বঙ্গশ্রী

মাসিক পত্রিকা

C06 - H04254 - 21 - P030226

একবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৬০—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

756.3
.002/3

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড্
৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

বিষয় ও লেখক-সূচী

P.30246

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	
অবধূতাচার্য্য শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব	শ্রীজনরঞ্জন রায়	৭৩
আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ভূমিকা	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০১
আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবন	শ্রীকালিদাস রায়	৯৩
আরব যুদ্ধের ইতিকথা	অধ্যাপক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯
ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের বার্ষিক কলা-প্রদর্শনী—(সচিত্র)-	শ্রীপরাশর	২০৯
উত্তর-দক্ষিণী সংস্কৃতি এবং বাঙালী-সংস্কৃতি	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	৪৮৮
কবি নজরুল দর্শনে	শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ	৫২১
কবি রংগলাল	শ্রীঅনিমেশ চট্টোপাধ্যায়	২৪৮
কিকুয়ু জাতির মানব-জীবন ও বেশভূষা (সচিত্র)	উমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১১৪
গ্রন্থাগার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান	কুমুদরঞ্জন সিংহ	৪২২
…গার—প্রাচীন ও নবীন	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
…য়ন পরিকল্পনা	ভবানী সেন	২৮৫
…হিতায় সাংখ্যদর্শন	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৩৯৪
…মর্ক …বজেন্দ্রলাল রায়	নারায়ণ চৌধুরী	৩৮০
নাট্যকার ইউজীন ও'নীল	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৫
পাশ্চাত্ত্যে ভারতের সংস্কৃতি-দূত উদয়শঙ্কর (সচিত্র)	শ্রীপ্রীতি চক্রবর্ত্তী	৪৯
পাশ্চাত্ত্যে সমুদ্রপূজা (সচিত্র)	শ্রীযতীন্দ্র সেন	২৩৮
পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা	শ্রীকালিদাস রায়	৫০১
ভারতীয় নাটকের জন্মকথা	মঞ্জু সেনগুপ্তা	১৭৮

বিষয়	লেখক	
পূর্ব্বপাকিস্তান বাঙালা সাহিত্য সম্মেলন (সংস্কৃতি-সংবাদ)	প্রফুল্ল রায়	৫৫৬
ভারতের বাণিজ্য প্রসার প্রচেষ্টা	যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
মনসা-মঙ্গল	শ্রীমতী পুষ্প বসু	…
মার্গসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিকতা	শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	১…
মোঘলযুগের চিত্রকলা	শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২…
মহর্ষির সম্বন্ধে গল্প	শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়	৫…
রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'	সুশীলকুমার গুপ্ত	৪…
রবীন্দ্রনাথের রাজা	অধ্যাপক হরনাথ পাল	…
রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ	শ্রীবাসন্তী বসু	…
রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়	ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৩, ১২২
বই পড়া	কুমুদরঞ্জন সিংহ	৩৫৩
বগুলা'র বারমাসী	নগেন দত্ত	৩৬০
বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ	নারায়ণ চৌধুরী	১
বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা	শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়	১০৩
বিশ্বনাগরিক নিত্যগোপাল	রেণু মিত্র	২৫৮
বৈদিক কর্ম্মবাদ	ডক্টর মতিলাল দাশ	২১৩, ৩৩৯
বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	শ্রীঅবনীনাথ রায়	২৬০
বার্নার্ড শ'—সেক্সপীয়র-কথোপকথন	মূলকরাজ আনন্দ অনুবাদ-অনিলকুমার আচার্য্য	৫৩১
শরৎ-স্মরণী	রণজিৎ কুমার সেন	১৪৩
সাহিত্যে নীতিবোধ	শ্রীরামদুলাল ভট্টাচার্য্য	৩৫১
সাহিত্যে শিবরাত্রি	জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৫
স্বদেশ-সেবক বিনয়সরকার	অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়	৫৬…

বিষয়	লেখক	
সাংখ্য ও বেদান্ত	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৪৭৭
সিদ্ধার্থের কবিত্ব লাভ	শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৫১৯
সাধক শ্রীকবিরঞ্জন (সচিত্র)	শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়	৫২৫
হিন্দী কাব্যসাহিত্যে বীরগাথাকাল	শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর	৫৪০
গল্প		
অন্ধদেবতা	শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৬
অজ্ঞদেশে	আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে অনুবাদ—শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়	২৯২
আগামী কালের মানুষের জন্য	ভিলিয়ার্স দে লাইল অ'দাম অনুবাদ—শ্রীকল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত	৩৫০
কন্টকাপল্লী	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
কুম্ভকর্ণের মৃত্যু	শ্রীগৌতম সেন	৩২০
কুয়াশা	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল	২২৯
ক্যালেণ্ডার	শ্রীশৈলেন বসু	৩৪৭
কালান্তর	অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	৪৮৩
খেলোয়াড়	শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২৫৩
গঙ্গা মড়া আসেন না	শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ	৪৩৪
জন্মদিন	শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ	৬
টুসু	শ্রীজনরঞ্জন রায়	৪৯৪
দুর্নিরীক্ষ্য	—আর্থার মিল্লার অনুবাদ—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	৩৫৭
দ্বিধারা	শ্রীঋতা	৬৯
ধারাবাহিক	শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৯৬
ন ভূতো ন ভবিষ্যতি	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	১১১
নারী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	৪৫৭
নিবৃত্তি	সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৫৩৭
পাঁচ-সাতে আটাশ	শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৯৭
পেশেন্ট	শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য্য	৩২৪
পাপপুণ্য	সুরুচি সেনগুপ্তা	৪৯৭
মাকড়সা	শ্রীরমাপতি বসু	৩৫
মানত	শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর	৫২
মুনাফা	শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার	৫৫৪
বান্না	শ্রীপ্রফুল্ল রায়	১৫৩
বাঁশী	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৯৫
বিপ্রলব্ধা	শ্রীঅনুপম সেন	৩৬৩
শিল্পীর নবজন্ম	শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী	৭৬
সত্যিকারের ভূতের গল্প	অধ্যাপক চেয়ো অনুবাদ—ব্রজেন রায়	১১৮
স্বর্ণবিভূতি	রণজিৎ কুমার সেন	৪২৭
উপন্যাস		
অয়েল	(আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়া'র) অনুবাদ—যতীশ বেন্দ্য	৬৫, ১৭২, ২৫৬, ৫৪৫
বান্ধবী	সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২৩, ১৬২, ২৪২, ৩৩০, ৫১৩
নাটক		
ধর্ম্মঘট	শ্রীমন্মথ রায়	১৩১, ২২০, ৩০৮, ৩৯৯,
কবিতা		
অগ্নিহোত্রী	শ্রীসুবোধ রায়	৩৮৫
অতল	শিশির দাশ	২৯১
অভীপ্সা	শ্রীঅধীর মল্লিক	৪৩৩
অমূল তরু	নরেন্দ্র দেব	১০২
অবসন্ন প্রহরের গান	পরিমলকুমার ঘোষ	২২
অসময়ের গান	সুশীলকুমার গুপ্ত	৩২৯
অহীরাবণ	শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী	১৬১
আগামীকালের রঙ	করুণাময় বসু	৭২
আবেদন	অরুণবরণ বক্রবর্ত্তী	২৩৭
আসবে না ফিরে	সেখ বাগ্‌বুল ইসলাম	২০৬
আমরা কি তবে করবো	সন্তোষকুমার অধিকারী	৫৫৯
ইচ্ছা	চিত্ত ঘোষ	৪৪৩
উত্তল : অবতল	শ্রীদুর্গাদাস সরকার	১৬৭
উৎসর্গ	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	৪৩৯
একটি উজ্জ্বল দিন	ব্রজেন রায়	৪১৮
একটি কথা	গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য	৩৪৬

বিষয়	লেখক	
এখনো সময়	শংকর চট্টোপাধ্যায়	৩০৭
ঋতুদগ্ধ	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৩৬
একটি গীতিকবিতা	রণজিৎকুমার সেন	৫৪৭
কন্যা কুমারীকে	বারীন্দ্রনাথ মৈত্র	২১৭
কবিতাষ্টক	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৫৫
কবি-প্রণাম	অমিয়মোহন বসু	৪২৫
কালের যাত্রা	সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৪৪
কোন বন্ধুকে	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৪৬
কোনো এক মেয়ে	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	৩১৯
কলকাতার প্রার্থনা	বটকৃষ্ণ দে	৫৩৬
ক্ষণবসন্ত	সুজিত কুমার নাগ	৯০১
চতুর্দশপদী	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪২
চার অধ্যায়	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৭২
চিতোর গড়	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩৪৫
ছড়া	অমলকান্তি ঘোষ	১৭৭
ছায়া	সন্তোষকুমর অধিকারী	১২
জানালা থেকে	মানস চৌধুরী	৪২৬
জীবন-স্বপ্ন	করুণাময় বসু	২২৮
জীবন-প্রশ্ন	সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৫১৩
ডাক	বংশীধারী দাস	২১২
তিনপাহাড়ের স্বপ্ন	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯৮
দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২২৬
দীপান্বিতা	সমীর ঘোষ	৫৪৪
ধারা	অনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩২৩
নববর্ষের প্রথম উষায়	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	৩৭৯
নাগ	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	৪২৬
নির্জন নীল	শ্রীকৃষ্ণ দাশ	৪৯৩
পঙ্কিল	শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪
পঁচিশে বৈশাখ	ইন্দিরা গুহ	৪০৫
পথ চলে যায় দিল্লী	শ্রীকৃতান্ত নাথ বাগ্চী	১
প্রেম	শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়	
ফিরে যাই	করুণাময় বসু	৪
ভবিষ্যৎ-বাণী	শ্রীমতী বাণী রায়	
মনোলীনা	সনৎকুমার মিত্র	১
মহাভিনিষ্ক্রমণ	শ্রীসুধীর গুপ্ত	২
মেঘমন	শিশিরকুমার দাশ	২
রবি-কাব্যসুধা	শ্রীঅবিনাশ সাহা	১১
রৌদ্র-স্নান	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৫
লীলাবতী	মানস রায় চৌধুরী	
বাস্তব	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৩
বিকাশ	শ্রীসুগৌতম	২
বিড়ি	আশুতোষ সান্যাল	৫
বিদায়ের পর	প্রফুল্লচন্দ্র গুহ	৭১
শান্তি	মৃণালকান্তি দাশ	১১৫
শূন্য দিগন্ত	সন্তোষকুমার অধিকারী	৩৮৫
শ্যাওলা	আনন্দ বাগচী	৩৬৬
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা	শঙ্খ ঘোষ	৩৯৮
সবুজ দ্বীপ	পরিমলকুমার ঘোষ	২১
সাগরতীরে	সমীর ঘোষ	৩
সিম্ফনি	শ্রীঅধীর মল্লিক	১৯৯
সুধায় ক্ষুধা ঘুচল না	লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস	১৬৭
সেরিনাড	বটকৃষ্ণ দে	১৪২
স্মরণ	শ্রীমতী বাণী রায়	২৬৮
স্মৃতি	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	২৫৫
স্বপ্ন-সুন্দর-আমি	মৃণালকান্তি দাশ	৪৮৭
স্মরণী	সুনীলকুমার নন্দী	৫১৮
হাড়ের মানুষ	সেখ বাগবুল ইসলাম	৪৪৩
হাসপাতালের চিঠি	সুশীলকুমার গুপ্ত	৫১
হিমছায়া	মানস রায় চৌধুরী	২২৫

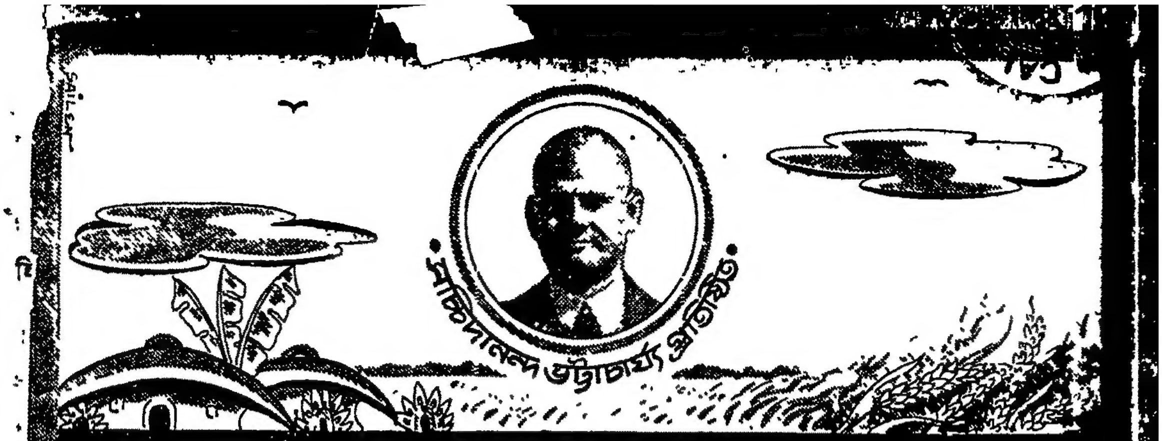

বঙ্গশ্রী

একবিংশ বর্ষ | পৌষ—১৩৬০ | ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ

নারায়ণ চৌধুরী

নানা বিপর্যয়ের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ অনেক দূর থেকেই বিকার দশা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও তার কাঠামোটি ঠিক আছে। এখনও আমাদের সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পসাহিত্যগত তৎপরতা—এ সবই মধ্যবিত্ত সমাজের করধৃত। সত্য বটে শ্রমিক শ্রেণী পূর্বের তুলনায় আজ বহু গুণে বেশী জাগ্রত, সঙ্ঘবদ্ধ এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে বর্ধমান; তা সত্ত্বে এ কথা মানতেই হয় যে, তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে এখনও ঢের, ঢের বিলম্ব। এমন কি আমাদের দেশে আদৌ সে অবস্থা কখনও সৃষ্টি হবে কি না সে বিষয়ে এক-এক সময় সন্দেহ জাগে।

সন্দেহ, কেন না আমাদের সমাজের গড়ন ঠিক ইউরোপীয় সমাজের গড়নের মতো নয়। ইউরোপীয় জন-সমাজ শিল্প-বিপ্লবের অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, কাজেই সে দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাধিনায়কত্ব (ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েট) কল্পনা করা সম্ভব; বস্তুতঃ ইউরোপীয় বামপন্থী বস্তু-বাদী দার্শনিকেরা বিগত শতকে তেমন কল্পনাই করেছেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ শিল্পবিপ্লব তো দূরের কথা ... পর্যন্ত কৃষি-সভ্যতার সব কটি স্তরই ভালো করে ... ক্রম করতে পারে নি। এ দেশে শিল্পায়িতকরণ প্রয়াস ... কৃষিব্যবস্থা গায়ে গায়ে মিশে আছে। বড়ো বড়ো ... গুলির পাশে এখনও কুটির শিল্প বহাল তবিয়তে ... আছে এবং দূর ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। কৃষি-ব্যবস্থা ... অন্যতম প্রধান অঙ্গ জমিদারী প্রথা রদের চেষ্টা চলছে, ... জমিদারী মনোভাব বিন্দুমাত্র দূর হয় নি। সহর ... গুলিতে কল-কারখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে, এ-দি... গ্রামীণ সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা-প্রসূত ... ব্যবস্থাদি পূর্বের ন্যায় বলবৎ। বাস্তব অবস্থার চা... পড়ে ভূমিহীন কৃষক সমাজের একটা অংশ শ্রমিক শ্রেণী... কোঠায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে, এ দিকে সাধারণ কৃষ... সমাজের মধ্যে ধনকৌলীন্য আভিজাত্য এবং তথাকথি... বনেদিয়ানার মোহ অতি প্রবল। ভারতীয় শ্রমিক সমা... ও কৃষক সমাজ তাদের পারস্পরিক অনগ্রসরতার দ্বারা দু... দুইকে পিছনে টেনে রেখেছে, এ কথা বললে মোটেই বাস্... সত্যের অপলাপ করা হয় না।

হই যে বিসদৃশ পরস্পরবিরোধী অবস্থা, এই অ...

স্থার জাঁতাকলে পড়ে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা হয়েছে কিম্ভূত। ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজ প্রত্যক্ষতঃ সেই দেশের শিল্প-বিপ্লবের ফলে উপজাত শিল্প-বিপ্লবের ফলে সহর-অঞ্চলগুলির পরিস্ফীতি ঘটায় এবং নানা নূতন নূতন বৃত্তির উদ্ভব হওয়ায় স্বভাবতঃই বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রয়োজন দেখা দিল এবং সে সমাজ অচিরেই একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ইউরোপীয় সমাজের নানাবিধ সমুন্নতি বিধানে তথাকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা সুবিদিত। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ ঠিক ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মতো নয়। ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মাটির সঙ্গে বিশেষ কোন যোগ নাই, কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আছে। মুখ্যতঃ নাগরিক আবহাওয়ার আওতায় সৃষ্ট বিভিন্ন নূতন বৃত্তির প্রয়োজনে এ সমাজ তৈরী হলেও গ্রামসমাজের সঙ্গে এ সমাজের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের আয়ের একটা অংশ বরাবর গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থার খাত বেয়ে এসেছে। বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর তেমন লোকের সংখ্যাই বেশি যাদের গ্রামঘরে কিছু না কিছু জমি জিরাত আছে। মধ্যবিত্তরা জীবিকার সূত্রে সহর-অঞ্চলে বাস করে, কিন্তু বাড়তি আয়ের সূত্রে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাদের সকলেরই নাড়ীর যোগ বিদ্যমান। আধুনিক কালোচিত শিল্প-সভ্যতা মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম দিয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মনের পরতে পরতে কৃষির সংস্কার ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। যে ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে একটি উদ্বৃত্ত আয়ের উপর নির্ভর সে ব্যবস্থা কখনও উক্ত আয়ের সুবিধাভোগীর নিকট অরুচিকর বা অবাঞ্ছনীয় ঠেকতে পারে না।

এই কারণে ইউরোপীয় বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ভাষ্য অনুসারে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজকে ঠিক মধ্যবিত্ত সমাজ বলা চলে না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্মকালের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব যদিও কিছু পূর্বে সংসাধিত হয়েছে, তা হলেও এই সমাজের চেহারার মধ্যেও কৃষি-শিল্প-বিমিশ্র আধা-খেঁচড়া ভাব সমভাবে বিদ্যমান। তার উপরকার নাগরিক পালিশের তলায় অন্তর্লীন স্রোতের মতো গ্রামীণ সংস্কার সতত প্রবহমান। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্তরা নাগরিক সভ্যতাসুলভ সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য আর রীতিপ্রকরণ করেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। তাদের নাগরিকতার তলায় তলায় কৃষিসভ্যতাসুলভ সংরক্ষণশীলতা ও স্থূলতার প্রবল আধিপত্য। আধুনিকতা আর রক্ষণকামিতার সংমিশ্রণে আমাদের বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষ কিম্ভূত এক-একটি জীব।

আরও একটি কারণে এ দেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এবম্বিধ দো-আঁশলা মানসিক গঠন উপজাত হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের মধ্যবিত্তরা নামেই মধ্যবিত্ত, পাশ্চাত্য সমাজের ষ্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের উপায় দুটি—বৃত্তিজাত আয় আর ভূমিজাত আয়। সেই স্থলে ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের আয়ের উৎস মাত্র একটিই—বৃত্তি। তৎ সত্ত্বেও ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের উপার্জনক্ষমতা সমধিক এবং সে-কারণ তাদের জীবনধারণের মানও উচ্চতর। দুই সূত্র থেকে আহৃত উপার্জনের অঙ্ক একত্র করলেও এ দেশীয় মধ্যবিত্তের আয় ও দেশের একজন গড়পরতা সাধারণ মধ্যবিত্তের আয়ের তুল্য হবে না। আয়ের তারতম্যের অর্থই হচ্ছে জীবিকার তারতম্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য। জীবনযাত্রা যেখানে সচ্ছল সেস্থলে দৃষ্টিভঙ্গীও উদার এবং আধুনিক হতে বাধ্য। এই কারণে দেখতে পাই, পাশ্চাত্যবাসী মধ্যবিত্তের পক্ষে নাগরিকতা তথা বৈদগ্ধ্য তথা আধুনিকতার লক্ষণগুলি যে পরিমাণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে তেমন সম্ভব হয় নি। ভারতীয় মধ্যবিত্তের গাত্রচর্ম খানিকটা আঁচড়ালেই বোঝা যাবে, তার মানসিকতায় পরিবারকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীটাই অদ্যাবধি প্রধান।

এ কথা যে নেহাৎ একটা কথার কথা নয়, পরন্তু বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। আমরা সদ্য-অনুষ্ঠিত শারদীয় দুর্গোৎসব মনে করে এ কথা বলছি। শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান কারক অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা হল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বিশেষতঃ সর্বজনীন পূজা-অনুষ্ঠানগুলির ব্যাপক উৎসব-সমারোহের মূলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রয়াসকেই মূলতঃ সক্রিয় দেখতে পাই। আগে গ্রামাঞ্চলের দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে মুষ্টিমেয় সঙ্গতিবানেরাই ছিলেন অনুষ্ঠানের নায়ক। গ্রামের জমিদার বা তৎস্থানীয় অভিজাত ধনী দোল-দুর্গোৎসব করতেন; সেই উৎসব-অনুষ্ঠানের আনন্দের পংক্তিভোজে সর্বসাধারণের জন্য পাত পড়ত। এখন পূজার উৎসবের চেহারা বদলেছে। যা ছিল ব্যক্তিগত ব্যবস্থাধীন ব্যাপার তা এখন সাধারণের ব্যবস্থাধীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূজা-অনুষ্ঠানের মধ্যেও গণতান্ত্রিকতার পর্ব সূচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানে এবং শিল্প বিপ্লবের সূচনায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তচ্যুত হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের করায়ত্ত হয়েছিল, ধর্মের ক্ষেত্রে এ যেন তেমনি একটি ব্যাপার। ভারতীয় সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের পূর্ব ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসব-ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের তুলনায় সে সম্প্রদায়ের উৎসাহ-উদ্যম বহুলাংশে স্তিমিত। কিন্তু প্রকৃতিতে শূন্যাবস্থা যেমন বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না, এ ক্ষেত্রেও পারে নি। অভিজাত সম্প্রদায়ের ত্যক্ত দায়িত্বের ভার স্বতঃই এ স্থলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তরাই এক্ষণে বাংলার ধর্মানুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা।

মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা কলকাতা শহরে বহু সংখ্যক সর্বজনীন দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এ সকল অনুষ্ঠান 'সর্বজনীন', সুতরাং তাতে সর্বশ্রেণীর হিন্দুরই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগ থাকা আবশ্যক। স্বেচ্ছা-সম্মত গণ-সহযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হলে তবেই শুধু কোনো অনুষ্ঠান বা আয়োজন সর্বজনীন আখ্যা লাভ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এখানেও দলাদলি, ঈর্ষা, লোভ, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মোহ, রাজনৈতিক বিসম্বাদ। অর্থাৎ গ্রাম-ঘরে ক্ষুদ্র সীমার ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা নিবদ্ধ ছিল তা এখন সহর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আত্মবিকাশের ব্যাপকতর ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। সর্বজনীন পূজা-উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামীণতা এক্ষণে সহর অঞ্চলে জাঁকিয়ে বসেছে।

এ জাতীয় ব্যাপার কেন ঘটে পূর্বেই তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে করি। অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্তের দো-আঁসলা স্বভাবই তার কারণ। বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রত্যক্ষতঃ বাস করে সহরে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে গ্রামীণতার সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। সহরের অধিবাসী হয়েও সে পল্লীমায়ের আঁচলধরা। কথাটাকে সদর্থে গ্রহণ করা যেত—অনেকে সদর্থেই গ্রহণ করবেন বলে মনে হয়, কারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত যে আজও পল্লীর সঙ্গে যোগ হারায় নি সেটি অনেকের নিকট বাঙালী মধ্যবিত্তের একটি অতিরিক্ত গুণরূপে পরিগণিত হওয়াই স্বাভাবিক,—কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বুঝি আর সদর্থক মনে করার যো নাই। নানা লক্ষণদৃষ্টে মনে হয়, বাঙালী মধ্যবিত্তের অগ্রসর ভূমিকা, প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাঙালী জীবনে নানা দিক থেকে নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিল, শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, ধর্ম ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় যে মধ্যবিত্ত সমাজ বাংলার মরা গাঙে বান ডাকিয়েছিল, সেই মধ্যবিত্ত সমাজ এক্ষণে ক্ষয়িত-শক্তি, স্তিমিতপ্রভ। পুরাতন কীর্তির রোমন্থন করাটাই এক্ষণে তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এ সমাজ এক্ষণে নিতান্তই আত্মরক্ষাতৎপর ও পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত পরিবারকেন্দ্রিকতা সর্বাবস্থায়ই সঙ্কীর্ণতার দ্যোতক। চার দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ স্বীয় ক্ষুদ্র সংসারের ভালোমন্দ ভাবতেই যার সমস্ত সময় কেটে যায় তার দৃষ্টিভঙ্গীতে কখনও সত্যিকার উদারতার স্পর্শ সৌভাগ্য ঘটতে পারে না। অতিরিক্ত পরিবারকেন্দ্রিকতারই অপর নাম স্বার্থপরতা। সেই স্বার্থপরতার অপবাদ বর্তমান বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উপর অনায়াসে আরোপ করা যেতে পারে বলে মনে করি। এককে দাবিয়ে, একের স্বার্থ পদদলিত করে, অপরের প্রতিষ্ঠা লাভ প্রয়াসের নীতি এ সমাজে দূষ্য নয়, কারণ এ সমাজের মাথাওয়ালা প্রত্যেকেরই নিকট নিজ নিজ সংসারটিই হল সকল চিন্তাভাবনা অধ্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দু। সকলেই অল্পবিস্তর মূল নীতি বলে ধরে নিয়েছে এ কথা যে, নিজ নিজ সংসারকে পাকেচক্রে রক্ষা করাই হল আসল কাজ, বাদবাকী সংসারগুলি জাহান্নমে গেলেও ক্ষতি নাই। এই অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাবের পরেও যে সংসারগুলি জাহান্নমে যায় না তার হেতু এই যে, সবাই আত্মসচেতন এবং নিজ নিজ পরিবার সংসারকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত। 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতির প্রতি এমন অখণ্ড শ্রদ্ধার মনোভাব আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি মাথাওয়ালা প্রবীণ লোক অহংবোধের বিগ্রহের সামনে মাথা মুড়োবার জন্য মাথা পেতে বসে আছেন। সত্য বটে মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদর্শবাদের অনেকখানি পোষকতা আছে; তারা ঠিক তাদের অভিভাবকদের মতো অহংসর্বস্ব নয়। দেশের বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার গণ্ডী উত্তীর্ণ। শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালনায় এবং সাধারণভাবে বামপন্থী রাজনীতির নয়কত্বের বেলায় এখনও মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজের ভূমিকাটাই প্রধান। বাংলা দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সূত্র আজও মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত তরুণরাই ধারণ করে আছেন। কিন্তু মন্তব্য-

টুকু সর্তবিরহিত নয়। মধ্যবিত্ত তরুণ যতদিন বয়সে তরুণ থাকেন ততদিনই তাঁর এই আদর্শবাদ; কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি সংসারের জোয়ালে নিজের ঘাড়টি জুতে দেন, অমনি তার চেহারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তখন আর দশজন প্রবীণ মধ্যবিত্তের মতোই পরিবার-গতপ্রাণ, বিষয়ী, সংসরনিবিষ্ট মানুষ। পারিবারিক স্বার্থের টানে আদর্শবাদের আকর্ষণ ক্ষয় পেতে পেতে এক সময়ে তা বিনিঃশেষে মুছে যায়, এককালীন রোমাণ্টিক অধুনা গৃহস্থ কাজেই বিষয়াসক্ত তরুণের মনে পুরাতন উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গমাত্রও আর বেঁচে থাকে কি না সন্দেহ। যুবক গৃহস্থ যতই সংসারে প্রবেশ করে ততই তার মন কঠিনত্ব প্রাপ্ত হতে থাকে, এক সময়ে মানসিকতার ভিতর ঔদার্যের বাষ্পও আর থাকে না।

শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ মনের পরিণতি দাঁড়ায় এই। এর ফল বৃহত্তর জাতীয়-জীবনের উপর কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যবিত্ত সমাজকে আজও আমরা সকল কাজের পুরোভাগে দেখতে ভালোবাসি এবং এখন পর্যন্ত সকল কাজের পুরোভাগে থাকার একটা ঠাট সে খাড়া রেখেছে। তবে মনে রাখতে হবে সেটি মাত্র ঠাটই, তার বেশি কিছু নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের উপর ন্যস্ত প্রত্যাশার পূরণ করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ হাঁপিয়ে উঠেছে। পুরাতন নজীরের বশে আজও আমরা আশা করে আছি, মধ্যবিত্ত সমাজ রাজনীতিতে, সাহিত্যে, সমাজ সংস্কারে, সমবায়মূলক কর্মপ্রয়াসের ক্ষেত্রে তার চরম কুশলতা প্রদর্শন করে সকলের উপর অগ্রপ্রাধান্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, কিন্তু এই আশার মর্যাদা মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা আজ যথাযথভাবে রক্ষিত হওয়া সম্ভব কি না সন্দেহ। বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষিতপ্রায়। ঊনিশ শতকে আরব্ধ সর্বতোমুখীন প্রগতির আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করবার ক্ষমতা মধ্যবিত্তের আর নেই, এখন শুধু পুরাতন ঐতিহ্যকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে মাত্র। আগুন নিভে গেছে; এক্ষণে শুধু দগ্ধাবশেষকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির প্রয়াস। পুরাতন কীর্তির অঙ্গার-রাশির উপর অদ্যকার মধ্যবিত্ত সমাজের টলটলায়মান প্রতিষ্ঠা।

তিনটি মূল কারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য দায়ী।—এক, তথাকথিত ভদ্রত্বের চেতনা, দুই, castism বা জাতিভেদ-চেতনা, তিন, অতিরিক্ত পরিবার-কেন্দ্রিকতা বা সংসারমনস্কতা। তিনটি কারণ সম্বন্ধেই কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

মধ্যবিত্ত সমাজ নিম্নবিত্ত তথা শ্রমিক সমাজের সঙ্গে পাছে এক হয়ে মিশে যান সেই ভয়ে সর্বদাই তটস্থ। তারা তাই তথাকথিত নিম্ন সমাজের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য-রেখাটিকে সুচিহ্নিত করতে সদাব্যস্ত। এ ব্যাপারে 'ভদ্রত্ব' তাদের সহায় আর তারই হেতু ভদ্রত্বের বেদীমূলে তারা সকলেই গললগ্নীকৃত বাস। ভদ্রত্ব বলতে এখানে আচরণের শীলতা, বিনয়, সদ্ধর্ম ইত্যাদি বোঝাচ্ছে না—ও সকল গুণ সব সম্প্রদায়ের দ্বারা সর্বাবস্থায়ই অনুশীলিতব্য—, ভদ্রত্ব বলতে এখানে নেহাতই জামা-কাপড়ের ভদ্রতাকে বোঝাচ্ছে। আর এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভদ্রতাকেই আঁকড়ে আছেন মধ্যবিত্ত সমাজ। কাপড়ে-চোপড়ে সাজে-সজ্জায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে নিজেদের শ্রেণিস্বরূপকে আলাদা করে দেখাবার তাড়নায় মধ্যবিত্ত সমাজ গলদঘর্ম। এত করেও যে সব সময় ভোল বজায় রাখতে পারেন তা নয়, তবু ধোপ-ধোরস্ত জামা-কাপড়ের শীর্ষে ভদ্রতার বিজয়বৈজয়ন্তী ওড়াবার চেষ্টার বিরাম নেই। সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার আদর্শকে তাঁরা মাত্র পুঁথিকেতাবের পাতায় স্বীকার করেন; এ দিকে বাস্তব জীবনের সজ্জায় ও আভরণে ঘটা-পটার আদর্শেরই সমধিক জয়জয়কার। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই সজ্জামোহ এসেছে অভিজাত সম্প্রদায়ের দেখাদেখি, কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়কে যা মানায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তা মানায় না। সমাজে সজ্জা পারিপাট্যের এবং সেই সূত্রে নিজ নিজ সঙ্গতি বিঘোষণের একটা সংস্কার প্রচলিত আছে বলেই খেয়ে না খেয়ে সেই রীতির পায়ে কুর্ণিশ জানাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অভিজাত সমাজ, বিত্তবান সমাজের পক্ষে যা নেহাতই বিলাস চর্চা, মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে তা প্রায় প্রাণঘাতী ব্যাপার। তবু সংস্কার এমনি বালাই যে, সকল রকম অসুবিধা সহ্য করেও তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে তবু নতুন কিছু করা চলবে না। মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের গ্রন্থাদিতে দেখতে পাই, মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে সেখানে দ্বিধাবিভক্ত বলা হয়েছে; মধ্যবিত্তের এক চোখ নীচু তলায়, আর এক চোখ উপর তলায় নিবদ্ধ। যখন যে দিকে কাত হলে সুবিধা, সুযোগ বুঝে মধ্যবিত্ত সমাজ সেই দিকেই কাত হন। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের রকম-সকম দেখলে মনে হয়, তাঁরা এক দিকে কাত হয়ে থাকাটাই তাঁদের চিরন্তন বিধিলিপি বলে জেনে নিয়েছেন, এবং সে এক দিক হল—উঁচু তলার দিক। বিশেষ, দেশ স্বাধীন হবার পর, কংগ্রেস শাসনক্ষমতা অধিকারের পর, মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। ধনী সমাজের গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারলে

তাঁরা আর কিছু চান না। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যাঁরা নিজেদের চাঁই গোছের মনে করেন বড়োলোকের সঙ্গে তাঁদের ঢলাঢলি লেগেই আছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তরুণ বয়সীরা নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীর দুঃখে যতই বিগলিত হোক, তাতে ঐ সমাজের শাঁসালো, ভারিক্কি অংশের বিচলিত হবার কারণ নেই যতক্ষণ তাঁরা ধনী সমাজের নেকনজরে আছেন। ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতা একটি অপরাধ বলে গণ্য। অবহেলিত নির্যাতিত সমাজের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবার অনুচিত আগ্রহে মধ্যবিত্ত সমাজের এই যে তথাকথিত ভদ্রত্ব জীইয়ে রাখবার প্রয়াস, এও এক ধরণের অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

তার পরেই জাত্যভিমান, বর্ণচেতনার অভিমান। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ দেখিয়েছেন, বাঙালীর ভিতর castism অমোচনীয়ভাবে বদ্ধমূল। সমস্ত রকমের সভ্যতার উপর-পালিশ ভেদ করে বাঙালীর এই বর্ণাভিমান আজও পর্যন্ত টিকে আছে। এ কথার প্রমাণ আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আচারে-ব্যবহারে নিত্যই পাই। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদির ভেদচেতনা শোচনীয়ভাবে প্রকট। কোথায় শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে এ সকল ভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে, তা নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই উক্ত ভেদচেতনার সর্বাধিক প্রাবল্য। বিবাহ, চাকুরি, বন্ধু নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে বর্ণ মিলিয়ে জোট বাধবার প্রবৃত্তি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যত প্রবল এমন বোধ করি আর কোন সম্প্রদায়ের ভিতর নয়। জোট বাধবার প্রবৃত্তি খারাপ তা বলি নে, কিন্তু বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ কতকগুলি ভেদলক্ষণ মিলিয়ে যেখানে এই মিলিত হবার প্রয়াস, সেখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেই হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাধারণতঃ উপাধির রন্ধ্রপথেই এই সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির উপাধি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তির প্রতি অপর পক্ষের মিত্রতা অথবা বিমুখতা অম্প-বিস্তর নির্ণীত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের ফলে যদি জানা যায় যে আলাপিতের উপাধি যথেষ্ট পরিমাণ উচ্চ কুলের জ্ঞাপক নয়, তথাকথিত কুলীন উপাধিগুলির দু'এক ধাপ নীচের সারে তার অধিষ্ঠান তা হলে জিজ্ঞাসাকারকের মনের কোণায় অজ্ঞাতসারেই বুঝি তাচ্ছিল্যের একটি চিলিক খেলে যায়। এটি কথার কথা নয়, যে কেউ আঁখি না ঠেরে নিজের মনের মুখোমুখি দাঁড়াবেন, এ অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সাধারণের তুলনায় শিক্ষিতের মধ্যে এ বর্ণাভিমান প্রবল। তার কারণ, আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাটাই এমন যে, তাতে শুধু ভেদচেতনা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। সাধারণের নিকট যে ভেদরেখা অস্পষ্ট, শিক্ষিতের চোখে সে ভেদরেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষিতের বিকারগ্রস্ত দৃষ্টি যেখানে ভেদ থাকা উচিত নয় সেখানে ভেদ আবিষ্কার করে পুলকিত হয়। উপাধির ক্ষেত্রে আমাদের এ ভেদজ্ঞান মর্মান্তিকভাবে পরিস্ফুট। আমরা অতি সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যসীমা অতিক্রম করেছি, প্রতি পদে পদে আধুনিকতার দোহাই দিই; উপাধির অত্যাচার সমাজদেহ থেকে আজও দূর হল না—এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কী হতে পারে?

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই দেখি, সন্তান একটু বড় হতেই তার লেখাপড়ার জন্য অভিভাবক বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং কন্যাসন্তানের বয়ঃপ্রাপ্তির সূচনায় তার বিবাহের জন্য টাকা জমাতে সুরু করেন। সন্তানের মঙ্গলকামনা পিতামাতামাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক, সুতরাং সেদিক থেকে এ অভ্যাসের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে, জোড়াতালি দেওয়া সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় অভিভাবকের মঙ্গলকামনা আর কত দূর ফলপ্রসূ হতে পারে? মধ্যবিত্ত ছেলের বাপ ছেলের লেখাপড়ার জন্য এত যে করেন, সেই তো ছেলে এ দেশ-প্রচলিত শিক্ষার প্রসাদে বড়ো হয়ে বাপেরই মতো আর একজন ছাপোষা কেরাণী হবে, তবে আর শিক্ষাদান ব্যপদেশে অত পাঁয়তাড়া কষা কেন। ধার-কর্জ করে, বাড়ী বন্ধক রেখে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই-ই চাই, এদিকে মেয়ে হয়তো পড়ল এক মদ্যপ, কুক্রিয়াসক্ত, অত্যাচারী স্বামীর পাল্লায়, নয়তো হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই জীবন গেল। গড্ডালিকাবাহী মধ্যবিত্ত সমাজ গতানুগতিকত্বকে মানতে গিয়ে কষ্ট পাবে, তবু অভ্যাস বদলাবে না। যেমন তেমন করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো চাই, মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই, কিন্তু যে ব্যবস্থার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পুত্রকন্যার শক্তি ও আয়ু অযথা ক্ষয়িত হচ্ছে সে ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা কারও মনে হয় না। নতুন করে সমাজকে ঢেলে সাজবার চিন্তা মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অনুপস্থিত। পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে সকলেরই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ অবারিত, সেস্থলে কেবলমাত্র অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে গতানুগতিক ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকা শোচনীয় অজ্ঞতার নামান্তর। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এই অজ্ঞতার দ্বারা কবলিত, সেই কারণে তার এতাদৃশ দুর্গতি।

জন্মদিন

অমরেন্দ্র ঘোষ

'মা আমার জন্মদিন কবে ?'

'যেদিন আমি মরব। আমার আর এ জ্বালা সয় না।'

ছ বছরের অম্বু থ মেরে যায়। মায়ের মূর্ত্তি দেখে আর কোনও কথা বলতে সে সাহস পায় না। খুকীকে কোলে ক'রে এইমাত্র অম্বু দেখে এসেছে ওরই সমবয়সী সবিতার জন্মদিন পালনের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছে তার বাবা ও মা। কেমন সুন্দর সিল্কের জামা এনেছে, জুতো এনেছে, শাড়ীও এনেছে ছোট্ট একখানা। রঙ দেখে অম্বু একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে। কি চমৎকার পাড় দুটি। ইচ্ছা করছে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে ধরতে। সবিতা নাকি একছড়া সোনার হারও পাবে দিদির কাছ থেকে। সবিতার এক বয়সী অতিথিরা খেলনা দেবে, পুতুল দেবে, ঝুমঝুমও দেবে নাকি একটা। অনিমার হিংসা হয় সবিতার সৌভাগ্যে। অম্বু খুকীকে কোলে ক'রে ছুটতে ছুটতে মার কাছে আসে।

সবিতা এক বাড়ীরই অন্য ঘরের ভাড়াটে মেয়ে। খুব যে ওরা বড়লোক তা-ও নয়। এই নিয়ে ওর দু'বার জন্মদিন উদ্‌যাপিত হল। আগে অন্যত্র থাকতে হয়েছে কিনা অনিমা জানে না। কিন্তু ওর ছোট্ট বুকখানি ভেঙে-চুরে যাচ্ছে এই দু' বছর ধ'রে।

মা বলেছে, 'কাঁদিস নে অম্বু, তোরও জন্মদিন হবে।'

কই দু'-দুটো বছর তো গত হয়ে গেল, কিছুই তো হল না।

সবিতার জন্মদিনের পরই গতবার একেবারে বেঁকে বসেছিল অম্বু।

'না আর আমি তোমাদের সংসারের কোনও কাজ-কর্ম্ম করব না। লক্ষ্মীপূজার জন্যে ফুল, বেলপাতা আনব না, খুকীকে ঘুম পাড়াব না; যখন-তখন হুকুম করলে আমি ছুটে যাব না দোকানে। ইস্‌ আমি কি দাসী, বাঁদি, না পোষা ঝি ? আমার পায় ধরলেও আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

মায়া হেসে হেসে জবাব দিয়েছে, 'তা কি হয় মা ? তুমি হচ্ছ অন্ধের নড়ি, তোমাকে ছাড়া কি সংসার করতে পারি আমি ?'

'না পার, না পার, গলায় দড়ি দিয়ে ডুবে মর গে— আমি তোমাদের কেউ নই। আজই আমি বড়দির বাড়ী চলে যাব।'

বছর সাতেকের বড় ভাই বাদল বলেছে, 'কি ক'রে যাবি, একবার যেয়ে দেখ না, চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আসব।'

'ও মা দেখ না দাদা কি বলে, নচ্ছার গুণ্ডাটা...' অম্বু একেবারে কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছে মেজেতে। আর যা-তা বলেছে ওর দাদাকে। 'চোর, ডাকাত, ছুঁচো কোথাকার। সেদিন কেমন মজা দেখিয়েছিল বাবা ? আর চুরি করবি কক্ষণো বাজারের পয়সা ? সিনেমা না দেখলে দিন কাটে না বাবুর।'

'চুপ কর অম্বু, চুপ কর বলছি।'

'কেন চুপ করব শুনি ? আমি কি মিথ্যে বলছি ? এর-পর গাঁজা খাবি, রেস্ খেলবি। ঘরের পয়সায় কুলাবে না, ট্রামে বাসে পকেট কেটে জেলে যাবি।'

'তবে রে হারামজাদী, আমি জেলে যাব—' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বাদল এগিয়ে এসেছে।

আর উপায়ান্তর না দেখে মায়া এসেছে একখানা ভাঙা বেত্রদণ্ড নিয়ে অনিমাকে রক্ষা করতে। ঐ বেতখানা যে কতবার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে বাদলের পিঠে।

বাদল ছুটে পালিয়ে গেছে। মায়ার সাধ্য কি যে ওকে ধরে। অম্বুকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক প্রবোধ দিয়েছে। 'নিশ্চয় তোমার জন্মদিন হবে সাতাশে পৌষ। এখনও অনেক দেরী—প্রায় তিন মাস।'

অনুকে কোলে নিতেই খুকী ছুটে এসে মার গলা জড়িয়ে ধরেছে হিংসায়। চুলের মুঠি ধরে অনুকে নামিয়ে দিয়ে সে দখল ক'রে বসেছে মার কোল; চোখ মুখ মুছে অনু সহাস্যে ওকে জড়িয়ে ধরে খেয়েছে চুমো।

অনুর জন্মদিন হবে এবং খুকীরও। বিয়েতে যেমন সাজসজ্জা লাগে, এতেও প্রায় তাই। অত-শত যদি সংগ্রহ করা না-ও সম্ভব হয়, তবু একটা রঙিন ফ্রক আসবে, রান্না হবে কড়াই বোঝাই সুমিষ্ট পায়স।

'মা-আমরা অতখানি পায়স খেতে পাবব? কতদিন খাইনি মিষ্টান্ন।'

'তোর দেখি নোলায় জল আসছে।'

'যেৎ তাই নাকি! আমার না জন্মদিন।'

সবিতা, রমা, শোভা, পুতুল—বাড়ীর ওপর সব ইস্কে নেমতন্ন করবি নে? ওরা এলে কি পায়স বেশী হবে?

'তুমি সব্বাইকে বলবে? অত টাকা চালাতে পারবে?'

'তেমন আর বেশী কি লাগবে, চালাতেই হবে।'

'ফুল লাগবে না মা?'

'সে-সব তোর দাদা জোগাড় ক'রে আনবে। আমরা কি সবিতাদের মত বাজে ব্যয় করতে পারি?'

'ম', আমি আর দাদার সংগে কক্ষণো ঝগড়া করব না। কিন্তু ও যে মিছেমিছিই আমার সংগে লাগে।'

'তবু তোমার বড় ভাই, তোমার গুরুজন, কিছু বললে চুপ ক'রে থেকো।'

'আচ্ছা।' প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভব হবে কিনা অনিমা জানে না, তবু বলে, 'আচ্ছা মা—তোমার কথাই শুনবো।'

আবার অনাগত জন্মদিনের কথা ওঠে। মায়া নানা রঙের আশার তুলি বুলিয়ে চলে মেয়ের বুকে। ওরা দরিদ্র হলেও ওদের মনটা ভরে যায় স্বপ্নে।

'মা, খুকীর জন্মদিন হবে না—দাদারও একটা কর না মা!'

'আগে তোমারটা হ'ক, তারপর একে একে সব্বাইয়েরটা হবে। দাদা বোঝে, খুকী অবুঝ—আগে তোমারটা হয়ে যাক।'

কিন্তু গত বছর সাতাশে পৌষ এসে চলে গেছে, নাবা অত্যন্ত অসুস্থ, কিছুই হয়নি। কথাটা সবাইর মনে এসে ধাক্কা দিয়েছে যেমন দেওয়া উচিত। মায় অনুকে দেখেছে উদাসীন হয়ে ঘুরতে। সে নীরবে শুধু সংসারের কাজ করে গেছে। ভাল করে তাকায় নি মেয়ের মুখের দিকে।

আবার একটা বছর প্রায় পৃথিবী তার বৃত্ত পরিক্রম করে এসেছে। আজ সবিতার জন্মদিন। অনুরটা আর কিছুদিন বাদে।

কিন্তু অনু জিজ্ঞাসা করা মাত্র আঘাত পেল মার কাছ থেকে।

সাত আনা পয়সার জন্য সপ্তাহের বরাদ্দ রেশন থেকে একটি সের চাল বাদ যাবে। অনুর বাবা ঠিকঠাক গুণে রেখেছিল পয়সা বাক্সে। কে যেন ভোর বেলাই পকেট হাঁতড়েছে। একটা ষ্টেসনারী দোকানের সেল্‌সম্যান অনুর বাবা। সে বাদলকে ডাকাডাকি করে বরিয়ে গেল। কারণ ডিউটি তার আটটায়। আজ রেশন না আনলেই নয়। মায়া পড়েছে মহা বিপদে। তা আর এ জ্বালা সয় না। সে যেন মরতে পারলে বাঁচে। ছেলেটা লেখাপড়া শিখলো না, মেয়েটা একটু কিছু দেখলেই হ্যাংলার মত করতে থাকে—আর কত সয় মানুষের শরীরে। সহ্য ধৈর্য্য তিতিক্ষা—তার বিবাহিত জীবনের এই কটা বছরে ঐ তিনটার বার বার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। আর নয়। এক হিসাবে সে মা জানকীর চাইতেও চরম দুর্ভাগিনী। মা জানকীর ছেলেরা অচ্ছাব ছিল না, স্বামী ছিল না অক্ষম। সত্তর আশী টাকায় কি একটা সংসার চলে! রাজার মেয়ে রাজ কুলবধূর আর যত দুঃখই থাক, রেশনের ভাবনা ভাবতে হয় নি কোনও দিন। সীতা জনম দুঃখিনী নয়, জনম দুঃখিনী বিংশ শতকের এই ছাব্বিশ বছরের বৌ মায়া।

এ বাড়ীতে অনেক ঘর ভাড়াটে। আর গত্যন্তর না দেখে মায়া অনুকে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে চলল পাশের ঘরের দিকে।

'মাসীমা কি করছেন?'

'এখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। বাতের ব্যথাটা খুবই বেড়েছে।'

'আমি বললাম একটু মাসকালাইর ডাল গরম করে সেক দিতে, তা আপনি গ্রাহ্য করলেন না।'

'সময় মত কে করে দেয় বলত? আমি কি এখন আর নিজে নিজে পারি ওসব জোগাড়-যন্ত্র করে নিতে।'

'কেন আমাকে বললেই হয়।'

'কোন মুখে তোমায় বলি। তুমি তো নিজের সংসার নিয়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। থাকগে, টাকা আটেক গেলেও ঐ কবরেজের তেলটা আনিয়ে নেব।'

মায়ার মুখ শুকিয়ে যায়। সে বলে, 'যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। আমি বলছিলাম অতগুলো টাকা খরচ না করে……'

'দেখ আমার যখন জন নেই, তখন ধনের সাশ্রয় করে লাভ হবে না।'

'তবে আর আমার কিছু বলার নেই।' মায়া অন্য ঘরের দিকে চলে যায়।

ঠিক সাত আনা ধার করলেও তো চলবে না। আরও দু আনা দরকার। অন্তুকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করবে। অন্তু যদি সামান্য একটা কাঠের খেলনাও নিয়ে না-যায়, তবে মুখ দেখাবে কি করে। হয়ত এমনও হতে পারে, ওরা খুকীকে এবং বাদলকেও বাদ দেবে না। পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই খাওয়াবে। সে ক্ষেত্রে যা দিয়ে অন্তুকে পাঠাতে চায় মায়া তাইতো নগণ্য। সাত আনাই জুটছে না, তার ওপর বোঝা বাড়ল আরও দু আনার।

'বিনুদি একটা কথা শুনবেন?'

'এখন বড্ড তাড়াহুড়ো, একটু পরে শুনলে হবে না? উনি আফিস যাবেন, প্রায় নটা বাজে, ঝি আসেনি, মসলাটাই বাটা হয়নি। কেবল হলুদ দিয়ে ঝোল চড়িয়ে দিয়েছি।'

'মসলার কৌটো দিন আমি বেটে দিচ্ছি।'

'না, না, তা কি হয়—আপনারও তো সংসারের কাজ আছে।'

'থাক গে, আমার অত তাড়াতাড়ি নেই, উনি ফিরে এসে খাবেন একটায়।' মায়া কয়েক মিনিটের মধ্যে চন্দনের মত মিহি শুদ্ধ মসলা বেটে দিয়েছে।

ঝোল নেমেছে। বিনুদির স্বামী আহার করে আফিসে বেরিয়ে গেছেন। এইবার অবকাশ পেয়ে মায়া বলে, "বিনুদি ন আনার পয়সা ধার দিতে পারেন?'

'আগে বললেন না কেন? মাস কাবার, যা বাক্সে ছিল তা উনি কুড়িয়ে কাচিয়ে নিয়ে গেছেন। ছিঃ ছিঃ দিদি, বড্ড লজ্জা পেলাম।'

'তা কি হয়েছে। ও জোগাড় হয়ে যাবে'খন।'

মায়ার মুখে হাসি। তার অন্তরে যে কতখানি প্রচ্ছন্ন লজ্জা বর্ত্তমান এবং তা যে বিনুদির চাইতে কত বেশী—তা একমাত্র অন্তর্য্যামী লক্ষ্য করেন।

আরও কয়েক ঘর ঘুরে পয়সা জোগাড় হয় না। অবশেষে নির্ম্মলদের তোলা ঝি মাতংগিনীর স্মরণাপন্ন হয় মায়া। 'মাতু, ন আনার পয়সা ধার দিতে পার? দশ-টাকার নোট ভাঙিয়ে বিকেল নাগাদ শোধ করে দেব।'

'তা আজ না পার কাল দিও, এই নাও একটা টাকা, খুচরা নেই দিদিমণি।'

মায়া খানিক এদিক-ওদিকে নজর চালিয়ে কাকে যেন বৃথাই খোঁজে। তারপর এক আনার মুড়ি কিনে আনে। 'অন্তু আমি না আসা পর্য্যন্ত খুকীকে নিয়ে কোথাও যেও না, এখানে বসে মুড়ি খাও। ঘর যেন খালি থাকে না, আমি এলাম বলে।'

ছেঁড়া স্যাণ্ডাল জোড়া কোনও রকমে পায়ে ঢুকিয়ে মায়া দ্রুত রেশনের দোকানের দিকে বেড়িয়ে যায়। আর মনে মনে সহস্র অভিসম্পাত দেয় পুত্রকে।

মাথার ওপর রোদ উঠেছে। পরনে ময়লা শাড়ী। এখনও যদি নচ্ছারটা আসত। কোন্ পরিচিত লোকের সংগে আবার দেখা হয়ে যায় কে জানে। শুধু রেশন আনলেই চলবে না। পুতুল কিম্বা খেলনা একটাও এই সংগেই আনতে হবে। দুপুরের পরই হয়ত নিমন্ত্রণ। আর তো সময় হবে না মায়ার। বাদলটার যত দোষই থাক না কেন, ও কেনা-কাটায় ওস্তাদ। মায়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে চলে। দু' আনার জিনিষও দেখে শুনে কিনতে না পারলে একেবারে ভাঙা ফুটো যা তা হতে পারে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মায়া রেশন ও একটা খেলনা

নিয়ে বাড়ী ফেরে। থলে দুটো এবং খেলনাটা কোন রকমে বারান্দায় রেখে একটু বিশ্রাম করতে বসে।

কিন্তু বসার কি উপায় আছে! ঘরে একটা অভাবনীয় কাণ্ড হচ্ছে। অন্নুটা কাঁদছে, খুকীটা চেঁচাচ্ছে তাকে জড়িয়ে ধরে। ওদের পাশেই একটা দামী পুতুল পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে মেজেতে।

একখানা কাপড় দিয়ে খুকীর হাত দুখানা শক্ত করে বেঁধেছে বাদল। 'বল এ পুতুল তুই কোথায় পেলি? চোর মেয়ে, না বলে কয়ে চুপিচুপি নিয়ে আসা হয়েছে—না? টের পেলে ওরা কি বলবে বলত মা?"

মাকে দেখে অন্নু যত অপরাধই করুক না কেন করুণ আর্ত্তনাদ জুড়ে দেয়।

ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট মায়া আর থাকতে পারে না সে বেতটা নিয়ে নির্ব্বিচারে বাদলকে মারতে থাকে। বাদল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুখ বুজে মার খেয়ে যায় সে বুঝতেই পারে না যে মা তার এত ক্ষেপল কেন? অন্নু অন্যায় করেছে—বড় ভাই হয়ে তাকে শাসন করায় কি দোষ হয়েছে?

ব্যথায় জড়ো-জড়ো হয়ে আসে বাদলের অংগ প্রত্যংগ তাকে একটা গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখে মায়া। বাদল আজ একটি কথাও বলে না।

এবার অন্নুর পালা। তার চুলের মুঠি ধরে মায় বসে, 'পুতুলটা তুলে নে—তোল শীগগির।'

ভয়ে ভয়ে অন্নু মায়ের আদেশ পালন করে।

'এখন আয় আমার সংগে।'

ওরা মা-মেয়েতে এগিয়ে যায়। খুকী কাঁদতে কাঁদতে ওদের অনুসরণ করে। ধুলো বালিতে একশা হয়ে যায় খুকীর ফ্রক।

'সবিতার মা!'

'কি গো মায়াদি?' সবিতার মার সংগে সবিতার বাবাও এসে একটু দূরে দাঁড়ায়। যে যে ছেলে মেয়ে এঘরে এসে ঘুর-ঘুর করছে, সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একটা জিনিষের ওপর—সেটা হচ্ছে অন্নুর হাতের পুতুল অন্নু আর চোখ দুটো তুলতে পারে না।

'বল অন্নু, যে, না বলে নিয়েছি, দোষ হয়েছে, আর কক্ষণো এমন করব না।' পুতুলটা ফিরিয়ে দে সবিতাকে!"

মায়ার মাথায় একটু ঘোমটা, মুখে শিক্ষয়িত্রীর দৃঢ়তা। কিন্তু চোখ দুটি যেন ঈষৎ মেদুর।

অন্নু আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে মায়ের আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যায়।

'ওকি মায়াদি, একটা পুতুলের জন্য ওকে কেন এমন সাজা দিচ্ছ? না অন্নু, তুই নিয়ে যা ওটা। আমার কথা শোন, নিয়ে যা মা।'

সবিতা বলে, "ওটা তো গতবারের পুতুল, এখন ওটা নিয়ে আমি আর খেলি নে। বারান্দায় পড়েছিল। তুই নিয়েছিস, নিয়ে যা অন্নু।"

মায়ার দিকে না তাকিয়ে সবিতার বাবাও অনেক অনুরোধ করে।

'আজ নয় সবিতার মা। এত ভালবেসেই যদি দাও, কাল দিও—এখন অন্নুরও পুতুল নেওয়া উচিত হবে না।'

ফেরার পথে খুকীকে কোলে তুলে নিয়ে আসে মায়া।

বেলা প্রায় একটা। অন্নুর বাবা বাড়ী ঢোকে ক্লান্ত পদে। সিঁড়িতে পা দিয়েই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এখনও ভাত হয় নি? আমাকে যে এক্ষুণি আবার বের হ'তে হবে। এই দুপুর রোদে যেতে হবে মাল খরিদ করতে।'

মায়া কোন জবাব দেয় না। বারান্দার এক অংশেই রান্না চড়ান তোলা উনানে। সে উনানটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। এতক্ষণে সম্পূর্ণ রান্না শেষ না হলেও, ভাতটা অন্তত নামতে পারত। সবিতাদের ওখান থেকে মায়া ফিরে এসে অন্নুকে আবার বেঁধেছে সামান্য কিছু মারধরও করেছে। 'তোরা দুটো আমার কাল হয়েছিস, যতক্ষণে আমি না চিতায় উঠি, ততক্ষণ তোরা সুস্থ হবি নে।'

ওরা ভাই-বোনে কিচ্ছু বলে নি।

অন্নুর বাবা ঘরে ঢুকেই একটা কিছু অনুমান করে নিল। স্মরণ হল সকাল বেলার কথা। সত্য মিথ্যা প্রমাণের কোনও অপেক্ষা না ক'রে সে বেত আনতে ছুটল। ওরা ভ্রাতা ভগ্নীতে কাঁপতে লাগল বলির পাঠার মত

এবার মায়া আর মুখ না খুলে পারল না। 'দেখ ওদের গায় তুমি যদি হাত তোল, তবে কুরুক্ষেত্তর হয়ে যাবে। আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। যেমন লোক তার ছেলে-মেয়েও তেমনি হয়। বাঁশের ঝাড় থেকে বট জন্মায় না কক্ষণো। তুমি নিজে কি কর একবার মনে মনে ভেবে দেখ দেখি।'

কিন্তু সে কথাতো পরম বিশ্বাসী মায়া ছাড়া কেউ জানে না। সে তো করে নিতান্ত দায় ঠেকে, একান্ত চলে না বলে। অক্ষম স্বামীর ওপর মায়ার এতদিন যে সহানুভূতি ছিল, তাকি হঠাৎ উবে গেল? নইলে সে কি ক'রে চাইল এমন চরম লজ্জার কথা প্রকাশ করতে।

মাঝে মাঝে দু'-একটা গন্ধ তেল কি সাবান না ব'লে নিয়ে আসে অনুর বাবা। বাড়া পর্য্যন্তও আনে না, রাস্তায় বেচে আসে। ঐ পয়সা দিয়ে সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজটাই হয়।

ক্ষুধার্ত্ত অনুর বাবা খানিক বোকার মত চেয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। শত ইচ্ছা থাকলেও মায়া উঠতে পারে না, পারে না হাত ধরে রুগ্ন স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে। একবার যে শর সে নিক্ষেপ করেছে, কি আশ্চর্য্য, তা ঘুরিয়ে আনার লজ্জাটাই যেন বড় হয়ে দাঁড়ায়।

অনুর বাবা আবার যখন বাড়ী ফেরে, তখন রাত দশটা। ঘরখানা নীরব। ছেলে-মেয়েগুলো ঘুমে। কেবল মায়া সজাগ। শুয়ে শুয়ে দুধ দিচ্ছে খুকীকে।

'তুমি এখনও খাওনি মায়া? এ তোমার ভারী অন্যায়!'

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ঘটি গামছা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আর তুমি যে খাও নি?'

'আমি তোমার মত রাগ করার মানুষ কিনা যে একটুতেই অভিমান করব! আমার শরীরে আর যা-ই সহ্য হক, উপোস সয় না। আমি পেট ভরে খাবার খেয়েছি।' মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে মায়ার স্বামী বলে, 'একটা মজা হয়েছে, সেই জন্যই তো এত দেরী। ওরা কি নেমতন্ন করেছিল—সবিতারা? ছেলে মেয়েরা গিয়েছিল?'

মায়া বলে, 'হ্যাঁ—খেয়ে দেয়ে এসে শুয়ে পড়েছে।'

'ওদের বলতেই হবে। অনুর জন্মদিনের খরচা নাও, এই টাকা পাঁচটা। অবশ্য চার টাকা এখন দিচ্ছি, একটা টাকা ভেঙেছি কিনা, মাইনে পেলে তোমায় পুরিয়ে দেব। মেয়েটা নিত্য কান্নাকাটি করে। গত বছর আশা দিয়েও কিছু করা গেল না।'

'এ টাকা তুমি কোথায় পেলে? আবার……'

'না মায়া না, তা নয়। তুমি যা ভাল বাস না, তা আর কক্ষণো করব না। উপোস করে মরলেও না।'

'তবে তোমায় কে দিলে?'

'মাল পত্তর কেনা-কাটায় কে যেন হিসেবের গোল-মালে বেশী দিয়ে দিয়েছে। একখানা পাঁচ টাকার নোটই বাড়তি।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তাইতো দেরী হল। এতক্ষণ ধরে হিসেব মেলাল বড় বাবু।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।'

টাকা চারটা আঁচলে বাঁধে মায়া। 'তবু একবার বড়বাজার গিয়ে মহাজনদের গদিতে জিজ্ঞাসা কর।'

'তা করব। এখন ভাত বাড় দেখি। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।'

যত অবাঞ্ছিত ঘটনাই ঘটুক না কেন, সময় দাঁড়ায় না। দিনের পর সপ্তাহ গড়িয়ে চলে। তারপর মাস। মানুষের মর্ম্মবেদনায় প্রলেপ পরে। বাদল চুরি করে সুবিধা পেলেই সংসারের দু'চার আনা এদিক-ওদিক করে, খুকী কাঁদে, অনু করে আবদার এবং বায়না। তার কি জন্মদিন হবে না? মায়া আশ্বাস দেয় আর লক্ষীর কৌটাটার দিকে তাকায়। কিন্তু মায়ার স্বামী মাইনে পেয়ে থাকলেও কিছুতেই পূর্ণ ক'রে দিতে পারে না ঐ একটি টাকা। মায়াও আর তাগাদা করে না। বড়বাজার থেকে স্বামীকে যে কথাটি জেনে আসতে বলেছিল মায়া, তা-ও সময়ের তরংগে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

সময় সময় বাদল অনুকে ক্ষেপায়, 'কোথায় টাকা যে তোর জন্মদিন হবে?'

'শুনছ মা, দাদা কি বলে ?'

'বলুক—আমি বলছি হবে, তোর ভাবনা কি ?'

'টাকা কোথায় ? হলেই হল তোর মত শুটকির জন্মদিন !'

বার বার বাদলের বক্রোক্তিতে অঞ্জুর মনেও একদিন সন্দেহ জাগে। সে শক্ত করে মাকে ধরে : 'মা টাকা কোথায়, তুমি মিথ্যা বলছ।'

'নারে না, মিথ্যা নয় মা। সেদিনের খরচের টাক আমি দূর করে সরিয়ে রেখেছি।'

'আমায় দেখাও না। গুণে দেখব ক'টাকা।'

মায়া চোখ রাঙায়, 'না।'

অঞ্জু মার পা জড়িয়ে ধরে।

মায়া পা ছাড়িয়ে চলে যায়। 'অতটুকু মেয়ের টাকায় কাজ কি, জন্মদিন হলেই তো হল।'

'মা, না মা, আমি একটি বার শুধু গুণে দেখব। ওমা দেখাও না !'

তখন অবশ্য মায়া দেখায় না। সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কারুকে বিশ্বাস করতে রাজী নয়। এমন যে অঞ্জু সে-ও তার কাছে সন্দেহের পাত্রী হয়ে ওঠে।

দিন কেটে যায় একটি একটি করে। বহু দূরের স্বপ্ন-মাখা জন্মদিন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসে অঞ্জুর ছোট্ট বুকখানির কাছে। অঞ্জু এবার তার আঙুলের কর গোণে কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনী বাঁকিয়ে।

'মা আর মাত্তর সাত দিন বাকী। সত্যি নয় !'

মায়া সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকায়। 'হ্যাঁ তাই হবে হয়ত।'

অঞ্জু এবার প্রবল ভাবে বায়না ধরে।

স্নেহের এক অতি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মায়া অঞ্জুকে টাকা চারটি না দেখিয়ে পারে না। অঞ্জু করতালি দিয়ে নাচতে থাকে

'কারুকে বল না কিন্তু।'

মায়া মেয়েকে বারবার সাবধান করে দেয়। 'অত হৈ হৈ কর না।'

কিন্তু অঞ্জুও আনন্দের এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বাদলকে চুপি চুপি ঘরে ডেকে নিয়ে আসে, জিজ্ঞাসা করে, 'বলতে পারিস দাদা ও কৌটাটায় কি ?'

বাদল মুখ গম্ভীর করে বলে, 'একটা ছুঁচো।'

'হুঁ—আমার জন্মদিনের টাকা।'

'তাই নাকি ?' বাদল একবার কৌটাটা খুলে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে রাখে। 'দেখিস ও টাকা দিয়ে বাবা রেশন আনবে—জন্মদিন না হাতী হবে।'

'তুই বললেই হল। মা কারুকে না জানিয়ে জমিয়ে রেখেছে। তুই আবার চুরি করিস নে দাদা !'

'দূর বোকা মেয়ে, আমি বুঝি তোকে ভালবাসি নে ! মা বাবার পয়সা না নিলে আমারই বা হাত খরচ চলে কি করে ? আমি কি চাকরী করি ?'

অবশেষে জন্মদিনের সুপ্রভাত এসে পড়ে। অঞ্জু রাত থাকতেই ঘুম থেকে ওঠে। লক্ষ্মীর আসনের কাছে সে একটা শব্দ শুনতে পায়। সে মাকে ঠেলা দেয়। 'মা চোর-চোর !'

মায়া ধড়মড় করে উঠে দেশলাই জ্বালায়।

'তুমি ওখানে কি করছ ?'

'লক্ষ্মির কৌটাটা খুঁজছি।'

'কোন দিন তো লক্ষ্মির কৌটা ওখানে রাখ না।'

অঞ্জুর বাবা জবাব দেয়, 'এক দিন ভুল করেও তো রাখতে পারি। যাক, লক্ষ্মির কৌটা আমার পকেটেই রয়েছে। আজ আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে। একটা টাকার জন্ম বোধহয় এ সপ্তাহের রেশনটা মাটি হল। যা চেয়েছিলাম, দিলে পারতে। এক টাকার জন্ম তার জন্মদিন ঠেকে থাকত না।'

'যদি নিতে হয় সবই নিয়ে যাও। আমার মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। যা জোর-জবরদস্তি করে নেওয়া যায়, তা গোপনে নিয়ে দুর্নাম করার যে কি হেতু থাকতে পারে বুঝি নে।'

'তোমাকে বোঝান যাবে না মায়া, আমাদের মত দিন-খাটা মজুরের দুঃখ স্বয়ং বিধাতাও বুঝতে নারাজ।'

কেমন যেন একটু করুণ হাসি হেসে অঞ্জুর বাবা বেরিয়ে যায়।

জন্মদিনের আকাশে একটা ম্লান রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে।

স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই মায়া শয্যা ত্যাগ করে। স্বামীর ব্যবহারে মনের যে অংশটা একটু ক্ষত হয়েছিল, তার জ্বালা মন্দীভূত হতে খানিকটা সময় গত হয়।

অনু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আজ না সাতাশে—আমার জন্ম দিন?'

'হ্যাঁ অনু, আজ তোমার জন্মদিন। বেলাদির কাছে তোমার একটা ফ্রক তৈরী করতে দিয়েছি। তুমি চেয়ে নিয়ে এস। দাদা কোথায়, তাকে ফুল আনতে বল।'

নতুন নয়, একটা পুরান কাপড়ের জামা তৈরী করে বাসন্তী রঙে ছোপানো হয়েছে। দেখতে বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে। অনু একেবারে গায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে এল। ইতিমধ্যে মায়ার বিছানা-পত্তর তোলা হয়েছে। 'তোর দাদা কোথায়?'

'দাদাকে তো দেখছি নে?'

মায়ার প্রাণটা ছ্যাঁক করে ওঠে। সে বাসি কাপড় ছেড়ে লক্ষ্মীর কৌটায় হাত দেয়—দিয়েই মাটিতে বসে পড়ে। কৌটাটা খালি।

'অনু দেখ তো মা হারামজাদটা কোথায়?'

অনু আর্ত্তনাদ করে দাদাকে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভিতরে, বাইরে চতুর্দ্দিকে খোঁজে।

বাদলের খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেকেই তাকে দেখেছে, কিন্তু এখন যে কোথায় আছে, কেউ বলতে পারে না। অনু ঘরে ফিরে আছাড় খেয়ে পড়ে।

মায়া অনুকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা খুঁজে পায় না। সে বুঝতেই পারে না, টাকা ক'টা সত্যই বাদল নিয়েছে, না চুরি করল অন্য কেউ।

মায়া অত্যন্ত তিক্ত মনে খুকীকে কোলে নিয়ে অন্য এক ঘরে গিয়ে বসে থাকে। আজ আর তার সংসারী কাজে কোন স্পৃহাই যেন নেই।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে অনুর জন্য মনটা মায়ার পুড়ে ওঠে। ও তো এখনও কিছু খায় নি, হয়ত পড়ে পড়ে কাঁদছে।

মায়া দরজার কাছে এসে বাদলের গলা শোনে। 'দেখি মুখ তোল। আর চোখের জল ফেলে না বোকা মেয়ে।'

মায়া আর একটু এগিয়ে আসে।

বাদল এমন অপরূপ করেও ফুল চন্দন কাজলে অনুকে সাজিয়েছে। আর টাকা চারটা দিয়ে মিষ্টান্ন রান্নার মত সমস্ত সামগ্রীই এনেছে, বলছে, 'আমি না থাকলে তোর জন্মদিনের টাকা দিয়ে নিশ্চয় বাবা রেশন তুলত।'

মায়ার সর্ব্ব শরীর থর থর করে কাঁপ্‌তে থাকে।

★

ছায়া

সন্তোষকুমার অধিকারী

যতদূর চলে যাই জীবনের দিগন্ত পেরিয়ে
তবুও পারি না যেতে; সে আসে নীরবে পিছু পিছু
সে থাকে চরণে মাথা দিয়ে।

জীবনে অজস্র ভুল। জানা আর অজানার ভীড়ে
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে যেজনে রেখেছি শুধু ঘিরে,
সেও যাবে; শুধু একা—রিক্ততায় বিশ্ব যায় ভরি।

সর্ব্বস্ব করেছি ত্যাগ তবু তারে সাথে রাখিলাম;
জীবনের বেদনায় অন্ধকারে তাহারে নিলাম,
মৃত্যুর নিঃশব্দ রাতে সে আমার ছায়াসহচরী।

স্বপ্ন আর সাধ…যত হৃদয়ের আশা হয় ভুল;
মোর জীবনের ছায়া চিরদিন কঠিন নির্ম্মূল
সহগামী অচ্ছেদ্য বন্ধনে;
সর্ব্বশেষ অন্ধকারে একাকার জীবনে মরণে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়

ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। এই সাহিত্যের জন্মকাল হইতে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, আনুমানিক খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্য জন্মলাভ করিবার পর হইতে এক হাজার বৎসর যাবৎ যে ভাবে এই ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি হয়, তাহা যথেষ্ট গৌরবজনক। এই উন্নতি কালক্রমে কাউয়েল (E. B. Cowell) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইতো গেল বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের কথা। তাহার পর খৃঃ ১৯শ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মোটের উপর দেড়শত বৎসরে এই সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রাক্ আধুনিক যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল কাব্য-প্রধান এবং ইহাতে গদ্য কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করিত। তখন ইহা ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্মানুগ অথবা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্বলিত সাহিত্য। আবার, বাঙ্গালীর ঘরকন্নার ছবিও এই যুগের সাহিত্যে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হওয়াতে ইহা ছিল অনেক পরিমাণে বাস্তব-নিষ্ঠ (realistic)। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ম হইলে ইহার দ্রুত রূপ পরিবর্ত্তন করে। তখন স্বল্পকালের মধ্যে এই সাহিত্যে বহুমুখী উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার পূর্ব্বে এক হাজার বৎসরেও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। এই যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য পদ্য, গদ্য ও নাটক এই ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়া ধর্ম্মানুগ বিষয় ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়-বস্তুতে সমৃদ্ধি লাভ করে। খৃঃ ১৯শ শতাব্দী যুগপ্রবর্ত্তক হিসাবে একদিকে শ্রীরামপুরের ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারীগণ ও দেশীয় পণ্ডিতবর্গ এবং অপর দিকে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে নবজীবন দান করেন। অপর বহু কবি এবং সাহিত্যিকও এই কাজে সহায়তা করেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে কতিপয় যুগে বিভক্ত করিলে দেখা যায়, প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ও রামমোহন রায়ের যুগ এবং তাহার পর ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। শেষোক্ত যুগের পর রবীন্দ্রনাথের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে পরিমাণ উন্নতি ঘটে, রবীন্দ্রনাথের আগমনে উহা আরও অধিক দূর অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে এই পর্য্যন্ত সর্ব্বশেষ যুগ-প্রবর্ত্তক কবি ও সাহিত্যিক। তাঁহার পর এখন রবীন্দ্রোত্তর যুগ চলিতেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তৎসঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার কিছু পরিচয় দানই বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত সংখ্যা অল্প নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গুণগ্রাহী সমালোচকগণের সংখ্যাও অনেক। তবে অধিকাংশ লেখকের দৃষ্টি বিশ্ব-কবির কবিতা ও কাব্যগুলির উপরই অধিক নিবদ্ধ। ইহা ছাড়া তথ্য অপেক্ষা রবীন্দ্র-কাব্যসমূহের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অথবা কবির মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় লেখকগণের আগ্রহও সমধিক। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর স্বল্পকাল ব্যবধানে সেই ব্যক্তির কার্য্যাবলীর দোষগুণ আলোচনা করা রীতি ও রুচি বিরুদ্ধ, কারণ এই সময়ে স্বাভাবিক কারণেই নিরপেক্ষ বিচারের সম্ভাবনা অল্প হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এতদিন রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনার প্রকৃত সময় না আসিলেও সম্ভবতঃ এখন আসিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীও অল্প মূল্যবান নহে, কারণ ইহাতে কবি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব না থাকিলেও নূতন তথ্যের কোন ইঙ্গিত বা আভাষ থাকিতে পারে। আশা করি শেষোক্ত পক্ষ হইতে কবি ও তাঁহার কাব্য রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা জোড়াসাঁকোর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৬১ সালের ৬ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ

করেন। কবির সুবিদিত বংশের বিশেষ পরিচয় দান এখানে অনাবশ্যক। বিশেষতঃ তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দানই আমাদের উদ্দেশ্য, বংশপরিচয় নহে। তবুও কবির রচনাগুলি বুঝিতে ইহা কিছুটা সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া সংক্ষেপে নিম্নে কবির "জীবন-স্মৃতি" অবলম্বনে তাঁহার বংশ-পরিচয় দেওয়া গেল।

বংশ-লতা

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬) —দিগম্বরী দেবী

- কন্যা (অল্প বয়সে মৃত)
- দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) —সারদা দেবী
  - কন্যা (অল্পবয়সে মৃত)
  - দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) —সর্বসুন্দরী দেবী
  - সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) —জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
  - হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-৮৪) —নীপময়ী দেবী
  - বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) —প্রফুল্লময়ী দেবী
  - সৌদামিনী (১৮৪৭-১৯২০) —সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
  - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) কাদম্বরী দেবী নিঃসন্তান।
  - সুকুমারী (১৮৫০-৬৪?) —হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
  - পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১-৫৭?)
  - শরৎকুমারী (১৮৫৪-১৯২০) —যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
  - স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬-১৯৩২) —জানকীনাথ ঘোষাল
  - বর্ণকুমারী (১৮৫৮) —সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
  - সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২)
  - রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) —মৃণালিনী দেবী
  - বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-৬৪)
- নরেন্দ্রনাথ (তিন বৎসর বয়সে মৃত)
- গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪) —যোগমায়া দেবী
- ভূপেন্দ্রনাথ (১৮২৬-৩৯)
- নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯-৫৮) —ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী নিঃসন্তান।

* **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৬১—১৯৪১) —মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩—১৯০২)

- মাধুরীলতা (১৮৮৬—১৯১৮
- রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮) —প্রতিমা দেবী
  - গৃহীতা কন্যা নন্দিনী (১৯২২)
- রেণুকা (১৮৯০—১৯০৩) —সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— নিঃসন্তান।
- মীরা (অতসী) (১৮৯২) —নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
  - নীতীন্দ্র নাথ (১৯১২—৩২)
  - নন্দিতা (১৯১৬) —কৃষ্ণ কৃপালনী
- শমীন্দ্র (১৮৯৪—১৯০৭)

কবিগুরুর জন্ম—৬ই মে (বাং ১২৬৮, ২৫শে বৈশাখ), ১৮৬১ সন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর জন্ম বলিয়া ইংরাজী মতে ৭ই। মেও বলা যাইতে পারে। স্থান :—কলিকাতা।

তিরোধান—৭ই আগষ্ট (বাং ১৩৪৮, ২২শে শ্রাবণ, রাখি-পূর্ণিমা) ১৯৪১ সন। স্থান :—কলিকাতা।

বয়সের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী কতিপয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

প্রথম যুগ—(ক) কবির নবীন বয়সের রচনা। ১৬ বৎসর। কবির ১১ বৎসর বয়স হইতে ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত। (১৮৭২ খৃঃ—১৮৮৭ খৃঃ)।

দ্বিতীয় বা মধ্যযুগ—(খ) কবির প্রবীণ (যুবা) বয়সের রচনা। প্রথম ভাগ—১২ বৎসর (১৮৮৮ খৃঃ—১৮৯৯ খৃঃ)।

(গ) কবির প্রবীণ (যুবা) বয়সের রচনা। দ্বিতীয়-ভাগ—১২ বৎসর। (১৯০০ খৃঃ—১৯১১ খৃঃ)।

(ঘ) কবির প্রবীণ (প্রৌঢ়) বয়সের রচনা। তৃতীয় ভাগ—২০ বৎসর। (১৯১২ খৃঃ—১৯৩১ খৃঃ)।

শেষ যুগ—(ঙ) কবির প্রবীণ (বৃদ্ধ) বয়সের রচনা। চতুর্থ ভাগ—১০ বৎসর। (১৯৩২ খৃঃ—১৯৪১ খৃঃ)।

উপরের বর্ণিত বিভাগানুসারে কবির রচনাবলী নিম্নে বিবৃত করা গেল।

(ক) কবির নবীন বয়সের রচনা। প্রথম যুগ। (১৮৭২ খৃঃ—১৮৮৭ খৃঃ)।

নাম রচনার অথবা প্রকাশের কাল।

১। "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" (কাব্য)—১৮৭২ সাল। কবির ১১ বৎসরের রচনা।

২। "অভিলাষ" (কবিতা)—১৮৭৪ সাল। (নভেম্বর—ডিসেম্বর)। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে কবি-রচিত এই কবিতা, উক্ত সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে (অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা।

৩। "হিন্দু মেলার উপহার" (কবিতা)—১৮৭৪ সাল।

৪। "ফুলবালা" (গাথা)—১৮৭৪ সাল।

৫। "শৈশব-সঙ্গীত" (কৈশোর সঙ্গীত কতিপয় গাথার সমষ্টি)—১৮৭৬ সালের পূর্ব্বে রচিত।

৬। "ভুবনমোহিনী-প্রতিভা"। (সমালোচনা প্রবন্ধ)—১৮৭৬ সাল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "ভুবনমোহিনী-প্রতিভা" (কাব্যগ্রন্থ), "দুঃখ-সঙ্গিনী" ও "অবসর-সরোজিনী"—এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে "জ্ঞানাঙ্কুরে" কবির সমালোচনা বাহির হয়। কাগজটির সম্পূর্ণ নাম 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব"।

৭। "বনফুল" (কাব্যোপন্যাস) ও "প্রলাপ" (রচনা)—১৮৭৬ সাল। এই দুইটি "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

৮। "করুণা" (উপন্যাস)—১৮৭৭ সাল।

৯। "কবি-কাহিনী" (দীর্ঘ কবিতা)—১৮৭৮ সাল। ১৮৭৭ সালে "ভারতী" নামে মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং কবি মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে এই কাগজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন কবির অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "কবি-কাহিনী" প্রথমে "ভারতী"তে বাহির হয় এবং ১৮৭৮ সালে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "কবি-কাহিনী" রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ""বন-ফুল", "কবি-কাহিনী"র আগে রচিত হইলেও ইহার পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। "ভারতী"তে প্রথম বৎসরেই কবি-রচিত "আগমনী", "ভারতী-বন্দনা", "হরহৃদে কালিকা" প্রভৃতি কতিপয় কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১০। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"—১৮৭৭ সাল। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রচিত হয়। পদগুলি ১৮৭৭ সালে 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কবির পরবর্ত্তী কালের কিছু রচনাও ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এই যুগে বিভিন্ন সময়ে লিখিত এবং আংশিক প্রকাশিত "ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" (রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনা, "নবজীবন" কাগজে প্রকাশিত, শ্রাবণ, ১২৯১, ১৮৮৪ সাল) উল্লেখযোগ্য। "ভানুসিংহ" রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম।

১১। "ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্র" (দেশ-ভ্রমণ সম্বন্ধে রচনা)—১৮৭৯—৮০ সাল। কবি তদীয় অন্যতম

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৭৮ সালে ইংলণ্ডে প্রথম গমন করেন। এই সময়ে তিনি প্রথমে Brighton Schoolএ এবং পরে London University Collegeএ ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়ন করেন। এই সময় মধ্যে 'ভারতী' কাগজে (১৮৭৯ খৃঃ—১৮৮০ খৃঃ) তাঁহার প্রিয় পাশ্চাত্য কবি চতুষ্টয় (Goethe, Dante, Petrarch ও Tasso) সম্বন্ধে কতকগুলি মনোরম প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। এই মাসিক পত্রিকাতেই তিনি ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইয়োরোপ প্রবাস সম্বন্ধে যে রচনাগুলি পাঠাইয়াছিলেন তাহাই পরবর্ত্তীকালে "ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্র" নামে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১২। "বাল্মীকি-প্রতিভা", "রুদ্র-চণ্ড" ও "ভগ্নহৃদয়" (গীতিনাট্য)—১৮৮০—৮১ খৃঃ।

ইয়োরোপে প্রথম প্রবাসকালে কবি তিনখানি সঙ্গীতময় গীতিনাট্য রচনা করেন। এইগুলির নাম যথাক্রমে "বাল্মীকি-প্রতিভা" (১৮৮০)—"রুদ্র-চণ্ড" (১৮৮১) ও "ভগ্ন-হৃদয়" (১৮৮১)।

১৩। "সন্ধ্যা-সঙ্গীত"। কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। —১৮৮২ সাল। ইংরেজ কবি Shelleyর কোন কোন কবিতা রচনার সহিত এইগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে।

১৪। "প্রভাত-সঙ্গীত" (কবিতা-গুচ্ছ)—১৮৮৩ সাল। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য কবি Victor Hugoর রচিত কতিপয় কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদও আছে। ইহা ছাড়া ইংরেজ কবি Shelleyর একটি কবিতার বৃহদংশের অনুবাদও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। প্রভাত-সঙ্গীতের অন্তর্গত "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" ইংরেজ কবি Tennyson রচিত The "Brook" কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৫। "প্রকৃতির পরিশোধ" (ক্ষুদ্র নাটক বা নাট্য-কবিতা)—১৮৮৩ সাল।

১৬। "বৌঠাকুরাণীর হাট" (উপন্যাস)—১৮৮৪ সাল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পিতা ১৮৮৪ সালে তাঁহাকে আইন পড়িবার জন্য পুনরায় বিলাত পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কবির তখন বিলাত যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াই তিনি কলিকাতায় ফিরিতে বাধ্য হন। এই বৎসরই তাঁহার রচিত ও "ভারতী"তে ১৮৮১ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস "বৌঠাকুরাণীর হাট" পুস্তকাকারে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই ১৮৮৪ সালেই রবীন্দ্রনাথের এক দীর্ঘ গদ্য প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থায় "ভারতী"র প্রথম খণ্ডে বাহির হয়।

১৭। "ছবি ও গান" (কবিতা-সমষ্টি)—১৮৮৪ সাল।

১৮। "নলিনী" (গদ্য গল্প)—১৮৮৪ সাল।

১৯। "কাল-মৃগয়া" (গীতি-নাট্য)—১৮৮৫ সাল। এই বৎসর (২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম জন্মলাভ করে। কবি এই সময় স্বদেশের উন্নতির জন্য নানা কাজে যোগ দিতে ব্যগ্র হন এবং তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী খোলেন।

২০। "বিবিধ গদ্য-রচনা ও কবিতাবলী" (মাসিক পত্রে প্রকাশিত)—১৮৮৫—৮৬ সাল।

তৎকালীন নব-প্রতিষ্ঠিত "বালক" পত্রিকায় কবি-রচিত অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে এই মাসিক কাগজখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এক বৎসর পরে কাগজখানি "ভারতী" নামে মাসিক পত্রের সহিত মিশিয়া যায়। এই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "নবজীবন" নামে সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বাহির হইত। একই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচার" নামে মাসিকপত্রেও কবি-রচিত অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর সমর্থনে রচিত কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

২১। "বিবিধ প্রবন্ধ", "আলোচনা", "সমালোচনা" ও "চিঠি পত্র" (বিবিধ সমালোচনা) প্রভৃতি।

১৮৮৩—১৮৮৭ খৃঃ।

রবীন্দ্রনাথের চারিখণ্ডে প্রকাশিত সাহিত্যিক সমালোচনা ও রচনা এবং বিবিধ প্রবন্ধ তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এইগুলির নাম "বিবিধ-প্রবন্ধ", "আলোচনা", "সমালোচনা"

ও "চিঠি-পত্র"। ইহাদের প্রকাশের কাল ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

২২। "কড়ি ও কোমল" (কবিতা-সমষ্টি) প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খৃঃ।

২৩। "রাজর্ষি" (উপন্যাস)—১৮৮৭ খৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ মাত্র ১১ বৎসর বয়সে বঙ্গবাণীর সেবা আরম্ভ করিয়া তাঁহার ২৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উল্লিখিত রচনাগুলি প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগ। কবি-প্রতিভার উন্মেষের লক্ষণ এই যুগেই প্রকাশ পায়।

কবির প্রবীণ বয়সের রচনা। প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় বা মধ্যযুগ। যৌবনকাল।
(১৮৮৮ খৃঃ—১৮৯৯ খৃঃ)

নাম — রচনার অথবা প্রকাশের কাল।

১। "মায়ার খেলা" (নাটক)—১৮৮৮ সাল।

২। "নলিনী" (নাটক)—১৮৮৮ সাল। "নলিনী" নামে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত গদ্য গল্পের নাট্যরূপ।

৩। "রাজা ও রাণী" (নাটক)—১৮৮৯ সাল। ইহার একটি ক্ষুদ্রাকার ইংরেজী সংস্করণ ১৯১৭ সালে বাহির হয়। এই বাঙ্গালা নাটকখানি পরবর্ত্তী কালে কবি কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া "তপতী নামে প্রকাশিত হয়।

৪। "মানসী" (কবিতাবলী)—১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। ইহার অন্তর্গত "সিন্ধু তরঙ্গ" কবিতার বর্ণনাত্মক ভাবার মধ্যে ইংরেজ কবি Byron রচিত "Don Juan"এর ছাপ স্পষ্ট রহিয়াছে।

৫। "ইয়োরোপ যাত্রীর ডায়েরী"—১৮৯১—৯৩ খৃষ্টাব্দে "সাধনা" মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশিত এবং তাহা হইতে পরে গৃহীত।

৬। "ছিন্ন পত্র" (গদ্য রচনা)—১৮৯১ সাল। ১৯১২ সনে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৭। "চিত্রাঙ্গদা" (Lynical Drama বা গীতি-নাটক)।—১৮৯১ সাল। ইহার ইংরেজী অনুবাদ "চিত্রা" ("Chitra") নামে পরিচিত।

৮। কতকগুলি ছোট গল্প—১৮৯১—৯৩ খৃঃ। "সাধনা" মাসিক পত্রে এই সময়ে কতকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়, যথা, "ঘাটের কথা", "শুভা", "নষ্ট-নীড়", "ধোপার পাট" ইত্যাদি। "ধোপার পাট" গল্পটির সহিত ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন সংগৃহীত "মৈমনসিংহ-গীতিকা"র অন্তর্গত "ধোপার পাট"—গল্পের সাদৃশ্য রহিয়াছে এই গল্পগুলি পরে "ছোটগল্প", "বিচিত্র গল্প", "গল্প চারিটি", "গল্প-দশক" ও "গল্প-গুচ্ছ" নামে চারিখণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত ১৯১৫ সনে "গল্প-শতক" যুক্ত হয়।

৯। "সোনারতরী" (কতকগুলি কবিতার সমষ্টি)—১৮৯৩ সাল।

১০। "বিদায় অভিশাপ" (একাঙ্ক নাটক) ৮৯৪ সাল। "বিদায় অভিশাপ" নামক কবিতাটি পৌরাণিক কচ ও দেবযানীর গল্পের কথোপকথনচ্ছলে নাট্যরূপ।

১১। "চৈতালী" (কবিতাগুচ্ছ)—১৮৯৬ সাল।

১২। "চিত্রা" (কবিতাগুচ্ছ)—১৮৯৬ সাল। ইহার অন্তর্গত"উর্ব্বশী"কবিতার সহিত ইংরেজ কবি Swinburne রচিত "Atalanta in Calydon" কবিতার মধ্যে একটি "Chorus" এর অন্তর্গত "Aphrodite" (Venus) কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইংরেজ কবির রচনা রবীন্দ্র-নাথের রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী।

১৩। "গান্ধারীর আবেদন", "নরকবাস" ও "কর্ণকুন্তি-সংবাদ" (নাটকত্রয়)—১৮৯৭ সাল। এই নাটকগুলিকে "নাটক" আখ্যা না দিয়া "কথোপকথনের নাট্যরূপ" বা "Dramatic Dialogue" বলিলেই যেন ঠিক হয়।

১৪। "বৈকুণ্ঠের খাতা","চিরকুমার সভা" ও "সতী" (নাটকত্রয়)—১৮৯৭ সাল। এই হাস্যরসাত্মক ও মিলনান্ত নাটকত্রয় একই বৎসরে (১৮৯৭) রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে "সতী" নাটকখানি এই নামের একটি মারাঠী গীতিকার বাঙ্গালায় নাট্যসংস্করণ।

১৫। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" (নাটক)—১৮৯৭ সাল।

ইহা দুই অঙ্কে সমাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র নাটক। "পঞ্চাঙ্ক" নাটকের স্থলে কম অঙ্কে নাটকের পরিসমাপ্তির

পাশ্চাত্য আদর্শ রবীন্দ্রনাথই সম্ভবতঃ বঙ্গভাষায় প্রথম প্রচলন করেন।

১৬। "মালিনী" (নাটক)—প্রকাশের কাল ১৮৯৭ সাল। ইহা একটি রসমধুর ক্ষুদ্র নাটিকা। এই নাটিকাটির রচনার প্রকৃতকাল বোধ হয় ১৮৯৫ সাল।

১৭। "পঞ্চভূতের ডায়েরী"—প্রকাশের কাল ১৮৯৭ সাল। এই গ্রন্থখানিতে প্রাচ্য তথা ভারতীয় জীবনাদর্শের সুন্দর সমালোচনা আছে।

১৮। "কণিকা" (কবিতাগুচ্ছ)—১৮৯৯ সাল। গ্রন্থখানি "উদ্ভট" শ্রেণীর ও কৌতুকোদ্দিপক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি।

১৯। "কণিকা" (কবিতা-সমষ্টি) ১৮৯৯ সাল (?)।

২০। "কল্পনা" (কবিতাগুচ্ছ) ১৮৯৯ সাল (?)।

"সাধনা", "ভারতী" এবং "বঙ্গদর্শন" কাগজে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা "কল্পনা" নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ইংরেজী ১৮৯৮ সালে (বাং ১৩০৫, ৩০শে চৈত্র) এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে একদিন ভয়ানক ঝড় হয়। এই বিশেষ দিনে এবং বিশেষ উপলক্ষে কবির "কল্পনার" অন্তর্গত "বর্ষশেষ" কবিতাটি রচিত হয়। ইংরেজ কবি Shelleyর রচিত "Ode to West Wind" কবিতাটির সহিত "বর্ষশেষ" কবিতার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

কবির প্রবীণ বয়সের রচনা। দ্বিতীয় ভাগ।
দ্বিতীয় বা মধ্যযুগ। যৌবনকাল।
(১৯০০ খৃঃ—১৯১১ খৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের ৩৯ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রচনাবলী কবির প্রবীণ বয়সের দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশ করেন।

নাম রচনার অথবা প্রকাশের কাল।

১। "কথা ও কাহিনী" (কবিতা-গ্রন্থ) ১৯০০ সাল।

২। "নৈবেদ্য" (কবিতা গ্রন্থ)। ১৯০১ সাল। 'গীতাঞ্জলী'র ভাবধারার পূর্ব্বাভাস ইহাতে আছে।

৩। "স্মরণ" (কবিতাগুচ্ছ) ১৯০২ সাল। কবির পত্নী মৃণালিনী দেবীর ১৯০২ সালে মৃত্যুর পর রচিত।

৪। শিশু' (কতিপয় কবিতার সমষ্টি) ১৯০৪ সাল। ১৯০৩ সালে কবির দ্বিতীয়া কন্যার মৃত্যুর পর রচিত।

৫। "শব্দ-তত্ত্ব" প্রথমে ১৮৯২ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রে এবং বিশেষভাবে "সাধনা" ও "ভারতী" পত্রে ইহা প্রকাশিত হয়। অনেক পরে, ১৯০৬ সালে, ইহা সংশোধিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৬। "কবিতা-সংগ্রহ" (১৩ খণ্ডে, মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত) ১৯০৩—১৯০৪ সাল। ১৯০৪ সালে কবির "উৎসর্গ-পত্র" সহ ইহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। এই উৎসর্গ পত্রের নামানুসারে সমগ্র গ্রন্থখণ্ডগুলির নাম হয় "উৎসর্গ"।

৭। "চোখের বালি" (উপন্যাস) ১৯০৩ সাল।

৮। "নৌকাডুবি" (উপন্যাস) ১৯০৪ সাল।

৯। "খেয়া" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯০৪ সাল। এই কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চাশটি কবিতা কবি নিজেই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯২১ সনে প্রকাশ করেন। 'খেয়ার' অন্তর্গত কবিতাবলীর মধ্যে সাধু কবীরের প্রভাব দেখা যায়। ইহার মধ্যে কবির মনস্তত্ত্বের দিকটি পরবর্ত্তী কালে "গীতাঞ্জলীর" ভিতরে আরও স্ফুটতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। ১৯০২ সাল হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত কবির পরিবারে কয়েকজনের মৃত্যুর ফলে তাঁহার পারিবারিক জীবন অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—১৯০২ সালে কবির স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। ১৯০৩ সালে কবির এক কন্যার মৃত্যু হয় এবং ১৯০৫ সালে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন। এই অল্প কয়েক বৎসরের রচনাগুলির স্থানে স্থানে কবির দারুণ মনোবেদনার ভাব আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৫ সালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে বাঙ্গালা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং ইহার ফলে সারা ভারতব্যাপি তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। "বঙ্গ-ভঙ্গ" আন্দোলন ও

"স্বদেশী" আন্দোলনে ইহা রূপ-পরিগ্রহ করে। কবির মনও স্বাভাবিক ভাবে এই আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং স্বদেশ-প্রেমিক কবির তৎসময়ের রচনাগুলি প্রভাবিত হয়।

১০ "স্বদেশী-সমাজ" (প্রবন্ধ)—"বঙ্গ-দর্শন", ১৯০৬ সাল।

১১। "শারদোৎসব" (নাটক) —১৯০৮ সাল। অনেকটা যাত্রাগানের অনুকরণে গদ্য ও গীতি (Lyrical verse) মিশ্রিত নাটক।

১২। "শান্তি-নিকেতন"। বক্তৃতামালা।—১৭ খণ্ডে প্রথম প্রকাশ—১৯০৯—১৬ খৃঃ। এই বক্তৃতামালাতে উপনিষদের প্রভাব রহিয়াছে।

১৩। "প্রায়শ্চিত্ত" (নাটক) —প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ সাল। কবি-রচিত "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে উপন্যাসের নাট্যরূপ। ইহার পরিবর্তিত নাট্যরূপ "পরিত্রাণ"(১৯২৯)।

১৪। "রাজা" (নাটক)—১৯১০ সাল। ইহার ইংরেজী অনুবাদ "King of the Dark Chamber" নামে পরিচিত। এই নাটকখানিতে "elements of mystery" বা সঙ্কেত ও রহস্যের উপাদান নিহিত আছে।

১৫। "অচলায়তন" (সঙ্কেতধর্ম্মী গদ্য নাটক)—১৯১০ সাল (?)।

১৬। "গোরা" (সামাজিক উপন্যাস)—দুই খণ্ডে মুদ্রিত, ১৯১০ সাল।

কবির প্রবীণ বয়সের রচনা। তৃতীয় ভাগ।
দ্বিতীয় বা মধ্যযুগ। প্রৌঢ়কাল।
(১৯১২—১৯৩১ খৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের ৫১ বৎসর বয়স হইতে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রচনা এই অংশের অন্তর্গত। কবিগুরুর এই কালের রচনা অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ও ভাবসমৃদ্ধ।

নাম রচনার অথবা প্রকাশের কাল।

১। "ডাকঘর" (নাটক)—১৯১২ সাল। সঙ্কেত-ধর্ম্মী নাটক। এই নাটকের সহিত Maeterlinck-এর "Blue Bird" নামে সঙ্কেতধর্ম্মী (Symbolic) নাটক তুলনীয়।

২। "জীবন-স্মৃতি" (আত্মকথা)—১৯১২ সাল। ইহার ইংরেজী অনুবাদ "My Reminiscences" (Pub. 1917 A.D.) নামক গ্রন্থ।

৩। "ছিন্নপত্র" (গদ্যরচনাবলী)—১৯১২ সাল।

৪। "গীতাঞ্জলী" (আধ্যাত্মিক কবিতা সমষ্টি)—১৯১২-১৩ সাল।

"গীতাঞ্জলী"তে বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকভাব সাদৃশ্য রহিয়াছে—শুধু ইহাতে "রাধা কৃষ্ণ" অথবা এইরূপ অন্য কোন সাকার দেবতার নামোল্লেখ নাই। ইহার ইংরেজী অনুবাদ স্বয়ং কবি-কৃত এবং ইহার প্রকাশক Macmillan & Co., লণ্ডন। শুধু বৈষ্ণব কবিতা বা পদাবলী কেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধু কবীরের রচনাগুলির সহিতও ভাবের দিকে ইহাদের বেশ নৈকট্য রহিয়াছে। ইয়োরোপের জেক্ (Czech) কবিগণের মধ্যে Wo ker, Brezina এবং Victor Dyk নামে কবিত্রয়ের রচনাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলীর" ভাবের দিকে যথেষ্ট মিল আছে। Brezina ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জার্ম্মান দার্শনিক Schopenhaur-এর পরম ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর Czech ভাষায় অধিকাংশ অনুবাদ J. Srajder & Co. মুদ্রিত করেন। ১৯১২ সালে "গীতাঞ্জলী" রচনা শেষ করিয়া এই বৎসরই কবি ইহার একখানি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার ফলে তৎ পরবৎসর (১৯১৩ খৃঃ) রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। "নৈবেদ্য", "খেয়া" ও বাঙ্গালা "গীতাঞ্জলী" হইতে নির্ব্বাচিত কতিপয় কবিতার অনুবাদই ইংরেজী "গীতাঞ্জলী" নামে পরিচিত।

"গীতাঞ্জলী"র ইংরেজী অনুবাদের পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে স্বরচিত একটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতার "Modern Review" কাগজে প্রকাশ করেন। ইহার পর লোকেন পালিত মহাশয়ও রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ উল্লিখিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদের দিকে তখন "Modean Review" পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি

তাঁহার কাগজের জন্ত রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার আরও কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে কবির কতকগুলি কবিতার নিজকৃত ইংরেজী অনুবাদ এই মাসিক কাগজে বাহির হয়। Sir William Rothenstein ১৯১০ সালে এই ইংরেজী অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হন। Sir Williamএর "Menand Memoirs" গ্রন্থপাঠে এই সংবাদ ভিন্ন আরও জানা যায় যে তিনি অজিত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেন। ১৯১২ সালের মে মাসে কবি ইয়োরোপ মহাদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে একবার তিনি লণ্ডন নগরে পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন Sir William রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম দেখা করিতে এবং কবিকে সুস্থ হইয়া তাঁহার 'গীতাঞ্জলী' কবিতা-গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ কবিতা এবং অপর কোন কোন কবিতা-গ্রন্থ হইতে কতিপয় নির্ব্বাচিত কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে উৎসাহিত করেন। ইংরেজ কবি W. B. Yeats এই ইংরেজী "গীতাঞ্জলী"র সংশোধন করিয়া দেন এবং এই অনূদিত গ্রন্থের জন্ত একটি 'মুখবন্ধ' বা 'ভূমিকা' (Preface) লিখিয়া দেন। ১৯১২ সালে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে ইহার সীবাবদ্ধ প্রচার প্রথমে "India Society" নামক সমিতির সভ্যগণের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। অবশেষে ১৯১৩ সালে ইহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে "গীতাঞ্জলী"র অন্তর্গত ছয়টি নির্ব্বাচিত কবিতা "Chicago Poetry" নামে কাগজের সম্পাদিকা Miss Monroe তাঁহার কাগজে ১৯১২ সালে মুদ্রিত করেন। কবির সহিত Miss Monroeর Chicagoতে (U. S. A.) সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছিল।

৫। "গীতিমাল্য" (সরল আধ্যাত্মিক গীতিকবিতাসমূহ) —১৯১৪ সাল।

৬। 'গীতালি' (কবিরচিত ১০৮টি গানের সংগ্রহ-গ্রন্থ —১৯১৪ সাল।

প্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক এই ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে "সবুজ-পত্র" কাগজের প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই কবি ইহাতে লেখা দেন।

৭। 'ফাল্গুনী' (বসন্ত-নাট্য)—১৯১৫ সাল।

৮। "গল্প-শতক"—১৯১৫ সাল।

এই গল্পগুলির মধ্যে "স্ত্রীর পত্র" গল্পটির বিষয়বস্তু একটি বালিকার কেরোসিন তৈল সাহায্যে আগুন ধরাইয়া আত্মহত্যা। ইহা পণপ্রথার শোচনীয় পরিণামে স্নেহলতা নামে একটি বালিকার আত্মহত্যা বিষয়ক সত্য-ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি গোবিন্দদাসও এই বিষয়ে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া দেশব্যাপি আন্দোলনকে ভাষায় রূপদান করিয়াছিলেন।

৯। "চতুরঙ্গ" (চারিটি গল্প)—১৯১৫ (?) সাল। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত "কাকা", শচীশ", "দামিনী" ও "শ্রীবিলাস" নামে চারিটি ছোটগল্প।

১০। "ঘরে বাইরে" (দেশাত্মবোধক উপন্যাস)—১৯১৬ সাল। ১৯০৮ সালে বাঙ্গালায় রাজনৈতিক গোলো-যোগের পটভূমিকায় রচিত।

১১। 'বলাকা' (কবিতাগুচ্ছ)—১৯১৪—১৬ খৃঃ মধ্যে রচিত ও ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "গীতাঞ্জলী"র সহিত গ্রন্থখানি তুলনীয়। উপনিষদ্ ও পাশ্চাত্য দার্শনিক Bergsonএর "গতিবাদ" কবিতাগুলিতে সমর্থিত হইয়াছে।

১২। "গান"—১৯১৬ সাল। "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা"র গানগুলি এবং বিভিন্ন সময়ে রচিত নানাজাতীয় গান ও কবিতা একত্র গ্রথিত করিয়া "গান" নামে পুনর্মুদ্রিত।

১৩। "বিসর্জ্জন" (নাটক)—১৯১৭ সাল। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ।

১৪। "পলাতকা" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯১৮ সাল।

১৫। "জাপান-যাত্রী"—১৯১৯ সাল। কবি ১৯১৬ সালে জাপান গমন করেন। কবির সেখানকার ইংরেজী বক্তৃতাসমূহ ১৯১৭ সালে "Nationalism" নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

১৬। "লিপিকা" গদ্য রচনা, (Sketches)—১৯১৯ সালে রচিত ও ১৯২২ সালে মুদ্রিত। এই লেখার মধ্যে "সবুজ পত্র" কাগজের প্রভাব রহিয়াছে। ১৯১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল অমৃতসরের কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক এইরূপ গুরুতর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ স্বরূপ কবিগুরু "Knight" উপাধি পরিত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরে এই দেশের দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একটি মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" আন্দোলন (Passive Resistance movement) আরম্ভ ও অপরটি "শান্তিনিকেতনে" "বিশ্বভারতী"র প্রতিষ্ঠা। উভয়েরই কাল ১৯২১ সাল।

১৭। "শিশু ভোলানাথ" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯২১ সাল।

১৮। "মুক্ত ধারা" (কাব্য-নাট্য)—১৯২১ সালে প্রকাশিত।

১৯। "বসন্তোৎসব" (নাটক) — ১৯২২ সাল। 'ফাল্গুনী' নাটক পুনর্লিখিত।

২০। "শারদোৎসব" (নাটক পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত)—১৯২২ সাল।

২১। "বর্ষামঙ্গল" (কবিতাগুচ্ছ ?)—১৯২২ সাল।

২২। "পূরবী" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯২২-২৩ সাল। বিভিন্ন সময়ে রচিত। ইহার মধ্যে "ভগ্ন-মন্দির" কবিতাটি পূর্ব্বেও অন্যত্র অন্যভাবে রচিত হইয়াছিল। এই কবিতা গ্রন্থে কবির ইয়োরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও বর্ণিত আছে।

২৩। "শোধ-বোধ" (নাটক)—১৯২৫ সাল। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রচিত।

২৪। "শেষ-বর্ষণ" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯২৫ সাল।

২৫। "লেখন" (কবিতাবলী)—১৯২৬ সাল।

২৬। "নটরাজ" (নাটক)—১৯২৭ সাল।

২৭। "নবীন ও সুন্দর" (নাটক)—১৯২৭ সাল।

২৮। "রক্তকরবী" (সঙ্কেত নাট্য, Symbolic Drama)—১৯২৮ সাল।

২৯। "গৃহ-প্রবেশ" (বিষাদাত্মক নাটক)—ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-প্রকাশিত গল্প "শেষ-রাত্রি" নাটকাকারে পুনরায় মুদ্রিত হয়।

৩০। "নটীর-পূজা" (চতুরঙ্ক নাটক)—১৯২৫ সাল।

৩১। "জোনাকী" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯২৭ সাল।

৩২। "শেষের কবিতা" (উপন্যাস)—১৯২৮ সাল।

৩৩। "মহুয়া" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯২৮ সাল। কবি-রচিত ও নির্ব্বাচিত কতিপয় প্রেমের কবিতা। ইহাতে কিছু নূতন কবিতাও সংযুক্ত হইয়াছে।

৩৪। "তপতী" (নাটক)—১৯২৯ সাল। "রাজা ও রাণী" নাটকের সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার।

৩৫। "পরিত্রাণ" (নাটক)—১৯২৯ সাল। কবি-রচিত "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে উপন্যাসের প্রথম নাট্যরূপ "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯০৯)। পরবর্ত্তী কালে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের নাম পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া নাম হয় "পরিত্রাণ" (১৯২৯)।

৩৬। "যোগাযোগ" (উপন্যাস)—১৯২৭ সালে রচিত ও ১৯২৯ সালে প্রকাশিত।

৩৭। "সহজপাঠ" (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—কতিপয় ভাগ)—১৯৩০ সাল। কতিপয় খণ্ডে প্রকাশিত।

৩৮। "রাশিয়ার চিঠি"—১৯৩০ সাল। ১৯৩০ সালে কবির ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও ডেনমার্ক হইয়া রাশিয়ায় ভ্রমণের বৃত্তান্ত। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) গমন করেন। "রাশিয়ার চিঠি"র ইংরেজী অনুবাদ—১৯৩১ সাল।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ৬ই মে, ১৯৩১ সাল, রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসরে পদার্পণ করেন। এই বয়সে কবির যশ সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। ইতি-মধ্যে কবি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতা দেন। ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া গেল।

দেশ	ভ্রমণের কাল।
১। যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.)	—১৯১২—১৩ সাল।
২। ইংলণ্ড	—১৯১১ সাল।
৩। যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) ও ইয়োরোপ	—১৯২০ সাল।

৪। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) ১৯১৬—১৭ সাল। জাপান হইতে কবির যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা। যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজী ভাষায় যে বক্তৃতাসমূহ দেন তাহা "Pesonality" নামে ১৯১৭ সালে মুদ্রিত হয়।

৫। ইয়োরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.)—১৯২০—২১ সাল।

৬। ইয়োরোপের ইটালি ও কতিপয় দেশ ভ্রমণ—মে মাস, ১৯২৬ সাল।

৭। মালয়, জাভা, বলি ও শ্যামদেশ—১৯২৭ সাল।

৮। পুনরায় মালয়, চীনদেশ, জাপান, কানাডা ও ইন্দোচীন ভ্রমণ—১৯২৯ সাল।

৯। পুনরায় ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ডেনমার্ক, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) গমন—১৯৩০ সাল।

নানাদেশে ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি বক্তৃতা দান করেন। তন্মধ্যে Czecho-Slovakiaর প্রসিদ্ধ Charles Universityর আহ্বানক্রমে "Creative Unity" নাম দিয়া ভারতীয় বাউলদের সম্বন্ধে কতিপয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা অন্যতম। Rev. C. F. Andrewsকে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলি "Rabinranath Tagore Letters from Abroad" (Madras, 1924) নামে পরিচিত।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "Hebbert Lecturers" দিবার জন্য আহুত হন। "The Religion of Man" এই বক্তৃতার বিষয় ছিল। উহা ১৯৩১ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজের অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতামালা "Man" নামে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত কবির জাপানে অবস্থিতি কালে বক্তৃতাসমূহ "Nationalism" নামে এবং যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে বক্তৃতাসমূহ "Personality" নামে (উভয় বক্তৃতাবলীই) ১৯১৭ সালে মুদ্রিত হয়। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-রচিত কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তুসম্পন্ন খোলা চিঠি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নাম "East and West" এবং ইহার প্রকাশের কাল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩২-৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত "কমলা বক্তৃতামালা" ("লেকচার্স") নামে বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি এবং তথায় ১৯৩৩—৩৫ সালে বাঙ্গালা সাহিত্যের "বিশেষ অধ্যাপক" হিসাবে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় তাঁহার "শিক্ষার বিকিরণ" বক্তৃতাটি এদেশবাসীর প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

[আগামী বারে সমাপ্য]

★

অবসন্ন প্রহরের গান

পরিমলকুমার ঘোষ

দুঃসহ ব্যথার ভারে একেবারে নুয়ে পড়ি যেন
কোন কোন অবসন্ন নগর সন্ধ্যায় :
শব্দ, ধোঁয়া, ভিড়
আর নিবিড়, নিবিড়
ক্লান্তি—ক্লান্তি সারা দেহমন ছায়।
জানিনা যে কেন।
পৃথিবীর রঙ্ জানি মোছেনি
(ক্লাবে রেস্তোরাঁয়
আর সিনেমার পর্দায় পর্দায়
হাজার বাতির আলো ঘোচেনি)
কি জানি মুছেছে কেন ছবি সব
আমারই মনের পটে।

জঙ্গিষ্ণু এ-জীবনের কামনার যত কলরব
স্তব্ধ। ওরা এই সব বিষন্ন মুহূর্ত্তে যেন বোবা হয়ে যায়
ফেটে যাওয়া বুদ্বুদের মতো শূন্যতায়
শুধু মনে চাওয়া থাকে অকল্পিত কিছু যেন ঘটে।

হিসাবের ছকটাকে পার হয়ে যদি ঘটে যায়
কোনদিন কোনকিছু তারই তো আশায়
ধূসর জীবনটার-এ গুণ টেনে টেনে
এ-পৌনপুনিক পথ চলা,
একদিন হাওয়া যদি লাগে এসে গালে,
কোন এক সোনালি সকালে
যদি কেউ নিয়ে আসে কানে কানে বলা
দু-একটি কথা, তবে জীবন নতুন হবে জেনে॥

বান্ধবী

সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জীবনটা চলছিল মন্দাক্রান্তা তালে। পড়, শোন, খাও দাও আর সারাদিন দাও জবাবদিহি। তাই বেড়াতে যাবার প্রয়োজনটা ত্যাগ করা কঠিন হয়ে উঠল। দাদাকে মিনতি করে বললাম, আপনি বুঝিয়ে বললেই ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যদি বলি ও আর কি যেতে দেবে ?

দাদা উদাস হয়ে বললেন, স্ফুর্তি করতে যাবে তুমি ? আর গাল খেয়ে মরব আমি ?

যে গাড়িতে আমরা দলবেঁধে ভ্রমনে বের হলাম, তা মিটারগেজের গাড়ি। কোলকাতার সুবার্বন ট্রেনগুলির সগোত্রীয়।

চললাম বন্ধুর-অনুর্বর লাল কাঁকরে ভরা মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে। এখানে-সেখানে কুব্জ-পৃষ্ঠ উটের দল পরম আনন্দে খাচ্ছেবাবলা আর কি সব কাঁটা গাছ।

অনেকটা পথ চলার পর শ্যামলিমার ছোঁয়াচ লাগল গায়ে। দলবদ্ধ মৃগযূথের নির্ভয় বিচরণ আর ময়ূরের কেকারব মনকে দিল উদাস করে।

বসেছিলাম গাড়ির এক কোণে। ভাবছিলাম যদি থাকত না পিছু টান, এমনি করে বেড়াতে পারতাম নির্ভয়ে—তবে বেশ হোত। গাঁয়ের বুক চিরে চলেছে গাড়ি। পল্লীবধূরা চিরাভ্যস্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখছে গাড়ির দিকে চেয়ে। সে দৃষ্টিতে কবির ভাষার উচ্ছল ছল-ছল, কলসী কাকল বাঙালী বধূর চাউনি নেই, সে মুখে আছে মরুর রুক্ষ সৌন্দর্য্য, নেই লাবণ্য।

এমনি যখন তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছি, সু এসে হেসে নাড়া দিয়ে বলল, এমনি মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে এসেছ বুঝি ? পাগল নাকি ? দুচার দিনের তো ব্যাপার।

হাতটা টেনে ওকে পাশে বসিয়ে বললাম, যাঃ, কি যে বলিস ! তুই তো সব জানিস। না বলে পালিয়ে এসেছি কিনা ?

দাদাই তো সব বুঝিয়ে বলবেন—বলল সু।

—ও কারুর কথা শুনবে না। ভয় হয়, রাগ করে অভিমানে না খেয়েই হয়তো দিন কাটিয়ে দেবে। যা জেদী মেয়ে।

—তুমি গেছ।

—সে আর বলতে। "I am in the grip of her life force"—দাদা আর আমার জন্যে বোধ হয় প্রাণ দিতে পারে। দাদাকে যা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

এমনি করে কথায় কথায় সময় কাটছে—বাইরে তাকিয়ে দেখি পল্লী ছাড়িয়ে, সংরক্ষিত বনভূমির ভিতর দিয়ে গাড়ি চলছে। এসে পৌছলাম নির্জ্জন, শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন পাওয়াগড় পাহাড়ের পাদদেশে।

ছোট্ট ষ্টেশন। বাহুল্যবর্জ্জিত। অপ্রয়োজনীয় দর্শকের ভীড় নেই। আমরাই নামলাম—উঠল না কেউ। ষ্টেশনের বাইরে পাহাড়ের গায়ে বিরাট ধরমশালা। মেলায় খুব লোক সমাগম হয় বলেই এই বিরাটত্ব, নইলে অসীম শূন্যতা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে সে সারাটি বছর।

উঠে যখন শুনলাম, এখানে না আছে শোবার, না আছে খাবার আয়োজন, সবাই তখন মুসড়ে পড়ল। এই সুযোগে সু আর সমীরকে বললাম, চলনা, রাতের গাড়িতেই ফিরে যাই, রসদ ফুরোতে না ফুরোতে।

সু সস্নেহ তিরস্কারে বলল, অমন জানলে বাপু আনতাম না তোমায়। অসিও শুনে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে না পেরে বলে উঠল, আসলে কেন ? লক্ষ্মীর আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকলেই তো পারতে।

আমাকে আর জবাব দিতে হল না, স্থ শ্লেষের হাসি হেসে বলল, তোমায় দেখলে দুঃখ হয়। গ্রেপস্ আর সাওয়ার। জলে পুড়ে মরবে কিন্তু আঙুর আর খেতে হবে না।

আমি খেতে চাইনে। তুমি আর তোমার বন্ধু পেট-ভরে খেও, তা'হলেই হবে।

কলহ ঘনায়িত হয়ে এল। স্থ বেশ উষ্ণ হয়ে বলল, চাওনা তা নয়। পাও না বলেই। ঐ রূপ আর মন নিয়ে 'ভূবণ্ডীর' মাঠের পেত্নীটাকেও পাবে না। যত সব নোংরা মন।

সমীর কামরার এক পাশে বসে আপন মনে গুণ গুণ করে গান গাইছিল। উঠে এসে বলল, কী হল রে বাপু? এমন মাটির মানুষ স্থ, তাকেও চটালে? ঝগড়ায় একেবারে বাক্‌বাদিনী।

'বার্ডস্ অফ দি সেম্ ফেদার' বলল অসিত।

তাতো বটেই। লক্ষ্মী হোটেলে মারাঠী চপ্পল দিয়ে তোমার ফেদার ঝেড়ে দিয়েছিল—মনে নেই?

প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হতে চলেছিল, কিন্তু বেশীদূর এগুল না। আর সবাই ইতি করিয়ে দিল।

অসিত মুখ গোমড়া করে রইল সারাদিন আর রাতে এসে জানাল, সে রাতের গাড়িতেই ফিরে যাবে, কাম্বে যাবে না।

ঝগড়া না হলে আমিও অসিতের সঙ্গেই একমত হতাম, কিন্তু ভোটের জোরে কাম্বেতেই যেতে হল।

এমন পেছুটান নিয়ে কেউ বাইরে বেরুতে পারে?

কথা ছিল দু'তিন দিনেই ফিরে আসবো, হল কিন্তু পাঁচ—সাতদিন।

যত দিন যেতে লাগল, অসহিষ্ণু হয়ে উঠল মন, শুধু পিছুটানে নয়—ভয়ে।

দুষ্টু ছেলে যেমন করে অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢোকে, আমিও তেমনি অপরাধীর মত ঘরের ভেতর পা দিয়েছি, একেবারে মুখোমুখি দাদার সঙ্গে দেখা। ভেবেছিলাম হয়তো তিনি অফিসে বেরিয়ে গেছেন। আমার সংশয় আশংকায় পরিণত হল।

দাদাকে এই প্রথম রাগতে দেখলাম। খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, এত দেরী হল যে? না হয় একটা তারই করতিস? কি করে যে সবার দিন কেটেছে। এতগুলি ছেলে, একেবারে না-পাত্তা? কত লোক যে এসেছে খবর নিতে।

জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, আমি কি ইচ্ছে করে···। যা—যা। চুপ কর। যত সব হতচ্ছাড়ার দল।

এটা ছিল দাদার আদরের গাল। বুঝলাম রাগটা পড়েছে। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, ওদের আর দোষ কি বলুন? আপনি না যেতে দিলে ওরাতো আমায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে পারতো না। আপনিও তো—

কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমি কি?·· টাকা দিয়েছি বলে? এমনি হবে জানলে কখনও দিতাম না। জানিস হোটেলের বাজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসে প্যানর প্যানর করে মাথা খেয়েছেন। সবাই মনে করেছে, এত-গুলি বাঁদর এক সঙ্গে গেছে, সবগুলোই বোধ হয় জোয়ারের জলে ভেসে গেছে।

—কচি খোকা সব বুঝি আমরা?

দাদা যেতে যেতে স্মিতহাস্যে বললেন, কচি খোকা না সেয়ানা দেখা যাবে। যে তোমাকে সজুত করবে সে এল বলে।

যেতে যেতে ফিরে বললেন, সময় হয়ে গেছে, কথা কইবার অবসর নেই। এসে সব বলব। আবার ঝগড়া টগড়া করিস নে কিন্তু।

দাদা চলে গেলে স্নান সেরে দরজা জানলা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লাম—ক্লান্তিতে আর অবসাদে।

জীবনে এই প্রথম অচীন, অজানা গন্ধ আমায় বিহ্বল করে দিল। উপাধানে জড়িয়ে আছে লক্ষ্মীর কেশবাস। সারা শয্যায় জড়ান রয়েছে কী একটা মিষ্টি গন্ধ। কী যে অপূর্ব্ব অনুভূতি। উপভোগেও ভয় হয়, পাছে সঞ্চয় ফুরিয়ে যায়, আবেশ যায় টুটে। রেখে ঢেকে কত করে যে পেতে ইচ্ছে হয়। উপাধানে অশ্রুবিন্দু, মুক্তাবিন্দুর মত ঝ'রে মিলিয়ে গেছে, পড়ে আছে দু'একটি চূর্ণ কুন্তল।

ভাবি, যার ছায়া, যার গন্ধ, কল্পনার দোলায় আমায় এমনি করে দোলায় সত্যি করে যদি তাকে পাই। এই চরম চিন্তা আমায় হঠাৎ, পরম নিরাশার তীব্র কশাঘাতে থামিয়ে দেয়। যেন কানে কানে বলে, তুমি কি জান না, বৃথা তোমার এ কামনা।

অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকি আমি। তন্দ্রার আবেশে চোখ দুটি বুজে আসে।

হঠাৎ বাইরের এক ঝলক আলো চোখে পড়ে তন্দ্রা ছুটে গেল। মৃদু পদ-সঞ্চারণে লক্ষ্মী এসে ঘরে ঢুকল। আমার চোখ দু'টো বন্ধ করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলাম। সন্ধানী আলোর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্মী আমায় দেখে। আমার সারা অঙ্গে ঘুরে-ফিরে সঞ্চরণ করে তার দৃষ্টি, নির্ব্বাক উষ্মায়। তার মূক মৌণ শাসন যেন অসহ্য হয়ে ওঠে।

যেমনি এসেছিল তেমনি আবার বেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম; যদিও বুঝলাম শাস্তি আমার তোলাই রইল।

শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। কেন ও একটি কথাও বলল না? ওর এই নির্ব্বাক শাসনের চেয়ে ঐ যে ঘরের কোণে রয়েছে দাদার ছড়িগাছা, ঐ দিয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে নিলেও শাস্তি পেতাম অনেকটা।

এক একটা মেয়ে এমনি করেই গড়ে ওঠে। এক হাতে দেয় স্নেহ, প্রেম আর শান্তি, আর এক হাতে ধরে রাখে শাসনের সুকঠিন বজ্র। লক্ষ্মী তাদেরি জাত।

একটু পরেই আবার পায়ের শব্দ পেয়ে চেয়ে দেখি, বেয়ারার হাতে প্রাতরাশের ট্রে দিয়ে ফিরে এসেছে আবার। টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে রেখে, চা-দানি থেকে পেয়ালায় চা ঢেলে, দুধ আর চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে অপাঙ্গে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

মুখের ভাব হয়েছে শিকার হাতে পাওয়ায় উৎফুল্ল শিকারীর মত। ওর দু'চোখের দৃষ্টি যেন বলছে, এবার যাবে কোথায়?

চা করতে দেখে নগীন বলে উঠল, সাহেব তো এখনও ঘুমোচ্ছে।

ধমকে উঠল লক্ষ্মী, তোকে কে কথা বলতে বলেছে? ঘুমোচ্ছে, ঘুম বার করে দিচ্ছি।

ভাবলাম একবার, বলি, ঐ বেচারাকে নিয়ে কেন? শিকার তো হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। আড়চোখে চেয়ে মুখের যা চেহারা দেখলাম তাতে বলবার মত সাহস আর আমার অবশিষ্ট রইল না।

চা ঢেকে রেখে, খাবার ঠিক করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, যা এবার তুই।

বেচারা কুণ্ঠিত হয়ে বলল, ওগুলো নিতে হবে না?

না খেতেই নিয়ে যাবি নাকি। যা বলছি শোন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কাটিসনে।

অতটুকু ছেলে ওর মাথায় এলোনা, ও ছাড়া আর কে নিয়ে যাবে পেয়ালা-পিরীচ, তাই যাই যাই করেও দাঁড়িয়েছিল। এবার ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে চলে গেল।

যে কথা এতক্ষণ ভয়ে বলতে পারছিলাম না, এবার হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওর সঙ্গে আবার লাগলে কেন?

কথার উত্তর না দিয়ে আমার হাত ধরে উঠিয়ে সটান সাজান খাবার টেবিলে বসিয়ে দিল। খাবার ঢাকনাগুলো খুলে দিয়ে লেগে গেল কাপড়-চোপড় গোছাতে। খেতে খেতে ওর কাণ্ড দেখতে লাগলাম। স্যুটকেসের পকেট থেকে কতগুলো কাগজ বার করে রাখল, সাহস করে বললাম, ওগুলোকে আবার ধোপার বাড়ি পাঠিওনা যেন। এবারও কোন উত্তর না পেয়ে বলতে হল, কথা বন্ধ নাকি?

হঠাৎ যেন বিস্ফোরণ হয়ে গেল। বাজির মত ছিটকে পড়ল লক্ষ্মী, তোমার মত নই। কথা বন্ধ করব। চোরের মত পালিয়ে যাব। বলে গেলে কি বেঁধে রাখতাম? না—বেঁধে রাখতে পারতাম?

আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে গিয়ে দু'হাতের বাজু ধরে বললাম, আর কত বেঁধে রাখতে চাও বল?

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, থাক্ আর দরকার নেই।

কথা বললে আরও ক্ষেপে যাবে মনে করে আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

—আবার শুয়ে পড়লে যে? ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে? কলেজ-টলেজ যেতে হবে না?

—আজকের দিনটি মাপ কর। পাহাড়ে চড়ে আর কাম্বের সমুদ্রে সাঁতরে যা গা ব্যথা হয়েছে।

সামনে এসে বলল, থাক। তোমার গল্প আর শুনতে চাইনে। যখন শুনলাম কাম্বের সাগরে স্নান করতে গেছ, ভাবলাম হয়েছে। এ জীবনে আর দেখা হবে না। আমি তো আমি। কত লোক যে এসে খবর নিয়েছে। যে দুঃখ আমায় দিলে একদিন তার ফল বুঝবে। কিন্তু সেদিন হয়তো দু'জনেই থাকবো নাগালের বাইরে। মরে যাওয়াটাইতো একমাত্র কথা নয়, মরা বাঁচার সন্ধিক্ষণটাই অসহ্য। স্থ যে এমন করবে বুঝতে পারিনি।

স্থ তো তোমায় আমায় দু'জনকেই জানে, কেন সে না বলে তোমায় নিয়ে গেল?

হাত ধরে বললাম, লক্ষ্মীটি, শান্ত হয়ে বোস এবার।

—শান্ত না হয়ে আর উপায় কি বল? তাই যদি না হত দেখতে এই বিছানায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছি।

—আবার বুঝি যা-তা বলতে শুরু করলে? অমন করলে টুপ করে পালিয়ে যাব কিন্তু আর একদিন।

—তা তুমি পার, গম্ভীর মুখ করে বলল।

হঠাৎ বিছানার দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, এই দেখ, ভুল হয়ে গেছে। চাদরটা আর ওয়াড়টা পাল্টাতে হবে যে।

—পরে না হয় দিও। দেবার মত কিছু তো হয়নি।

—ওঠ বলছি, জেদ করে বলল।

—আমি একটা বালিস উঠিয়ে বুকে চেপে ধরে গন্ধ শুঁকে বললাম, তুমি একটা কাঠ।

এবার লক্ষ্মী বুঝতে পেরে হেসে ফেলে বলল, যা। তক্ষুনি আবার কঠোর হয়ে বলল, এ সবে আমার মন ভোলে না। তোমরা কী করে গেলে কাম্বের সাগরে চান করতে—বলতো? যদি ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

—সে কথা আর বলতে? ভেসেই তো গিয়েছিলাম। জাহাজের দড়ি ধরে সবাই বেঁচে যাই। দূর থেকে সমুদ্র দেখে কী উত্তেজনাই যে হয়েছিল! মাইলের পর মাইল—লালে লাল হয়ে আছে—এগিয়ে দেখি সেগুলো রক্তবর্ণ সারসের ঝাঁক। জীবনে এমন দেখি নি। ভাববার আর অবসর পেলাম না—সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। কিছুদূর যেতেই বুঝলাম—সমুদ্র আমাদের মহাসমুদ্রের পানে টানছে। কি করা, চেষ্টা করেও ফেরার সাধ্য হল না। তখন এক নোঙর করা জাহাজের দড়ি ধরে বেঁচে যাই।

লক্ষ্মীর চোখ জলে ভরে এল, বলল, ওকে বলে মরণ সাগর। কত লোককে যে ভাসিয়ে নিয়েছে ভাঁটার টানে তার ইয়ত্তা নেই। উঃ, কি বাঁচাই না বেঁচেছ।

—বাঁচব না? ভাটার টান কি তোমার টানের চেয়ে বেশী?

—তাতো দেখলেই, গর্ব্বে খুসিতে উচ্ছল হয়ে লক্ষ্মী বলল।

—দেখলাম আর কই? এখনও তো কত দূরে রয়েছ।

—দূরে থাকাই ভালো। সামনে এসে, জ্বালা বাড়িয়ে লাভ কি?

আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম, আবার সেই লাভ-লোকসানের কথা। তুমি গিয়ে বসে বসে তার খতিয়ান কর।

লক্ষ্মী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলল, দেখেছ? কথায় কথায় বারোটা বেজে গেছে। মা এতক্ষণ ঘর-বার করছেন। নগীনের কাছে তোমার আসার খবর শুনে এতক্ষণ যে চলে আসেননি কেন, তাই ভাবছি।

ঘরের ভেতর হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পড়ল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, কে? ও নগীন। কি রে?

তোমাকে আর সাহেবকে বাঈ ডাকছেন।

মাকে বলগে যাচ্ছি। সাহেব ওবেলা যাবে। শোন, শোন, যাসনে। ঐ পেয়ালাগুলো নিয়ে যা।

নগীন পেয়ালা-পীরিচ গোছাতে লাগল। খানিকক্ষণ আগে ওর ওপরই ঝাল ঝেড়ে আমায় এলেম দেওয়া হচ্ছিল।

হেসে বললাম, একটু আগে ওর ওপর কী রাগটাই না দেখালে?

লজ্জায় লাল হয়ে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ও বলল, যাও। তোমার জন্যেই তো ও বেচারা বকুনি খেয়ে ম'ল। যাই, আর কথা নয়। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিইগে।

খাবার পাঠিয়ে দেবে, তুমি আসবে না?

আমার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আসবো গো, আসবো। কাল থেকে কিন্তু ঠিক কলেজ যেতে হবে, বলে বেরিয়ে গেল। [ক্রমশঃ

গ্রন্থাগার—প্রাচীন ও নবীন

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রেরণা আসে প্রয়োজনের তাগিদ থেকে। সভ্যজগতে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে এমনি এক প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই। যুগে যুগে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির যে বিচিত্র নতুন অভিজ্ঞতা জন্মলাভ করে, তাকে অবলম্বন করেই দেশের সংস্কৃতি রূপ লাভ করে। এই অভিজ্ঞতার বাণীকে যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছে দেয় গ্রন্থরাজি। তাই গ্রন্থাগারকে একদিক থেকে বলা চলে সংস্কৃতির বাহন।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্যদেশ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। তাই গ্রন্থাগারের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে ফিরে যেতে হয় সেই প্রাচীন যুগেই।

বিস্মৃত সুদূর অতীতে এই প্রাচ্যে শিল্প-কলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দুটি সুউন্নত সভ্যতা পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল—একটি মিশরে, আর অপরটি পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডে, গ্রীকেরা যার নাম দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া।

প্রাচীন মিশরে মন্দিরাদি ধর্মগৃহের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র ছিল মন্দিরগুলি। শস্যাগার, কারখানা, অফিসাদি, আদালত, স্কুল, এমন কি গ্রন্থাগারও থাকতো এই মন্দিরে।

হেরোডোটাস, প্লেটো, ডিওডোরাস, প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে আমরা মিশরীয় মন্দির-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির বিষয় অবগত হই।

থিবসের একটি স্মৃতি-মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি গ্রন্থাগারের উল্লেখ করেছেন ডিওডোরাস। এর প্রবেশদ্বারে লেখা ছিল "আত্মার ঔষধ"। এর প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় রামেশিস সম্ভবতঃ ১২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করতেন। কর্ণাক ও দেন্দারার মন্দিরেও গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছে।

আর্মেনিয়া পর্বতের বরফগলা জলে পুষ্ট তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর পলি দিয়ে গড়া পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড উর্বর মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিমের কিছু পরিমাণ মরুভূমি নিয়ে গঠিত ইরাক। সমগ্র অঞ্চলটিই এখন ইরাক নামে অভিহিত। বহু সহস্র বৎসর পূর্বেকার কথা। এখানকার ব্যাবিলন ও এসিরিয়া রাজ্য তখন শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা, কৃষি-আবাদ সমস্ত দিক থেকেই সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তারপর কত সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন কালের সেই অতীত গৌরবের নিদর্শন অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এসিরিয়ায় আগত পর্যটকেরা বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতো এখানকার বিবিধ আকৃতির মৃত্তিকাস্তূপগুলি। ইরাক বা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার বিখ্যাত সহর মোসুল থেকে বাগদাদ পর্যন্ত তাইগ্রীসের তীরদেশ বরাবর এবং ইউফ্রেতিসের উপত্যকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল এই রহস্যময় মৃত্তিকাস্তূপগুলি। কোন কোন পর্যটক যে এই মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে অতীত গৌরবের অধিষ্ঠান অনুমান করেন নি, এমন নয়। তবে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ বিষয়ে কার্যকরী তদন্তের কোন ব্যবস্থা হয় নি। ফরাসী সরকার প্রত্নতত্ত্ববিদ নিয়োগ করলেন খননকার্যের জন্য। পরবর্তীকালে লেয়ার্ড, ওপার্ট, রলিনসন, স্মিথ প্রমুখ অনেকেই পর্যায়ক্রমে খননকার্য চালিয়ে গেছেন। ফলে সকলের বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সামনে একে একে যে সকল দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তা এক সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস রচনা করে দিয়েছে। আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে অসংখ্য খোদিত মৃত্তিকাফলকও দেখা দিয়েছে। এই প্রাচীন ফলকগুলিতে ধর্ম-বিজ্ঞান, কাব্য-কাহিনী, ব্যাকরণ-আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যযুগের সকল নিদর্শনই উৎকীর্ণ রয়েছে।

সে যুগের প্রত্যেক রাজাই তাঁর রাজত্বকালের সমস্ত কাহিনী উৎকীর্ণ করে রাখতেন মৃত্তিকাফলকে ও প্রাসাদ-গাত্রে। এসিরিয়ার নৃপতিদের উল্লেখ প্রসঙ্গে জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন: "It was not mere whim which impelled the Kings of Assyria to build so assiduously.. Palaces had in those times a destination, which they have no longer in ours. Not only was the Palace indeed the dwelling of royalty, but, as the inscriptions indicate, it was also the "Book", which each sovereign began at his accession to

the throne, and in which he was to record history of his reign."

সুতরাং জ্ঞান বিতরণের দিক থেকে, ইতিহাসের উপাদানের দিক থেকে প্রাচীনকালের প্রাসাদগুলির মূল্য অসীম।

অতি প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়ায় জ্যোতিষের চর্চা ছিল ব্যাপক। অধিকাংশ দেবমন্দিরেই থাকতো পর্যবেক্ষণ-কার্যের জন্য মানমন্দির। পর্যবেক্ষণের ফলাফলের রেকর্ড রাখা হ'ত নিয়মিত ভাবে এবং সেগুলিকে সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল। ফলে মন্দিরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল গ্রন্থাগার।

যতদূর জানা গেছে, মেসোপটেমিয়ার সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন একজন ব্যাবিলনীয়। এঁর নাম আমেল-অনু। এঁকেই বিশ্বের আদি গ্রন্থাগারিক বলা চলে। সম্ভবতঃ খৃষ্টজন্মের ১৬ শতাব্দী পূর্বে ইনি বিরাজ করতেন।

মেসোপটেমিয়ার মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে থেকে যে সকল গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে কৌনজিকের গ্রন্থাগারটিই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই কৌনজিক পরবর্তীকালে নিনেভা নামে অভিহিত হয়েছে। ১৮৪৫ সালে কৌনজিকে খননকার্য পরিচালনাকালে লেয়ার্ড মৃত্তিকাফলক সম্বলিত "রেকর্ড কক্ষ" আবিষ্কার করেন। এই কক্ষে দুর্বোধ্য ও বিচিত্র ভাষায় খোদাই করা বহুসংখ্যক মৃত্তিকাফলক পাওয়া যায়। ফলকগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ১৮৭০ সালে জর্জ স্মিথ ফলকগুলিকে সুসজ্জিত করা ও তার দুর্বোধ্য ভাষা উদ্ধারের চেষ্টায় মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত লেয়ার্ডের আবিষ্কারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় নি।

পাঁচ হাজার বছরের পুরানো ফলকগুলি পোড়ামাটি দিয়ে তৈরী ও সমতল। এর উভয় পার্শ্বে ত্রিকোণাকৃতি অক্ষর উৎকীর্ণ রয়েছে। পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যার মত ফলকগুলি ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত। একই বিষয় সম্বলিত ফলকগুলির মধ্যে পারম্পর্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি ফলকে শিরোনামা দিয়ে। ফলকগুলি বিভিন্ন আকারের। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ফলকগুলি দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি ও প্রস্থে সাড়ে ৬ ইঞ্চি। লেয়ার্ডের বিবরণ থেকে জানা যায়, গ্রন্থাগারটি যে অট্টালিকায় ছিল, তার দু'টি কক্ষে মেঝে থেকে এক ফুট বা তারও বেশী উঁচু পর্যন্ত ফলকগুলি সাজানো ছিল। সংলগ্ন আরও কতকগুলি কক্ষেও এই ফলক রক্ষিত ছিল। এসিরিয়ার ভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান, জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা, পুরাণের কথা, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, কাব্য, এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার মধ্যে আদান-প্রদানের ইতিহাস, বিভিন্ন রাজত্বকালের বিবরণ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ দ্রব্যের তালিকা প্রভৃতি সবকিছুই পাওয়া গেছে উৎকীর্ণ ফলকগাত্রে।

এসিরিয়ার রাজা এসারবানিপলের নামানুসারে এই গ্রন্থাগারের নামকরণ "এসারবানিপলের রাজকীয় গ্রন্থাগার" সার্থক হয়েছে। রাজা স্বয়ং লিখে গেছেন যে, প্রজাসাধারণের শিক্ষার জন্যই তিনি এই গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। কৌণজিক বা নিনেভা যে সভ্যতা বিস্তারের এক বিশাল কেন্দ্র ছিল, তার প্রমাণ এই গ্রন্থাগার।

বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে অবস্থিত সুপ্রাচীন কিশ্ সহরে এক বিরাট গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন অধ্যাপক ল্যাংডন। খননের ফলে গ্রন্থাগারের প্রায় ২০টি কক্ষে প্রাপ্ত ফলকসমূহে প্রধাণতঃ ব্যাকরণ ও অভিধান উৎকীর্ণ দেখা যায়। দুই হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে এই কিশ্ সহরে একটি কলেজ ছিল। গ্রন্থাগারটি সম্ভবতঃ এরই সংলগ্ন ছিল বলে অনুমান করা হয়।

প্রাচীন ব্যাবিলনের অপর একটি সহর সিপ্পারায় (বর্তমান নাম আবু হাব্বা) আর একটি গ্রন্থাগারের সন্ধান মিলেছে মন্দিরের অভ্যন্তরে। ফলে প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বেকার আরও নিদর্শন পাওয়া গেল।

রাজা প্রথম সারগণ কর্তৃক আগাদেতে স্থাপিত গ্রন্থাগারের উল্লেখ না করলে প্রাচীন ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রথম সারগণের রাজত্বকাল সম্পর্কে নানামত প্রচলিত। বিভিন্ন পণ্ডিতের যুক্তি অনুধাবন করলে মনে হয়, ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব উনবিংশ-অষ্টবিংশ শতকে রাজত্ব করতেন।

প্রথম সারগণকে এশিয়ায় গ্রন্থাগারের জনক বলা হয়েছে। সেই প্রাচীন যুগেও যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কতখানি উন্নত হয়েছিল তাঁর গ্রন্থাগারে সে প্রমাণ মেলে। পুস্তক আদান-প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক কালের মত।

গ্রীকদের প্রাচীন গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোন পণ্ডিত অ্যারিস্টটলকে প্রথম পুস্তক সংগ্রাহক বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, অ্যারিস্টটল মিশরের রাজাদের গ্রন্থাগার গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

গ্রীক প্রচেষ্টার কথা বলতে গেলে প্রথমেই এথেন্সবাসী ডিমিট্রিয়াস ফ্যালেরিয়াসের নাম উল্লেখ করতে হয়। যে-কোন কারণেই হোক ডিমিট্রিয়াস এথেন্স থেকে চলে এসে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে

জড়িত হয়ে রয়েছে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগারের নাম। গ্রন্থাগারটির স্থাপনকর্তা অবশ্য টলেমি সটার। ৩৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার যখন মিশরে প্রবেশ করেন, তিনি জেনারেল টলেমির (Ptolemy) হাতেই এর শাসনভার দিয়েছিলেন। মিশর যতদিন গ্রীকেদের অধিকারে ছিল, এই টলেমি নৃপতিরাই পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করে গেছেন। গ্রন্থাগারটি তদারক করতেন ডিমিট্রিয়াস। ইনি নিজে ৫০খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ও বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারকে পুষ্ট করেছিলেন। ভারত, ইথিওপিয়া, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকেও যে-কোন মূল্যে পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল।

শিক্ষার প্রতি টলেমিদের শ্রদ্ধা লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রত্যেক টলেমি নৃপতি জ্ঞানার্জনকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছিলেন, তাই গ্রন্থাগার ছিল তাঁদের প্রিয়তম বস্তু। গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শ্রম ও অর্থব্যয়ে তাঁরা কার্পণ্য করেন নি।

ভারত ও চীনের মধ্যে অতি প্রাচীনকালেই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। প্রাচীন চীনে সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল কি না সঠিক জানা না গেলেও রাজদরবারে, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অভিজাত ব্যক্তিদের গৃহে ও মন্দিরাদিতে যে গ্রন্থশালা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ২২০ খৃষ্টপূর্বাব্দে চীনের এক সম্রাট গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত সম্ভবতঃ এই সময়েই। সিয়াও-উ (১৩০-৮৬ খৃঃ পূঃ) পুঁথি একত্র সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা করেন।

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে চীনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় গ্রন্থাদি চীনাভাষায় অনূদিত হয় ও সেই সকল পুঁথি সুশৃঙ্খলে রক্ষার চেষ্টা হয়। হান বংশের রাজত্বকালে প্রায় ১৪ শত ভারতীয় গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়।

হরপ্পা ও মাহেন-জো-দারোয় আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর মধ্যে শীলমোহরাদিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রচলিত অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগে গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মেলে না।

প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা ছিল বিখ্যাত। চীনা পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র ও নালন্দায় উচ্চশ্রেণীর পুঁথিশালা ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রত্নদধি" নামক গ্রন্থাগারটি বর্তমান যুগের পক্ষেও এক বিস্ময়ের বস্তু। জানা যায় যে, তিনটি বিশাল অট্টালিকায় গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল। অট্টালিকা তিনটির নাম ছিল "রত্নসাগর", "রত্নরঞ্জক" ও "রত্নদধি"। রত্নরঞ্জক অট্টালিকাটি ছিল নয়-তলাবিশিষ্ট। গ্রন্থাগারটি পরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়।

এতদ্ব্যতীত তদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা নামক গ্রন্থশালাদ্বয়ও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে। তদন্তপুরী গ্রন্থশালাটি বিহারের কোন এক সহরে অবস্থিত ছিল। বক্তিয়ার খিলজী এটিকে ভস্মীভূত করেন।

ভারতে গ্রন্থশালা আন্দোলনে জৈনরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে জৈন সন্ন্যাসীদের বাসস্থানের সঙ্গে পুঁথিশালা ছিল।

বিভিন্ন দেশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের কথা মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এখন নবীনদের কথায় আসা যাক।

বৃটিশ মিউজিয়ম : লণ্ডন

বৃটিশ মিউজিয়ম ইংলণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার। সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালে (১৪৮৫-১৫০৯ খৃষ্টাব্দ) থেকেই রয়েল লাইব্রেরীর অস্তিত্ব ছিল। সপ্তম হেনরী থেকে সুরু করে দ্বিতীয় জর্জ (১৬৮৩-১৭৬০ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা এই গ্রন্থাগারটিকে পুষ্ট করেছিলেন। ১৭৫৭ সালে দ্বিতীয় জর্জ রয়েল লাইব্রেরীটি দান করলেন মিউজিয়মকে।

রিডিং রুম—বৃটিশ মিউজিয়াম

এইভাবে পুরাতন রয়েল লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হল বৃটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের। কিন্তু হান্স স্লোন (১৬৬০-১৭৫৩ খৃঃ) নামক জনৈক ধনী চিকিৎসকের সংগ্রহগুলি না থাকলে বৃটিশ মিউজিয়মের অস্তিত্বই সম্ভব হত কি না সন্দেহ। পুস্তক সংগ্রহ ছিল এঁর নেশা। প্রায় ৫০ হাজার মুদ্রিত পুস্তক ও সাড়ে ৩ হাজার হাতে-লেখা পুঁথি এঁর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বৃটিশ মিউজিয়ম জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হল ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

বৃটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের রিডিং রুমের পরিকল্পনাটি অপূর্ব। রিডিং রুমটি গোলাকার। কক্ষের মাঝখানটিতে চক্রাকারে সজ্জিত কাউন্টার এবং এই চক্রকে বেষ্টন করে পাঠকদের জন্য দীর্ঘ সোজা বসবার আসনগুলি কক্ষের বিভিন্নদিকে সম্প্রসারিত। কক্ষের কেন্দ্রস্থলে চক্রাকার অংশে রিডিং রুমের অফিস কর্মীরা কাজ করেন। রিডিং রুমে ৪৫০ জন পাঠকের আসনের ব্যবস্থা আছে এবং অন্ততঃ ৬৫,০০০ রেফারেন্স পুস্তক আছে।

রিডিং রুমের এই অভিনব পরিকল্পনার মধ্যে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে—প্রথমতঃ, সৌন্দর্যের দিক, দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন ও সুবিধার দিক। সৌন্দর্য সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত চিত্র থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কক্ষের মধ্যস্থলের চক্রাকার বেষ্টনী থেকে রিডিং রুমটি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এখানে আগত পাঠকের সুবিধা হয় প্রচুর। কারণ কক্ষের যে-কোন আসন থেকেই এই বেষ্টনীর দূরত্ব প্রায় সমান। সুতরাং পাঠকদের সময়ের অপচয় হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। রিডিং রুমের নির্মাণকার্য সুরু হয় ১৮৫৪ সালে এবং এর উদ্বোধন হয় ১৮৫৭ সালে।

পুরাতন সংবাদপত্র, নূতন সংবাদপত্র, হাতেলেখা পুঁথি, মানচিত্র, প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক রিডিং রুমের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫০ লক্ষাধিক পুস্তক রক্ষিত আছে বৃটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য বিষয়ের পুস্তকের সংখ্যা দেড় লক্ষ ও হাতেলেখা পুঁথির সংখ্যা এক লক্ষ। ১৮৩৪-৩৫ সাল থেকে নিয়মিত সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেস : ওয়াশিংটন

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের উৎপত্তির পর থেকে প্রয়োজনের সময় নিউইয়র্ক সোসাইটি লাইব্রেরী ও ফিলাডেলফিয়া লাইব্রেরী ব্যবহার করা হত।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস স্থানান্তরিত হল নতুন সহর ওয়াশিংটনে। ফলে নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া চলে গেল নাগালের বাইরে। নতুন জায়গায় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হল। আইনে কংগ্রেসের সেনেট ও প্রতিনিধিসভার জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিধানও দেওয়া হল। এইভাবে উৎপত্তি হল লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের।

দু'বার ধ্বংসের কবলে পড়ে গ্রন্থাগারটি। প্রথমবার যুদ্ধ ও দ্বিতীয়বার অগ্নিকাণ্ডের ফলে অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই রক্ষা পেয়েছিল। পরিশেষে এই পুস্তক সম্বল করে ১৮৯৭ সালে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হল যে মনোরম অট্টালিকায়, ক্রমে তার আয়তন সম্প্রসারিত হল।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেস

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ ক্রমে এত বিরাট হল যে, প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হল।

গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থা ন্যস্ত রয়েছে প্রধানতঃ মার্কিন কংগ্রেসের ওপর। গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন বাবদ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি গ্রন্থাগারিক সরাসরি জ্ঞাপন করেন কংগ্রেসকে—প্রেসিডেন্টকে বা কোন শাসন বিভাগের কর্তাকে নয়। সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করেন।

বর্তমানে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে ৫০ লক্ষাধিক পুস্তক ও ১০ লক্ষাধিক হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত রয়েছে।

প্রুশিয়ান স্টেট লাইব্রেরী : বার্লিন

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল রাজপরিবারের নির্দেশ। গ্রন্থাগারটি প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজপ্রাসাদের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল গ্রন্থাগারটি।

প্রথম ফ্রেডারিক প্রুশিয়ার রাজা হলেন ১৭০১ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় ফ্রেডারিকের আমলে রাজ পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ছিল গ্রন্থাগারের ওপর।

প্রথম ফ্রেডারিকের পর ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজত্বকালে গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি হল। ফ্রেডারিক দি গ্রেট সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। তখন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার আর ১৭৮৬

খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকালে এই সংখ্যা পরিণত হয়েছিল দেড় লক্ষে।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মৃত্যুর সময় জাতীয় আন্দোলন প্রসার লাভ করে। প্রুশিয়ার নেতারা আন্দোলনের পরিপুষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারসমূহকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইলেন, কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আন্দোলনকে জোরালো করে তুলতে হলে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপিত করে তুলতে হবে সর্বাগ্রে, আর একাজে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার গ্রন্থাগার।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে স্টেট লাইব্রেরীর আরও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হল। বস্তুতঃ ১৮৩১ সাল পর্যন্ত স্টেট লাইব্রেরীই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্থান গ্রহণ করেছিল। বার্ষিক অর্থসাহায্যের পরিমাণও দ্রুত বর্ধিত হতে লাগলো।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মৃত্যুকালে পুস্তকসংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ, ১৮৪০ সালে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হল, ১৮৯০ সালে হল ৮ লক্ষ, ১৯০৯ সালে সাড়ে ১২ লক্ষ এবং বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে পুস্তক সংখ্যা ২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

গ্রন্থাগারের বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ লক্ষ্য করবার মত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এর পুঁথি বিভাগটি, বিশেষ করে প্রাচ্য বিভাগটি। ভারতীয়, আরবী, তুর্কী, চীনা প্রভৃতি ভাষার পুঁথি গ্রন্থাগারের একাংশ পূর্ণ করেছে। ১৯৩২ সালের হিসাব অনুসারে গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথির সংখ্যা নিম্নরূপঃ পাশ্চাত্য—১৩,৪৯২, প্রাচ্য—১৮,৮৪৬ এবং পূর্ব এশীয়—১,৮৭৪।

রয়েল লাইব্রেরীর রিডিং রুম ঃ ষ্টকহেম

সুইজারল্যান্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরী ঃ বার্ণ

মাত্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জার্মান-সুইস ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত জুরিকের ফ্রেডারিক স্টব জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনকল্পে ফেডারেল কাউন্সিলে আবেদন করেন। তদন্তের ফলে দেখা গেল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অনুকূলে রয়েছে বিপুল জনমত।

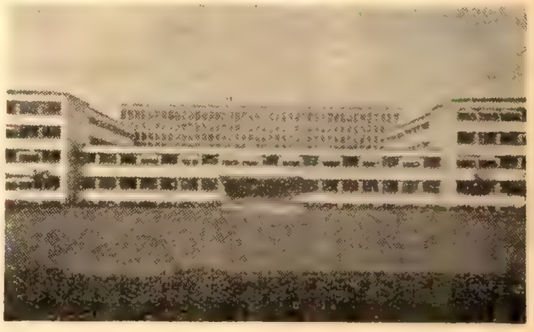

সুইজারল্যান্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরী

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন আইন পাশ হল। এর চার বৎসর পর ফ্রেডারিক স্টবের সংগ্রহ ক্রয় করা হল ২৫ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে। প্রথমতঃ, বার্ণে স্থানীয় একটি কমিটির হাতে ছিল গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার। পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একটি জাতীয় কমিটি স্থাপিত হল।

বর্তমানে গ্রন্থাগারে প্রায় ৭ লক্ষ পুস্তক আছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার গ্রন্থাগার

জারের আমলে রুশিয়ায় বড় বড় সহরে গ্রন্থাগারসমূহে দুর্লভ পুস্তকাদি ও অন্যান্য বিচিত্র সংগ্রহ থাকতো, কিন্তু

লেনিন স্টেট লাইব্রেরী ঃ মস্কো

দুঃখের বিষয় এগুলিতে বিশেষ শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্য কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরই গ্রন্থাগারগুলি সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দেখা দেয়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া গ্রন্থাগারসমূহের মোট পুস্তক সংখ্যা ছিল ৪৪ কোটি ২২ লক্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান আক্রমণকারীরা বহু গ্রন্থাগার ও অজস্র পুস্তক ভস্মীভূত করে। অবশ্য জার্মানদের বিতাড়িত করে সোভিয়েট সরকারের সহযোগিতায় এই সকল গ্রন্থাগারকে পরে আবার স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বস্তুতঃ ১৯৪৯ সালে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থের সংখ্যা প্রাক-যুদ্ধাবস্থাকেও অতিক্রম করে।

মস্কোয় অবস্থিত ভি আই লেনিন স্টেট লাইব্রেরী দেশের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল সাড়ে ১০ লক্ষ। ১৯৩৮ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬ লক্ষে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৯ কোটি ৪০ লক্ষ। বর্তমানে সোভিয়েট রুশিয়ায় ১ লক্ষ সাধারণ গ্রন্থাগার এবং মোট ২০ কোটি গ্রন্থ রয়েছে।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী

কলকাতার গ্রন্থাগারের ইতিহাসে ১৮৩৫ সালের আগষ্ট মাস এক স্মরণীয় কাল। তদানীন্তন অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল সার চার্লস মেটকাফ কুখ্যাত প্রেস আইন প্রত্যাহার করলেন। মুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য ১৮৩৫ সালের ২০শে আগষ্ট এক বিরাট জনসভায় মিলিত হন। এই সভায় নাগরিকেরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং' নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সভায় আরও সংকল্প করা হল যে, এই অট্টালিকায় একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে তদানীন্তন "ইংলিশম্যান" পত্রিকার সম্পাদকের উদ্যোগে আর একটি সভা আহূত হল। এই সভায় কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ফলে ১৮৩৬ সালের মার্চ মাসে 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী'র উদ্বোধন হল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেম। তাঁরা স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীকে মেটকাফ ভবনে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানালেন। ১৮৪৪ সালে পাবলিক লাইব্রেরী মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত হল। এই কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীই উত্তরকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

ভারতের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পূর্ব-নাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। ১৮৯১ সালে ভারত সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির সমবায়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গোড়াপত্তন হয়। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গ্রন্থাগারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নানা মূল্যবান পুস্তকে এই গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কলেজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও লন্ডনের ইষ্ট ইন্ডিয়া বোর্ডের গ্রন্থাগারসমূহের যাবতীয় পুস্তক এখানে রক্ষিত হয়।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার

লর্ড কার্জন বড়লাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে পরিদর্শন করতে সুরু করেন। তদানীন্তন জাতীয় গ্রন্থাগার 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী'তেও তিনি পদার্পণ করেন। গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করে তিনি মুগ্ধ হন এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ উপলব্ধি করেন। তিনি দেখলেন বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি গ্রন্থাগারকে বড় করে তোলা যাবে না। তাই সরকারী দপ্তরখানার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্মিলিত করে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার স্থাপন করলেন। সম্মিলিত গ্রন্থাগারের নাম রইল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। ১৯০৩ সালের ৩০শে এপ্রিল লর্ড কার্জন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন।

১৯৪৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে ন্যাশনাল লাইব্রেরী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক এর সভ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুস্তকের সংখ্যা ৬ লক্ষ।

বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিম্নে আমরা এরূপ কয়েকটির বিবরণ দিলাম ঃ

(১) বুহার লাইব্রেরী—বর্ধমান জেলার বুহার গ্রামের জমিদার সৈয়দ সদরুদ্দিনের বদান্যতায় লাইব্রেরী বিশেষ উপকৃত হয়। ১৯০৪ সালে তিনি প্রায় এক হাজার আরবী-ফারসী গ্রন্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে উপহার দেন। বুহার গ্রামের নামানুসারে এই সংগ্রহের নামকরণ করা হয়েছে।

(২) সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ—সার আশুতোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রায় ৮০ হাজার গ্রন্থ তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে ১৯৪৯ সালে ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে দান করা হয়। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, আইন, দর্শন প্রভৃতি কোন কিছু গ্রন্থই এই সংগ্রহ থেকে বাদ যায় নি।

(৩) হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন দূতাবাসের গ্রন্থাগারটি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অধিকারে এসেছে।

(৪) বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামদাস সেনের গ্রন্থাগারটি তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অধিকারে এসেছে। এই সংগ্রহে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার গ্রন্থ রয়েছে।

গত তিন বৎসর কালের মধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় একলক্ষ পুস্তক ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দানস্বরূপ এসেছে। গ্রন্থাগারটি যে কতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এ থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমানে লাইব্রেরীর রিডিং রুম এস্প্লানেড ও বেলভেডিয়ার উভয় স্থানেই রয়েছে। এতে পাঠকসাধারণ লাইব্রেরীর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে পারছেন না। লোকালয় থেকে দূরে বেলভেডিয়ারের নির্জন, শান্ত পরিবেশ গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হলেও বেলভেডিয়ারের অবস্থান সাধারণের পক্ষে অনেকখানি অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভারত সরকার সমগ্র লাইব্রেরীটিকে বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করলে বিভিন্ন স্তর থেকে সরকারকে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে উপস্থিত মতো তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা স্থগিত রাখতে হলেও পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর রিডিং ও লেন্ডিং সেকশন্ বেলভেডিয়ারেই স্থানান্তরিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এই গ্রন্থাগারটি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে বৃহত্তম। ১৮৬৯ সালে উত্তরপাড়ার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৫০০০৲ টাকা দান করেন এবং প্রায় একই সময়ে ঈশানচন্দ্র ঘোষের উইল অনুসারে কিছু গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সূচনা হল এই দুটি দানকে কেন্দ্র করে। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব তহবিল থেকে পুস্তক ক্রয়ের অধিকার পেল। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রকৃত কার্য সুরু হল এর আট বৎসর পর। এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের কোন বলিষ্ঠ রূপ দেখতে পাওয়া যায় নি। ১৯১২ সালে ভারত সরকার এক লক্ষ টাকা সাহায্য দিলেন। এর পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধির পশ্চাতে রয়েছে সার আশুতোষের আন্তরিক প্রয়াস।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত এর আরও কয়েকটি শাখা রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিশেষ সংগ্রহ এবং প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত সেমিনারগুলির লাইব্রেরীও মূল গ্রন্থাগারের অন্তর্গত। বিশেষ সংগ্রহগুলির মধ্যে বাগচী, পি সি ঘোষ, দাশগুপ্ত, পিশেল, ডান প্রভৃতি সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাতে লেখা পুঁথি ব্যতীত প্রায় ২ লক্ষ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রয়েছে। পুরানো বাংলা পুঁথি, সংস্কৃত পুঁথি ও তিব্বতী পুঁথির সংখ্যা যথাক্রমে ৬২০০, ১০৫৪ ও ৪৮৫৯। বৃহৎ রিডিং রুমে ৩০০ আসনের ব্যবস্থা আছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার

প্রাচ্যবিদ্যা আলোচনার জন্য সুসমৃদ্ধ কোন গ্রন্থাগারের উল্লেখ করতে হলে এশিয়াটিক সোসাইটিকে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় বলা চলে। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সঙ্গেই গ্রন্থাগারের কার্যত আরম্ভ হয়।

গ্রন্থাগারটি প্রধানতঃ ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

(১) সংস্কৃত

(২) ইসলাম বিষয়ক

(৩) সংস্কৃত গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য
(৪) চীন ও তিব্বত সম্পর্কিত

বর্তমানে এর মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা এক লক্ষ ও পুঁথির সংখ্যা ৩৩ হাজার।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার

বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যা আলোচনার জন্য যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের মূল্য অসীম, শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার জন্য তেমনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৯৩-৯৪ সালে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা। বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ৫০ হাজার পুস্তক ও ৫ হাজার পুঁথি গ্রন্থাগারের অবলম্বন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি সত্যেন্দ্র দত্ত, রমেশ-চন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের নিজস্ব সংগ্রহসমূহ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রন্থাগারের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কলকাতার খ্যাতনামা পুরাতন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৮২ খৃঃ), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী (১৮৮৩ খৃঃ), কুমারটুলী ইনস্টিটিউট (১৮৮৪ খৃঃ), বেলিয়াঘাটা সুবার্বন রিডিং ক্লাব (১৮৮৮ খৃঃ), চৈতন্য লাইব্রেরী (১৮৮৯ খৃঃ), ও রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

★

সাগরতীরে

সমীর ঘোষ

জল কাঁপে।
তল নাই, নাই পরিমাণ।
অতন্দ্রবীণায় বাজে কি গভীর গান।
কি যেন সে মাপে
মাপে আর ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে শুধু কাঁপে।

এই জলে কাপে এই মন,
একতারা শত হোয়ে ভাঙে অনুখন।
ফস্‌ফরাসের আলো ওঠে জেগে
হলুদ বালুর তীরে লেগে।

জাগে চাঁদ।
আজ রাতে পীত আলো তার
সাগরের বুক ছুঁয়ে হোয়েছে নতুন সুরকার;
ফেনায় ফেনায় তার নতুন মূর্চ্ছনা
ছড়ায় বিচিত্র সুর-কনা।

তালীবন দোলে—
জলের অশ্রান্ত কলরোলে
পাতায় পাতায় তার গান—
এ লীলার নাই অবসান।

জল কাঁপে, কাঁপে মন
জাগে চাঁদ, দোলে তালীবন;
তারি মাঝে চেয়ে দেখি নীলজল অপূর্ব্ব সবুজ
মন হয় অন্তরে অবুঝ।

আমি যেন তোমাকেই খুঁজি
দু বাহুতে বুঝি।
সে তুমি কোথায় আছো বুঝি না জানি না
তবু এ সাগরতীরে কাঁপে মনোবীণা।

মাকড়সা

রমাপতি বসু

—আপনার নাম কি শঙ্কর মৈত্র?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো? বিস্মিত হয়ে শঙ্কর জবাব দিল।

—আমি বনানী।

অফিসের কেরানীরা ছুটির পর যখন বাসে ঠেসাঠেসি করে যাচ্ছে—তখন একটি পুরুষ ও নারী কণ্ঠের এই সংলাপ সকলেই শুনেছিল।

আবার শোনা গেল:

—তোমাকে একদম চেনা যায় না।

—তোমাকেও চেনা যায় না। আমি সাহস করে জিগ্যেস করে ফেললুম।

—যদি তোমার ভুল হতো?

—সংক্ষেপে বলতাম: দুঃখিত। এর পর আর নিশ্চয় কোনো কথাই হতো না।

দুজনে একটু হাসলো। বাসের অন্যান্য মেয়ে ও পুরুষ যাত্রীরা এদের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু এদের সে দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অনর্গল কথা বলে যায় মেয়েটি। এদের কথাবার্তা শুনলে বেশ বোঝা যায় দীর্ঘদিন পরে দেখা শোনা হচ্ছে। একসময় এদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জীবনের সেই ফেলে আসা দিনের একটি সূত্র ধরে আজকের এই আলাপ। হয়তো এরা যখন কিশোর কিশোরী ছিল, তখন এদের জীবনে এসেছিল অনুরাগ—যার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় আজকের এই সাক্ষাতে।

বনানীর চেহারায় বেশ একটা জৌলুষ আছে। বয়স বাইশ কী জোর তেইশ হবে। পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ী আর ব্লাউজ। এক হাতে কয়েকটি মোড়ক, অপরহাতে উৎকলী কাজ ভেলভেটের বটুয়া। বটুয়ায় আয়নার টুকরো বসানো বলে—মাঝে মাঝে রোদ পড়ে চিক্ চিক্ করে উঠছে। বনানীর গড়নটা বেশ সুন্দর। চলতি কথায় যাকে বলে আলগা চটক্। গায়ের রঙটা খুব ফর্সা না হলেও কালো বলা যায় না। আর যার সঙ্গে সে কথা বলছিল, তার নাম শঙ্কর। সাধারণ দোহারা চেহারা। তার মুখশ্রী আছে কিন্তু গায়ের রঙটা বেশ কালো। পরনে সাধারণ হাফ সার্ট আর প্যান্ট। বোধ হয় শঙ্কর অফিস থেকেই ফিরছে। মুখ চোখের অবস্থা দেখলে তাই মনে হয়।

শঙ্কর বললে: তোমার নাম না বললে আমি কিছুতেই চিনতে পারতুম না। তুমি বেশ বড়ো হয়ে গেছ।

বনানী বললে: বয়স হলো না? কতদিন পরে দেখা হচ্ছে বলতো?

—তা প্রায় পনেরো ষোল বছর হবে। শঙ্করের মুখ মৃদু হাসিতে ভরে যায়।

বনানী আবার বললে: তোমরা তো দেশে মোটেই যাও না। এরপর কত কি ঘটে গেছে। আমাদের সংসারের কোনো চিহ্নই নেই। সেই যে সেবার তোমরা পুজোর সময় গিয়েছিলে—সেই বছর পৌষ মাসে মা মারা গেলেন। আমাদের তিন ভাই বোন-কে নিয়ে বাবা চলে গেলেন আমেদাবাদে আমার এক পিসিমার বাড়ী। পিসেমশাই ওখানকার ডাক্তার, তাঁরই ওখানে থেকে বাবা আমাদের মানুষ করতে লাগলেন। এর কিছু দিন পরে—সাতদিনের আড়া-আড়িতে আমার একটি ভাই আর একটি বোন টাইফয়েডে মারা গেল। এই শোক বাবার খুব লেগেছিল। তাঁর শরীর খুব ভেঙে যায়। এদিকে আমি ওখানকার একটি মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করছিলাম। ইচ্ছে ছিল খুব পড়াশোনা করার, কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না।

শঙ্কর বললে: কেন—বাবা বুঝি তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন?

সলজ্জভাবে বনানী বললে: হ্যাঁ।

—বাবা কেমন আছেন?

—আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেছেন।

শঙ্কর যেন এই সংবাদে খুব দুঃখিত। মুখটা তার ম্লান হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ চাপ। অনেকক্ষণ পরে শঙ্কর জিগ্যেস করে: স্বামী কি করে?

—সাংবাদিক।

—এখন কোথায় গিয়েছিলে?

মার্কেটে। কয়েকটা দরকারী জিনিষ ছিল কেনার।

আমার আবার কারুর কেনা পছন্দ হয় না। বনানীর মুখে হাসি।

শঙ্কর বললেঃ বেশ গিন্নি হয়ে গেছ। তোমার সংসার দেখতে ইচ্ছে করে।

—এসো না এখন।

—এখন না, আর একদিন আসবো।

বনানী তবু পীড়াপীড়ি করে বলেঃ এখনতো সবে সন্ধ্যে হয়েছে। আজই এসো আমার সঙ্গে। আর একদিন আর হবে না। এর পরের স্টপেজে আমাকে নামতে হবে।

বলতে বলতে স্টপেজে এসে বাস থামে।

বনানী নিজে উঠে বললেঃ এসো শঙ্করদা, এইখানে নামতে হবে।

অগত্যা বনানীর অনুরোধে শঙ্কর আরো কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নেমে পড়ে।

রাসবিহারী এভিন্যুর শেষ প্রান্তে যেখানে ঠাস বুননের মত বাড়ীগুলো রয়েছে—তারই মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটি কাঁচা বেসরকারী গলি। এই গলি দিয়ে বনানী শঙ্করকে নিয়ে এসে হাজির হলো তার বাড়ীতে। ছোট একতলা বাড়ী। মোট তিনখানা ঘর আর সামনে একটু ঘাসের জমি পড়ে রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর পক্ষে এই যথেষ্ট।

ঘরে এসে বসে শঙ্কর জিগ্যেস করেঃ তোমার স্বামী কোথায় ?

—তাঁর তো নাইট ডিউটি। বলো কেন—একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাই। মাসের মধ্যে অন্তত আটাশ দিন তিনি রাত্রে বাড়ীতে থাকেন না। দিনের বেলা এসে ঘুমোন।

ঘুরে ঘুরে শঙ্কর বাড়ীটি দেখে। বেশ পছন্দ হয় তার।

হঠাৎ শঙ্কর বনানীকে জিগ্যেস করেঃ ভাড়া কতো ?

—ভাড়া দিতে হয় না।

—তার মানে ?

—তার মানে বাড়ীটি এই কমাস হলো আমরা তৈরী করেছি।

খুশিতে শঙ্করের মুখটা যেন কী রকম হয়ে যায়।

সে বলেঃ বাঃ, ভারী সুন্দর হয়েছে। কার প্ল্যানে তৈরী করালে ?

—আমার প্ল্যানে। সগর্বে বনানী বললেঃ তোমার বুঝি খুব পছন্দ হয়েছে ? কোথা থেকে এই প্ল্যান নেওয়া জান ? বিলিতি মাসিক পত্রিকা থেকে।

শঙ্কর বললেঃ চমৎকার হয়েছে। কিন্তু সামনের ঐ জায়গাটুকুতে মরসুমী ফুল ফোটাতে পারো। ওতে বাড়ীর শোভা বাড়ে।

—ফুল ফোটাতে আমার মন চায় না। সকলেরই লোভ হয় ওখানে গাছ পোঁতার। আমি পছন্দ করি না। সবুজ ঘাসই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। তাই ওখানে আমি সবুজ ঘাসের কার্পেট করে রেখেছি।

শঙ্কর আর বনানী যখন বসে আলাপ করছে তখন বছর দশ বারো বয়সের একটি পাহাড়ী ছেলে এসে চা দিয়ে গেল। ট্রেতে টি পট্, পেয়ালা, চামচ, চিনির বাটি সাজানো। আর এরই সঙ্গে এক কৌটা বিস্কুট।

ছেলেটা দিয়ে যাবার পর শঙ্কর বললেঃ তোমার সংসার যত দেখছি ততই ভাল লাগছে। সেই ছোট্ট বনানী—তার এই সংসার, ভাবতে আমার কী রকম যেন লাগছে।

লিকারে দুধ মেশাতে মেশাতে বনানী বললেঃ এটা তুমি ঠিক কথা বলছ না শঙ্করদা। আমাকে খুশি করার জন্য বলছো।

—না না বিশ্বাস করো। আমি তোমার এই পরিবর্তন দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেছি। এই কথা বলে শঙ্কর বনানীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বনানীর সব কিছু যেন তার আজ বেশী করে ভাল লাগছে।

বনানী বললেঃ এখানে আমি বড়ো একা শঙ্করদা।

শঙ্কর কৌতূহলী হ'য়ে জিগ্যেস করলেঃ তোমার বুঝি ভয় করে ?

—ভয় ? না না ভয় করার আর কি আছে ? ভয়ানক একা মনে হয়। এ যেন আমি খুনী আসামীর মত নির্জন সেলে বন্দী হয়ে আছি। তাই তো মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। জানো শঙ্করদা, মনটা কিছুতেই ভাল হয় না।

—তোমার মন আছে, তাই ভাল খারাপের প্রশ্ন ওঠে। আমার মন নেই, তাই খারাপ ভাল কিছু বুঝিনে।

—তুমি যেন একটু ঘোরালো হ'য়ে গেছ। বয়সের তুলনায় গম্ভীর বেশী।

কৌতুক করার জন্য শঙ্কর বললেঃ ও কথা ছেড়ে দাও বনানী। ওটা মেয়েদের চারিত্রিক বিশেষত্ব। একটা কথা জানতে আমার ভারী ইচ্ছে হ'চ্ছে।

—কি কথা ?

—বলবো ?

—বলো, না বললে জবাব দেবো কি করে ?

—মাকড়সা দেখলে এখন আর ভয় পাও না ?

বনানী বেশ শিউরে উঠে বললেঃ এখন যেন আরো বেড়েছে। ঐ ভয়ে সব সময় আঁতকে থাকি। বিশ্বাস করো শঙ্করদা—আমি আজো সারা রাত আলো জেলে ঘুমোই। অন্ধকারে কিছুতেই ঘুমতে পারি না।

শঙ্কর চুপ করে শোনে বনানীর কথা।

বনানী নিজের মনে বলে যায়ঃ

শঙ্করদা—তুমি জানো না, তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আমি খুব অনুতপ্ত হয়েছিলাম। ছোট বেলার স্মৃতি আজো আমার মনে আছে। আমি চিরদিন মাকড়সা দেখলে ভয় পাই। মাকড়সা দেখলে আমার সারা শরীর যেন কি রকম করে ওঠে। মনের মধ্যে কিল বিল করে ওঠে। আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে সে কী শিহরণ আমি অনুভব করি।

এর কারণ কি জানো? খুব ছোট বেলায় একবার একটি মাকড়সা আমার পা বেয়ে একেবারে পিঠে উঠে এসেছিল ফ্রক পরে ছিলাম, পিঠের ওপর অতগুলো পা দিয়ে চলে বেড়াতে আমি ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যাই। এত ভয় পেয়েছিলাম যে আমার জ্বর এসে গিয়েছিল। আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে—সারা শরীরটা আমার কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। গাটা রী রী করে উঠেছিল ভয়ে। সেই ভয় আজো আছে। ছোট বেলায় একটু অন্যায় বা যদি কোনো কিছু মার কাছ থেকে আব্দার করতে চেয়েছি—মা অমনি আমাকে শাস্তি দেবার জন্য মেঝের ওপর কয়েকটা হিজি বিজি আঁচড় কেটে দিয়ে দেখিয়েছেন, এটা মাকড়সা। আমি অমনি চোখ বুঝিয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে থাকতাম। এ ছিল আমার ভয়ানক শাস্তি। শেষে বাবা একদিন মাকে বলে দিলেনঃ এ ধরণের ভয় দেখিয়ে শাসন করা অন্যায়। মা আর সেই থেকে কোনোদিন আমাকে 'মাকড়সা' দেখিয়ে ভয় দেখাননি। ঐ থেকেই 'মাকড়সা' শব্দটার ওপর আমার আতঙ্ক থেকে গেছে। এর পর ভাঁড়ার ঘরে, বাথরুমে, একতলার গুদোম ঘরে মাকড়সা দেখলেই আমি ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরতাম। পাড়ার যারা একটু বয়ঃজ্যেষ্ঠা তাঁরা আমার এই স্বভাবের জন্য অনেক কথাই বলে গেছেন। কেউ বলেছেনঃ ন্যাকামি, কেউ বা বলেছেনঃ ধিঙ্গীপনা। আমি কিন্তু এ সবের একটি কথারও কোন দিন উত্তর দিইনি।

তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি এত জেনেও যে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারো, তা আমি জীবনে কল্পনা করতে পারিনি।

আমরা গ্রামে থাকতাম, তোমরা থাকতে সহরে। সহর মানে খাস কোলকাতায়। পুজোর সময় তোমরা গ্রামে ফিরবে—এটাই ছিল আমার সব চেয়ে আনন্দের। প্রতি বছর তোমরা কবে আসবে—এই চিন্তায় আমার দিন কাটতো। বাবা চিরদিন আমার গোঁড়া ও কুসংস্কারাছন্ন। সহুরে সভ্যতা বা ঐ জাতীয় আদপ্ কায়দা কোন দিনই বরদাস্ত করতেন না। আমার বেশ মনে আছে—আমি তখন স্কুলের —ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। তোমরা সেবার আসবে না আসবে করে পুজোর সপ্তমীর দিন এলে দেশে। আমার সে কী আনন্দ। আমি ছুটে তোমাদের বাড়ী গেলাম। সে সময় আমার কৈশরের উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তোমাদের কত জামা কাপড় এনেছিলে কোলকাতা থেকে। তুমি এক এক করে তোমার সিল্কের পাঞ্জাবী. জালীগেঞ্জি, শান্তিপুরী কালাপেড়ে ধুতি, কোলকাতার চীনে বাড়ীর পাম্প সু—দেখালে। আমার সে কী আনন্দ। তুমি বোধ হয় ঐ প্রথম ধুতি পড়বে, তাই আমার বিনুনিটা ধরে টেনে বলেছিলেঃ আমায় ধুতি পরলে কি রকম দেখাবে রে? আমি সরল মনে বলেছিলামঃ ভাল।

তুমি খুশি হ'য়ে আমাকে একটা ফুলকাটা রুমাল আর বাদামী রঙের এক কৌটা পাউডার দিয়ে বলেছিলেঃ এটা তোকে পুজোয় উপহার দিলুম। পাড়াগাঁয়ে এসব পাউডার পাওয়া যায় না।

সেদিন আমি তোমার ঐ কথা মেনে নিয়েছিলাম। মেয়েরা প্রসাধনের জিনিস পেলে যে কী খুশি হয়—তা তুমি বুঝবে না। আনন্দে আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাকে বললামঃ মা শঙ্করদা আমার জন্য কীসব জিনিস এনেছে দেখ। মাতো দেখে খুশিই হ'য়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন তুলে রাখতে। যখন তখন ব্যবহার করে যেন নষ্ট না করি। কিন্তু এ কথা শুনে বাবা আর ঘরে রইলেন না। বেরিয়ে এসে আমাকে বললেনঃ ওগুলো আমায় দাও আমি ফেরৎ দিয়ে আসি।

বোকার মত আমি বাবাকে জিগ্যেস করেছিলামঃ কেন বাবা?

বাবা খুব গম্ভীর হ'য়ে গেলেন আর বললেনঃ সে তুমি বুঝবে না।

সত্যি আমি সেদিন ফেরৎ দেওয়ার কোনো কারণই বুঝতাম না। বাবার এই রায়ের ওপর আমার কথা বলার কোনো সাহসই ছিল না। আমার মুখের অবস্থা দেখে বোধ হয় বাবার একটু মায়া হ'য়েছিল, তাই তিনি তোমার দেওয়া জিনিসগুলো আর ফেরৎ দিলেন না, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি যা করেছিলেন—তা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমার মনে হ'য়েছিল। দশমীর দিন রাত্রে তোমার বাবা

এসেছিলেন আমাদের বাড়ী দেখা করতে। বাবা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। মিষ্টিমুখ করার পর বাবা তোমার বাবাকে বলেছিলেন: দেখুন সরোজবাবু এ সব আমি মোটেই পছন্দ করি না। আপনার ছেলে আমার মেয়েকে একেবারে খারাপ করে দিচ্ছে। এই বয়সে রুমাল, পাউডার উপহার দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না। এখন এই অঙ্কুর থেকে নজর না রাখলে ভবিষ্যতে এর ভয়ানক খারাপ ফল দেখা দেবে। কোলকাতার কালচার ভয়ানক খারাপ মশাই। এই সব করেই দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। জানেন না মশাই এই কিশোর বয়সটা ভয়ানক খারাপ। এখন মনে ছাপ পড়ে গেলে—তা আর কিছুতেই মোছে না।

শঙ্কর এতক্ষণে একটি কথা জিগ্যেস করলো: আমার বাবা তাতে কি বলেছিলেন?

বনানীর চোখ দুটো যেন আরো ডাগর হ'য়ে উঠলো। সে বলে চললো: শঙ্করদা, তোমার বাবা ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বলেছিলেন: আপনার মাথা খারাপ মশাই। কী যা-তা বলছেন। একটা রুমাল যদি দিয়েই থাকে তাতে হয়েছে কি? আপনার মেয়ে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়, আমার ছেলে এই বছর প্রথম ধুতি কাপড় পরছে—এর মধ্যেই যত কিছু খারাপ হ'য়ে গেল? তোমার বাবা আমার বাবার এ সব কথায় মোটে আমল দেননি। কিন্তু এ'দের শেষ কথা যা হ'লো—তা হচ্ছে, বেশ আমি আমার মেয়েকে মিশতে দেবো না। তোমার বাবা বলেছিলেন: বেশ দেবেন না। কিন্তু এই নিয়ে আমি আমার ছেলেকে একটি কথাও বলবো না।

এই দিন থেকে বাবা আমাকে শাসন করে বলে দিয়েছিলেন, তোমার সঙ্গে যেন কথা না বলি, খেলা না করি। বাবার সব কথাই আমি শুনতুম, কিন্তু এই অনুশাসন আমার মোটেই ভাল লাগেনি। আরো আমার জীদ্ চেপে গেল, তোমার সঙ্গে খেলা করবো, কথা বলবো। কিন্তু শঙ্করদা তোমার মত দুষ্টু আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি।

শঙ্কর বললে: তুমি তো এ কথা আমাকে কিছু বলোনি।

—না। বলার সুযোগ দিয়েছিলে কোথায়? বনানী বললে: একাদশীর দিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ী এসে মাকে প্রণাম করে তুমি চলে গিয়েছিলে। আমার সঙ্গে একটি কথাও বলোনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় তোমার বাবার কাছ থেকে সব শুনেছ। রাগ করেছো। আমাদের বাড়ী থেকে যাবার সময় তুমি একটি খাম আমার হাতে দিয়ে চলে গেছলে। খামটা খুলেই আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেছলাম। তার মধ্যে তুমি একটা মরা মাকড়সা দিয়েছিলে। তুমি জানতে আমি মাকড়সা দেখলে ভয় পাই, তবু তুমি যখন আমার সঙ্গে এই রকম একটা ব্যবহার করলে—তখন আমার মন একেবারে ভেঙে গেল। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে সে আমার কী দশাই না হয়েছিল। কিছুতেই তোমার ঐ ব্যবহার আমি ভুলতে পারিনি। তুমি যে আমাকে ঐ রকমভাবে আঘাত করতে পারো—তাও আমার কল্পনাতীত ছিল। মেয়েদের ভীরুতা নিয়ে বিদ্রুপ করতে নেই। তুমি মেয়েছেলে নও তাই বুঝবে না। তবু বলি তোমার ওপর বিরূপ হ'লেও তোমাকে দেখার লোভ আমার খুব ছিল। মা আমাকে এই ঘটনা জানার পর বলেছিলেন: তোমার সঙ্গে যেন জীবনে কথা না বলি। কিন্তু আমার মন তবু মায়ের সে আদেশ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। কত পুজো গেছে এরপর, তোমরাও দেশে ফেরনি একবারও। কোথায় থাকো, কী কর—কিছুই জানবার উপায় ছিল না। মনের এই ভাবটাকে কি বলে জানি না—তবে সব কাজের মধ্যে তোমার কথাই বেশী করে মনে পড়েছে। আমার কিশোরী মনে বুঝি যে দাগ কেটেছিলে আজো তা মিলিয়ে যায়নি। তোমাকে দেখে শঙ্করদা—আজ যে কী আনন্দ হ'চ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে পারছি না।

আমার স্বামী হ'চ্ছেন দেবতা। তাঁকে দেখলে তুমি নিশ্চয় খুশি হবে। রাত্রিদিন শুধু লেখা আর পড়া নিয়ে থাকেন। আমার কোনো কথায় তিনি না করেন না। আমার স্বামীর দিক থেকে—আমি ভয়ানক সুখী। অনেক মেয়েই আমার সৌভাগ্য দেখে হিংসে করে।

আচ্ছা শঙ্করদা—তুমি বিয়ে করোনি?

—না।

সে কী! এখনও বিয়ে করোনি? আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী সংসারী হ'য়ে পড়েছো। ছেলেপুলে নিয়ে সুখে সংসার কোরছো। হেসে বললে বনানী।

শঙ্কর বনানীর এই কথায় বললে: আমার মত দুষ্টু প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে কে বিয়ে দেবে?

এটা তোমার অন্যায় কথা শঙ্করদা। আজ আমার কি মনে হয় জানো? যারা দুষ্টু, যারা অবাধ্য—তারাই অসাধারণ। তাদের ওপর মেয়েদের একটু বেশী দুর্বলতা থাকে।

—মেয়েদের মনের কথা জানার আমার সুযোগ হয়নি।

—না, না এ হ'তেই পারে না। তুমি আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছ।

—তুমি বিশ্বাস করো। আমি বিয়ে করিনি। তুমি যেমন মাকড়সা দেখলে ভয় পাও, আমিও তেমনি মাকড়সার জাল দেখলে ভয় পাই। বিয়েটা হ'চ্ছে ঐ মাকড়সার জাল।

বনানী চুপ করে থাকে। এই নিয়ে কথা বলা যেন ভাল দেখায় না। এ কথার এইখানেই শেষ করে দেওয়া উচিত বলে মনে হয় তার।

শঙ্কর বললেঃ হঠাৎ চুপ করে গেলে কেন?

—না ভাবছি, বলে বনানী আবার সুরু করলেঃ আমাদের ছেলে বেলার দিনগুলো সত্যি খুব সুন্দর ছিল। কী আনন্দেই না সে সব দিন কেটেছে। জল কাদায় প্যাচ-প্যাচে পথ দিয়ে হাঁটতে কী ভালোই লাগতো। ভেজা গাছের বুনো সোঁদা গন্ধ—ধোঁয়া ও ধুলোয় সে পরিবেশকে কলুষিত করতে পারে না। সেইটেই ছিল সুন্দর, সেইটেই ছিল সব চেয়ে প্রিয় আমার। তাই তো আমার বাড়ীর সামনে ঐ ঘাসের কার্পেট পেতে রেখেছি। চিম্‌নীর ধোঁয়ায় সবুজ আর দেখা যায় না। ভিজে ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটতে আমার ভয়ানক ভাল লাগে। আমি বৃষ্টি হ'লেই ওখানে হেটে বেড়াই।

শঙ্কর বললেঃ অতীত যদি মধুর না হ'তো—তবে মানুষের বাঁচা খুব কষ্টকর হ'তো। অতীতই তো মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যা একবার চলে যায় আর ফিরে আসে না, সেইটেই হয় সবচেয়ে মধুর ও মনোরম।

শঙ্কর বনানীর ঘরের চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পায় ঘরের দরজার ঠিক ওপরে একটি মাকড়সা। ইচ্ছে ছিল বনানীকে সেকথা বলবে না, কিন্তু না বলাটাও যেন উচিত হবে না। শঙ্কর মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু ভাবে, যদি তার চলে যাওয়ার পর বনানী ঐ মাকড়সাটা দেখতে পায়—তবে সে হয়তো ভয়ে শিউরে উঠবে। হয় তো বা সে মূর্চ্ছা যাবে দেখে। তখন বনানীকে দেখার কে থাকবে। উঠে পড়বে কী না—এই চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে শঙ্কর। কী বলবে বা কী করবে—তা সে কিছুই ঠিক করতে পারে না।

শঙ্করের মুখ চোখের ভাব দেখে বনানী বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। জিগ্যেস করে বনানীঃ কি হ'য়েছে শঙ্করদা?

শঙ্কর কোনো জবাব দেয় না। নির্বাক, নিশ্চল হ'য়ে শুধু চিন্তা করে; এই অবস্থায় বনানীকে রেখে তার বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা উচিত হবে না। কী যে করবে—তা ঠিক করতে পারে না শঙ্কর।

হঠাৎ শঙ্করের চোখের দিকে তাকিয়ে বনানী বুঝতে পারে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। পিছন দিকে তাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরে।

—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও শঙ্করদা। বনানীর ভয়ার্ত কণ্ঠে কথাগুলো জড়িয়ে গেলেও শঙ্কর তা বেশ বুঝতে পারে।

মাকড়সা দেখলে বনানীর শরীর আজো যেন কী রকম করে। মনে হয় তার মাথার মধ্যে অনেকগুলো সরীসৃপ কিল বিল করে চলে বেড়াচ্ছে। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভয়ে সে মুখ লুকিয়ে ফেলে। আর একবার ঐ মাকড়সার দিকে তাকাতে তার সাহস হয় না।

শঙ্কর বলেঃ ব্যস্ত হয়ো না বনানী। আমি ওটাকে মেরে ফেলে দিচ্ছি।

বনানী তার দুটি হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে একটা চেয়ারের ওপর বসে থাকে।

শঙ্কর হাতের কাছে কিছু খুঁজে পায় না। শেষে একটা বই নিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। খুব সন্তর্পনে দরজাটা সে ভেজিয়ে দেয়। তারপর সজোরে বারকয়েক বইটাকে দেয়ালের গায়ে ঠুক্‌তেই মরা মাকড়সাটার রস লেগে দেয়ালের গায়ে একটা বিশ্রী দাগ হ'য়ে যায়। তারপর সেটাকে একবার আলগোছে নাড়া দিয়ে দেখ্‌তেই উল্টে মেঝের উপর প'ড়ে যায়। গর্ভবতী মাকড়সা। পেটে বোধ হয় ডিম ছিল। তা না হ'লে ঐ দেহ থেকে এত রস বেরুবে কী করে!

মাকড়সাটাকে মারার একটা আওয়াজ শুনেছিল বটে বনানী কিন্তু সে চোখ খোলেনি। শঙ্কর স্পষ্ট করে জানাতে তবে বনানী একবার ভালো করে শঙ্করের দিকে তাকাতে পারে। বিস্ময়ে, ভয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে শঙ্করের দিকে। তার মনে হয়, সেই ছোট বেলার শঙ্করের সঙ্গে আজকের এই শঙ্করের যেন অনেক পার্থক্য।

* * *

ঘরের ভেজানো দরজা খুলে এসে ঢোকে বনানীর স্বামী দিনেশরঞ্জন।

এইভাবে শঙ্কর আর বনানীকে দেখে সে বেশ অপ্রতিভ হ'য়ে যায়। দিনেশরঞ্জনের এই সময়ে আসার কোনো

সম্ভাবনাই ছিল না। বনানীও তাকে দেখে যেন কী রকম হ'য়ে ওঠে। তবু স্বামী ফিরতে বনানীর যেন একটু সাহস হয়। সে বললেঃ তুমি এসেছো যখন—তখন ভালই হ'য়েছে। ইনি হ'চ্ছেন আমাদের শঙ্করদা। উঃ, বাবা, কী ভয়ই না পেয়েছিলুম।

নমস্কার জানালো শঙ্কর, কিন্তু দিনেশরঞ্জন শঙ্করের দিকে তাকিয়েও প্রতিনমস্কার কোরলো না। শুধু মুখে বললেঃ ও।

বনানীকে ভাল করে লক্ষ্য করে বললেঃ তোমার এ অবস্থা কেন? আর দরজা... দিনেশরঞ্জনের কথা শেষ হওয়ার আগেই বনানী বলে উঠলোঃ উঃ সে কী ভীষণ ব্যাপার। আমি তো মরেই যেতাম। আমাদের বাড়ীতে আবার মাকড়সা। ভাগ্যিস শঙ্করদা ছিল—তা না হ'লে আজ যে কী অবস্থা হ'তো—তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

খুব গম্ভীর গলায় দিনেশরঞ্জন বললেঃ থাক্‌ আমাকে আর বোঝাতে হবে না।

শঙ্কর দিনেশরঞ্জনের এই রকম ব্যবহারে বেশ একটু অপমানিত বোধ করেছিল। ঠিক এইভাবে এখানে থাকা উচিত নয় বলে তার মনে হয়। সে তাই বললেঃ আজ আমি এখন চলি বনানী। পরে একদিন আসবো।

বনানী বললেঃ আচ্ছা শঙ্করদা।

শঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দিনেশরঞ্জনের রূঢ় ব্যবহার তার মনে খুব আঘাত করেছে। মনে মনে সে বলেঃ ছিঃ ছিঃ এইভাবে বনানীর কথায় তার এ বাড়ীতে আসা উচিত হয়নি।

শঙ্কর চলে যাওয়ার পর বনানী তার স্বামীকে কী যেন বলতে যাচ্ছিল।

দিনেশরঞ্জন বনানীকে কিছু বলতে না দিয়েই বললেঃ থাক্‌ আমাকে আর কিছু বোঝাতে হবে না। তোমাকে আমি ভয়ানক বিশ্বাস করতাম বনানী।

বনানীর গলার স্বর যেন বন্ধ হ'য়ে যায়। দিনেশরঞ্জন ভুল বুঝেছে, তার ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার। কিন্তু বনানী যা বলতে চায়—তা সে বলতে পারে না। সব যেন এলো-মেলো হ'য়ে যায়।

দিনেশরঞ্জনের জুতোর খট্‌ খট্‌ আওয়াজ ক্রমেই অস্পষ্ট হ'য়ে যায়। সে বনানীর আর কোনো কথা না শুনেই বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

বনানী যা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, তা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। একটা চাপা কান্না তার বুকটাকে যেন আরো ভারী করে তুললো। শুধু দিনেশরঞ্জন কেন, কেউই হয় তো বিশ্বাস করতে পারবে না যে—শঙ্কর আর বনানী কিছুক্ষণ আগে সত্যি সত্যি একটা মাকড়সা মারার জন্য কী রকম ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল।

বনানীর চোখ দুটো জলে ভরে যায়। তার সজল চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দেয়ালের গায়ে মরা মাকড়সাটার দাগটার ওপর। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে কোনো এক নির্জন কক্ষে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনানী, আর তার সামনে পড়ে থাকে মরা মাকড়সাটা।

প্রেম

শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

এখন আগুন-রোদ, আমি শুধু পথে পথে ঘুরি
দৃঢ়-মুষ্টি, দীপ্ত-শ্বাস। দুই চোখে যুগান্তের নদী,—
খুঁজি তাকে মাঠে মাঠে—যে আমার সব গান চুরি
করে নিল, সব ধান—পৃথিবীর সব রঙ,—যদি
কোনদিন দেখা পাই; একবার কাছে পাই তাকে,
শেষ বিন্দু রক্তে তার তৃপ্ত করি আমার তৃষ্ণাকে।

এখানে বুভুক্ষা শুধু, তোমার আসন কোথা, প্রেম;
আজকে তোমাকে তাই হৃদয়ে লুকিয়ে রাখলেম!

ভারতের বাণিজ্য প্রসার প্রচেষ্টা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিল-জগতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সহিত ভারতের তথা সমগ্র এশিয়ার এবং বৃটিশ-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রসাধারণ-তন্ত্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যাতায়াত, যোগাযোগ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আদান-প্রদানের সুযোগ ও সুবিধা সৌকর্য্যে, নিখিল-জগৎ এখন যেন এক-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকের সুখ-সুবিধ এবং উন্নতি-অনুন্নতির সহিত প্রতি খণ্ড-দেশ ও মহাদেশের উদ্যোগ-উদ্যমের নিবিড় সম্বন্ধ। সম্প্রতি লণ্ডনে রাষ্ট্র-সাধারণ-তন্ত্রান্তর্গত দেশসমূহের একটি অর্থনৈতিক বৈঠকে এবং নয়া দিল্লীতে, এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যের ব্যাপার-সংক্রান্ত সদস্য-সমিতির (Commission on Assian and Far Eastern Affairs) প্রথম অধিবেশনে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা এবং তাহার ফলাফলের সম্যক আলোচনা হইয়াছিল। অভিজ্ঞ পাঠক অবশ্য অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, সম্মিলিত জাতি-গঠনের অর্থনৈতিক-বিভাগ-সঙ্কলিত, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের নিখিল জগতের অর্থনৈতিক বিবৃতি অনুযায়ী সমগ্র জগতের শ্রমশিল্পজাত উৎপাদনের পরিমাণ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ৭৫ অংশ অধিক হইয়াছিল। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত চারিটি খৃষ্টাব্দের গড়ের তুলনায়, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে নিখিল-জগতের খাদ্য উৎপাদন শতকরা ১০ অংশ অধিক হইয়াছিল। কিন্তু, গত কয়েক বর্ষে, সমগ্র জগতের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ অংশ বৃদ্ধি পাওয়াতে মাথাপিছু খাদ্যের উৎপাদন, যুদ্ধ-পূর্ব্ব পরিমাণের তুলনায় কম হইয়াছিল,—বিশেষতঃ এশিয়া মহাদেশে। মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি সংশাসনের ফলে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরে এই সময়ে অবশ্য বহুবিধ বিধি-নিষেধ প্রচলিত ছিল।

সম্প্রতি যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, নিখিল-জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল শতকরা ২ হইতে ৩ অংশ। সমগ্র এশিয়া মহাদেশের অংশ ছিল শতকরা ১১ হইতে ১৫ অংশ। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ অবশ্য বৈদেশিক উদ্যোক্তাদের হস্তে। তাহার কারণ এই যে, মালবাহী জাহাজের অধিকাংশই বৈদেশিক বণিকদের অধিকারে। ভারতের বহির্ভাগে, বিভিন্ন দেশে, তাহাদের গোমস্তাখানা ব্যবস্থিত (Agencies) আছে; সুতরাং, তাহারা সহজেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃষ্টাংশ আয়ত্ত করে। দেশবাসীর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং যত শীঘ্র সম্ভব, ভারতীয় মালবাহী-জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্ব্বক, ভারতীয় পোত-প্রতিষ্ঠান-গুলির বহিঃসমুদ্রে মালপরিবহন সামর্থ্যের প্রসার সাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। গত ১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভারতের স্বাধীনতার ফলে, আমাদের দেশে, যে-অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাহার বিবৃতি ভারতে অধিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য-প্রতিনিধির বিবৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্য বিষয়ক অর্থনৈতিক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল (Overseas Economic Survey of India), তখন ভারতে পরিবর্ত্তনের যুগ চলিতেছিল; এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অপরিস্ফুট ছিল। তৎপরে অবশ্য ভারতের রাষ্ট্র সংগঠন বিধান প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি ছিল অশাসনীয়। মূল্যস্ফীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, উৎপাদন হ্রাস পাইতেছিল, এবং আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে ভারতের ঘাটতি ঘটিতে-

ছিল। বর্ত্তমান বিবৃতিতে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধি স্বীকার করিয়াছেন যে, মূল্যস্ফীতি শাসন-সংযত হইয়াছে, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, কৃষি সংক্রান্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু বিবিধ ফলপ্রদ উপায় অবলম্বিত হইতেছে, খাদ্য-দ্রব্যের অভাব অনটন প্রশমিত হইয়াছে; এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য জমাখরচে ঘাটতির অঙ্ক হ্রাস পাইয়াছে। বস্তুতঃ—ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিগত পঞ্চবর্ষের তুলনায় উন্নত হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আলোচনা করিব।

বিগত তিন আর্থিক বৎসরের প্রথমার্দ্ধের সংখ্যা সঙ্কলন হইতে আমাদের বিমান ও সমুদ্রবাহী বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও পরিমাণের কিছু আভাস পাওয়া যাইবে :—

আমদানী
(এপ্রিল হইতে-সেপ্টেম্বর)

দেশ	মূল্য (লক্ষ মুদ্রা)		
	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২
যুক্তরাজ্য	৬০৬৫	৭৪০০	৭২০০
যুক্তরাষ্ট্র	৬৪৯০	১০০০০	১৩০৩০
ক্যানাডা	৬৯০	৮৯০	২১২০
অষ্ট্রেলিয়া	১৮৪০	৮৩০	৭৩০
আর্জেন্টাইনা	(সামান্য)	৩০	(সামান্য)
ফরাসী	৪২০	৫৮০	৭০০
সুইজারল্যান্ড	৩৩০	৫১০	৪০০
জার্মানী	৩৭০	১০৪০	১১৭০
ইটালী	৩৯০	১২০০	৫১০
বেলজিয়াম	৬১০	৪৭০	৫৮০
হল্যান্ড	৩১০	৪৪০	৫৮০
সুইডেন	২৮০	৩৩০	২৩০
মিশর	১৫৮০	২৪০০	৬৮০
ইষ্ট আফ্রিকা	১৪৭০	১৬১০	১৩০০
ইরাণ	২১০০	২০২০	১৪০
পাকিস্থান	৩৪০	৮৩০	১০
সিংহল	৯০	২১০	২৪০
বর্মা	৭১০	১১৫০	১১৭০
সিঙ্গাপুরের সহিত মালয়	৮৫০	১১৮০	৭১০
জাপান	৪০০	১১৮০	৯৫০
শ্যাম	১৫০	৭২০	৬৭০
পর্ত্তুগীজ-ইষ্ট আফ্রিকা	১৫০	১১০	২৪০

রপ্তানী
(এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর)

দেশ	মূল্য (লক্ষ মুদ্রা)		
	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২
যুক্তরাজ্য	৫১৬০	১০১০০	৫৩১০
যুক্তরাষ্ট্র	৪৪৬০	৬৮৪০	৫৭৫০
ক্যানাডা	৫৮০	১০০০	৬৫০
অষ্ট্রেলিয়া	১৩৫০	২৫৪০	১১৭০
আর্জেন্টাইনা	৩৭০	১৪৪০	১০
ফরাসী	১৩০	৭৩০	২৬০
সুইজারল্যান্ড	৪০	৮০	৩০
জার্মানী	২২০	৩৯০	৫৮০
ইটালী	১৮০	৩৬০	৬৪০
বেলজিয়াম	২৩০	৪৪০	৩২০
হল্যান্ড	৩০০	৪০০	৬১০
সুইডেন	৯০	১৪০	৯০
মিশর	২৪০	২৩০	৩১০
ইষ্ট আফ্রিকা	৪২০	৬৭০	৭০০
ইরাণ	২০০	৩১০	১১০
পাকিস্থান	৮৭০	৬৭০	১১৭০
সিংহল	৭২০	৭৩০	৮৫০
বর্মা	৫৭০	৯২০	১৩৮০
সিঙ্গাপুরের সহিত মালয়	১০৬০	৮৮০	১০২০
জাপান	১৩০	১০৭০	১৫৭০
এডেন	৪২০	২৪০	৫৫০
	—	—	—

যদিও যুক্তরাজ্য অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; তথাপি যুক্তরাজ্যের সহিত আমাদের দুইশত বৎসরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। গত দুই খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের সহিত আমাদের আদান-প্রদানের অবস্থা এইরূপ ছিল :

আমদানি (কোটি মুদ্রা)

	১৯৫১	১৯৫২
সর্ববিধ পণ্য	২০৪·৫২	১৫২·৭৩
(তন্মধ্যে)		
চা	৫৯·২০	৬৪·৯৭
পাট, প্রস্তুত দ্রব্য	৩৩·৯৮	১৭·৬৭
বীজ, বাদাম, তৈল প্রভৃতি	৯·৫১	৮·১৯
চর্ম্ম ও তৎনির্ম্মিত দ্রব্যাদি	২৬·৩৮	২২·৩৭

রপ্তানী (কোটি মুদ্রা)

	১৯৫১	১৯৫২
সর্ববিধ পণ্য	১৫৩·৫৮	১৪৯·৫৩
(তন্মধ্যে)		
যন্ত্রপাতি	৪৫·৪২	৪৭·৫০
যান ও পোত	৩০·৪৬	২২·৪৩
বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি	১০·৬৯	১৫·১৮
রাসায়ণিক দ্রব্য ভেষজ ও রং	১৫·৩৯	১০·২৮

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত যুক্তরাজ্যের আদান-প্রদানের একুন মূল্য হইয়াছিল ৩০২'৬৬ কোটি মুদ্রা; ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই সমষ্টির পরিমাণ ছিল ৩৫৭'৩৩ কোটি টাকা। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে এই অঙ্কের পরিমাণ ছিল, মাত্র ২৬০ কোটি টাকা। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে বৃটেন হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছিল ১৪৯'৫৩ কোটি টাকার পণ্য।

তৎপূর্ব্ব বৎসরের ১৫৩'৫৮ কোটি মূল্যের তুলনায়— শতকরা ২ অংশ কম। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমদানী পণ্যের অঙ্ক সমষ্টি ছিল ১৩৯'৩৩ কোটি টাকা। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে প্রেরিত রপ্তানী-পণ্যের একুন মূল্য হইয়াছিল ১৫৩'৫৮ কোটি টাকা। তৎপূর্ব্ব বৎসরের ২০৪ কোটির তুলনায় শতকরা ২৪ অংশ কম। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে প্রেরিত পণ্যের মূল্য হইয়াছিল মাত্র ১৩০'৬৬ কোটি টাকা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বৃটেন কর্ত্তৃক সর্ব্বদেশে প্রেরিত পণ্যের শতকরা ৪'৩ অংশ লইয়াছিল ভারত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরেই আমরা লইয়াছিলাম সমগ্র বৃটিশ রপ্তানী-পণ্যের শতকরা ৪'৪ অংশ। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশপণ্যের ক্রেতৃবর্গের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল পঞ্চম, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে একধাপ নামিয়া ভারত অধিকার করিয়াছিল ষষ্ঠস্থান। পক্ষান্তরে, যুক্তরাজ্যে পণ্য-সরবরাহকারী দেশ-সমূহের মধ্যে ভারতের স্থান তৎপূর্ব্ব বৎসরের পঞ্চম হইতে, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে, সপ্তমে পরিগণিত হইয়াছিল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আমরা বৃটেন হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়াছিলাম শতকরা ৫ অংশ অধিক, অর্থাৎ ৪৫'৫৫ কোটির তুলনায় ৪৭'৫০ কোটি টাকা।

বর্ত্তমান ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম তিন মাসে আমাদের সমুদ্রবাহী-বাণিজ্যের পরিমাণ হইয়াছিল মাসিক ৮৪ কোটি টাকা। গত খৃষ্টাব্দের প্রথম তিন মাসে এই অঙ্কের পরিমাণ ছিল, মাসিক ৮৭ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ সমান ছিল; অর্থাৎ প্রত্যেকটি ৪২ কোটি টাকা। সঠিক সংখ্যা-সঙ্কলনে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যাহা হউক, ১৯৫২-৫৩ আর্থিক খৃষ্টাব্দে, আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের আয় গত আর্থিক খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৫৯ কোটি টাকা কম হইয়াছিল। প্রধানতঃ, পাট ও চা—এই দুই পণ্যের স্বল্পতা হেতু এই অধোগতি ঘটিয়াছিল। পাটের অংশের স্বল্পতার পরিমাণ হইয়াছিল ১৪০ কোটি টাকা এবং চা-এর অংশের খর্ব্বতার পরিমাণ ৭ কোটি টাকা। রপ্তানী লব্ধমূল্যের হ্রাস সত্ত্বেও অন্যান্য পণ্যক্ষেত্রে মোটের উপর রপ্তানীমূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। ইহাতে অনুমিত হয় যে, রপ্তানীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাথুরিয়া কয়লা, কেওদানা, ম্যাঙ্গানীজ মলধাতু (Ore), চীনা বাদাম, রেড়ীর তেল, এবং কাঁচা কার্পাস ও পশম পণ্যে রপ্তানি আয় পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৯৫২-৫৩ আর্থিক খৃষ্টাব্দে অধিকতর হইয়াছিল। গত আর্থিক খৃষ্টাব্দের তুলনায়, ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে, ভারত হইতে পাট প্রস্তুত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ হইয়াছিল মাত্র ৭০৫,০০০ টন, অর্থাৎ ১০০,০০০ টন কম। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে এরূপ অবনতি পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। কিন্তু, একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ২৫৪,০০০ টনের তুলনায়, ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে ডলার এলাকায় আমরা পাঠাইয়াছিলাম ৩০৪,০০০ টন পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি। পাট-প্রস্তুত দ্রব্যের চাহিদা প্রতি বৎসর সমান থাকে না। অর্থ-নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে উন্নত ও অনুন্নত, উভয়বিধ দেশে, পাট-প্রস্তুত দ্রব্যের চাহিদা নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইবে। পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোনবিধ তন্তুর (Fibre) ব্যবহার, কিংবা প্রতিযোগিতা-আমাদের এই ব্যবসায়ের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সম্ভবযোগ্য ক্ষেত্রে, রপ্তানী লাইসেন্সের কিছু-কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় পাটকল সমিতি ও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত এ বিষয়ে সরাসরি বাণিজ্য-সংস্পর্শ (Contacts) সংস্থাপনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এ প্রচেষ্টার ফলও ভালই হইতেছে। কাগজ এবং কার্পাস; কিংবা ভারী বোঝাই প্রথার প্রবর্ত্তন সত্ত্বেও, পাটের থলের আদর কখনও কম হইবে না। সুতরাং,পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের অযথা বিচলিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। শিল্প-বাণিজ্যে সাময়িক তেজী-মন্দী অবস্থা স্বাভাবিক। আমাদের বাণিজ্য-সচিব রপ্তানী-বাণিজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের প্রয়াস পাইতেছেন এবং এ বিষয়ে ভারতীয় বণিক-সমিতি সঙ্ঘকে তাঁহাদের আশ্রিত এবং অনাশ্রিত সর্ব্ব শিল্পী-বণিক-সমিতির সহযোগে একটি রপ্তানী-বিভাগের প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতী বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির নিমিত্ত কয়েকটি বিধি-নিষেধের

কঠোরতা হ্রাস করিয়াছেন। এ বিষয়ে, আমাদের সূতী বস্ত্র ক্রয়কারী দেশ-সমূহে অনুসন্ধানের ফলে, এই পণ্যের রপ্তানীকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যেন তাঁহারা চালানীকৃত মালের দোষ-গুণ এবং গাঁটুরি-বাঁধার সৌকর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ব্যবসায় বৃদ্ধি করিতে হইলে পণ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ক্রেতার নিকট আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। চা-শিল্পে, সম্প্রতি মূল্য হ্রাসের ফলে, কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। সে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজ্যে মজুত মালের হ্রাস ঘটিয়াছে; সুতরাং সে ক্ষেত্রে আমাদের চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু, সেই হেতু, খুসী মনে, শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন কারণ ঘটে নাই। বরং, মার্কিন-চা-ব্যবসায়ীদিগের সাহচর্য্যে ও সহযোগিতায় চা-কাটতির প্রসার বৃদ্ধি বিষয়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ সম্প্রতি য়ুরোপের অন্যান্য দেশে প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থায় বিদেশ-পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কলের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের ন্যায়, হাতের তাঁতে-প্রস্তুত বস্ত্রাদির রপ্তানীও বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। মূল্যাধিক্যই, অবশ্য, এই বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় ছিল। যে সকল দেশ বহু-দিন হইতে আমাদের হাতের তাঁতে-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছিল, তাহারাও সম্প্রতি আমদানি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত কয়েকটি বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই রপ্তানী-বাণিজ্যের পুনঃ প্রসার কল্পে বাণিজ্য-পরিব্রাজক (Commercial Travellers) নিযুক্ত করিবার, এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র (Emporia) সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবলমাত্র হাতের তাঁতে-প্রস্তুত বস্ত্রাদি নহে, আমাদের দেশের হাতের তৈয়ারী সর্ব্ববিধ শিল্প-কর্ম্মের রপ্তানী বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারতীয় হস্ত-শিল্পকর্ম্ম পরিচালন-মণ্ডলীর (All-India Handicrafts Board) পরামর্শানুযায়ী যথাবিহিত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি রপ্তানী-তদ্বিরকারী সংগঠনের কল্পনা হইয়াছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রে, আমাদের দেশের হস্ত-বিনির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যের বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয়, ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ আলোচনা ঘটিয়াছে।

অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রধাণতঃ ডলার-এলাকা ও ষ্টার্লিং-এলাকা—এই দুই শ্রেণীভুক্ত দেশের সহিত। মার্কিন ডলার-শাসিত দেশসমূহ ডলার-এলাকা এবং বৃটিশ ষ্টার্লিং মুদ্রা শাসিত দেশসমূহ ষ্টার্লিং-এলাকা। বৃটিশ রাজ্ঞীর নেতৃত্বাধীন সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ এই শেষোক্ত এলাকার অন্তর্গত। ভারত ষ্টার্লিং-এলাকাভুক্ত; আমাদের চলতি মুদ্রার মান ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্য-নিরিখে নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং ষ্টার্লিং-এলাকার সহিত আমাদের কায়-কারবারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পশ্চাতে, বৃটেনের শিল্পোৎপাদন-শক্তি-সামর্থ্য বহুল পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। এই হেতু ডলার-এলাকার সহিত আমাদের কায়কারবার বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু, আমাদের চলতি মুদ্রার বিনিময়ে, ডলার মুদ্রালাভ সহজসাধ্য নহে। বৃটেনের নিকট গচ্ছিত আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে আমরা প্রয়োজনানুরূপ ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারি না। এই হেতু বর্ত্তমানে শিল্পোন্নয়ন সাধনার্থ আমাদের যে-সকল যন্ত্রপাতি কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম এবং আমাদের দেশে অপ্রাপ্য, অথচ আমাদের আশু অতীব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারি না। সুতরাং শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে, আমাদের কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। যুক্তরাজ্যের ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক,—যে, আমাদের ষ্টার্লিং সংস্থিতি হইতে আমরা যে অর্থ ব্যয় করি, সে অর্থ বৃটিশ-পণ্য ক্রয়ের দ্বারা বৃটেনের অভ্যন্তরে বৃটিশ জাতির কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এখনও আমরা বৃটিশ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ক্রেতা। অবশ্য, বৃটেনের সহিত আমাদের সুদীর্ঘ দ্বিশত বর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু এরূপ ব্যবস্থা অসমীচীন নহে। তথাপি, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বৃটেনের এই অভিপ্রায় সিদ্ধিহেতু আমাদিগের শিল্পোন্নয়ন প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। যাহা হউক, ১৯৫২-৫৩ আর্থিক, খৃষ্টাব্দে, ডলার-এলাকায় প্রেরিত আমাদের রপ্তানী

পণ্যের একুন মূল্য হইয়াছিল ১৩৭'৬৫ কোটি টাকা ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে এই অঙ্কের পরিমাণ ছিল, ১৮'৬৫ কোটি টাকা। আলোচ্য বর্ষে, অন্যান্য চলতি মুদ্রা থকে আমাদের রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট মূল্য হইয়াছিল,—১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ৫৫৮'০৫ কোটির তুলনায়—৪৩১,৯৩ কোটি টাকা। এই রপ্তানী বাণিজ্যে আমাদের প্রধানতম পণ্য ছিল পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি। ডলার-এলাকা লইয়াছিল ২৭'৯৩ কোটি টাকা মূল্যে—৩০৪,৬০০ টন এবং অন্যান্য এলাকা লইয়াছিল ৭১'৬৭ কোটি টাকা মূল্যে ৪০৫'২৯০ টন। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে, যখন পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য অধিকতর ছিল, তখন ডলার-এলাকা লইয়াছিল ৮৭'৩০ কোটি টাকা মূল্যে—২৫৪,৪০০ টন এবং অন্যান্য এলাকা লইয়াছিল ১৮৩'০৮ কোটি মূল্যে ৫৫২, ৩০০ টন। পাটের পরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল—চা। বিগত আর্থিক বর্ষে, আমরা চা চালান দিয়াছিলাম ৮১ কোটি টাকা মূল্যে—৪২৭,৭০০০০ পাউণ্ড। ইহাতে ডলার-এলাকার অংশ ছিল ১০'২০ কোটি টাকা মূল্যে ৫২ মিলিয়ান পাউণ্ড। ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে আমরা সূতী-বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছিলাম ৬১'৮৮ কোটি টাকা মূল্যে—৬১৪,৩০০,০০০ গজ। ইহার অধিকাংশই গিয়াছিল ডলার-এলাকার বহির্ভাগে। ডলার-এলাকা লইয়াছিল মাত্র ৪,৩০০,০০০ গজ,—৫৮ লক্ষ টাকা মূল্যে। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে আমাদের সূতী-বস্ত্রের রপ্তানীর পরিমাণ হইয়াছিল ৪২৭,৪০০,০০০ গজ,—৫২.২০ কোটি টাকা মূল্যে। তন্মধ্যে ডলার-এলাকা লইয়াছিল মাত্র ৩৩,২০০,০০০ গজ, ৩'৩৭ কোটি টাকা মূল্যে। গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে, অন্যান্য পণ্যে আমাদের সাগরপারের চালানের পরিমাণ ছিল এইরূপ। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পশু চর্ম্ম,—২০'৫১ কোটি টাকা মূল্যে,—২৪,৩০০ টন; ম্যাঙ্গানীজ মলধাতু,—২০'৬৯ কোটি টাকা মূল্যে ১,৩৫৭,৮০০ টন। কাঁচা কার্পাস,—১৯'৩২ কোটি মূল্যে, ৭০,৮০০ টন। লঙ্কা,—১৫'৯৬ কোটি মূল্যে, ২৪৬,২০০ হন্দর। তামাক,—১৫.১৮ কোটি মূল্যে, ৮৩'৬০০,০০০পাউণ্ড। কেশু শাঁস,—১২'০৬ কোটি মূল্যে, ২৭,৪০০ টন। চীনাবাদামের তেল,—১০'৪৬ কোটি মূল্যে, ১,৩৬৫,১০০ হন্দর; এবং পাথুরিয়া কয়লা ১০'৭১ কোটি টাকা মূল্যে ২,৬৮৮,৪০০ টন।

সম্প্রতি নিখিল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পোত-চলাচলের গত মার্চ্চ মাসের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের বাণিজ্য-জমাখরচে ঘাটতির পরিমাণ অনেক কম হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬১ কোটির তুলনায় মাত্র ৮১ কোটি। যদি গত আর্থিক খৃষ্টাব্দের দ্রব্যমূল্য পরিমাণ গত পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য থাকিত, তাহা হইলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও অধিক হইত। পরন্তু, গত আর্থিক খৃষ্টাব্দের একুন বাণিজ্যের পরিমাণও গত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের তুলনায় কম হইয়াছিল। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইবার ইহাও একটি কারণ। অধিকন্তু, মোট রপ্তানী-বাণিজ্যের হ্রাসের অনুষঙ্গে, আমদানী বাণিজ্যের খর্ব্বতা সাধন হেতু ঘাটতির পরিমাণও ন্যূন হইয়াছে। গত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ৮৬২ কোটি মূল্যের আমদানীর স্থলে গত ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের আমদানী পণ্যের একুন মূল্য হইয়াছিল ৭০১ কোটি টাকা। গত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের খাদ্যদানা আমদানী মূল্য ২২৮ কোটির তুলনায় গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে খাদ্যদানা আমদানীর পরিমাণ হইয়াছিল—১৫৩ কোটি টাকা। কার্পাস তুলার আমদানীও ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ১৩৬ কোটির তুলনায় ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে উক্ত পণ্যের আমদানীর একুন অঙ্ক হইয়াছিল ৭৭ কোটি টাকা। যুদ্ধোত্তর ভারতের এই দুইটি প্রধান পণ্যের আমদানী হ্রাস (মোট ১৩৪ কোটি) অবশ্য লাভজনক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, ঐরূপ দুইটি গুরু পণ্যের রপ্তানী-হ্রাস আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। চা-এর রপ্তানী যদিও ৪২৫$\frac{1}{2}$ মিলিয়ন পাউণ্ডের তুলনায় ৪২৩$\frac{1}{2}$ মিলিয়ন, অর্থাৎ মাত্র দুই মিলিয়ন পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল; তথাপি চা-য়ের মূল্য হ্রাস হেতু, ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি টাকা। পাটের রপ্তানীর পরিমাণ তৎপূর্ব্ব বৎসরের ২৮০ কোটির তুলনায় গত বৎসর ১২'৯ কোটিতে অবনমিত হইয়াছিল। চায়ের মূল্য হ্রাসের তুলনায় পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছিল গুরুতররূপে। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের

৮০৭,৭৮৭ টনের তুলনায়, পাটের রপ্তানী কমিয়াছিল ৭০৬,৮৪৫ টনে। অবশ্য, ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের ৬৫০,৩৭০ টনের তুলনায় কম নহে। সুতি বস্ত্রাদির রপ্তানী, গত পূর্ব্ব বৎসরের ৪২৩ মিলিয়ন গজের তুলনায়, গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে ৬১৪ মিলিয়ন গজে উন্নীত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যুক্তরাজ্য ভারত হইতে সুতি-বস্ত্রের আমদানী একপ্রকার বন্ধ করিয়াছে। সন্তোষের কারণ অবশ্য এই যে, ইতিমধ্যে, মধ্যপূর্ব্ব (Middle East) এবং এশিয়ার অন্তর্গত জেলাসমূহে আমাদের সুতি-বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য তন্তু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি (Textiles) এবং পশমের রপ্তানীও গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মোট মূল্যের অঙ্ক ৪ কোটি হইতে ১০ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। মল মিশ্রিত, অর্থাৎ অসংস্কৃত ধাতু (Metal Ores) এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদি (Minerals) ১২ কোটি হইতে ৪১ কোটিতে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল। খনি-মুক্ত মল-মিশ্রিত লৌহ (Iron ore), সবজী ঘৃত (Vegetable oils) এবং বিভিন্ন তৈলের রপ্তানী অল্প-বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, তৈলবীজ (Oilseeds) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চর্ম্ম এবং পাত-গালার (shellac) রপ্তানীও হ্রাস পাইয়াছিল। লক্ষ্যের বিষয়, পাথুরিয়া কয়লা ও পোড়া কয়লার রপ্তানী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি অপ্রধান বিষয়েও, যথা, লৌহ-পিত্তলাদি-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি, জীবজন্তু, ফল ও উদ্ভিজ্জ, হাড়, জুতা এবং টাদির রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে; ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮ মিলিয়নের তুলনায়, ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬১ মিলিয়ন দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে, আমরা বিদেশ হইতে খাদ্যদানা এবং কার্পাসের আমদানী কম করিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের ১৩৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হইয়াছিল। আরও কয়েকটি পণ্যে আমরা গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে, আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়াছিলাম। কার্পাস, রেশম ও পশম ব্যতীত, অন্যান্য তন্তু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাষ্ঠ ও গুড়ি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ও ঔষধ, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি, লৌহ-পিত্তলাদি-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কারিগরি যন্ত্রপাতি, রং ও রঞ্জন দ্রব্যাদি, এবং কল-কব্জা ও যানবাহন। তন্তু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ১০ কোটি হইতে, মাত্র এক কোটিতে; কাষ্ঠ ও গুড়ি, ৫½ হইতে মাত্র দুই; রাসায়নিক এবং ভেষজ দ্রব্যাদি ও ঔষধাদি ৩৬ হইতে ২৫; ছুরি, কাঁচি ও লৌহপিত্তলাদি নির্ম্মিত দ্রব্য ২০ হইতে ১৪ কোটিতে অবনমিত হইয়াছিল। রং ও রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী হ্রাসের পরিমাণ হইয়াছিল ৯ কোটি; এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে ৬ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ধাতব ব্যতীত খনি-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, তৈল, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ, সামরিক দ্রব্য সম্ভার, লৌহ ও ইস্পাৎ এবং তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এবং বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদির আমদানী কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খনি সংক্রান্ত দ্রব্যাদিতে বৃদ্ধির পরিমাণ হইয়াছিল ৪ কোটি টাকা; তৈলে ২ কোটি; বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রোপকরণে ৩½ কোটি এবং লৌহ ও ইস্পাতে, ২ কোটি টাকা।

গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে (১৯৫২-৫৩) বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত দেশসমূহ, তৎপূর্ব্ব দুই বৎসরের তুলনায় ভারতে কম পণ্য বিক্রয় করিয়াছিল; এবং ভারত হইতে ক্রয় করিয়াছিল কম পণ্য। এই সকল দেশ হইতে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের তুলনায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস অধিকতর হইয়াছিল। সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত দেশ সমূহ হইতে আমাদের আমদানীর পরিমাণ, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮৯ কোটির তুলনায় দাঁড়াইয়াছিল ২৬২ কোটি। যুক্তরাজ্য হইতে আমাদের আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল ২০ কোটি; সুদান হইতে ১০ কোটি পরিমাণ; এবং অষ্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুর হইতে ৫ কোটি পরিমাণ। গত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের তুলনায় গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে ক্যানাডা ভারতে বিক্রয় করিয়াছিল, ১০ কোটি অধিক মূল্যের পণ্য; এবং বাহরেন দ্বীপপুঞ্জ,—৭½ কোটি অধিক মূল্যের পণ্য। আলোচ্যবর্ষে ক্যানাডা ভারত হইতে লইয়াছিল ৩½ কোটি কম মূল্যের পণ্য। অর্থাৎ ক্যানাডা হইতে আমাদের আমদানী হইয়াছিল আমাদের রপ্তানী অপেক্ষা অধিক। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রেরিত আমাদের পণ্যের মূল্য হইয়াছিল ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ৪৭ কোটির তুলনায় মাত্র ১৭ কোটি এবং গত পূর্ব্ব

খৃষ্টাব্দের তুলনায়, গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য আমাদের দেশ হইতে ক্রয় করিয়াছিল ৬৬ কোটি কম মূল্যের পণ্য। সাধারণ তন্ত্রের বহির্ভূত জেলা সমূহের মধ্যে গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত পণ্যের মূল্য, ১৯ কোটি পরিমাণ; এবং আর্জেন্টাইনে প্রেরিত পণ্যের মূল্য ১১ কোটি পরিমাণ কম হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রেরিত পণ্যের মূল্য ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮৭ কোটির তুলনায় ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ১৮৭ কোটি টাকা। মিশর হইতে আমরা গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে আমদানী করিয়াছিলাম তৎপূর্ব বৎসরের তুলনায় ২৫ কোটি কম মূল্যের পণ্য; এবং জাপান হইতে ৯ কোটি কম মূল্যের পণ্য। গত আর্থিক খৃষ্টাব্দে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল সিংহল, বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, এডেন, পশ্চিম জার্ম্মানী, নেদারল্যাণ্ডস্ (হল্যাণ্ড), ইটালী এবং জাপানে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল জাপানে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের ১৪ কোটির তুলনায় ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ কোটি টাকা।

ভারতের বহির্ভাগে আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার প্রচেষ্টার বিষয় অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্কে আমরা সম্প্রতি সুদূর এবং মধ্য প্রাচ্য এবং য়ুরোপের অন্তর্গত কোন কোন দেশ হইতে, আশাপ্রদ সংবাদ পাইয়াছি। দক্ষিণে, সন্নিকটবর্ত্তী সিংহলের সহিত ভারতের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সিংহল আমাদের দেশে প্রস্তুত ঔষধাদির (Pharmaceutical products) প্রশস্ত বিক্রয় ক্ষেত্র। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত, একাদশ মাসে, সিংহল ৬৫ লক্ষ টাকার পেটেন্ট ঔষধ এবং ৬০ লক্ষ টাকার অন্যান্য ঔষধাদি আমদানী করিয়াছিল। তন্মধ্যে, ভারতের অংশ ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকা। ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করিলে সিংহল আমাদের দেশে প্রস্তুত ঔষধাদি অধিকতর পরিমাণে লইবে,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের ভৌগোলিক পরিধির অন্তর্ভুক্ত, ভারতের অঙ্গীভূত, কিন্তু বর্ত্তমানে বৃটিশ কূটনীতির ফলে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন। পূর্ণ-স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক বর্ম্মার সহিত আমাদের বহু প্রাচীন ছন্দেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং স্বভাবতই বর্ম্মার সহিত বাণিজ্য বিষয়ে ভারত রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের আলাপ-আলোচনা চলে কার্য্য পরিচালক আমলাগণের মারফতে; —কিন্তু বর্ম্মার সহিত আলাপ-আলোচনা পরিচালিত হয় আরও উচ্চস্তরে, অর্থাৎ, মন্ত্রী-পরস্পরে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, চারি বৎসরের জন্য, একটি চুক্তি পত্র বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ম্মা হইতে আমরা চিরদিনই প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী করি। শ্রীযুক্ত মুনসী, একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউলের বিনিময়ে, চটের থলে, বাদাম তৈল, কার্পাস নির্ম্মিত সূত এবং লৌহ ও ইস্পাৎ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ম্মা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, একমাত্র চটের থলে ব্যতীত অন্য কোন পণ্য তাহারা অন্য দেশে চালান দিবে না। রপ্তানী ও আমদানী লাইসেন্স সম্পর্কেও উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের সহিত, অন্যান্য সহজে প্রাপনীয় বিনিময় মুদ্রালভ্য দেশের (Soft currency countries) ন্যায়, অতি অনুকূল ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের দেশে চাউলের স্বাচ্ছল্য ঘটিয়াছিল। ইতিমধ্যে ভারতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু আমরা আমদানি কিছু হ্রাস করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি, বর্ত্তমান খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কিদোয়াইয়ের সহিত দর লইয়া কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পুনরায় একটি অধিকতর পরিমাণে পণ্য বিনিময়ের চুক্তিপত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পাঠাইব চটের থলে, বাদাম তৈল, কার্পাস সুতা এবং লৌহ ইস্পাৎ নির্ম্মিত দ্রব্য। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে, নিউজীলাণ্ড দেশে, আমাদের দেশে প্রস্তুত তাঁতের কাপড, বুটা দেওয়া পর্দ্দার কাপড়, রেশম ও কিংখাপ, হস্তে প্রস্তুত জরি, ফিতা প্রভৃতি, জরি-নির্ম্মিত হাতথলে, টিনে রক্ষিত পেয়ারা এবং আম্র, মেঝে ঢাকা গালিচা, ছুলিচা, শতরঞ্চি প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। এডেনে, আমাদের দেশের কাঠের তৈয়ারী গৃহসজ্জা এবং সৌদি-আরবে ভারতে নির্ম্মিত কয়েক প্রকার দ্রব্যের বিক্রয় চলিতেছে। ১৯৫১

খৃষ্টাব্দে প্রথম নয় মাসের তুলনায় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের প্রথম নয় মাসে আফগানিস্থান হইতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত রপ্তানী-পণ্যের পরিমাণ কম হইয়াছিল। ফলে, ঐ কালে আফগানিস্থানের ডলার মুদ্রালাভের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রপ্তানী বাণিজ্যে-লব্ধ ডলার মুদ্রা দ্বারা আফগানিস্থান, জাপান হইতে, বস্ত্র ও সবুজ চা ক্রয় করিত। এই সুযোগে, আফগানিস্থানে এই দুইটি পণ্যের অধিকতর রপ্তানী দ্বারা ভারতের পক্ষে আফগান-বাজারে তাহার প্রাধান্য রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত, ভারতের পক্ষে আফগান বাজারে মেজের আচ্ছাদন লাইনোলিয়ম বস্ত্র; বিড়ি এবং সিগারেট-চুরুট বিক্রয় করিবার বিশেষ সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে। নরওয়ে দেশ হইতেও ভারতীয় দ্রব্য ক্রয়ের আগ্রহান্বিত অনুসন্ধান আসিয়াছে। এই হেতু, ঐ দেশে ভারতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটি ভাণ্ডার খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার হইতে সূতি বস্ত্র, রেশম এবং কৃত্রিম রেশম বিক্রয়েরই বিশেষ সুবিধা ঘটিবে। চা, লঙ্কা, সবজী তৈল এবং লাক্ষা বিক্রয়ের ক্ষেত্রও নরওয়ে দেশে প্রশস্ত। সম্প্রতি তুরস্কের সহিত আমাদের একটি বাণিজ্য চুক্তি ঘটিয়াছে। ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে আমরা তুরস্কে পাঠাইয়াছিলাম ১৫ কোটি টাকা-মূল্যের রপ্তানী পণ্য এবং আমরা আমদানী করিয়াছিলাম, ৮৩ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি। বর্ত্তমান চুক্তির ফলে, তুরস্ক আমাদের নিকট হইতে লইবে চা, পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ির খেই, মোটর টায়ার এবং টিউব (নল), রবার-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, মসলা, ডাক্তারী রেড়ীর তেল, সূতী বস্ত্রাদি। আমরা সেখান হইতে আনিব শুষ্ক ফল, মোটা শস্যদানা, বীজ ও মটর কলাই ইত্যাদি, পারদ, মোম, চামড়া তৈয়ারীর নিমিত্ত ওক্ বৃক্ষের ফল, বীজ ও কষায়, কাঁচা কার্পাশ, রেশমের সূতা ও গুটি। এই আদান প্রদানের নিমিত্ত উভয় দেশের মধ্যে জাহাজ-চলাচলের সুবন্দোবস্ত হইবে। ইরাকের সহিতও আমাদের একটি বাণিজ্য-চুক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা প্রায় সর্ব্ব-প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য সেখানে পাঠাইব এবং আমরা সেখান হইতে লইব, অশ্ব, অশ্বতর, খেজুর, মাজুফল বিবিধ শস্য-দানা, লম্বা আঁস কার্পাস এবং হাল্‌কা ছোট-বড় চামড়া। আমাদের উত্তর প্রান্তস্থ তিব্বতের সহিত, গত কয়েক বৎসর আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাচীনের আধিপত্য বিস্তারের পশ্চাতে, তিব্বতে পশমের উৎপাদন হ্রাস পায় নাই এবং তথা হইতে ঐ পণ্যের আমদানী অব্যাহত আছে। যুগোশ্লোভিয়া দেশের সহিতও আমাদের সম্প্রতি একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আমরা সেখানে পাঠাইব পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, নারিকেল ছোবড়ার দড়ি প্রভৃতি, সূতি বস্ত্রাদি, বিশুদ্ধ তৈল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সেলাই কল, রবার টায়ার ও টিউব এবং চা। আমরা সে দেশ হইতে আনিব, চা সিন্দুক, কার্ব্বন ব্লাক, লিথোফোন, বিস্ফোরক পদার্থ, বয়ন ও চর্ম্ম শিল্পার্থ রাসায়নিক পদার্থ, ঔষধাদি, ফেরোক্রোম, ধাতুকর্ম্মনিমিত্ত এবং ইমারৎ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি। হিন্দুস্থানের অঙ্গ-বিচ্ছিন্ন পাকিস্থানের সহিত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ বাণিজ্য-চুক্তি সম্প্রতি সম্প্রসারিত হইয়াছে। অন্যান্য পণ্যের সহিত পাট ও পাথুরিয়া কয়লা আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি রুশিয়ার সহিতও আমাদের একটি কার্য্যকরি বানিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

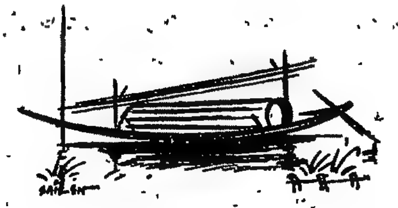

পাশ্চাত্যে ভারতের সংস্কৃতিদূত উদয়শঙ্কর

শ্রীপ্রীতি চক্রবর্ত্তী

জীবনের স্মৃতির খাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ১৯৪৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখটি। ঐ দিন বর্ত-মান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্য-সঙ্গিনীরূপে আমি আর আমার ছোট বোন স্মৃতি বোম্বাই জাহাজে পশ্চিমের পথে পাড়ি দিই। লণ্ডনে আমরা দিন-কতক অবস্থান করি। সেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের কয়েকটি নৃত্যানুষ্ঠান হয়। লণ্ডনের দর্শকমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে আমরা যাত্রা করি আমেরিকার নিউইয়র্কের উদ্দেশে। নিউইয়র্কে কয়েকটি নৃত্যানু-ষ্ঠানের পরই উদয়শঙ্করের প্রশস্তিতে সেখানকার নৃত্য-রসিকেরা শতমুখ হয়ে ওঠেন—তাঁর প্রতিভার জয়গানে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্যে উদয়শঙ্করের সে যেন এক দিগ্বি-জয় যাত্রা—যে সম্মান সে-দেশবাসীর নিকট থেকে উদয়-শঙ্কর লাভ করেছিলেন তার অংশভাগিনী হবার সৌভাগ্য লাভ করে জীবন আমাদের ধন্য হয়ে গেছে। এক একটি নৃত্য প্রদর্শনে বার বার পর্দা উঠেছে, দর্শকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে মৌনভাবে বসে নাচ দেখেছে, নৃত্যশেষে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠেছে তাদের প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনিতে। তারপর আমাদের সম্প্রদায়ের সকলের ছবি তুলবার জন্যে এবং অটোগ্রাফ নেবার জন্যে সে কি প্রচণ্ড উৎসাহ।

উদয়শঙ্কর এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নৃত্য দেখে একদিকে যেমন আমেরিকার সাধারণ দর্শকেরা খুশি হয়েছে, অন্য-দিকে তেমনি জন মার্টিনের মত কলা-সমালোচক, শঙ্কর এবং তাঁর নৃত্যসঙ্গী ও নৃত্যসঙ্গিনীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মিউজিক কণ্ডাকটার টর্কোভিস্কি (ফ্যান্টাসিয়ার মিউজিক ডাইরেক্টর) স্বয়ং ষ্টেজে এসে আমাদের অভিনন্দিত করেছেন। শঙ্কর নিজে যেমন নিপুণ শিল্পী তেমনি তাঁর শিক্ষাদান নৈপুণ্যও অপরিসীম। তাই বিভিন্ন নৃত্যের রূপায়ণে তাঁর দলের অন্যান্য শিল্পীরাও সেখানকার দর্শকদের আনন্দ পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছেন। শঙ্করের শুধু নৃত্যরূপায়ণ নয়, নৃত্য-পরিকল্পনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভারত নাট্যম্, কথাকলি,

নৃত্যস্বন্দ্ব

ভান দিন থেকেঃ স্মৃতি চক্রবর্তী, প্রীতি চক্রবর্তী, গীতা নন্দী, অমলাশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, শঙ্করণ ও রাঘবন্।

কথক, মণিপুরী সব কয়টি ক্লাসিক্যাল নাচেরই আঙ্গিকে তাঁর নৃত্যসমূহ পরিকল্পিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সেগুলো প্রথাগত নয় এবং গতানুগতিকতার ধারাবাহীও নয়। শঙ্করের সৃজনী প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে ক্লাসিক্যাল নৃত্যের মধ্যে যেন নব প্রাণ-চেতনার সঞ্চার হয়েছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যকেও তিনি তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনায় যথাযোগ্য আসন এবং মর্যাদা দান করেছেন। সেই জন্যই উদয়শঙ্করের নৃত্যপরিকল্পনায় আমেরিকা-বাসীরা প্রত্যক্ষ করেছে নৃত্যভারতীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। দক্ষিণ-উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত যাবতীয় নৃত্যকলার নিখুঁত এবং সুষ্ঠু রূপায়ণ।

ভারতীয় নৃত্যকলার সঙ্গে, ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুর-সংযোজনা এবং তবলা তরঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য-

দর্শকদের মনকে তা টেনে নিয়ে গিয়েছিল দৃশ্যমান জগতের অন্তরালস্থিত এক অদৃশ্যলোকে। 'স্নানম্' নৃত্যের কোমল পেলবতা নৃত্য স্বন্দের অপূর্ব অভিব্যঞ্জনা অমলা-শঙ্করের ভরত নাট্যমে নটরাজের আবাহন, ইটার্নাল মেলডি বা শাশ্বত সুরে নরনারীর সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনার অভি-ব্যক্তি। অমলা, স্মৃতি, দীপ্তি গীতা ও 'লেখিকার' সমবেত মণিপুরী রাসনৃত্যে প্রেম-ভক্তির স্বতঃ উৎসারিত রস-প্রবাহে, 'তাণ্ডব নৃত্যে' মুদ্রার সাহায্যে মূক অভিনয়ে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা একদিকে যেমন ওখানকার দর্শকদের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি ভারত-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটিও তাদের বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে। তাই তো শঙ্করকে তারা অভিনন্দিত করেছিল শুধু শ্রেষ্ঠ নৃত্য-

স্নানম

প্রীতি চক্রবর্তী, গীতা নন্দী, অমলাশঙ্কর ও স্মৃতি চক্রবর্তী

যন্ত্রের সমন্বয়ে নৃত্যানুষ্ঠান কালে পাদপ্রদীপের সম্মুখে যুগপৎ যে সুর-লোক ও রূপলোকের সৃষ্টি হত, আমেরিকা-বাসীদের নিকট তা ছিল অভিনব—তাদের দেশে যে ধরণের নৃত্যকলা দেখতে তারা অভ্যস্ত তার থেকে এর জাত আলাদা, ধাত আলাদা। ও দেশের অধিকাংশ নৃত্য নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে সত্য, কিন্তু তার আবেদন অন্ত-র্লোকের গভীরে নয়, পক্ষান্তরে উদয়শঙ্কর পরিবেশিত নৃত্য রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায় অরূপকে—দেহচ্ছন্দে আর লীলায়িত ভঙ্গীতে মূর্ত হয়ে ওঠে রূপাতীতের অমর্ত মহিমা।

জড়বাদী আমেরিকানরা উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্যে প্রত্যক্ষ করেছিল ভারতের আত্মাকে, তার অধ্যাত্ম সত্তার অপূর্ব মহিমাকে। শঙ্করের ইন্দ্র প্রভৃতি বিবিধ নৃত্যে শিল্পীর চরণছন্দে ও শোভন দেহভঙ্গীতে ভারতের চির-ন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শই হয়ে ওঠে রূপায়িত। মার্কিন

শিল্পীরূপে নয়, ভারতের অন্যতম সংস্কৃতি-দূতরূপে।

আমেরিকা জড়বাদী, আমেরিকা অর্থের উপাসক সত্য, কিন্তু সেখানেও তো 'মেসিনগানের সম্মুখে জুঁই ফুলের গান' বেজে ওঠে, মনীষী এমার্সনের রচনায় অনুরণিত হয়ে ওঠে বেদান্তের বাণী, বিবেকানন্দের বাণী থেকে আজো সেখানকার বহু নরনারী লাভ করে শান্তি ও সান্ত্বনা। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতই উদয়শঙ্করও পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক। তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনায় ও পরিবেশনে তারা পেয়েছে ভারতের সেই চিরন্তন আদর্শেরই সন্ধান। নৃত্যরসিক ও নৃত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমঝদার জি ভেঙ্কটাচলম বাস্তবিকই বলেছেন—"He is a great cultural messenger in his own way as the poet Tagore was." অর্থাৎ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় তিনি তাঁর নিজস্বভাবে (ভারতের) একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-দূত।

হাসপাতালের চিঠি

সুশীলকুমার গুপ্ত

এবার চল্লাম আমি।
ডাক্তার, তোমার চেষ্টা কখনো ভুলবো না;
সিষ্টার, তোমার স্বতঃউৎসারিত সেবা
অন্তরে ছড়াবে আলো;
হে বন্ধু, তোমার দেওয়া সরস আপেলগুলি
চিরকাল মনে রবে;
মনে রবে মা তোমার বরাভয়-মাখা কাল চোখ
আর প্রিয়তমা,
আমার কল্যাণে কত উৎকণ্ঠা লাঞ্ছনা

এবার চল্লাম আমি।
আমাকে তোমরা সব হাসিমুখে বিদায় জানাও।
আমি হবো মৃত্যুঞ্জয়ী তোমাদের প্রেমে,
মৈত্রী ও শান্তির পক্ষে চূড়ান্ত সংগ্রামে,
সর্বহারা মানুষের মুক্তির মিছিলে।
এ বিদায়—বিদায় তো নয়!
ফেরার আকুল ডাক, বাঁচার প্রস্তুতি।

এই যে ঘরের মাঝে আমি শুয়ে আছি
এই ঘর দেশের ইটের;
এই খাটে রয়েছে জড়ানো
অজস্র শিল্পীর স্পর্শ;
দেশের আলোক মাখি এখনো দু'হাতে;
দেশের বাতাস টানি ঝাঝরা এই বুকে;
এখনো শোনায় গান পাখী,
ফুলেরা পাঠায় গন্ধ,
ব্যাথায় ঝরায় পাতা পরিচিত বট।

আমি আছি দেশের অন্তরে,—
এই তো পরম শান্তি।
এবার চল্লাম আমি।

আমার গৈরিক ভস্মে যদি এ দেশের
এতটুকু মাটি
উর্বর প্রসন্ন হয়,
যদি কোন সূর্যমুখী চারা
প্রাণরস পেয়ে ফুল ধরে,
তবে ধন্য আমি!

হেমন্তের মায়া—গোধূলিতে
প্রিয়তমা, সে-মাটির একটি আয়ত টিপ
তোমার কপালে এঁকো,
আর সেই ফুল গুঁজো দীর্ঘ কাল চুলে;
কোন নীল নক্ষত্রের চোখে চোখ রেখে
আমাকে স্মরণ ক'রো,
প'ড়ো বসে অসম্পূর্ণ আমার কবিতা।
ওগো প্রিয়তমা,
তুমিই আমার
মৃন্ময়ী দেশের সেরা চিন্ময়ী প্রতিমা।

ভলকে ভলকে রক্ত ওঠে তো উঠুক,
দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে যায়, যাক।
তবু দেখি দূরে—
ভলগা থেকে হোয়াংহোর তপ্ত রক্তস্রোতে
আমারি রক্তের
অজস্র অঞ্জলি পড়ে,
আমারি হৃদয়-পিণ্ড মত ভোর এশিয়ার বুকে।

ওগো প্রিয়তমা,
তোমার একটি হাত দাও শূন্য আমার মুঠিতে,
জাগার আশ্চর্য স্বপ্নে এখন ঘুমোই।
নূতন ভারতে তুমি থেকো প্রতীক্ষায়,
এখন ঘুমোতে দাও অবাধ শান্তিতে,
ঘুমে বুজে আসে দুই চোখ।
এবার চল্লাম আমি।

মানত

শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর

মহাষ্টমীর রাতে বিকাশের মনে হ'লো যে আর একটা দিনও কোলকাতায় থাকলে সে ঠিক পাগল হ'য়ে যাবে। এতোদিন পাড়ায় পুজো ছিলো একখানা—তার অত্যাচার অনেকটা গা'সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে জুটেছে আর এক পুজো—'ফাটানো সঙ্ঘে'র। বিকাশের বাড়ীর পাঁচিলের ঘেরের ঠিক ধারে—যেখানটায় ডাষ্টবিনটা থাকে—সেই জায়গাটাই পরিস্কার ক'রে নিয়ে গজিয়ে উঠেছে এই নতুন পুজো। কোলকাতার কাটাকাটির সময় অনেক মাথা ফাটিয়ে নিজেদের কীর্তি অক্ষয় ক'রে রাখবার জন্যেই গোড়াপত্তন ক'রেছিলো পাড়ার ছেলেরা এই 'ফাটানো সঙ্ঘে'র। ...সামনেই পড়লো পুজো।...একসঙ্গে নিজেদের গলা আর 'মাইকে' পরের কাণ ফাটিয়ে সদ্য পুরোনো স্মৃতির অস্তিত্ব খানিকটা বাঁচিয়ে রাখবার এমন অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া হতে দিলে না ওরা। ছেলেরা তাই মেতে উঠেছে ষষ্ঠীর দিন থেকেই...পুরোনো দিনের মিইয়ে যাওয়া নেগেটিভ পুজোও পজিটিভ এই পুজোর ছোঁয়াচেই বুঝি নতুন প্রাণ পেয়েছে—তারাই বা কম কিসে!...কিন্তু দুয়ের কম্‌পিটিশনে পাড়ার লোকের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা—বিশেষতঃ বিকাশের—বরাতক্রমে ওর শোবার ঘরের জানলাটা আবার নতুন পুজোমণ্ডপের লাগোয়া...ষষ্ঠী সপ্তমীর রাত একরকম জেগেই কাটাতে হ'য়েছে ওকে—মহাষ্টমীর দিন ওদের ফুর্তিতেও বোধ হয় লেগেছে মহত্বের ছোঁয়াচ—শব্দভেদী বাণ যেন এসে বিঁধছে কাণদুটোতে। মা বোধ হয় জ্যান্তো অসুরদের এমন বিচিত্র অস্ত্রসজ্জা দেখে ভয়ে আর এগোতেই সাহস করেননি!...এলে আর রক্ষে ছিলো না—এই অল্পবয়সেই স্রেফ কাণের মাথাটি খেয়ে ফিরতে হ'তো—পুরুতদের চিং চিং মন্ত্রও আর শুনতে হ'তো না কোনোদিন—ফলে না খেয়ে শুকিয়েই হয়তো মরতে হ'তো!

বিকাশ সিগারেটের পর সিগারেট টেনে ঠায় বসে কাটিয়ে দিল মহাষ্টমীর রাত। ভোর হ'তেই নিত্যকর্মগুলো সেরে সোজা চলে এলো হাওড়া ষ্টেশনে...কাছাকাছির মধ্যে যে কোন ট্রেণ প্রথমে পাবে তাতেই চেপে বসবে ও। কোলকাতায় আর এক মুহূর্তও নয়।

অন্ততঃ একটা বিষয়ে এতোদিন পর্যন্ত গান্ধীবাদ মেনে এসেছে বিকাশ। ট্রেণের গণতান্ত্রিক ক্লাশে চেপে যা আরাম!...দলাই-মলাই...দাপাদাপি...বোঁটকা গন্ধ... আশ্চর্যমলম ঃ সর্বমিলিয়ে দিব্যি সময়টা যে কোন্‌খান দিয়ে কেটে যায়!...কিন্তু ব্বাপ্‌স্‌! সাপের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে সবগুলো টিকিটঘরের সামনেই যা টিকিট-ভুখা-মিছিল দাঁড়িয়েছে, তাতে ওই ফোঁকর অবধি পোঁছুতে পা'দুখানা সত্যাগ্রহ ঘোষণা না ক'রেই ছাড়বে না...অগত্যা 'আইন-অমান্য' ছাড়া গত্যন্তর নেই...বেলা আটটা নাগাদ কাছাকাছির মধ্যে নবদ্বীপের একখানা গাড়ী আছে...যাক—বাঁচা গ্যালো! ন্যাড়ানেড়ীর রাজত্বে নিশ্চয় মায়ের উৎপাতের আশঙ্কা নেই!—নবদ্বীপেরই একখানা ডেড়াভাড়ার টিকিট কেটে ঢুকে পড়লো বিকাশ প্লাটফর্মে।

প্রাণহীন গাড়ীর খোলসগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে—ভীড় তখনও তেমন জমে ওঠেনি। কিন্তু ঠিক ওদিককার প্লাটফর্মের গাড়ীখানা সমানে ফুঁসে চলেছে। ফেটে না যায়! গাড়ীখানা ছাড়ো ছাড়ো; একটা ঘণ্টা ইতিমধ্যে হ'য়ে গ্যাছে। পশ্চিমের গাড়ী নিশ্চয়! যা দেহাতী আদমীর আমদানী! বাইরে থেকে মনে হ'চ্ছে একটা ছুঁচ গলাবারও জায়গা নেই ওতে—কিন্তু ঠিক মালের বস্তার মতো ক'রে তালগোল পাকিয়ে তখনও লোকের পর লোককে ওরা জানলা দিয়ে দিচ্ছে গড়িয়ে—চারপাঁচজনে মিলে এক একটা লোককে চ্যাংদোলা ক'রে ধরে 'মারোরে জোয়ান হেইও' গোছের ঠ্যালা আর সঙ্গে সঙ্গে 'কালীমাইকী জয়' গোছের একটা বিচিত্র গলাফাটানো চীৎকার। আরও একটা ঘণ্টা হ'য়ে গ্যালো...একটি মিহি মেয়েলী গলা তখনও মাইকে অবোধ্য এক ভাষায় একটানা কাতরে চলেছে...জনগণের দুঃখে বিগলিত হৃদয় বাষ্পযান অধিকর্তারাই নাকি যাত্রীসাধারণের অসুবিধে দূর করবার জন্যে পরম উপকারী এই ব্যবস্থার প্রবর্তন ক'রেছেন।...ইঞ্জিনটা রাগে আরও জোরে জোরে ছাড়ছে ধোঁয়া...ওই কামরাটার ভেতরে কারা লাগিয়ে দিয়েছে ধ্বস্তাধ্বস্তি, কে যেন একটা জানালা বন্ধ ক'রে আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রছিলো—বাইরে থেকে গোটাকতক ছোঁড়া দুমদাম ছুঁড়ে মারলো ঘুষি—আর কী চীৎকার। প্লাটফর্মের ছাতটা ফেটে না পড়ে!...এইবার পড়ে গ্যালো শেষ ঘণ্টাটা...গার্ড সাহেব তেড়ে-ফুঁড়ে হুইসিল দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের খুপরিটার দিকে। এখনও সচল মাল

বোঝাই বন্ধ হয়নি। বিকাশ ঘেমে উঠলো...লালশালুর ব্লাউজ-পরা কোরা শাড়ী জড়ানো ফানুসের মতো গোল একটি রসবতীকে চার পাঁচটা জোয়ান ছোঁড়া তুলে ধরেছে —শ্রীমতীর মুখে হাসির ঝিলিক...বোধ হয় ওদেরই মধ্যে কেউ হাতের মক্‌শো করার এমন সুযোগ হেলায় হারায়নি —ধাঁ ক'রে ও'র শ্রীহস্তের একটি চড় এসে পড়লো ওদেরই একজনের মাথার ওপর—আর কী উল্লাস ! ওদিকে গার্ড-সাহেবের নীল নিশানা দেখে ইঞ্জিনটা গাধার প্রথম তানের মতোই এক বিচিত্র আওয়াজ ক'রে চলতে সুরু ক'রলো ধীরে ধীরে। তখনও রসবতীর পশ্চার্দ্ধ ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছে বাইরেকার খান আট-দশ হাতের ওপর। তিড়বিড় ক'রে দোলায়মান পদপল্লবের আঘাত-প্রসাদ পেয়ে ওদের আনন্দোল্লাসে প্লাটফর্মের আকাশটা ফাটো ফাটো।

গাড়ীটা আস্তে আস্তে চলে গ্যালো দৃষ্টির বাইরে... ওদিককার প্লাটফর্মটায় নেমে এলো শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বিকাশদের ট্রেণটা কবন্ধের মতো এতোক্ষণ ঝিমুচ্ছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনটা এসে প্রাণসঞ্চার ক'রলো ওর দেহে আর মিনিট পনেরো বাকী। ভীড় বেশ জমে উঠেছে এদিকেও...ইণ্টার ক্লাশ তখনও ফাঁকা। বিকাশ নির্ভয়েই এগিয়ে গ্যালো ইঞ্জিনের দিকে—ওর ডলারস্ফীত কলেবরের বিরাটত্ব চুম্বুকের মতো অনায়াসেই আকর্ষণ করেছিলো ওকে। এইবার একটা কামরা দেখেশুনে নিয়ে উঠে পড়বে ব'লে সবে ট্রেণটার ল্যাজমুখো হ'য়েছে, দ্যাখে ব্যস্তবাগীশ বৃন্দাবন হন্তদন্ত হ'য়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

"আরে শ্রীক্ষেত্র যে! এ্যাঁ! কী সৌভাগ্য আজ! কতোদিন পরে! তা চল্‌লি কোথায় ? সঙ্গে উনি ?..."

"গ্রহণী।"

"ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে কথা কইতে শিখিসনি। ছোট-লোক কোথাকার!"

"তোমার বুদ্ধির খুরে খুরে নমস্কার!...আমি হ'লাম ছোটলোক আর উনি এলেন ভদ্রমহিলা! হল এ্যাণ্ডারসনের গ্রামারখানা..."

বৃন্দাবনের কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মাঝপথেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো বিকাশ—

"হল ষ্টিভেনশন বল! যাক্ প্রায় একযুগ বাদে তোর সঙ্গে দ্যাখা। দিব্যি মুটিয়েছিস। তা এখন যাচ্ছিস কোথায় ?"

"পশ্চিমে।"

"অর্থাৎ।"

"তার আগে তুই কোথায় যাচ্ছিস শুনি।"

"নবদ্বীপে।"

বৃন্দাবনের বউ হেসে ফেললো—"আপনি নিশ্চয় বিয়ে করেননি।"

বিকাশ খানিকটা হক্‌চকিয়ে গ্যালো—এ'ধরণের প্রশ্ন —বিশেষ ক'রে অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে— আশা করেনি সে—

"মানে ?"

"মানে অতি সোজা"—বললো বৃন্দাবনের স্ত্রী—"পুজোর বাজারে নইলে কেউ নবদ্বীপে যায়! সে যাক্, নবদ্বীপের বড়দার সঙ্গে তো দ্যাখা হ'য়েই গ্যালো"—বলেই আবার এক ঝলক হাসি আর সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের দিকে হ'লো কটাক্ষ বর্ষণ "আর বিবাগী হ'য়ে কাজ নেই, তার চাইতে চলুন না আমাদের সঙ্গে..."

"কোথায় ?"—অনেকটা বিবশ হ'য়েই জিজ্ঞাসা ক'রলো বিকাশ।

জবাব দিলো বৃন্দাবন—"হুগলীতে। মণিদা ওখানে থাকেন না ? তাঁর বাড়ীতে পুজো। সত্যি চল—খুব খুসী হ'বেন তিনি।"

পুজোর নাম শুনেই ভড়কে গ্যালো বিকাশ। "না ভাই, রক্ষে করো! ফুটন্ত কড়া থেকে আগুনে পড়তে রাজি নই! পালিয়ে বাঁচতে যাচ্ছি পুজোর দৌরাত্ম্য থেকে, আবার পুজোর হাঙ্গামায়!"

"হাঙ্গামার কিছু নেই—তোর কোনো অসুবিধে হ'বে না! আর অসুবিধে হ'লেই বা তোকে ছাড়ছে কে ? ক'বছর বাদে দ্যাখা বলতো—নে, ওঠ!"—বৃন্দাবন প্রায় ঠেলেই ঢুকিয়ে দিলো বিকাশকে।

ওরা যখন গিয়ে পৌঁছুলো, তখন একটানা 'মা মা' আর ঢাকের প্রলয়ঙ্কর শব্দে সমস্ত পুজো বাড়ীটা মুখর হ'য়ে উঠেছে। উঠোনটা গিস্‌গিস্ ক'রছে লোকে; মাঝে মাঝে বলির পাঁঠার করুণ আওয়াজ ভেসে আসছে...

"কি রে, বলছিস্ নিরিমিষ পুজো—তা—",

মাঝপথেই থামিয়ে দিল বৃন্দাবন বিকাশকে—"আগে দ্যাখই না।"

ততক্ষণে ওরা উঠেছে এসে বারান্দায়। ক্যামন একটা অজানা ভয়ে ঢিপঢিপ করে বিকাশের বুক...আতঙ্কে চেয়ে দ্যাখে হাঁড়িকাঠ দুটোর দিকে—শুকনো খাঁ খাঁ করছে—

বলির কোনো চিহ্নই নেই ওতে। এদিকে একটা নয়, দুটো নয়—ন'টা ছাগল দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে কান ঝাড়ছে আর আর্তনাদ ক'রে চলেছে। সবগুলোরই কপালে সিঁদুর মাখানো—গলায় টক্‌টকে লাল জবাফুলের মালা। খাঁড়াখানা যা—বোধ হয় ন'টাকেই একবারে নাবানো যায়! ক্যামন মুষড়ে পড়ে বিকাশ আসন্ন বীভৎসতার কথা মনে ক'রে... বুকের মধ্যে রক্তের নাচন বেড়ে চলে। কিন্তু এ আবার কী? হাঁড়িকাঠের ওপরে এক একটা ক'রে ন'টা ছাগলই তুলে ধরলো ঘাতক...একে একে সবকটাকেই দিলে ছেড়ে। বলি দেওয়া হ'লো তার বদলে ন'গাছা আখ আর ন'টা চালকুমড়ো!...বিকাশ বুঝতে পারলো না বহ্বারম্ভে এই লঘুক্রিয়ার অর্থ কি!...

"ব্যাপার কি বলুন তো মণিদা"—বিজয়ার রাত্রে কৌতুহলটা আর চেপে রাখতে পারলো না বিকাশ।

"ব্যাপার তো ভাই স্বচক্ষেই দেখলে।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন মণিদা—"কিছু শোনোনি বেন্দার কাছে? ...তা হ'লে শোনো— এ কাহিনী শোনাবার মতোই বটে!... ওই যে বুড়ীকে দেখছো—কে জানো?"

"কে?"—অনেকটা ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করলো বিকাশ।

"আমার ঠাকুর্দার মা—জগদ্দল পাথর...আজও মরেনি —আমাদের না খেয়ে বোধ হয় মরবেও না..."

"আঃ, কী যা তা ব'লছো"—চায়ের কাপ ক'টা নামিয়ে দিতে দিতে ধমক দ্যান মণিদার স্ত্রী।

"বলছি নেহাৎ মিথ্যে নয়,...যাই হোক, আজ প্রায় আশি পঁচাশি বছর আগেকার কথা। ও বুড়ীর তখনো ছেলেপুলে হয়নি। ও'র শাশুড়ী মানত ক'রলেন—নাতি হ'লে জোড়াপাঁঠা দিয়ে মায়ের পুজো দেবেন। মা শুনেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তার বছর খানেকের মধ্যেই এলো ও'র কোলে প্রথম ছেলে। সেই ছেলের যখন বছর পাঁচেক বয়স, ঠিক হ'লো মানতের পুজো দেওয়া হ'বে। আমাদের বাড়ীর নিয়ম—সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমীতে সাতটি, আটটি আর নটি আর সন্ধি পুজোয় একটি—মোট পঁচিশটি পাঁঠা বলি দেওয়া। সেবারে নিয়ম মাফিক পাঁঠা তো এলোই—সঙ্গে এলো আরো এক জোড়া।

—সাদা ধবধবে এক জোড়া পাঁঠা নাকি ছিলো ওই দলের মধ্যে...সেই ছেলে সেই দুটিকে ধরে বসলো...নাওয়া খাওয়া ভুলে সর্বক্ষণ তাদের পেছনেই সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

—এদিকে মহাষ্টমীর দিন মানতের পুজো। ছেলে কেঁদে একসা। পাঁঠা দুটোকে কিছুতেই ছাড়বে না সে—চান করাতে দেবে না। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে তো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো ওকে। কিন্তু বলির পরে হ'লো এক কান্ড।—নিয়ম বা মানত—যে জন্যেই হোক—কাটা পাঁঠার মুণ্ডু থেকে ঝরে পড়া রক্ত দিয়ে ছেলেকে চান ক'রাতে হ'বে —ওতে নাকি কেটে যাবে ছেলের ফাঁড়া...বুড়ীর শাশুড়ী তাই নাতিকে কোলে ক'রে বসে সবে একটা কাটা মুণ্ডু তুলে ধরেছেন মাথার ওপর—হাঁড়িকাঠে ফেলা পাঁঠারই মতো বিকট চীৎকার ক'রে ক্যামন যেন হ'য়ে পড়লো ছেলে...তবু মানতের নিয়ম তো মানতেই হ'বে। ওরই মধ্যে সবাই মিলে জোর ক'রে রক্ত দিয়ে ছেলেকে চান করিয়ে দিলো। সেই ছেলে কিন্তু থেকে থেকে কেবলি চমকে ওঠে আর চীৎকার করে ক্যামন যেন ঘুমের ঘোরে—'ঝুলা, লুলা ব'লে—পাঁঠা দুটোর ওই নাম রেখেছিলো সে...বিকেল হ'তে না হ'তেই হলো তার ভীষণ জ্বর—সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি আর আর্তনাদ 'ঝুলো, লুলা—আমি যাবো—আমি যাবো।'...বাড়ীশুদ্ধ সবারই চোখে জল...একটা আতঙ্কের কালো ছায়া যেন গ্রাস ক'রতে লাগলো সমস্ত বাড়ীটাকে ধীরে ধীরে। ছেলের ঠাকুরমা আছড়ে গিয়ে পড়লেন পুজোর দালানে—'মা, দাদুকে ফিরিয়ে দাও—আবার পুজো দেবো জোড়া পাঁঠা দিয়ে।'...মা আনন্দে হাসলেন না দুঃখে কাঁদলেন জানি না। এদিকে ডাক্তার বদ্যিতে বাড়ী ভর্তি। ওঝা, সন্ন্যাসী —আশেপাশে গাঁয়ের যে যেখানে আছে সব এসে জড়ো হ'য়েছে—বাড়ী লোকে লোকারণ্য...ছেলেকে নিয়ে চলছে যমে মানুষে টানাটানি। সেবার সন্ধিপুজোর সময় ছিলো শেষরাত্রের দিকে। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা একহাতে মুছছে চোখের জল, আর একহাতে ক'রে চলেছে পুজোর আয়োজন। ছেলের দাদু পুজোমণ্ডপে বসে চোখের জলে ভাসছেন। মুখে এককথা—"মা দাদুভাইকে ফিরিয়ে দাও... কী লাভ হ'বে তোমার ওকে নিয়ে?"...

বলির বাজনা বেজে উঠেছে সন্ধিপুজোর। আলোর মালায় ঝলমল ক'রছে পুজোর দালান...বুড়ীর শাশুড়ীর বুকের ভেতরে আর একটি অবোধ শিশুকণ্ঠ বুঝি কেঁদে উঠলো...ততক্ষণে বলির পাঁঠাটাকে ফেলা হ'য়েছে হাঁড়িকাঠে ...হাজার কণ্ঠের 'মা মা' ডাকে বাতাস হ'য়ে উঠেছে কাতর ...ঘাতক তুলেছে খাঁড়া—

"বন্ধ কর, বন্ধ কর"...মৃত্যুর কণ্ঠ চিরে চীৎকার ক'রতে ক'রতে কে যেন আসছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে! পেছনে জমাট বাঁধা কান্না থমকে দাঁড়িয়ে আছে। পাগলের মতো আলু-

থালন্ বেশে ছন্টে এলেন ছেলের ঠাকুরমা—বন্কে চেপে ধরে নাতিকে। ঘাতকের হাত গ্যাছে থেমে—ঢাকগন্লো ভয়ে নিস্তব্ধ। বাতাস জমে পাথর হ'য়ে গ্যাছে বন্ঝি! বলির বেদীর কাছে ধীরে ধীরে নাতির প্রাণহীন দেহটাকে নামিয়ে দিয়ে ক্যামন অদ্ভুতভাবে তাকালো বন্ড়ী প্রতিমার দিকে—চোখ দন্টোতে পাথরের স্তব্ধতা—চোখদন্টোই যেন ভাষা পেলো—

"এই যদি তোর মনে ছিলো তা'হলে পাঁঠার লোভ না ক'রলেই পারতিস!...পেট ভরলো তোর রাক্ষন্সী?"—বন্ড়ীর সংজ্ঞাহীন দেহটা লন্টিয়ে পড়লো নাতিরই পাশে...

সেই থেকে আমাদের বাড়ী বলি বন্ধ হ'য়ে গ্যাছে।

রন্মাল দিয়ে চোখদন্টো মন্ছে নিলো বিকাশ। চেয়ে দ্যাখে—বন্ড়ীর নামাবলীআঁকা শন্কনো গাল বেয়ে তখনও ঝরে পড়ছে দরদর ধারা।

★

বিড়ি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

গাঁজা খেতো যারা মনের দুঃখে,—খায়না কেবল লজ্জায়,
অসীম দৈন্য বেঁধে আছে বাসা যাদের অস্থিমজ্জায় ;
লবণ আন্‌তে পান্ত ফুরায়—নেই কানাকড়ি সম্বল
দুনিয়ার দিক্‌দারি দেখে যারা নিতে চায় লোটা-কম্বল ;
আমি বিড়ি—হীন প্রোলেটারিয়েট্ তাদের নিত্য সঙ্গী,—
তাহাদের সনে সখ্য আমার—যেনরে অঙ্গ-অঙ্গী !
বোতলবাহিনী সুরা নই আমি—নহি ফেনায়িত উচ্ছল,
স্ফটিক-পাত্রে তুলি' বুদ্বুদ না হই নটন-চঞ্চল।
আমার প্রবেশ নিষেধ ভাইরে, বাবুদের বালীগঞ্জে,—
কত চাঁদমুখে চুমা আঁকিবারে উস্‌খুশ্ করে মন যে !
সস্তা টিনের কৌটোয় থাকি ময়লা নোংরা কামিজে,
ভদ্রসমাজে অচল যাহারা তাহাদেরি প্রিয় আমি যে !
মোর ভক্তেরা আছে তাই আজো এই দুনিয়াটা চল্‌ছে,
তারা তোমাদের সমাজের খোল,—তারাই যে ভাই, নল্‌চে !
ঐ যে গরীব কেরাণী বাবুটি আপিসের ঘানি টান্‌ছে,
রাস্তায় যারা পিঠের উপর মালের বস্তা আন্‌ছে ;
মুটে-গাড়োয়ান-ভবঘুরে আর শ্রীহীন মধ্যবিত্ত,—
আমার কদর জানে ওরা তাই অর্চ্চনা করে নিত্য।
দুঃখী-বেকার-ব্যথিতের আমি ব্যথাবেদনার সাথী হে,
মোর করুণায় কাটায় তাহারা কত বিনিদ্র রাতি যে।
সস্তা বলিয়া করিও না ঘৃণা,—ভেবো না আমারে ঘৃণ্য,
মরুর মতন হ'ত এ জীবন বন্ধু হে, আমা ভিন্ন।
নিজে পুড়ে দিই পরকে তৃপ্তি,—দিই ক্ষণিকের শান্তি,
আমি বিড়ি—নহি দামী সিগারেট শুভ্র তুষার কান্তি !

কবিতাষ্টক

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

১। মুক্তি ও শক্তি

'মুক্তি' যদি ভালবাসি সকলের হই মুক্তি-কামী,
'শক্তি' যদি ভালবাসি হ'তে চাই সকলের স্বামী।

২। সভ্যতা

সভ্যতার অঙ্গরাখা মখ্‌মলের চিক্কণ পোষাক
নীচে তার বর্ম্মঢাকা অস্ত্র আর শস্ত্রক্ষত দাগ।

৩। যৌবন

যৌবন ক'দিন থাকে ? নূতনের আকাঙ্ক্ষা য'দিন
পুরাতনে তৃপ্ত যবে সেইদিন হয়েছো প্রবীণ।

৪। সুবিচার

ন্যায়বান মনিবের সুবিচার শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে
ঈশ্বরের অনুকারী হয় তাহে ঈশ্বরত্ব পেয়ে।

৫। শিক্ষিত মূর্খ

শিক্ষিত যে মূর্খ হ'লে হয় তা'র পণ্ডিতাভিমান,
পণ্ডিতেরা করে তা'রে মূর্খ হ'তে মূর্খতর জ্ঞান।

৬। স্বাধীনতা

'স্বাধীনতা' পুষ্ট হয় সংহতি-শৃঙ্খলা-শক্তি বলে
ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য ত্যাগে সমষ্টি বলিষ্ঠ পদে চলে।

৭। ধর্ম্ম

'ধর্ম্ম' হয় উপলব্ধি, গাল-ভরা তত্ত্বকথা নয়,
রসনার তরবারি খরশাণ বাক্যে যুদ্ধ জয় !

৮। প্রেমের গতি

নদী নিম্নপথে চলে বহি তা'র সুগভীর প্রেম,
সমুদ্র বক্ষেতে নিয়া বলে প্রিয়া তোমারে পেলেম।

স্বদেশ-সেবক বিনয় সরকার

(১৮৮৭-১৯৪৯)

অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়

আমরা বিনয় সরকারকে এতদিন বহু-বিদ্যা-বিশারদ্, বিবিধ ভাষাবিদ্, মৌলিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক অতি বিরাট পণ্ডিতরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অক্লান্ত জ্ঞান-চর্চ্চার পেছনে যে শক্তি দিবারাত্রি প্রেরণা জুগিয়েছে, সেটা হ'লো এক প্রচণ্ড স্বদেশ-প্রেম ও দেশাত্মবোধ। এই স্বদেশ-সেবার মহান্ আদর্শই রূপ নিয়েছে বাইরের তাঁর বহুমুখী কাজ-কর্ম্মে। বিনয় সরকার ছিলেন একজন খাঁটি স্বদেশ-সেবক। সারা জীবনে তিনি এমন কোন কাজ করেন নি, যা দেশ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, বা যা তিনি করেছিলেন নিছক ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে। তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু বলার পূর্ব্বে এই কথাটা স্মরণ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিনয় সরকারের এই স্বদেশ-সেবার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই শৈশবে, যখন তিনি তাঁর জন্মভূমি মালদায়। ১৮৯৬-১৯০০ সালের কথা। বড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি জামগাছতলায় ফি বছর অনুষ্ঠিত হ'তো মালদহের গম্ভীরার পূজা-পার্ব্বণ, গান-বাজনা, নাচানাচি ইত্যাদি। এখানে এসে হাজির হ'তো যত তথাকথিত 'ছোট জাতের দল'। শৈশবে এই আম্রের গম্ভীরা-গান তাঁর প্রাণে বয়ে আনতো এক নূতন উন্মাদনা, নবীন প্রাণের স্পর্শ। গম্ভীরার ঢোলকে ঘা পড়বামাত্র তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না—ছুটে বেরিয়ে আসতেন এই ছত্রিশ জাতের সাথে হাত মিলিয়ে জামতলার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে। এই 'ছোট জাতের' সম্মেলনে তিনি বাঙালীর হৃদয়ের স্পন্দনকে সেদিন অনুভব করেছিলেন। বাঙালী জাতি এক নয়া মূর্ত্তিতে তাঁর দৃষ্টিতে দেখা দিল—সে হলো বাঙলার রোদে-পোড়া, আধ-পেটা-খাওয়া জনগণের মূর্ত্তি, বাঙলার প্রাণশক্তি। গম্ভীরার আবহাওয়াতে যে-দৃষ্টি তিনি লাভ করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তারই বিকাশ সাধিত হয়েছে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে, জীবনের জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার মধ্যে। 'বৈঠকে'(১) তিনি বলেছেন, "জামতল্লীর গম্ভীরাতে যে-সব লোকজন দেখেছি সেই সব লোকজনের সঙ্গে তুলনা ক'রেই অন্যান্য লোকজনকে চিনেছি। গম্ভীরার লোকজনের জুড়িদারই পেয়েছি দুনিয়ার নানা পল্লী-শহরে। যে-সব রক্ত-মাংসের মানুষ জাপানে, চীনে, মিশরে আর ইয়োরামেরিকায় ছুঁয়েছি তারা সবাই মনে হ'য়েছে পুড়াটুলীর বারোয়ারী-তলার লোকজনেরই মাসতুত ভাই। ......একালে গণতন্ত্র বকি। সেই গণতন্ত্রই জীবনে প্রথম দেখেছি জামতল্লীর গম্ভীরার শাসন-কায়দায়। আজকাল সমাজ-তন্ত্রও কপচাই। সেই সমাজতন্ত্রের দস্তুল জীবনে প্রবেশ করেছিল,—চুনিয়া-নুনিয়া-পাঝ্‌রা-কাঁসারি ইত্যাদি জাতীয় ভাইদের সঙ্গে নাচানাচি আর লাফালাফির আবেষ্টনে।......১৯১৭ সনে "ফোক-এলিমেণ্ট" বইটা বেরুলো। তখন আমি আমেরিকার হার্ভার্ডে। তারপর ইয়োরামেরিকার নানা দেশের বড় বড় লাইব্রেরিতে এই বইয়ের এক একটা কপি দেখেছি। যখনই দেখেছি, বুকটা চেঁড়ে উঠেছে; আর তখনই পেয়েছি জীবনের বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি,—এই আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগ্‌বিজয়। মনে হ'য়েছে,—এই আমার পুড়াটুলীর দিগ্‌বিজয়। কল্পনা ক'রেছি,—এই আমার মালদহের দিগ্‌বিজয়,—আমার চুনিয়া-নুনিয়া ভাইদের দিগ্‌বিজয়।" এই যে সাধারণ মানুষটিকে আবিষ্কার, সে আবিষ্কার ঘটেছিল জামতল্লীর গম্ভীরার আড্ডায়।

জামতল্লীর 'সাধারণ মানুষটি'র সেবায় আত্ম-নিয়োগের মন্ত্র বিনয় সরকার গ্রহণ করেন কলিকাতায় তাঁর কলেজ

(১) 'বিনয় সরকারের বৈঠক' (প্রথম খণ্ড, ১৯৪৫ ; পৃষ্ঠা ৩৭৩-৭৫)

জীবনে. ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় (১৯০২-০৭)। তিনি তখন (১৯০৩) প্রেসিডেন্সী কলেজের বি, এ, ক্লাশের ছাত্র, আবাস ইডেন হিন্দু হোটেলে। ১৯০২ সালে কলিকাতার মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন বা বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সাংস্কৃতিক পরিষদ্। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম জন্মদাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮)। বিনয় সরকার ১৯০৩ সালে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ডন সোসাইটির সভ্যপদ গ্রহণ করেন। এই ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামীর সুললিত গীতা-বিশ্লেষণে এবং রবীন্দ্র-নাথ, দীনেশ সেন, নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব, সতীশ মুখার্জ্জী প্রভৃতি মণীষিগণের নৈতিক ব্যাখ্যায় তিনি জীবন-গঠনের তিনটি বীজ-মন্ত্র লাভ করেন। এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে স্বদেশ-সেবা, নিষ্কাম কর্ম্ম ও স্বার্থত্যাগ। ১৯৪২ সনে 'বৈঠকে' বিনয়বাবু বলেছেন, "প্রত্যেক দিনই ঘুরে ফিরে এসে হাজির হতাম স্বার্থ ত্যাগের দর্শনে। বুঝতে পার্‌তাম —বিবেকানন্দ-বাঞ্ছিত 'এক বগ্‌গা ক্ষ্যাপামি'র জ্যান্ত প্রতিমূর্ত্তি সতীশ মুখোপাধ্যায়। সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়েছিলাম বলে জীবন ধন্য হ'য়েছে।···গীতার শ্লোকগুলা ধ'রে ধ'রে শব্দের পর শব্দ বুঝিয়ে দেওয়া হ'তো। পণ্ডিত নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাগুলা কানে ঠেক্‌তো অতিমধুর আর মিশে যেতো রক্তের সঙ্গে। প্রত্যেকদিন শুন্‌তাম এক সুর। তা হ'চ্ছে: 'শরীর কিছু নয়, প্রাণ কিছু নয়, মৃত্যু কিছু নয়। একমাত্র জিনিষ কর্ত্তব্য পালন'। সেই সুর আজও কানে বাজছে। আর তারই জোরে বেঁচে রয়েছি।" (১ম খণ্ড, পৃ ২৬২—৬৩)। এই নবমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে তিনি এক নূতন জীবন লাভ করেন, —সেই জীবনের ডাক স্বদেশ সেবায়, সেই জীবনের সার্থকতা পরের জন্য আত্মোৎসর্গে। এই মন্ত্রকে ধ্রুবতারা ক'রে তিনি জীবন-পথে এগিয়েছেন, সারা জীবন দিয়ে এর মর্ম্মবাণীকে সার্থক করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর সকল কর্ম্মের প্রেরণা ছিল এই স্বদেশ-সেবার মন্ত্র, গীতার "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

বিনয় সরকারের স্বদেশ-সেবার প্রথম ধাপ স্বদেশী

স্বদেশ-সেবক বিনয় সরকার

আন্দোলনের আবহাওয়া, ১৯০৫-১৪ সন। ১৯০৫ সালে বাঙলায় জ্বলে ওঠে কার্জ্জন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন, অন্যদিকে সুদূর প্রাচ্যে বিঘোষিত হলো জাপানের কাছে শ্বেতাঙ্গ রাশিয়ার পরাজয়বার্ত্তা। শতাব্দীর ঘোর তিমির থেকে সেদিন জেগে উঠ্‌লো সমগ্র এশিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এশিয়ার জীবনে সূচিত হ'লো এক নূতন যুগ,—জাগতিক সকল কর্ম্মক্ষেত্রে সংগ্রাম ও সৃষ্টির যুগ। এ-জাগরণের প্রস্তুতি চলেছিল বাঙলায় তথা ভারতে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে। বিশাল প্রস্তুতির পর তাই বাঙলায় আন্দোলন ধারণ করে এক ভয়াবহ রূপ। বিপ্লবের স্রোতে বাঙলা বর্জ্জন করে বিলাতী মাল, প্রচলন করে স্বদেশী শিল্প আর দাবী জানায়—পূর্ণ স্বরাজ। রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে ক্রমে আন্দোলন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 'বয়কট' করে জাতীয় কর্তৃত্বে ও জাতীয় স্বার্থে শিক্ষা-প্রচারের সঙ্কল্প গৃহীত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ধারার যাঁরা ছিলেন প্রকৃত নায়ক

ও ধারক, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে পারি 'ডনে'র সতীশ মুখোপাধ্যায় ও সেই সঙ্গে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি মনীষির নাম। এই নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সেদিন কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় ভাবে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ (১১ই মার্চ্চ, ১৯০৬)। এই পরিষদের পরিচালনায় স্থাপিত হ'লো "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল" (১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬) ও তৎসংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে-কেন্দ্রে বহু জাতীয় বিদ্যালয়২। স্বদেশ-সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত বিনয় সরকার সে-সময় ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গ-বিপ্লবের সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে। তাঁর শিক্ষাব্রতী মন স্বভাবতই বেছে নিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয় শিক্ষার দিকটা। ১৯০৫-০৬ সনে "জাতীয় শিক্ষা" প্রচারের জন্য বাঙলা দেশে ছাত্র-মহলে যে তোড়জোড় ও জল্পনা-কল্পনা চলেছিল, তাতে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি সে-যুগের সেরা ছাত্রদের সঙ্গে বিনয় সরকারও এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হ'লে পর তিনি তাঁর ইংরেজী-বাংলা দুটো প্রবন্ধে ('মালদা সমাচার' জুন, ১৯০৬; অমৃতবাজার পত্রিকা, জুলাই-আগষ্ট, ১৯০৬) বাঙলার জনগণের নিকট জাতীয় শিক্ষা সমর্থণের জন্য এক আবেদন পেশ করেন। ১৯০৬ সালে এম্, এ, পাশের পর ভারত সরকার তাঁকে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করেন ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও প্রদান ক'রেছিলেন। কিন্তু বিনয় সরকার উভয় দানই সানন্দে প্রত্যাখ্যান ক'রে যোগদান করেন কলিকাতাস্থ জাতীয় কলেজে স্বদেশের সেবকরূপে (১৯০৬)। জাতীয় কলেজে তিনি ছিলেন ইংরেজী ও ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক। এই সময় দুই বৎসর (১৯০৬-০৮) তিনি খালি পায়ে খালি গায়ে শুদ্ধ মাত্র একখানি চাদর গায়ে দিয়ে ত্যাগী সাধকের জীবন-যাপন ক'রেছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা হ'লো: "এই অধম ন্যাশন্যাল কলেজে ঢুকিয়াছে মামুলি সেবক হিসাবে। খালি পা আর খালি গা। জামাও নাই, জুতাও নাই। বিলকুল কপর্দ্দকহীন।" বিনয়কুমারের ন্যাশন্যাল্ কলেজের ছাত্র ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক বাগেশ্বর দাস মহাশয়ের কাছে শুনি যে, সে সময় বিনয় বাবুর অনুপ্রেরণায় ও দৃষ্টান্তে তাঁর ছাত্রেরাও অনেকে খালি গায়ে, খালি পায়ে অনেকদিন কাটিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে প্রধানত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। অথচ তখন মাতৃভাষায় পুস্তক কোথায়? বিনয় সরকার আত্মনিয়োগ করলেন পাঠ্য পুস্তক রচনায়। ছাত্রাবস্থায়েই বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্ভব কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি চিন্তা করতেন ও বন্ধুবান্ধব মহলে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আবহাওয়ায় তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তাঁর প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' (১৯১০, পৃ ৬৪), 'প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা' (১৯১০, পৃ ১৭৫), 'ভাষা শিক্ষা' (১৯১০, পৃ ১২০), 'শিক্ষা সোপান' (১৯১২, পৃ ৬৪), 'শিক্ষা সমালোচনা' (১৯১২, পৃ ১৫০), 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' (১৯১২, পৃ ১২৫), 'সাধনা' (১৯১২, পৃ ২০০) প্রভৃতি। তা ছাড়া, ইংরেজীতেও রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক সাত-আটখানা বই প্রকাশিত হয়। শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ক বইগুলির তিনি যে শিক্ষা পদ্ধতির খসড়া দিয়েছিলেন, তার মূল কথা ছিল এই যে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য, কলা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে কিছুটা পরিমাণে বিজ্ঞান ও 'হাতের কাজ'ও (যথা, অঙ্কন, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ প্রভৃতি) শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মস্তিষ্কের শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক শিক্ষাও অতি প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধীর বেসিক শিক্ষা-পদ্ধতির পূর্ব্বাভাস সূত্রাকার এখানে পাওয়া যায়। বিনয় সরকার তাঁর শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলি লিখেছিলেন

(২) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত A Phase of the Swadeshi Movement (National Education, 1905-1910) দ্রষ্টব্য।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তরফ থেকে। তাঁর বইগুলি আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বেই জাতীয় শিক্ষার মুখপত্র ইংরেজী 'ডন' পত্রিকায় নিম্নলিখিত অভিমত দেখা যায়ঃ "বাবু বিনয়কুমার সরকার, এম্, এ, শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শিক্ষা পরিষদের শিক্ষামূলক তালিকায় 'পেডাগগিক্‌স্' অন্তর্ভুক্ত। যদিও এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন ক্লাস আরম্ভ হয় নাই, তবুও শিক্ষকমণ্ডলী ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। বাবু বিনয়কুমার সরকার এই বিষয়ে যে শিক্ষকদের 'হ্যাণ্ডবুক্' প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন" ('ডন', মার্চ্চ, ১৯০৮)। তাঁর অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রজেন শীল মন্তব্য করেন যে, ইহা "বর্ত্তমান ভারতীয় শিক্ষা জগতে একটি সুস্থ ও সবল শক্তি হিসেবে কাজ করবে"।

যে-সময় বিনয় সরকার ন্যাশন্যাল কলেজে অ্যাপনা ও নানা পুস্তক রচনায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত, সে সময়ও তিনি শিক্ষা পরিষদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য স্বদেশ সেবকদের সঙ্গে অর্থ সংগ্রহে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৯০৫—১৪ সনের যুগে তিনি কয়েকবার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাতে এই সংগৃহীত অর্থ ন্যাশন্যাল কলেজের পুষ্টির জন্য অর্পণ করেন (৩)।

জাতীয় কলেজে অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন অধ্যাপক সরকারের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হ'তে থাকে। যে সময় তিনি বাঙলার জনগণের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত, সে সময় তাঁর কানে জন্মভূমির চুনিয়া-নুনিয়ার ডাক এসে পৌঁছে। মালদার নিরক্ষর, অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের আদর্শ গ্রহণ করে তিনি স্থাপন করলেন মালদায় এক নূতন কর্ম্মকেন্দ্র। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো 'মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতি' (৫ই জুন, ১৯০৭)। এই সমিতি কলিকাতার শিক্ষাপরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় কাজকর্ম্মে মোটের উপর স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতো। ১৯১৩ সালে এই সমিতির পরিচালনাধীনে এগারোটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এদের দুইটি নৈশ বিদ্যালয়, দুইটি বালিকা বিদ্যালয়, দুইটি 'ফিফ্‌থ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (ম্যাট্রিক) স্কুল। 'ফিএথ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' স্কুল দুইটির একটি ছিল জন্মভূমি মালদায় অপরটি তাঁর পৈতৃক ভিটা সানিহাটিতে (ঢাকা)। শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য নানাবিধ পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হয়। কলিকাতাস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পাঠক্রম অনুযায়ী এখানকার বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প, স্বাস্থ্য, সূত্রধরের কর্ম্ম, অঙ্কন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'তো। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই আবার ছোটখাট একটি লাইব্রেরী এবং কারখানা ও গবেষণাগার ছিল। মালদার 'আদর্শ বিদ্যালয়ের' লাইব্রেরীতে প্রায় হাজারখানেক বই সংগৃহীত হয়। মালদা শিক্ষা-সমিতির তরফ থেকে আবার মাঝে মাঝে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থাও ছিল। এই সকল কাজকর্ম্মের প্রধান নায়ক ও কর্ম্মী ছিলেন বিনয় সরকার। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কলিকাতা জাতীয় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিনয়ের কাজকর্ম্মের ফলে সেযুগে মালদা একটা দেখবার জায়গা হয়ে দাঁড়াল। আমরা অনেকেই তখন বিনয়ের field of operation দেখতে মালদা যেতাম।" রাধাকুমুদ বাবু, বাগীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও এলাহাবাদের কংগ্রেস কর্ম্মী ঈশ্বর শরণ বিনয় সরকারের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করতে একবার মালদা গিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় শিক্ষা পরিষদ্ সংস্থাপনের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা প্রচারের যে-আদর্শ গৃহীত হয়, সেই আদর্শ গ্রামে-গ্রামে, জেলায়-জেলায় প্রসারিত করার মূল দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন বিনয় সরকার। সেযুগের জাতীয় বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি খুব বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির কয়েকটা আজও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বেঁচে রয়েছে।

ইয়োরোপের বড় বড় দেশগুলির সঙ্গে পিছিয়ে-পড়া ভারতের তুলনা করে বিনয় সরকার স্বদেশী যুগেই চিন্তিত

(৩) বিনয় সরকার প্রণীত Education for Industrialisation (কলিকাতা, ১৯৪৬; পৃঃ ৩৪১)।

ও ব্যথিত হ'য় পড়েন। কি ক'রে দেশটাকে দ্রুত বড় করা যায়, কি ক'রে জগতের সামনে ভারতের ইজ্জৎ বাড়ানো যায় এই ছিল তাঁর প্রধান ধান্ধা। তিনি বুঝেছিলেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জার্ম্মাণীর অধুনাকালে দ্রুত অগ্রগতির প্রধান কারণ শিল্প-বিপ্লব। আর বুঝেছিলেন, ভারতকে বড় করতে হ'লে চাই এদেশে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার। অথচ তখন ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির সংখ্যাও ছিল যেমন কম, শিল্প-বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল তেমনি সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গলার এই অভাব দূর করবার জন্ত বিনয় সরকার ১৯১০-১১ সনে (রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে) জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ও মালদা জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট পনেরো জন ছাত্রকে সংগৃহীত অর্থে বিদেশে প্রেরণ করেন বিবিধ শিল্প-বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, পরীক্ষা মূলক চিত্ত-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার জন্ত। সরকার প্রেরিত ছাত্রেরা অনেকেই,—যথা, নরেন্দ্রনাথ সেন, হীরালাল রায়, বাণেশ্বর দাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসা ও শিক্ষায় লিপ্ত থেকে স্বদেশ-সেবা করেছেন ও করছেন। তাছাড়া, বাঙ্গলার বাইরে ভারতের নানা সহরে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্তও তিনি মালদা শিক্ষা সমিতি থেকে ছাত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, যেমন, লাহোরের টেকনিক্যাল স্কুলে, বৃন্দাবনের মহাবিদ্যালয়ে ও এলাহাবাদের কাঁচশিল্পের কারখানায়।[৪]

এছাড়া, ১৯০৫-১৪ সনের যুগে আর একটি বিষয়েও বিনয় সরকারের দৃষ্টি পতিত হয়েছিল। সেটা হ'লে বাংলা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বাংলা ভাষায় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রণয়ন করা। প্রথমটির দিকে তিনি বাঙ্গলার সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দুইটি সভায়—মালদায় উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (পৌষ, ১৩১৭) ও মৈমনসিংহে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (বৈশাখ, ১৩১৮)। শেষোক্ত সভায় 'সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি অবলম্বনবিষয়ক প্রস্তাব"-এ তিনি বলেন, "কি উপায়ে এবং কত-দিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরেজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে—ইহাই আমাদের এখন বিবেচনার বিষয় হইয়াছে।" (সাধনা, ১৯১২ পৃঃ ১৫২)। মৈমনসিংহের সভায় তাঁর ঐ প্রস্তাব স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। ঐ একই বৎসরে ঐ প্রস্তাব হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য সম্মিলনীতে হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় প্রচারিত হয়।

বাংলা ভাষায় উচ্চতর গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্ত বিনয় সরকার মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতির অধীনে একটি "সাহিত্যালোচনা বিভাগ" স্থাপন করেন। ঐ বিভাগের সহিত সেযুগে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যক্তিগণ একদিকে যেমন স্ব স্ব স্বতন্ত্রক্ষেত্রে গবেষণা চালাতেন, অপরদিকে তেমনি ছাত্রদেরও গবেষণায় উৎসাহিত ও পরিচালিত করতেন। এই সকল গবেষণার ফল-স্বরূপ কয়েকটি পুস্তক মালদা শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫]

বিনয় সরকার ১৯০৭ সালে "মালদহ সমাচার"-এ সার্ব্বজনিক গম্ভীরার ইতিহাস রচনার জন্ত পঁচিশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হরিদাস পালিত ১৯০৯ সালে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকায় আদ্যের গম্ভীরা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি পরে ১৯১২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই 'গম্ভীরার' তথ্য অবলম্বনে বিনয় সরকার বিদেশে থাকাকালীন "দি ফোক্ এলিমেণ্ট ইন হিন্দু কালচার" (লণ্ডন, ১৯১৭) প্রণয়ন ক'রে মালদহের লোকসঙ্গীতকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই দেন।

(৪) বিনয় সরকার-প্রণীত "বাড়তির পথে বাঙ্গালী"র বাণেশ্বর দাসের ভূমিকা।

(৫) বিনয় সরকার-প্রণীত "বাড়তির পথে বাঙ্গালী"র বাণেশ্বর দাসের ভূমিকা।

এছাড়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের জ্ঞানরাশি বাংলা-ভাষায় বাঙ্গালীর পাতে পরিবেষণের নিমিত্ত বিনয় সরকার ১৯১১ সনে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করে সাহিত্য-পরিষদের হস্তে কয়েক হাজার টাকা অর্পণ করেন। তৎপ্রদত্ত অর্থেই ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় "ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক ফরাসী পণ্ডিত গীজোর" হিস্ট্রি অব ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেসানে"র বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। সেই অর্থেই বিনয় সরকারের অনেক ছাত্র সুধাকান্ত দে প্রণীত রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হ'তে চলেছে। অধ্যাপক সরকার নিজেও সে সময় আমেরিকার নিগ্রোদের প্রষ্টাগুরু বুকার টি ওয়াশিংটনের "আপ্ ফ্রম্ স্লেভারী" (১৯০১) বইখানির বাংলা অনুবাদ "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" নামে তাঁহার সম্পাদিত 'গৃহস্থ' মাসিকে ধারাবাহিক ভাবে (গৃহস্থ, বৈশাখ, ১৩২১—পৌষ, ১৩২১) প্রকাশ করেন। ইহা ১৯১৪ সনেই পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। সে যুগের যুব-সমাজ এই বইটিতে দারুণ অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। জানুয়ারী, ১৯৫০এর "ক্যলকাটা রিভিয়ু" এই বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, গান্ধী-পূর্ব্ব যুগে বাঙ্গালী জাতির জীবন-গঠনে এ বইটির অবদান আজ অস্বীকার করা চলে না।"

বিনয় সরকারের স্বদেশ-সেবার একটি বড় স্তম্ভ "বিশ্ব-ইতিহাসে ভারতের স্থান ও মান নিরূপণ।" বিদেশে পর্য্যটনকালে (১৯১৪-২৫) ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন দেশের এবং চীন-জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাকাডেমী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা করেন। তাছাড়া, গ্রন্থ-রচনা, বিদেশের নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ ইত্যাদি তো ছিলই। ইংরেজী ছাড়া ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায়ও তাঁর কলম ছিল সমভাবে সক্রিয়। কি বক্তৃতায়, কি লেখালেখিতে, সকল ক্ষেত্রে ভারতই ছিল তাঁর প্রচারের মূল বিষয়বস্তু। তাঁর প্রচার-কার্য্যের মধ্য দিয়ে ভারতের যে-মূর্ত্তিটি ফুটে ওঠে, সেটা হ'লো শক্তিযোগী, ইহনিষ্ঠ, বস্তুবাদী ভারত। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার ও পশ্চিম বস্তু-তান্ত্রিকতার কেন্দ্রস্থল। এই ধরণের বহুল প্রচলিত ও সর্ব্বজনস্বীকৃত মতবাদের মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিত্তিতে জীবনের বিভিন্ন আদর্শ ও প্রচেষ্টাকে দফায় দফায় তুলনায় আলোচনা করে তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে, মনোবৃত্তিতে, জীবন-দর্শনে এবং সভ্যতা বিকাশের ধারায় "মোটের উপর" এক বা সমরূপ। বিনয় সরকার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বৈষম্যমূলক ব্যাখ্যাকে কুসংস্কারপ্রসূত, সাম্রাজ্যবাদদুষ্ট ও অবৈজ্ঞানিক বলে পরিত্যাগ করেছেন। পক্ষান্তরে, তাঁর ভারতবিষয়ক প্রচারে একদিকে যেমন তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও গৌরবকে তুলে ধরেছেন, অপর দিকে তেমনি যুবক বাঙ্গলার ও যুবক ভারতের (১৯০৫) জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রগতি বা অগ্রগতির প্রচেষ্টার ধারাকে নির্দ্দেশ করেন। তাঁর বিচারে ১৭৫৭-১৯০৫ এর যুগ ভারতেতিহাসের একমাত্র তিমিরাচ্ছন্ন অধ্যায়। ঐ যুগে পরাধীন ভারতবাসী শিল্প-বিপ্লবের অগ্রদূত ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের তুলনায় প্রায় একশত বছরের মত পিছিয়ে ছিল। কিন্তু ১৯০৫এর বঙ্গ-বিপ্লবের আগুনে যে জাগরণ ও পুনর্গঠনের সূচনা হয়, তা পরবর্ত্তী যুগে 'বাড়তির পথে' চলেছে। ১৯০৫এর পর থেকে বাঙ্গলা তথা ভারতে, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাঙ্ক, বীমা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কল কারখানা, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে যে পুনর্গঠন সুরু হয়েছে, ভারতবাসীর সে-সকল নয়া নয়া কৃতিত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গৌরবের সাথে সমভাবেই ঠাঁই পেয়েছে বিনয় সরকারের বক্তৃতা ও লেখালেখিতে। এক কথায়, বস্তুনিষ্ঠ মেজাজে ভারতের গৌরব প্রচারই ছিল বিদেশে তাঁর অসংখ্য কাজকর্ম্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাঁর প্রচারকার্য্য যে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তার নিদর্শন মেলে তাঁর বক্তৃতা ও লেখালেখি সম্পর্কে বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত বাঘা-বাঘা পণ্ডিতদের উক্তি, মন্তব্য ও সমালোচনায়। জার্ম্মাণ পণ্ডিত কার্ল হাউসহোফারের মতে বিনয় সরকার ভারতীয় বহু জাতীয় নেতার চেয়ে বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে বেশী কাজ করেছেন। তার

'গেয়োপলিটিক' পত্রিকায় এই মতটা খোদাই করা আছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিদেশে থাকাকালীন বিনয় সরকার তাঁর কাজকর্ম্মের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতের অর্থে-পুষ্ট যে সকল ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মস্কো, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, রোমে নিযুক্ত আছেন, তাদের যে-কোনর চেয়ে পরাধীন ভারতের 'সংগ্রাম-দূত' বিনয় সরকারের ইজ্জৎ বেশী।

বিশ্ব পর্য্যটন কালে বিনয় সরকার একদিকে যেমন বিশ্বের দরবারে ভারতের ঠিকানা কায়েম করবার জন্ত লড়াই চালিয়েছেন, অপর দিকে তেমনি ভারতের জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধির ও বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্ত পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে বাঙ্গালীর পাতে পরিবেষণ করেছেন। তাঁর "বর্ত্তমান জগৎ"এর তের খণ্ড (১৯১৪-৩৫) এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বইগুলির প্রতিটি লাইন প্রথম প্রকাশিত হয় কলিকাতার কোন না কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় ১৯১৪-২৫-এর ভেতর। সাত-সমুদ্র-তের-নদীর পারে অবস্থান করেও তিনি যে তাঁর প্রিয় স্বদেশের কথা, তাঁর জাতি-ভাইদের কথা ভুলতে পারেন নি, অসংখ্য কাজের মধ্যেও তাদের জ্ঞানের দারিদ্র্য, ভাষার দৈন্ত মোচনের জন্ত প্রাণপাত করেছেন, 'বর্ত্তমান জগৎ' (প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠা) তার সাক্ষ্য বহন করছে। বিনয় সরকারের বিদেশের কাজ কর্ম্ম সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য এইরূপ : "আমি বন্দে মাতরম্‌এর তিলক কেটে গোটা ভারতকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে ফিরেছি। দুনিয়ার সকলকে শুনিয়েছি,—আমাদের ছোকরারা এই কাজ করছে, পণ্ডিতেরা এই কাজ করছে, অমুক পরিষদ্ এই কাজ করেছে। যুবক বাঙ্লার আর যুবক ভারতের বিজ্ঞান-সভা, সাহিত্য-সভা, শিল্প-আন্দোলন স্বরাজ-আন্দোলন, মজুর-আন্দোলন ইত্যাদি কিছুই আমার বিদেশী বোলচালে, বক্তৃতায় বা প্রবন্ধ রচনায় বাদ পড়েনি। এইভাবে দুনিয়ার সর্ব্বত্র লেখাপড়া চালিয়েছি। আমার বিশ্বাস,—আমি কোথাও আমার জাতির আমার স্বদেশের ইজ্জত মারিনি।......নিজে গিয়ে বিদেশ দেখে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতের চাকর আমি। আমার পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব। এক সঙ্গে পাঁচ সাত হাজার বাঙ্গালীকে গোটা দুনিয়া দেখিয়ে এনেছি। বাঙ্গালী জাত এক সঙ্গে বর্ত্তমান জগৎ দেখেছে।" (নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪২৫—৪৩২)।

বিদেশে থাকাকালীন বিনয় সরকার আমেরিকার বিপ্লবী গদর পার্টির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনার ব্যাপারে জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার বেথ্‌ম্যান হলওয়েগ্‌ ও 'আর্মি-অফিসারের' সাথে কথাবার্ত্তাও চালিয়েছিলেন। পরে গদর-পার্টির ধর-পাকড় আরম্ভ হ'লে (১৯১৫) তিনি পালিয়ে পিকিং-এ চলে যান। সেখানে যে-দারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লণ্ডনস্থ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁর লেখা পত্রে (৬)।

বিশ্ব-পর্য্যটনের যুগে (১৯১৪-২৫) আর একটি বিষয়েও অধ্যাপক সরকারের দৃষ্টি পতিত হয়,—তা হ'লো অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র ও রাষ্ট্রশাস্ত্রের স্বাধীন ও উচ্চতর গবেষণা। স্বদেশী যুগেই (১৯০৫-১৪) এই বিষয়গুলিতে বাঙ্গলার দারিদ্র্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এবার নিজেই ঐ সকল বিদ্যার গবেষণা চালাতে শুরু করেন। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, কল-কারখানার মালিক ও ঐ সকল বিদ্যার পণ্ডিতদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে, পল্লীতে-পল্লীতে, সহরে-সহরে সাধারণ লোকের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ ক'রে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা ক'রে ও সর্ব্বোপরি ব্যক্তিগত পড়াশুনার মধ্য দিয়ে তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, দেশে ফিরে সে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পিছিয়ে-পড়া দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গ করেন।

---

(৬) 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসীর' বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে আমি উপরোক্ত ঘটনাবলী জানতে পারি। রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, বীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত ও বাণেশ্বর দাসও এরূপ উক্তি করেন, কেদার বাবুর উক্তি হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বিনয় সরকার' নামক ইংরেজী গ্রন্থে, পরিশিষ্ট, পৃঃ৭৫, দেখা যায়।—লেখিকা

১৯২৫-৪৯ এর যুগে ভারতে অবস্থানকালে (১৯২৯-৩১ এবং ১৯৪৯ এর মার্চ্চ-নভেম্বর বাদে) যে দিকটা অধ্যাপক সরকারের জীবনে বড় অংশ অধিকার করেছিল, সেটা হ'লো সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ধন-বিজ্ঞানের গবেষণা, গ্রন্থ প্রণয়ন এবং গবেষণা-পরিচালনা। অর্থাৎ এদিকটায় বাঙ্গালীর যে দৈন্য তিনি দেখে গিয়েছিলেন, সে অভাব পূরণ করাই হ'লো তাঁর মূল লক্ষ্য। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত (১৮ই এপ্রিল, ১৯২৭) সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "বিদ্যাবুদ্ধি কিছু থাকুক না থাকুক, ভারতবর্ষকে ঘাড়ে করে' ইয়োরামেরিকা-মিশর-জাপান-চীনে ঘুরেছি। এখন দুনিয়াকে ঘাড়ে করে' হয়েছি ভারতে হাজির।" তাই দেখি, দেশে ফিরে একদিকে তিনি যেমন নিজে ইংরেজী ও বাংলায় অর্থনীতি, সমাজশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ক বহু উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করেন, অপরদিকে তেমনি এঙ্গেলস্, মার্ক্স্, লিষ্ট, লাফার্গ প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতদের অর্থনীতি সংক্রান্ত বই বাংলায় অনুবাদ করেন। এতে বাঙ্গালীর জ্ঞানভাণ্ডারও যেমন বাড়তে থাকে, বাংলা ভাষাও তেমনি উন্নতি সাধিত হয়। অধ্যাপক সরকারের বাংলা লেখালেখির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অতি কঠিন বিষয়ও তিনি বেশ সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করে প্রকাশ করতে পারতেন। এজন্য বিষয়বস্তু কঠিন হলেও সাধারণের পক্ষে তাঁর বাংলা লেখা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

অর্থশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় বাঙ্গালী ছাত্রদের নিয়োজিত করবার জন্য বিনয় সরকার এই সময় (১৯২৫-৪৯) বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদ (১৯২৮) ও বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদ (১৯৩৭) নামে দুইটি গবেষণা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল পরিষদের কাজকর্ম প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় পরিচালিত হ'তো। একই উদ্দেশ্যে তিনি 'আর্থিক উন্নতি' নামক একটি অর্থনীতির পত্রিকাও সম্পাদন করেন (১৯২৬-৪৯)। সরকারের পরিচালনায় গবেষণা করে তাঁর অনেক ছাত্র অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে উঁচুদরের বই লিখেছেন। বিনয় সরকার সম্পাদিত "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" (১৯৩৭, ১৯৩৮) দুই খণ্ড ও "সমাজ বিজ্ঞান" (১৯৩৮) গ্রন্থে এই সকল গবেষক লেখকদের বহু প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আছে।

এছাড়া, বাঙ্গলা ও বৃহত্তর জগতের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের নিমিত্ত বিনয় সরকার আরও চারিটি পরিষদ স্থাপন করেছিলেন, যথা:—আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদ্ (১৯৩১), বঙ্গীয় জার্ম্মাণ পরিষদ্ (১৯৩১), বঙ্গীয় এশিয়া পরিষদ্ (১৯৩৮) ও বঙ্গীয় দান্তে সমিতি (১৯৩৮)। এই পরিষদ্গুলিতে ১৯৩২ সালে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় জন্মশতবার্ষিকী ও জার্ম্মাণ কবি গ্যেটের মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল। বিনয় সরকার বরাবরই বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালী কর্ত্তৃত্বে ও পরিচালনায় বিদেশী সংস্কৃতি পরিষদ্ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন বঙ্গীয় ফরাসী পরিষদ, বঙ্গীয় রুশ পরিষদ্ ইত্যাদি। তাঁর মতে ঐ সকল পরিষদের এক মাত্র বা মূল লক্ষ্য থাকবে বাঙ্গালীর চোখ দিয়ে বিদেশী সংস্কৃতি পর্য্যালোচনা করা। তাঁর বিচারে কোন দেশকেই ষোলআনা ভারতবন্ধু বিবেচনা করা ঠিক নয়। পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গেই সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বার্থে কমবেশী দহরম্ মহরম্ চালানো স্বদেশ-সেবার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ঐ সকল পরিষদে বিদেশী কর্ত্তৃত্ব তিনি পছন্দ করতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বলতেন, "হাজার হ'লেও এই অধম বঙ্গ-চন্দ্র বাঙালীর বাচ্চা।"

জীবনের সায়াহ্নে বিনয় সরকার যখন তৃতীয়বারের জন্য বিদেশে যান (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯), তখনও তাঁর যৌবনোচিত উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দৃষ্টান্তে আমেরিকা-বাসিগণ বিমুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। এবারও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সময় ভারতই তাঁর মূল বিষয়বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে (জুন-আগষ্ট, ১৯৪৯) নৃতত্ত্ব বিভাগের তদ্বিরে "ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতির" উপর যে বক্তৃতাগুলি তিনি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সেক্রেটারী গ্রেস. এল. উড. (নৃতত্ত্ব বিভাগ, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়) উক্তি করেছেন: অধ্যাপক সরকার তাঁর বিষয়বস্তু ভারতকে অতি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন।"

মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অধ্যাপক সরকার ভারতগত

প্রাণ ছিলেন। ডক্টর মণি মৌলিক তাঁর "লাষ্ট ডেজ অব বিনয় সরকার" প্রবন্ধে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১০ই জানুয়ারী. ১৯৫০) লিখেছেন, ওয়াশিংটনে থাকাকালীন অধ্যাপক সরকার আমেরিকায় অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের উপর ষ্টার্লিং-এর মুদ্রামান হ্রাসের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা ক'রে বিশেষ শঙ্কিত হ'য়ে পড়েন। পাছে মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে এর পর আমেরিকায় গিয়ে অধ্যয়ন করা কঠিনতর হয়ে পরে, পাছে আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের কারো কারো পড়া বন্ধ হ'য়ে যায়। এই সকল কথা চিন্তা ক'রে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। বিষয়টি সম্পর্কে তিনি দুতাবাসের কর্ম্মচারী ও আমেরিকার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চালিয়েছিলেন।

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থেকেও অধ্যাপক সরকার ভারত ও বাঙ্গলার কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারেন নি। হাসপাতালে কঠিন রোগ-শয্যায় শায়িত থাকাকালীন ডক্টর তারক নাথ দাস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে-সময় বিনয়বাবু স্বদেশের অনেক কথা তাঁর সাথে আলোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একদিন তিনি ডক্টর মণি মৌলিককে আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, 'তারকের হাতে আমি যেন আমার মতৃভুমির স্পর্শ অনুভব করি।' মৃত্যুর দুইদিন পুর্ব্বে মিসেস্ সরকার যখন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান (২২শে নভেম্বর, ১৯৪৯), তিনি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি ভুলে গিয়েছো সেই দিনের কথা যখন আমি তোমায় ১৯১৪ সনে জাহাজে 'বন্দে মাতরম্' গান শিখিয়েছিলাম?' স্ত্রীর সাথে অধ্যাপক সরকারের এই শেষ কথা।

★

পঙ্কিল

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি দর্দম, কর্দম আমি, ভাবে বিগলিত মাটি,
আমি পৃথিবীর প্রাথমিক উপাদান,
ঝড়ে উড়ে আসা ক্ষিতি ও অপের আমি তো বিমানঘাটী,
আমি সঙ্গীত ক্রৌঞ্চ মিথুন গান...
প্রলয় পয়োধি সম্ভূত আমি, বস্তু-বিভূতি-মিতা,
শব ও শিবের আমি দুজনারই চিতা॥

আমি তো পঙ্ক, আমার অঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে জাগে সৃষ্টি,
হোতা ও হোমের আমি নির্মম মন্ত্র,
রতি বিরতির আমি শেষ কথা, নিস্কাম কাম-দৃষ্টি,
আমি অঘটন-সংঘটনের তন্ত্র...
বিগলিত শবদেহ সম্ভূত আমি রূপ-কোকনদ,
আমি নির্মল শিব, বিমলিন প্রচ্ছদ॥

প্রবল ঘূর্ণী-প্রভঞ্জনে প্রলয়ের গ্রহ উপগ্রহ,
নিস্পেষণোজ্জীবিত স্বয়ম্ভু,
স্বতোচ্ছসিত মহাম্বুধিতে বিগলিত সর্বংসহ,
প্রলয়ে বাজাই আদি জীবনের কম্বু...
কত চূর্ণ তারকা ধূমকেতু মোর বক্ষে জাগিছে কুসুমে,
কত দধিচী অস্থি ফল হয়ে জ্বলে মোর দ্রুমে॥

দেহীর চর্মে লোমকূপে কূপে জাগি শাশ্বত ঘর্ম,
প্রেমাতুরা নারী মোর লাগি হয় জননী,
ঘর বাহিরের গণ্ডী রচনা সে শুধু আমার কর্ম,
মহাকালগলে আমি উদ্ধত কাল-ফণী...
কর্দমেমাখা বাসুকির মাথা নড়ে ওঠে বারবার,
মৃত্যুর বুকে জাগে জীবনের ঝঙ্কার॥

অয়েল

আপটন সিন্‌ক্লেয়ার ★ অনুবাদক : যতীশ বেদজ্ঞ

(৭)

পরের দিন ভোরে ওরা বেরিয়ে পড়লো ট্রাউট মাছ ধরতে আর যাবার পথে থেমে একবার চললো মিঃ হার্ডএকরের সাথে দেখা করতে। ভিতরে ঢুকবার পূর্বে ড্যাড বান্নীকে নিষেধ করে দিল কোন কথা বলতে কিম্বা মুখভঙ্গী করতে, দরকার মত ড্যাড নিজেই করবে'খন যা কিছু করবার। ওরা ঢুকতেই মিঃ হার্ডএকর জানালেন ছোট ব্যাণ্ডির প্রস্তাবের কথা; তার বাবা নাকি রাজী হয়েছেন খামারটা তাদের বিশ হাজার ডলারে বিক্রী করতে। শুনে উত্তেজনায় বান্নীর বুক উঠলো দুর দুর করে, ভালই করেছে ড্যাড আগেভাগে ওকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে, না হয়তো ও চীৎকারই করে উঠতো "ঠিক আছে ড্যাড, নিয়ে নাও।" কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বসে রইলো নির্বিকার হয়ে, আর ড্যাড বললো "আ মলো যা, ওরা আমাদের ভেবেছে কি?"

মিঃ হার্ডএকর বুঝিয়ে বললেন ও খামারটায় নাকি ভাল জমিই আছে প্রায় বিশ একরের মত; ড্যাড বললো, বেশ তো সেগুলোর জন্য না হয় একর পিছু একশ ডলারই হলো আর তার সাথে খরচপত্র বাবদ আরও না হয় ধরে দেওয়া হলো হাজার চারেক ডলার, কিন্তু তাতেও তো দেখা যাচ্ছে বাকী পাথুরে জমিগুলোর জন্য ব্যাণ্ডি ছোরাটা ওদের কাছ থেকে আদায় করতে চাচ্ছে একর পিছু চোদ্দ ডলার! বাপরে বাপরে বাপ রক্তচোষার মুখ বসানো আছে নাকি ছোরাটার ঠ্যাঙে?

দালাল উত্তর করলো "সত্য বলতে কি, মিঃ রস, ওরা কি করে জেনেছে আপনি একজন তেল ব্যবসায়ী, ওদের ধারণা আপনি নাকি তেলের খনি বসাতে যাচ্ছেন জায়গাটাতে।"

ড্যাড বললো, "ভাল কথা, খুঁজে দেখতে বলুন ওকে অত্র কে রাজি আছে ওর জমিতে তেলের খনি বসাতে, সে তেল খুঁজে পেলে আমরাও না হয় তখন লেগে যাব কুয়ো বসাতে। ইতিমধ্যে আমার কেনা জমিগুলোতেই মেলা কোয়েল জুটবে আমার শীকার করবার মত।"

শেষ পর্যন্ত ড্যাড রাজি হলো মোটমাট বার হাজার ডলারে রফা করতে, কিন্তু তাতে না হলে সে ভুলেই যাবে ঐ জমিটার কথা। গাড়ীতে চড়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট নিতেই বান্নী ফিশ ফিশ করে বললো, "বড্ড বেশী ঝুঁকি নিচ্ছ যেন ড্যাড!"

ড্যাড বলে, "ঘাবড়াও মাত—বাচ্চু, থাক না কেন ও আরো খানিকটা চ্যাং দোলা। এক্ষুনি কুয়ো বসাবার মত জমি তো মেলাই আছে আমার হাতে।"

"কিন্তু ড্যাড ও যদি তার মধ্যে অন্য লোক জোগাড় করে ফেলে কুয়ো বসাবার জন্য?"

"কিছু ভাবনা নেই তোমার খোকা। আমরাই না হয় একটা তেলের চিহ্ন দেখেছি তাই বলে অন্য কেউ তো আর তা দেখে নি। আর কিছুদিন অপেক্ষা করতেই দেখবে ছোট ব্যাণ্ডি উঠবে অধৈর্য্য হয়ে। ইতিমধ্যে চলো যাই আমরা দু-চারটে মাছ ধরবার চেষ্টা দেখিগে।"

ওখান থেকে চলে এসে একটা হ্রদ বেছে নিয়ে সমস্তদিন ওরা কাটিয়ে দিল দিব্যি সুন্দর চকচকে সব ট্রাউট মাছ ধরে। তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলো র‍্যাসকামদের খামার বাড়ীতে। চটপট মাছগুলোকে ভেজে নিল পল, তার পর তিন জনে মিলে দিব্যি আরামসে সেরে ফেললো তাদের রাতের খাওয়া। চুরুটের ধুয়ো ছাড়তে ছাড়তে ড্যাড প্রশ্ন করে চললো পলকে তার বিজ্ঞান সম্বন্ধে, আর দুঃখ জানালো ছোট বেলা সে ওসব শিখতে পারেনি বলে, ওগুলো নাকি সত্যিই সব জানবার মত জিনিষ।

কিন্তু বান্নী তো পারে প্রাণীতত্ত্ব আর পদার্থবিদ্যা শিখতে, তা না ওরা কিনা ওর মাথাটাকে ভর্তি করছে ল্যাটিন আর কবিতা দিয়ে, তারপর ঐ ইতিহাসের ব্যাপারটা, যত সব সেকেলে রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধ আর তাদের উপ-পত্নীদের কাহিনী, যা কিনা কোনদিনই আসবে না কারো কোন কম্মে।

পরদিন ভোর বেলা পলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা গিয়ে আবার বসলো সেই পাহাড়ী হ্রদে, সমস্তদিন মাছ ধরে প্রায় শোবার সময় নাগাদ ওরা ফিরে এলো বীচ্‌ সিটীতে।

বাপ্পী আবার সুরু করলো তার স্কুল আর তাদের বেসবল টীমের কোষাধ্যক্ষের নূতন কর্তব্য, আর ড্যাড লেগে গেল তার হ্যার্মিটেজ খনিতে আরও চারটে, আর ওয়ার্ডষ্টাফে তিনটে নূতন কূয়ো বসাবার কাজে। এদিকে ইউরোপের জাতিগুলোও ইতিমধ্যে গোটা দেশ জুড়ে ভাগ হয়ে পড়েছে দুটো মৃত্যু শিবিরে। লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে আসছে সেই শিবিরে যেন কোন দানবেরই মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে, দেখতে দেখতে তাদের দেহগুলো ছড়িয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো হয়ে, আর তাদের বুকের রক্তে লাল হয়ে উঠছে পৃথিবীর মাটী। খবরের কাগজগুলো ফলাও করে ছাপিয়ে চলেছে দীর্ঘ দিনব্যাপী সেই সব যুদ্ধের কাহিনী, আর পেট্রলের দর হুহু করে বেড়ে গিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলছে জে, আরনল্ড রসের ডলারের সংখ্যা।

এরই মধ্যে এসে গেল বসন্ত কাল, বার্টীর অন্ত নাই তার ভাইকে নিয়ে পরিকল্পনার। আঠার বছরের তন্বী যুবতী বার্টী, উচ্ছল তার প্রাণ প্রাচুর্য। সার্কাসের নর্তকীর মত চকচকে পোষাক পরে সে ঘুরে বেড়ায় সর্বাঙ্গে যৌবনের হিল্লোল তুলে। উজ্জ্বল আর স্বচ্ছ সিল্কে মোড়া তার পা-দুটো, আর সুচলো জুতোর 'পরে কোথাও দেখা যাবে না কোন দাগ। সব কিছুই তার হওয়া চাই তার পোষাকের সাথে রং মিলায়ে—মোজা, জুতো, টুপী, দস্তানা চাইকি হ্যাণ্ড-ব্যাগটা পর্যন্ত।

ড্যাড বলে কালে দিনে তার গাড়ীটাকেও নাকি হতে হবে অমনি মত রং মেলান। ভারী মজা পায় ড্যাড বার্টীর নামের বিলের বহর দেখে আর ড্যাডের সেই মজার মধ্যে থাকে কেমন যেন একটু বিদ্রূপেরও আমেজ; তার এই চমৎকার সুন্দর প্রজাপতিটীর ভাবসাব দেখে সে যেন একটু ভাবিতও হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু এম্মা খুড়ী বলেন, তার নাকি পুরোপুরিই অধিকার রয়েছে খুসীমত চলবার। কাজেই ড্যাডকেও মিটিয়ে দিতে হয় তার বিলের টাকা। একটা ব্যাপারে ড্যাড কিন্তু পাথরের মত অটল—তাকে তাদের সামাজিক আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার সমস্ত চেষ্টাই সে ব্যর্থ করে দিয়েছে বার্টীর। আল্লার দিব্যি! সেইটি কিছুতে হচ্ছে না—উপর তলার ঐসব আড্ডাধারীদের তার ভীষণ ভয়, বিশেষ করে ওদের মেয়েদের, অপেরা গ্লাশ কি ঐরকম একটা কিছু চোখে দিয়ে ওরা সব নাকি তার দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকে যেন সে একটা আলুর পোকা কি ঐ জাতীয়ই কিছু। তা ছাড়া তেল তুলবার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণাই নেই তাদের সাথে কি কথাই বা বলবে ড্যাড।

এ-ব্যাপারে বাপ্পীর মনোভাবও ড্যাডেরই মত; সোসাইটির লোকের মতে কিন্তু এটা কুরুচি, কেউ কেউ বা আবার একে মনে করে একটা ফ্যাশান; অন্তত বাপ্পীর দিদি তো বলে তাই।

আঠারো বছরের কোন তরুণীর পক্ষে ষোল বছরের কোন ছেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে খেয়াল রাখা খুব কঠিন হলেও বার্টীর বড়লোক বন্ধুদেরও তো কম বয়সের ভাইবোন রয়েছে। বার্টী চায়—বাপ্পী ওর নখের তেলের দাগ মুছে এসে মেলামেশা করে তার সেই সৌখীন দুনিয়ার সাথে, আর বেছে নেয় অন্তত ওর ঐ রোজি টেনটরের চেয়ে ভাল একটা মেয়ে। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে বাপ্পী কিছু দিন সেই চেষ্টাই করে দেখলো—কিন্তু কেতাদুরস্ত ঐসব বড়মানষের ঝিদের ওর ভাল লাগলো না; ওর মতে তাদের নাকি না আছে কোন জ্ঞানগম্মি আর না আছে বিশেষ কোন কিছু করবার ক্ষমতা। কথাবার্তা তাদের সব এক ছাঁচের—আর তাও আবার সবই পরস্পরের সম্বন্ধে, নানা ইঙ্গিত—আর নিজে-দের খুসীমত তৈরী করে নেওয়া শব্দ মিশিয়ে ওরা যখন কথা বলে, তখন মনে হয় বুঝিবা কোন নূতন ভাষায় কথা বলছে তারা। সেই সব ইঙ্গিত আর শব্দের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে বসবার মত ভাল লাগেনি বাপ্পীর তাদের কাউকেই; তার চেয়ে বরঞ্চ তেলের পোষাক পরে ও গিয়ে হাজির হতো সেই সব জায়গায় ওদের যেখানে কাজ চলছে নূতন কূয়ো বসাবার; কোন গোঁয়ার গোবিন্দকে যদি বেয়াড়া ভাবে চলবার জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হোত খনি থেকে তবে ও গিয়ে কাজ করতো তার জায়গায় আর মিস্ত্রীদেরকে সাহায্য করতো কাদার সাথে উঠে আসা বালি আর পাথুরে নুড়ি গুলোকে কাদার নালাটার মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে জল যাতায়াতের পথটা পরিস্কার রাখতে।

এরই সাথে অন্য চিন্তারও বিরাম নেই বাপ্পীর; শীঘ্রই একটা মতলব ঠিক করে ফেলে ও গিয়ে হাজির হলো ড্যাডের কাছে।

"আচ্ছা ড্যাড, প্যারাডাইসে আমাদের যে কুড়েটা তৈরী করবার কথা ছিল তার কি হলো?"

"কেন বলতো?"

"পল লিখেছে রুথ এসে নাকি এখন ওর সাথেই থাকছে। কাজেই এর পর আমরা যখন আবার কোয়েল শীকারে যাবো তখন তো কোন জায়গাই থাকবে না আমাদের থাকবার। এখন একবার ওখানে গেলে কিন্তু মন্দ হয় না ড্যাড। ছুটীও পাওয়া যাবে খানিকটা আর সেই সঙ্গে কুড়েটাও ফেলা যাবে তৈরী করে।

"কিন্তু খোকা, এই গ্রীষ্মকালে ও জায়গাটা তো "ফ্লুজিন্সের" মতই আগুন হয়ে রয়েছে।"

ফ্লুজিন্সটা যে কি আর কোথায় তা অবশ্য অন্য সকলের মত বান্নীরও নেই জানা, তা হলেও ও বললো, পলরা তো এখনও আছে ঐখানেই তা ছাড়া খানিকটা ঘামানো ভালই হবে ড্যাডের পক্ষে, মেলাই নাকি মুটিয়ে যাচ্ছে সে; তারপর সত্যই যদি দেখা যায় সে রকম একটা বেশী গরম তা হলে না হয় পাতলা পামবীচের সুট পরে ড্যাড যেন বসেই থাকে বুগেনভিল লতার ঝোপের তলায়, আর বান্নী সে সময়টা পলের কাছ থেকে দিব্যি শিখে নেবে ছুতোর মিস্ত্রির কাজটা। এতে করে হাওয়াও বদলানো হবে বেশ খানিকট—ডাক্তার ব্লাকিস্টোন এসেও নিশ্চয়ই বলবেন ঐ কথাই। শুনতে শুনতে ড্যাড হেসে ফেলে তার সেই চিরাচরিত মুচকি হাসি। বসে, ঠিক আছে, এবার থেকে সে না হয় দস্তুরই করে নেবে ঐ ওয়াটকিন্স ভাই-বোনদের।

ওরা গিয়ে আবার হাজির হলো র‍্যাসকামদের খামার বাড়ীতে, সঙ্গে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুটা। পল আর রুথ জিদ ধরলো তারা বাড়ীতে থাকবে না; শেষ পর্যন্ত রুথ গিয়ে ঘুমোলো তাঁবুটাতে আর পল তার বিছানা তৈরী করে নিলো খোলা খড়ের গাদার পরে। একটা ঘোড়া আর লাঙল ভাড়া করে নিয়ে পল এর মধ্যেই তৈরী করে ফেলেছে দিব্যি চমৎকার একটা শব্জী আর সীমের ক্ষেত, আর সেই সাথে লাগিয়ে দিয়েছে কিছু কিছু স্ট্রবেরীর চারা। ছোট একটা হাতে চালানো যন্ত্র দিয়ে সে নিজেই পরিচর্য্যা করে এই সবের আর রুথ দেখা শুনা করে গোটা ছ'য়েক দুগ্ধবতী ছাগল আর এক পাল মুরগীর।

সব চেয়ে বড় খবর হচ্ছে, পল এর মধ্যেই আনিয়ে নিয়েছে বিচারপতি মিন্টারের দেওয়া বইগুলো। রাখবার জায়গার অভাবে সেগুলোর বেশীর ভাগই এখনও রয়েছে বাক্সবন্দী, কিন্তু হাকস্‌লি, হেগেল, রেনান্‌ আর অমনি আরও কয়েকজনের বইগুলোকে পল সাজিয়ে রেখেছে প্যাকিং বাক্সের তৈরী কয়েকটা তাকের পরে, আর ঐগুলোই হচ্ছে পাঠকের আত্মার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক। রুথ বলে ওদের 'পাপ্‌' নাকি এবার একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছেন, হঠৎই বড় হয়ে ওঠায় রুথকেও আর মারা চলে না, তা ছাড়া বাতটাও তাঁর বেড়ে গিয়েছে খুবই, এমন কি ইলিও পারেনি তা সারাতে। ড্যাড পলকে বললো, নুতন ক্যাবিনটার জন্য কাঠের অর্ডার দেবার সময় সে যেন বইয়ের তাকের জন্যও বলে দেয় কিছু কাঠের কথা, তা হলে শীত কালের মধ্যেই পল পারবে সেগুলো বানিয়ে ফেলতে। পল আপত্তি করতে ড্যাড আর তার মধ্যে আর এক দফা বাদানুবাদ চল্লো এই নিয়ে—ড্যাড বললো, এ বাড়ীটা যখন পলদেরই তখন দরকার মত নিশ্চয়ই তার অধিকার আছে কয়েকটা বইয়ের তাক বানিয়ে নেবার, আর তা হলে তখন তারা এলে পর পলও পারবে তাকে দু একখানা বই পড়তে দিতে আর তাতে করে ড্যাডেরই সাহায্য করা হবে কিছু শিক্ষা পেতে তা সে যত বুড়োই হোক না কেন সে।

দিব্যি যেন একটা সুখী পরিবার ওদের, আর জায়গাটাও চমৎকার, এখানে ড্যাডকে ভাবতে হয় না তার খনির কথা, আর ভাবতে হয় না প্রধান ফোরম্যানের সাথে তার মনোমালিন্যের কথা। সে ছোকরা গিয়ে বিয়ে করেছে একটা চালিয়াৎ মেয়েকে আর তার পর থেকেই তার আর মন নেই কাজ কর্মে।

রোজভিলের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ওরা নিয়ে এসেছে ওদের দরকার মত কাঠ, পল হয়েছে প্রধান মিস্ত্রী আর বান্নী তার সাকরেদ, ড্যাড হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়ায় চারদিকে তদবির তদারক করে, তারপর এক সময় ঘেমে নেয়ে উঠে গিয়ে বসে পড়ে পুষ্পিত বুগেনভিল লতা বিতানের তলায়, রুথ এসে তখন তার পাশে দাঁড়িয় আঙ্গুর রসের বোতলটা খুলে নিয়ে, তার এই সখের বস্তুটা ড্যাড আসবার সময়ই নিয়ে এসেছে সাথে করে।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় ওরা সবাই মিলে বেড়াতে বের হয় গাড়ীতে করে। প্যারাডাইস থেকে ওরা নিয়ে আসে ওদের চিঠিপত্র আর সেই সাথে স্থানীয় একখানা ছোট কাগজ; বুড়ো মিঃ ওয়াটকিন্স সেখানার গ্রাহক। গাড়ীতে বসেই বান্নী সুরু করে দেয় সেখানা পড়তে। তারপর এক সময় চীৎকার করে ওঠে, হায় সর্বশক্তিমান ভগবান, দেখ, ড্যাড, কি ব্যাপার! সামনের পাতাটাতেই গল্প বেরিয়েছে, ইলি নাকি বিরাট এক মিটিং করেছে স্যান্টাক্লসিয়ায়, সেখানে তার উন্মত্ত ভক্তদের মধ্যে সে ঘোষণা করেছে, প্রভু নাকি তাকে আদেশ করেছেন তার তৃতীয় আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে বিরাট এক গীর্জা তৈরী করতে, সবটাই হবে তার শ্বেত পাথরের আর মাঝে মাঝে থাকবে সোনালী কাজ করা। গীর্জাটা তৈরী করতে হবে এ্যাঞ্জেল সিটীর একত্র গোটা জমির পরে আর তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হতে হবে ঠিক যেমনটি কিনা ইলি দেখেছে তার স্বপ্নে। ইলির বর্ণনামত মাপের কথা শুনে ড্যাড বললো গোটা এ্যাঞ্জেল সিটীর কোথাও নাকি পাওয়া যাবে না ঐ মাপের জমি কিন্তু তা না পাওয়া গেলেও ইলি নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছে অন্য কোন একটা ব্যবস্থার কথা—না হয়তো দরকার মত আর একটা আদেশ পেতেই বা বাধা কি! রোজ

ভিল ঈগল কাগজখানা অহংকার করে লিখেছে ইলিই নাকি স্যানএলিডো উপত্যকাকে স্থান করে দিয়েছে আমেরিকার মানচিত্রে। ইলির সভাগুলোতে সংগৃহীত অর্থেই নূতন করে তৈরী করা হবে প্যারাডাইসের এ্যাপস্টলিক গীর্জাটাকে, কিন্তু পুরানো কাঠামোটাকে রেখা দেওয়া হবে আগেরই মত, যাতে করে তীর্থযাত্রীরা এসে দেখতে পারে কোথায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল "সত্য বাণী"।

পথে ওদের দেখা হয়ে গেল মিঃ হার্ডএকরের সাথে। তিনি বললেন ছোট ব্যাণ্ডি নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ড্যাডের তেলের কুয়ো বসাবার অপেক্ষা করে করে, সে এখন চাইছে বাপ-মাকে নিয়ে সহরে গিয়ে ব্যবসা করতে, কাজেই ড্যাড রাজী থাকলে সহজেই সে এখন রাজী হয়ে যাবে তার প্রস্তাবই মেনে নিতে। ড্যাড বললো, ঠিক আছে, ওরা জানালেই সে গিয়ে শেষ করে আসবে দলিল রেজেস্ট্রারীর কাজ। পরদিনই গাড়ী হাকিয়ে মিঃ হার্ডএকর এসে হাজির হলো র‍্যাসকাম খামারে, রেজিস্ট্রী করবার কর্মচারীকে ব্যাণ্ডি-দের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তিনি নাকি এর মধ্যেই দলিলে সই করিয়ে নিয়েছেন বুড়ো ব্যাণ্ডি আর তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে. কাজেই ড্যাড আর বান্নী গাড়ী চেপে গিয়ে হাজির হলে ব্যাঙ্কে, চার হাজার ডলার নগদ দিয়ে ড্যাড চুক্তিতে সই করে ফেললো—জমি দখল নেবার সাথে সাথেই বাকী আট হাজার ডলারও শোধ করে দেবার সর্তে। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বের হয়ে আসতে আসতে মুচকী হেসে বান্নীকে বললো "ব্যস, খোকা, এবার তুমি সুরু করতে পার তোমার জমিতে কুয়ো বসানোর কাজ।"

বান্নীকে আর পায় কে, ও যেন খুসী হয় এখনই কাজ সুরু করতে পারলে। টেলিফোনে ড্যাড ডেকে পাঠাক তার ফোরম্যানকে আর ঠিকাদার এসে লেগে যাক রাস্তা ঘাট তৈরীর কাজে, ব্যস! কিন্তু ড্যাড যেন কেমন, সে বলে তার চেয়ে বরঞ্চ কেবিনটার কাজটাই শেষ করা যাক আগে, আর সেই অবসরে ভেবেও নেওয়া যাক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। কাজেই বান্নী গিয়ে আবার সুরু করে ওর ঘরটার চালে লোহা পিটবার কাজ। বাচ্চা ছেলেদের মতই ওর মনটা হয়ে ওঠে খুসীতে ভরপুর—শুধু একটা অস্বস্তিকর চিন্তা বার বার বিঁধতে থাকে ওর বিবেককে; ও ভেবে পায় না কি করে ও পল আর রুথের কাছে প্রকাশ করবে ওদের তেলের কুয়ো বসাবার কথাটা। হয়তো ওরা ভাববে ড্যাড ফাঁকি দিয়েই বাগিয়ে নিল ওদের জমিটা।

কিন্তু বান্নীর বরাত ভাল। হঠাৎই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা কিনা কল্পনারও অতীত। ব্যাণ্ডিদের সাথে দেনা পাওনা চুকে যাবার পর তিন দিন কেটে গেছে, ড্যাড ব্যস্ত রয়েছে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া একবার ভেবে নিতে, এমন সময় এক দুপুর বেলা রুথের বোন মিলি ওয়াটকিন্স এসে হাজির হলো বড় একটা নীল রংয়ের ছাতা মাথায় দিয়ে আর সঙ্গে নিয়ে এলো আজব এক খবর। বুড়ো মিঃ রিঙ্কাম সহর থেকে ফেরবার পথে ওদের বাড়ীতে থেমে ওদের "পাপকে" নাকি বলে গেছে—একসেলসিয়র পেট্রোলিয়ম কোম্পানী বলে বড় একটা তেলের কোম্পানী এসে লিজ নিয়েছে প্যারাডাইসের মাইলখানেক পশ্চিমে উপত্যকাটার ও পাশের কার্টারদের খামারটা, আর শীঘ্রই নাকি তারা সেখানে কুয়ো বসাতে সুরু করবে তেলের খোঁজে। বুগেনভিল লতার ছায়ায় বসে হাওয়া খেতে খেতে ড্যাডও খবরটা শুনলো মিলির কাছ থেকে। বান্নী আর পল ব্যস্ত ছিল কেবিনটার চাল লাগাতে। ড্যাডের ডাক শুনে ওরা দুজনেই এলো ছুটে, রুথও বেরিয়ে এলো মুরগীর ঘর থেকে। খবর শুনে ব্যাণ্ডি চীৎকার করে উঠলো—"একসেলসিয়র পিটি! কি আশ্চর্য, ড্যাড, ওরা তো বড় পাঁচ জনেরই একজন।"

কিছুক্ষণ ওরা দুজন তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে তারপর টেবিলের পর কিল মেরে ড্যাড বললো "ভগবানের দিব্যি! ওরা কখনও ভাল ভাবে না জেনে কুয়ো বসাতে যায় না, খোকা। আমার মনে হচ্ছে, আমাদেরও এ জায়গাটায় একটা কুয়ো বসিয়ে দেখা উচিৎ।"

রুথ বলে উঠলো, "হ্যাঁ, মিঃ রস্, সত্যিই তাই করা উচিৎ—আমাদের এবি খুড়ো তো চিরকালই বলে আসছেন এখানে নাকি তেল আছে।"

"সত্যি নাকি?" আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করে ড্যাড। তা হলে তো কথাই নেই, আমাদেরও একবার দেখতে হবে কুয়ো বসিয়ে, আর কিছু না হোক মজাতো হবে মেলাই।" মুচকি হেসে ড্যাড তাকায় বান্নীর দিকে। পরবর্তী জীবনে কত অর্থই বান্নী খুঁজে পেয়েছে ঐ হাসির মধ্যে। ড্যাড জানতো বান্নীর দুশ্চিন্তার কথা, ওয়াটকিন্সদের সম্বন্ধে ওর সমস্যাটা একটুও দেরী হয়নি তার বুঝতে, আর বুদ্ধি করে সে তাই এমন ব্যবস্থাই করেছে যাতে বান্নীকে লজ্জা পেতে না হয় পল কিম্বা রুথের কাছে। সত্যি, কজনের কপালে জোটে এরকম ড্যাড? কি ভালই না সে তাকে বাসে, তার জন্য সে কিনা করতে পারে—দরকার হলে মিথ্যে কথা বলতেও সে পিছপাও নয়। ওর বয়সের কোন ছেলের নৈতিক সমস্যার এর চেয়ে সন্তোষজনক সমাধান আর কিই বা হতে পারতো?

দ্বিধারা

শ্রীখতা

ভাগ্নীর বিবাহোপলক্ষে কলকাতা এসেছি।

জীবনের প্রথমদিক থেকে দ্বিতীয়ার্ধ বাংলাদেশের বাইরেই কেটেছে, তাই, কলকাতাটা-আমার কাছে যেন আন-কোরা নতুন। আত্মীয়, বন্ধুও ছড়িয়ে আছেন অনেক। এই সুযোগে, সহর দেখার সঙ্গে তাঁদের সাথেও দেখা-সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা রয়েছে মনে।

তা—সময়টাও ভাল পড়েছে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। না গরম, না শীত। আর একটি মাত্র আদরের ভাগ্নী। যতই অসুবিধা হোক্, না গিয়ে কি পারি?

উনি প্রথম দিনেই বল্লেন, দেখ, বেশী লোকজন আসার আগে বাইরের ঘোরাঘুরিগুলো সেরে নাও। নইলে পরে আর বেরুনো যাবে না। তারপর তোমাদের ননদ, ভ্রজে যত ইচ্ছা গল্প গুজব ক'রো।

—বেশ পতি-আজ্ঞা শিরোধার্য।

কয়েকদিন ধরে খুব দেখাশোনা হল। রেণু বল্লে, বৌদি, এত অনিয়ম করছ, দেখো আবার শরীর খরাপ না হয়ে পড়ে।...খাওয়া দাওয়া সেরে উনি সেই ঘরেই শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন, কথা শুনে বল্লেন, শরীর খারাপ কিরে? এখানে এসে তোর বৌদির চেহারার যা জৌলুষ খুলেছে, আমি তো—। মাঝপথে আমাকেই ভ্রূকুটি করে থামতে হ'ল। আঃ, বোনের সামনে কি যে বল, যা—তা। বেশ আর যাচ্ছিনে কোথাও।

উনি হাতের তালুর ওপর মাথার ভর দিয়ে পাশ ফিরে বল্লেন—যাচ্ছ না মানে? আজ সরোজের সঙ্গে দেখা কর্তে যাব যে! না গেলে বড় দুঃখিত হবে।

আমি সতরঞ্চি পেতে বালিস নিয়ে শুয়ে পড়ে বল্লাম—তিনি তোমার বাল্যবন্ধু, তুমি দেখা করে এসো। আমি আজ আর বাড়ী থেকে নড়ছি না। এমনিতেই ওদের কাছে পাই না, অনুরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আবার কবে দেখব তার ঠিক নেই। তোমার সঙ্গ আর সুখকর মনে হচ্ছে না এখন।

উনি হেসে বল্লেন, তাই কি? না, সুখকর হবে না, বন্ধু-পত্নীর আসঙ্গ?

আমি চোখের উপর হাতটা চাপা দিয়ে বল্লাম—নে তুমিই জানো। আমাকে আর বিরক্ত কোরো না, বড্ড ঘুম পেয়েছে। সত্যি কি ঘুম? না, প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতির রোমন্থন!

ও'র বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য নয়। কাজেই তাঁরাও সুবিধা-মত আসা যাওয়া করে বন্ধুত্ব রক্ষা করেন। ও'র বিশেষ বন্ধু সরোজবাবুর বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুবই, কিন্তু দৈবগতিকে আমার যাওয়া হয়ে উঠলো না। উনি ছ'দিনের ছুটী নিয়ে শুভকালে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ফিরে এলে জিজ্ঞাসা কর্লাম, কেমন দেখলে?

বেশ ভালো।

বেশ ভালো, কি? বিয়েটা না বৌটি?

দুটোই। আর তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে তাঁকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। শীগ্গিরই আসবে তারা, বুঝলে? খুশী তো এবার?

শীগ্গিরই এলেন দু'জনে। মাসখানেক না হতেই। বিনাখবরে আসার জন্যে আমি একটু বিব্রত বোধ কর্ছিলাম। সহর থেকে দূরে থাকা, চাওয়া মাত্র তো জিনিষ পাওয়া যায় না। সরোজবাবু যদিও ঘরের লোকের মতই, কিন্তু অন্য-জন তো নববধূ! কি দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করব?

নতুনবৌ, অর্থাৎ প্রমীলা, চা জলখাবার খেয়ে ও'দের সঙ্গেই গল্প করতে লাগলো। মন্দ মনে একটু বিস্মিত হলেও আমি সেটা তেমন আমল দিলাম না। কারণ রান্নার লোক থাকলেও আমাকে রান্নাঘরেই থাকতে হবে। আর ও বেচারী এই গরমের মধ্যে এসে বস্লে, সে আমার অস্বস্তিই হোত।

রান্না শেষ হতে একটু দেরী হোল। ঘরে এসে দেখি প্রমীলা শুয়ে একটা বই পড়ছে। আমাকে দেখে বল্লে, হোল আপনার হাঁড়ি ঠেলা? বাবাঃ, আমি তো ও'কে বলে দিয়েছি, যে, দেখো, যে হাতে এতদিন কলম আর বই ধরে এসেছি, সেই হাতে কিন্তু হাতা খুন্তি ধরতে পারবো না।

আমি সকৌতুকে হেসে বল্লাম হাঁ ভাই, প্রথম প্রথম এরকম অনেক সঙ্কল্পই থাকে, কিন্তু সংসারের আছাড়ে ধোপে টেঁকে না। তা, আমি কিন্তু তুমি বলব, আর নাম ধরেই ডাকব তোমায়। কেমন, রাজী তো?

প্রমীলা বল্ল, তাই ডাকবেন। কারণ বয়েসে তো আপনি বড়ই।

,আমি বল্লাম, শুধু বয়েসে নয়, সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতাও আমার তোমার থেকে অনেক বেশী। শিষ্যত্ব গ্রহণ কর তো বল।

প্রমীলা হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বল্ল, থাকুন আপনি আপনার সাংসারিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। যাদের কোন কালচার নেই, তারাই ওসব নিয়ে গর্ব করে।

এমন অভাবনীয় উত্তরে চমকিত হলাম। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে, কোনরকমে বল্লাম, যাক সে কথা, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আর কাল রাতে গাড়ীতেও নিশ্চয় ভাল ঘুম হয়নি? তুমি ও'দের সঙ্গেই খেতে বস।

প্রমীলা বল্ল, না, ঘুম হবে না কেন? আমাদের ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে বার্থ রিজার্ভ করাই ছিল। তবে বেশী বেলায় খেলে সহ্য হয় না আমার। চলুন।

এতক্ষণ কাজের মধ্যে যে একটা উৎসাহ অনুভব কচ্ছিলাম, তা আর রইল না। মনে হল, অতিরিক্ত খেটেছি আজ, অত্যন্ত ক্লান্ত আমি।

ও'রা তিনজনে এসে বসলে বল্লাম, আজ আপনাদের খেতে বড় দেরী হয়ে গেল!

সরোজবাবু বল্লেন, না দেরী আর কি? সকালে যা জলযোগ হয়েছে, তাতে এর আগে খাওয়াই যেত না। তা আপনিও আমাদের সঙ্গে বসুন না বৌদি?

উনিও সায় দিলেন কথাটায়ঃ সত্যি, ব'স না। ঠাকুর দেবে'খন, যা লাগবে।

বল্লাম, ও যা আনাড়ী, কি দিতে কি দিয়ে বসবে। খেয়ে আমার সুখ হবে না। তাছাড়া দেওয়ারও যে একটা আলাদা তৃপ্তি আছে। সে তোমরা কি বুঝবে!

প্রমীলা একটু হেসে বল্লে, বৌদি তোমার ভীষণ সেকেলে। চাকর ঠাকুরকে কি করে ট্রেইণ্ড করতে হয়, তা ও'র জানা নেই। তাই নিজেই খেটে মরেন, এবং এতেই সুখ বলে মনকে প্রবোধ দেন।

উনি আশ্চর্য হয়ে একবার আমার দিকে, একবার প্রমীলার দিকে তাকিয়ে খাবারে মন দিলেন। সরোজবাবু কিছু বলতে গিয়েও অপ্রস্তুতমুখে নীরবে মাথা নীচু করলেন।

এর বিপক্ষে অনেকগুলো জোরালো যুক্তি মুখের কাছে তৈরী হয়েই ছিল। কিন্তু ও'রা অতিথি। কথাটা বাড়ালে বিশদৃশ হবে। তাই অনেক কষ্টে মুখে হাসি টেনে বল্লাম —ভাই, সংসারে কতগুলো ভাল-মন্দ আছে, যেগুলো সহজ বুদ্ধিতে চেনা যায়। আর কতগুলো আছে, যা নিজেরা রুচি অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। তুমি ঠিকই বলেছ। আমি একটু পুরনো দিনেরই লোক বটে।'

উনি হাঁফ ছেড়ে বল্লেন, যাক্ বাঁচা গেল। তোমার সংসারের পুরানো ঝরঝরে জিনিষগুলো ফেলে দিতে দেখলে আমার ভাবনা হয়, কোনদিন পুরনো বলে আমাকেই বা বাতিল কর। আজ তোমার প্রাচীনের উপরই প্রীতি জেনে মনটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। নাও, এখন তোমার কি আছে বার কর।

কথা শুনে সরোজবাবু এবারে সশব্দে হেসে উঠলেন। আবহাওয়াটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল এর পরে।

ও'দের শোবার জন্যে ঠিক করে রাখা ঘরটা দেখিয়ে দিলাম।—আসুন ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে নিন। তারপরে বিকেলে বেড়াতে যাব। কিছু বই টই পড়বেন? দে'ব?

সরোজবাবু বল্লেন, নাঃ গুরুভোজনের ফলে চোখের পাতা আপনি বুজে আসছে।

প্রমীলা বল্লে, দেখি, কি বই আছে?

বল্লাম, নামকরা প্রায় সব লেখকদের বই-ই আছে। রবীন্দ্ররচনাবলীও আছে কয়েক খণ্ড। কার লেখা তুমি পড়তে ভালবাস, বল?

প্রমীলা নাক কুঁচকে বল্ল, ওঃ আপনি বাংলা বই-এর কথা বলছেন? আমি বাংলা বই পড়ি না। কি আছে ওতে? যত ভালই 'রাইটার' হোন না কেন, ইংরেজী নভেলের মত তাদের লেখা তেমন 'ইন্টেলেক্চুয়াল' নয়। বাংলা রাবিশগুলো পড়া মানে সময় নষ্ট করা।

প্রথমে এ কথা শুনলে হতবাক হতাম, কিন্তু সকাল থেকে ওর অনেকখানি পরিচয় পেয়ে গিয়েছি বলে সহজভাবেই উত্তর দিলাম—'তুমি বাংলা বই পড়নি বলে তোমার এমন অদ্ভুত ধারণা। কিন্তু ঠাকুরপো, আপনি একজন সাহিত্য-রসিক। আপনার সহধর্মিনীকে এবার সে ধর্মে দীক্ষিত করুন।

বলে চলে এলাম। ঘরে এসে ও'কে জিজ্ঞাসা করলাম, —ঠাকুরপোর কতদিন ছুটি?—উনি হাসলেন। বল্লেন, কেন? অধৈর্য্য হয়ে পড়লে এরমধ্যে?

লজ্জিত হলাম। "কেন? এমনি জানতে চাইলে দোষ হয়?

উনি বল্লেন, দোষ নয়। ভাবছি শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাক্যালাপ থাকলে হয়।

সন্ধ্যা হবার একটু আগে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। লাল কাঁকড়ের রাস্তা। দুপাশে ঘন সবুজ ঘাস। সরোজ-

বাবু বল্লেন, আঃ, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বেশ আছ তোমরা! এখান থেকে আর ইঁট কাঠের রাজ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না।

উনি বল্লেন, সত্যি তাই। আমি আজকাল আর সহরে গিয়ে থাকতে পারি না। তেমনি, তোমরা সহরের মানুষ। দু'একদিন ভাল লাগবে। তারপর হয়ত প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে।

আমি বল্লাম, চল, সেই টিলাটার উপর গিয়ে বসি। সেখান থেকে এদিকটা ভারী সুন্দর লাগে দেখতে। যদিও রাস্তাটায় একটু ধুলো বেশী।

সরোজবাবু বল্লেন, তাতে কি? চলুন, চলুন

প্রমীলা চাপা বিরক্তির স্বরে বল্লে, এই ধুলোর রাজ্য আমার মাইশুর জর্জেটটা পরে আসাই ভুল হয়েছে। ট্রাঙ্ক-ভর্তি সিল্কগুলো শুধু শুধু আনলাম!

সরোজবাবু মৃদুস্বরে বল্লেন, এমন একটা সন্ধ্যার জন্যে যদি তোমার দামী শাড়ীখানা নষ্টই হয়, তবে সেটা এই আনন্দের মূল্য বলেই ধরে নিও।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রির সীমানায় পৌঁছল। শুক্লা দশমীর চাঁদের আলোয় আমরা ক'জন বসে আছি স্পষ্ট-অস্পষ্টর আলো-আঁধারে। ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে। সহজেই মনটা কেমন এক খুশীতে ভরে উঠেছে।

সরোজবাবু বল্লেন, বৌদি, এমন চমৎকার পরিবেশ আপনার একখানি গান না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সেই কবে শুনেছিলাম। করুন না।

বল্লাম, আমার গাইতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রমীলা, তুমি আগে ধরো না একটা।

প্রমীলা বল্ল, আমার রস কস একটু কম। সায়েন্সের ষ্টুডেন্ট কি না! আপনার গান শুনতে আপনার দেওরের ইচ্ছা হয়েছে। আপনিই করুন।

সরোজবাবু বল্লেন, হাঁ, সেদিক থেকে বৌদির কৃতিত্ব অনেক বেশী। কারণ উনিও একদিন সায়েন্সের ষ্টুডেন্ট ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আর্টকেও আয়ত্বাধীন করেছেন।

এরপর গান করা বিড়ম্বনা। বাড়ী এসে প্রমীলা জানাল, এই বন-গাঁয়ে কি মানুষ থাকে? কালকেই চলে যাবে, যেমন করে হোক।

খাবার সময় সরোজবাবু ভারী গলায় বল্লেন—আপনার আদর-যত্নের কথা চিরকাল মনে থাকবে বৌদি। আমাদের কথাও আপনার মনে থাকবে। সেই জন্যেই আপনাদের যাওয়ার নিমন্ত্রণ করার আর উপায় থাকলো না।

১৯০৫এ বাঙালী স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে শিল্পে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে ঝুঁকেছিল। উৎসাহ উত্তেজনায় স্বদেশী শিল্প জন্মলাভ করেছিল অনেকগুলি, কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী বন্যার জলের মত সেগুলিকে ভেসে যেতে দিয়েছিল। সেই ভাববন্যা কাটিয়ে বাঙালীর কীর্তি স্থায়ী হয়ে রয়েছে সামান্য দু-চারটিতে।

১৯২১এ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশী শিল্পের নতুন উদ্বোধন করেছিল। তারও অধিকাংশ কালের প্রবাহে ভেসে গেছে। অসহযোগ-আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল **'কাজল কালি'** বাংলা দেশে আজও সগৌরবে টিকে আছে। এর কারণ ভাবাবেগের সঙ্গে এর আবিষ্কারক-পরিচালকদের চিত্তে নিষ্ঠা ও সততা ছিল। **'কাজল কালি'** এক জায়গাতেই থেমে থাকেনি, সময়ের এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই কালি কলমের মর্যাদা রেখে এগিয়ে চলেছে। দামে এবং গুণে হার মেনেছে যাবতীয় বিলিতী কালি।

বাংলা দেশের একজন সামান্য বাণীসেবক আমি, বিগত শতাব্দীপাদের অধিক কাল এই **'কাজল কালি'র** সাহায্যেই বাণী সাধনা ক'রে আসছি। কখনও অসুবিধেয় পড়িনি, শ্লথ হয়নি কলমের গতি, বন্ধ হয়নি লেখনীর মুখ। এরই জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবশে **'কাজল কালি'র** অক্ষয় জীবন কামনা করছি

২৬।১০।৫৩ [illegible]

চার অধ্যায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

রাত্রির বিবর্ণ ফুলে সূর্যের প্রথম কাঁপা আলো,—
জানালার নীল কাঁচে ছায়া তার ধূসর সবুজ;
হলুদ বাতাস ঘিরে কুয়াশামেয়েরা জড়োসড়োঃ
হিমেল তাদের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে শীতের সকাল॥

শালিক-চড়াইঃ কিচিকিচি ধ্বনি—অলস দুপুর,
সকালের ঘন সোনালি রৌদ্র ম্লান ছলোছল—
রুপোলি মেঘের শীত হিম হিম ছায়া টলোমল,
কৃষ্ণচূড়ার পাতায়-পাতায় তন্দ্রালু সুর!

বিকেল শেষ, ক্লান্ত মনে সন্ধ্যা নেমে আসে
জোনাকি-নীল-পাখনা ছুঁয়ে। করুণ, ম্লান ঘাসে
কুয়াশাঘন স্বপ্নময় সন্ধ্যা নামে-নামেঃ
দিনের কাঁপা সেতার-তারে সূর্য-সুর থামে!

তারপর, সব সন্ধ্যা, সব মেঘ, স্বর্ণনীল স্বপ্নরা হারালো—
তারার সরণি বেয়ে নামে রাত্রিঃ মৃত্যুহিম ছায়া...কালো...
কালো॥

লীলাবতী

মানস রায়চৌধুরী

ভেবেছি যে কতোবার, এই সব ঝিলিমিলি পাতার নিশানে
সমারোহে, বর্ণের বিস্তার কেন? অথবা চৈত্রের বনে একি
উদাসীন হাওয়ার ভেলায় ভেসে চলে এইখানে
অস্ফুট ঈপ্সার ভাষা; কার জানিনা তো, চেয়ে দেখি

কতো দ্রুত বসন্তের অবসান হয়; এ আকাশ
কোথা থেকে মেঘ মেয়ে ডেকে আনে বজ্রের ভাষায়।
অতন্দ্র প্রহর জুড়ে শাল, তাল, শিরীষ, পলাশ
কীযে আলুথালু হয় শৃঙ্গার লীলায়।

তারপরে ঘুম, স্নেহস্নাত কপোতের মতো শান্ত চাঁদ
সুরে সুরে জাল বোনে অলস অরণ্য ভরে; স্বপ্নের পাখায়
অরণ্যের সব ভয় পলাতক। হৃদয়ের সব অবসাদ
সান্ত্বনায় মুছে যায় দূর কোনো নক্ষত্রের নিবিড় ছায়ায়।

আগামী কালের রঙ

শ্রীকরুণাময় বসু

আমার প্রান্তর দেখি পরিপূর্ণ স্বপ্নের ফসলে,
একটি উচ্ছল নদী আবর্তিয়া ফেরে পাশে পাশে;
দূরের চিত্রিতা বন পাখা মেলে ময়ূরের মতো,
হেমন্তের ভোর বেলা চূর্ণ আলো ঝরে ঘাসে ঘাসে।

দিনরাত্রি ঘুম নেই, সারাক্ষণ অতন্দ্র পাহারা,
ধানের শীষ তো নয়, বনান্তের সবুজ মৌচাক;
ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরে, গাঢ় হয় মুক্তার মতন,
মধু লোভে উড়ে আসে নীলকণ্ঠী পায়রার ঝাঁক।

আশ্চর্য জ্যোৎস্নার রাতঃ সাদা যুঁই মালা করি যেন
প্রাঙ্গণের ঘাসে ঘাসে অন্যমনে ফেলে গেছে কেউ;
রুপালি নদীর ধারা অশ্রুমতী সুন্দরীর চোখ,
একটি মরাল ওড়ে বাতাসেতে আঁকি কটি ঢেউ।

বারুদের গন্ধ আসে, মন বলে তবু শান্তি চাই,
বলিষ্ঠ জীবন-প্রশ্ন রেখা আঁকে মানুষের মুখে;
আশাবাদী মন বলে, শুভ বুদ্ধি হবে জাগরিত,
আগামী কালের রঙ তুলে আনি স্বপ্নের ঝিনুকে।

নির্মল প্রত্যুষকালে নদীজলে ভেসে যাবে হাঁস,
নবীন প্রসন্ন নীল অবারিত উদার আকাশ।

মেঘমন

শিশিরকুমার দাশ

আমার ব্যাকুল মন হয়ে গেছে মেঘ
শ্রাবণের আকাশের ছায়া তার চোখে
বুকে তা'র স্নিগ্ধশ্যাম প্রাণের আবেগ
ভেসে চলে গেল আজ দ্যুলোকে-ভূলোকে।
আজকে ঝরাবো জল তোমাদের মাঠে
ঢেলে দেবো অবিশ্রান্ত দিবস-রজনী
আমার প্রাণের সুর তোমাদের বাটে
চোখের জলেতে ভেজা রস-সঞ্জীবনী।

ছড়াবো ছড়াবো জল, ভরাবো বাতাস
আমার নিঃশ্বাসে হবে পৃথিবী ব্যাকুল
আমার অঞ্জন মেখে স্নিগ্ধ নীলাকাশ
ফোটাবে অজস্র তীব্র বিদ্যুতের ফুলঃ
দেব ছায়াঃ ছায়া দিয়ে এই চারিপাশ
ঘিরে দেবো আর দিয়ে মেঘময় চুল॥

আলোচনা

অবধূতাচার্য্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব

শ্রীজনরঞ্জন রায়

রত্নপ্রসবা বঙ্গমাতার সাংস্কৃতিক বিকাশোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন, বিজ্ঞান—প্রতি বিভাগে বাংলাদেশ সারা জগতের অগ্রগমন-পথে তার চরণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সাধনরাজ্যে সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও শ্রীনিত্যগোপাল অবধূতদেব উপস্থিত হইলেন। ধর্মজগতে তখন বহু অনাচার জমিয়াছে। আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়াছে। তখন তাঁহারা আসিলেন মহৎ "সর্ব-সমন্বয়ের" নিশান হাতে নিয়া। উভয় যুগাবতারেরই আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্য আছে। পরমহংস দেব বর্ণজ্ঞানহীন, শ্যামবর্ণ, দরিদ্র, বিবাহিত, ব্রাহ্মণবেশে দেখা দিলেন। আর নিত্যগোপাল আসিলেন চিরকুমার, সুদর্শন, ধনী কায়স্থ পরিবারের শিক্ষিত সন্তানের বেশে। নিজে কোন কিছু লিখিয়া গেলেন না পরমহংসদেব। তিনি মহামূল্য উপদেশ-সম্ভার মুখে মুখে বিতরণ করিলেন, তাঁহার বহুলাংশ মহাত্মা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সংগ্রহ করেন তাঁহার ('ম' লিখিত) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও আত্মানুভূতির জ্ঞান সমৃদ্ধ ২৬ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যান। এখনও তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। নিত্যসিদ্ধ দেহ লইয়া শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব হয়। দিব্যদ্রষ্টা পরমহংসদেব পাকা জহুরীর মতো নিত্যগোপালকে প্রথম দর্শনেই চিনিতে পারেন। কী অমূল্যধন এই নিত্যগোপাল, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে তাহা আমরা পাই। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মহাভাবমগ্ন পরমহংসদেব দেবীপূজা করিতে বসিয়া সেই পূজার ফুল যখন নিজের মাথায় তুলিয়া দিতেছিলেন, সম্মুখে বালক নিত্যগোপালকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মাথাতেও সেই ফুল দিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন—"তুইও এসেছিস...আমিও এসেছি!"—এই সিদ্ধবাক্যের অর্থ অবশ্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আর এক সময়ে যখন পরমহংসদেবের সহধর্মিনী শ্রীমতী সারদা দেবী অনুযোগের সুরে স্বামীকে বলিতেছিলেন—আমি এমন বস্তু চাই যাতে মন নিশ্চিত রেখে জীবনটা সদ্ভাবে কাটাতে পারি, তখন ভাবসমাধিমগ্ন নিত্যগোপালকে নিকটে দেখিয়া তাঁহাকে সারদাদেবীর কোলে দিয়া পরমহংসদেব বলেন—"এই তোমার সদ্ভাবে জীবন কাটাবার সুযোগ করে দিলাম ...গোপালকে (নিত্যগোপালের ডাকনাম ছিল গোপাল) নাও এর সেবা করো, তা'হলেই জীবন বেশ কাটবে।" তৎপরে জননী নির্বিশেষে চিরদিন স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন সারদা দেবী এই আত্মভোলা পিতৃমাতৃহীন নিত্যগোপালকে। পরমহংসদেব অপেক্ষা নিত্যগোপাল বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের আবির্ভাব হয় ২০-২-১৮৩৩ সালে ও তিরোভাব হয় ১৬-৮-১৮৮৬ সালে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব হয় ১৮৫৫ ২৫শে মার্চ্চ রবিবার ১৩ই চৈত্র ১২৬১ বাসন্তী অষ্টমীতে এবং তিরোভাব হয় ১৯১০ সালের ২০শে জানুয়ারী শনিবার ৭ই মাঘ ১৩১৭ তারিখে। পরমহংসদেবের পবিত্র দেহে অগ্নিসংস্কার করা হয়। দেহভস্মাবশেষ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে সমাহিত করার আদেশ মিলে না। ইহা শুনিয়া শ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহার পৈত্রিক অর্থে ক্রীত কাঁকুড়গাছীর বাগান বাড়িতে তাহা সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাহা এক্ষণে 'কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান' নামে অভিহিত হইতেছে। শ্রীনিত্যগোপাল কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর সেই পূত-দেহ তাঁহার অন্যতম সাধনকেন্দ্র—তখন মনোহরপুকুরে জঙ্গলময় স্থানে, এখন শ্রীনিত্যগোপালের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের অবস্থানের প্রধান কেন্দ্র—'মহানির্বাণ মঠে' সমাহিত করিবার আদেশ দিয়া যান। এখন মহানির্বাণ মঠের ঠিকানা —১৯৩নং রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। শ্রীনিত্যগোপালের প্রকৃত ভক্তিযোগ স্থাপনমূলক 'ভক্তিযোগদর্শন', অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপনমূলক 'সিদ্ধান্ত দর্শন', যোগতত্ত্ব স্থাপনমূলক 'যোগদর্শন', ধর্মতত্ত্ব স্থাপনমূলক 'সর্বধর্ম নির্ণয়সার' এবং জাতিতত্ত্ব স্থাপনমূলক 'নিত্যদর্শন' নামক গ্রন্থগুলি মৌলিক তথ্যপূর্ণ। সর্বধর্ম সমন্বয় তত্ত্বই নিত্যদর্শনের প্রধান আলোচ্য। নিত্যানিত্যসমন্বয়, আত্মানাত্মসমন্বয়, জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়, সাকার নিরাকার সমন্বয়, আকার নিরাকার সমন্বয়, সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়, জড়াজড় সমন্বয়, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়, দ্বৈতাদ্বৈত 'সমন্বয়'—এই সর্বসমন্বয়তত্ত্বগুলি শ্রীনিত্যগোপাল জটিলতাহীন প্রাঞ্জল

ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আজও শ্রীনিত্যগোপালের সমস্ত পুস্তকগুলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কেবল তাঁহার ভক্তিযোগ গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠে ডঃ রাধাকৃষ্ণ, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ জর্জ হাওয়েল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, 'অনবদ্য' (very best)। শ্রীনিত্যগোপালের দুইখানি বাংলা ও একখানি ইংরাজী জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী জীবনচরিতের পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—তাঁহার দেহ প্রকৃত প্রস্তাবে দেবদেহ ছিল...তাহাতে সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইত সামান্য ভগবত প্রসঙ্গে...দেহের বর্ণও সমাধি অবস্থায় পরিবর্তিত হইত। (.."The tuning of his being was such that even the least spiritual impress had its unfailing and spontanious expression through the change of form and colour of body.").

শ্রীনিত্যগোপালের সন্ন্যাসের নাম শ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূত। ১৪ বৎসর বয়সে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজ নিত্যগোপালকে সন্ন্যাস দেন। তৎপরে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার আশ্রম বেলুচিস্থানে হিঙ্গুলাদেবী পীঠের পর্বত গুহায় চলিয়া যান। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ আদি অবধূত সম্প্রদায়ের 'কেবলানন্দ' শাখার অন্তর্গত। শ্রীনিত্যগোপালের পৈত্রিক নাম শ্রীনিত্যগোপাল বসু। শিশুকালে ডাকনাম ছিল গোপাল। আগামী ২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৪ শনিবার বাসন্তী অষ্টমীর দিন, ১১৩নং রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা, মহানির্বাণ মঠে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উৎসব সম্পাদিত হইবে।

★

সেকালের নারী শিল্পী

বেলা দে

কোন দেশের সভ্যতার সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতে হলে সেই দেশের জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর এবং পশ্চিমাংশ এবং যার একশ বছর পরে পূর্ব ও দক্ষিণাংশ মুসলমানদের অধীনে ছিল, এর পূর্বের যে যুগ তাকেই আমরা প্রাচীন বাংলা বলি, কিন্তু এ যুগের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ ও শিলালিপি এবং প্রাচীন মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ছবি এইগুলিকে অবলম্বন করে এ সম্বন্ধে যে একটা অস্পষ্ট ধারণা করা যায়, তার বেশী আর কিছু জানবার উপায় নেই। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রগণ যেমন লেখাপড়ার চর্চা করে দেশের গৌরব বর্ধন করেছেন, অশিক্ষিত শিল্পীরাও সেইরূপ চারুশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে বাংলা দেশকে গৌরবান্বিত করতে পেরেছিলেন। কাপড় বোনায় বাঙ্গালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। নানা জাতীয় গাছের ছাল বা শীস থেকে সুতা তৈরী করে যে সব চিকণ কাপড় তৈরী হোত তার নাম ছিল দুকুল। এখন আমরা যাকে 'লিনেন' বলি অনেকটা সেই জাতীয় কিন্তু খুব মিহি ও মসৃণ।

উনিশ শত বছর পূর্বে একজন গ্রীক বণিক এ দেশে এসেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে বাংলা দেশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মসলীন কাপড় বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। কাজেই সারা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য সভ্য জগতে বাংলার কাপড়ের বিশেষ আদর ছিল। এ ছাড়া বস্ত্রশিল্প খুব প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বড় রকমের একটি শিল্প ছিল।

মাটির বাসনপত্র তৈরী করা আর একটি বড় শিল্প ছিল। বাসনপত্র ও অন্যান্য তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটির অনেক জিনিসপত্র তৈরী করে এর উপর সুন্দর খোদাই-করা কাজ থাকত। পাথরের মূর্তি তৈরী খুব বড় রকমের একটি শিল্প ছিল। বাংলা দেশে প্রাচীন আমলের শত শত সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এদের গঠন ও পরিকল্পনা খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির পরিচায়ক। স্বর্ণকারেরা সোনারূপার নানা রকমের গহনা ও মণিকারেরা রত্নখচিত অনেক রকমের অলঙ্কার তৈরী করতো। তখনকার ধনীদের ব্যবহারের জন্য সোনারূপার অনেক বাসনও তৈরী হোত। কাঠের কাজেরও খুব উন্নতি হয়েছিল—যুদ্ধের রথ ও যাতায়াতের জন্য নানা রকম যান-

বাহনও কাঠে তৈরী হোত। এ ছাড়া বেত ও বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে ঘরের নানা রকম আসবাব ও ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করা হোত। আমাদের দেশের শীতল-পাটী এক আশ্চর্য শিল্প। এক সময় এই শীতলপাটী সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য এই সব শিল্পের অন্তরালে ছিলেন আমাদের অন্তঃপুরের শিল্পকলাবতীর দল। এগুলি তাঁরা অন্তঃপুরে বসে পুরুষ শিল্পীর সহযোগিতায় সমাধান করতেন।

এ ছাড়া মনে পড়ে তাঁদের কারুশিল্পের কথা—কাঁথাতে, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের চিত্র প্রভৃতি এমন সুন্দর-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সুতা দিয়ে সেলাই করতেন যে হঠাৎ দেখলে তাকে তুলি দিয়ে আঁকা একখানি বৃহৎ চিত্র বলে মনে হোত। কিন্তু এই কারুকার্যগুলির জন্য তাঁদের পয়সা খরচ করে কোনো জিনিস কিনতে হোত না। শুধু পাড়ের সুতোর সাহায্যেই তার সমাধান হোত। কোন কোন সময়ে একখানা কাঁথা তৈরী করতে প্রায় বারো বছরও সময় লেগেছে এরূপও শোনা যায়। যাঁরা এই কাঁথা প্রস্তুত করতেন তাঁদের ধৈর্য্য ও সৌন্দর্যবোধের কথা মনে পড়লে গর্ব ও আনন্দে মনটি ভরে ওঠে। পল্লীগ্রামের 'সিকা' আর একটি সুন্দর প্রয়োজনীয় জিনিস। ছোট একখানি খড়ের ঘরের চালের মাথায় আনন্দলহরী, ফুলঝুরি, সাগরফেনা প্রভৃতি নানা রকমের শিকায় রঙ্গীন পানের বাটা, গয়নার ঝাঁপি, সিঁদুর-কৌটা প্রভৃতি মেয়েদের অতি সখের জিনিস-গুলো দুলতে থাকতো। বিছানা, বালিশ টাঙিয়ে রাখবার জন্য মেয়েরা রঙ্গীন সুতো দিয়ে এক রকম সিকা তৈরী করতো। এগুলিও দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। আজ-কাল মাটির প্রদীপের চলন উঠে গেছে। এই প্রদীপের সলতে রাখবার জন্য আমাদের প্রাচীনা দিদিমা ঠাকুরমারা রং-বেরংয়ের কাপড় দিয়ে সলতেদানী তৈরী করতেন। তাতেও থাকত নানা রকম কারুকার্য। এখনো পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ পরিবারে কড়ির আলনা, কড়ির দেলনা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য আমরা বিদেশীদের অনুকরণে গৃহসজ্জা সজ্জিত করে থাকি কাজেই এ সবের প্রতি লক্ষ্য আমাদের নেই। কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখা যায় তাহলে এই সব খাঁটি স্বদেশী জিনিসগুলির সাহায্যে গৃহসজ্জার মান আরো বাড়াতে পারবো। আর আমাদেরও গর্বের বস্তু হবে যে, একদিন এই শিল্পের মধ্য দিয়ে বাংলার নারী তাঁর সরল প্রাণ ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

★

ভবিষ্যৎ-বাণী

শ্রীমতী বাণী রায়

ছায়াচ্ছন্ন ধূসর এ বনানীর তলে
আমারি সমাধি যদি লেখে ভাগ্যধাতা;
ঝরে পড়ে শাদা ফুল, খসে' কাল পাতা;
বাতাস মৃত্যুর গান কানে কানে বলে;
        স্তিমিত-দুর্বল আলো বৃক্ষশাখা চিরে'
        সহসা উজ্জ্বল করে আশ্রয় আমার,
        যুগান্তের বিষাদের গাঢ় তমো ঘিরে'
        যেখানে সমাধি রচা তপ্ত বাসনার;
যৌবন নির্বাক থাকে, মুমূর্ষু জীবন;
ডালে ডালে পত্রজালে রহস্য-লিপিকা;
অবসন্ন দিনসূর্য পশ্চিমেতে লিখা,
বাতাসের কণ্ঠে চলে মৃত্যু আলাপন।
        তুমি কি আসিবে প্রিয়, ত্রকপল লাগি',
        একবার ছুঁয়ে যাবে রিক্ত ভূমিরেখা?
        আমার অদৃশ্য নেত্রে পাব্বা ক্ষণদেখা?
        উঠিবে রোমাঞ্চ শুষ্ক কঙ্কালেতে জাগি'।
না না, তুমি আসিবেনা, দীপ্ত নাগরিক,
পদচিহ্ন কোথায় এ ম্লান বনতলে?
কোথায় তোমার স্বর ঘন গন্ধমদলে,
হে মম অসহ প্রেমে অসহ প্রেমিক?
        এ জীবনে বিরহের চির পারাবার,
        মরণের অন্তে আরও লাগিবে জোয়ার।

শিল্পীর নবজন্ম

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী

দীর্ঘ, ঋজুদেহ ভদ্রলোকটি।

নারীদেহ হ'লে কবিজনে ব'লতো—তন্বী। কিন্তু পুরুষের বেলায় সে অভিধা ঠিক হবে না। সুতরাং তিনি রোগাই।

পিছনে ওলটানো লম্বা চুলগুলো তাঁর বিন্যস্ত নয়। তেলের অভাবে রুক্ষ্ম হয়তো, কিংবা অতি-আধুনিকতার দস্তুর এ, কে বলতে পারে। পায়ে একজোড়া নিউ-কাট্, ভালো রকম পালিশ-করা। তলাটা তার আছে, মানে—আছেই ঐ পর্যন্ত। এমনি চোখে উপর থেকে তো আর দেখে নেবার উপায় নেই। পরনের কাপড়খানা ময়লা না হলেও সদ্য পাটভাঙ্গা নয়, কোঁচার অংশটুকু যত্ন করে মুড়ে কোমরের কাছে গোঁজা—মধ্যের লম্বা ছেঁড়াটা পথচারীর চোখে না ধরা পড়ে। গায়ে পাঞ্জাবী, ইস্ত্রির ভাঁজগুলো স্পষ্ট ফুটে আছে। আর পকেট? হাঁ, সেলাই-এর চিহ্ন যখন দাগে দাগে চিহ্নিত রয়েছে, তখন পকেট বৈ কি! —ভিতরের কাপড়টুকু আছে, কি ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে জুতো মোছার ন্যাকড়ায় পরিণতি পেয়েছে, কে-ই বা পরীক্ষা করে দেখছে। বুক-পকেটে কিন্তু ফাউন্টেন-পেন উঁকি দিচ্ছে,—ক্লিপসহ যে মাথাটুকু নয়, হলপ্ করে বলা যায়।

'স্বপ্নদীপ' মাসিক পত্রের আপিসে ঢুকলেন তিনি তিন-তলা সিঁড়ি ভেঙ্গে। বাইরে দাঁড়িয়ে খানিক হাঁপ নিলেন তার আগে। আপিস ঘরে এসে ইতস্ততঃ তাকালেন, যেন পরিচিত কাউকে খুঁজছেন। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে না পেয়ে পাশে উপবিষ্ট ভদ্রলোককে বললেন—সম্পাদক মশাইকে আমি চাই।

—তিনি কাজে বেরিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না—উত্তর হলো।

—আপনি?

—সহ-সম্পাদক।

আগন্তুক দাঁড়িয়ে খানিক ভেবে নিলেন। হাতের বাণ্ডিল-করা কাগজগুলো টেবিলে রেখে দিয়ে বল্লেন—লেখাটি রেখে গেলাম। ছাপ্‌বেন আপনাদের কাগজে—পরশু এমনি সময়ে এসে পারিশ্রমিকটা নিয়ে যাবো, জানিয়ে রাখবেন সম্পাদক মশাইকে।

উত্তরের অবসর না দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর গমনপথের দিকে খানিক বিহ্বলভাবে চেয়ে থেকে সহ-সম্পাদক তাড়াতাড়ি উঠে কাগজের বাণ্ডিলটা খুললেন—সাহিত্য-বিষয়ক তথ্যবহুল একটি গবেষণা। লেখক—শ্যামল সেন।

সুসাহিত্যিক শ্যামল সেন!—অবাক হবার কথাই বটে। নিজে উপযাচক হয়ে লেখা দিয়ে গেলেন তিনি। বহু ধরণা দিয়ে আর সাধ্যসাধনা করে যাঁর কাছ থেকে বছরে একটি লেখাও বের করা যায় না। কোথায় থাকেন, কি যে করেন—হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না তাঁর।

ডেকে ফেরালে কেমন হয়,—একটু আলাপ করা মন্দ কি? কিন্তু এতক্ষণ পরে ভিড়ের মাঝে আর কি খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁকে?

কদিন জ্বর ভোগের পর আজই প্রথম পথে বের হয়েছেন শ্যামল সেন। বেহুঁস অবস্থায় কেটেছিল দুদিন। জ্বর ছাড়লেও সপ্তাখানেকের মধ্যে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পাননি। মাথা এখনও টলে। আজ কয়টা টাকার বড় দরকার পড়েছিল, তাই পুরানো ফাইল থেকে একটা প্রবন্ধ বেছে নিয়ে 'স্বপ্নদীপ' আপিসে এসেছিলেন, দেখা হলো না সম্পাদকের সঙ্গে।

এখনি বাসায় ফেরা ঠিক হবে কি? না—বাসাই বা কোথায়! ছিল হয়তো একটা, কিন্তু ফেরার পথ বুঝি বন্ধ এতক্ষণে। কতোকাল যে ভাড়া দেওয়া হয়নি। বাড়িওয়ালার চোখ এড়িয়ে গভীর রাতে ফিরে অন্ধকারে বিছানা হাতড়িয়ে কোনরকমে শুয়ে থাকতে হয়েছে রাতের পর রাত। আলো নিলে পাছে ধরা পড়তে হয়। পাশের বাড়ির খুদে মেয়েটিই যা ভরসা। বছর এগারো বারো বয়স হবে—লেখাপড়াও জানে না আদৌ, কিন্তু লেখক জাতটার ওপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। ছাপার হরফে যাঁদের লেখা বের হয়, তাঁরা তার কাছে অসাধারণ জীব। তাই, বাপ-মায়ের দৃষ্টি বাঁচিয়ে লুকিয়ে এটা-ওটা জুগিয়ে চলেছে সে নিয়মিত। তালাবন্ধ দরজার ফাঁকেও অলিগলি, রন্ধ্রপথ তার অজানা নয়। জ্বরের মাঝে তাই সাগু-বার্লিও জুটেছে তার দৌলতে, আর মিলেছে সশ্রদ্ধ সেবা, অপটু কাঁচা হাতের। কিন্তু তা কি অবহেলার?

যাক্, পকেটে এখনো একটি টাকা আর এক আনা পয়সা অবশিষ্ট। কোনক্রমে চলে যেতে পারবে দুটো দিন এ-দিয়ে। কিন্তু, আর তো হাঁটা যায় না—জুতোর পেরেকগুলো যেন হুল্ বেঁধাচ্ছে। পা দুখানা তো আর ভীষ্মদেবের নয়, যে শরশয্যা অনায়াসে বরদাস্ত করে নেবে। গাছতলায় ছোক্রা 'জুতি-সিলাই'। বাবুলোককে খোঁড়াতে দেখে ঠিক পায়ের দিকে তাগ করে বসে আছে—পুকুরে কাঁকড়ার দিকে চেয়ে লোভাতুর শেয়ালের মত ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকিয়ে। কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই বললো—সিলাই হোবে বাবু, আউর বুরুশ?

—এ্যাঁ, হাঁ। খরচ করে ফেলবে নাকি আনিটা তবে?

না না, এক আনায় তো হবে না—গোটা সোলটাই যে পালটানো দরকার। তার খরচ জোগাতে ঐ একটি টাকা আর আনিতে কুলাবে না। তাছাড়া, ছোকরাটার কাছে অভাবের দৈন্য ধরা পড়ার লজ্জাই যে হবে সার। তার চেয়ে খুঁড়িয়ে চলা—। জুতোজোড়া ঠিকই আছে। পা-দুটো টান করে চলতে চান সাহিত্যিক শ্যামল সেন।

কিন্তু এভাবে চলা কি সম্ভব? ট্রামে উঠে বসলে কেমন হয়? তাও তো হবে না। —টাকাটায় হাত পড়ে যাবে যে। তিন পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে...? চেনাজানা কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়? দ্বিতীয় শ্রেণীর লজ্জা সামলানো যাবে কি? নিরুপায় তবে,—বিক্ষত পা দুটি আর দুর্বল দেহের বোঝা বয়ে চলতেই হবে এখন।

পথের ধারে অন্ধ ভিক্ষুকটা বসে হাত পেতে—বাবু, একটা পয়সা।...আহা, বেচারা। জন্মান্ধ হবে বোধহয়—পিতামাতার পাপ আর লালসা-তৃপ্তির অভিশাপ গায়ে মেখে হয়তো জন্ম নিয়েছে সে—সেই দুর্বহ ভার হয়েছে জীবনে দিন-চলার পাথেয়। অন্ধ চোখের বন্ধ পথিকের দয়া আকর্ষণ করে মিলিয়ে দেবে তাকে একটি দুটি পয়সা, জিইয়ে রাখবে তাকে বছরের পর বছর। দেবে নাকি আনিটা ওকে?

না—কেনই-বা দেবে? এতটুকু দুর্বলতায় দুদিনের সম্বলটুকু ক্ষীণতর করে আনবে? ঐ একটি টাকা, একটি আনি আর আভিজাত্যের গর্ব তাকে ভিক্ষুকটা থেকে পৃথক করে রেখেছে, —দয়া দেখিয়ে গৌরব বোধ করায় প্রলোভিত করছে। ওটুকু সঞ্চয় মুছে দিলে কি তফাৎ থাকে সাহিত্যিক শ্যামল সেন আর অন্ধ ভিক্ষুকে! সব গরিবের এক জাত, সর্বহারার আবার দাতা সাজার লোভ! আর, এই দয়া দেখিয়ে দেশজোড়া দারিদ্র্যকে কি ঠেকাতে পারে কেউ—না, পেরেছে কোনদিন? আদিকাল হতে দানের মহিমা গেয়ে-গেয়ে দেশে একটা অনুগ্রহ-পুষ্ট জাতেরই সৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ ক'এক লক্ষ শ্রমবিমুখ ভিক্ষুনজীবী পুরুষানুক্রমে পরগাছা হয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। দেশ এদের খাওয়ায় পরায়, বিনিময়ে পায় না এতটুকু শ্রম। দেশের দৌলত হচ্ছে হতমান। এ নিয়ে শাণিত লেখনী চালাতে হবে তাঁকে। রাষ্ট্রনায়কগণ কি আজও এ-সম্বন্ধে অবহিত নন?

এগিয়ে চলতে হয় আবার। সামনে বই-এর দোকানে চটকদার বিজ্ঞাপন—নব-প্রকাশিত উপন্যাসের সারি থরে থরে সাজানো। একপাশে উঁকি দেয় দেশবিখ্যাত এক লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা'—ধূলিমলিন তার দেহ। সাহিত্যের আসরে যেন অপাঙ্‌ক্তেয় সে। বর্ণাঢ্য ছবি, চকচাক বাঁধাই উপন্যাস, যৌন-সাহিত্য, আর চটুল ব্যঞ্জনাভরা রহস্য-রোমাঞ্চ ছেড়ে কে পড়বে ঐ অতি নীরস সাহিত্যের ভূমিকা। মানুষ পড়ে না কেন এসব, কে দায়ী এই অধঃপতনে? সমঝদার পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টির দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরা কি সে-দায়িত্ব ঠিক মত পালন করে চলেছেন? বিশ্ববিদ্যালয় কতোটুকু সচেতন এবিষয়ে। জনসংখ্যার নিরক্ষর বিরাট অংশ বাদ দিলেও সাক্ষরের সংখ্যা আমাদের দেশে নগণ্য নয়। কিন্তু কেন তারা কুরুচিপূর্ণ যৌন-সাহিত্য, রহস্য-রোমাঞ্চ আর সস্তা প্রেম-কাহিনী ছাড়া চিন্তাশীল মনীষীদের রচনায় রস পায়

তরল আলতা

বলতে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" যে—শত বৎসর ধরে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে সমভাবে চলে আসছে। মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় – কারণ তারপর আর কোন আলতায় মেয়েদের মন ভরে না.........

আলতা-সিন্দুর-স্নো-ক্রীম
সকল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

না? কর্তব্যের ত্রুটি কার এবং কোথায়? শুধু দারিদ্র্যের দোহাই-ই কি সব?—

জি, বি, এস-এর নতুন বই বের হয়েছে সবে। বইখানা পাওয়ার ইচ্ছা কদিন থেকেই। মাত্র একটা টাকা দাম—কেনা যাবে নাকি এক কপি? না—আবার বিক্রয়কর লাগবে তিন পয়সা। হাতে থাকে মাত্র এক পয়সা। তারপর—! থাক, কাজ নেই কিনে।

হাসি পায় ব্যবস্থা দেখে। জ্ঞান-অর্জনের পথেও শুল্ক! ইস্কুল-কলেজের বেতনের উপরও ঐ বিক্রয়-কর ধার্য করলে কেমন হয়?—সেখানেও তো হয় বিদ্যাবিক্রয়।

নিজে পড়ার লোভ থাক আপাততঃ। মায়ের চিঠিটা বুক পকেট থেকে এখনও উঁকি দিচ্ছে। টাকার অভাবে ছোট ভাই-টার নাকি পড়া ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। নীলিমার জন্যেও এক জোড়া শাড়ি এমাসে না পাঠালেই নয়। ডাগর মেয়ে, কতো-দিন আর শুধু গ্রন্থি বেঁধে লজ্জা ঢেকে চলবে—। ওদের জন্যেই না আজ এই পথে নিষ্ক্রমণ—

তবু, আর যে চলে না। তিনটে দিন পেটে দানাপানি পড়েনি বললেই হয়। অসহ জ্বালায় অস্থির করে দিচ্ছে বেহায়াটা, সামান্য সাগু-বার্লির ঘুস আর বরদাস্ত করতে রাজি নয় সে। সামনের রেস্তোঁরাটায় একবার ঢুকে পড়া যাবে নাকি? অন্ততঃ দুখানা টোস্ট আর ধূমায়িত এক কাপ চা। সারাদিনটা তো এতেই বেশ কেটে যেতে পারে।

কিন্তু সমস্যা যে সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। ভাইয়ের পড়া কি বন্ধ করা যায় এ-বয়সে? বোনের একজোড়া শাড়ি এ-মাসেই, অন্ততঃ পক্ষে একখানা—

একটা চাকরিও কি ছাই মেলে না এবাজারে? —কি গুণই বা আছে তাঁর চাকরি জোটানোর পক্ষে। তাঁর মতো পাশ-করা উমেদার হুদো-হুদো ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের অলিতে-গলিতে। সাহিত্যিক তক্মা অচল চাকরির বাজারে। রসসৃষ্টির স্বপ্ন সওদাগরের লাভের পুঁটুলি বাঁধার কোন সহায়তাই করে না কোনদিন। সেখানের জহুরিদের কাছে বাস্তব মূল্য যাচাই করতে এগিয়ে গেলে উপহাস আর অঙ্গুলি নির্দেশে ফুটপাত দর্শন হবে দিনচলার একমাত্র পাথেয়। সে-অপমান কুড়িয়ে কথাশিল্পী যায় কেমন করে ধরণা দিতে বণিক আর ধনিকদের মানুষ-পেষাই-এর আস্তাবলে?

—চাই চানাচুর টাট্কা ভাজা, যতো খাবেন ততোই মজা। —নেবেন নাকি, বাবু, এক আনা প্যাকেট—

রাস্তার মাঝে থম্কে দাঁড়াতে দেখে চানাচুরওয়ালা আশায় এগিয়ে আসে প্রশ্নভরা চোখে। একটি আনার তরেও তার কাঙালপনা। কোনক্রমে গছাতে পারলে থোক চারটি পয়সা। কাঁকরভরা ভাত যদি জুটে থাকে, লবণ আর লঙ্কার খরচটা উঠে যাবে এতেই। নিয়ে ফেলা যাক না এক প্যাকেট। চানাচুর আর চা, মন্দ কি?...

তবু টাকাটায় টান পড়ে, তা ভাঙ্গানোর কোন সঙ্গত সমর্থন মিললো না নিজের দিক থেকে। থাক্‌গে তবে। শুধু এক কাপ চা-ই—

চানাচুরওয়ালাকে অতিক্রম করে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নিয়ে রেস্তোঁরার দরজায় পা বাড়ালেন শ্যামল সেন। হঠাৎ—

—এক টাকা, মাত্র এক টাকায়। তিন টাকার বই মাত্র একটাকায়—

পরিচিত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকার কানে এলো যেন। নিরস্ত হতে হলো চা-পানের লালসা থেকে অগত্যা। পিছন ফিরতে দেখা গেল, বিপরীত ফুটপাতে বন্ধু সত্য রায়কে বই হাতে ফেরি করতে। কবি সত্য রায়—!

এই দশা তাঁর? প্রকাশ্য দিবালোকে স্বরচিত কবিতার বই-এর কম্‌প্লিমেন্টারী কপি হাতে নিয়ে ফেরি করার লজ্জা তাঁকে ঘরে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কবিযশঃ তাঁর সুপ্রতিষ্ঠার মর্যাদায় পৌঁচেছে। আজাদ হিন্দ বাগ্-এর কোণ মাথায় বইখানা উঁচু করে ধরে সমানে চীৎকার করে চলেছেন বন্ধুবর,—সস্তা, সস্তা—তিন টাকার বই মাত্র এক টাকায়—

কিন্তু ক্রেতা কোথায়। চীৎকারই সার, কে কিনবে কবিতার বই গাঁঠের পয়সা খরচ করে। ব্যাকুল উদ্বেগ ফুটেছে তাঁর সারা মুখখানায়। চার পাঁচটি কচি-কাঁচা নিয়ে ঘরে তাঁর রুগ্না স্ত্রী। সত্যিই তিনি আজ বিপন্ন, নইলে লজ্জা ঘৃণার মাথা খেয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেন না তিনি এভাবে। সহযোগী শিল্পস্রষ্টার এ-অপমরণ চোখে দেখতে বেদনার আঘাতে বুকের পাঁজরগুলো গুঁড়িয়ে আনে যেন।

পুত্রকন্যার অনাহার, স্ত্রীর একফোঁটা ওষুধের প্রয়োজন একটা শিল্পীজীবনের অপমৃত্যু ঘটাতে বসেছে। দারিদ্র্যের কশাঘাত বড় হয়ে ফুটেছে স্রষ্টাজীবনে পরাজয়ের অবলুপ্তি মুখে। তবু জীবন-সংগ্রামে পরাভব স্বীকারের আগে মানুষের কি অক্লান্ত বাঁচার প্রচেষ্টা। বাঁচতে হবে নিজে, বাঁচাতে হবে পুত্রকন্যাকে মুখে আহার জুগিয়ে, স্ত্রীর রোগে ওষুধের সরবরাহ দিয়ে।

বাঁচার তপস্যা সর্বস্ব বিনিময়ে—

টাকাটা সদ্ব্যবহারের এই তো সুযোগ। গছিয়ে দেবে বন্ধুর অসময়ে সমব্যথীর এতটুকু সাহায্য। নিজের কথা ভাবার সময় কি এই?

তবে—প্রয়োজনের তাগিদে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এই দৈন্য

স্বীকার করেও বন্ধুর স্নেহের দান সত্য রায় হয়তো আজ গ্রহণ করবেন হাত পেতে। কিন্তু দুদিন পরে—?

আজকার দীনতার লজ্জা সারাজীবন কি-সান্ত্বনা দেবে ব্যর্থ শিল্পীর অপূর্ণতার বেদনায়। দরকার কি, তার চেয়ে—

এদিক-ওদিক তাকাতে চোখে পড়ে যায়, কাছে দাঁড়িয়ে নিম্নশ্রেণীর এক ছোকরা বিড়ি টানছে পরম আরামে। কাছে গিয়ে হাত ধরতেই সে চম্‌কে উঠলো। অপরিণত বয়সে ধূম-পানের অপরাধ তার শঙ্কিত চোখের পাতায়—

ভয়ে ভয়ে বললো—কি, বাবু?

—একটা কাজ করবি, বাবা? একটা সিগারেট পাবি বখ্‌শিস্‌—

—সিগারেট্‌? —ছোকরা উৎসাহিত হয়। শ্যামল তার কানে কানে কি কথা বলে টাকাটি হাতে গুঁজে দিলেন। আর সে-ও সানন্দে ছুটে চল্‌লো ওদিক রাস্তা পার হয়ে টাকা নিয়ে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই সে ফিরে এলো—নিন্‌, বাবু।

তার হাতে সেই বই। কবি সত্য রায়ের 'কাব্য মাল্য'—

ত্রস্তে বইটা বগলে চেপে আর আনিটা তার হাতে দিয়ে দ্রুত হাটতে শুরু করে দেন শ্যামল সেন। জুতোর পেরেক-গুলো আর তো পায়ে বিঁধ্‌ছে না মোটে, শরীরটাও দুর্বল মনে হয় না।

রাস্তার কল থেকে জল পড়ছে তখনও ঝুরঝুর করে। লোকের দৃষ্টি বাঁচিয়ে আঁজলা-ভরা জল খেয়ে নিলেন পেট পুরে।

আঃ,—একি কম তৃপ্তি!

★

বিদায়ের পর

প্রফুল্লচন্দ্র গুহ

তুমি ছেড়ে চ'লে যাওঃ দূরে তব শুনি কণ্ঠস্বর।
হাত নেড়ে বিদায়ের শেষের প্রহর
ধীরে ধীরে হ'য়ে আসে ম্লান;
ফেরা-পথে কেয়া বনে পাখী ধরে বিরহের তান।
গাছের স্মৃতিতে পড়ে তোমার বিগত সব ছায়া
আমি ফিরে আসি একা—তুমি দূরে স'রে গেছ
রেখে গেছ মোর লাগি মায়া
সমস্ত জড়ায়ে।
কানন-বীথিরে কভু দুই হাতে স্পর্শ পরায়ে
তোমারে যায় কি পাওয়া?
নাহি যায়—শুধু তাহাদেরে ধরে সেই গান গাওয়া
তার রূপে তার সুরে তোমার আস্বাদ
আগামী প্রতীক্ষা নিয়ে বাড়ায় আহ্লাদ।

ঘরে ফিরে এসে গেছি—দুই ভাগে বল্লরীর বন
মুছে গেছে আগে কতক্ষণ।
তোমার জাহাজ বুঝি এইবার পার হয়ে গেছে সীমান্তরে
চোখের যতটা দূরে তত কাছে এসেছো অন্তরে।

সাহিত্যের ধর্ম মানুষে মানুষে সেতু-রচনার ধর্ম; চেতনায় চেতনায় রাখী-বন্ধনের ধর্ম। তাই সাহিত্যের আবেদন সর্বমনে, সেখানে অক্ষাংশ কি দ্রাঘিমার ভৌগোলিক সীমাচিহ্ন অনুপস্থিত। সাহিত্য দেশে দেশে, যুগে যুগে জীবনের মিলনদূত। সাহিত্য দূরতম মানুষকে একই ঘরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিয়াছে, সাহিত্যের শুভ্র পত্রে সাদা-কালো-হল্‌দে, কোন বর্ণ-বিদ্বেষের কলঙ্কবিন্দুই তাই অমানবিক অপরাধের; অমার্জনীয় পাপের মত দুঃসহ। বহুদূরের একটা দিগন্তের সংবাদ লইয়া সম্প্রতি একটি রুশ উপন্যাস উপস্থিত হইয়াছে। অ্যান্টোনিনা কোপ্‌টায়েভার 'আইভ্যান আইভ্যানোভিচ্'। সোবিয়েত পরিবার নারী-পুরুষের ন্যায়ানুগত ঐক্যের ভিত্তিতেই কেবল নয়, পরস্পরের প্রীতিমধুর বন্ধুত্ব ও সুমিত শ্রদ্ধার উপর রচনা-করার নির্দেশ রহিয়াছে উপন্যাসটিতে। রুশের ঘরোয়া পরিবেশের একটি মনোরম চিত্র পাঁচশত আটচল্লিশ পৃষ্ঠার ক্যানভাসে নিপুণ তুলিতে আঁকিয়াছেন কোপ্‌টায়েভা। সাম্প্রতিক সোবিয়েত-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাঙলার চিন্তামানস রবীন্দ্র-রচনা, অরবিন্দ-সাধনা ইত্যাদির মধ্য দিয়া পৃথিবীর দিক-দিগন্তে বিস্ময়ের স্পন্দন তুলিয়াছে। বাঙলার ভাবরূপটির দিকে আজও বিশ্বের দৃষ্টিপ্রদীপ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। বাঙালী ঔপন্যাসিক ভবানী ভট্টাচার্যের ইংরাজী রচনাঃ সো মেনি হাঙ্গারস্‌। ক্ষুধা, আর মন্বন্তরের পটভূমিতে মর্মবিদারী এই উপন্যাসটি পৃথিবীর দৃষ্টিপ্রদীপটিকে অশ্রু-আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। বাঙলায় 'কত ক্ষুধা' নামে অনুবাদ করিয়াছেন মার্কস্‌বাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যের নেপথ্যচারী যে প্রাণপুরুষটি সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করে তাহা জীবন-দর্শন। দর্শন সৃষ্টিকে একটা পরিমিত ও সুসঙ্গত রূপ দান করে। চোখ দিয়া দেখার নাম দৃষ্টিপাত আর চোখের সঙ্গে অনুভূতির সংমিশ্রনে যে দেখা—তাহা দর্শন। প্রতিটি সুস্থ-চেতন লেখকের প্রাথমিক কর্তব্য তাহার দেশীয় দর্শনের ধারাটিকে নিজের মধ্যে ফল্গু-প্রবাহিত করা—নতুবা সৃষ্টি-কর্ম হয় অসম্পূর্ণ নয় বিকৃত হইবেই। ভারতীয় দর্শনের উপর একটি প্রামাণ্য প্রবন্ধ-পুস্তকঃ দি কালচারাল্ হেরিটেজ্ অব্ ইণ্ডিয়া। ত্রিশ জন বিখ্যাত ভারতীয় চিন্তানায়কের রচনায় সমৃদ্ধ। ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হইবার পর এই আবার নতুন প্রকাশটি বর্দ্ধিত ও মার্জিত আকারে মণ্ডিত হইয়াছে। প্রতিটি ভারতীয়ের অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ।

কিছুকাল পূর্বে বুখারেস্ট যুব উৎসবে তরুণ পাঞ্জাবী লেখক নাভতেজের 'এগেইনষ্ট্ দি টাইড্' নামক ছোট গল্পটি প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অবহেলিত ও ভাগ্যদলিত কিশোর-কিশোরী জীবনের মর্মন্তুদ পরি-প্রেক্ষিতে আগামী সংগ্রামের আলোকসঞ্চারে গল্পটি বলিষ্ঠ ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল।

দূরের আকাশ হইতে এইবার বাঙলার ঘরোয়া আবেষ্টন-টুকুতে ফিরিয়া আসা যাউক। শারদীয়া সংখ্যায় সুপ্রচুর সাহিত্য-অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া প্রায় সব লেখকই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই গতমাসের অনুল্লেখ্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে অবসন্ন অসুস্থতার অপ্রীতিকর ছাপ রহিয়াছে। আগামী মাসের দিকে সাগ্রহে প্রতীক্ষায় তাকাইয়া রহিলাম।

রবীন্দ্র-গীতিঃ (রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা)—শ্রীজয়দেব রায়। প্রাপ্তিস্থানঃ ৪১।১৩, রসা রোড় (টালিগঞ্জ), কলিকাতা। দামঃ তিন টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রসাহিত্য লইয়া এ পর্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত লইয়া ততবেশী আলোচনা হয় নাই। ইহার একটা প্রধান কারণ বোধ করি এই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ন্যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত দীর্ঘকাল মানুষের মনকে আশ্রয় করিয়া সামাজিক অনুভূতির ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই। সমাজের বৃহত্তরক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুশীলন সুরু হয় বহু দেরীতে। গত পনেরো বৎসরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অসাধারণ বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের নির্ধারিত সুর-নির্ভর সঙ্গীত সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহশীল হইয়া ওঠেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকগুলি লইয়া আলোচনায় অগ্রসর হন। এদিক হইতে খুব সম্ভব শান্তিদেব ঘোষই পথ-প্রদর্শক। তাঁহার 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' গ্রন্থ প্রকা-

শের পর গ্রন্থের মাধ্যমে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনাকে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই জাগ্রত হইয়া ওঠে। অনুরূপ আর একখানি গ্রন্থ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান'। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় দুখানি গ্রন্থই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়, তাহা যে কোনো সঙ্গীত-অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনসাধনায় অন্যূন সাড়ে তিন হাজার গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা একদিকে যেমন শব্দের ললিতগুণে ও ভাবের গভীরতায় গীতিকাব্যসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সুরমাধুর্যে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। জনপ্রিয়তার দিক হইতে যদিও রামপ্রসাদী গানের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের গান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিত্তকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, তথাপি তাহা যে ক্রমেই গণচিত্তগ্রাহী হইয়া উঠিয়া বাংলায় রবীন্দ্রগীতি যুগের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা নিশ্চিত। রামপ্রসাদের গান প্রধানতঃ মাতৃসঙ্গীত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান বহু শাখায় শাখায়িত। সেই বিস্তৃত শাখা সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলাদা আলাদাভাবে খুব বেশী আলোচনা হয় নাই। মণিলাল সেন, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কিছু কিছু আলোচনা করিলেও তাহাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক রূপটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে নাই। সেদিক হইতে শ্রীজয়দেব রায়ের আলোচ্য 'রবীন্দ্রগীতি' গ্রন্থখানি অনেক বেশী কার্যকরী হইয়াছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন স্তর লইয়া ইহাতে একটি শান্ত মধুর আলোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত বা এই জাতীয় আরও কয়েকটি দিকের আলোচনা ইহা হইতে বাদ গেলেও অন্যান্য নানা আলোচনার সূত্রে সেগুলি আসিয়া গিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে এই আলোচনা লইয়া পাল্টা আলোচনা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক হইবে না, তবে একথা নিশ্চিত যে, সকল বাদ এবং বাদানুবাদের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকৃত হইবে। আমরা লেখককে তাঁহার এই জাতীয় শ্রমস্বীকৃত গ্রন্থপ্রণয়নের জন্য সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

রথচক্রঃ গল্পগ্রন্থ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ওরিয়েন্ট্ বুক কোম্পানীঃ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৸০ টাকা মাত্র।

বাঙালী পাঠক জটিল বিষয়বস্তুর চাইতে সহজ সরল সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিতে বেশী ভালোবাসে। বাংলা-সাহিত্যে এ পর্যন্ত তাই যে-কোনো একটি ঘটনাসম্বলিত কাহিনীর পরিবর্তে যেখানেই টেক্নিক, বর্ণনাবিন্যাস ও আর্টের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চলিয়াছে, সেখানেই পাঠক তাহার বুদ্ধিদীপ্ত চেতনায় চমকিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্তরগ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হইতে পারে নাই। যেখানে কাহিনীর চমৎকারিত্ব, বাঙালী-পাঠকের মনও সেইখানেই সমধিক রসঘন হইয়া ওঠে। অনাবশ্যক 'স্টান্ট্' বা আপেক্ষিক ধাক্কা রচনাকে যতই ঐন্দ্রজালিক করিয়া তুলুক না কেন, বাঙালী পাঠকের মন তাহা বড় বেশী স্পর্শ করে না। খুব সম্ভব গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের এই কথাগুলি বিশেষভাবে জানা আছে বলিয়াই তিনি তাঁহার রচনাকে দুর্বোধ্যতা ও আকস্মিক আপেক্ষিকতায় জটিল করিয়া না তুলিয়া একটি মর্মস্পর্শী পরিণতির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া লইতেই অধিক যত্নবান। তাঁহার গল্পগুলি পড়িয়া পাঠক তাই সহজেই খুসী হয়। গল্পগুলি জীবনদর্শনের উত্তুঙ্গশিখরে অধিরূঢ় না থাকিলেও মধ্যবিত্ত বাঙালী-সমাজের এমন একটি স্তরের উপর ভিত্তিশীল, যাহা আপামর পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি-অন্তর্গত। ভাম্যমান, প্রণয়, বিন্দু-বারিধি, পরকলা, কষ্টিপাথর, আশা, স্বর্গস্বপ্ন, বয়েস, তৃষ্ণার শান্তি, ঘর, বয়ঃসন্ধি, পলায়নঃ মোট এই বারোটি গল্পকে কেন্দ্র করিয়া মানব-জীবনের রথচক্র বিঘূর্ণিত। এ যেন একটি বিরাট যৌথ বাঙালী-জীবন-রথের বারোটি স্বতন্ত্র চাকা। প্রত্যেকটি চাকা একই শিল্প-সৌকর্যে রচিত। সামাজিক পরিবেশে মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়া আলোচ্য গ্রন্থের যে চরিত্রগুলি তাহাদের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি লইয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহারা আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতেরই সুখে-দুঃখে সংগঠিত মানুষ। তাহাদের কাহাকেও বা করুণা করিতে ইচ্ছা হয়, কাহাকেও বা ভালোবাসিতে সাধ যায়। গৌরীশঙ্কর কম লিখিয়াও ভালো লেখেন; এইটি তাঁহার সৃষ্টি-সাধনার একটি প্রধান গুণ। তাঁহার 'রথচক্র' সেই স্বল্প অথচ পরিমিত রচনার একটি ভালো গল্প-সাহিত্য-সঙ্কলন।

মনোবৈজ্ঞানিকঃ নাটক। সত্যেন সিংহ প্রণীত। দাশগুপ্ত এন্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য ১৸০ টাকা মাত্র।

মনোবিজ্ঞান বিশ্বের একটি পরম বিস্ময়। ইহা লইয়া এ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী দ্বারা নানা 'থিওরী' গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতেই কিছু থিওরী সংগ্রহ করিয়া তরুণ নাট্যকার তাঁহার আলোচ্য 'মনোবৈজ্ঞানিক' নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। নাটকটির একটি প্রধান গুণ হইতেছে এই যে,

ইহা শুধু মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ফরমূলা ধরিয়াই মাত্র অগ্রসর হয় নাই, সাম্প্রতিক কালের মনুষ্যত্ববিবর্জিত বিশ্বে মানবতা প্রতিষ্ঠার দুঃসাহসিক ব্রতেও নাটকখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলির সকলেই প্রায় সমভাবে সজীব ও প্রাণবন্ত। প্রফেসর তরফদার বলিতেছেনঃ 'আমি মুখ বুজে কঠোরভাবে কর্ম করে যাই শুধু এক আশায়—নূতন মানুষ তৈরী করবো! সে-মানুষ হিংসা করবে না, লোভ করবে না, শুধু সৃষ্টি করবে অপূর্ব, অভিনব—'

উত্তরে ডাঃ সুবিমল বলিলেনঃ 'এই নোংরা পৃথিবীতে আপনার সে নবমানবের মৃত্যু ঘটতে বিশেষ বিলম্ব হবে না।'

প্রফেসর তরফদার কহিলেন, 'তাদের মৃত্যুর পূর্বেই বেরিয়ে আসবে আর এক দল, পূর্বগামীদের বাঁচিয়ে তুলবে তারা—এমনিভাবে একদিন রাষ্ট্র গ্রহণ করবে আমার মতবাদ...

দেখিবার বিষয় যে, মতবাদ প্রচারের প্রয়াসে নাটকের কোনস্থল কণ্টকিত হইয়া ওঠে নাই; মনোবিজ্ঞানের ক্রম-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের কাহিনীও ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়াছে। কোথাও নাটকীয় সংঘাত বা 'এ্যাকশন' ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তরুণ নাট্যকারের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। নাট্যকার-কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নাটকটির সমধিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। মঞ্চাধিকারীরা নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করিলে জাতির উপকার হইবে, সন্দেহ নাই।

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা : গল্পগ্রন্থ। স্বপনবুড়ো। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৷০ টাকা মাত্র।

অধুনাতন বাংলা রস-সাহিত্যের যে ধারাটি রসরাজ অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে সুরু করিয়া কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়া পরশুরামে আসিয়া ঠেকিয়াছিল, তাহার নতুন অগ্রগমনের পথ সুরু হইল শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ সমসাময়িককালের মুষ্টিমেয় কয়েকজন শক্তিশালী সাহিত্যিকের লেখনীসঞ্চালনে। শিবরাম-সাহিত্যে প্রধানতঃ 'পানিং'-এর খেলা; অখিল-সাহিত্যে মূল কাহিনীটি সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি শান্ত স্মিত-মধুর রস-গীতিতে সঞ্চরণশীলা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 'স্বপনবুড়ো' আর শ্রীঅখিল নিয়োগীতে তারতম্য শুধু লেখক-পরিচিতিতে। মূলতঃ একই শিল্পী। গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে কবি ঈশ্বর গুপ্তের একটি প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কাব্য-চরণ দ্বারা। ইহাতে গল্পগুলির সঙ্গে গ্রন্থনামার একটি সাজাত্য রক্ষা পাইয়াছে। বাংলাদেশ শুধু আজ বঙ্গভঙ্গের দ্বারাই লাঞ্ছিত নয়, নানা সমস্যাভারেও কণ্টকিত। কিন্তু বাঙালীর মননক্ষেত্র চির উর্বর ও রসপ্রবণ। বাহিরে যত আঘাত ও কণ্টকই জড়িত হউক, ভিতরে পলিমাটির সরসতা বিরাজিত। গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে সেই সরস-সুন্দর রসমাধুর্যেরই প্রাণস্পর্শী স্বাক্ষর। হাস্য-কৌতুককে কোথাও জোর করিয়া কাতুকুতুর আশ্রয় লইতে হয় নাই, কাহিনীও সেই পরিমাণে রোমান্টিকধর্মী হইয়াও বস্তুনিষ্ঠ। মোট ষোলটি গল্পে গ্রন্থটি পূর্ণ। প্রত্যেকটি গল্পই চিত্র-বিচিত্র হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকের ইহা কম আকর্ষনীয় নয়। তৎসঙ্গে আর একটি বড় আকর্ষণ হইতেছে গ্রন্থের প্রচ্ছদপট। অত্যন্ত রমনীয়, অথচ সুরুচিপূর্ণ। এজন্য প্রকাশকের আন্তরিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীমা : শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সাধারণ সাহিত্য-সংস্থা, ৭ কাশী বসু লেন, কলিকাতা ৬।

'শ্রীশ্রীমা' শ্রীসারদামণীর জীবন-কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনসঙ্গিনী শ্রীসারদামণীর জীবনালেখ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায়ই চমকপ্রদ। তাঁহার জীবন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের গিন্নীদের মতো ছিল না; অথচ সংসারাশ্রমে থাকিয়াই তিনি স্বামীধর্ম পালন করিয়া তন্ত্রের গূঢ় রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া শক্তিসাধনার উর্ধ্বস্তরে উন্নীতা হইয়াছিলেন। নদীর ধারা আসিয়া যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, এবং সমুদ্রের সঙ্গে একত্রে মিশিয়া মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রা করে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে শ্রীসারদামণীর ধর্মসংযুক্তি ঘটিয়া মহাশক্তির অমৃতসাধনা সার্থক হইয়া উঠিল। উভয়ের জীবনে একই সুর, একই বাণী, একই আলো, একই জ্যোতি। দুইয়ে মিলিয়া এক। ভারতের মূল সাধনাও একেশ্বর সাধনা। জীবনে যাহা সহধর্মাচরণ, সাধনায় তাহাই প্রাণায়াম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শ্রীসারদামণীর আবির্ভাবে যে প্রাণময় সুরের অনুরণন জাগিল, বাংলার সাধনাকে তাহাই নবীন ত্যাগে ও নবীন ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিল। সেই শ্রীশ্রীমা সারদামণীর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা দেশ তাঁহার উদ্দেশে আজ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে সমবেত হইয়াছে। শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য শ্রদ্ধার্ঘটির মূল্য যথেষ্ট। ভক্ত বাঙালী মাত্রেই এই অর্ঘটি দ্বারা লাভবান হইবেন। এই অর্ঘের সূচনায় ডাঃ কালিদাস নাগের আলিম্পন-রচনাটি একাধারে ভাবগর্ভ ও প্রাণস্পর্শী। তাহাতে আলোচ্য গ্রন্থার্ঘটির সৌষ্ঠব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশকার্যে প্রকাশকের সুরুচি প্রশংসনীয়।

সম্পাদকীয়

কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর বক্তৃতা

গত ১৩ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে কলিকাতার ব্রিগেড্ প্যারেড গ্রাউণ্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু এক নব্বই মিনিট-কালীন বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী হইতে সুরু করিয়া বিশ্বের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যা পর্যন্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীনেহেরুর আকস্মিক এই কলিকাতায় আগমণের মোটামুটি দুইটি তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ, বহুতর রাজনৈতিক সমস্যাবিজড়িত পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন কংগ্রেস-অধিবেশনের ইতিকর্তব্য ও প্রতিকূল রাজনৈতিক গোষ্ঠী-নীতির অসারতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্বোধন। মূলতঃ এই দুইটি প্রধান কার্যকে কেন্দ্র করিয়া আনুসঙ্গিক যে বিষয়গুলি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার মধ্যে এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের সাধারণ সভায় বক্তৃতা, বেলঘরিয়ায় টেক্স্‌মেকো ও কামারহাটিতে মহিলা সমবায় শিল্প-ভবন ও বরাহনগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয়ে কংগ্রেস-কর্মীদের এক বৈঠকে বক্তৃতা প্রদানই প্রধান।

তাঁহার নব্বই মিনিট-কালীন বক্তৃতায় শ্রীনেহেরু যে-যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাহা সংক্ষিপ্তাকারে এইরূপঃ

১। সাত বৎসর হইল ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও একটা দেশের জীবনে সাতটা বৎসর কিছু না। এই সাত বৎসরে দেশের ভালো কি মন্দ হইয়াছে, তাহা বিচার করা দরকার। মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ; যেখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেখানে জাতির জীবনে শিক্ষালাভ করিবার আছে।... পশ্চিমবঙ্গে এক সরকার আছে; কিন্তু দায়িত্ব কেবল এই সরকারের নহে। দেশবাসী তাঁহাদের নির্বাচন করিয়াছেন, সুতরাং দায়িত্ব এখন সমগ্র দেশের।

২। (ক) পৃথিবীতে অনেক সমস্যা আছে, ইহারই মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব যে কিরূপে ভারতবাসীর উপরে পড়িবে, তাহাই বিচার্য। দুনিয়ায় যদি লড়াই বাধেই, তবে উহার প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশেও হইবে। আমরা অবশ্য ঘোষণা করিয়াছি যে, আমরা নিরপেক্ষ থাকিব; কিন্তু লড়াই যদি বাধেই, তবে উহার প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইবেই। অবশ্য ভারতবর্ষ লড়াই চাহে না।

(খ) দেশের কল্যাণে প্রত্যেককে মনমেজাজ স্থির রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষকে গড়িতে হইবে, ইহাকে অগ্রসর করিতে

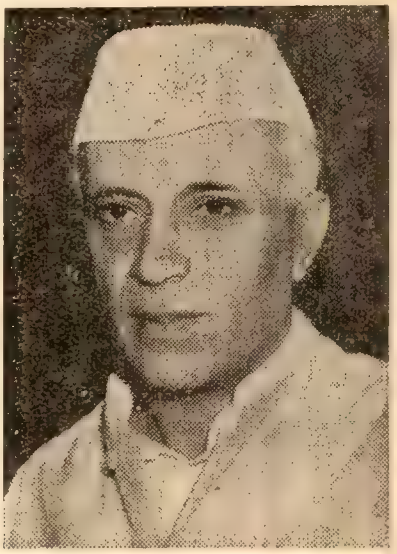

শ্রীজওহরলাল নেহেরু

হইবে, দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে, দেশকে সর্বপ্রকারে উন্নত করিতে হইবে। কেবল সামরিক শক্তিতে নহে, সংস্কৃতি-সভ্যতা-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও যাহাতে দেশ উন্নত হয়, তেমন কাজ করিতে হইবে। অনবরত এই ভাবনাই ভাবিতে হইবে। কেবল অল্পলোকের চাকুরী দেওয়ার কথা নহে, ৩৬ কোটি লোককে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নহে। সারা দেশে নানা রকম কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই কেবল সকলের কর্মসংস্থান হইতে পারে। আসলে দেশ তো গরীব নহে, দেশের লোক

গরীব। দেশে যথেষ্ট উৎপাদন আছে; ঐ উৎপাদন কাজে লাগানো এবং কিভাবে উহা লাগাইতে হইবে, উহাই বড় কথা।

(গ) প্রশ্ন এইঃ নীতি কি হইবে? যে নীতি দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, তাহাই অবলম্বন করা উচিৎ। অন্ধের মতো কাহাকেও অনুসরণ করা ঠিক নহে, তা সে আমেরিকাই হউক বা রুশিয়াই হউক। কিন্তু আমরা এই দুই দেশের নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিতে পারি।

৩। (ক) ভারতবর্ষের নীতি হইতেছে সকল দেশের সঙ্গে মিত্রতা, কাহারও বিরুদ্ধে শত্রুতা নহে। মৈত্রীভাব লইয়াই আমরা সকলের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব।

(খ) ভারতবর্ষের নীতি হইল সমগ্র শক্তি লইয়া আপন স্বাধীনতা রক্ষা করা।

(গ) আজও যে সব দেশ স্বাধীন হয় নাই, তাহারা আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া আছে। এই সব দেশের প্রতি ভারতবর্ষের পূর্ণ দরদ ও সহানুভূতি বহুদিন হইতেই আছে।

৪। খবরে প্রকাশ, পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে এক সামরিক মৈত্রী হইতেছে এবং আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিবে। আমেরিকা বড় দেশ; পাকিস্থানও স্বতন্ত্র দেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের স্পষ্ট কথা যে, যদি এমন হয় তো ভারতবর্ষের উপরও উহার প্রভাব পড়িবে। তাই ভারতীয় সংসদে আমি বলিয়াছি যে, আমরা এই ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারি না। এই কারণে আমরা পাকিস্তান ও আমেরিকাকে এ সম্পর্কে ভারতবর্ষের মনোভাব জানাইয়া দিয়াছি।

৫। ভারতবর্ষ কোরিয়ায় শান্তিসৈন্য প্রেরণ করিয়াছে।

৬। (ক) দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি,—সে উৎপাদন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেই হউক. কি বস্ত্রের ক্ষেত্রেই হউক, কি অন্য কোনো ক্ষেত্রেই হউক। আইন করিয়া আদেশ জারি করিয়া দারিদ্র বা কর্মাভাব দূর করা যায় না।

(খ) ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, এবং এই স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই হইবে। মাদ্রাজের লোক, বোম্বাইয়ের লোক, বাংলার লোক যেন না আপন আপন দিকে টানাটানি করে। তবে দেশের মহাশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে। দেশ এক এবং সে দেশ ভারতবর্ষ; দেশ বলিতে বাংলাও নহে, বোম্বাইও নহে। এ দেশে যাঁহারা থাকিবে, তাহারা যে জাতির বা বর্ণের হউক, তাহাদের সকলেরই এখানে সমান অধিকার। এখানে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নাই; একক ভারতবর্ষের বিস্মৃতি এখানে দেশদ্রোহীতারই সামিল।

৭। একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, আমরা কি চাই? সমাজবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ না গান্ধীবাদ? এই মতবাদ লইয়া যাহারা ঝগড়া বাধায়, তাহারা দেশের সংহতি বিনষ্ট করে। সকল লোক সমান, সাম্যবাদীদের এই সমাজ-পরিকল্পনার সহিত আমাদের কোনো বিরোধ নাই। যে নিপীড়িত তাহাকে নিশ্চয়ই তুলিতে হইবে। সকলকে সমান সুযোগ দিতে হইবে। সত্য কথা, সকলে সমান সুযোগ পায় না। দেশের এমন যোগ্য ছেলে আছে, যাহারা খাইতে পরিতে পায় না। অথচ ইহারাই আগামী-কালের ভারতবর্ষ। এখন হইতেই ইহাদের জন্য ব্যবস্থা না করিলে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ কি করিয়া গড়া হইবে? কিন্তু কম্যুনিষ্টরা যদি মনে করে যে, তাহারা গায়ের জোরে তাহাদের নীতি প্রবর্তন করিবে, তবে তাহারাও অবশ্যই উহার মোকাবিলা করিবে। শান্তির পথে কেহ যদি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তবে সে তাহা করুক। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা যে পথে চলিতেছে, সে পথ ধ্বংসের, গঠনের নহে।

৮। চাষিদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিতে দেরী হইতেছে, কিন্তু উচ্ছেদ যে হইতেছে, ইহাই সন্তোষের বিষয়। আসল বিষয়, জমিদারী প্রথার অবসান হইল।

৯। (ক) শ্রমিকেরা নিশ্চয়ই ট্রেড ইউনিয়ন মারফৎ দৃঢ়তার সহিত তাহাদের দাবী উত্থাপন করিবে এবং সংগ্রাম করিবে; কিন্তু যে হুল্লোড়বাজি মাঝে মাঝে কলিকাতায় দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শ্রমিকেরা যাহাই করুক, তাহা যেন তাহারা মর্যাদার সঙ্গে, শান্তি ও সভ্যতার সঙ্গে করে।

(খ) দারিদ্র্যের পাশাপাশি বড় বড় ইমারৎ নির্মানও আমি বরদাস্ত করিতে চাহি না। দরকার হইলে আইন প্রণয়ন করিয়াও উহা বন্ধ করা উচিৎ বলিয়া আমি মনে করি।

১০। (ক) ইচ্ছা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার মতো একদল লোক সকল দেশেই আছে, কিন্তু জনসাধারণ যেন তাহাতে বিভ্রান্ত না হয়।

(খ) একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আর্থিক সামর্থই সকলের চাইতে বড় কথা। দেশে যাহাতে সকল জিনিস উৎপন্ন হয়, এজন্য আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা করিয়াছি। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অর্থই হইতেছে সকলের দুঃখাবসান করা। আমাদের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ন্যাশনাল এক্সটেনশান সার্ভিস এই দিক দিয়া অনেক কাজে আসিবে।

এইভাবে যদি আমরা অগ্রসর হইতে পারি, তবে নানা ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে আর্থিক স্বাধীনতা পাইতে পারি। ইত্যাদি।

নেহেরুজী প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও সুবক্তা। তাঁহার বক্তৃতা যেমন সাবলীল, তেমনি একবার বক্তৃতা করিবার উৎস পাইলে বলিতেও পারেন অক্লান্তভাবে। আলোচ্য বক্তৃতাও তাঁহার সেই পরিচয়ই বহন করে। তাঁহার নব্বই মিনিট-কালীন সুদীর্ঘ বক্তৃতার সার মর্ম দাঁড়ায় মোটামুটি তিনটি শব্দেঃ শান্তি, ঐক্য ও সংগঠন। কিন্তু কথা হইতেছে theoretical Science এক জিনিস, applied Science অন্য জিনিস। ভারতের অবিসংবাদী নেতা হইয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা একজন নিম্নবেতনভুক স্কুল-শিক্ষকও বলিতে পারিতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আকাশ পাতাল। নেহেরুজীর বক্তব্যকে দেশবাসী applied Science রূপেই দেখিতে চায়। নীতির দিক হইতে 'এ-কাজ করিতে হইবে, সে-কাজের জন্য দুঃখ বরণের মধ্য দিয়া দৃপ্তপদে অগ্রসর হইতে হইবে, দেশকে ফলপ্রসু করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে' প্রভৃতি কথাগুলি যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি উত্তেজক সন্দেহ নাই। কিন্তু সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে এ কাজ ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব, তাহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শ্রীনেহেরুর অতিকথনের মুখে ঢাকা পড়িয়াই গিয়াছে। গত ৭ বৎসরের স্বাধীন ভারতের ঐতিহ্যের দিকে তাকাইতে গেলে চোখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। শ্রীনেহেরু বলিয়া-ছেন—একটা দেশের জীবনে সাতটা বৎসর কিছু নয়। কিন্তু কিছু নয়ই বা কি করিয়া। বক্তৃতার কোনো কোনো স্থলে তিনি যে চীন ও রুশিয়ার নজির টানিয়াছেন, বিপ্লোবত্তোর যুগে সেই রুশ ও চীন সাত বৎসর দূরের কথা, মাত্র সামান্য দুই তিন বৎসরে দেশকে যেরূপ সম্পদশালিনী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু ইহা জানেন বৈ কি? কিন্তু সেই জানিত-অভিজ্ঞতাকে তিনি গত সাত বৎসরে তাঁহার দেশের কাজে লাগাইতে পারেন নাই। তিনি যত বড় theoretical, তত বড় যদি Practical হইতে পারিতেন, তবে স্বাধীন ভারতের বন্ধ্যা সাতটি বৎসরকে তিনি এভাবে জনসমাজের কাছে উল্লেখ করিতে পারিতেন না।

তৎপর উৎপাদন। শ্রীনেহেরু একটি চমৎকার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেনঃ 'আসলে দেশ তো গরীব নহে, দেশের লোক গরীব। দেশে যথেষ্ট উৎপাদন আছে; ঐ উৎপাদন কাজে লাগানো এবং কিভাবে উহা লাগাইতে হইবে, উহাই বড় কথা।'

দেশ যথার্থই গরীব নয়। অতুল শস্যসম্পদশালিনী ভারতবর্ষ। প্রবাদ আছে—'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।' কী নাই ভারতে? কিন্তু এখন দেখিতেছি—কি আছে ভারতে? বিদেশ হইতে চাউল, গম, চিনি না আসিলে এ দেশের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, উপবাস সুরু হইয়া যায় সারা ভারতবর্ষে। কোথায় আজ দেশে উৎপাদন? এমন উৎপাদন কোথায় দেখিলেন প্রধানমন্ত্রী? দেশে মাটি আছে, মানুষ নাই। মানুষ অর্থে সজীব সক্রিয় মানুষ। যে শক্তিদ্বারা উৎপাদনকারী কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষ আপন লাস্যে বাহু সঞ্চালন করিবে, সেই শক্তি বা প্রাণোচ্ছ্বাস আজও তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া তোলা হয় নাই। ভূমিকর্ষণের যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জমি প্রাণদায়িনী হয়, এ পর্যন্ত তাহা কতদূর গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা জানি না। একাজে ভারতীয় এগ্রিকালচারাল ফার্মগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সে-দায়িত্ব পালিত হয় নাই; হইলে ভারতীয় জমিগুলির আজ এ অবস্থা হইত না। এ পর্যন্ত কষ্টকল্পিত চেষ্টাদ্বারা যাহাও উৎপাদিত হইয়াছে, চোরা-কারবারীদের হাতে পড়িয়া তাহাও 'পাচার' হইয়া গিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী একদা এই চোরাকারবারীদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে-কথাও তাঁহার ভাব-প্রবণ বক্তৃতারই অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার কল্যাণের জন্য জমিদারী উচ্ছেদ বিল গৃহীত হইল, কিন্তু মধ্যস্বত্বলোপ ভিন্ন বৃহত্তর কার্যনীতি গ্রহণের পথ এখনও সুদূরপ্রসারিই রহিয়া গিয়াছে। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ, কৃষিমুক্তি ভিন্ন ভারত-কল্যাণ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ঐতিহাসিক শ্রীনেহেরুর কাছে ইতিহাসের নজির তোলা ধৃষ্টতা, কিন্তু ইতিহাসের ধারা হইতে বস্তু-তান্ত্রিক সত্য গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত-দেহে তাহা প্রব-র্তনের পথ করিয়া দিতে পারেন নাই। ইহা আপশোষের কথা। ভাত-কাপড়ের প্রশ্ন বড় প্রশ্ন। গভর্ণমেন্ট হাতে লইয়া শ্রীনেহেরু যদি ভারতের ভাত-কাপড়ের সমস্যা সমা-ধানের কার্যে আগে অগ্রসর হইতেন, এবং সেই সঙ্গে জন-সাধারণের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক মান-উন্নয়নের দিকে অধিকতর যত্নবান হইতেন, তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাত বৎসর পর আজ দেখিতে পাইতেন—প্রায় সমস্ত 'ইজম্'ই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি বা তঁহার গভর্ণমেণ্ট সে-দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। সমস্যা আছে

সন্দেহ নাই। সমস্ত দেশই এই সমস্যাগুলি লইয়া চলে। রুশ ও চীনকেও চলিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতের মতো তাহাদের অবস্থা দাঁড়ায় নাই।

আরও একটি বড় সমস্যা হইতেছে কংগ্রেসকর্মীদের লইয়া। ভারতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট আসলে তো কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টই। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে 'পাঁচসালা পরিকল্পনা' ও 'কম্যুনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট প্রজেক্ট' প্রযোজিত হইল, জনসাধারণকে তৎসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা সম্পর্কে কংগ্রেস-কর্মীদের একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকা কি উচিত ছিল না? দেশের মানুষদের সংস্পর্শে আসা হইতে যতই তাঁহারা দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন, দেশের চিত্ত হইতে ততই তাঁহারা বাদ পড়িয়া যাইতেছেন। নিজের চোখে নিজের মৃত্যু দেখার মধ্যে যে বেদনা, বোধ করি সে-বেদনা আসিয়াও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে পীড়া দিতেছে না। বৎসরে একটি করিয়া বহু-অর্থব্যয়-সাধ্য কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের গণচিত্তের স্পর্শ পাওয়া সম্ভব নয়। বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী স্বচক্ষেই কি দেখেন নাই—তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে তরুণ বাংলা একরকম অনুপস্থিতই থাকিয়া গিয়াছে; প্রবীণধর্মী যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগও বাঙালী ছিল না। ইহার কারণ কি প্রধানমন্ত্রী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? যাঁহারা অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বোধ করি লোকবিভ্রান্তকারী ব্যক্তি ছিলেন না। ঐতিহাসিক গতিতেই নিছক বক্তৃতার উপর মানুষ আজ আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। শ্রীনেহেরু শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও সভাপতি। উভয় দায়িত্বই তাঁহার উপর সমভাবে ন্যস্ত। তিনি মঞ্চের উপরে মাইকের সামনে দাঁড়াইয়া দেশকে না দেখিয়া দেশের যথার্থ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, অনটন ও দুঃখ-দারিদ্র্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহার যথোপযোগি ব্যবস্থার পথ অবলম্বন করিলে স্বাধীনতার সাত বৎসর পর তিনি নিজেই আজ দেখিয়া উৎফুল্ল হইতে পারিতেন—তাঁহার ভারতবর্ষ—তাঁহার 'Discovery of India' হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বর্ণময়ী শোভাময়ী অলঙ্কারভূষিতা হইয়া উঠিয়াছে। বেলা গিয়া সন্ধ্যা আসিতে এখনও কিছু সময় বাকী আছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিব—তিনি, তাঁহার গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহার কংগ্রেসকর্মীরা এখনও দেশের হৃদয়কে চিনুন; গণশক্তিকে একমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে ইহাই একমাত্র পথ।

অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল বিল

গত সংখ্যায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল বিল লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ইতিপূর্বে সিলেক্ট কমিটির যে রিপোর্টটি বিবেচনাধীন ছিল, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার হেমন্তকালীন অধিবেশনে তাহা উত্থিত হইয়া নানা বিতর্কের সৃষ্টি করে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে বিগত দেড়শত বৎসরের পুরাতন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে।

জমিদারী দখল বিলের ধারাওয়ারী আলোচনায় সরকার-পক্ষ উহার ১নং ধারায় একটি সংশোধন প্রস্তাব মানিয়া লওয়ায় কলিকাতা পৌর-সভার অধীন এলাকাসমূহ বিলের বাহিরে চলিয়া যায়। মূল বিলে ছিল যে, উহা কলিকাতা পৌরসভার এলাকা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যসমস্ত যায়গায়ও প্রযুক্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিলের ষষ্ঠ অধ্যায় লইয়া বিধান সভায় তুমুল বিতর্ক চলে এবং অতঃপর সম্পূর্ণ অধ্যায়টিই সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। এই সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত বিলটির দ্বারা কেবল জমিদারদের অর্থাৎ যাঁহারা সরাসরি সরকারকে খাজনা দেন, তাঁহাদেরই ভূসম্পত্তি অধিকার করা চলিত। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে যে সমস্ত রায়ত বা অধস্তন রায়ত নিজেদের জমি বর্গাদারদের দ্বারা চাষ করান, তাঁহারাও এই বিলে বর্ণিত মধ্যসত্বভোগীর পর্যায়ে পড়িবেন এবং তাঁহাদের জমিও সরকার দখল করিয়া লইতে পারিবেন। অবশ্য তাঁহাদের খাস জমি হিসাবে ৩৩ একর জমি নিজেদের অধীনে রাখার ক্ষমতা থাকিবে।

বিল লইয়া বিরোধীপক্ষ যে সমস্ত আলোচনা করেন, তাহার মধ্যে শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী প্রভৃতির বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা সত্যের মুখোস খুলিয়া ইহাই দেখাইতে যত্নবান হইয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তন ছাড়া এই বিলের দ্বারা সরকার আর কিছুই করেন নাই। যে জন্য এতকালের আন্দোলন, কৃষকদের গণবিক্ষোভ, সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার ব্যবস্থা ইহাতে নাই। আজ দেশে ব্যক্তিগত জমিদারীর পরিবর্তে সরকার নিজেই জমিদার হইলেন। জমিদারী লোপের ব্যবস্থা এই বিলে নাই, মধ্যস্বত্বভোগীর জমি দখলের কথাই শুধু আছে। সরকার সাহসের সঙ্গে সেই কাজটি করিতে পারেন নাই। সরকার সামাজিক ন্যায়-বিচারের নামে কলিকাতা মিউনিসিপাল এলাকাকে এই

বিলের আওতা হইতে বাদ দিয়াছেন, মাছের চাষের জমি বাদ দিয়া ভেরী বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে সামাজিক ন্যায়বিচার বলা চলে না। ভূমি লইয়া যাঁহারা ফট্‌কাবাজি করেন, তাঁহাদের স্বার্থে ডাঃ রায় কলিকাতাকে বিলের আওতার বাহিরে রাখিয়াছেন। বাংলার ৫।৭ জন জমিদারকে এক কোটি দেড় কোটি টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিন হইতে মুনাফা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা দেশের কল্যাণধর্মের জন্য যে সর্ত্ত ছিল, তাহা রক্ষা না করিয়া শোষণব্যবস্থাই চালাইয়া আসিয়াছেন। আজ দরকার তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা। এতদ্ব্যতীত বকেয়া খাজনা আদায়ের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে দুঃস্থ প্রজা উচ্ছেদ একটা মর্মান্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতে পারে। খাস জমি রাখার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী ও জোতদারদের এক পরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে জমি বণ্টন করিয়া লইবে যাহাতে তাহাদের গায়ে হাত দেওয়া যাইবে না। এই ব্যবস্থা বন্ধের জন্য একটা সীমা স্থির করিয়া দেওয়া উচিৎ ছিল। চাষ হইতে যাহাদের আয়, তাহাদের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করার কথাও ভাবিবার প্রয়োজন। যাহারা ভূমিহীন এবং যাহারা জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তাহাদের হাতেই জমি দিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলেই অরাজকতা সৃষ্টি হইবে।

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, গত দেড়শত বৎসর কাল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল এবং যাহা এই রাজ্যে প্রায় অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থার অবসান ঘোষিত হইতেছে। বিরোধীপক্ষের যে সকল সদস্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তিনি দ্বিমত নহেন। পৃথিবীর আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা অচল, কারণ ইহা দেশের লোকের অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। কোনো ব্যবস্থা আজ আর সমর্থন করা যায় না বলিয়া ব্যক্তির সহিত তাঁহার কোনো বিরোধ নাই। তিনি এমন বহু জমিদারের কথা জানেন, যাঁহারা বহু সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের কথা দেশের বহু চিন্তাশীল লোক বহু পূর্ব হইতেই চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেস বহুপূর্বেই দেশে শিল্প প্রসারের কথা বলিয়া আসিতেছেন। তাহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যাহাতে জমির উপর সর্বশক্তি নিয়োগের কথা দেশের লোকের মন হইতে দূর হয়, এবং বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি দেশের মানুষ ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য কংগ্রেস সেদিন দেশে কারিগরী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিল। দেশের সম্মুখে বর্তমানে যে প্রশ্ন, তাহা হইতেছে—কিভাবে জমি দখল করা যায় এবং কেমন করিয়া তাহা জমিহীন কৃষকের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে এই কথা মনে রাখিতে হইয়াছে যে, ১২ লক্ষ জমিহীন কৃষক ও বর্গাদারের জমির জন্য ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া যেন কোনো প্রকারে উৎপাদন ব্যাহত না হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিল সম্পর্কে তিনি মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন ও জমির পুনর্বণ্টন, জমি যাহাতে আর খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন না হয়, তাহার জন্য আইন প্রণয়ন এবং দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন শিল্পে নিয়োগ প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ বারো লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। প্রকৃত উৎপাদনকারী যাহাতে তাহার অধিকার ফিরিয়া পায়, সে বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা তিনি কম উৎসাহী নহেন। এই রাজ্যের অগ্রগমনে সরকার ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিতেছেন। একদল লোকের নিকট হইতে জমি দখল করা এবং তাহা অন্য আর একদল লোকের মধ্যে বন্টন করার মধ্যেই এই ক্রমবিকাশের ধারা সীমাবদ্ধ নহে। দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তনে এই বিল সহায়ক হইবে। এই ধরনের এক জটিল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল অবশ্য সকল শ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিরোধী পক্ষ যেসকল বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন, কংগ্রেস তাহা কার্যকরী করার কৃতিত্ব লাভ করিতে চলিয়াছে, অন্য কাহাকেও বা এই বিল স্বার্থের দিক হইতে আঘাত করিতে পারে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া কেবলমাত্র বিরোধী পক্ষের সদস্য নহে, কংগ্রেস দলের সদস্যগণের মতামতের কথা তিনি বিবেচনা করিয়াছেন। সরকার যে এতবড় একটা জটিল কাজ সকলের সহযোগিতায় সুসম্পন্ন করিতে চাহিয়াছেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। এই বিল জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ প্রসারে সহায়ক হইবে।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীর বঙ্গভবনে এক বিবৃতি প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী উক্ত কথার পুনরুল্লেখ করিয়া এই বিল সম্পর্কে বলেনঃ ভূমিহীন কৃষকদিগকে ভূমিদান ও শিল্পের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করাই পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ বিলের উদ্দেশ্য।

বিরোধীপক্ষ এবং মুখ্যমন্ত্রীর অভিমত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ নাই। বিরোধী দলের মতে বিলটি সম্পর্কে এক সর্বব্যাপক প্রস্তাব রচনা করা সরকারের পক্ষে

সম্ভব ছিল। ইহার জন্য যদি আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অনুমোদনীয়। কিন্তু সরকারপক্ষ মনে করেন যে, ব্যাপক আইন প্রণয়নের জন্য আরও সময় ব্যয় না করিয়া মধ্যস্বত্ব লোপের ব্যবস্থাই আপাতত সম্পূর্ণ করা উচিৎ। ইহার ভিত্তিতে যে সুবিধাগুলি আপাতত পাওয়া যাইতেছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার বিবৃতি দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনের অচল অবরোধ ভাঙ্গিতে হইলে দ্বিধাসংকুল আধা-খেঁচরা কাজ করিয়া কখনও নবীন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামের কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্য আইনের ভিত্তিতে যত্নবান হইয়াছেন, তেমনি ইহার সর্বাত্মক সংস্কার সাধনের ভিত্তিতে ইহাকে জনকল্যাণমুখী করিয়া তোলাও তাঁহাদের পক্ষে অবিলম্বে প্রয়োজন। অন্যথায় তাঁহারা জনগণের আস্থা হারাইবেন। আইন যথাযথভাবে প্রযোজিত হইতে এখনও নিশ্চয়ই কিছু বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তবে দুর্গত বাংলার সর্ববিধ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে। উৎপাদন সম্পর্কে তাঁহাদের যে ভয়, তাহা অমূলক; কারণ কৃষিকর্মীদের জীবনের মান উন্নত হইলে তাহারা পূর্ণ উৎসাহে অধিক উৎপাদন করিয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বভাবতঃই উদ্যোগী হইবে।

জাতীয় জীবন ও সঙ্গীত

শীত সমাগমে প্রতিবৎসরই কলিকাতায় সার্কাস, কৌতুক, নৃত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মচঞ্চল কলিকাতার বিক্ষুব্ধ জীবনে কয়েকটা দিনের জন্যও অন্ততঃ আনন্দের স্পর্শ আসিয়া লাগে। এ বৎসরও তাহার অন্যথা হয় নাই। সার্কাস আসিয়াছে, কৌতুক ও নৃত্যাভিনয় হইয়াছে, অবশেষে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে 'নিখিল বঙ্গ' এবং 'তানসেন' সঙ্গীত সম্মেলন। ভারতের নানা স্থান হইতে খ্যাতিমান গীতশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ আসিয়া কয়েকদিন কলিকাতা সহরের যন্ত্রমানসের উপর সুরমানসের অমৃত সিঞ্চন করিয়া আবার স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শীতের কুহেলিকায় স্বভাবতই মানুষের জীবনে যে জড়তা আসিত, তাহার পরিবর্তে এক প্রাণস্ফূর্ত পরিবেশে নাগরিকজীবনের একটি বিশেষ অংশ সঞ্জীব হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইল, জীবনের ইহাও একটু বৃহত্তর লাভ, সন্দেহ নাই। 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'—সঙ্গীত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কলাবিদ্যা আর নাই। গীতিরস শ্রেষ্ঠ রস। এই রসের দ্বারা সঞ্জীবিত হইলেই তবে প্রাত্যাহিক জীবনের মালিন্য হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। এবারের নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ ও সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে পণ্ডিত ভি, এন্, পটবর্ধন এবং রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই গীতিরসমাধুর্য্যের ঔৎকর্ষ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। পণ্ডিত পটবর্ধন বলেনঃ এই বিদ্যা যাহাতে মানুষের জীবনকে ভাব, চিন্তা, মাধুর্য্য ও রসাবেশে আবিষ্ট করে, মানুষকে তাহার প্রতিদিনের জীবনে অনুপ্রেরণা দেয়, আবার প্রাত্যহিকতার সীমানা ছাড়াইয়া তাহাকে ইন্দ্রিয়াতীত রসের অধিকারী করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সুরের আলাপন করিতে হইবে—কাজেই জীবনের বহু বিচিত্র অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া যে বহু বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধি সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে হইবে এবং সর্বোপরি সকল সুর, সমস্ত রসকেই হৃদয়াবেগের অভিমুখে চালিত করিতে হইবে—হৃদয়সম্পর্কচ্যুত নির্বিশেষ সুরচর্চা তাই সঙ্গীতের মহত্তর উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে।

সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেনঃ আমাদের দেশে যদিও যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত এবং নৃত্যকলার যথেষ্ট আদর আছে, আর এই প্রধান কলাবিদ্যাটির অনুশীলনও প্রভূত পরিমাণেই হইতেছে, তবু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সাধারণতঃ তরল ও জনপ্রিয় নৃত্যগীতের দিকেই বেশীর ভাগ মানুষ ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। পক্ষান্তরে ভারতের যাহা অধিকতর গৌরবের বস্তু, সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধক ও বোদ্ধা, দুইয়ের সংখ্যাই ক্রমশ কমিতেছে। যাহাতে উপযুক্ত রক্ষণ ও অনুশীলনের অভাবে আমাদের এই অমূল্য সম্পদ নষ্ট না হয়, সেদিকে যেমন সকলকেই সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তেমনি সমুচিত চর্চা ও প্রচারের মাধ্যমে এই উচ্চ সঙ্গীতের সমৃদ্ধি এবং মাধুর্য সম্বন্ধেও দেশবাসীকে অধিকতর সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। রাগ-সঙ্গীতের স্থিতি ও উন্নতির জন্য স্রষ্টা ও শ্রোতা দুইয়েরই উৎকর্ষ চাই, কেন না কেবলমাত্র গলা থাকিলেই রাগ সঙ্গীতে সিদ্ধ হওয়া যায় না, আর কেবলমাত্র কান থাকিলেই, তাহা শুনিয়া রসোপভোগও করা যায় না—কণ্ঠ ও কর্ণ দুইয়েরই সাধনা দরকার, এ দুইয়ের ইদানীং অভাব হইতেছে।

সঙ্গীত যতক্ষণ না যুগচেতনার সঙ্গে জীবনের গভীর অনুভূতিকে স্পর্শ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গীতকে সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করায় স্বতঃই কুণ্ঠা জাগে। সেই সঙ্গীতকে কেবলমাত্র ব্যষ্টিগত রসস্রষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া

তাহাকে ব্যাপ্তির পথ রচনা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। একটা জাতির জীবনে যখন একই সঙ্গে সঙ্গীত প্রমূর্ত হইয়া ওঠে, তখন বুঝিতে হয়, সেই জাতি তাহার বহুতর আবিলতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুস্থ জীবন-বোধের দ্বারা মার্জিত ও উন্নত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশ এখনও এ সম্পর্কে একেবারেই পিছনের দুয়ারে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি সংগীত গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু 'Applied Science' হিসাবে তাহার বহুতর প্রয়োগ এখনও সুদূরপ্রসারী। একথা ঠিক যে, বাংলা দেশে আজ সঙ্গীতানুশীলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে, কিন্তু বাড়িলেও তাহা পর্যাপ্ত নয়। ছেলেমেয়েদিগকে সাধারণ পাঠের সঙ্গে যাহাতে গীতিশিল্পেও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যায়, তাহার জন্য অভিভাবকশ্রেণীকে সচেতন হইবার প্রয়োজন। সঙ্গীত আজ আর নিতান্ত Surplus Art হিসাবেই পরিগণিত নয়, ইহা একাধিক স্থলে জীবিকারও বাহন। অতএব সর্বদিক দিয়াই ইহার প্রয়োজনীয়তা আজ স্বীকৃত। ইহার ভিতরের গলদ ও ইহার সস্তা জনপ্রিয় আঙ্গীকগুলিকে বর্জন করিয়া সঙ্গীতকে জীবনে প্রাণময় করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ সম্পর্কে পণ্ডিত পটবর্ধন ও ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ দুইটি স্মর্তব্য। জনসাধারণকে আমরা এ সম্পর্কে অবিলম্বে সচেতন হইতে বলি।

বারমুডায় অনুষ্ঠিত ত্রিশক্তি সম্মেলন

সম্প্রতি গত ৮ই ডিসেম্বর বারমুডায় চারিদিনব্যাপী ত্রিশক্তি রাষ্ট্রনায়ক-সম্মেলন সমাপ্ত হয়। ত্রিশক্তির প্রস্তাবে বলা হয় যে, বার্লিনের চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ পরিষদ ভবনে আগামী ৪ঠা জানুয়ারী চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সোভিয়েট সরকার এই বৈঠকে কমিউনিস্ট চীন সহ পঞ্চশক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পাইবেন। অতলান্তিক চুক্তিসংস্থা প্রস্তাবিত ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন সম্পর্কে উহাতে বলা হয় যে, এই ব্যবস্থা একান্তই আত্মরক্ষাধর্মী। প্রস্তাবে এই মর্মে আশা ব্যক্ত করা হয় যে, চতুঃশক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের ফলে জার্মানীর পুনর্মিলন ঘটিবে এবং অষ্ট্রিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইবে। এই সব সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে কিছুটা অগ্রসর হওয়া গেলে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ মীমাংসার পথ সুগম হইবে। আলোচ্য সম্মেলনের শেষে এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রচার করিয়া বলা হয়ঃ

'এই বৈঠক আমাদের তিনটি দেশের ঐক্যের প্রতীক। আমাদের সম্মুখে যেসকল সমস্যা রহিয়াছে, সেগুলি সমাধানের উপায় সম্পর্কে আমরা একমত হইয়াছি। —আমাদের সম্মিলিত শক্তিই শান্তি ও নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ রক্ষক—সে শক্তিকে আমরা দৃঢ় করিয়া তুলিব. আক্রমণের আশঙ্কা আজ হয়ত কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও অনমনীয় নীতিই উহা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে। —এই ঐক্য বজায় রাখবার জন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা করিব—কেহ যাহাতে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে না পারে, তজ্জন্য আমরা সর্বদা সতর্ক থাকিব। —পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের যে ঐহিক ও নৈতিক সম্পদ রহিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজেদের নিরাপত্তা ও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়াই আমরা জানি। এই ব্যাপারে আমরা তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছি। উত্তর অতলান্তিক চুক্তিকে ভিত্তি করিয়া যেমন বর্তমানে আমাদের মূল নীতি গড়িয়া উঠিতেছে, ভবিষ্যতেও তেমনই চলিতে থাকিবে। —আমাদের সকলের আত্মরক্ষা শক্তি কিভাবে বাড়ানো যায়, সে-সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। উত্তর অতলান্তিক চুক্তিসংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল লর্ড ইস্‌মে এ বিষয়ে আলোচনাকালে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জার্মানীসহ সমগ্র ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলাই উহার স্বাধীন জাতিসমূহের ঐশ্বর্য ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির উপায় বলিয়া আমরা জানি। অতলান্তিক সংস্থার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় প্রতিরক্ষাসংস্থা গঠন যে প্রয়োজন, সেকথাটি আমরা পুনরায় ঘোষণা করিতেছি। ইউরোপের মূল ভূভাগে মোতায়েন বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী এবং ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সংস্থার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করাই হইবে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রধান কর্তব্য।—ইউরোপ বর্তমানে যেভাবে বিভক্ত রহিয়াছে, উহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি না। পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ যথাসময়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীন ইউরোপের স্বাধীন জাতিরূপে আবির্ভূত হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।—পৃথিবীতে বর্তমানে যে মন কষাকষির ভাব চলিতেছে, উহা হ্রাস করিবার কোনো সুযোগই আমরা অবহেলায় ত্যাগ করিব না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন জাতিসমূহ যদি একতাবদ্ধ হয়, এবং শক্তিশালী হইয়া ওঠে, তবে পৃথিবীর বহু সমস্যারই সমাধান সম্ভব হইবে এই মনোভাব লইয়াই আমরা সোভিয়েট সরকারের পত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি। চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া রুশ সরকারের নিকট যে জবাব

পাঠানো হইতেছে, উহা আমরা অনুমোদন করিয়াছি। আমরা আশা করি যে, প্রস্তাবিত বৈঠকের ফলে স্বাধীন অবস্থার মধ্যে উভয় জার্মানীর মিলন এবং অস্ট্রিয়ান চুক্তি সম্পাদনের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে। —আমরা দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতিও পর্য্যালোচনা করিয়াছি। কোরিয়ান রাজনৈতিক সম্মেলন আহবান আমাদের অনুসৃত নীতির আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু একথাও ঠিক যে, কোরিয়া সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে দূর প্রাচ্যের অবস্থা আরও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফরাসী ও ইন্দোচীনের স্বাধীন সংযুক্ত রাজ্যের সৈন্যরা যে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে, উহার গতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। —এই সংগ্রামের দ্বারা তাহারা স্বাধীন বিশ্বকে যে প্রভূত সাহায্য করিতেছে, সেকথা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমাদের সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।—বারমুডায় আমাদের এই সাক্ষাৎকার আমাদের ঐক্য আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। মনে অধিকতর আশা লইয়াই আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারিতেছি। আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হইয়া আমরা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত আমাদের নীতি অনুসরণ করিব, যে নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।'

নিজের দিকে পুরামাত্রায় ঝোল টানিয়া অপরকে ত্যাগধর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার মধ্যে যে প্রহসন, ইহাও সেই প্রহসনেরই আর একটি দিক। ত্রিশক্তি সম্মেলন ইহাই আজ নতুন নয়, ইতিপূর্বে এইরূপ সম্মেলন শতাধিকবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বশান্তির পদ্মপত্রে একবিন্দুও বারি সিঞ্চিত হয় নাই। এই ভাবেই মাঝে মাঝে সম্মেলনের মাধ্যমে কিছু কিছু শ্রুতিমধুর কথা উত্থিত হইয়া দীর্ঘকালের ক্ষতে আপাত প্রলেপের মতো কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু কার্যতঃ মূল রোগের উপসম হয় নাই। নয়া গণতান্ত্রিক চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার পথ রুদ্ধ রাখিয়া বিশ্বশান্তি যথার্থ সম্ভব কি? ত্রিশক্তির অধিনায়কেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রুদ্ধ পথের অর্গল খুলিয়া সৌহার্দ্দ্যের হাত প্রসারিত করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইউরোপীয় সংস্থায় তাঁহাদের ত্রিভুজ-ঐক্য সম্ভব হইলেও বিশ্বশান্তি একটা কথার কথা মাত্র। একথা বিবেচনা করিয়াই আমরা বারমুডায় সম্মিলিত এই শক্তিত্রয়কে আগামী ৪ঠা জানুয়ারীর অধিবেশনে যোগ দিতে বলি।

বৃটিশ গায়নার মুক্তি-সংগ্রামে ভারতের সহানুভূতি দাবী

বৃটিশ গায়নার পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ছেদি জাগান এবং পদচ্যুত শিক্ষামন্ত্রী মিঃ বার্নহাম সম্প্রতি ভারত সফরে আসিয়া ভারতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দের সহিত একটি ঘরোয়া অধিবেশনে মিলিত হইয়া ভাষণ দেন। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে তাঁহাদের এই সফর ও ভাষণের যে একটি বৃহত্তর মূল্য না রহিয়াছে, তাহা নয়। ভাষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁহারা বৃটিশ গায়নার জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতের জনসাধারণের সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। তাঁহাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে কমিউনিজম্ ও হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের যে অভিযোগ করা হইয়াছে, উভয় নেতা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ডাঃ জাগান বলেন যে, তাঁহারা কমিউনিস্ট কি কমিউনিস্ট নন্, সে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হইতেছে বৃটিশ গায়নার অধিবাসীদের নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী গভর্নমেন্ট গঠনের পক্ষে ভোট দিবার অধিকার আছে কিনা! মিঃ বার্নহাম বলেন যে, বৃটিশ গায়নায় ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম জয়ী হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশ গায়নার অধিবাসীদের বিশেষভাবে প্রেরণা জোগাইয়াছে। বৃটিশ গায়নার শর্করা শিল্পপতিদের হাতে জনসাধারণ কিভাবে শোষিত হইতেছে, ডাঃ জাগান ও মিঃ বার্নহাম উভয়েই তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করেন। ভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ জাগান বলেন যে, বৃটিশ গায়নায় যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, তাহা কমিউনিজম্ লইয়া নহে। পশ্চিমের বহু দেশে জাতীয়করণের যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেইরূপ কোনো প্রশ্ন বৃটিশ গায়নায় এখনও দেখা দেয় নাই। বৃটিশ গায়নায় আসল প্রশ্ন হইতেছে যে, জনসাধারণ তাহাদের গভর্নমেন্ট গঠনের অধিকারী কিনা! গণতন্ত্রের অজুহাতেই বৃটিশ গায়নায় গণতন্ত্রের ধ্বংস করা হইতেছে। সুতরাং গণতন্ত্রে যাঁহারা সত্যকার বিশ্বাসী তাঁহাদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। —ডাঃ জাগান আরও বলেন যে, বৃটিশ গায়নার ইতিহাস অনুধাবন করিতে হইলে শর্করা শিল্পের ইতিহাসই প্রথমে অনুধাবন করিতে হইবে। বৃটিশ গায়নার শর্করা শিল্পপতিরা এক মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন। কারণ তাহাদের কিউবা ও ব্রেজিলের শর্করা শিল্পপতিদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইতেছে, অথচ বৃটিশ গায়নায় কিউবা বা ব্রেজিলের মতো দাসপ্রথা নাই। কিন্তু বৃটিশ গায়নায় প্রাক্তন দাসশ্রমিকরা এখন দিনে এক শিলিং করিয়া

মজুরি দাবী করিতেছে। শর্করা শিল্পপতিরা অবশ্য চীনা ও পর্তুগীজ শ্রমিকদের আমদানী করিয়াছিল। কিন্তু শর্করা শিল্পে কাজের অত্যধিক চাপে অতিষ্ঠ হইয়া এইসব শ্রমিকরা কাজ ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা সুরু করে। ইহার পর ১৮৭০ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত শিল্পপতিরা ভারতীয় শ্রমিক আমদানী করে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইহাদের সংখ্যা উজাড় হইয়া যাইতেছে।

আলোচ্য এই ঘরোয়া বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। ডাঃ ছেদি জাগান ও মিঃ বার্নহামের বক্তৃতার উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ ভারত সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবসান কামনা করে—তা সে শাসন যেখানেই থাকুক না কেন! কারণ, মানবতার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইহা বর্তমান বিশ্বে উত্তেজনা ও অসন্তোষ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলেন যে, গত দুই তিন শত বৎসর যাবৎ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী থাকিলেও বর্তমানে উহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। ভারতের ন্যায় বহু স্থান হইতে উহাকে পাততাড়ি গুটাইতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে একথা বুঝায় না যে, উহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। একসময়ে আমরা শুধু ভারতের নহে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্যও যে লক্ষ্য ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতাম, ভারতের জনগণ যাহাতে সর্বদা তাহা স্মরণে রাখেন, তিনি তাহাই আশা করেন।

খোলাখুলিভাবে না বলিলেও শ্রীনেহরু বৃটিশ গায়নার মুক্তি-সংগ্রামে ভারতের সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায়ই জানাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতিরও পূর্ণভাবেই নিন্দা করিয়াছেন। অতএব, ডাঃ জাগান এবং মিঃ বার্নহাম ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ভারতের শুভেচ্ছা লইয়াই ফিরিতে পারিলেন। ইহার উপর কোনোরূপ টিকা করা নিষ্প্রয়োজন।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি

পাকিস্থান টাইমস্-এ প্রচারিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার একটি সংবাদে প্রকাশ পায়—দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের সহিত একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদনার কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারীভাবে ভারতকে জানাইয়াছে। এ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস বলেন যে, এই চুক্তির দ্বারা যে সমস্ত সমরোপকরণ পাকিস্থানে প্রেরণ করা হইবে, সেগুলি পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কাজেই ব্যবহার করিতে হইবে। ঐগুলি কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করা চলিবে না।

এই চুক্তি সম্পর্কে ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের সহিত আলাপ করিয়া যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, তাহার বিবরণ ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের হস্তগত হয়। সোভিয়েট সরকারের সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে রাশিয়া ও ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বলা হয়—তুরস্ক, পারস্য ও পাকিস্থানকে মার্কিন প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া আনা হইতেছে এবং এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পুরোবর্তী ঘাঁটি সৃষ্টি করা হইতেছে। এখন পাকিস্থানকে মধ্যপ্রাচ্যের আক্রমণ ব্যবস্থায় টানিয়া লইয়া মার্কিন শাসকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহাদের আক্রমণবাদী আতলান্তিক সৌহার্দ্যের শাখা স্থাপন করিতেছে। পাকিস্থানের পশ্চিম ও পূর্ব অংশ ভারতের উভয়পার্শ্বে অবস্থিত। মার্কিন সমরনায়কদের মতে প্রয়োজন মতো পাকিস্থানের এই দুইটি অংশকে ভারতের বিরুদ্ধে সাঁড়াশীর ন্যায় প্রয়োগ করা চলিবে।

এতদ্‌সম্পর্কে 'টাইম্‌স্' পত্রিকার মন্তব্যটিও বিশেষ কৌতুকপ্রদ। 'টাইম্‌স্' তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেনঃ 'পাক-গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ-এর লণ্ডন আগমন এবং একই সময়ে পাক-প্রধান সেনাপতি জেঃ আয়ুব খাঁ কর্তৃক অস্ত্র সাহায্যের আশায় আমেরিকা ভ্রমণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্থানের এখন যে-সব অস্ত্রপাতি আছে, তাহা সবই বৃটিশ। সুতরাং পাকিস্থানের যদি অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা বৃটিশ মহল হইতে পূরণ করা উচিৎ।

মস্কো রেডিওর বক্তা মঃ বচ্‌কারেভ এক বেতার ভাষণে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কে যে সফলতা অর্জন করিয়াছে, সমগ্র এশিয়ায় সেইরূপ সফলতা লাভের চেষ্টা করিতেছে।

এতদসম্পর্কে ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া যথাযথ তথ্যের জন্য তৎপর হন। ইতিমধ্যে পি, টি, আই করাচীর এক সংবাদ পরিবেশন করিয়া বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিতে পাকিস্থান সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ সদর দপ্তর হইতে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, পাকিস্থান সরকার তাহা সরাসরি ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন।

অন্যদিকে কাশ্মীর গণপরিষদের সভাপতি মিঃ জি, এম্, সাদিক এক ঘোষণায় বলেনঃ পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী তাহাদের দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ে প্রস্তুত, এইজন্যই তাহারা পাকিস্থান ও কাশ্মীরে আমেরিকানদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগদানের জন্য শলাপরামর্শ করিতেছে। ইহার প্রতিদানে পাকিস্থান কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছে। এই ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্য কাশ্মীরীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বদা অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহারা যেন এই ষড়যন্ত্রকে কোনো কারণেই হাল্কাভাবে না দেখে।

বিষয়টি সর্বদিক হইতেই ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যে সময়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা বৃহত্তর রাষ্ট্রগোষ্ঠী কর্তৃক বিশ্বশান্তি সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলিতেছে, ঠিক তাহারই সমসাময়িককালে এইরূপ একটি চুক্তি যে নিতান্ত ব্যাধিদুষ্টই নয়, একটা মারাত্মক রকমের অপরাধ, তাহা যে কোনো রাষ্ট্রধুরন্ধরই বিশ্বাস করিবেন। এই চুক্তির পিছনে যে আক্রমণনীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহা অচিরে পরিহার করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যদি বিপরীত কোনো লক্ষণ দেখা দেয়, তাহার জন্য বিশ্বের কাছে মূলতঃ দায়ী হইবেন মার্কিন ও পাকিস্থান সরকার। গণতান্ত্রিক বিশ্ব নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে সেদিন ক্ষমা করিবে না। অতএব সময় থাকিতে হুঁসিয়ার।

বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাচ্য পুস্তকাবলী এবং পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী

সম্প্রতি লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাচ্য পুস্তকাবলী এবং পাণ্ডুলিপির এক প্রদর্শনী সুরু হইয়াছে। ইহাতে ঋগ্বেদ ও রামায়ণের ন্যায় পুরাতন ভারতীয় পাণ্ডুলিপিগুলি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মিউজিয়মের দুই শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে এ বৎসর অন্যান্য প্রদর্শনীর সহিত এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীই বিশ্বের একটি বিশেষ অংশের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে পরিচয় দিবার জন্য পরিকল্পিত হয়। বর্তমান প্রদর্শনীতে গত আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচ্য সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত এবং দূর প্রাচ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; ৫০টি বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি এবং পুস্তকাবলী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমান সংগ্রহ হইতে ভারতের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের একটি সূক্ষ্ম চিত্র লাভ করা যায়। ঋগ্বেদ এবং রামায়ণের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মপুস্তক এবং মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি যেমন এই প্রদর্শনীতে আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন যুগের বিশুদ্ধ ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য। তালপত্র, স্বর্ণথালি, তাম্র, কাঠের বোর্ড এবং অন্যান্য বহুবিধ উপকরণের উপর লিখিত অহমিয়া, বর্মী, হিন্দী, মারাঠি, সিন্ধি, সিংহলী এবং তামিল প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রদর্শনীতে আছে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন বৌদ্ধ পালি পুঁথি। এই সঙ্গে আছে ভারতীয় ভাষায় এবং বিশেষভাবে দক্ষিণীভাষায় অনূদিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি। ইস্‌লামিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ১৪শ শতকের কোরান।

দুঃখের বিষয়, বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত প্রাচীন পুঁথির কোনো প্রদর্শনীরই উল্লেখ নাই। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে বাংলাভাষা আজ বিশ্বসাহিত্যের সম-পাংক্তেয়। মিউজিয়াম-কর্তৃপক্ষের ইহা অজানা থাকিবার কথা নয়। সেইদিক হইতে ভারতীয় পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর ত্রুটি স্বভাবতঃই লক্ষ্য করা গেল। অন্যথায় সাংস্কৃতিক বিচারে এইরূপ একটি প্রদর্শনী সাদরে অভিনন্দনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড,
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মা ও ছেলে ফটো—নীলিমাণ রায়

একবিংশ বর্ষ | মাঘ—১৩৬৫ | ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবন

শ্রীকালিদাস রায়

তান্ত্রিক সাধকগণ শ্মশানে মশানে রুদ্র-ভীষণা মহা-শক্তির উপাসনা করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের শৌর্য্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য সত্যই তাঁহাদিগকে 'বীরাচারী' বলা যাইতে পারে। শৌর্য্য ও সাহস যাহাতে সচেতন থাকে, তাহার আয়োজনেরও অভাব ছিল না,—রক্ত ছিল, মদিরা ছিল, আরো অনেক উদ্দীপক উপকরণ ছিল।

দেশে শক্তিপূজার প্রথা চলিল, কিন্তু সমস্ত দেশটাই বীরাচারী, কৌলাচারী, বা অঘোরপন্থী হইয়া উঠে নাই। তান্ত্রিকদের সাধনা রহস্যময় ও গূঢ়, স্থান—শ্মশান মশান; বন জঙ্গল অথবা নিভৃত আশ্রম কক্ষ, কাল গভীর নিশীথ, অমাবস্যা। জনসাধারণের তাহাতে যোগ দেওয়ার উপায় নাই। তান্ত্রিকদের বেশভূষা, মূর্ত্তি ভাষা, হুঙ্কার, ভঙ্গি, চাল-চলন সমস্তই ভীতিব্যঞ্জক। মহাকালীর মূর্ত্তিও ভীষণা। জনসাধারণ প্রণত হইল ভয়ে। তান্ত্রিক বীরাচারীদের সাহস তেজ ও মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কি শান্তিপ্রিয়, শান্ত সহনশীল বাঙ্গালী পাইল? তাহাদের মধ্যে এস্তা ভয়ের ধর্মই প্রবর্তিত হইল।

শক্তি পূজার অন্যান্য অভিব্যক্তিতেও ভয়ের ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। সর্পসঙ্কুল বঙ্গদেশে সর্প ভয়ে শঙ্কিত বাঙ্গালী শক্তিকে মনসা মূর্ত্তিতে পূজা করিল—সে পূজাও ভয়ে। মনসা-মঙ্গলের সাহিত্যে এই ভয়কেই দৃঢ় মূল করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যায়।

বসন্ত রোগের ভয়ে শীতলার আবির্ভাব—নানা প্রকারের প্রাকৃতিক উপদ্রব ও বিপদের ভয়ে চণ্ডীর নানারূপের আবির্ভাব।

লক্ষ্মী পূজা চলা স্বাভাবিক—কিন্তু অলক্ষ্মী পূজা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে স্বাভাবিক হইল। পাছে অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর কৃপা উবিয়া যায়, সেজন্য কেবল লক্ষ্মী পূজা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই—ভয়ে অলক্ষ্মীকেও পূজা করিতে হইল। এইভাবে ডাকিনী, যোগিনী, নিশাচরী, প্রেতিনী ইত্যাদিরূপে বহু অহিত-

কারী দেবতার পূজা ভয় হইতেই জন্মিয়াছে। বাস্তু শক্তি কেবল দেবীরূপেই কল্পিত হন নাই—দেবরূপেও পরিকল্পিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রসাদ পরিতুষ্টির জন্য বাঙ্গালী বিধিমত পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। অগ্নি (ব্রহ্মা), যম, শনি, রাহু, কেতু, ঘণ্টাকর্ণ, পাঁচু ঠাকুর কলি, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় ইত্যাদি পুরুষরূপেও আধিদৈবিক রুদ্রশক্তি ভীত চিত্তের পূজা পাইয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য—এই ভয়ের ধর্ম সত্য সত্যই ধর্ম কিনা? যদি ধর্মই হয় তবে কোন স্তরের ধর্ম? বর্বরদের প্রেত পূজাকেও এইভাবে সমর্থন করা যায় না কি? যে স্তরের ধর্মই হউক, এই ধর্ম বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে দুর্বল করিয়াছে কি না—দেশ জুড়িয়া এই ভয়ের ধর্ম অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী জাতি ক্রমে ভীরু ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে কি না সুধী সমাজে ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

তারপর বৈষ্ণব ধর্মের কথা। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে প্রচার লাভ করে নাই, সেজন্য শান্তরসের সাধনাও এদেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধ সহজিয়া ভাব হইতে যে মধুর ভাবের সাধনার জন্ম, সে সাধনা শ্রীচৈতন্যদেবের আগে বর্তমান ছিল, চণ্ডীদাস তাহার কবি—দেশের ধর্মজীবনে সে ভাবের প্রভাব পুরামাত্রায় পড়িয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মধুর ভাবের সাধনাকে নিজের জীবনেই প্রকটিত করিয়া 'আপনি আচরি' শিখাইয়া গেলেন। দেশে গোস্বামিগণ এই মধুর ভাবের সাধনাকে দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সাধনাকে অবলম্বন করিয়া সহজিয়াদের সহিত সন্ধি করিয়া দেশে আউলিয়া, বাউলিয়া, কর্তাভজা ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল সাধনায় প্রত্যেক পুরুষকেও স্ত্রী কল্পনা করা হইত—এক শ্যামসুন্দর বা ইষ্ট দেবতা ছাড়া আর কেহ পুরুষ নাই। যাঁহারা এ সাধনায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং দেশবাসীকে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন। স্ত্রী বেশ ধারণ ও স্ত্রীলোকের ভাব-ভঙ্গির অনুসরণ এই শ্রেণীর ধর্ম সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ততঃ স্ত্রী ভাবাপন্ন হওয়াই সাধনার উচ্চস্তরের আদর্শ—ইহা তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই সাধনার আদর্শ দেশবাসীর পৌরুষশক্তি হরণ করে নাই কি? শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মে মধুর ভাবই প্রবল হইলেও ঐ ভাবের অন্তর্নিহিত নিম্নতর স্তরের দাস্যভাবই সর্বাপেক্ষা দেশবাসীর মনকে অভিভূত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একা মুরারি গুপ্তই দাস্যভাবের সাধক নহেন,—শ্রীচৈতন্যের সকল পার্ষদই অল্পবিস্তর দাস্যভাবে প্রণোদিত। শ্রীচৈতন্যকে যাঁহারা পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে দাস্যভাব পরিহার করা কঠিন। তাই অদ্বৈত, হরিদাস, রঘুনাথ, নরোত্তম, সনাতন, শ্রীবাস ইত্যাদি অধিকাংশ সহচর অনুচরই দাস্যভাবে অনুপ্রাণিত। ইহাদের প্রভাবে যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হইয়াছে, তাহা দাস্যভাবেই পরিপুষ্ট। 'তৃণাদপি সুনীচ' 'তরোরিব সহিষ্ণু' ও 'অমানিনে মানদ' হইতে হইলে দাস্যভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। এই দাস্যভাব রামায়ণের হনুমান ও. মহাভারতের বিদুরের আদর্শের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই দাস্যভাব বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দাস মনোভাবের সৃষ্টি করে নাই কি? বাঙ্গালী প্রভুত্ব অপেক্ষা দাসত্বকে সে ভালবাসে তাহার মূলে তাহার ধর্মই সহায়তা করে না কি?

বৈষ্ণব সাধক কবিগণ যশোদা ও শচী মাতাকে অবলম্বন করিয়া দাস্যভাব হইতে উচ্চতর এবং মধুর ভাব হইতে নিম্নতর বাৎসল্য ভাবের একটা সাধনাও প্রবর্তিত করেন—সম্ভবতঃ দেখাদেখি শাক্ত কবিগণ মেনকাকে অবলম্বন করিয়া ঐ সাধনাকেই পরিপুষ্ট করিয়াছেন। কৌশল্যা গান্ধারীর আদর্শও হয়ত তাহাকে সহায়তা করিয়াছে। এই বাৎসল্য ভাবের সাধনাও বাঙ্গলা দেশের চিত্তকে কম বিগলিত করে নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই ধর্মের মধ্যে বাৎসল্য ভাব বাঙালীর জাতীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কি না? ইহাতেও কি বাঙালীর অন্তর কোমল স্নেহার্ত ও স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া উঠে নাই?

তারপর ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির ধর্ম। বিপদ হইতে এড়াইবার জন্য যেমন এক ধরণের ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে... সম্পদ লাভ করিবার জন্য তেমনি এক শ্রেণীর পূজাপদ্ধতির প্রচলন।

দুর্গোৎসবের জন্ম ও ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ ঐহিক কাম্যবস্তু লাভের জন্য অনুষ্ঠান। দুর্গোৎসবের প্রধান মন্ত্র "ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষোযহি" ঐহিক শ্রী বর্ধনের জন্য গৃহী এই পূজা প্রবর্তন করে... তারপর কৌলিক হইয়া ইহা বংশপরাম্পরাণুক্রমে চলিতে থাকে...তেমন উহার সঙ্গে একটা ভয়ও আসিয়া জুটে। কৌলিক পূজা বন্ধ হইয়া গেলে একটা অনর্থ ঘটিতে পারে—এই ভয়ে দরিদ্র গৃহী ভিক্ষা করিয়াও এ পূজা করে। গৃহী সারা বৎসরের সকল কামনা বিশ্বজননীর চরণে নিবেদন করে।

কালীপূজার ব্যবস্থা বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য

যেমন—ইষ্টলাভের জন্যও তেমনি। কোন না কোন ইষ্ট-লাভের জন্যই মেষ মহিষাদি মানত করার প্রথা। মহামারীর সময় বা মৃত দোষক্ষালনের জন্য যেমন, পুত্রলাভের জন্যও তেমনি কালীপূজার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া কালী-মন্দিরে নিত্যই শত শত নব নব আবেদন ধ্বনিত হইতেছে।

লক্ষ্মীপূজো লক্ষ্মী লাভের জন্য, সরস্বতীপূজো বিদ্যালাভের জন্য, কার্তিকপূজা পুত্রলাভের জন্য, অন্নপূর্ণা পূজা সম্পদ লাভের জন্য বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ-যুগের ধর্মঠাকুর এখন ধর্মরাজে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহাকে সারা বৎসরে মানত শুনিতে হয়—দুরারোগ্য রোগের আরোগ্য সম্পাদন করিতে হয়...বিনিময়ে ভক্তের চুলদাড়ি পাইলেই ইনি সন্তুষ্ট। মহাদেব ও ধর্মরাজে বিশেষ তফাৎ নাই। উভয়কেই এক প্রকারের নিবেদনই শুনিতে হয়। গাজনে মাতিতে হয়—চড়কে ভক্তের আত্মনিগ্রহ দেখিয়া তুষ্ট হইতে হয়।

সন্তানবৎসলা মৃতবৎসা জননীর দেশে ষষ্ঠীমাতাকে সারা দিন-রাত্রিই আবেদন শুনিতে হয়। কেবল পুত্র নয়...জামাতার কল্যাণের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়...তাঁহার বাহন বিড়ালটিও সমাদর পায়।

কৃষিসম্বল দেশে লক্ষ্মীর সহিত ইন্দ্রও পূজা পান...মিত্রও পূজা পান। অদৃষ্ট, চক্র, কোষ্ঠী, গ্রহবৈগুণ্য ইত্যাদিতে যে দেশের লোক শ্রদ্ধাবান, সে দেশে গ্রহগণ যে পূজা পাইবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? নারীগণের ব্রত-পার্বণের সঙ্গে যে সকল দেবতা আহূত হন—তাহাদের প্রত্যেককেই সরল হৃদয়ের আবেদন শুনিতে হয়...বালিকারা ভ্রাতার কল্যাণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনোমত স্বামীলাভের আবেদন পর্যন্ত দেবতাদিগকে শোনাইবার জন্য নানা আয়োজন করে।

মুসলমানের সত্যপীরের নিকট হইতেও কাম্যবস্তু লাভের উদ্দেশে তাঁহাকে সত্যনারায়ণ রূপ দেওয়া হইয়াছে। গৃহে গৃহে গৃহদেবতা মঙ্গলচণ্ডী, গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য দেবতারা, বর্ষে বর্ষে মেলার দেবতারা অসহায় বাঙালীর আবেদন নিবেদন শুনিয়া আসিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা চিরস্থায়ী হইয়াও আছেন। কেবল চক্ষুরোগ আরোগ্যের জন্যই বিশালাক্ষী বা ত্র্যক্ষী নামে দেবতা আছেন। কামাখ্যাদেবীকে এক প্রকারের আবেদন শুনিতে হয়। তারকেশ্বর ও কালভৈরব দুইই যদিও মহাদেব, কিন্তু প্রার্থনা শুনিতে হয় ভিন্ন ভিন্ন। মোকদ্দমায় জয়লাভের জন্য বা চাকরী পাওয়ার জন্য পৃথক দেবতার কল্পনা হয় নাই। মোকদ্দমেশ্বর ও চাকুরীশ্বর অভাবে উক্ত উভয়বিধ আবেদন ঠন্‌ঠনে এবং কালীঘাটের মা কালীকেই শুনিতে হইতেছে। খৃষ্টানের ভগবানকেও অন্নেশ্বর হইতে হইয়াছে; Lord's Prayer-এ আছে Give us our daily bread. যাহাদের অন্নের অভাব নাই তাহারাই যখন অন্ন চাহিয়াছে, তখন এই নিরন্ন দেশে অন্নের জন্য দেবতার সংখ্যা যে বাড়াইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অই পেটের দায়ে কর্মকুণ্ঠ ব্যক্তিরা এক একটি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং তাঁহাকে কোন একটি বিশেষ 'ইষ্টের' দাতা বা বিধাতা বলিয়া প্রচার করিতে হইয়াছে।

দেশের বহু লোকই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন না করিয়া—সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোন সাধনা না করিয়া অগাধ বিশ্বাসে কোন বিগ্রহবিশেষের উপর নির্ভর করিয়া থাকিত। খুব জোর ২।৪টা মাদুলী-কবচ ধারণ করিত অথবা ২।৩টা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইত। যিনি সাধনার পুরস্কার দেন, যিনি প্রত্যেক লাভের জন্য শ্রমের মূল্য নির্দেশ করিয়াছেন—তিনি ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের জন্য আবেদন ও সরল বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করেন কিনা জানি না তবে যুগ যুগ হইতে আমাদের দেশবাসী সকল সুখ সৌভাগ্যের জন্য দেবতার দয়ার উপরই নির্ভর করিয়াছে। একথা অস্বীকার করা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য—প্রত্যেক কাম্যবস্তুর জন্য উদ্ধের শক্তির উপর নির্ভর করা বাঙালী জাতির স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া কি মনে হয় না? দেশের কবিগণ, মনীষীগণ ও নেতৃগণ নিজের জাতিকে পরনির্ভর, কর্মকুণ্ঠ, ভিক্ষুবৃত্তিক, হতোদ্যম, আত্মশক্তিহীন ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। এই হীনতার সহিত তাহাদের আবেদন নিবেদনের ধর্মের কি কোন সম্পর্ক নাই? সমগ্র বঙ্গদেশ যে ধর্ম-পদ্ধতি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পালন করিয়াছে তাহাতে দেশবাসী কতটা পারলৌকিক পথে অগ্রসর হইয়াছে জানি না। ইহলোকের অধোগতির সহিত কি তাহার ঘনিষ্ট কোন সম্পর্ক নাই?

ধারাবাহিক

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভাইঝিটা কোথা থেকে ছুটে এসে হাঁপতে হাঁপাতে বললো, জাপ্‌ড়ি কি করছে দেখবে এসো কাকা।

তাই নাকি? একটু অপ্রস্তুত হয়ে কলমটা থামিয়ে প্রশ্ন করলো রঞ্জন। উৎসুক হয়ে বললো, "এর মধ্যেই বুঝি হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে?

না না, তা' কেন। তুমি দেখবেই এসো না।—অস্থির হয়ে উঠলো ভাইঝি। বাঁ হাতটা টানতে টানতে বললে, জানো, জাপ্‌ড়ে আমাদের লেখক হবে তোমার মত। কত্ত কি লিখবে।—লেখক? বেশ খানিকটা বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকালো রঞ্জন। বললে, "কৈ চল্‌তো দেখি। কি সর্ব্বনাশ। শেষে কি না বাপের অন্ন মারবার ফন্দি?

ভাইঝির টানে প্রায় ছুটতে ছুটতেই এসে পুবের ঘরে ঢুকলো রঞ্জন। ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হোলো স্ত্রীর গলার স্বরে।

হতভাগা ছেলে। টাকা নয়, মাটি নয়, ধরলো কি না শেষে কলম? ঐতো একজন। কলম ধরে আমায় সগ্যে তুলে দিয়েছেন। ওরই তো ছেলে, কত আর হবে।

কথা ক'টা যেন কানের ভেতর আমূল বিঁধে যেতে চাইলো তার। মুখ তুলে তাকালো সেদিকে। দেখলো থমথম্ করছে রমার মুখখানা। ধ্বক করে উঠলো বুকের ভেতরটা। কালো হয়ে উঠলো সারাটা মুখ।

খোকার দিকে নজর পড়লো। কলমটা বাগিয়ে ধরবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দুষ্টুমিতে ভরে তুলেছে কাকার কোল। ভারি দুষ্টু হয়েছে ছেলেটা।

একবার হাসির চেষ্টা করলো রঞ্জন। ম্লান ফ্যাকাশে একটুকরো হাসি ফুটলো বটে ঠোঁটের কোণে, কিন্তু মনে হোলো সে হাসিতে প্রাণ নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই।

দরজার বাইরে পা বাড়াতে গিয়ে টান পড়লো পাঞ্জাবীতে। চোখ ফিরিয়ে দেখলো ভাইঝির হাতটা তখনো ধরা রয়েছে জামার খুঁটে। চোখাচোখি হতেই সে হেসে বললে, জানো কাকা, তোমার ছেলে যা দুষ্টু হয়েছে এরই মধ্যে, বাবা বাবা। কলমটা দিয়ে যেন মানুষ খুন করবে।

বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো রঞ্জন। ভয়ানক অবাক হোলো ওর কথায়। এত কথা ওরা শিখলো কোথায়?

চোখাচোখি হোলো রমার সাথে। থতমত খেয়ে মুখটা নামিয়ে আল্‌তো করে ঘোমটা টানলো সে। মুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে সামলে নিলো নিজেকে। তারপর ডাগর চোখ দু'টো তুলে বললে, দেখছো কি, তোমার ইচ্ছেটাই সত্যি হোলো।

যেন কান্না ছোপা, বড় ভেজা ভেজা লাগলো রঞ্জনের কাছে তার গলাটা। হেসে বললে, বড় অন্যায় কথা। ছেলে হয়ে কিনা হতভাগা বাপের ভাত মারবার ফন্দি আঁটছে?

ভয়ানক উদ্ধতভাবে ঘাড় ঝাঁকালো রমা। বললে, ঠাট্টা করছো?

একদম নয়। ছেলেটার স্পর্দ্ধা দেখে বিস্ময় আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি মাত্র। হেসে উত্তর দিলো রঞ্জন।

বড় বৌ পাশ থেকে খিল্‌খিল করে হেসে উঠে বললে, খুব হয়েছে। ছেলের পেশা নিয়ে এখুনি ঝগড়া না করলেও চলবে।

রমা এক নজর তার দিকে চাইলো। তারপর রঞ্জনের প্রতি একটা তীর্য্যক কটাক্ষ হেনে তাকালো শাশুরীর দিকে। সহসা যেন ধমক খেয়ে থেমে গেল দৃষ্টি। এক কণাও হাসি নেই তাঁর মুখে। কে যেন হাসির সঙ্গে মুখের সমস্ত রক্তটুকু শুষে নিয়েছে ব্লটিং দিয়ে। আর চোখের তারায় অতল গভীরতা।

কোন কথা ফুটলো না রমার মুখে। মুখটা নামিয়ে

মাটির দিকে খানিক চেয়ে থেকে চোখ ফেরালো খোকার দিকে।

আর দাঁড়ালো না রঞ্জন। নিজেকে আড়াল করে এক সময় পালিয়ে এলো নিজের ঘরে। খুব সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে টেবিলটার সামনে এসে বসে বেশ ঘন করে একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। পরক্ষণে চোখের দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়লো টেবিলের ওপর। দেখলো, ইতস্তত ছড়ানো কাগজগুলির ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে ঝর্ণা কলমটা। ঠিক তার মাঝের লম্বা ছুঁচের মত একটা অংশ আলো পড়ে জ্বলছে। তলোয়ারের মত ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে সে অংশটা।

ক'টা পল ক্ষণের ব্যবধানে হঠাৎ ঝাপ্‌সা হয়ে এলো চোখের দৃষ্টি। খোকার চন্দন মাখানো মুখখানা মনে পড়লো। ক্রমে বড়, পরিণত হয়ে এলো সে মুখ। লেখক খোকার অবয়বখানা যেন স্পষ্ট ধরা পড়লো তার কাল্পনিক দৃষ্টিতে। ঠিক তারই বয়সে এসে থমকে গেল খোকার সে মুখখানা। রমার থম্‌থমে মুখখানা যেন ছাপিয়ে উঠলো সে মুখকে। কিন্তু এ মুখের রহস্য স্পষ্ট হোলো না। শুধু মনে হোলো মেয়েরা মা-ই, আর কিছু নয়।

চোখ নামাতে গিয়েই আবার চমকে উঠতে হোলো। তার অজানিতেই যেন কখন চোখ পেরিয়ে বড় বড় ক'ফোঁটা জল নেমে এসে ঠিক কলমটার ওপর পড়েছে। কালো কলমটার ওপর জলের স্পর্শে যেন আরো উজ্জ্বল, আরো ব্যাপ্ত মনে হচ্ছে আলোর দ্যুতি।

কেমন করে উঠলো বুকের ভেতরটা। কি করবে ভেবে না পেয়ে কলমটা খপ্‌ করে চেপে ধরলো ডান হাতের মুঠোয়। চেষ্টা করলো হাতের তালুতে তাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলবার। অনেকটা ঠিক খোকারই মত।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো কলমটাকে রঞ্জন। নাঃ তেমন কিছুই বৈচিত্র্য নেই। সাধারণ একটা ঝর্ণা কলম। মূল্যের বিচারেও অকিঞ্চিত। অথচ, এই কলমটাই তার ভরসা, তার সমস্ত জীবনের পরিচয়, গর্ব্ব।

পরম আদরে কলমটাকে হাতের মধ্যেই নাড়াচাড়া করলো খানিক। তারপর খাপটা খুলে তুলে ধরলো চোখের সামনে। অনেকটা তলোয়ারের মতই তীক্ষ্ণ আর ঝলসানো নিবের মুখটা। সূক্ষ্মতায় না হোক, শ্রদ্ধার গভীরতায় আমূল বিঁধে দেওয়া চলে যে-কোন পরিবেশে যে কোন মানুষের বুকে।

খুব যত্নে আবার খাপে ভরে প্যাঁচ দিলো ক্যাপে। তারপর রেখে দিলো অসমাপ্ত লেখা কাগজটার ওপর। হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেলো। গল্পটা এখনো শেষ হয়নি। একটু ইতস্তত করে প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলো গল্পটা। বেশ তন্ময় হয়েই উঠেছিল, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থেমে পড়তে হোলো অসমাপ্ত জায়গায় এসে। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো চোখ দু'টো। যেন খানিকটা, খানিকটা কেন, বেশ খানিকটা অসোয়াস্তি এসে ভীড় করলো দু'-চোখের তারায়। নাঃ তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, শেষ না করা পর্য্যন্ত। কলমের খাপটা খুলে ফেললো আবার। শেষ করতেই হবে আজ গল্পটা। খানিক এলোমেলো ভাবে নেড়ে একসময় বাগিয়ে ধরলো কলমটা। আবারও চোখে ভেসে উঠলো খোকার কলমটাকে বাগিয়ে ধরবার প্রচেষ্টাটুকু।

আপনা হতেই এক ঝলক জলো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক ঠেলে। লেখা আর হোলো না। কলমটা বন্ধ করেউঠে গিয়ে দাঁড়ালো দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা-টারকাছে। আশপাশটা একবার ত্বরিতে ঘুরে এলো চোখের তারা দু'টো।

পাড়াটা বর্দ্ধিষ্ণু নয়, বরং সহরের পক্ষে এ অংশটুকু ক্ষতের মতই। দু'পাঁচটা যা দালান-কোঠা আছে, আর সবই প্রায় বস্তি-বাড়ী। টিন আর টালিতে ছাওয়া নিচু নিচু বাড়ী। একটার গায়ে আরেকটা যেন হেলে, দুমড়ে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই এ বাড়ীর চার পাশটা এখন খোলা-মেলা। পাড়া ছাপিয়ে তাই দৃষ্টি ছুটিয়ে দেওয়া যায় দূরের পার্ক পেরিয়ে ট্রাম রাস্তা পর্য্যন্ত। স্পষ্ট কানে আসে বড় রাস্তার যান বাহনের আওয়াজ, পথিক মানুষের টুকরো কথা জড়ো করা কল-গুঞ্জরণ।

চোখ ফিরিয়ে আনলো রঞ্জন। বাঁ দিকের শিমূল গাছটায় যেন আগুন লেগেছে। লাল ফুলের প্রাচুর্য্যে ঢাকা পড়েছে কচি পাতার রঙ। লক্ষ্য না করলে বোঝাই

যায় না ও গাছে পাতা আছে। ডালে ডালে মুকুলিত পত্রগুচ্ছের এত সমাবেশ।

একটু অবাক হোলো রঞ্জন। এই তো সেদিন দেখলো গাছটা ন্যাড়া। এত লালফুলের প্রাচুর্য্য থাক, সামান্য কয়েকটা কচি পাতাও চোখে পড়তো না সহসা সেদিন।

সে সকালে আর লেখাটা শেষ হোলো না। হাজারো চেষ্টায়ও আর কলমটাকে বশ করে ধৈর্য্য ধরে বসতে পারলো না সে। মনের কোথায় যেন বেশ খানিকটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে। অথচ এমনটা তো ঘটেনি তার জীবনে। আজ ব্যতিক্রম হোলো। লেখক-মন তার হার স্বীকার করলো কলমের কাছে।

দুপুরে খেতে বসেও আনমনাই রইলো চিন্তাটা। নিজের প্রথম ছেলের আজ অন্নপ্রাশন, অথচ মনে তার কোন উচ্ছ্বাসের আলোড়ন জাগলো না। আশ্চর্য্য! গল্পের চিন্তায় মন আচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মনকে তো পীড়ন করে না কখনো।

সারাটা দুপুর, বিকেল বেরুলো না বাড়ী থেকে। গল্পটা আজ শেষ করতেই হবে, যেমন করে হোক। গভীর মনস্তত্ত্বমূলক গল্প, ছেদ পড়লে পরে সুর বদলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

সন্ধ্যেও কেটে গেল। গল্প শেষ করা হোলোনা তবুও। লাভের মধ্যে এ্যাস্‌ট্রেটা ভরে উঠলো ছাই আর টুকরো সিগারেটে। কিন্তু বসবার মত মন যেন কিছুতেই পাচ্ছে না সে। মনে মনে এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো রঞ্জন।

সারা দিনে বার কয়েকই রমা ঘরে এসেছিল। হয়তো বা কিছু বলবারও চেষ্টা করে থাকবে। কিন্তু রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখে আর কোন কথা সরেনি। মনে পড়লো কথাটা। হাসি পেলো রঞ্জনের। হয়তো সে হাসিতে করুণাও ছিল খানিকটা।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে একবার এদিক ওদিক তাকালো, তারপর নেমে এলো নিচে। সিঁড়ির একপাশে বুড়ি মা জপের মালা নিয়ে বসেছেন। বড় বৌদির গলার স্বর ভেসে আসছে রান্না ঘরের দিক থেকে। কার সঙ্গে যেন কথায় মেতেছেন তিনি নিচু গলায়।

যার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ইসারায় তিনি কি প্রশ্ন করলেন বোঝা গেল না। কোন উত্তর দিলো না রঞ্জন। চোখ ফিরিয়ে ওপাশের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রমার গলা পাওয়া যাচ্ছে না। অবাক হোলো একটু। এই ঘোর সন্ধ্যায় গেল কোথায় ও?

একটু বিমর্ষ হয়েই ফিরে দাঁড়ালো রঞ্জন। মনটা ইতিমধ্যে ভারি অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। মাথার মধ্যে সব চিন্তাকে ছাপিয়ে জেগে রয়েছে শুধু সকাল বেলার স্ত্রী'র কথা ক'টি।

স্বার্থের মিনারে মন রেখেও তবু মেয়েরা কত অসহায়, কত অগভীর, বেহিসাবী। মনটাকে তারা বেঁধে ফেলেছে চিরাচরিত জীবন-যাপনের স্বপ্নে। ভাবলো রঞ্জন। আর সেই সঙ্গে একটুকরো হাসিও খেলে গেল ঠোঁটের ফাঁকে। এছাড়া মেয়েরা যেন অসম্পূর্ণ, অপ্রয়োজনীয়। এর বাইরে পা বাড়াবার যেন অধিকার নেই, স্পর্দ্ধা নেই ওদের।

রান্না ঘর থেকে বৌদির আলোচনার টুকরো ভেসে আসছে। তাতে সম্পূর্ণ রূপ নেই, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সে আলোচনা কাঠ-খড় থেকে শুরু করে হাতের শাঁখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী ওদের গণ্ডি নয়, ভাববার মত মন নেই।

সিঁড়ির মুখে পা বাড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ থেমে পড়তে হোলো তাকে। মা ডাকছেন। চোখ ফেরাতেই দেখলো, জপের থলেটা নেড়ে তাকেই ডাকছেন মা।

নেমে, কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রঞ্জন। ইসারায় বসতে বললেন মা। তারপর দু'হাত কপালে ছুঁইয়ে প্রণাম সেরে ছোট্ট করে বললেন, বোস্। ক'টা কথা আছে তোর সঙ্গে।

আমার সঙ্গে? একটু সজাগ, খানিকটা ঔৎসুক্য নিয়ে চোখ নামালো রঞ্জন।

হ্যাঁ। মালার গুটি গুনতে গুনতেই উত্তর দিলেন সুমতি দেবী।

নিজেকে বেশ খানিকটা সঙ্কুচিত করে মা'র ছোঁয়া বাঁচিয়ে একপাশে বসে পড়লো সে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে মুখ খুললেন সুমতি দেবী।

বললেন, ছাথ খোকা, তোর মন নিয়ে আমি জন্মাই নি, কিন্তু তুই যে আমার রক্তে-মাংসে গড়ে উঠেছিস সেটা মিথ্যে নব।

এ কথা কেন মা ? চমকে ওঠা নয়, রীতিমত বিস্মিত হোলো রঞ্জন।

না, তাই বলছিলুম। এক নজর রঞ্জনের মুখখানা দেখে চোখ ফেরালেন সুমতি দেবী। অনেক পরে বললেন, ওদের ওপর অবিচার করিসনি কখনো। আমি তো জানি, এ হতেই হবে। এ যে তোদের বংশের ধারা।··· কথাটা রাখিস।

রঞ্জন অবাক হয়ে চাইলো মা'র মুখের দিকে। তারপর ছোট্ট করে বললো, কার কথা বলছো মা ?

বৌমার কথা, ওরা ছেলে মানুষ। এখনো ভেঙে গড়তে শেখেনি। তার চেয়েও বড় কথা ওরা মেয়ের জাত, মা'য়ের জাত। ওরা তাই সংসারের বাইরের মনকে বরদাস্ত করতে পারে না।······আমিই কি পেরেছিলুম প্রথমটা ?

চুপ করলেন একটু সুমতি দেবী। পরে আবার বললেন, তুই যখন হলি, স্পষ্ট মনে আছে সেদিনকার কথাটা। দিনটা ছিল সোমবার। সকালের উঠতি বেলা সবে মাত্র নারায়ণ পুজো শেষ করে তোর বাবা ঘণ্টাধ্বনি করছেন, আর সেই সময়, ঠিক সেই আরতির মুখে তুই হলি।—

তুই হলি। আনন্দই হল আমার। কিন্তু তোর বাবার মুখে কিন্তু ততটা হাসি ফোটেনি। শুনতে হয় গোছের শুনলেন, তার বংশে আরো একটি লোক বাড়লো। ব্যস্। আর কিছু নয়, কোন উচ্ছ্বাসই নয়। একবারটি কোলে তুলে নেয়া পর্য্যন্ত নয়।

সেই তোর বাবা, তিনটে লাফ দিয়ে পাড়া মাতিয়ে তুললেন, যখন শুনলেন ছেলে তার কলম ছুঁয়েছে অন্নপ্রাশনে। তিন দিন তিন রাত্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিলেন না বাড়ীর লোকগুলিকে। চললো কথকতা। কবির লড়াই আর স্বভাব কবির আখড়।

আমি কিন্তু সেদিন তোর বাবার ঐ সব ভালো চোখে দেখিনি। দেখিনি, বাপের ধারা পেয়ে ছেলেটাও উড়ুচণ্ডী হয়ে থাকবে বলে। কতদিন তাই গৃহ-দেবতার পায়ে মাথা কুটেছি : "হে ঠাকুর, ছেলেটাও যেন বাপের মতো বয়ে না যায়। সংসারটা যেন চেনে " চোখের জলও ফেলেছি কতবার তাই নিয়ে।

সেই তুই বড় হ'লি, লেখা পড়া শিখলি, চাকুরিতে ঢুকলি। কিন্তু তখন কি ছাই ভেবেছিলুম যে তোর বুকেও তোর বাপ-ঠাকুর্দ্দা লুকিয়ে আছে।

চুপ করলেন একটু সুমতী দেবী।

মুখ তুলে একবার তার দিকে চাইলো রঞ্জন। মনে হোলো তাঁর মুখে চোখে যেন কিসের প্রচ্ছন্ন ছায়া, কি এক গভীরতার ইংগিত।

শুনেছি তোর ঠাকুর্দ্দা ছিলেন কথক। তাঁর কথকতা শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। আমি এ সংসারে আসবার ক'টা দিন পরেই তিনি দেহ রাখেন। তবে একটা জিনিষ দেখেছিলুম, অমন শ্রাদ্ধ জীবন তোর আর একটাও চোখে পড়েনি। দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসছে চোখের জল ফেলছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তোর দাদুর প্রশংসায়।

অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ করে রইলেন সুমতী দেবী। মনে হোলো, তিনি যেন আজ এই বিস্মৃত এক সময়ে বসেও নিরিখ করবার চেষ্টা করছেন সেদিনকার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যটা।

কেমন যেন গুলিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল রঞ্জনের দৃষ্টি। উঁচু করে চাইতে গিয়েও যেন চেয়ে থাকতে পারলো না বেশীক্ষণ।

—সেই তোর দাদুই নাকি একদিন রামায়ণ পাঠের আসরে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিলেন যে, এ বংশের ছেলেরা আসে প্রদীপ হাতে নিয়ে ' সে প্রদীপের আলো য় হাজার হাজার মানুষকে পথ দেখাবে বলে, তাদের জীবন শুদ্ধি করবে বলে। কথাটা মিথ্যে নয়। তোর বাবাকেও দেখেছি রাতদিন মানুষের ভীড়ে হারিয়ে থাকতে। কত কেঁদেছি সে জন্যে। যে লোকটার জন্যে রক্তের সম্পর্ক ছেড়ে এসেছি পরের ঘর করতে, সেই মানুষটা একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার মত করে ধরা দিত না বলে। কেবলই চোখের জলে বুক ভিজিয়েছি।

—মনে মনে ঠাকুরের কাছে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বলেছি "নারায়ণ, চিরজীবন যেন বন্ধ্যা থাকি সেও ভালো, তবু যেন এ জগতে মা না হতে হয়।"

আবার একটু চুপ করলেন সুমতী দেবী। বোধ হয়, দুরন্ত সংযম দিয়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছেন। নিজেকে কঠিন রাখবার সাধনা করছেন।

অব্যক্ত ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠলো রঞ্জনের বুকের ভেতরটা। ত্বরিতে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করে বললো, "মা"। আর কিছু নয়। যেন আর কোন ভাষাই থেই পেলো না রুদ্ধ আবেগের তটে।

চোখ মেলে তাকালেন সুমতী দেবী। ক্ষমা আর গর্ব্ব যেন একই সঙ্গে সে দৃষ্টিতে প্রতিভাত। বললেন, "খোকা।" একটু চুপ করে আবার বললেন, "কিন্তু— জানিস খোকা আজ তোকে নিয়েই আমার যত গর্ব্ব, যত তৃপ্তি। মানুষের মধ্যে সমস্ত জীবন কাটিয়ে যে আনন্দ আমার সঞ্চিত হয়নি, তার চেয়ে শতকোটি বেশী আনন্দ আর গর্ব্ব আমার তোকে নিয়ে, তোর মা হয়েছি বলে।

বেশ খানিকটা সময় রঞ্জনের পিঠে হাত বোলালেন সুমতী দেবী। তারপর একসময় নিচু গলায় বললেন, দুঃখ্যু করিস নি। বৌমা যখন আমার এই বয়সে আসবে, মা হবার তৃপ্তি বুঝবে মনে প্রাণে, তখন সেও গর্ব্বই করবে তোর ছেলের জন্যে।

—এ যে হতেই হবে। এটা তোদের বংশের ধারা, রক্তের সম্পর্ক। কবিয়ালের ছেলে কি ডাক্তার হবে, না বামুন বলে কুল-পুরোহিতের ব্যবসা নিয়ে জীবন কাটাবে?

উঠে দাঁড়ালেন সুমতী দেবী। বললেন, মন খারাপ করিস নি। মন নিয়ে ব্যবসা করিস, একটু ধৈর্য্য ধর্, বৌমাকে মা হওয়া পর্য্যন্ত—সেদিন দেখবি কত পরিবর্ত্তন আজকের এই মেয়েটার সঙ্গে সেদিনকার মা'র।

জপের থলিটা একবার কপালে ঠেকিয়ে এগিয়ে গেলেন সুমতী দেবী। কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, আর—আর একটা কথা। আজ পর্য্যন্ত তোর বাবাকে নিয়ে কখনো কিছু লিখিস নি এবার একটা লিখিস।·········কি লিখবি সে তুই জানিস। কিন্তু তার সঙ্গে এটুকু লিখিস, তোর বাবা কবিয়াল, মানুষের মনের রাজা। আর—একটু চুপ করে থেকে চোখ বুজেই বললেন সুমতী দেবী:—আর—সে জন্যে তোর মা গর্ব্বিত, ধন্য।

আর দাঁড়লেন না তিনি। ত্বরিতে উঠোন পেরিয়ে ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ছোট বেলার একটা ছবি মনে ভেসে উঠলো রঞ্জনের। —পড়তে বসে ঠায় অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সামনের দেওয়ালে টাঙানো বাউলের ছবিটা। কেমন একটা মাদকতা, বেশ খানিকটা আকর্ষণ রয়েছে ঐ ছবিটার গভীরে। দেখে দেখেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না।

কতক্ষণ দেখছিল খেয়াল নেই, সহসা পিঠের ওপর আল্‌তো হাতের চাপ পড়তে চমক ভাঙলো তার। পেছন ফিরে দেখলো, তার বাবা। চোখের কোণে তাঁর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর আশ্বাস। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, এঁকে মনে রাখিস খোকা, বড় হ'লে প্রেরণা পাবি, পথ পাবি।

তারপর একটু চুপ করলেন। ঘন করে একবার ছবিটা দেখে নিয়ে বললেন, বাউলের জাতে ঘর পেয়েছিস, তোর আবার অভাব কিরে, দুঃখ কিরে! এঁর ওপর বিশ্বাস রাখিস—মন পাবি, দামও পাবি। ইনি তোর ঠাকুর্দ্দা। দেবোত্তর কথক। মুখে মুখে রামায়ণ-মহাভারতের ছড়া কাটতেন। মানুষের মন নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর জয়গান গেয়েই জীবন কাটিয়ে গেছেন।··· এঁর রক্ত তোর দেহে, এঁর মনের বীজ তোর রক্তে, তোর আবার দুঃখ কি!

তারপর পরম আদরে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আবার বললেন, তোর দাদুর জন্মের কথাটা জানিনে, কিন্তু আমারটা শুনেছি মা'র কাছে। বাড়ীর কেউ ভালো মনে নিলে না, এমন কি তোর ঠাকুরমা'ও নয়, যখন অন্নপ্রাশনের বেলায় আমি খাগের কলমটা চেপে ধরলুম দু'হাতে। টাকা নয়, মাটি নয়, ধান, নয়, এমন কি দর্পণখানা পর্য্যন্ত নয়, পরম বিশ্বাসে তুলে নিলুম কিনা সামান্য একটা হাতেকাটা খাগের কলম।

সবাই মুখ ফেরালে, বললে, কথকের ছেলের রুচি আর কতদূর গড়াবে। ওরা যে ঘরছাড়ার জাত। ঘর বাঁধবার মত মন নিয়ে তো আসবে না।"

সেই তো সত্যি হোলো। কথক ঠাকুরের ছেলে, একটু বদলে হোলো কবিয়াল। স্বভাব কবি। তুই তো তারই ছেলে। দেখিস বাবা, কবিয়াল না হোস্‌, অন্ততঃ কবির মন নিয়ে ধারাকে অব্যাহত রেখে যাস্‌। দুনিয়ার সব জাত আর পরিচয়ের উর্দ্ধে তোর আমার জাত, এ কথাটা মনে রাখিস।"

স্পষ্ট মনে পড়ছে আজ বাবার সে কথাগুলি। দেখতে দেখতে ভিজে উঠলো চোখের পাতা রঞ্জনের। অনাহুত ভাবে দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।

সেই তো সত্যি হোলো। বংশের ধারাই বজায় রইলো।

ঘরে ফিরে এলো রঞ্জন। ভয়ানক গুমোট অন্ধকার সারাটা ঘরময়। কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। শুধু দেয়াল ঘড়িটা টিক টিক করছে একটানা।

পা ফেলতেও যেন গা ছমছম্‌ করে। অহেতুক টিপ টিপ করে বুকের ভেতরটা। চারদিকে তাকিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করলে। একটু যেন স্বচ্ছ মনে হচ্ছে এবার। দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা দু'টো ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে। আবছা আবছা নজরে আসছে জানালার ধারের টেবিলটা।

দৃষ্টি পড়লো বিছানার ওপর। সন্তর্পণে দু'পা এগিয়ে যেতেই অবাক হয়ে দেখলো, কখন যেন রমা এসে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। পাশে শুয়ে খোকা। তার একমাত্র বংশধর।

বড় ভালো লাগলো দৃশ্যটা। মা আর ছেলে। অদ্ভুত ভালো লাগছে আজ পাশাপাশি এ মুখ দু'খানা।

ঝুঁকে একবার খোকার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলো রঞ্জন। কেমন আশ্চর্য্য এক শান্তি, সোনার বিচ্ছুরণ ওর সারাটা মুখময়। আরো একটু ঝুঁকে পড়লো। নাঃ আসলটুকু ছাড়া আর কিছুই চোখে ঠেকছে না।

রমার মুখখানা চোখে পড়লো এ্যাঁ, খোকা যেন মা'র মুখেরও খানিকটা পেয়েছে। দু'খানা মুখ যেন ভেঙে মিশে গিয়েছে।

চোখটা ঘুরিয়ে ফিরে দাঁড়ালো রঞ্জন। নজর পড়লো টেবিলের ওপর। দৃষ্টি আটকে গেল। কৈ না নেই তো কলমটা। দু'হাতে ঝড় তুললো টেবিলের ওপর। কিন্তু-না, নেই।

ঘুরে দাঁড়ালো সে। আর সেই মুহূর্ত্তে কি যেন চিক্‌-চিক্‌ করে উঠলো বিছানায়। ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো সামনে দেখলো খোকার কচি হাতের মুঠোয় ঝিলমিল করছে তার স্বর্ণ কলমটা, ধরে আছে অনেকটা সেই সকালবেলার মত করেই।

★

ক্ষণবসন্ত

সুজিতকুমার নাগ

সেদিনের সেই হারাণো কথাই মনে পড়ে ?
সেদিনের সেই হারাণো গান তো ঝরে পড়ে!
তোমার আমার যে-হেতু এ মন হারালো গানে
পথের দেখায় উতল হল কি কোন প্রাণে ?

অথবা আমার প্রাণের ক্ষেত্রে দ্রাণে দোলা :
স্মৃতির কাব্য মনের মিছিলে যায় না ভোলা,
তবুও দেখায়—শুধু দুটি কথা ভনে মনে :
ফুল যদি ফোটে, মালা গাঁথা স্রান্তি অবারণে ?

অমূল তরু

নরেন্দ্র দেব

বাংলাদেশের আমরা বাঙালী পৃথিবীর সেরা আরামবাজ,
বাঙালীকে কেউ ছোটলোক বলে বাঙালী করে না এমন কাজ।
বাংলাদেশের শহরে কি কেউ দেখচো ভোরে বা সন্ধ্যাকালে—
বাঙালীরা দেয় ঝাড়ু জলছড়া পথের প্রদীপ বাঙালী জ্বালে?
বাংলাদেশের প্রধান শহরে বাঙালীকে বড় পাবে না খুঁজে,
বাঁচিয়ে ছোঁয়াচ থাকে একপাশে খাটাখাটুনিতে চোখটি বুজে।
এ দেশের যত পথঘাট গড়ে অন্য দেশের মানুষ এসে,
যত বাড়ীঘর গেঁথে দিয়ে যায় যারা নাহি রয় বাঙ্‌লা দেশে।
ঝাড়ুদার আর ধাঙড় মেথর ঠাকুর চাকর অথবা মালী,
বাঙালী একটি পারে না সহজে, তারা দেয় শুধু সবারে গালি;
'উড়ে' 'মেড়ো' আর 'নেড়ে' বলে তারা অবজ্ঞাভরে সবারে ডাকে,
'কিষ্কিন্ধ্যার জঙ্গলী' অথবা 'ছাতুখোর' নাম তারাই রাখে!
বাঙাল ঘটির নটঘটি বলো দেশজুড়ে আজ কেবা না জানে?
ধরা পড়ে গেছে বেহার আসাম বাঙালী খেদার ঐক্যতানে!
ট্রেন থেকে নেমে ওঠো যদি ঘেমে খুঁজেও পাবে না বাঙালী কুলি,
ফেরিওয়ালা গুলো কত কি তো বেচে, বলেনা কিন্তু বাঙ্‌লা বুলি।
ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সী রিকশা ডেকে দেখ তারা কি ভাষা কয়?
ট্রাম বাসে যাও তার ড্রাইভার কণ্ডাক্টার এদেশী নয়।
ডাকো ঠ্যালাগাড়ী মুটে কি মজুর বাঙালী খুঁজিয়া পাবে না ভাই,
জুতো ছিঁড়ে গেলে রাস্তায় মুচী খুঁজে দেখ দাদা বাঙালী নাই!
দেখেছো কি যারা গরু নিয়ে এসে গোয়ালা সকালে দাঁড়ায় দো'রে?
তারা কি বাঙালী? পরদেশী সব। বাঙালী গোয়ালা গিয়েচে মরে।
নাপিত খুঁজিলে নৌয়া মিলিবে, পরামাণিকের পাত্তা নেই,
কাপড় ধোলাই করে দেয় কারা? ধোবার ঘরেও হালটা সেই!
গাধা নিয়ে যারা গাধাদের ঘরে প্রতি সপ্তাহে আসে বা যায়,
বিদেশী বঁধু সে। রজকিনী রামী বহুদিন হ'ল লুপ্তপ্রায়!
রাত না পোয়াতে বাড়ী বাড়ী ঘুরে দৈনিকখানি বিলায় যারা,
বেচে ফল মূল মসুম্বী নেমু বেদানা আনার জানো কি কারা?
এদেশের যত সেরা কারবার একচেটে প্রায় যাদের হাতে
জানো কি তাহারা রাজোয়ারাবাসী, বাঙালী বেনেরা পতিত জাতে।
ছোট বড় যত কলকারখানা হয়েছে এখন বাংলা দেশে,
বাঙালীর টাকা বাঙালীর শ্রম খুঁজেও সেখানে পাবে না এসে।
অল্প সল্প খুচরো মজুরি তাতেও বাঙালী দেয় না যোগ
চেয়ারে টেবিলে চাকুরি সে চায়, বাবুগিরি তার জাতের রোগ!
ভাঙা লোহা কেনে বাঙালী কি কেউ ননীর শরীরে পারে না বাছা,
সারাদিন যায় টেরিটা বাগাতে, সামলাতে তার কোঁচা ও কাছা!
নকল সাহেবও সাজে দেখি হাতে সিগারেটটিন এ্যাটাচি কেস,
হাওয়াই সার্ট বা চাদনীর স্যুটে, কাবুলী চটিতে সঙের বেশ!
চাল, ডাল আর তেল, ঘী দেশের, সুপুরি, মশলা, হলুদ, ধনে,
তুলো আর পাট, চা' চিনি বাগিয়ে অবাঙালী আজ রুপেয়া গোণে!

বড়বাজারের পগেযাপটিতে বাঙালীরা ছোটে কাপড় নিতে,
ভেবে দেখ দেখি শাল আলোয়ান কার কাছে তারা কিনছে শীতে?
জুতার জন্য চীনে বাড়ী আর ভরসা বাটার দোকান গুলো
বাঙালীর দেশে অবাঙালী রাজা, বাঙালীর নেই চাল কি চুলো।
পানের দোকানে পান খেতে যাও বাঙালীর হাতে নেই সে পান,
ডালমোট আর ঝাল ছোলা চানা গোলাপী রেউড়ী কাদের খান?
বাংলা দেশের চোর বদমাস্ হয়ত কতক বাঙালী তারা,
তাই আমাদের দেউড়ী বাঁচায় ভোজপুরী, নয়, নেপালী যারা।
পুলিশ প্রহরী বাঙালী ক'জন? চোর ধরা নয় তাদের কাজ;
লড়াই যাকিছু গুর্খারা করে, বাঙালী তো নয় দাঙ্গাবাজ।
বাঙালী যখন নাট্যাভিনয়, খেলাধুলো আর জলসা করে,
পুজো পার্বণে চাঁদার খাতায় অবাঙালী ধনী বাছিয়া ধরে।
গানের আসরে আমাদের ঘরে অবাঙালী এসে বাজায় গায়,
হিন্দী উর্দু ভজন ভয়রোঁ বাঙালী শ্রোতার তারিফ পায়!
যদিও বাঙালী জাতটাকে সবে বাক্যবাগীশ বলিয়া জানে,
তবু অবাঙালীকে কনভোকেশনে বক্তৃতা দিতে ডাকিয়া আনে।
প্রাদেশিকতার মনোভাব নেই বাঙালী বড়ই উদার প্রাণ,
নিজের নাসিকা কেটেও তাঁরা কি তবুও কোথাও সুনাম পান?
জল ড্রেন গ্যাস প্লাম্বিংকাজে বাঙালী কোথায় খুঁজে কি পাও?
বাঙালী দেয় না ছোট কাজে হাত, যতই তোমরা বাহবা দাও।
অফিসার গ্রেডে উঠেছেন যাঁরা ভারিক্কে কিছু হয়েচে পায়া,
সেথা ছেলে মেয়ে মানুষ করিছে মান্দ্রাজী নয় বেহারী আয়া!
ঢুকে বাংলায় ব্যবসা মহলে মনে হবে, কোন্ দেহাত্ এটা,
ঘোরে টেক্‌চাঁদ, পলাতকরাম, আয়ার, নায়ার, প্যাটেল, মেটা!
জানো কি এখন অবাঙালী জন চাষ করে যায় তোমার ক্ষেতে,
শানাই বাজায় অবাঙালী এসে তোমার ছেলের মেয়ের বে'তে?
কোন্ সে জহুরী যোগায় তোমার কন্যাদায়ের অলংকার?
কোন পাটোয়ার গেঁথে দেয় তব প্রিয়ার কণ্ঠে মুক্তাহার?
মাংস কিনিতে যার কাছে যাই দেখি তারা কেউ বাঙালী নয়
হলেও বাঙালী সহিংস জাতি, তাবলে তারা কি কসাই হয়?
ম'লেও যে তার নেই নিস্তার, বাঙালী গড়েনা মড়ার খাট,
বাঙালী শ্মশানে খোঁড়ে নাকো চিতা, বাঙালী বয়না চিতার কাঠ,
জন্মমৃত্যু সারাটা জীবন পরমুখ চাওয়া বাঙালী জাত
অবাঙালী ছাড়া ঘরে ও বাইরে বাঙালীর নেই কোথাও হাত।
বাঙালী চলেছে পরের স্কন্ধে, অচল সে বিনা বিদেশী গরু;
মাটির সঙ্গে যোগ নেই যার,—কদিন বাঁচে সে অমূল তরু?
সহসা পায়ের তলা হ'তে যদি অবাঙালী যারা সরিয়া যায়,
ধুলায় লুটাবে পলকা বাঙালী হালকা তাসের প্রাসাদ প্রায়!
বাঁচিবার যদি সাধ থাকে, তবে, ভিত গড়ো, আজও সময় আছে,
কায়িক শ্রমের সম্মান শেখো, প্রাণরস নাও মাটির কাছে।

বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

বাঙলা আজ যাহা ভাবিবে, তাহাই কাল ভারতবর্ষ ভাবিবে—"What Bengal thinks to-day India will think to-morrow." বাঙলা ও বাঙালীর উদ্দেশ্যে এই প্রশস্তি-বাক্য একদা বাহির হইয়াছিল স্বর্গীয় গোপাল-কৃষ্ণ গোখেলের মুখ হইতে। ইহা অতিশয়োক্তি নহে, চাটুক্তিও নহে,—বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা সম্পর্কে স্বরূপ-কথন বলা যাইতে পারে। গোখেল একজন ভারত-বিখ্যাত নেতা। তিনি একান্ত নিষ্ঠার সহিত স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। চিন্তাশীল সুবিবেচক ও ত্যাগী দেশসেবক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। গোখেলের মতে বাঙালীর চিন্তাধারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে একদিন পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলে। কিন্তু গোখেলের অপেক্ষা অধিকতর খ্যাতিমান ও লোকপ্রিয় এক-জন নেতা বাঙালীর চিন্তাধারার অগ্রগতি অনেক বেশী বেগবান বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি হইলেন দেশনায়ক অরবিন্দ ঘোষ। তাঁহার মতে, বাঙালীর চিন্তা-ধারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে একদিন পশ্চাতে রাখিয়া নহে, এক সপ্তাহ পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যায়। "What Bengal thinks to-day India will think to-morrow week;" অর্থাৎ বাঙলা আজ যাহা ভাবে, তাহাই এক সপ্তাহ পরে ভারতবর্ষ ভাবিবে। ইহা অরবিন্দের উক্তি বলিয়া ভারতের প্রবীণতম সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মুখে একাধিকবার শুনিয়াছি।

বাঙালীর চিন্তাধারার অগ্রগমন সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা অরবিন্দের পক্ষে যে স্বাভাবিক সে প্রমাণ তাঁহার রচনা, ভাষণ ও কথোপকথন হইতে মিলিবে। তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে,—ভারতের উচ্চতর চিন্তায় বাঙালী সর্বদাই নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে। কারণ বাঙালীর মধ্যে প্রধানতঃ এমন শক্তি রহিয়াছে যাহা ভাবীকালের নূতন জাতির পক্ষে খুবই আবশ্যক। "The Bengali has always led and still leads the higher thought of Indian, because he has eminently the gifts which are most needed for the new race that has to arise." অরবিন্দ সেই প্রবন্ধে ইহাও বলিয়াছেন যে,—বাঙালীর সূক্ষ্ম মেধা আছে,...... অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালী অধিক মাত্রায় অতিমানসের অধিকারী এবং এখন পর্যন্ত অনুন্নত হইলেও উহাকে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে,...অধিকন্তু এই জাতির প্রবল ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে।... "He has, too, a subtle brain.. he has in a greater degree than other races the yet undeveloped supermind.. In addition, the race has a mighty will-power.."

দুই

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে বাঙালীর চিন্তাধারা অগ্রগামী। এই প্রবন্ধে আমরা রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

'বন্দে মাতরম্' ও 'জনগণমন' স্বাধীন ভারতে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই দুইটি সঙ্গীতই দুই-জন বাঙালী কবির রচিত। উত্তর প্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা এবং মাদ্রাজের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ যখন আসামের রাজ্যপাল ছিলেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিলং-শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৩৫৬ সনের নববর্ষ-উৎসবের সভায় বাঙলা ভাষায় ভাষণ দিয়াছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

"ইহা সত্যই গৌরবের কথা যে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন' বাঙালী কবির রচিত।"... "স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গদেশের অতুলনীয় দানের কথা উল্লেখ করিয়া প্রদেশপাল বলেন,—সেই অন্ধকার ক্ষণে যখন ভারতবর্ষ লক্ষ্যহীন এবং বিভ্রান্ত তখন বঙ্গদেশ হইতেই আশার তরুণদীপ্তি ধীরে ধীরে বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল। এই বাংলা দেশই ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরাধীনতার সেই সঙ্কটক্ষণে যখন সকলে ভাবিয়াছিল—সবই বুঝি হারাইয়া গিয়াছে—তখন ভারতবর্ষের যাহা কিছু সনাতন—যাহা কিছু মঙ্গলময়—তাহা বাঙালী সাধকরা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া সমগ্র দেশকে অপূর্ব গরিমায়

জাগ্রত করিয়াছিলেন। ভারতভূমি তখন সকল গ্লানি সকল অপমান বর্জন করিয়া বিপুল গৌরবে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে নির্ভয়ে আলোকের-পথে তাহারা জয়যাত্রা সুরু করিয়াছিল। ধীরে ধীরে দেখিলাম আমাদের দুঃখের অবসান ঘটিতেছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫৬ সন ৬ই বৈশাখ—১৯৪৯ খৃঃ ১৯শে এপ্রিল)।

এই ভাষণের মধ্য দিয়া বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারার প্রতি প্রশস্তি নিবেদিত হইয়াছে। চিন্তা কর্মের উৎপাদক বা স্রষ্টা। সুতরাং রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর যে অতুলনীয় দান, তাহার মূলে রহিয়াছে বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা।

, জন্মভূমিকে জননী-জ্ঞানে পূজা ও সেবা করিবার মহান আদর্শ কয়েকজন বাঙালী মনীষী সর্বাগ্রে তাঁহাদের অনবদ্য রচনার মধ্য দিয়া প্রচার করেন। পরে সমগ্র ভারতবর্ষ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। "আনন্দমঠের" ভবানন্দের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শুনাইয়াছেনঃ—

"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—"

এই আদর্শের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমকে ধর্মের আসনে উন্নীত করিয়াছেন। 'জন্মভূমিই জননী'—এই জ্ঞানের উন্মেষ বঙ্কিমচন্দ্রই করিয়াছেন। এই জন্য অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি "Rishi Bankim Chandra" শীর্ষক অনুপম প্রবন্ধের মাধ্যমে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে। রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণের রচনায়ও অনুরূপ ভাবের অভিব্যক্তি আছে।

বাঙালী স্বদেশপ্রেম-ধর্মে দীক্ষা নিয়াছে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের মধ্য দিয়া। নিজে অগ্রে দীক্ষিত হইয়া পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীকে সে দীক্ষা দিয়াছে। বাঙলা যে স্বদেশপ্রেম-ধর্মের পীঠস্থান এবং বাঙালী যে সেই ধর্মের দীক্ষা-গুরু; ইহা অবাঙালী দেশভক্তেরাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। ,

তিন

বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষা প্রচলন, সালিসী আদালত স্থাপন, অবৈতনিক সরকারী কার্য ত্যাগ, রাজপুরুষগণের সম্মানার্থ অনুষ্ঠিত সভা-সম্মিলনাদি বর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের রাজনীতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিখিল ভারতের বাস্তব কর্ম-ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কালে। যাঁহারা স্বদেশী যুগের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস জানেন না, তাঁহাদের কাছে পূর্বোক্ত কার্যক্রম অভিনব বলিয়া স্বভাবতঃই মনে হইবে। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে ওই কার্যক্রম বাঙলা দেশে সর্বপ্রথম গৃহীত হয় এবং তাহা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হয়। ওই কার্যক্রমের উদ্ভাবকও বাঙালী। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সরকারী প্রস্তাব কার্যকরী করা হইবে বলিয়া সঠিক সংবাদ প্রকাশিত হয় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। স্বনামখ্যাত নেতা নির্বাসিত দেশসেবক স্বর্গত কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার সম্পাদিত বাঙলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৯০৫ খৃষ্টব্দের ১৩ই জুলাই (১৩১২ সনের ২৯শে আষাঢ়) তারিখের সংখ্যায় 'কর্তব্য নির্দ্ধারণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রকাশ করিয়া বাঙলার জনসাধারণকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। প্রবন্ধটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে।... জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না।... বাঙালী আর মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।.. বড় লাট, ছোট লাট, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না।... রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের আমোদে কেহ যোগ দিতে পারিবে না।

"লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙালী আর রাজপুরুষদের সংস্রবে যাইতে পারিবেন না।"

'সঞ্জীবনী'র প্রস্তাবিত পূর্বোক্ত কার্যক্রম দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। তৎপর ৭ই আগষ্ট (১৩১২ সালের ২২শে শ্রাবণ) কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ইহাই

'বয়কট' আন্দোলনের জন্ম-বৃত্তান্ত। এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

চার

গান্ধী-যুগে কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয় পতাকা পরিকল্পিত ও ব্যবহৃত হইবার বহু বৎসর পূর্বে বাঙালী উহার পরিকল্পনা করে; এবং বাঙলা দেশেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা জনসভায় উড্ডীন করেন। জাতীয় পতাকা প্রথম ব্যবহৃত হয় কলিকাতায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। বাঙালীর পরিকল্পিত ও বাঙলা দেশে ব্যবহৃত সেই জাতীয় পতাকাও ছিল ত্রিবর্ণ। সেই পতাকার বর্ণনা এবং অনুষ্ঠানের বিবরণ 'দি বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত জাতীয় পতাকার বর্ণনা এইরূপঃ—

"সবুজ, পীত ও লাল রঙের জমির উপর প্রথম লাইনে আটটি পদ্ম, দ্বিতীয় লাইনে সংস্কৃত অক্ষরে বন্দে মাতরং এবং শেষ লাইনে সূর্য ও অর্ধচন্দ্রাকৃতিই জাতীয় পতাকার চিহ্ন হইয়াছিল।"

স্বদেশী আন্দোলনেরও বহু বৎসর পূর্বে একজন প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী মনীষী একটি পতাকার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। উহা পরিকল্পিত হইয়াছিল হিন্দু জাতির জন্য। সেই মনীষী হইলেন জাতীয়তার আদ্যাচার্য বলিয়া খ্যাত ও সম্মানিত ঋষি রাজনারায়ণ বসু। তাঁহার 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক রচনায় দেখিতে পাই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে তিনি ভারতবর্ষের হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য এবং তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে "মহাহিন্দু সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। হিন্দু বলিতে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভারতবাসীকে বুঝিয়াছেন। উহার ৪ সংখ্যক বিধির কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

"...মহাহিন্দু সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে, তাহাতে 'ঈশ্বর ও মাতৃভূমি' এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এই বাক্যের নিম্নে একটি পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে এবং তাহার নিম্নে "সনাতন ধর্মের জয়" এই বাক্যটি অঙ্কিত থাকিবে। পদ্মপুষ্প এদেশে ঈশ্বরের সৃজনশক্তি এবং দেবপূজার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গণিত হইয়া থাকে।..."

পাঁচ

অন্যায় আইনের নিকট মাথা নত না করার ভ্রূণ ভারতবর্ষে বাঙালীর মস্তিষ্কেই প্রথম জাগ্রত হয়, এবং স্বদেশী যুগে বাঙলা দেশেই সর্বাগ্রে অহিংস থাকিয়া অন্যায় আইন অমান্য করিয়া নিগ্রহনীতিপন্থী ক্ষিপ্ত রাজশক্তিকে উপেক্ষা করা হইয়াছিল। বাঙলায় অনুসৃত এই নীতি গান্ধী-যুগে 'সত্যাগ্রহ' নামে প্রচারিত ও প্রযুক্ত হয়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance, এবং অসহযোগ বা 'Non-cooperation' বাঙলা ও বাঙালীর নিকট অভিনব রাজনীতিক কর্মপন্থা নহে। রাজনীতিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বলপ্রয়োগ না করিয়া দুঃখবরণের পথ অবলম্বন করার আদর্শ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীই প্রথম প্রচার করে। এই সমুদয় আদর্শ ও পন্থা বাঙালী শুধু প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বাঙলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহা রূপায়িত করিয়াছে ও অনুসরণ করিয়াছে। বাঙালী 'আপনি আচরি ধর্ম' পরকে শিখাইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য-পর্বে বিদেশী রাজের দমননীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগ যখন আরম্ভ হয়, তখন বাঙালী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। বাঙলার ছাত্রগণকে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে কর্তৃপক্ষ নিষেধ করিলে সে-নিষেধ ছাত্রসমাজ মানে নাই। সেইজন্য ছাত্র, শিক্ষক এবং কোন কোন স্থলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে পর্যন্ত নানা ভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ছাত্র বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, শিক্ষক পদচ্যুত হইয়াছেন এবং বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সরকারের ছাত্রদলন-নীতির সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিল বাঙলা—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ("বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ") প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে তদধীন শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়া। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেই শিক্ষা পরিষদের বিরাট অবদান এবং বাঙালীর সংগঠনী শক্তিরও জীবন্ত নিদর্শন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে থাকিয়াও ছাত্রগণ ওই আদেশ মানিয়া চলে নাই। ছাত্রদলন-নীতির প্রতিবাদে কলিকাতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তৎকালের বিখ্যাত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান—'এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'। পরে সেই সার্কুলার উপেক্ষিত আইনে (dead letter-এ) পর্যবসিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করিয়া সরকারী আদেশ জারী করা হয়। জনসাধারণ সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ

হয় নাই। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার "আত্মচরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ—"...ছোট ছোট বালকবালিকারাও দণ্ডের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া 'বন্দে মাতরম্' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ কোন ইংরেজ দেখিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দে মাতরম্' বলিত।..."

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এবং ১৫ই এপ্রিল বরিশাল সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া সহস্র সহস্র বাঙালীর বিরাট মিছিল 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে রাজপথ দিয়া সম্মিলন-মণ্ডপের দিকে যাইতে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ শোভাযাত্রীদিগের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালায়। যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অনেকেই আহত হইলেন, কাহারও মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইল, কাহারও হাড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং কেহ অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। নির্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াও কেহ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বন্ধ করিলেন না, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতেও বিরত হইলেন না এবং মিছিল ছাড়িয়া একজনও সরিয়া গেলেন না। শোভাযাত্রীরা সংখ্যায় পুলিস বাহিনী অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হইলেও নেতৃবর্গের আদেশ পালন করিয়া তাঁহারা প্রহৃত হইয়াও প্রহার করিলেন না, আত্মাবহ বিশ্বস্ত বীর সৈনিকের ন্যায় আঘাতের পর আঘাত মাথা পাতিয়া লইলেন—তবু আক্রমণকারীকে আঘাত করিলেন না।

স্বদেশী যুগে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবর্গ তাঁহাদের ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও নিরুপদ্রব অসহযোগের আদর্শ ও পন্থা প্রচার করিয়াছিলেন। আলিপুরে বোমার মামলায় মুক্তি পাইবার পর (১৯০৯ খৃঃ) অরবিন্দ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে বলিয়াছিলেন যে, বিদেশী সরকার যদি লোকায়ত্ত সরকারে পরিণত হয়, তবে সহযোগিতা ("co-operation") করা যাইতে পারে। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ন্যায়-সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ("Passive Resistance"-এর) পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে এবং ইহাই একমাত্র শান্তিপূর্ণ পথ; বিদেশী শাসকরা যদি আমাদের প্রাথমিক অধিকারগুলি কাড়িয়া নেন, তবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণভাবে দুঃখভোগ এবং সহযোগিতা করিতে শান্তিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন পথ নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখের 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের "An open letter to my country men" (আমার স্বদেশবাসিগণের নিকট একখানি খোলা চিঠি) শীর্ষক পত্রে জাতীয় দলের ("Nationalist Party"-র) জন্য যে কার্যক্রম দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম দুইটিই হইল—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগ। এই সমুদয় আদর্শ ও পন্থা তাঁহার সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমেও প্রচারিত হইয়াছিল।

গান্ধী-যুগে সত্যাগ্রহীরা বিদেশী রাজার বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করিয়া কারাবরণ করিতেন। বাঙালীর নিকট এই ভাব নূতন কিছু নহে। স্বদেশী যুগে দুইটি প্রসিদ্ধ রাজদ্রোহের মামলায় দুইজন আসামী বিদেশী রাজার বিচার করিবার অধিকারকে আদালতে অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। ইঁহাদের একজন "সন্ধ্যা" পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং আর একজন "যুগান্তর" সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল চব্বিশ পরগণার বারুইপুরে জনসভায় অরবিন্দ যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বোক্ত মামলা দুইটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভূপেন দত্ত এবং উপাধ্যায় মহাশয় বিদেশী রাজার আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

ছয়

পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শও বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারায় স্থান পাইয়াছিল। কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক "বন্দে মাতরম্", বাঙলা দৈনিক "সন্ধ্যা" ও "নবশক্তি" এবং বাঙলা সাপ্তাহিক "যুগান্তর" পত্রিকার মধ্য দিয়া ওই আদর্শ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে প্রচারিত হয়। তৎকালে বাঙলার জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁহাদের বক্তৃতায়ও পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার ভাষায় ভারতবাসীর রাজনীতির লক্ষ্য—"Absolute autonomy free from foreign control." "কর্মযোগিন্" এবং "ধর্ম" পত্রিকার মাধ্যমেও অরবিন্দ ওই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। "An open letter to my countrymen" শীর্ষক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—"Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control"....

পূর্ণ স্বাধীনতার কথা শুনিয়া গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের মতো একজন স্থিরমস্তিষ্ক মধ্যপন্থী নেতার মাথা এমনই

গরম হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি পুনরায় এক জনসভায় ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষ সমর্থন করিতে পারে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব এবং যাঁহারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শান্তিপূর্ণ পন্থার কথা বলেন, তাঁহাদের মনের ভিতরের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার মতো সাহস নাই। কলিকাতার একাধিক জনসভায় অরবিন্দ গোখেলের ওই মন্তব্যের সমুচিত জবাব দিয়াছিলেন। গোখেলের পূর্বোক্ত মন্তব্য হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, বাঙালী নেতাদের চিন্তাধারা অন্য প্রদেশের নেতাদের চিন্তাধারাকে কত দূর পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলে।

সাত

গান্ধী-যুগে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী দেশের কুটির-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে চরকা প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পনর-ষোল বৎসর পূর্বে স্বদেশী যুগে বাঙালীর মস্তিষ্কে একই চিন্তা জাগিয়াছিল এবং উহাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। বিফলতার কারণ সম্পর্কে স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা নেতা স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার "আত্মচরিত" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া উদ্ধৃতি দিলাম না। তৎকালে বাঙলার ঘরে ঘরে চরকা প্রচলনের চেষ্টাও হইয়াছিল। সেই সঙ্গে বাঙলার অধিবাসিগণকে কাপাসের চাষ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। নির্বাসিত নেতা স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এই কার্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে জনসভা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমেও এই সম্পর্কে প্রচার-কার্য চলিয়াছিল। বঙ্গনারী যে চরকায় সুতা কাটাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে রহিয়াছে।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার বৎসর চারেক পূর্বে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিশ্রুত জননায়ক চিত্তরঞ্জন দাশ (গান্ধী-যুগে 'দেশবন্ধু' বলিয়া আখ্যাত) বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের ভবানীপুর-অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে পল্লী-উন্নয়ন, কুটির-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও চরকা প্রচলনের আবশ্যকতা সম্পর্কে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

..."তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে কি এখন এমন তুলা আজিও উৎপন্ন হয় না, চাষ করিলে কি সেটুকু ফলে না, যাহাতে আমাদের মোটা কাপড় লজ্জা-নিবারণের জন্য তৈয়ারি হইতে পারে? এখনও ত উপবীতের সুতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করি, সে সুতা কেন মোটা হয়, তেমনি সরুও ত হয়। যে ভাবে পূর্বে আমরা কাপড় ও সুতা তৈয়ারি করিতাম, চরকায় আবার কেন তেমনি ভাবে সুতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারির ব্যবস্থা করি না? আমাদের গৃহস্থের ঘরে পূর্বে যেমন সংসারের কাজ ও ক্ষেতের কাজ সারিয়া আপনাদের লজ্জা-নিবারণের পরিধেয় বসন নিজেরাই তৈয়ারি করিয়া লইতাম, তেমনি করিয়া আবার করিতে হইবে।"...

দূরদর্শী জননায়ক চিত্তরঞ্জন তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণে শিল্পবাদ বা Industrialism-এর প্রসার ও প্রভাব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। "Industrialism-এর ফলে ইউরোপের কি দুর্দশা—মানুষগুলা রক্তমাংসের মানুষগুলাকে পাথরের আর লোহার চাকা তৈয়ারি করিয়া ফেলিয়াছে।"—সেই কথা তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে—'Industrialism-এ যে ধনের বৃদ্ধি হয়, সে ধনীর ধনবৃদ্ধি, সাধারণ লোকের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি থাকে। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই ধনের অত্যাচার আরম্ভ হয়।" চিত্তরঞ্জন ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পাশ্চাত্ত্য শিল্পবাদ বা Industrialism-এর যেরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এদেশে অন্য কোন রাজনীতিক নেতা তৎপূর্বে ওইরূপ করিয়াছেন কিনা জানি না। "এই Industrialism-কে সর্বতোভাবে বর্জন করা নিতান্ত আবশ্যক"—বলিয়া তিনি সর্বাগ্রে আমাদের সজাগ করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ অবধি আমরা গান্ধীজীর মুখে অনুরূপ অভিমতই শুনিতে পাইয়াছি।

আট

রাজনীতি-ক্ষেত্রে জনসভা ডাকিয়া বক্তৃতা প্রদান ও প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনের রেওয়াজ দীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের (General Strike-এর) সাহায্যে প্রতিবাদকে জোরালো করার পরিকল্পনা বাঙালীর মস্তিষ্কেই প্রথম উদ্ভূত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদকরূপে আদালত অবমাননার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল

বেঞ্চ কর্তৃক দণ্ডাদেশ ঘোষিত হইলে ওই দিন কলিকাতা মহানগরীতে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ সমস্ত কাজকারবার বন্ধ করিয়াছিলেন। গান্ধী-যুগে ইহাই 'হরতাল' নামে সুবিদিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড উপলক্ষে সে যুগে অর্থাৎ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধী-যুগ আরম্ভ হইবার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাঙলা দেশই সর্বপ্রথম 'হরতাল' পালনের মধ্য দিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয় ব্যাপক ভাবে বাঙলা দেশের নানা স্থানে—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ-দিবসে। সেদিন রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মঘটও কার্যক্রমের অঙ্গীভূত ছিল। ইংরেজের দোকান এবং অনেক মাড়োয়ারী ও মুসলমানের দোকান ব্যতীত কলিকাতা মহানগরীতে ও উপকণ্ঠে সমুদয় দোকান, কাজ-কারবার, হাটবাজার, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ থাকে। সহরতলীর কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকগণ কাজ করে নাই। শত-শত কারখানার বংশীধ্বনি সেদিন ছিল স্তব্ধ হইয়া। অনুরূপ কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া মফঃস্বলেও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ-দিবস পালন করা হইয়াছিল।

নয়

আবেদন-নিবেদন নীতির অনুসরণে ভারতবাসীর পক্ষে রাজনীতিক অধিকার প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না বলিয়া ভারতীয় মনীষী ও চিন্তানায়কগণের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেন। এই নীতির নিষ্ফলতা সম্পর্কে তিনিই সকলের আগে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে খোলাখুলি এই নীতির নিন্দা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়া বিদেশী রাজার শাসন-কালে তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত মনীষীগণের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে মত প্রকাশ করা নিরাপদ ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রূপকের অন্তরালে থাকিয়াও তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই-রূপ ভিক্ষা-বৃত্তির উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। তাঁহার "কমলাকান্তের দপ্তর" এবং "লোকরহস্য" গ্রন্থের প্রবন্ধে এই নীতি সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। "পলিটিকস্" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে এইরূপ ভিক্ষুকের মনোবৃত্তিকে উচ্ছিষ্ট-লোলুপ কুক্কুরের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছেন যে, আমাদের লোকসেবকগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম আমাদের তৎকালীন রাজনীতিক আন্দোলনে অনুসৃত পন্থার শূন্যগর্ভতা ও অনাবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সারমেয়-অনুসৃত পন্থা পরিহার করিয়া কেশরী-অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। "He bade us leave the canine mathod of agitation for leonine"...

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রায় একুশ বৎসর পূর্বে ঊনবিংশ শতকের নবম দশকে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আবেদন-নিবেদনের প্রতিকূলে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গীতের একাংশ এইরূপঃ-

"মিছে—
কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির।"
... ...

স্বদেশী আন্দোলনের বারো বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩০০ সালে লিখিত "ইংরাজ ও ভারতবাসী" প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ "কেবল বক্তৃতা ও আবেদন" নীতিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার বর্ম বলিয়া জ্ঞান করার মনোভাবকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়াই জাতির উদ্দেশ্যে বলিয়াছেনঃ—

"আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কত দিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?"

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব বৎসর (১৩১১ সালে) রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" নামক প্রবন্ধে আবেদন-নিবেদন নীতি সম্পর্কে তাঁহার প্রতিকূল মনোভাব আরও পরিস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

..."গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, একথা আমি কোনো মতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে

কী, আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের কয়েক বৎসর পরে উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ দশকে অরবিন্দ বরোদা বাস-কালে বোম্বের "ইন্দু প্রকাশ" নামক ইংরেজী পত্রিকায় কংগ্রেসের আবেদন-নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

দশ

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছে বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা হইতে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার গোড়াপত্তন হইয়াছিল কলিকাতা মহানগরীতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশনের মধ্য দিয়া। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। স্বদেশবাসীর রাজনীতিক অধিকার লাভ এবং অভাব-অভিযোগের প্রতিকার ইত্যাদি কার্যের জন্য বৈধ উপায় আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বাঙলা দেশেই প্রথম অনুভূত হয়। ইহা হইতেই উৎপত্তি হইল ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্‌সের। ইহার অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনও কলিকাতায়ই হইয়াছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তৎপর আর কোন অধিবেশন হয় নাই। একই উদ্দেশ্যে গঠিত ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের সহিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্‌স্ সম্মিলিত হইয়া যায়।

এগারো

রাজনীতিক লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছিতে হইলে দেশবাসীর নগরমুখী দৃষ্টিকে গ্রামাভিমুখী করিতে হইবে, পল্লী-উন্নয়ন কার্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং মুমূর্ষু পল্লী-প্রাণকে গঠনমূলক কার্যের ভিতর দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে;—এই কথা বাঙালীর মনেই সকলের আগে স্থান পাইয়াছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার পরিকল্পিত "মহা-হিন্দু সমিতি"র কার্যক্রমে গ্রামকে প্রাধান্য দিয়া ছিলেন এবং মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের পল্লী-সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা ভাবিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বাবধি রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত পল্লীগ্রামের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। "আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী' —এই কথা তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন। স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় বৎসরে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের পাবনা-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে পল্লী-সংগঠনের প্রতি বিশেষ ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পল্লী-উন্নয়নের একটি সুচিন্তিত কার্যক্রমও প্রদান করেন।

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট দেশনায়কেরা তাঁহাদের ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়া স্বদেশবাসীকে পল্লী-উন্নয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অরবিন্দ ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জে বক্তৃতাদান কালে বলেন যে,—জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জাতির প্রাণ-কেন্দ্র পল্লীগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে; আমাদিগকে স্বরাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে গ্রামগুলেই ইহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে,—স্বরাজ লাভের জন্য একটি অবশ্যকরণীয় কার্য এই যে, সাধারণ-জন অর্থাৎ mass-এর রাজনীতিক সম্বিৎ জাগ্রত করিতে হইবে;...পল্লী-সমিতি সংগঠন না করিলে সাধারণ-জনের রাজনীতিক শিক্ষা-লাভ সম্ভব হইবে না।

যদিও পল্লী-উন্নয়নের কথা বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারায় স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু বাঙলা সেই বিষয়ে তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। গান্ধী-যুগে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র দেশ এই সম্পর্কে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

বারো

হিন্দী আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবার পূর্বে গান্ধীজী বিদেশী ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে কোন একটি ভারতীয় ভাষাকে সার্বজনীন অর্থাৎ Lingua Franca রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে হিন্দুস্থানী নামে একটি কালোপযোগী নূতন ভাষা সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ভারত-বিভাগের পর হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্র-ভাষা রূপে প্রবর্তনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় এবং তৎপরিবর্তে হিন্দী রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে বাঙলা দেশের তিনজন বরেণ্য দেশভক্ত মনীষী ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে কোন একটি ভারতীয় ভাষাকে সার্বজনীন ভাষারূপে প্রচলনের

আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা নানা দিক বিবেচনা করিয়া হিন্দী ভাষাকে সেই মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই মনীষীত্রয় হইলেন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের পরে হিন্দীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষারূপে প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিল অরবিন্দের অধিনায়কত্বে পরিচালিত যুগান্তর বিপ্লবী দল। ইহা হইল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা।

অরবিন্দ নিজেও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া "জাতীয় ঐক্যের অন্তরায় অপসারিত করার" কথা বলিয়া গিয়াছেন—ভারত স্বাধীন হইবার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। তাঁহার সম্পাদিত সাপ্তাহিক "ধর্ম" পত্রিকায় "দেশ ও জাতীয়তা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

..."ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব।"...

আমরা ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অভিনব ব্যবস্থার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া নিয়াছে। পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিয়াও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকা যে সম্ভব এবং তাহাতে যে ভারতবাসীর আপত্তি হইবে না,—এইরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দূরদর্শী দেশনায়ক অরবিন্দের রাজনীতিক রচনায় পাওয়া যায়। 'ধর্ম' পত্রিকায় "স্বাধীনতার অর্থ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছেনঃ—

..."আমাদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্গত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রকার মীমাংসা জাতীয় পক্ষ কখনও আবশ্যক মনে করে না। আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয়, আপত্তি কি? আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।"

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালী একদা জাতির সম্মুখে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, নব নব ভাব উদ্ভাবন ও প্রচার করিয়াছিল এবং জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিল। রাজনীতিক চিন্তায় বাঙালী ছিল সকলের অগ্রগামী। বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও বাঙালী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারা বাঙলাকে দিয়াছিল ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে নায়কের সম্মানিত আসন। আজ সে বাঙলা কই—আর সে বাঙালীই বা কোথায়?

★

রবি-কাব্য-সুধা

শ্রীঅবিনাশ সাহা

দানব লাঞ্ছিতা রিক্তা কে তুমি জননী,
জীর্ণ শীর্ণ ক্লান্ত দেহ রুধিরা ধরণী?
ফিরিতেছ দিকে দিকে ভিক্ষা পাত্র করে
সঞ্জীবন শান্তিসুধা অন্বেষণ তরে?
ওকি মাত! কেন তুমি অধীরা উতলা?
হেরিয়াছ শুধু বুঝি ক্রূর জন ছলা?
মুখে মধু অন্তরে গরল দুরাচার,—
উন্মত্ত হিংসা মাঝে অস্ত্রের ঝঙ্কার?
ভয় নেই এস হেথা অভয় চরণে,
পূর্ব্ব প্রান্তে ভারতের শান্তিনিকেতনে!
লভয়ে বিশ্রাম ক্ষণ আম্র-কুঞ্জ ছায়ে
পান কর রবি-কাব্য-সুধা মৃদুবায়ে।
পুন যাও ফিরে দিকে দিকে মহারাণী,
শোনাও বধিরে যত সুললিত বাণী।

ন ভূতো ন ভবিষ্যতি

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

পড়ন্ত জমিদারীর সংক্ষিপ্ত আয়ে এখনো সংসার কোন রকমে চলে যায় বটে, তা' হলেও একেবারে চুপ-চাপ শুয়ে-বসে কাটানো ভালো লাগে না সদানন্দর। এতকাল ধরে যথেচ্ছ খরচে অভ্যস্ত তার বাপ-মা ব্যয়-সংকোচ করতে যেয়ে পদে পদে যে কতরকমে নাজেহাল হচ্ছেন তাও তার চোখ এড়ায় নি। তাই এম, এ, পড়া বন্ধ রেখে অর্থোপায় সম্বন্ধেই সে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠল। বাড়ি থেকে মাসোহারা নিয়ে কলকাতায় আনন্দে দিন কাটানো সত্যই সে আর বরদাস্ত করতে পারছিল না।

কিন্তু উপার্জ্জনের পথ কোথায়? যে কোন একটা ভদ্র কাজের জন্যে সদানন্দ সেন পৈ-পৈ করে কি যে-সে ঘোরা ঘুরেছে এই কলকাতায়? গোটা দু'বছর কেটে গেল তার শুধু এই ঘুরে ঘুরে আর যতসব কর্ত্তাব্যক্তিদের ব্যর্থ তোষামুদি করে। কিছু হলো? কিছুই না। হবে কোত্থেকে, চাকুরি কি আছে পোড়া দেশে? তবু ভাগ্যি, এ-বেলা ও-বেলা দু' দু'টো ট্যুইশানি জুটে গেছে। তা' নইলে তো বাড়ি থেকে টাকা এনেই তাকে চল্‌তে হতো। ট্যুইশানি দু'টো সে-লজ্জা থেকে তাকে রেহাই দিয়েছে। সে-জন্তে ভগবানের কাছে কম কৃতজ্ঞ নয় সদানন্দ।

সকালে বিকেলে ছাত্র পড়ানো আর সারা দিনটা চাকুরি চাকুরি করে আফিসে আফিসে ছুটোছুটি। এ ভাবেই দিন চলেছে। ব্যর্থতার ব্যথা মনের গহ্বরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখলেও বাইরে থেকে সদানন্দর সে দুঃখের চিহ্ন মাত্রও কোনদিন কারুর চোখে পড়ে নি।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল টুপ্‌টাপ্‌। একবারে জোর বর্ষণ হয়ে গেলে কথা ছিল না। কিন্তু আকাশের যা চেহারা তাতে কবে যে এই টিপটিপ বৃষ্টি বন্ধ হবে তা' বলা শক্ত। এমনি দিনে মন-মেজাজ ভাল লাগার কথা নয়। বিকেল বেলার ট্যুইশানিতে তাই সদানন্দর যাবার ইচ্ছা ছিল না মোটেই। কিন্তু আগের দিন গিয়েছে রববারের ছুটি, সোমবার তাই না গেলেই বা চলে কি করে?

চল্লিশ লক্ষ লোকের কলকাতায়ও সে-সন্ধ্যায় লোকের ভিড় নেই। ছেলে পড়িয়ে সদানন্দ যখন বাড়িমুখো ফিরছে তখন রাত সাড়ে সাতটা। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট জন-মানবহীন। ফুটপাত ধরে সেণ্টপল্‌স্ কলেজ পার হয়ে আসতেই আকস্মিক নারীকণ্ঠে বিরতি ঘটালো তার পথ চলায়।

: শুনুন!

থমকে দাঁড়ায় সদানন্দ অপরিচিত গলার ডাক শুনে।

: বড্ড ভয় ভয় লাগছে। কী অন্ধকার! আপনি কোন্ দিকে যাবেন? আমায় একটু এগিয়ে দিন না।

: আমি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে যাব। আপনি?

: আমি করিস চার্চ লেনে।

: তা'হলে তো আমার সঙ্গেই আপনার অনেকটা যাওয়া হয়ে যাবে।

: হ্যাঁ, তা' হবে। কিন্তু করিস চার্চ লেনের মুখ থেকেই যে রাস্তাটা বেশী খারাপ। লোক চলাচল এমনিতেই খুব কম। তার ওপর আজকের এ অবস্থার তো কথাই নেই। আমাদের বাসা অনেকখানি ভেতরে কিনা, তাইতে আরো ভয়।

: না, না, ভয় কিসের? এটুকু যেতে যেতেই কারুর না কারুর দেখা পেয়ে যাবেন হয়ত।

: কারুর দেখা না পেলে আপনি দয়া করে আমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন কিন্তু।

: তা হবে'খন।—স্বীকার করে নিতে হয় সদানন্দকে। এ অবস্থায় কোন তরুণীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায়

কি করে ? তা' ছাড়া মনের আকাশে কেমন যেন একটা স্বপ্ন বিদ্যুৎও খেলে যায়।

দুর্যোগময়ী রাত্রির অন্ধকারকে ভেদ করে এগিয়ে চলেছে মহানগরীর ফুটপাথে একজোড়া তরুণ-তরুণী। তাদের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর বিষণ্ণ নীরবতাকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিচ্ছে।

: আপনি এমনি রাতে একা একা কোত্থেকে এলেন ? আর এলেনই যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে এলেই পারতেন।—সদানন্দর এ প্রশ্নে একটু সচকিতা হয়ে ওঠে তরুণী।

: কলেজ থেকে আর কাকে নিয়ে আসব বলুন। পরীক্ষা এসে গেছে। আমাদের হিষ্ট্রির প্রফেসর টিউটরিয়াল ক্লাস একটানা ঘণ্টা তিনেক চালিয়ে আজ এমনি দেরি করিয়ে দিলেন যে আর বলার নয়। অবশ্যি আমরাও ভেবেছিলাম, বৃষ্টিটা হয়ত এর মধ্যে থেমেও যেতে পারে। কিন্তু তারতো কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই এই দুর্ভোগ।

: তা' নয় হলো। কিন্তু টিউটরিয়াল ক্লাসে আপনি একাই তো আর পড়েন না। দু'একজন সহপাঠীর সাহায্য নিলেইতো আপনাকে আর এরকম অসহায় অবস্থায় পড়তে হতো না।

সদানন্দর এ সব বেয়াড়া প্রশ্নের জবাব জোগানো খুব সহজ না হলেও সদ্য পরিচিতা তরুণীটি কিন্তু বেশ বেপরোয়া ভাবেই উত্তর দিয়ে চলে।

: কার আর সাহায্য নেবো বলুন! মাত্র চারজন তো আমরা হিষ্ট্রি অনার্স দেবো। তার মধ্যে দু'জন ছাত্র আর দু'জন ছাত্রী। আমরাই টিউটরিয়াল ক্লাস করি প্রত্যেকদিন কলেজ শেষ হবার পর। আজ আবার বৃষ্টির দিন বলে আমার বন্ধু মাধবী কলেজেই আসেনি। আর এলেই বা আমার কি সুবিধে হতো তাতে! কলেজ থেকে তো এক-দৌড়ের রাস্তা ওর বাড়ি—এক মিনিটের পথ। আর ক্লাসের ছেলেদের কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্য চাওয়া, সে তো এক ভীষণ ব্যাপার। তা'হলে কি আর পরদিন কলেজে টেকা যাবে ? সমালোচনায়, টিটকিরিতে, প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত হয়ে মারা পড়তে হবে একেবারে। রক্ষা করুন ভগবান তা' থেকে!

মেয়েটির কথার ধরণ গভীর মন দিয়ে লক্ষ্য করে সদানন্দ, তার আত্মসম্মানবোধ প্রশংসনীয় বলেই মনে হয় তার। সত্যিই তো কোন কলেজছাত্রীর পক্ষেই কোন সহপাঠী ছাত্রবন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করা সহজ নয়। মনে মনে বেশ ভাল লাগে মেয়েটিকে।

ইতিমধ্যে তারা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট ডাকঘরের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যায় কথায় কথায়।

এই যে কোরিস চার্চ্চ লেন। আর মিনিট চার পাঁচের পথ। দয়া করে আমায় আর একটু যদি এগিয়ে দেন!—অত্যন্ত সবিনয় অনুনয়ের সুরে বলে মেয়েটি।

হঠাৎ তরুণীর হাত থেকে একখানা বাঁধান খাতা ফুটপাথের ওপর পড়ে যেতেই সদানন্দ তাড়াতাড়ি তা' মেয়েটিকে তুলে দিয়ে বলে, চলুন!

: অশেষ ধন্যবাদ!—কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবার মেয়েটি আগে আগে চলতে সুরু করে।

মিনিট দুই কোন কথাবার্ত্তা নেই।

: আর কতদূর ? প্রশ্ন করে সদানন্দ।

: এই যে!—এই বলেই তরুণী বাঁদিকে বাঁক ফিরে ঢুকে পড়ে এক সরু গলির মধ্যে।

হঠাৎ কেন জানি হকচকিয়ে ওঠে সদানন্দের মনটা। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ঘোর অন্ধকার সরু গলির ভেতর পা দু'টো যেন কিছুতেই এগুতে চায় না। অথচ কেমন একটা লজ্জায়ও যেন সে আহত বোধ করে মনে মনে। মেয়েটির সঙ্গও বেশ মিষ্টিই লাগছিল এতক্ষণ ধরে। হঠাৎ এমন একটা সন্দেহের দোলা লাগে কেন ?

: এবার যাই তা' হলে।—ভয়ে ভয়ে কোন রকমে বিদায় নিয়ে রেহাই পেতে চায় সদানন্দ।

: এই এসে পড়েছি। ঐ যে আমাদের ঘর দেখা যাচ্ছে। আর দু'চার পা এগিয়ে দিলেই আমি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারব। আপনি দয়া করে একবার যাবেন না আমাদের বাড়ি?—সদানন্দকে সকৃতজ্ঞ আমন্ত্রণ জানাতে ভুল হয় না মেয়েটির।

: না, আজ আর নয়। আজ ক্ষমা করুন, পরে দেখা

যাবে'খন।—কলেজী মেয়ের আমন্ত্রণ, একেবারে সরাসরি উপেক্ষা করতে সংকোচ বোধ করে সদানন্দ। তাই আর একটু এগিয়ে যেতে যেতে হাতে রেখেই কথাটার জবাব দেয় সে।

: ডাকাত, ডাকাত! আমার সব নিয়ে গেল, সব নিয়ে গেল!—হঠাৎ এই বলে একটা আর্ত চিৎকার তুলে মেয়েটি ছুটে যেয়ে দাঁড়ায় সামনের বাড়ির বারান্দায় আর মুহূর্ত্তের মধ্যে জনকয়েক লোক ডাণ্ডা, লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়ে এসে ধরে ফেলে সদানন্দকে।

সদানন্দ হতভম্ব!

মারধর—কীল-চড়-ঘুষিতে জর্জ্জরিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় সদানন্দ। অজ্ঞান হয়ে যায় সে। কতক্ষণ যে সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে সে অবস্থায় পথের ওপর পড়ে থাকতে হয়েছিল কিছুই তার খেয়াল নেই। এক বৃদ্ধ পথিক দয়াপরবশ হয়ে তাকে ডাকতেই সে ক্ষীণ কণ্ঠে একটু সাড়া দিল বটে, কিন্তু ব্যথাজর্জ্জর দেহটাকে সে চেষ্টা করেও তুলতে পারল না। বৃদ্ধ তাকে সন্দেহ করলেন মাতাল বলে। কিন্তু টর্চ্চ ফেলে দেখলেন রক্তাক্ত তার দেহ, ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত তার জামা-কাপড় বৃদ্ধ তাকে টেনে তুলে সাহায্য করলেন দাঁড়াতে।

: কী হয়েছে আপনার?—জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধ পথিক।

: কী যে হলো কিছুই যে আমি বলতে পারি না।—সদানন্দর মুখ থেকে আর কোন কথাই বেরোয় না। সে খোঁজ করে দেখে তার ঘড়ি, চশমা, বোতাম কিছুই নেই —টিউশানির সদ্য পাওয়া মাইনে চল্লিশটা টাকাও উধাও।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত সদানন্দকে ধরে ধরে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এনে যখন একখানা রিক্সায় তুলে দিয়ে টর্চ্চের আলোয় ঘড়ি দেখলেন, তখন রাত ন'টা বেজে পঞ্চান্ন।

★

শান্তি

মৃণালকান্তি দাশ

জীবন সুরুর থেকে তোমাকে খুঁজেছি দেশ দেশ
বনে বনান্তরে কভু, নদ নদী সাগর-সৈকতে,
নিয়ন প্রদীপ লয়ে অন্ধকার গুহা ও গহ্বরে
তোমাকে খুঁজেছি প্রিয়া মাটি থেকে নীলিমার নীলে।

খুঁজেছি তোমাকে আমি অথৈ সমুদ্র তলদেশে
পাখীদের মত কত বনানীর শ্যাম বীথিকায়
কত না দেউল দ্বারে, শোকদগ্ধ শ্মশান শিয়রে
বালুচরে ঘর বেঁধে কাম মোহ করিয়া সম্ভোগ।

তোমারে খুঁজেছি আমি মনের নিভৃত নিরজনে—
ফুল ফোটা ধান ক্ষেতে দিনমান অলিদের মত,
চাষিদের মাঠে বাটে তীক্ষ্ণ সে লাঙল-ফলায়
নাও বেয়ে উজানীয়া চরে চরে মাঝিদের মত।
তোমাকে খুঁজেছি আমি পল্লীর ঘরে বাঁধা কুটিরে কুটিরে
লাজে নত বধূদের সরম আঁচলে,
কুমারীর বেণুনীর আকাবাঁকা পথে…
চপল সজল চোখে মিঠেল অধরে।

খুঁজে খুঁজে হারিয়েছি আজি মোর খেই—
যত কিছু প্রেম প্রীতি সুখ ও সোহাগ
সবই যেন নিয়ে গেছ কেড়ে তুমি প্রিয়া,
নিরাশার নদী তীরে ভাঙ্গা মন নুয়ে
একাকী রহিনু বসে মরা-স্রোত নয়!

কিকুয়্ জাতির সমাজ-জীবন ও বেশভূষা

উমারঞ্জন চক্রবর্তী

বিচিত্র দেশ আফ্রিকা। আজো 'অন্ধকারের দেশ' বলে খ্যাত এই বিচিত্র ভূমিতে কতো যে বিচিত্রতর মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা রয়েছে তার সীমা নেই। সভ্য মানুষের অভিযানের ফলে ক্রমে এদেশের নৃতত্ব, সমাজতত্ব ও প্রাণিতত্বের অনেক চমৎকার বিবরণ আমরা পাচ্ছি। আফ্রিকানদের আরণ্যজীবন ও আনুষঙ্গিক প্রকৃতিগুলো, অসুখবিসুখে চিকিৎসা তুকতাক, ভূতপ্রেতের পুজো আর্চা, এখনো সভ্যমানুষের যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহল উদ্রেক করে আসছে। এই ছোট্ট প্রবন্ধে আফ্রিকানদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়, তাই এখানে শুধুমাত্র কিকুয়্ জাতি সম্পর্কে খানিকটা তথ্য পরিবেশন করতে প্রয়াস করছি। কিকুয়্ জাতি আজ আমাদের অপরিচিত নয়, এদের রাজনৈতিক চেতনা, শ্বেতাঙ্গ জাতির শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম আজকাল সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ পাচ্ছে। কোন রাজনৈতিক আলোচনা করার জন্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়, এই কিকুয়্ জাতির সমাজজীবন, তাদের বেশভূষা আচারব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা বলবো।

আফ্রিকার একটি ছোট্ট এলাকা হচ্ছে এই কিকুয়্দের দেশ। বৃটিশ-আফ্রিকা প্রোটেকটোরেটের অন্তর্ভুক্ত এই দেশের সীমা উত্তরে নিরক্ষরেখা, দক্ষিণে আথি সমভূমি। পূর্ব্বদিকে এর সীমানা মাউন্ট কেনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এর পশ্চিম প্রান্ত বিখ্যাত 'রিফটভ্যালীর' 'এবারডেয়ার' পর্ব্বতের পাদদেশ। এক সময়ে এই অঞ্চল ছিলো দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আকীর্ণ। ক্রমে কিকুয়ুরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সেই অঞ্চল প্রায় নিশ্চিহ্ন করে এনেছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ জাতি এর মধ্যে পেয়েছে শোষণের সন্ধান। উকাম্বা প্রদেশের রাজধানী নাইরোবি তাদের শোষণ-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। এখানকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশে সরকারী দপ্তরখানা, হোটেল দোকানপাট বাজার ব্যাঙ্ক, ট্রেজারী ডাকঘর, রোমান ক্যাথলিক চার্চ আর ইস্কুল দেখলে সাম্রাজ্যবাদী জাতির সুসভ্য শোষণযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পরিচয় পাওয়া যায় না এদেশের অধিবাসীদের, যাদের শোষণ করে সভ্য ইংরাজ নাইরোবিকে অন্যতম বিলাসনগরীতে রূপান্তরিত করেছে সেই সব কিকুয়্, মাসাই, মাউ মাউ কবিরান্দো বা ন্যান্দী জাতীয় আফ্রিকানদের। আলো ঝলমল, যান্ত্রিক যানবাহনে মুখর রাজধানী থেকে দূরে গেলে সন্ধান পাওয়া যায় জঙ্গলে জঙ্গলে এদের।

কিকুয়্ এলাকায় আজো যে জঙ্গল আছে তা নয়, তারই মাঝে মাঝে অধিকাংশ এলাকাতেই ওরা বসতি স্থাপন করে সেই জঙ্গল ধ্বংস করে আনছে। এখানে যেমন গরম তেমনি শীত। তেমনি আবার বর্ষাও অসহনীয়। বর্ষাকালে এখানে হরদম শিলাবৃষ্টি হয়। এই শিলাবৃষ্টির প্রচণ্ডতা চোখে না দেখলে কল্পনা করা অসাধ্য।

সংগ্রামে শিকারে এই কিকুয়ুরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। কিন্তু এমনিতে জাতি হিসাবে এরা অতি নিরীহ চাষী। ভুট্টা যব আখ, মিষ্টি আলু, কলা, তামাক, বীন আর রেড়ি তৈলের গাছের চাষ করে থাকে এরা। ঘর গেরস্থালীর কাজের মত এই চাষাবাদের কাজ হলো মেয়েদের। কিকুয়ুরা পশুপালনও করে থাকে। এদের পালিত পশুর মধ্যে ছাগল ভেড়াই প্রধান। বয়স্ক পুরুষ ও ছোট ছোট ছেলেদের কাজ হলো মাঠে মাঠে বনে জঙ্গলে ছাগল ভেড়ার পাল চরিয়ে বেড়ানো।

কিকুয়ুদের মধ্যে বন্য পশুর তাজা রক্ত পান করা আজো চলতি আছে। সামাজিক উৎসবে বা পুজো-পার্ব্বণের দিনে এরা অস্ত্র দিয়ে পশুর ঘাড়ের শিরা কেটে রক্ত চুষে খায়। এদের মধ্যে মদ খাওয়ার নেশাও বিশেষ চলতি। আখের রস আর মধু গাঁজিয়ে ওরা একরকম

মদ তৈরী করে। এরা মধুর একান্ত ভক্ত। যে কোন কিকুয়ু পল্লীতে গেলে দেখা যায় এরা গাছে গাছে এক

একটি সৌখিন কিকুয়ু যুবক। তার কানের মগজাতীয় কাঠের পাত্রটি দর্শনীয়।

রকম কাঠের মোটা মোটা চোঙা ঝুলিয়ে রেখেছে। মৌমাছিরা পাখীর উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই কাঠের চোঙার মধ্যে মৌচাক তৈরী করে। সময় মতো কিকুয়ুরা সেই চোঙা নামিয়ে মধু বের করে নেয়। আমাদের দেশে যেমন ধুঁয়ো দিয়ে চাক থেকে মৌমাছি তাড়ানো হয়, চাক ভাঙার বেলাও কিকুয়ুরাও অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে।

এই কাঠের চোঙার অঙ্গসজ্জায় কিকুয়ুদের চিত্ররুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এক এক অঞ্চলের এক এক রকম চোঙার কারিকুরির মধ্যে এদের গোষ্ঠীগত পার্থক্যও নজরে পড়ে। কেউ কেউ চোঙার গায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নানা রকম নক্সা খোদাই করে, আবার কেউ কেউ বা চোঙার গায়ে মাটি দিয়ে নানা রঙ বেরঙের ছাপ তৈরী করে।

কিকুয়ুদের বাড়ীতে এক একটি ঘরে একটি করে কুঠুরী। পরিবারে লোকসংখ্যার অনুসারে এরা ঘর ছোট বড়ো করে কিন্তু কুঠুরী একটাই থাকে। আমাদের দেশের খড় জাতীয় একপ্রকার বস্তু দিয়ে ওদের ঘরের ছানি দেওয়া হয়। এদের দেশে আমাদের হোগলার মতো এক ধরণের জলজ ঘাস আছে। সেগুলো দিয়েও ওরা ঘরের ছানি দেয়। তবে সাধারনতঃ ঐ হোগলার মতো ঘাসের আঁটি বেঁধে ওরা নৌকো তৈরী করে বলে ছাউনির কাজে এগুলো বেশী ব্যবহার করে না। নানা রকম খড়কুটো দিয়ে ওরা প্রথমে ঘরের দেয়ালের কাঠামো তৈরী করে নেয়, পরে তা মাটি দিয়ে লেপে দেয়। ঘরে ওরা কোন জানলা রাখে না, দরজা তৈরী এদের মধ্যে আজো চলতি হয়নি। তবে একদিক দিয়ে খানিকটা জায়গা খোলা থাকে যাতায়াতের জন্যে। রাতে বুনো শক্ত লতা দিয়ে তৈরী একটা ঝাঁপ ওরা সেই প্রবেশপথের মুখে রেখে ভেতর থেকে শক্ত কাঠ দিয়ে আটকে দেয়।

কিকুয়ুদের হাটবাজার করার রীতি হচ্ছে হপ্তায় এক দিন। ঐদিন কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে নানা রকম গয়না, অস্ত্র শস্ত্র খরিদ বিক্রী হয়। বাজারে জ্বালানী কাঠ ও খাদ্যশস্যও পাওয়া যায়। নুন, কলার গাছের ছিবড়ের দড়ি, কলা, পাখীর পালক, ছাল, মেটে বাসন, জালা পশুর চামড়া, তামাক—এই সব আমদানি হয়। বাজারে খরিদ বিক্রী মেয়েরাই করে। হাটবারে নানা এলাকা থেকে হরেক রকম মরিচ আমদানী হয়। সেখানে পুরুষদের ভিড়, তাদের

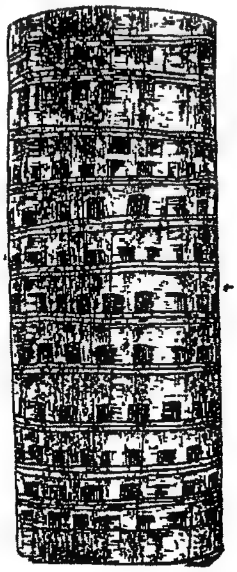

ছুরির সাহায্যে নক্সাকাটা কাঠের চোঙা। কিকুয়ুরা এইগুলো গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখে যেন মৌমাছিরা এরমধ্যে চাক বাঁধবে বলে।

মাতলামো, ঠাট্টা ইয়ার্কি একটি দর্শনীয় ব্যাপার। আগে এদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিলো, হালে ওরা মুদ্রা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কিকুয়ু পরিবারের মেয়েরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। ছেলেরা আর বয়স্ক পুরুষরা শুধু ছাগল ভেড়া চরায় আর খোলা জায়গায় পড়ে পড়ে ঘুমায়। মেয়েরা জমি চাষ করে, কম্বল বুনে, জমির তদারক করে, বন থেকে আঁটি আঁটি জ্বালানীকাঠ চামড়া দিয়ে মাথার সঙ্গে বেঁধে ঘরে নিয়ে আসে। এরা চামড়া বা মেটে জালায় জল ধরে রাখে। অল্পবয়সী বা যুবতী মেয়েরা ঘরে থেকে শস্য ঝাড়াই বাছাই করে, রান্নাবান্নার কাজ করে। দিনের বেলায় যখন হাতে অন্য কোন কাজ থাকে না তখন ওরা সেলাই নিয়ে বসে। এরা চামড়া জোড়া দিয়ে পোষাক বানায়, কাপড়ে নানারকম নক্সা তোলে।

কিকুয়ু ছেলেদের উলঙ্গ থাকতে বাধা নেই, কিন্তু ছোট্ট মেয়েকেও পোষাক একটা কিছু পরতেই হবে। এ ব্যাপারে ওদের সামাজিক অনুশাসন ভারী কড়া। বিবাহিত মেয়েরা লোহার কানপাশা আর্মলেট ইত্যাদি পরে থাকে। কিন্তু বিবাহযোগ্যা কুমারী মেয়েদের কপালে সব সময়েই একটা পুঁতির মালা পরে থাকতে হয়।

কিকুয়ু পুরুষ ও মেয়েরা বিচিত্র সব সাজসজ্জা করে থাকে। ছেলেদের ত্বকচ্ছেদের রীতি ওদের মধ্যে চলতি। ত্বকচ্ছেদের বয়স হলে তখন একসঙ্গে ছেলেদের ত্বকচ্ছেদ ও কানের কয়েক জায়গায় ছিদ্র করে দেওয়া হয়। সেই ছিদ্রে ওরা রুচি অনুযায়ী কাঠ ও পাথরের টুকরো পড়ে। মেয়েরা ঠোঁট কেটে বা কান কেটে মোটা কাঠের টুকরো বা পাথর পরে। আফ্রিকান অধিকাংশ জাতির মধ্যেই যে মেয়ের ঠোঁট যতো বেশী খোদাই সে ততো সুন্দরী। ওরা কানে কাঠ বা পাথরের টুকরো ছাড়া পরে হরেক নমুনার তারের আংটি। এই আংটি পরার একটা বিপদ আছে। কিকুয়ু মেয়েদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলে ওরা পরস্পরের কানের আংটি ধরে এমন টানাটানি করে যে, অনেক সময় কান ছিঁড়ে রক্তপাত হয়ে থাকে।

কিকুয়ুরা লোহার ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ। লোহা থেকে এরা বর্শা, বল্লম, ছুরি এসব তো তৈরী করেই, এদের অলংকারের অধিকাংশই লোহা থেকে তৈরী। আজকাল কিছু কিছু তামার তারের প্রচলন হয়েছে ওদের মধ্যে। লোহা ছাড়াও মেটে বাসন কোশন, খেলনা ইত্যাদি তৈরীর কাজও এরা করে থাকে। এই কাজ হলো ঘরের মেয়েদের। মেটে জিনিষপত্র তৈরীর জন্যে ওদের কোন যন্ত্রপাতি বা ছাঁচের দরকার হয় না, হাতের কেরামতেই ওরা এসব তৈরী করে।

কিকুয়ু পরিবারে ছাগল ভেড়া মূল্যবান সম্পদ। তার মধ্যে আবার ছাগলের মর্য্যাদা বেশী। বিয়ের সময় বরপক্ষ কনেপক্ষকে কয়টি ছাগল দিতে সক্ষম তাই দিয়ে বরের যোগ্যতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। তাই ওরা নিজ নিজ পরিবারের ছাগলগুলোকে দিনরাত চোখে চোখে রাখে। রাতে ঘরে নেবার বেলায় আর দিনে চরাতে নিয়ে যাবার আগে সেগুলো রোজ ভালো করে গুণে নেওয়া হয়।

আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে কিকুয়ুরা সার্জ্জারীতে দক্ষ। ছাগল ভেড়া নিয়ে এদের সঙ্গে অন্যের হামেশাই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকে। এই সব অস্ত্রক্ষত বা অন্য কোন কারণে ক্ষত সেলাই করবার বেলায় ওরা একধরণের মোটা গাছের কাঁটা বা লোহার শলা ব্যবহার করে। প্রথমে কাঁটা দিয়ে চামড়া ছিদ্র করে পরে তার মধ্য দিয়ে গাছের ছিবড়ের সরু দড়ি বা জীবজন্তুর শিরা ঢুকিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ কেশবিন্যাসের ব্যাপারে পৃথিবীর সব দেশে মেয়েরাই অগ্রণী, কিন্তু আফ্রিকানদের বেলায় তা সম্পূর্ণ উল্টো। এদের মেয়েরা কেশবিন্যাসের ধার ধারে না; ছেলেরাই সারাদিন নানান ভঙ্গীতে কেশের পারিপাট্য বিধানে মেতে থাকে। চুল ঢেউ খেলানো করার দিকে এদের স্বাভাবিক প্রবণতা। ভেড়ার চর্বি দিয়ে চুল আচ্ছা করে ভিজিয়ে নিয়ে এরা আঙুল দিয়ে টিপে টিপে কোঁকড়া করতে চেষ্টা করে। মাথার পাকা চুল এরা বরদাস্ত করতে পারেনা। মাথায় পাকা চুল দেখলে কিকুয়ুরা সব কাজ ফেলে রেখে ওগুলো ওপড়ে ফেলবে। যাদের বেশী চুল পেকে যায় তারা মাথায় গেরিমাটি লেপে আবার যুবক সাজবার চেষ্টা করে। চুলে চর্ব্বি মাখানো সম্পর্কে

ওরা বলে থাকে যে, বৃষ্টি বাদলার মধ্যে যাদের মাথায় দেবার কিছু থাকেনা তাদের জন্যেই নাকি এই ব্যবস্থা

একটী কিকুয়ু যুবতী। সে নেড়া মাথায় পরেছে পুতির মালা, কানে পরেছে অগুণতি তারের আংটি।

চলতি হয়েছিলো। বেশী বৃষ্টির মধ্যে পাছে চর্ব্বি ধুয়ে গিয়ে চুলের কৃত্রিম ঢেউ খেলানো রূপটা নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে অনেক সৌখীন কিকুয়ু চুলের ওপর ছাগলের ভুড়ির চামড়া দিয়ে তৈরী এক প্রকার টুপি পরে থাকে। যখন টুপির প্রয়োজন থাকে না তখন তারা সেটা ভাঁজ করে কোমরে জড়িয়ে রাখে। মেয়েরা কেশ প্রসাধনের বালাই থেকে মুক্ত। তারা মাথা নেড়া করে ফেলে ভুরুর চুল চেঁছে ফেলে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর কিকুয়ুদের প্রাচীন বেশভূষায় আচার ব্যবহারে ভাঙন ধরেছে। আধুনিক কিকুয়ুদের মধ্যে অনেকে প্যাণ্টকোট পরে, টুপি মাথায় দেয়। বর্শা বল্লম ছাড়া আজকাল অনেক কিকুয়ু বন্দুক চালনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। রেল লাইনে কুলীর কাজ ছাড়াও এখন ওদের মধ্যে অনেকে মোটা বেতনে চাকুরী-বাকুরীও করছে। তাদের ছেলে মেয়েরা মিশনারী স্কুলে পড়াশোনাও করে। অনেকে খৃষ্টধর্ম্মও গ্রহণ করেছে। চাঁদনী রাতে মাদলের মত্তো এক ধরণের বাজনা বাজিয়ে সস্তা সাহেবী পোষাক পরে যখন এই কৃষ্ণাঙ্গ কিকুয়ুর দল মাঝে মাঝে নাচ গানের অনুষ্ঠান করে তখন দেখলে হয়তো মনে হবে এদের পুরনো জীবন শেষ হয়ে নতুন জীবন সুরু হতে আর হয়তো বেশী দেরী নেই। কিন্তু তা সত্যি নয়। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত করেও আফ্রিকার আরণ্যক সভ্যতার অন্যতম উত্তরাধিকারীরা আরও দীর্ঘদিন টিকে থাকবে।

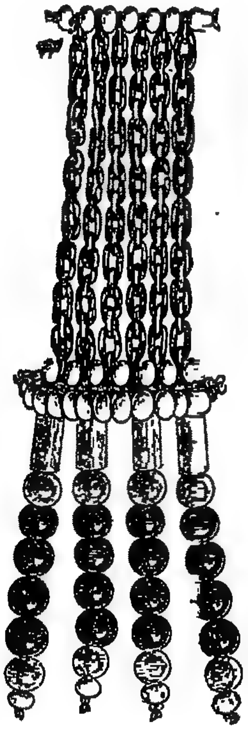

কিকুয়ুদের একটি বিশিষ্ট কর্ণাভরণ। এর প্রথম সারির মালাগুলো সাদা, দ্বিতীয় সারি ধূসর রঙের। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারির মালাগুলো চকচকে নীল আবার সপ্তম সারিরগুলো ধূসর। চেনগুলো লোহার, ওগুলো কিকুয়ু কারিগরদের তৈরী।

সত্যিকারের ভূতের গল্প

অধ্যাপক চেরো ঃ অনুবাদ—ব্রজেন রায়

[অধ্যাপক চেরোর সঠিক পরিচয় এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। কোথায় তাঁর বাড়িঘর ? পূর্ব্ব পরিচয় তাঁর কি ? এসব খবর অধ্যাপকের নিজের কাছে থেকেও কখনও পাওয়া যায় নি। পাশ্চাত্য দেশের একজন খুব বড়দরের জ্যোতিষ এবং ভবিষ্যৎ বক্তা এই অধ্যাপক চেরো—পৃথিবীর সর্ব্বত্র 'হাত দেখার চেরো' নামেই ইনি সুবিখ্যাত।

অনেকে মনে করেন, অধ্যাপক চেরো (Chiero বা কিরো) এই নামটিও আসলে ছদ্মনাম। যাই হোক চেরোর জীবন অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি যে পরিচয় রেখে গেছেন. তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক।

হাত দেখিয়ে আগের থেকে ভবিষ্যৎ জানবার একটা দুর্ব্বলতা অল্পবিস্তর অনেকেরই আছে। পেশাদার হস্তরেখাবিদ ছাড়াও আমাদের দেশে একদল সৌখিন হস্তরেখাবিদ্ আছেন যাঁরা হস্তরেখা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন চেরোর বই পড়ে। তাই চেরোর আদর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বক্ষেত্রে। সহজ সরল ভাবে হাত দেখা সম্বন্ধে এ ধরণের বই ইতিপূর্ব্বে আর কেউ লিখেছেন বলে জানা যায় নি।

কিন্তু এই চেরো কে ? কি তাঁর পরিচয় ? ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী না মার্কিন ?

চেরো বলেছেন, তিনি হাতদেখা সম্বন্ধে বিদ্যালাভ করেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথি পড়ে পড়ে। প্রথম ব্যবসা সুরু করেছেন লণ্ডনে আর খ্যাতিলাভ করেছেন আমেরিকায়।

চেরোর অদ্ভুত হাত দেখে সব কিছু বলে দেবার শক্তিতে বিস্মিত হয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকা। নাম ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে। এত বড় হস্তরেখাবিদ্ হয়েও চেরোর জীবন বিশেষ সুখে কাটে নি। ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি ভারতবর্ষ, ইউরোপ আর আমেরিকায়। কিন্তু কোনখানেই তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। জীবিত কালে সম্মান তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্মানের প্রকৃত মর্য্যাদা তখনও নির্নীত করা হয় নি। ১৯৩৬ সালে সত্তর বৎসর বয়সে হলিউডে তাঁর মৃত্যু হয়।

'সত্যিকারের ভূতের গল্পে' তিনি তাঁর কর্ম্মজীবনের বহুবিস্তৃত রহস্যময় অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেছেন। গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা পুষ্ট, কতকগুলি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সংগৃহীত। গল্পগুলি সত্যি—কারণ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যেগুলি নয়, সেগুলিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই সমতুল্য।

Chiero এই নামটি গ্রীক শব্দ Chser (হাত) থেকে সংগৃহীত। সুতরাং নামটি তাঁর ছদ্ম নাম এ বিষয়ে বেশ কিছুটা ধারণা পোষণ করা যেতে পারে বলেই মনে হয়।—অনুবাদক]

সবে মাত্র রাতের খাবার খেয়ে উঠেছি, ফাদার জ্যাকসন এলেন গল্পগুজব করার জন্যে। ফাদার বিদেশী লোক। সাগর পারের ফরাসী দেশের মানুষ তিনি। যেমন অমায়িক, তেমনি সদাশয় এবং আমাদের সকলেরই প্রিয়পাত্র। স্থানীয় গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক তিনি। সেই কারণে তাঁকে চেনে সবাই, ভালবাসেও সকলে। এই সদাহাস্যময় মানুষটি কর্ম্মে সেবায় উপদেশে এবং মধুর সঙ্গ-দানে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন খুব অল্পদিনের মধ্যেই। ফাদার নামেই তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

তিনি যখন এদেশে এসেছিলেন তখন আমাদের এই স্থানীয় গীর্জ্জাটি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ—ভাঙা-চোরা জীর্ণ

প্রাসাদের মতই কঙ্কালসার। অবহেলা আর অমনোযোগের ফলে আমরা পতনের সম্মুখীন। ফাদার এলেন, নিজের কর্ম্মক্ষমতা অধ্যবসায় এবং সাধনা দিয়ে আবার সংস্কার সাধন করলেন গীর্জ্জাটির। অবহেলার স্থানটিকে আবার পরিপূর্ণ করে তুললেন ধর্ম্মকথা এবং জ্ঞানের আলোচনায়। তাঁর মুগ্ধ স্বভাব এবং প্রীতিমুগ্ধ হৃদয়ের কণামাত্র লাভের আশায় দূর দূরান্ত থেকে লোকজনের আনাগোনা সুরু হল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও তাঁর সমান উৎসাহ। গল্পগুজব এবং অনেক সময় জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছি আমরা।

আজ এলেন। ধর্ম্ম সম্পর্কিত অথবা ঐ ধরণের কিছু না বলে আজ তিনি ভূতের গল্প ফেঁদে বসলেন। গল্পটি সত্যি।

ভূতের গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু এ ধরণের ভূতের গল্প আমি ইতিপূর্ব্বে কোনদিন শুনিনি। যেমনি অভূতপূর্ব্ব, তেমনি রোমাঞ্চকর।

কথাবার্ত্তায় ভূতের প্রসঙ্গ উঠতেই সম্প্রতি আমার বাড়িতে যে সব অবিশ্বাস্য আশ্চর্য্যকর ঘটনা ঘটে গেছে, এবং বুদ্ধিতে যার কোন সময়েই ব্যাখ্যা করা যায় না, সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে গেলাম।

হঠাৎ আমার বিস্ময়ের অবকাশে তিনি সাধারণতঃ যে সব যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে বিরোধিতা করতেন, সেরকম কিছু না করেই তিনি বললেন, "আমি একথা মানতে বাধ্য যে প্রেতাত্মারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারে, অনেক সময়ে ভাল কাজের জন্যই। এ সময়ে পুনরায় পৃথিবী পরিদর্শনের অধিকার তারা লাভ করে থাকে—এবং এ সম্বন্ধে আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছিল সেই কথাই বলছি।"

ফাদার একটু রহস্যময়ভাবে ঘরের সব দিকটা দেখে নেন একবার। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে সুরু করেন, "এক সময়ে একটি খুব ছোট গীর্জ্জার সহকারী ধর্ম্মযাজক ছিলাম, গ্লাসগোতে। তরুণ বয়সে সে জায়গাটিকে আমার মোটেই ভালো লাগতো না। অন্য একটি যাজকের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ধর্ম্মযাজকটি আমার চেয়েও বয়সে অনেক বড়—প্রায় আমার বয়সের দ্বিগুণ হবেন হয়তো।

অধ্যাপক চোরো

একদিন রাত্রে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরী হয়। ভিজে জুতো খুলে আগুনের পাশে এসে বসেছি, আমার সঙ্গী ধর্ম্মযাজকটি এক বাটি গরম ঝোল নিয়ে এসে হাজির করলেন—ঝোলটি তিনি আমার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই গরম করছিলেন। শারীরিক এবং মানসিক উভয়তঃই আমি বিশেষ ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। সহরে বেশ কিছুদিন থেকে মহামারী দেখা দিয়েছে। আবহাওয়াটা শীতের তীব্র ঠাণ্ডার মত। লোক মরছে অকাতরে, বিনা চিকিৎসায়। ধর্ম্মযাজকের কাজ যা সেই সেবা করতে করতে আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্লান্তি দূর করার জন্যে ইজি চেয়ারে শরীর বিছিয়ে দিলাম অগ্নিকুণ্ডের সামনে। বাইরে শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের করুণ আর্ত্তনাদ। ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার

অল্প অল্প বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। আজ রাত্রে আর কোন রোগী দেখে বেড়াতে হবে না ভেবে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গীটি সেদিনের খবরের কাগজখানা আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। আমি জোরে জোরে কাগজ পড়তে লাগলাম। হঠাৎ দরজাধাক্কার শব্দে চুপ করে গেলাম। আমার সঙ্গীটিও তাকালেন দরজার দিকে। দু'একটি মুহূর্ত্ত। সব চুপচাপ। আমি আবার জোরে জোরে কাগজ পড়ায় মন দিলাম। আবার শব্দ। কতকটা যেন রহস্যময় একগুঁয়েমী ভাবের। কাগজ ফেলে দিয়ে আমি উঠে পড়ি। দরজা খুলে দেখি, কেউ নেই সেখানে, সব শূন্য, একরাশ অন্ধকার। আমি একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করি—কিন্তু কারও দেখা নেই। দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে আসি আগুনের কাছে।

—"ও শুধু হাওয়া। এতো রাত্রে কে ডাকতে আসবে আবার? অবশ্য লোকতো অনেক মারা যাচ্ছে এ সময়—হয়তো আসতেও পারে কেউ।" —সঙ্গীটি বলেন।

আমি চুপ করে থাকি। কিছুক্ষণ সব চুপ, কোন কিছুরই শব্দ নেই। আমি ত কাগজ পড়ায় জোর করে মনোনিবেশ করি আবার। আবার শব্দ—আমরা নিশ্চুপ ভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকি। আবার শব্দ—এ সময়টা খুব জোরে বলেই মনে হল। আমি এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলি। রাস্তার গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে লক্ষ্য পড়ে একটি মানুষের মূর্ত্তি—আমারই জন্যে যেন সে অপেক্ষা করছে। এখনও পর্য্যন্ত সে মুখ স্পষ্ট মনে পড়ে আমার। রুক্ষ-রুক্ষ চোখ মুখের ভাব। গলায় রুমাল বাঁধা। স্পষ্ট আইরিশ বলে মনে হয়। মুখে চোখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক। চোখে এক তীব্র সন্ধানীর দৃষ্টি।

কোন কথা বলে না মূর্ত্তিটি, শুধু ইঙ্গিতে জানায় তার অনুসরণ করতে।

সম্মতি জানিয়ে আমি উত্তর দিই, 'একটু অপেক্ষা কর—আমি আসছি।'

আবার সেই ভিজে বুট-জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে গায়ে ভিজে জামা চাপিয়ে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষপত্র নিয়ে আমি দরজার কাছে এসে উপস্থিত হই।

লোকটি আমাকে ইঙ্গিতেই তার অনুগমনের নির্দ্দেশ জানিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। তার সঙ্গে অতখানি জোরে হাঁটা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো মাঝে মাঝে। তবু আমি নীরবেই অনুসরণ করতে থাকি।

সহরের যে অংশ দিয়ে আমরা পথ হাঁটছিলাম, সে অংশটি আমার কাছে খুবই পরিচিত ছিল। তবু মনে হচ্ছে লোকটিই আমার চেয়ে যেন বেশী চেনে এ সব অঞ্চল। একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে সে সমানে এগিয়ে চলেছে। আমি খুব পিছিয়ে পড়লে, একটু থেমে দাঁড়ায়—আবার পথ চলতে সুরু করে।

আমার মনে হচ্ছিল, সে যেন কারও জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং সেই কারণেই প্রাণ-পণে জোর পায়ে হেঁটে চলছিল। আমি খুব জোরে জোরে সেই বৃষ্টির মধ্যেই তার পেছনে পথ হাঁটছিলাম।

অবশেষে জাহাজঘাটা এবং তার পাশের রাস্তায় একটি অস্বাস্থ্যকর ময়লা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। ইঁদুরের ভীষণ উৎপাতে এপল্লীটা বিপর্য্যস্ত। আমরা একটি ভাড়া বাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম।

দরজা থেকে পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে। দেখলাম লোকটি আমার জন্যে সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করছে। আমরা প্রায় এক সঙ্গে উপরে উঠলাম। উপরের তালার শেষের ঘরটিতে এসে আমরা থামলাম। ঘরের দরজাটি খোলা। সামনের অপ্রশস্ত পথ দিয়ে তেলের প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে। লোকটি ভেতরে প্রবেশ করে সোজা বিছানার মাথার দিকে উপস্থিত হল। আমি স্পষ্টই লক্ষ্য করে দেখি, লোকটি বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে মুমুর্ষু লোকটির হাত পরীক্ষা করছে। পরমুহূর্ত্তেই দেখি লোকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আচ্ছা ভোজবাজি তো?

আমি অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। ঘরের অন্য কোন পথ নেই। তবে, লোকটি গেল কোথায়? রহস্যের কোন কূলকিনারা পাই না আমি।

মুমুর্ষু এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, "আরে, আপনি এসেছেন তাহলে? প্যাট ইগান আমাকে বলে গেছে যে সে আমার জন্যে একজন ধর্ম্মযাজককে নিয়ে আসবেই, দেখছি সে তার কথা রেখেছে ঠিক ঠিক।"

"প্যাট ইগান কোথায় আছে?" আমি প্রশ্ন করি, কতকটা সন্দিগ্ধ চিত্তেই।

—"সে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে অষ্ট্রেলিয়াতে মারা গেছে। শুনুন, ভয় পাবেন না; আগে আমার কথা শুনুন, সব বুঝতে পারবেন। প্যাট ইগানের সঙ্গে কোন

প্রাসাদের মতই কঙ্কালসার। অবহেলা আর অমনোযোগের ফলে আমরা পতনের সম্মুখীন। ফাদার এলেন, নিজের কর্ম্মক্ষমতা অধ্যবসায় এবং সাধনা দিয়ে আবার সংস্কার সাধন করলেন গীর্জ্জাটির। অবহেলার স্থানটিকে আবার পরিপূর্ণ করে তুললেন ধর্ম্মকথা এবং জ্ঞানের আলোচনায়। তাঁর মুগ্ধ স্বভাব এবং প্রীতিমুগ্ধ হৃদয়ের কণামাত্র লাভের আশায় দূর দুরান্ত থেকে লোকজনের আনাগোনা সুরু হল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও তাঁর সমান উৎসাহ। গল্পগুজব এবং অনেক সময় জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছি আমরা।

আজ এলেন। ধর্ম্ম সম্পর্কিত অথবা ঐ ধরণের কিছু না বলে আজ তিনি ভুতের গল্প ফেঁদে বসলেন। গল্পটি সত্যি।

ভুতের গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু এ ধরণের ভুতের গল্প আমি ইতিপূর্ব্বে কোনদিন শুনিনি। যেমনি অভুতপূর্ব্ব, তেমনি রোমাঞ্চকর।

কথাবার্ত্তায় ভুতের প্রসঙ্গ উঠতেই সম্প্রতি আমার বাড়িতে যে সব অবিশ্বাস্য আশ্চর্য্যকর ঘটনা ঘটে গেছে, এবং বুদ্ধিতে যার কোন সময়েই ব্যাখ্যা করা যায় না, সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে গেলাম।

হঠাৎ আমার বিস্ময়ের অবকাশে তিনি সাধারণতঃ যে সব যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে বিরোধিতা করতেন, সেরকম কিছু না করেই তিনি বললেন, "আমি একথা মানতে বাধ্য যে প্রেতাত্মারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারে, অনেক সময়ে ভাল কাজের জন্যই। এ সময়ে পুনরায় পৃথিবী পরিদর্শনের অধিকার তারা লাভ করে থাকে—এবং এ সম্বন্ধে আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছিল সেই কথাই বলছি।"

ফাদার একটু রহস্যময়ভাবে ঘরের সব দিকটা দেখে নেন একবার। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে সুরু করেন, "এক সময়ে একটি খুব ছোট গীর্জ্জার সহকারী ধর্ম্মযাজক ছিলাম, গ্লাসগোতে। তরুণ বয়সে সে জায়গাটিকে আমার মোটেই ভালো লাগতো না। অন্য একটি যাজকের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ধর্ম্ম-

অধ্যাপক চোরো

যাজকটি আমার চেয়েও বয়সে অনেক বড়—প্রায় আমার বয়সের দ্বিগুণ হবেন হয়তো।

একদিন রাত্রে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরী হয়। ভিজে জুতো খুলে আগুনের পাশে এসে বসেছি, আমার সঙ্গী ধর্ম্মযাজকটি এক বাটি গরম ঝোল নিয়ে এসে হাজির করলেন—ঝোলটি তিনি আমার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই গরম করছিলেন। শারীরিক এবং মানসিক উভয়তঃই আমি বিশেষ ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। সহরে বেশ কিছুদিন থেকে মহামারী দেখা দিয়েছে। আবহাওয়াটা শীতের তীব্র ঠাণ্ডার মত। লোক মরছে অকাতরে, বিনা চিকিৎসায়। ধর্ম্মযাজকের কাজ যা সেই সেবা করতে করতে আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্লান্তি দূর করার জন্যে ইজি চেয়ারে শরীর বিছিয়ে দিলাম অগ্নিকুণ্ডের সামনে। বাইরে শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের করুণ আর্ত্তনাদ। ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালায়

অল্প অল্প বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। আজ রাত্রে আর কোন রোগী দেখে বেড়াতে হবে না ভেবে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গীটি সেদিনের খবরের কাগজখানা আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। আমি জোরে জোরে কাগজ পড়তে লাগলাম। হঠাৎ দরজাধাকার শব্দে চুপ করে গেলাম। আমার সঙ্গীটিও তাকালেন দরজার দিকে। দু'একটি মুহূর্ত্ত। সব চুপচাপ। আমি আবার জোরে জোরে কাগজ পড়ায় মন দিলাম। আবার শব্দ। কতকটা যেন রহস্যময় একগুঁয়েমী ভাবের। কাগজ ফেলে দিয়ে আমি উঠে পড়ি। দরজা খুলে দেখি, কেউ নেই সেখানে, সব শূন্য, একরাশ অন্ধকার। আমি একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করি—কিন্তু কারও দেখা নেই। দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে আসি আগুনের কাছে।

—"ও শুধু হাওয়া। এতো রাত্রে কে ডাকতে আসবে আবার? অবশ্য লোকতো অনেক মারা যাচ্ছে এ সময়—হয়তো আসতেও পারে কেউ।" —সঙ্গীটি বলেন।

আমি চুপ করে থাকি। কিছুক্ষণ সব চুপ, কোন কিছুরই শব্দ নেই। আমি ত কাগজ পড়ায় জোর করে মনোনিবেশ করি আবার। আবার শব্দ—আমরা নিশ্চুপ ভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকি। আবার শব্দ—এ সময়টা খুব জোরে বলেই মনে হল। আমি এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলি। রাস্তার গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে লক্ষ পড়ে একটি মানুষের মূর্ত্তি—আমারই জন্যে যেন সে অপেক্ষা করছে। এখনও পর্য্যন্ত সে মুখ স্পষ্ট মনে পড়ে আমার। রুক্ষ-রুক্ষ চোখ মুখের ভাব। গলায় রুমাল বাঁধা। স্পষ্ট আইরিশ বলে মনে হয়। মুখে চোখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক। চোখে এক তীব্র সন্ধানীর দৃষ্টি।

কোন কথা বলে না মূর্ত্তিটি, শুধু ইঙ্গিতে জানায় তার অনুসরণ করতে।

সম্মতি জানিয়ে আমি উত্তর দিই, 'একটু অপেক্ষা কর—আমি আসছি।'

আবার সেই ভিজে বুট-জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে গায়ে ভিজে জামা চাপিয়ে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষপত্র নিয়ে আমি দরজার কাছে এসে উপস্থিত হই।

লোকটি আমাকে ইঙ্গিতেই তার অনুগমনের নির্দ্দেশ জানিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। তার সঙ্গে অতখানি জোরে হাঁটা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো মাঝে মাঝে। তবু আমি নীরবেই অনুসরণ করতে থাকি।

সহরের যে অংশ দিয়ে আমরা পথ হাঁটছিলাম, সে অংশটি আমার কাছে খুবই পরিচিত ছিল। তবু মনে হচ্ছে লোকটিই আমার চেয়ে যেন বেশী চেনে এ সব অঞ্চল। একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে সে সমানে এগিয়ে চলেছে। আমি খুব পিছিয়ে পড়লে, একটু থেমে দাঁড়ায়—আবার পথ চলতে সুরু করে।

আমার মনে হচ্ছিল, সে যেন কারও জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং সেই কারণেই প্রাণ-পণে জোর পায়ে হেঁটে চলছিল। আমি খুব জোরে জোরে সেই বৃষ্টির মধ্যেই তার পেছনে পথ হাঁটছিলাম।

অবশেষে জাহাজঘাটা এবং তার পাশের রাস্তায় একটি অস্বাস্থ্যকর ময়লা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। ইঁদুরের ভীষণ উৎপাতে এপল্লীটা বিপর্য্যস্ত। আমরা একটি ভাড়া বাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম।

দরজা থেকে পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে। দেখলাম লোকটি আমার জন্যে সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করছে। আমরা প্রায় এক সঙ্গে উপরে উঠলাম। উপরের তালার শেষের ঘরটিতে এসে আমরা থামলাম। ঘরের দরজাটি খোলা। সামনের অপ্রশস্ত পথ দিয়ে তেলের প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে। লোকটি ভেতরে প্রবেশ করে সোজা বিছানার মাথার দিকে উপস্থিত হল। আমি স্পষ্টই লক্ষ্য করে দেখি, লোকটি বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে মুমূর্ষু লোকটির হাত পরীক্ষা করছে। পরমুহূর্ত্তেই দেখি লোকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আচ্ছা ভোজবাজি তো?

আমি অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। ঘরের অন্য কোন পথ নেই। তবে, লোকটি গেল কোথায়? রহস্যের কোন কুলকিনারা পাই না আমি।

মুমূর্ষু এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, "আরে, আপনি এসেছেন তাহলে? প্যাট ইগান আমাকে বলে গেছে যে সে আমার জন্যে একজন ধর্ম্মযাজককে নিয়ে আসবেই, দেখছি সে তার কথা রেখেছে ঠিক ঠিক।"

"প্যাট ইগান কোথায় আছে?" আমি প্রশ্ন করি, কতকটা সন্দিগ্ধ চিত্তেই।

—"সে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে অষ্ট্রেলিয়াতে মারা গেছে। শুনুন, ভয় পাবেন না; আগে আমার কথা শুনুন, সব বুঝতে পারবেন। প্যাট ইগানের সঙ্গে কোন

একটি জঙ্গলে আমার দেখা হয়, মেলবোর্ণ থেকে চারশো মাইল দূরে। আমাদের সমাজ থেকে আমরা দু'জনেই বহিষ্কৃত হয়েছিলাম সে সময়। আমাদের দ্বারা কোন ভাল কাজের আশাও করা যেতে পারতো না, কোন সদুদ্দেশ্যও আমাদের ছিল না। এই কারণে সমাজের সকলেই আমাদের বিপক্ষে এবং আমরাও সকলের বিরুদ্ধে ছিলাম।

আমাদের মাথার জন্যে অর্থের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত প্রচার করা হয়েছিল। এজন্যে শহর এবং সভ্যতা থেকে দূরে বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেম। বিপদের মধ্যে অনেক সময় আমরা দু'জন দু'জনের রক্ত নিয়ে শপথ করেছি যে কেউ কাউকে ভুলবো না। এমনি ভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

ধর্ম্মের সম্বন্ধে কোনদিনই আমার বিশেষ কিছু ধারণা ছিল না। জেলে যখন ছিলাম, তখনই কিছু কিছু যীশুর সম্বন্ধে শুনেছিলাম। কিন্তু সে সময় ওসব আমার বিশেষ ভাল লাগতো না।

ইগান প্যাট কিন্তু একেবারে গোঁড়া ক্যাথলিক। তার মায়ের দেওয়া ক্রশ সর্ব্বদা বুকের কাছে ঝুলিয়ে রাখতো সে। রোজ রাত্রে উপাসনা করে তবে শুতো - সে গর্ত্তের মধ্যেই হোক অথবা উন্মুক্ত বালির প্রান্তরে যেখানেই হোক। এই রকমই তার কড়াকড়ি নিয়ম ছিলো এবং এ নিয়ম সে সর্ব্বদাই পালন করে চলতো।

একদিন রাত্রে আমাদের দু'জনেরই খুব জ্বর এলো। আমার চেয়ে ইগানের অবস্থাই খুব খারাপ। আমাদের মত জোয়ান লোকও সব শক্তি খুইয়ে নির্জীব অসহায় শিশুর মত দুর্ব্বল বোধ করেছিলাম নিজেদের। ইগানের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে নামতে লাগলো। বুঝলাম তার মৃত্যুর আর বিশেষ দেরী নেই। আমার নিজেরও একই অবস্থা। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করে তার মাথা ধুইয়ে দিয়ে তাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছিলাম।

এ সময়ে আমরা মরুভূমির একপ্রান্তে অবস্থান করছিলাম—শিকারী এবং অন্যান্য লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অক্লান্ত সংগ্রাম করছিলাম। দু'জন মানুষের বাঁচার সে কি আগ্রহ কি উৎসাহ! তবু ইগানকে বাঁচান গেল না। মারা যাওয়ার আগে আমার হাত ধরে বলে গেল, "বন্ধু, আমার জন্যে এক কাজ করতে পারবে? তুমি যদি এ কাজটা কর, তাহলে আমিও তোমার মৃত্যুর সময় এ উপকারটা করবো, আমি কথা দিচ্ছি বন্ধু।"

ফিস ফিস শব্দ বের হয়ে আসে ইগানের মুখ দিয়ে; আমি তার মুখের কাছে কান নিয়ে স্পষ্ট করে শুনতে চাই কথাটা। ইগান আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, "আমার জন্যে একজন ধর্ম্মযাজককে ডেকে আনতে পারো বন্ধু?"

পরদিন ভোর-ভোর সময়ে নিকটবর্ত্তী সহরের পথে মাত্র অর্দ্ধেক পথ অগ্রসর হয়েছি। শরীরে যদিও অসহ্য দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে দেহ, তবুও প্রাণপণে সে-সব উপেক্ষা করে ছুটে চলেছি। আবার রাত্রি এলো, আমি পথ হেঁটে চলেছি মাইলের পর মাইল সব কষ্ট সহ্য করে। হঠাৎ দূরে একটি ক্রশওয়ালা গীর্জ্জার চূড়ো দেখতে পেলাম। আমি সেই চূড়ো লক্ষ্য করে ছুটে চললাম এবং গীর্জ্জায় পৌঁছে এক সৌম্য শান্ত ধর্ম্মযাজককে দেখতে পেয়ে সমস্ত কথা খুলে বললাম।

তিনি সমস্ত কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটি ঘোড়া দিয়ে নিজে আর-একটিতে বসে পূর্ণ বেগে ঘোড় ছুটিয়ে দিলেন।

আমরা ঠিক সময়েই উপস্থিত হয়েছিলাম।

ইগানের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো এত দূরেও নির্জ্জন মরুভূমির দেশে তার মৃত্যুকালে একজন ধর্ম্মযাজককে যে এনে উপস্থিত করতে পেরেছি, এজন্যে কৃতজ্ঞতায় তার দু'চোখ ছলছল করে উঠলো।

মুমূর্ষু ইগান তার সেই অস্পষ্ট ঠোঁটকাঁপা ফিসফিসে স্বরে আমাকে বললো, "বন্ধু, আমার মৃত্যুর সময় তুমি আমার যে উপকার করলে—আমি তা কোনদিনও ভুলতে পারবো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার মৃত্যুর সময়েও তোমার জন্যে এই উপকার করবো।"

"লোকটি তার কাহিনী শেষ করলো। মৃত্যুর সময়ে সে আমাকে তার আত্মার জন্যে শুভ কামনা জানাতে বলে গেল। এটা আমার প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা, অধ্যাপক। বলুন, এরপর আর অবিশ্বাস করি কি করে বলুন?"

ফাদার জ্যাকসন তাঁর গল্পের উপসংহার টানলেন। লক্ষ্য করলাম কেমন যেন একটা বিষাদমাখা বিবর্ণতা তাঁর সমস্ত চোখ-মুখের উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ করে দিয়ে গেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়

ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কবির প্রবীণ বয়সের রচনা। চতুর্থ ভাগ।

তৃতীয় বা শেষযুগ। বৃদ্ধকাল।

(১৯৩২ খৃঃ—১৯৪১ খৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশ বৎসর অবশ্য তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেরও শেষ অধ্যায় বা যুগ। এই অধ্যায়েও তাঁহার লেখার সংখ্যা অল্প নহে। এই সময়ে স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা অপেক্ষা ভাবের আতিশয্য অত্যন্ত অধিক এবং আনন্দবাদী কবির জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণারও দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবনে প্রথম 'গদ্যকাব্য' রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা অভিনব ঘটনা সন্দেহ নাই। এই যুগে কবির নিম্নলিখিত রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

নাম রচনার অথবা প্রকাশের কাল।

১। "পরিশেষ" (কতকগুলি নূতন কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ)—১৯৩২ সাল।

২। "লিপিকা" (প্রথম গদ্যকাব্য)—১৯৩২ সাল।

৩। "পুনশ্চ" (লঘুচিন্তাধারার গদ্য-কাব্য)—১৯৩২ সাল।

৪। "কালের যাত্রা" (দুই অঙ্কে সমাপ্ত নক্সা)—১৯৩২ সালে রচিত (২)। নক্সাটি দুই অংশে বিভক্ত, যথা :—(ক) রথের রশি, (খ) কবির দীক্ষা।

৫। "তাসের দেশ" (সঙ্কেতধর্ম্মী ব্যঙ্গচিত্র)—১৯৩২ সালে রচিত ও ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত।

৬। "চণ্ডালিকা" (ক্ষুদ্র নাটিকা)—১৯৩২ সাল। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রচিত।

৭। "কমলা বক্তৃতামালা" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)—১৯৩২-৩৩ সাল।

৮। "দুইবোন" (উপন্যাস)—১৯৩৩ সাল।

৯। "বিচিত্রা" (নূতন ও পুরাতন কতিপয় কবিতা-সমষ্টি)—১৯৩৩ সাল।

১০। "প্রহাসিনী" (কবিতা-সমষ্টি)—১৯৩৪ সাল।

১১। "বাঁশরী" (নাট্যরূপে কথোপকথন, Dramatic Dialogue)—১৯৩৪ সাল।

১২। "চার অধ্যায়" (রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত)—১৯৩৫ সাল।

১৩। "শেষ-সপ্তক" ("লিপিকা" ও তৎপরবর্ত্তী "পুনশ্চ" গদ্য-কাব্যদ্বয়ের অনুকরণে গদ্যকাব্য এবং ইহা কতিপয় গদ্য-কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ ইহার অন্য উদাহরণ—"সাময়িকপত্র" ১৯৩৬)—১৯৩৫ সাল (?)।

১৪। "বীথিকা" (ভাবপূর্ণ গীতি-কবিতাসমূহ)—১৯৩৫ সাল।

১৫। "পত্রপুট" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯৩৫-৩৬ সাল।

১৬। "শ্যামলী" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯৩৬ সাল।

১৭। "সাময়িক পত্র" (কবিতাবলী—১৯৩৬ সাল)।

১৮। "খাপছাড়া" (কবিতাবলী)—১৯৩৬ সাল।

১৯। "স্ফুলিঙ্গ" (কবিতাবলী)—১৯৩৬ সাল (?)

২০। "ছড়ার ছবি" (কবিতাগ্রন্থ)—১৯৩৭ সাল।

২১। "প্রান্তিক" (কবিতাবলী)—১৯৩৪-১৯৩৭ সাল।

২২। "সেঁজুতি" (কবিতাবলী)—১৯৩৬-৩৮ সাল।

২৩। "আকাশ-প্রদীপ" (কবিতাবলী)—১৯৩৮ সাল।

২৪। "বনবাণী" (কবিতাগুচ্ছ প্রকৃতির রহস্য ব্যাখ্যা)—১৯৩৮ সাল (?)।

২৫। "ছড়া" (কবিতাবলী)—১৯৩৯ সাল।

২৬। "নব-জাতক" (কবিতাবলী)—১৯৩৮-৩৯ সাল।

২৭। "গীতবিতান" (গীত-সমষ্টি)—১৯১১-১৯৩৯ সাল।

২৮। "সানাই" (কবিতা-গ্রন্থ)—১৯৩৮-৪০ সাল।

২৯। "গল্পসল্প"—১৯৪০ সাল।

৩০। "রোগশয্যায়" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯৪০ সাল।

৩১। "আরোগ্য" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯৪১ সাল।

৩২। "জন্মদিনে" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯৪১ সাল।

৩৩। "শেষলেখা" (কবিতাগুচ্ছ)—১৯৪১ সাল।

এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রচিত আরও কতিপয় নাটক ও প্রহসনের নাম করা যাইতে পারে। যথা—

"গোড়ায় গলদ" (প্রহসন, ১৮৯২, পুনর্লিখিত, নাম 'শেষ রক্ষা' ১৯২৮), "বিনি পয়সার ভোজ" (ব্যঙ্গকৌতুক নাট্য, ১৯০৭), "নুতন অবতার" (ব্যঙ্গকৌতুক নাট্য,১৯০৭), "বশীকরণ (ব্যঙ্গকৌতুক নাট্য, ১৯০৭), "হাস্যকৌতুক" (কৌতুক নাট্য, ১৯০৭), "অরসিকের স্বর্গ-প্রাপ্তি" (ব্যঙ্গ-কৌতুক নাট্য, ১৯০৭), "স্বর্গীয় প্রহসন" (ব্যঙ্গকৌতুক নাট্য, ১৯০৭), "মুকুট" (এই নামের ক্ষুদ্র উপন্যাসের নাট্য-রূপ, ১৯০৮), "শোধ-বোধ" ("কর্মফল" গল্পের নাট্যরূপ, ১৯২৬), "ঋতুরঙ্গ" (নাটক, ১৯২৭), "শাপমোচন" (নাটক, ১৯৩১), "শ্রাবণ-গাথা" (নাটক, ১৯৩৪), "পরিশোধ" (নাট্যগীতি, ১৯৩৬), "শ্যামা" (নৃত্যনাট্য, ১৯৩৯) এবং "মুক্তির উপায়" (প্রহসন, ১৯৩৮)। এতদ্ভিন্ন কতিপয় নাটকের পরিবর্তিত নাম উল্লেখযোগ্য। যথা—"চিরকুমার সভা" (উপন্যাস ও নাটক—নাটকের অন্য নাম "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ"), "অচলায়তন" (নাটক, পরবর্তী নাম "গুরু"), "শেষ-বর্ষণ" নাট্যধর্ম্মী "কবিতা-গুচ্ছ" পরবর্তী নাম "ঋতু-উৎসব"), "শারদোৎসব" (নাটক, পরবর্তী নাম "ঋণশোধ"), "অরূপ-রতন" ("রাজা") নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) এবং "বৈরাগ্যসাধন" ("ফাল্গুনী" নাটকের অন্য নাম)।

এতদ্ভিন্ন কবি-রচিত কবিতা ও কাব্য প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত মূল্যবান অংশগুলির দুইটি সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে। ইহাদের পূর্ব্বতন সংগ্রহের বা সঙ্কলনের নাম "চয়নিকা" এবং পরবর্তী সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম "সঞ্চয়িতা"।

রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বাঙ্গালা সাহিত্যের পদ্য, গদ্য ও নাটক এই তিন শাখাতেই তাঁহার অমূল্য অবদান রহিয়াছে। তাঁহার রচনার তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে যে এই অবদানের গুরুত্ব এবং সংখ্যাও অল্প নহে। বর্ত্তমান তালিকাটি নানা কারণে বিশেষতঃ অজ্ঞতা ও অনবধানতা বশতঃ, পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া চেষ্টা সত্ত্বেও তালিকাটিতে নানারূপ ভুল ত্রুটি থাকাও অসম্ভব নহে। তবুও যে গ্রন্থগুলির নাম করা গেল, "রবীন্দ্র-সাহিত্য" বুঝিতে তাহাই যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কোন কবি বা সাহিত্যিকের রচনা আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে ইহার দুইটি দিক আছে। ইহার একটি দিক লেখকের মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং অন্য দিক রচিত বিষয়ের নূতনত্ব ও সাহিত্যিক মূল্য। পাঠক অথবা সমালোচকের দৃষ্টি এই উভয় দিকেই নিবদ্ধ থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা যায় মন্তব্যের প্রথম অংশটি বিশেষ ভাবে সাধারণের যতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, দ্বিতীয় অংশটি ততটা করে নাই। কবির মনস্তত্ত্বের পরিচয় অপেক্ষা কবির সাহিত্যিক অবদানের মূল্য নির্দ্ধারণ অধিক প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্যের দিকে অধিক দৃষ্টিক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনস্তত্ত্ব অথবা চিন্তাধারা নিয়া যতটা আলোচনা হইয়া গিয়াছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য ও স্থান নির্দ্দেশ নিয়া ততটা আলোচনা হইয়াছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এখন রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার করা একান্ত আবশ্যক। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়া নানা দিক অবলম্বনে গভীরভাবে আলোচনা করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

১। রবীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য এবং বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব কতখানি পড়িয়াছে? কবিগুরু পাশ্চাত্য দার্শনিক ও কবিগণের চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শ কি পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন? পাশ্চাত্য কবিগণের মধ্যে কাহাদের কবিতা এবং কোন্ কোন্ কবিতা রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিতেন এবং কোন কবিতাগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার কোন্ কোন্ রচনায় পাশ্চাত্য কবি ও লেখকগণের অনুকরণ, অনুসরণ, সাদৃশ্য অথবা আংশিক প্রভেদ রহিয়াছে? বিবিধ গদ্য রচনার দিকে রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য ভাবধারা কতখানি ক্রিয়া করিয়াছে? তাঁর গদ্য বাক্য-গঠন রীতিতে (Syntax গঠনে) তাঁহার সংস্কৃতের

প্রতি অনুরাগ, পরবর্ত্তী কালে পাশ্চাত্য রীতির প্রভাব কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল? নাটক রচনার দিকে কবির উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কতটা পড়িয়াছিল? তাঁহার নিজের রচনাগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ইংরেজী অথবা ইয়োরোপীয় নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল? ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি কবি স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছিলেন?

২। রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রাচ্যের ভাবধারা দর্শন ও সাহিত্যের এবং বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ভাবধারা ও সাহিত্যের পরিচয় কতখানি পাওয়া যায়? তাঁহার উপর সংস্কৃতের দিকে উপনিষদ্‌, বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাসের প্রভাব কিরূপ ছিল? সংস্কৃতের দর্শন, কাব্য-সৌন্দর্য্য, পৌরাণিক কাহিনী, ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাবাদর্শ কবিকে কি পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল? নিকট প্রাচ্যের সুফী মতবাদ, বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের মতবাদ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ কবির কাব্য সমূহে কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে? বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতবাদ এবং 'বৌদ্ধ-জাতক', 'অবদান-শতক' ও বৌদ্ধ রাজাগণের কাহিনী কবিকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছিল? রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের একদিকে সঙ্কীর্ণতা ও কুপ্রথাসমূহ এবং অপরদিকে ভক্তি-প্রবণতা উভয়ই কবির উদার মনের উপর কতখানি সাড়া দিয়াছিল? নাটক রচনার রীতি-পদ্ধতি (technique) সম্পর্কে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ তুলনামূলকভাবে কি পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন?

৩। ভাব ও সুরের দিকে কবি-রচিত গানগুলি আদিযুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে কোন্‌ স্থান অধিকার করিয়াছে? বাঙ্গালা সঙ্গীতের সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কতখানি? দেশী সঙ্গীত, সংস্কৃত রীতির সঙ্গীত ও শাস্ত্র, দক্ষিণী, পাশ্চাত্য এবং অনুরূপ সঙ্গীতের সহিত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সম্পর্ক কিরূপ?

৪। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট নিরপেক্ষ আলোচনা এবং "রবীন্দ্র সাহিত্য" হইতে প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ প্রয়োজন। তুলনা মূলক বিচার ও ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহা ভিন্ন বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পাশ্চাত্য Romanticism এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের Mysticism ও Symbolism এর পরিচয় ও পার্থক্য কতখানি পাওয়া যায় তাহাও সঠিক-ভাবে দেখাইতে হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন্‌ কোন্‌ দিকে রবীন্দ্রপ্রতিভা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কবির স্থান নির্দ্দেশ করিতে গেলে দেখা যায় কবি হিসাবেই তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে। কোন কবি বস্তুনিরপেক্ষ (Subjective) অথবা বস্তুনিষ্ঠ (Objective) ভাবের দিকে স্বীয় প্রতিভা দেখাইতে পারেন। এইদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ Subjective ভাবের কবি। তাঁহার এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক কবি বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অনুভূতি ও জীবনের প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বহু কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুনিরপেক্ষ কবি কোন কাহিনী নেপথ্যে রাখিয়া এবং নিজেকে তাহার মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড়িত না করিয়া প্রেম, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি কোন ভাবের অথবা সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি কোন রসের বর্ণনার সাহায্যে স্বীয় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে কবি গৌণ এবং তাঁহার বর্ণনাত্মক কবিতা বা কাব্য মুখ্য। বৈষ্ণবগণ পদাবলী সাহিত্যে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই মুখ্য স্থান দিয়া তাঁহার কবিতাবলীর সাহায্যে স্বীয় অনুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কবির কাব্য অপেক্ষা কবি স্বয়ংই আমাদের সম্মুখে অধিক প্রতিভাত হইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত উচ্চাঙ্গ কবিতা সমূহ যেন বেদান্ত-উপনিষদের ভাব সমৃদ্ধ কবির জীবন-বেদ। তাঁহার উপর বিশেষ সমাজের ধর্ম্মীয় প্রভাবের ফলে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলি সাকার কোন দেবতা বিশেষকে উপলক্ষ করিয়া রচিত হয় নাই। এই দিক দিয়া কবিতাগুলির ভিতর একটি বিশ্বজনীনতার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিগুরুর চিন্তাধারার সহিত আমাদের পরিচিত হওয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে। তবে কবির ভিতর দিয়া তাঁহার

কাব্যকে চিনিতে পারা গেলেও কাব্যের ভিতর দিয়া কবিকে চিনিতে চেষ্টা করাই অধিক সঙ্গত। সম্ভবতঃ ইহার সাহিত্যিক মূল্যও অধিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনের দার্শনিক সংগঠন এবং তৎরচিত কবিতাগুলির বস্তুনিরপেক্ষতার ফলে অনেক কবিতা 'গীতিকবিতা' বা Lyric শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উপনিষদের গভীর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ সমূহ কবি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন এবং এই দিক দিয়া তিনি 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'এর মধ্যে 'সুন্দরের' প্রতিই অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। এইরূপ 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দের' মধ্যে কবি 'আনন্দের' প্রতিই যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। ঋতুর দিকে, বর্ষা ঋতুর প্রতি কবি খুব আকৃষ্ট ছিলেন এবং ইহা মহাকবি কালিদাসের প্রভাবের ফলও হইতে পারে। রসের মধ্যে 'শান্ত' ও 'মধুর' রস তাঁহার অনেক কবিতার ভিতরেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত কাব্য ও কবিতাগুলি কখনও চিত্র-ধর্ম্মী, কখনও সঙ্গীত-ধর্ম্মী এবং কখনও ভাব-ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রথম দিকের রচনাগুলি প্রধানতঃ চিত্র-ধর্ম্মী এবং শেষেরগুলি ভাব-ধর্ম্মী। শেষোক্ত রচনাগুলির মধ্যে ভাষা অপেক্ষা ভাবের গুরুত্বই অধিক দৃষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তাহা স্বদেশী ছাঁচে ঢালিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার লেখাতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ভাবধারারই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। অনেক স্থলেই বহিরঙ্গে পাশ্চাত্য রীতি বা Technique গ্রহণ করিলেও রচনার অভ্যন্তরে স্বদেশের চিন্তাধারা ও রীতিই অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায়ই প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন। আবার কবির মন যেন জাতিধর্ম্মনিরপেক্ষ মানব জাতি ও মানবমনের প্রতীক ছিল। তাঁহার মানবচিত্তের অভিজ্ঞতা অপরিসীম ছিল এবং তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের গৌরব বুঝিতেন। তিনি ব্যষ্টি বা সমষ্টি নিরপেক্ষ কোন প্রকার নিপীড়ন কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহাতে রাজনীতি নাই, ইহা উচ্চ নীতিগত প্রশ্ন। তিনি মানুষের আত্মসম্মানের মূল্য বুঝিতেন এবং কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশ-প্রেম এই দুই দিকেই তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে Romantic কবি বলা যাইতে পারে। অতীন্দ্রিয়তা, সৌন্দর্য্যোপলব্ধি ও আনন্দোপভোগ romanticismএর প্রধান লক্ষণ। Shelley, Keats ও Wordsworth প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথও এই শ্রেণীর কবি। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের সন্ধান, অপূর্ণতার বেদনা এবং অজানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য কবিগণ হইতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কোন কোন দিকে পার্থক্য থাকিলেও ইঁহারা সকলেই Romantic কবি। পাশ্চাত্ত্য Romantic কবিগণ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণময় সত্তা অনুভব করিয়া মানব-চিত্তের উপর প্রকৃতির অসামান্য প্রভাব স্বীকার করিতেন; অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দেখেন নাই। প্রকৃতিকে তিনি নিজের সহিত একান্তভাবে মিশাইয়া ফেলিয়া একাত্মবোধ করিতেন। কবি মানব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি এতদুভয়ের মধ্যে সেই অখণ্ড ও অনন্তের লীলা-রহস্যেরই বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

'রহস্য বাদ' (গূঢ়বাদ') বা mysticism রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করিয়াছিল। এই mysticismএর অভ্যুদয় ইয়োরোপে অপেক্ষাকৃত নবীন হইলেও ভারতবর্ষের চিরপুরাতন মর্ম্মকথা। রহস্য-বাদের মধ্যে এক অব্যক্ত অনন্ত জীবনের সহিত খণ্ড মানব-জীবনের সম্বন্ধের আভাষ সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত আছে। বিশ্ব-রহস্যের অপূর্ব্ব অনুভূতি ও মানব-জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ক কবির রহস্যবাদী মনকে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকের সন্ধান দিয়াছিল এবং কবির romantic মনকে 'রহস্যবাদের' ধারায় চালিত করিয়াছিল। নানাদেশে ও নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও এই 'রহস্যবাদ' প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে। ইরাণের সূফী সম্প্রদায় ও বাঙ্গালার কর্ত্তাভজা, বাউল ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় 'রহস্য-বাদের' উল্লেখ-যোগ্য সমর্থক।

কবির চিত্তে বিভিন্ন বয়সে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব

উপস্থিত হইলেও মোটের উপর কবি আশাবাদী ছিলেন। সৃষ্টি-রহস্যের ভিতরের ভীষণতা ও ক্রূরতা কবিকে ব্যথিত করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে, কিন্তু কবি-মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জন্ম ও মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিলেও 'কঠ' 'কেন' ও 'ঈশ' প্রভৃতি উপনিষদের অমূল্য উপদেশ সমূহ তাঁহার মনে সদা জাগ্রত ছিল; "রসো বৈ সঃ" ও "অমৃতস্য পুত্রাঃ"-রূপ অভয়বাণী কবি যৌবনেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ডজীবনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মৃত্যুতে তিনি জীবনের এক বিশেষ অবস্থা এমনকি পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এইদিক দিয়া কবীরের ন্যায় সাধুগণও একই কথা বলিয়াছিলেন। কবি মৃত্যুতে জীবনের শেষ না দেখিয়া অশেষের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন-স্মৃতি" মারফৎ জানাইয়া গিয়াছেন—আমারতো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার একটি মাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।

এই মিলন-সাধনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা তাঁহাকে সীমা ছাড়াইয়া অসীমের সন্ধানে যাত্রা করাইয়াছে এবং তাঁহাকে দিয়া ক্রমাগত গতি বা চলার বাণী ঘোষণা করাইয়াছে। সৃষ্ট জগতেও ইহা যেমন সত্য, ভাব-জগতেও তাহাই। বেদান্তের ও উপনিষদের (তথা শঙ্করাচার্যের) মতানুযায়ী "অদ্বৈতবাদ" অপরিবর্তনীয় "সৎ" বা "সত্য" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান থাকিলেও এই মতবাদগুলির সঙ্গে এ দেশীয় গতিবাদ সংক্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন। একদিকে প্রাচীন উপনিষদ্ ও অপরদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক Bergson এই "গতিবাদ" প্রচার করার ফলে কবি-মনে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। বৈদিক যুগের মহীদাস "চরৈবেতি, চরৈবেতি" (চলো, চলো) ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বাণীই পুনবায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কবি সংসারের প্রতি বীতরাগ হইবার মনোবৃত্তি পছন্দ করিতেন না। বরং তিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া রসানুভূতির পক্ষপাতিই ছিলেন। তাঁহার উক্তি—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ("নৈবেদ্য")।

রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহ স্বাভাবিকভাবে নিম্নবর্ণিত কয়েক শ্রেণীতে প্রধানতঃ বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

১। কাব্য ও কবিতা সমূহ
২। সঙ্গীত
৩। নাটক সমূহ
৪। গদ্য-রচনাবলীঃ
(ক) নানাবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ ও বক্তৃতামালা (লিখিত)
(খ) বিবিধ সমালোচনা (কাব্য সম্বন্ধে ও নানাবিধ)
(গ) ছোট-গল্পসমূহ
(ঘ) উপন্যাসসমূহ

রবীন্দ্রনাথ-রচিত কাব্যসমূহ ও কবিতাবলী সম্বন্ধে বলা যায় যে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কাল পর্য্যন্ত কবির মন একটা বিষাদের ভাবে আচ্ছন্ন ছিল। কবি তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' রচনাকালেই সচেতন হইয়াছিলেন, তবে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি তখনও ভালভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহার প্রকৃত উন্মেষ হয় প্রভাত-সঙ্গীতের কাল হইতে। "জীবন-স্মৃতিতে" কবি লিখিয়াছেন—"কাব্য হিসাবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মূল্য বেশী না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্ত্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই" ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রশংসাই করিয়াছিলেন। কবি-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ অবশ্য পরবর্ত্তী যুগের কথা। কবি তাঁহার কাব্য-জীবনে কল্পনাবলে এক দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দেবতা কবির "জীবন-দেবতা" নামে সুপরিচিত। কবির জীবনের যত কিছু প্রেরণা ও যত কিছু বৈচিত্র্যের মূলে রহিয়াছেন এই জীবন-দেবতা। কবি-হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ইনি বিরাজ করেন। বিশ্ব-স্রষ্টা ও জীবন-দেবতা কবি-কল্পনায় ক্রমে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। কবির নিকট ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া ভগবানকে অনুভব করা অধিক রুচিকর ছিল। সেই জন্য তিনি কবির কাছে দূরত্ব বোধক 'প্রভু' 'রাজা' বা 'রাজার দুলাল' অপেক্ষা 'স্ত্রী', 'বর' 'সখা' প্রভৃতি নৈকট্য-

বোধক নানারূপেই অধিক উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকৃত mystic সাধকের ন্যায় কবি এইরূপ নানা সম্পর্কের ভিতর দিয়া ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন এবং বিশ্বের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। কবির আধ্যাত্মিকতার সুর "নৈবেদ্য" "খেয়া", "গীতাঞ্জলী" প্রভৃতির কবিতাসমূহে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

কবির কৈশোর অবস্থার কবিতাগুলির মধ্যে প্রতিভা তত বিকাশ প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার পূর্ণ যৌবনে প্রথম রচিত "মানসী" (১৮৯০) কবিতাগুচ্ছ হইতেই এই কবি-প্রতিভা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং স্বয়ং কবিও এই সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। এই সময় কবির আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। তাঁহার "সোনারতরী" (১৮৯৩) কবিতাবলীতে সীমার সহিত অসীমের ও আত্মার সহিত প্রকৃতির মিলন সংবাদের সহিত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে মানবের আনন্দময় অস্তিত্বের কথাও বিঘোষিত হইয়াছে। এই কবিতাগুলিতে রহস্যময় অনুসন্ধিৎসার ও সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। "নৈবেদ্য" (১৯০১) কবিতা-গ্রন্থে কবি বিশ্বস্রষ্টাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে 'মহারাজ' ও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তিনি অবশ্য পরবর্ত্তী স্তরে উভয়ের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। "খেয়া" (১৯০৪-৬) কবিতাগ্রন্থে প্রথম কবির mysticism বা 'রহস্যবাদ' ('গূঢ়বাদ') এর পরিচয় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক রসবোধ ও Lyric বা গীতি-কবিতার সংমিশ্রণে "খেয়া" রচিত। "গীতাবলী", "গীতিমাল্য" "গীতালি" ও "গান" তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু "খেয়া" এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিক কবিতা-গ্রন্থ হইলেও তত্ত্ব ও কবিত্ব উভয়েরই স্পর্শ ইহাতে আছে। "বলাকা" (১৯১৬) কবিতাগ্রন্থ কবির 'গতিবাদ' সম্বন্ধে আস্থার পরিচয় দেয়। নিজের সহিত বহির্বিশ্বের দ্বন্দ্বে কবি-মানসের বিশেষ অবস্থাও ইহাতে সূচিত হইয়াছে। "বলাকার" কবিতাগুলির প্রত্যেকটির একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য আছে। আবার সম্মিলিত ভাবেও একটি বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। বিশ্বময় চলার বা গতির রহস্য কবি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অনন্তের পথে যাত্রাই কবি-মানসে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান কবিতাসমূহের দুইটি সংগ্রহ-গ্রন্থ (শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত) আছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বতনটির নাম 'চয়নিকা' ও পরবর্ত্তীটির নাম 'সঞ্চয়িতা'। শেষোক্ত বৃহত্তর গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-কাব্যের ধারা বুঝাইতে বিশেষ সাহায্যকারী বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং অনেকগুলি কাব্য-নাটকাদির অন্তর্গত গান রহিয়াছে। গানগুলি ভাব, ভাষা ও সুরে অনবদ্য বলা যাইতে পারে। এখন 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' বাঙ্গালার গানগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই গানগুলির লোকপ্রিয়তাও যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবির গীতধর্ম্মী মনের সংগঠনের জন্য তাঁহার অনেক নাটকেই নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কবির সঙ্গীত ও গীতিকবিতা (Lyrics) রচনায় অনুরাগ এবং তৎসঙ্গে আদর্শবাদী (idealistic) মনের ধারা তাঁহার প্রায় সব নাটকেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ইহার ফলে কোন একটি কাহিনীমূলক নাটক রচনার সময়ে আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নই তাঁহার মনে বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। নাটক রচনার technique বা রীতির মধ্যে idealistic বা আদর্শগত এবং realistic বা বাস্তবতার দিক দুইটি রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নাই। তবে আদর্শের দিকে অধিক ঝোঁক এবং গান রচনায় অত্যধিক আগ্রহ নাটকগুলিকে প্রায়শঃই কাব্য, গান ও নাটকীয় কথোপকথনে পূর্ণ একটি সংমিশ্রিত সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাটকগুলির ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে তাঁহার রচিত গীতিকাব্য-প্রধান ও সঙ্গীত-ধর্ম্মী নাটকগুলি 'তত্ত্ব-নাট্য', 'কাহিনী-নাট্য', 'কাব্য-নাট্য', 'সঙ্গীত-নাট্য', 'নৃত্য-নাট্য' প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি-রচিত কতকগুলি নাটক আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী কোন অঙ্ক বা দৃশ্য তাহাতে নাই। এই জাতীয় নাটকে আছে শুধু নাটকাকারে কথোপকথন (Dramatic Dialogue) এবং

ইহার মাধ্যমে চরিত্র-সৃষ্টি। ইহাতে নাটকের 'গতি' বা ক্রিয়ার (action) অত্যন্ত অভাব। কতকগুলি নাটক স্বাভাবিকভাবে 'পঞ্চাঙ্ক' না হইয়া এক হইতে চারি অঙ্কের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কবি-রচিত প্রায় নাটকগুলিতেই গান প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কবির "জীবন-স্মৃতি" পাঠে জানা যায়—"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনা-স্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুতঃ মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

কবির এই উক্তির মধ্যে নাটক রচনায় কোন্ দিকে তাঁহার মনের গতি তাহা টের পাওয়া যায়। কবির আদর্শবাদের স্পর্শ কমবেশী সব নাটকেই থাকাতে কতকগুলি নাটক একেবারে 'সঙ্কেতধর্ম্মী' (Symbolic) হইয়া পড়িয়াছে, যেমন—"ডাকঘর" (১৯১২) নাটক। এই নাটকখানি Maeterlinckএর "Blue Bird" নামে Symbolic নাটকের পূর্ব্বে রচিত হয়। এই Symbolic বা সঙ্কেতধর্ম্মী নাটক রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালায় রচনা করেন। ইয়োরোপের বেলজিয়ামের অধিবাসী Maeterlinck এই শ্রেণীর নাটক রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিলেও রবীন্দ্রনাথের রচনার পর তাঁহার রচনা আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের Symbolic নাটকগুলির মধ্যে "বাল্মীকি-প্রতিভা" (১৮৮০), "রুদ্র-চণ্ড" (১৮৮১), "ভগ্ন-হৃদয়" (১৮৮১), "নলিনী" (১৮৮৪), "কাল-মৃগয়া" (১৮৮৫) ও "প্রকৃতির-পরিশোধ" (১৮৮৫) উল্লেখযোগ্য। ইহার পরে Maeterlinckএর প্রথম Symbolic নাটকগুলি রচিত হয়। এইগুলি হইতেছে "Princess Maleine" (১৮৮৯), "The Blind" (১৮৯০), "The Intruder (১৮৯০), "The Seven Princess" (১৮৯১), "Pellees and Melisande" (১৮৯২) ইত্যাদি। উভয়ের এই জাতীয় প্রথম রচিত নাটকগুলির কাল পনের বৎসর। বিষয়বস্তুর দিক হইতে নাটকের শ্রেণী বিভাগে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য (পারিবারিক) ও সাঙ্কেতিক (Symbolic) প্রভৃতি নাটকসমূহের মধ্যে প্রায় সব শ্রেণীর নাটকই নাট্যকার-কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে বিশেষ করিয়া পৌরাণিক নাটক (যেমন 'চিত্রাঙ্গদা'), ঐতিহাসিক নাটক (যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ') ও সাঙ্কেতিক নাটক (যেমন 'রাজা', 'প্রকৃতির পরিশোধ' 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর') রচনায় মনোযোগী হইলেও শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ Symbolic নাটক রচনার দিকেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রকাশ-ভঙ্গীর (Form) দিকে 'গীতি-নাট্যই' সম্ভবতঃ তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল। এই জাতীয় নাটকের কতক পরিমাণে "যাত্রা-গানের" সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। তবে কবির গান, কাব্য ও সঙ্কেত মিশ্রিত নাটকগুলির জাতি বিচার করা একটু কঠিন ব্যাপার। তাঁহার অনেকগুলি তথাকথিত নাটক মাত্র, কথোপকথনের নাট্যরূপ (Dramatic Dialogue) বলা যাইতে পারে। নাট্যশাস্ত্রের (Dramaturgy) নিয়মানুযায়ী নানাবিষয়ের মধ্যে কবি 'আদর্শ' (Idealism) বা নৈতিক আদর্শ প্রচারেই অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য (তথা প্রাচ্য) নাট্যশাস্ত্রসম্মত Plot, Time, Structure, Character, Conflict, Event ও Action প্রভৃতির মধ্যে Characterএর দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিলেও Structure সংঠনে এবং বিশেষ করিয়া Actionএর বিবৃতিতে কবির বিশেষ শৈথিল্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাটকগুলিতে চরিত্র-চিত্রণ অত্যন্ত বাস্তবধর্ম্মী (realistic) ও গানগুলি অনবদ্য তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পাত্র-পাত্রীর বক্তৃতাগুলির মধ্যে কবি অনেক সময়েই নেপথ্যে না থাকিয়া নিজেকে ধরা দেওয়াতে নাট্যরস কতকটা ব্যাহত হইয়াছে। তবু বলা যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে Symbolic নাটকের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভার ফল।

কাব্য, কবিতা ও নাটক প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন প্রকার গদ্য রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতামালাতে এদেশের শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠন সম্পর্কে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন

তাহা চিরকাল এদেশীয় জনসমাজে সমাদৃত হইবে। কাব্য-সমালোচনাতে তিনি একরূপ তুলনা-রহিত। তাঁহার রচিত "কাব্যের উপেক্ষিতা" প্রবন্ধে 'রামায়ণের উর্ম্মিলা-চরিত্র বর্ণনা-মাধুর্য্যে, হৃদয়ের আবেদন ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে অতুলনীয় বলা যাইতে পারে। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন কাব্য সমালোচনাতে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ সম্ভবতঃ এদেশে আর কেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ছোট গল্পগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব্ব দান। চরিত্র বর্ণনা ও বিশ্লেষণে, হৃদয়ের স্পর্শে, মাধুর্য্যে, ভাব ও ভাষা-সম্পদে এবং রসসৃষ্টিতে এই ছোট গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। উদাহরণ স্বরূপ "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন", "গুপ্তধন", "কাবুলীওয়ালা" প্রভৃতি অনেক গল্পের নাম করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসগুলি কতিপয় সামাজিক প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে কবির চিন্তাধারার পরিচায়ক। ইহাদের গল্পগুলির পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়া যেন রবীন্দ্রনাথের নীতিমূলক বিশেষ মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারাও (ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি) তাঁহার চিত্তকে আংশিক প্রভাবিত করিয়াছে। সাহিত্য-রস অপেক্ষা লেখকের মতবাদগুলিই এই উপন্যাসসমূহে অধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার রচিত "গোরা", "চোখের বালি", "নৌকা-ডুবি", "রাজর্ষি" ও "বৌঠাকুরাণীর হাট" প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাঙ্গালা উপন্যাস-রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি অপেক্ষা নূতন ভাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন—এই জাতীয় সাহিত্যের পথপ্রদর্শক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির সুদীর্ঘ তালিকা দৃষ্টেই বুঝা যাইবে কোন্ জাতীয় রচনা এবং কোন্ ভাবসমৃদ্ধ রচনা কবির অধিক প্রিয় ছিল? কাব্য ও সঙ্গীতই কবির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মনে হয়। যে স্বরচিত কাব্যাদি কবির বিশেষ প্রিয় ছিল সেইগুলির এক একটি কখনও কাব্যে কখনও উপন্যাসে আবার কখনও নাটকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কতকগুলি স্বরচনার আবার ইংরেজীতে এবং পাশ্চাত্য নানা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে নিজেও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। কবির এই লেখা নানা ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গে লেখাগুলির নাম-পরিবর্ত্তন আংশিক পরিবর্ত্তন ও সংশোধন তো আছেই। "বৌঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাস ও "রাজা" নাটক ইহার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা নানাদিকে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধারে স্রষ্টা ও সমালোচক ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নানাপ্রকার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে "শিশু-সাহিত্য" অন্যতম এই "শিশু-সাহিত্য" রচনায় (যথা—'সহজ পাঠ', 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রভৃতি) কবির অপরিসীম দক্ষতা সর্ব্বজন-বিদিত। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ইংরেজ কবির কবিতার সাদৃশ্যমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য কবিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও কবিতার বাঙ্গালা ছন্দে অনুবাদও করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে Victor Hugo, Shakespeare, Shelley, Mrs. Browning, Moore, Marston, Webster, Aubre de Vere, Earnest Myers প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পাশ্চাত্য নানা গ্রন্থের অনুবাদ এই দেশে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব হইতেই রচিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক Shakespeare রচিত Macbeth নাটকের বাঙ্গালায় ছন্দানুবাদ (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে 'ভারতী'তে প্রকাশিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতের দিকে কবি কর্ত্তৃক কালিদাস-রচিত কুমার-সম্ভবের (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'ভারতী'তে প্রকাশিত) বাঙ্গালায় ছন্দানুবাদ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও ছন্দ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যকে বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন। কবিবর ভারতচন্দ্র (১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) বহু সংস্কৃত ছন্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত করেন এবং সুললিত ছন্দে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। কবিতার মধ্যে ভাষার লালিত্যে ভারতচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের তুল্য

সম্মানের অধিকারী। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন আর রবীন্দ্রনাথ নানারূপ নূতন নূতন ছন্দে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'গদ্য ছন্দ' ও 'গদ্য-কবিতা' রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রচলিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য রচনাকে নানা স্থানে কাব্য-সৌন্দর্য্য দান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও সেরূপ আছে। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কবিতার প্রকাশ-ভঙ্গীকে গদ্যের পর্য্যায়ে আনয়ন করিয়া বঙ্গভাষায় 'গদ্য-কবিতার' সৃষ্টি করেন। তিনি বাঙ্গালা গদ্যে ইংরেজী বাক্য গঠনরীতি (syntax) প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগিতা বা উৎসাহে প্রচলন করেন বলিয়া শুনা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গদ্য-রচনা রীতি সংস্কৃত ঘেঁষা ছিল, কিন্তু পরে তিনি ইংরেজীরীতি অনেক পরিমাণে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের কোন কোন শাখায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দেখিতে পাওয়া যায় না, বা অল্প আছে। তিনি ইচ্ছা করিয়াই "মহাকাব্য" রচনা করেন নাই অথবা হাস্যরসাত্মক ও শ্লেষাত্মক রচনাও অধিক রাখিয়া যান নাই। "গীতি-কবিতা" রচনার দিকেই তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। তবে বৈষ্ণবগীতি-কবিতা রচনায় বৈষ্ণবরস সৃষ্টিতে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। ইহা বৈষ্ণবভক্ত ও সাধকগণের অন্তরের কথা। "ভানুসিংহের ('ভানু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) পদাবলী" কবির অল্প বয়সের রচনা এবং ইহা বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের অনুকরণে রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ন্যায় হাসির গান অথবা সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক গান ও কবিতা রচনায় তত মনোযোগী না হইলেও আধ্যাত্মিক ও স্বদেশ-প্রেম বিষয়ক গান রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। অবশ্য স্বদেশ-প্রেমের দ্যোতক নাটক ও স্বদেশ প্রেমের গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকের গ্রাম-কেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের কুসংস্কার ও দুর্নীতির প্রতি কশাঘাত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (T. N. Mukherji) মহাশয় যে বাস্তব রসসমৃদ্ধ গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেরূপ গল্প খুব অল্পই আছে। এতদ্ভিন্ন আধুনিক কালে রাজশেখর বসু ("পরশুরাম")-রচিত "গড্ডলিকা" ও "কজ্জলী" এই দুইটি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থে এবং নানা গল্পে যে শ্রেণীর রস-রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ সে শ্রেণীর সাহিত্য বিশেষ রচনা করেন নাই। ভাবে ও ছন্দে সুকুমার রায়ের "আবোল-তাবোল" ও "খাই খাই" শিশু-সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এইরূপ রচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে ২০শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত (১৮৭২-১৯৪১ খৃঃ) প্রায় সত্তর বৎসর মধ্যে বহু কাব্য, কবিতা, ছড়া, নাটক, গল্প, উপন্যাস ও আরও নানাবিধ গদ্য, প্রবন্ধ এবং গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্য রবি-রশ্মিতে সমুদ্ভাসিত এবং ইহার ফলে এই সাহিত্য জগৎ-সভায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা বঙ্গ-জননীকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকই ছিলেন না—তিনি আরও বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কণ্ঠ-সঙ্গীত ও অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে চিত্রাঙ্কনেও পটুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সারা পৃথিবীর বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ব্যবহারিক জগতের রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বদেশ-সেবা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা ও প্রাণের টান ছিল। ১৯১৯ সালে জালিওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর কবির 'নাইট' উপাধি ত্যাগ এবং ১৯২১ সালে "বিশ্বভারতীর" প্রতিষ্ঠায় কবির স্বদেশ-প্রেমের ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একবার চীন ও জাপানের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। তখন জাপানী কবি নোগুচির সহিত পত্রালাপে উদার-হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চীনের প্রতি জাপানের আক্রমাত্মক মনোভাবের তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন। "স্বদেশী আন্দোলনের" সময় বাঙ্গালী জাতির 'বরিশাল-সম্মেলনে' কবিও তথায় গিয়াছিলেন এবং ইংরেজ রাজত্বের মন্দদিকটি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবির বিভিন্নকালের রচনার ও চিঠিপত্রের মধ্যে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক বিষয়েরও সমস্যার ছাপ পড়িয়াছে। এই জন্য সেই সময়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা "রবীন্দ্র-সাহিত্য" পাঠে অপরিহার্য্য মনে করা যাইতে পারে। এই মূল্যবান সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ও অনুসন্ধিৎসা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে নূতন পথ দেখাইয়া গৌরবান্বিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্মঘট

শ্রীমন্মথ রায়

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের প্রান্তভাগে রাজছত্র লিমিটেড নামক ছাতা ও ওয়াটার প্রুফের কারখানা অঞ্চলে রাজছত্র লিমিটেডের ক্লাব-ভবন—"মিলন-মন্দির"স্থ সভা কক্ষ। কক্ষটি প্রশস্ত। মধ্যভাগে একটি মঞ্চ রহিয়াছে। মঞ্চের উপর খানকয়েক চেয়ার রহিয়াছে এবং নীচে দুই পাশে বহু ফোল্ডিং চেয়ার সাজানো রহিয়াছে। কক্ষের বড় বড় জানালাগুলি উন্মুক্ত। প্রাচীর-গাত্রে ছাতা ও ওয়াটারপ্রুফের রঙ-বেরঙের নানা পোষ্টার শোভা পাইতেছে। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান দীনবন্ধু চৌধুরীর তৈলচিত্র এবং গান্ধী, জহরলাল, সুভাষচন্দ্রের সুদৃশ্য ছবি টানানো রহিয়াছে একটি প্ল্যাকার্ডে "সত্যমেব জয়তে"—আদর্শলিপি দেওয়াল-গাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। একটি বড় দেওয়াল-ঘড়ি সময় নির্দেশ করিতেছে।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসের এক সন্ধ্যা রাত্রে এই সভাকক্ষে কোম্পানীর শ্রমিকসংঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা-রত।

মঞ্চের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে,—কোম্পানীর চেয়ারম্যান—দীনবন্ধু চৌধুরী, ফ্যাক্টরী ম্যানেজার—লোহারাম দাস, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার—সুমঙ্গল সেন এবং আরো দুই একজন প্রধান কর্ম্মচারী। মঞ্চের নিম্নে শ্রমিক সংঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের মধ্যে যাহারা উপস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ওয়াটারপ্রুফ বিভাগের হেড মেকানিক্—জনার্দ্দন দত্ত, ছাতা বিভাগের হেড মেকানিক্—মহম্মদ ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের পুত্র—লাল মিঞা শ্রমিক সর্দ্দার—হারাণ দাস, আকবর মিঞা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিলন-মন্দির ক্লাব-ভবনের তত্ত্বাবধায়ক (care-taker) মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী মঞ্চের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ একটু অদ্ভুত ধরণের, হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান—এই তিন ধর্ম্মেরই ছাপ তাহার পোষাক-পরিচ্ছদে প্রতিভাত।

শ্রমিক সদস্যগণ ॥ (একযোগে)

"এ সব কথা আমরা জানি, কিন্তু ছাঁটাই করা চলবে না।"

"কাজকর্ম্মের অবস্থা ভালো নয়, এতো চিরকালের বুলি—চিরকালই শুনছি।"

যুদ্ধের বাজারে যখন লাখ-লাখ টাকা লাভ করেছেন, সেই অনুপাতে কি আমাদের মাইনে বেড়েছিল? তবে?"

"আমাদের এক কথা,—ছাঁটাই করা চলবে না, চলবে না।"

দীনবন্ধু চৌধুরী (চেয়ারম্যান) ॥ অর্ডার! অর্ডার!! চেঁচামেচি করলে কোনো আলোচনা চলে না।

গোলমাল থামিল।

তোমরা যার তত্ত্বাবধানে কাজ কর, যিনি কোম্পানীর অবস্থা এবং তোমাদের অবস্থা সবই জানেন,—ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীলোহারাম দাস, তিনি কী বলেন? তোমরা স্থির হ'য়ে শোনো। মিষ্টার দাস—

লোহারাম দাস ॥ মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং আমার প্রিয় সহকর্ম্মিগণ! আমাদের এই কোম্পানীর নামটা কি? রাজছত্র লিমিটেড্। বিবেচনা করুন, ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফ তৈরীর ব্যবসায়ে একদিন আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্যই ছিল। বিবেচনা করুন, এ ব্যবসায়ে রাজছত্র আমরাই এককাল ধারণ করেছি। কিন্তু গেল বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্যাঙের ছাতার মতোই অলি-গলিতেও গজিয়ে গেল সব ছাতার কোম্পানী। বিবেচনা করুন, তখন থেকেই সুরু হয়েছে আমাদের দুর্দ্দশা। বিবেচনা করুন, যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটও এসে গেছে এদেশে। বিবেচনা করুন, দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা কী সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে!

ইব্রাহিম॥ জানি স্যার, এসব কথা বলবেন জানি। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে লাখ লাখ টাকা মুনাফা হয়েছে, সেটাও বিবেচনা করুন।

জনার্দ্দন। সে অনুপাতে আমাদের বেতন আর ভাতা কোম্পানী বাড়াবার কথা বিবেচনা করেন নি।

লালমিঞা। হিয়ার, হিয়ার।

লোহারাম। কিন্তু কোম্পানী বলেন, যুদ্ধের পর থেকে এ কয়েক বছর ক্রমাগত যে লোকসান হয়েছে, সে লোকসান কোম্পানী মুখ বুজে ঘাড় পেতে স'য়ে গেছেন। বিবেচনা করুন, আপনাদের বেতন বা ভাতা সে জন্য কিছু কমাননি।

ইব্রাহিম। সে কথা মানছি। কিন্তু লড়াইএর বাজারে লাভ এতো করেছেন যে, দুধ তো দূরের কথা, এখনো জলেই হাত পড়েনি। না, না, ও ছাঁটাই-টাটাই চলবে না।

শ্রমিকগণ। (ঘন ঘন করতালি) ঠিক, ঠিক।

সুমঙ্গল সেন (লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার)। (চেয়ারম্যানের প্রতি) স্যার, আমি দু'একটা কথা বলতে পারি?

শ্রমিকগণ। না, না, আর বলবার কী আছে? ছাঁটাই-টাটাই চলবে না স্যার।

দীনবন্ধু। অর্ডার! অর্ডার!! (গোলমাল থামিল) তোমাদের শ্রমিক-কল্যাণ-কর্ত্তা শ্রীসুমঙ্গল সেন কিছু বলতে চান,—শোনো। বলুন মিষ্টার সেন—

সুমঙ্গল। লোকসানের বছরেও কোম্পানী বেতন আর ভাতা কমাননি। বরং আমি বলবো, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা বেড়েছে।

শ্রমিকগণ। (ব্যঙ্গহাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ!

কোন কোন শ্রমিক। (ব্যঙ্গ সহকারে) বলুন, বলুন। প্রাণ যা চায় বলুন।

লালমিঞা। হ্যাঁ, মুখের ওপর তো আর ট্যাক্সো নেই। বলুন—

সুমঙ্গল। হ্যাঁ বলবো। কেন বলবো না? এই যে "মিলন-মন্দির"—যে ক্লাবঘরে বসে আপনারা সভা করছেন,—এতোবড় এই বিল্ডিংটা। একটা কলোনী করে দিয়ে তাতে আপনাদের বসবাসের জন্যে কোয়ার্টার্স ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

লালমিঞা। হ্যাঁ, কতকগুলো পায়রার খোপ।

সুমঙ্গল। তবু মাথা গুজবার ঠাঁই,—আজকাল লোকে যা পায় না। ধর্ম্মকর্ম্মের জন্যে কলোনীতে একটা মন্দির, একটা মসজিদ। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে একটা ফ্রী প্রাইমারী স্কুল। নিরক্ষর বয়স্কদের জন্যে একটা Adult Education centre। একটা দাতব্য ডাক্তারখানা—

লালমিঞা। হোমিওপ্যাথিক! (সকলে হাসিয়া ওঠে)

সুমঙ্গল। এ সব কোম্পানী নিজের খরচায় গড়ে দেন নি?—যার সুখ-সুবিধা আপনারা ষোলআনা ভোগ করছেন।

হারাণ। তা' অবিশ্যি দিয়েছেন। কিন্তু প্রসূতি-সদনটা? কদ্দিন থেকে আমরা চাইছি। কোম্পানী স্পষ্ট 'না' বলে দিয়েছে। কোম্পানী চান না যে, আমাদের ছেলে-মেয়ে ভালোভাবে হোক্। কোম্পানীর মতলব শ্রমিকের বাচ্চাগুলো আঁতুড়েই শেষ হয়ে যাক।

লালমিঞা। সেম্! সেম্।

হারাণ। কিন্তু শকুনের শাপে গরু মরে না। আমাদের বাচ্চারাও মরবে না। আমরা নিজেরাই প্রসূতি-সদন গড়ে তুলবো। আমাদের ইব্রাহিম সর্দ্দারের সোণার চাঁদ ছেলে—এই লালমিঞা, সেজন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে "মহুয়া" পালা গানের টিকিট বিক্রী করে টাকা তুলছে। শ্রমিকের বংশবৃদ্ধি ধনিক রোধ করতে পারবে না—পারবে না।

জনার্দ্দন। আঃ থামো হারাণ। এ সব বাজে কথা রাখো। আমাদের দাবী—কোন ক্রমেই ছাঁটাই করা চলবে না। একজন শ্রমিকও যদি ছাঁটাই হয়, তাহলে আমরা ধর্ম্মঘট করবো।

সকলে। আমরা ধর্ম্মঘট করবো—আমরা ধর্ম্মঘট করবো।

দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীনবন্ধু। অর্ডার! অর্ডার!! (গোলমাল থামিল) এবার আমি কিছু বলতে চাই,—তোমরা স্থির হয়ে শোনো। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে সামান্য মূলধন নিয়ে আমি দীনবন্ধু চৌধুরী একা ছাতা তৈরী

ব্যবসাতে নেমেছিলাম। সেদিন যে সব শ্রমিকরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, আনন্দের কথা—আজও তাদের প্রায় সকলেই আমার সঙ্গেই আছে। শুধু আছে বলবো না, কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে ছিল সামান্ত শ্রমিক, সে হয়েছে আজ এক এক বিভাগের মাথা। যেমন—ওয়াটার প্রুফ বিভাগের হেড মেকানিক্ ওই জনার্দ্দন দত্ত, ছাতা তৈরী বিভাগের হেড মেকানিক্ ওই মহম্মদ ইব্রাহিম। এ কথা খুবই সত্য, এতোকাল আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই এতো ঝড়-ঝাপটা সয়েও আজও আমরা টিকে আছি। একথা আমি ভুলবো না,—ভুলতে পারি না। কিন্তু কোম্পানীর সামনে আজ চরম সংকট এসে দাঁড়িয়েছে। আয়-ব্যয়ের ছাপানো হিসাব তোমরা দেখেছো। বছরের পর বছর লোকসান সয়েও আমরা আজ পর্য্যন্ত একজন শ্রমিকও ছাঁটাই করিনি, যখন কারখানায় কারখানায় ছাটাই হচ্ছে অথবা হবে ঠিক হয়েছে।

আকবর। চেয়ারম্যান সাহেবের জয় হোক্। দোহাই আপনার, আপনি ছাঁটাই করবেন না। বাল-বাচ্চা নিয়ে আমরা তবে কী খাবো? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?

দীনবন্ধু। আমি জানি, আমি বুঝি। আমারও বাল-বাচ্চা আছে। কিন্তু উপায় কী? যে ছাতা, যে বর্ষাতি গুদামে এখনো মজুত রয়েছে,—বাজারে আজ যা' চাহিদা তা' দুবছরেও কাটবে কিনা সন্দেহ। নতুন অর্ডার পাচ্ছি না। কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করাই আজ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ছাঁটাই করে কোম্পানীটাকে ধরে রাখা যায় কিনা আমরা সেই কথাই ভাবছিলাম। কোম্পানী উঠে গেলে সবই গেল।

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। কোম্পানী যদি উঠে যায়, আমরাও যাবো। একসঙ্গে শুরু করেছিলাম, এক সঙ্গেই শেষ হবো।

জনার্দ্দন। যদি যাই, সব এক সঙ্গেই যাবো। ছাটাই চলবে না।

সকলে। হ্যাঁ ছাঁটাই চলবে না।

দীনবন্ধু। বেশ, আরো বছরখানেক হয়তো আমরা লড়তে পারি, যদি তোমরা সকলে আর একটু বেশী মেহনত কর, ছাতা তৈরী, ওয়াটার প্রুফ তৈরী ছাড়াও যদি আর একটা কাজ হাতে নাও।

আকবর ও হারাণ। আমরা নেবো, আমরা নেবো।

জনার্দ্দন। কী কাজ?

দীনবন্ধু॥ দশহাজার লাঠি—বাঁশের লাঠি।

শ্রমিকগণ। (সবিস্ময়ে) লাঠি

দীন। হ্যাঁ, ছাতার বাঁট তৈরী করার জন্তে বাঁশের কারবারতো আমাদের আছেই। কাজেই দশহাজার লাঠির অর্ডার সাপ্লাই করা আমাদের পক্ষে খুব দুঃসাধ্য নয়।

ইব্রাহিম। দশহাজার লাঠির অর্ডার। কার?

দীন। চুক্তি আছে—সেটা গোপন থাকবে।

ইব্রাহিম। পুলিশের লাঠি,—কী বলুন তার?

লালমিঞা। শ্রমিক ঠ্যাঙাবার লাওয়াই নয় তো?

দীন। এ সব কথা উঠছে না। ওঠা উচিতও নয় কার অর্ডার তা' নিয়ে তোমাদের এতো মাথাব্যথা কেন?

জনৈক শ্রমিক। মাথাটা ফাটবার ভয় আছে কিনা তার।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

দীন। অর্ডার। অর্ডার॥

লোহারাম। বিবেচনা করুন, যখন জীবন-মরণের কথা হচ্ছে, তখন আমাদের এ হাসাহাসিটা শোভা পায় না।

সুমঙ্গল এই অর্ডার সাপ্লাই করার ওপরেই ছাঁটাই-এর প্রশ্ন নির্ভর করছে। এটা হাস্ত-পরিহাসের বিষয় নয়। শ্রমিক-মঙ্গলের সহিত জড়িত।

জনার্দ্দন। (শ্রমিকদের প্রতি তোমরা থামো। (চেয়ারম্যানের প্রতি) আপনি বলুন।

দীন। এই দশহাজার বাঁশের লাঠি এক মাসের মধ্যে সাপ্লাই দিতে হবে। এজন্ত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এতো মাল তৈরী করতে গেলে তোমাদের হপ্তায় ৪৫ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে।

জনার্দ্দন। ৪৫ ঘণ্টার জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা?

দীদবন্ধু। হ্যাঁ, তা না হলে কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে

যাবে। ভুলো না, এই কোম্পানীকে তোমাদের নিয়ে টিকে থাকতে হলে এই অর্ডার সাপ্লাইটা অপরিহার্য্য। ছাঁটাই করা না করা এখন তোমাদের ওপরেই নির্ভর করছে।

ইব্রাহিম। এই বাড়তি ঘণ্টার জন্যে আমরা বাড়তি মজুরী পাবোতো?

দীন। না, কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থায় বাড়তি মজুরী দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জনার্দ্দন। বাড়তি কাজ করবো, অথচ বাড়তি মজুরী পাবো না?

দীন। অবশ্য ছাঁটাই করে সেটা দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।

দীনবন্ধু। এখন তোমাদের সামনে এই দুটো পথ খোলা রয়েছে,—হয় ছাঁটাই, না হয় বাড়তি মজুরী ছাড়া বাড়তি কাজ। এর যে-কোনো একটা তোমরা বেছে নাও।

হারাণ। ছাঁটাই-এর চেয়ে বাড়তি কাজটাই ভালো। নাইবা পেলুম বাড়তি মজুরী। চাকরীটাতো থাকবে।

আকবর। তা বটে। তা বটে!!

ইব্রাহিম। না, তা' হ'বে না। ওই দুটোর কোনটাই চলবে না। ছাঁটাই-এর ভয় দেখিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নিয়ে বাড়তি মজুরী না দেবার মালিকদের এটা একটা ফিকির—এ আমরা বুঝি।

লালমিঞা। সেম্। সেম্!!

দীনবন্ধু। অর্ডার। অর্ডার!! আমার যা বলবার—বলেছি। এবার তোমাদের যা' বলবার আছে, তোমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে আমাকে লিখিতভাবে আজই জানিয়ে দাও। কাল কলকাতায় আমাদের বোর্ডের মিটিং-এ সেটা আলোচনা করা হবে।

জনার্দ্দন। বেশ, তাই আমরা জানাবো। খেলার মাঠে আমাদেরও শ্রমিক জমায়েৎ হয়েছে আজ। আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। আপনাদের বক্তব্য আমরা সেখানে গিয়ে পেশ করছি। আমাদের সাধারণ সভায় যা সিদ্ধান্ত হয়, আপনাকে লিখিতভাবেই তা' জানাচ্ছি। কোথায় জানাবো?

দীনবন্ধু। (লোহারামের প্রতি) মিলন-মন্দিরে আজ আর কী কী প্রোগ্রাম আছে? কেয়ার-টেকার কোথায়?

মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী ছুটিয়া আসিল। দেহটিকে Right angleএ সন্নিবেশ করিয়া হাত দুইখানি সম্মুখে সমান্তরালে প্রসারিত করিয়া চেয়ারম্যানকে অভিবাদন জানাইয়া স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো চট্ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

নটবর। ইয়েস্ স্যার।

দীনবন্ধু। (লোহারামের প্রতি) ইনি কে?

লোহারাম। আমাদের নতুন কেয়ার-টেকার—নটবর।

দীনবন্ধু। নটবর গোস্বামী?

নটবর। আজ্ঞে হ্যাঁ, ও গোস্বামীও বলতে পারেন—উইলিয়ামও বলতে পারেন—আবার মহম্মদও বলতে পারেন।

লালমিঞা। যাকে বলে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় স্যার।

লোহারাম। বিবেচনা করুন, নামে কী আসে যায়? লোকটি কাজে খুব ভালো। এই অল্পসময়ের মধ্যে—বিবেচনা করুন, এই মিলন-মন্দিরের অনেক উন্নতি করে দিয়েছেন—বলুন মিষ্টার গোস্বামী, মিলন-মন্দিরে আজ আর কী কী প্রোগ্রাম আছে। সায়েব জানতে চাইছেন।

নটবর। এই সভা ভাঙলেই এখানে হবে "মহুয়া" পালা-গানের ড্রেস্ রিহার্সাল।

দীনবন্ধু। সেটা আবার কী? কারা করছে?

লালমিঞা। পালাগানটা করছি আমরা—শ্রমিকদেরই ছেলে-মেয়েরা। যে প্রসূতি-সদন আপনাদেরই তৈরী করে দেওয়া উচিত ছিল স্যার,—অথচ দিলেন না, সেই প্রসূতি-সদন গড়ে তোলবার জন্যে আমরা এই অভিনয়ের আয়োজন করছি। সহরের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে আমরা টিকেট বিক্রী করেছি। সকলে একবাক্যে আমাদের সাধুবাদ করেছেন আর আপনাদের দিয়েছেন ধিক্কার।

দীনবন্ধু। তা দিন। তবুও আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাঁরা এমন একটা সৎকার্য্যের জন্যে টিকেট কিনে অর্থ সাহায্য করেছেন। কোম্পানীর তরফ থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছু করতে পারিনি বলে আমি বিশেষ

দুঃখিত। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে একশো টাকার একখানা টিকেট কিনছি।

লাল। সেতো আমরা আপনাকে দিতে পারবো না স্যার।

দীনবন্ধু। কেন ?

লাল। পাঁচটাকার বেশী আমাদের টিকিট নেই।

দীনবন্ধু। ও—তা' একশো টাকার যে ক'খানা হব তাই।

লোহারাম। Donation আর কি—সাহেব Donation দিচ্ছেন।

দীনবন্ধু। হ্যাঁ (নটবরের প্রতি) তারপর—মিষ্টার মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী ? এই রিহার্স্যালের পর এখানে আর কী প্রোগ্রাম ?

নটবর। আজ আর কিছু নেই স্যার ?

দীনবন্ধু। (লোহারামের প্রতি) বেশ ততক্ষণে তোমাদের ডিনার-পার্টিও বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে—কী বল দাস ?

লোহারাম। হ্যাঁ স্যার, তা হবে।

দীনবন্ধু। (শ্রমিকদের প্রতি) পালাগানের রিহার্স্যালের পর আবার আমরা এই "মিলন-মন্দিরে"ই সমবেত হবো এবং আশা করি তোমাদের কাছ থেকে যে উত্তর পাবো, তাতে আমাদের মিলনের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবে। এখনকার মতো সভা ভঙ্গ।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া যাইবার জন্ত উদ্যত হইল। শ্রমিকগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আলাপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে হারাণ লালমিঞাকে বলিল।—

হারাণ। কী হে লালমিঞা, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাবে না ? এসো।

লালমিঞা। (চেয়ারম্যানকে দেখাইয়া) একশো টাকা দেবেন বলেছেন।

হারাণ। তা, দেবেন তো—দেবেনই।

লালমিঞা। না, ওরকম অনেক বলেন—কিন্তু দেন না, তাই দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা যান না—মিটিং করুন। আমরা হচ্ছি গিয়ে সব soldiers—যা হুকুম হবে, তামিল করবো।

হারাণ। ও—আচ্ছা।

হারাণ চলিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ততক্ষণে নীচে অবতরণ করিয়াছে। দীনবন্ধু ও লোহারাম ব্যতীত তাহারাও চলিয়া গেল। লালমিঞা দীনবন্ধুর সামনে গিয়া টিকেটের খাতা পকেট হইতে বাহির করিল।

লালমিঞা। একশো টাকার একখানা টিকিট নেবেন বলেছিলেন স্যার।

দীনবন্ধু। (লোহারামকে) মিষ্টার দাস, আমার অ্যাকাউণ্ট থেকে টাকাটা দিয়ে দেবেন।

(লালমিঞার নিকট হইতে টিকেটটি লইয়া) মহুয়া। ব্যাপারটি কী বল তো ? কার লেখা—বঙ্কিম বাবুর ?

লালমিঞা। আজ্ঞে না বঙ্কিম বাবু তখনও জন্মান নি। সাড়ে তিন শো বছর আগে পূর্ববঙ্গের দ্বিজ কানাই নামে এক পল্লী-কবি এই "মহুয়া" পালাটা লেখেন। হুমড়া নামে এক বেদে দল-বল নিয়ে নদেরচাঁদ নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ী খেলা দেখাতে আসে। হুমড়ার পালিতা কন্যা মহুয়ার খেলা দেখে নদেরচাঁদ মহুয়াকে বিয়ে করবার জন্তে ক্ষেপে যায়।

দীনবন্ধু। Very interesting ! বিয়ে হলো ?

লালমিঞা। না স্যার। মহুয়া রাজী হলো, কিন্তু হুমড়া বেঁকে বসলো। বললে,—বেদে—বেদে, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ। তেলে-জলে কখনো মিল খায় না।

দীনবন্ধু। Thank's right !

লোহারাম। বিবেচনা করুন, হিন্দু-মুসলমান আর কি। কিন্তু স্যার, পার্টিতে যাবার সময় হয়ে এলো।

দীনবন্ধু। আচ্ছা যদি কখনও সময় করতে পারি, তোমাদের পালাগান শুনতে আসবো। হ্যাঁ, তোমাদের পালাগানটা কবে।

লালমিঞা। পরশু রবিবার।

দীন। আচ্ছা, আসবো আসবো—

লাল। ভুলবেন না স্যার। আচ্ছা—আদাব কেয়ার-টেকার স্যার—

নটবর। (কাছে ছুটিয়া আসিয়া) বলুন স্যার বলুন।

লাল। আজ আমাদের পোষাক পরে রিহার্স্যাল হবে। লাইটগুলো সব ঠিক আছে তো?

নটবর। সে আর বলতে হবে না স্যার। সে যা করেছি, তাক্ লাগিয়ে দোব।

লাল মিঞা। তাক্ দুভাবেই লাগতে পারেন—কিছু করে অথবা কিছু না করে। দেখা যাক্।

লালমিঞা মঞ্চের পার্শ্বে অবস্থিত কক্ষের অভিমুখে চলিয়া গেল।

দীনবন্ধু দেওয়ালের ছবি ও পোষ্টারগুলি দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। নটবর ইহাতে খুব উৎসাহী ও তৎপর হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দীনবন্ধুর নিকটে গেল।

দীনবন্ধু। (নটবরের প্রতি) এই সব ছবি-টবি আগে ছিল না। কিন্তু এ বেশ হয়েছে।

নটবর। আমার একরম অনেক পরিকল্পনা আছে স্যার। একটা পোষ্টার করাচ্ছি যে, ছাতা যে কেবল রোদ আর বৃষ্টি থেকে বাঁচায়, তা নয়—পাওনাদারও ঠেকায়। হ্যাঁ, এক সময় আমাকেও ঠেকিয়েছে।

দিনবন্ধু। বেশ, বেশ। এতো নতুন idea হে নতুন angle থেকে।

নটবর। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ সব আপনাকে দেখতে হবে না। দেখবেন, রাজছত্র কোম্পানীর গৌরবময় গোটা ইতিহাসটাই আমি ছবিতে আর চার্টে বলে টাঙিয়ে দেবো স্যার।

দীনবন্ধু। বেশ, বেশ। কিন্তু আপনার এই গৌরবময় নামটির ইতিহাসটা কী বলুন দেখি. শুনি।

নটবর। মানে স্যার, সাত ঘাটের জল খেয়েছি। গল্পের মতো একটা করুণ কাহিনী।

দীন। বটে?

নটবর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীন। শুনতে পাই?

নটবর। নিশ্চয় স্যার। বৈরাগীর ঘরে জন্মেছিলাম। বড় গরীব ছিলাম, কিন্তু খুব ভালো কীর্ত্তন গাইতে পারতাম। একদিন এক মিশনারী সাহেব আমার গান শুনে মোহিত হয়ে আমায় ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর চার্চ্চে।

দীন। ছিলেন বৈরাগী,—হলেন খৃষ্টান?

নটবর। আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিলুম নটবর বৈরাগী,—হয়ে গেলাম উইলিয়াম। ভাত-কাপড়ের দুঃখ গেল। বেশ ভালোই ছিলাম। কিন্তু তারপর—(মাথা নিচু করিল)

দীন। হ্যাঁ তারপর? থামলেন যে?

নটবর। তারপর—মানে—বয়স যখন একটু বাড়লো—তখন—মানে—(লোহারামের প্রতি) আপনি তো জানেন, আপনিই বলুন স্যার।

লোহারাম। তারপর একটু কেলেঙ্কারী ব্যাপার—মানে, বিবেচনা করুন স্যার, একটি মুসলমান বিধবার প্রণয়াসক্ত হয়ে,—বিবেচনা করুন, মুসলমান হ'তেই হলো।

দীন। বিধবার প্রণয়াসক্ত।

নটবর। না, না, বিয়ে হলো স্যার?

দীন। (হাসিয়া উঠিয়া) ও-আচ্ছা, আচ্ছা, তা' থেকে হলেন মহম্মদ। তা' মহম্মদ হলো—উইলিয়াম হলো—এখন বাকী থাকলো গোস্বামী। তা—তারপর?

নটবর। তারপর স্যার, এলো ছ'চল্লিশের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। আমাদেরই এক হিন্দু চাকর,—যাকে আমরা ছেলের মত মানুষ করেছিলাম, ছেলের মতই দেখতাম, সে কিনা আমার চোখের সামনে আমার বিবিকে কচুকাটা করলে দলবল ডেকে এনে। ধন-সম্পত্তি যা ছিল, সব লুট হলো। আমি শুদ্ধি হ'য়ে কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেলাম,—হয়ে গেলাম গোস্বামী। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া একবার বাধলে,—আমি দেখছি, কারুর কোন জ্ঞান থাকে না স্যার। দয়া, মায়া, ভালবাসা সব চলে যায়। সবাই পশু হ'য়ে যায়।

দীন। (একটি নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া) ঠিক, ঠিক! তুমি ঠিক বলেছো। ইংরেজ এই ঝগড়াটা চালু রেখেই এতোকাল রাজত্ব করতে পেরেছিল।

(ইতিমধ্যে মহুয়ার সাজে সজ্জিতা মায়া এবং নদের-চাঁদের সাজে সজ্জিত লালমিঞা পার্শ্বকক্ষ হইতে বাহির হইয়া দীনবন্ধুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদের দেখিয়া দীনবন্ধু বলিল,)—

দীন। ও বাবা! এরা আবার কারা?

লোহারাম। বিবেচনা করুন, চিনতে পারছেন না স্যার? লালমিঞা—নদেরচাঁদ সেজেছে। আর এ হলো গিয়ে মায়া, আমাদের ওয়াটারপ্রুফ্ ডিপার্টমেন্টের হেড মেকানিক্ জনার্দ্দন দত্তের মেয়ে—মহুয়া সেজেছে।

দীন। বাঃ! বেশ তো!

(মায়া নমস্কার করিল)।

লালমিঞা। আমাদের পালাগান শুনতে সময় করে আসবেন—এ ভরসা আমরা রাখি না। পোষাক পরেই এখনি আমরা রিহার্স্যাল দোব। দলের সবাই অই বলছে, যদি সময় করে আজই দেখে যেতেন, একশো টাকার টিকিটটার অন্ততঃ কিছু উশুল হতো।

দীন। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আজ কিছুতেই পারছি না। আসবো—প্লের দিন আমি নিশ্চয়ই আসবো।

লালমিঞা। সেই ভালো স্যার। এসো মায়া—

(মায়াকে লইয়া লালমিঞা পুনরায় পার্শ্বকক্ষে চলিয়া গেলে দীনবন্ধু লোহারামকে বলিল—

দীনবন্ধু। এখানকার মেয়েরা দেখছি বেশ ফরওয়ার্ড।

লোহারাম। বিবেবচনা করুন, সবাই নয়। তবে হ্যাঁ, ওই মেয়েটি একটু বেশীরকম ফরওয়ার্ড। মানে, বাপের শাসন নেই। বিবেচনা করুন, এ জন্তে অনেক কেলেঙ্কারীও হচ্ছে—মানে, ঐ লালমিঞার সঙ্গে।

দীনবন্ধু। বিয়ে-টিয়ে হবে নাকি?

লোহারাম। বিবেচনা করুন, ওদের দুজনের যেরকম মেলা-মেশা,—আর কানাঘুষো যা' শুনি, বিয়ে বোধ হয় হয়েই গেছে,—তবে গোপনে।

দীনবন্ধু। কেন, গোপনে কেন?

লোহারাম। জনার্দ্দন লোকটা ভারী গোঁড়া—সইবে না। বিবেচনা করুন, প্রকাশ হলে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।

দীনবন্ধু। দাঙ্গা? বটে!

দীনবন্ধুর মুখে ভাবান্তর দেখা গেল।

নটবর। হ্যাঁ সার। আপনাকে তো বলছিলাম, তখন আর কোন জ্ঞান থাকে না,—সব পশু হয়ে যায়।

দীনবন্ধু। আমি জানি—আমি জানি। সবাই জানে কিন্তু মজা এই,—কথাটা আবার সব সময়ে মনে থাকে না। চল দাস—ও হ্যাঁ, আমার ব্যাগ আর ওয়াটারপ্রুফটা?

নটবর। আমি নিচ্ছি স্যার।

মঞ্চের উপর টেবিলে জিনিষ দুইটি ছিল।

নটবর সেই দিকে ছুটিল।

দীনবন্ধু। নাঃ, লোকটা বেশ জ্ঞানী। বেশ একটা দামী কথা মনে করিয়ে দিয়েছে হে। তোমার সেই দালাল দুটি ঠিক আছে তে?

লোহারাম। রীতিমত টাকা খাচ্ছে,—বিবেচনা করুন, কেন ঠিক থাকবে না? ওদের তো দেখলেন, স্ট্রাইকারদের পক্ষে কেমন গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে। বিবেচনা করুন, ওই আকবর মিঞা আর হারাণ বিশ্বেস্।

দীনবন্ধু। কিন্তু বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। ওই করেই সব ধরা পড়ে।

ইতিমধ্যে নটবর উক্ত জিনিষ দুইটি লইয়া আসিয়াছে।

তাহার হাত হইতে ওই দুইটি লইয়া দীনবন্ধু বলিল,—

দীনবন্ধু। Thanks! তোমার সঙ্গে আলাপ করে বেশ খুসী হলুম।

নটবর। নিজের জীবনের অনেক বাজে কথা বলে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করেছি। ক্ষমা করবেন স্যার।

দীনবন্ধু। না, না, এ তোমার একার জীবনের কথা নয়। হিন্দু-মুসলমান—এ দুটো জাতের মধ্যে বিরোধ লাগাতে পেরেছিল বলেই তো ইংরেজ রাজত্ব করে গেল এতোকাল—এতো বড় দেশটায়। ওদের নীতিই ছিল—Divide and Rule! অথচ ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা ভুলে যাই। এসো দাস—আমার খাস্কামরায় এসো।

সকলে যাইতে উদ্যত হইল।

যবনিকা নামিল। [ক্রমশঃ

মনসা মঙ্গল

শ্রীমতী পুষ্প বসু

আমাদের দেশ ধার্ম্মিকের দেশ—ভক্তের দেশ। এখানে ছত্রিশ কোটি দেবদেবী ছত্রিশ জাতের মধ্যে নানা ভাবে পূজিত ও সমাদৃত হয়ে থাকেন। গীত, চণ্ডী, বিরাট, রামলীলা, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, কীর্ত্তন, পাঠ ও কথকথার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরিত করে—আমরা এ থেকে সান্ত্বনা পাই, প্রেরণা পাই, উপকৃত হই। আমাদের কাব্যে, সাহিত্যে, গাথায় এর বহু উদাহরণ আছে। এগুলি বহু পুরাতন এবং বহু ভক্তি ও বিশ্বাসের ফল।

"মনসা মঙ্গল" অথবা "পদ্মপুরাণ" এই ধরণেরই ধর্ম্ম-মূলক অতি প্রাচীন একটি মহাকাব্য। বাংলা দেশের প্রধানতঃ বর্দ্ধমান জেলায় এবং পূর্ব্ববঙ্গে—ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই গ্রন্থের সমাদর অত্যন্ত বেশী ছিল। এই দেবলীলার উপাখ্যানযুক্ত কাব্যখানি তালপাতায় অথবা তুলট কাগজে লিখে জনসাধারণ নিজেদের মঙ্গল কামনায় মানসিক করে—চণ্ডী, শিবকীর্ত্তন ও সত্যনারায়ণের ব্রতকথার মত মনসার গান দিয়ে থাকেন। চলতি ভাষায় এই গানকে "রয়ানী" বলে। এখনও বহু জায়গায় শ্রাবণ মাসের ১লা তারিখ থেকে শেষ তারিখ পর্য্যন্ত এক মাস ধরে অনেক হিন্দুর ঘরে ঘরে এই কাহিনী পড়া হয়ে থাকে, এবং অনেক ঘরে এই গ্রন্থ বিগ্রহের মত পূজিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে "মনসা মঙ্গল"-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রায় চারশ বছরেরও আগে ১৪১৬ শকে বাখরগঞ্জ জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের ভক্ত ও সাধক কবি বিজয় গুপ্ত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মহাকাব্য রচনা করেন। তখনকার বাংলা ভাষা এখনকার মত যে পরিপুষ্ট ও বিশুদ্ধ ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তখন অত্যন্ত সাধারণ অলঙ্কার ও অতি সামান্য পরিচ্ছদই বাঙ্গলা ভাষার সাজগোজের উপকরণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে অপ্রশস্ত বাংলা ভাষার সেই তমসাচ্ছন্ন যুগের তুলনাই হয় না। এই সময়ে মহাত্মা বিজয় গুপ্ত ঈশ্বরপ্রেম, স্ত্রীলোকের স্বামিভক্তি, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের আদর্শস্বরূপ এই পবিত্র "মনসা মঙ্গলে" সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচনা করেন। সত্যি কথা বলতে কাব্যে এত বড় প্রাচীন বই সে সময়ে আর ছিল না বললেই হয়। এই বইখানি ২২টি পালা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এর ভাষা বহু জায়গায় গ্রাম্যদোষ দুষ্ট হলেও, রস, ভাব ও কাহিনী বিশেষ উপভোগ্য। ভাষা ও ছন্দের কথা বাদ দিয়েও ভক্তি রসের প্রাধান্যই "মনসা মঙ্গল"কে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্ম পুস্তকের অন্যতম করে রেখেছে।

"মনসামঙ্গলের" মধ্যে পদ্মার বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে বলে সাধারণতঃ একে "পদ্মপুরাণ" বলা হয়ে থাকে। বহু ভক্তজনের মধ্যে এমন বিশ্বাস আছে যে পদ্মপুরাণ ঘরে থাকলে সেঘরে আগুন লাগে না; যাত্রাপথে মানুষের সঙ্গে থাকলে তার কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। বিজয়গুপ্তের পরবর্ত্তীকালে এই "মনসামঙ্গল"কে অবলম্বন করে বহু পণ্ডিত, ধর্ম্মাত্মা, কবিকার "মনসার ভাসান", "বেহুলার গান" ও "রয়ানী" লিখে গেছেন।

বিজয়গুপ্তের এই "মনসামঙ্গল" রচনা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। মনসাদেবীর কৃপায় আদিষ্ট বিজয়গুপ্ত দিনের পর দিন একটি প্রকাণ্ড ছাতিম গাছের তলায় বসে মনসাদেবীর এই কাব্যকথা শেষ করে, তাঁর মামা কবি ত্রিলোচন দাসকে লেখাগুলি দেখে দিতে বলেন। ভাগনের অনুরোধে ত্রিলোচন দাস একদিন যখন ঐ লেখাগুলি সংশোধন করছেন, তখন তাঁদের পুরোহিতের একটি অল্প বয়েসী মেয়ে এসে তাঁকে প্রশ্ন করে: তিনি কি করছেন? উত্তরে ত্রিলোচন দাস বলেন, তিনি বিজয়গুপ্তের 'মনসার পাঁচালী' সংশোধন করে দিচ্ছেন। এতে মেয়েটী গম্ভীরভাবে বলে যে,—এতে

তাঁর হাত দেবার প্রয়োজন নেই, বিজয়গুপ্ত যা লিখেছেন তাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এই কথা বলেই মেয়েটি অন্তর্দ্ধান হয়। তখন ত্রিলোচন দাস অশিক্ষিত ছোট একটি মেয়ের এই কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হন, এবং খোঁজ নিয়ে জানেন যে, উক্ত পুরোহিতের মেয়ে চার পাঁচ মাস হল শ্বশুরবাড়ীতে আছে। এই ঘটনা থেকে তিনি বোঝেন যে এ সবই মনসার কাজ, অতএব পাণ্ডুলিপিখানি তিনি আর সংশোধন না করেই বিজয়গুপ্তকে ফেরত দেন খুব ভাল হয়েছে বলে।

প্রধানতঃ মনসাদেবীর কোপে পড়ে চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের যে বিপর্য্যয় ঘটে সেই কাহিনীই "মনসামঙ্গলের" কাহিনী। নাগকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা দেবাদিদেব শঙ্করের অংশসম্ভূতা শক্তিশালিনী দেবী। তাঁর কোপানলে পড়ে চাঁদসদাগর ছ'ছেলে হারান, নিজে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে আপ্রাণ যুদ্ধ করে দেবীর কাছে যে পরাভব স্বীকার করেন; তা এক অপূর্ব্ব ঘটনা। সতী পতিগতপ্রাণা চাঁদসদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাবার জন্য এই উপাখ্যানের মধ্যে যে অংশ গ্রহণ করেন—তাও এক শিক্ষণীয় রোমাঞ্চকর কাহিনী। এই কাহিনীর তাৎপর্য্য আজও বাংলার ঘরে ঘরে অনুভূত হয়—মনসা-পঞ্চমীর মধ্যে—মনসামঙ্গলের গানের মধ্যে।

মোটামোটি মনসামঙ্গলের গল্পটি বলি:

একদিন দেবাদিদেব মহাদেব পদ্মবনের ধারে বেড়াতে-বেড়াতে মানস করলেন এক অপূর্ব্ব শক্তিময়ী লাবণ্যবতী কন্যার। তৎক্ষণাৎ পদ্মের ভেতর থেকে এক কন্যা আবির্ভূত হলেন। মহাদেবের মানস-কন্যা বলে এঁর নাম হল মনসা এবং পদ্মের ভেতর থেকে জন্ম বলে আর এক নাম হল পদ্মা। এই দেবী হলেন সর্পকুলের অধীশ্বরী সেইজন্য অন্য একটি নাম বিষহরি।

দেবী মনসা পিতা মহেশ্বরের কাছে বর প্রার্থনা করলেন, যেন পৃথিবীতে ঘরে ঘরে তাঁর পূজা হয়।

মহাদেব বল্লেন, "তথাস্তু", কিন্তু মহাদেব আরও বল্লেন, মা তোমার পূজা সম্পূর্ণ হবে—চাঁদসদাগর যদি তোমার পূজা করেন। কারণ সে শঙ্করীর মহাভক্ত। শঙ্করী তার ইষ্টদেবী। শঙ্করী ভিন্ন সে অন্য দেবীর পূজা সহজে করবে না। তুমি তাকে তোমার প্রভাব ও শক্তি দ্বারা বশীভূত করতে পারলেই পৃথিবীতে তোমার পূজা চির প্রতিষ্ঠিত হবে।"

দেবী মনসা ভাবলেন—এ আর বেশী কথা কি! আজই তিনি চাঁদসদাগরকে স্বপ্নে আদেশ দেবেন। কিন্তু চাঁদসদাগর ছিলেন অত্যন্ত চণ্ডীভক্ত এবং নির্ভীক; ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না। কাজেই দেবী মনসাকে এজন্য বিশেষ আয়োজন করতে হয়েছিল।

উজান নগরে চাঁদসদাগরের বাস। বিরাট তাঁর প্রাসাদ, স্ত্রী সনকা ও ছয় ছেলে, ছয় পুত্রবধূ নিয়ে তাঁর বড় আনন্দ ও শান্তির সংসার ছিল অর্থবল, লোকবল কোন কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না এঁরা সকলে দেবী দুর্গার আরাধনা করতেন। দেবী দুর্গার বিরাট স্বর্ণ-মন্দিরে মহাধুমধামে দেবীর পূজার্চ্চনা হত।

এমনি এক শুভমুহূর্ত্তে চাঁদসদাগর সপ্তডিঙা সাজিয়ে মহাসমারোহে বাণিজ্যে গিয়েছেন। সেই সময়ে একদিন দেবী মনসা স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে চাঁদসদাগরের স্ত্রী সনকাকে বল্লেন, 'সনকা ওঠ এব প্রত্যুষে আমার ঘট স্থাপনা করে আমার পূজা-আরাধনার ব্যবস্থা কর। আমার সন্তোষবিধান করলে তোমাদের অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে এবং ঐশ্বর্য্যে তোমার ঘর ভরে যাবে।'

সনকা অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠেই দেবী মনসার পূজার আয়োজন শুরু করলেন। কোন ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটল না, মন্দিরে ঘটস্থাপনা করে মহাধুমধামে মা বিষহরির পূজা আরম্ভ হল চাঁদসদাগরের ঘরে।

এই আনন্দ উৎসবের মাঝে একদিন চাঁদসদাগর বাণিজ্য করে দেশে ফিরে এলেন।

তিনি ত এসে অবাক,—একি! দেবী চণ্ডীর মন্দিরের পাশে এ কার মন্দির স্থাপিত হয়েছে? এত ধুমধামে কার পূজা হচ্ছে?

স্ত্রী সনকা ভক্তিবিহ্বলমনে স্বামীকে দেবী মনসার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বললেন।

চাঁদসদাগর এসব শুনে একেবারেই খুশী হতে পারলেন না। কি এতবড় স্পর্দ্ধা! "সনকা, কেন তুমি

এই বিষহরির মন্দির আর ঘটস্থাপনা করেছ—তুমি কি জাননা যে আমি আমার একমাত্র ইষ্টদেবী চণ্ডীর পূজা করি? আমি অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করব না।" রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে চাঁদসদাগর তখনি দেবী মনসার মন্দির ভেঙ্গে ফেললেন। সকলে হায় হায় করে উঠল, একি কান্ত! মানুষ হয়ে দেবদেবীর সঙ্গে শত্রুতা!—এ যে প্রলয়ের আভাস। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি কে লঙ্ঘন করতে পারে, চাঁদসদাগর কারও কোন কথা শুনলেন না। এই ঘটনায় সকলের মনই আতঙ্ক ও বিষাদের মেঘে ছেয়ে গেল। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে সকলে যেন ম্রিয়মান ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সর্পকুলের অধীশ্বরী মহাদেবী বিষহরির অপমান! না জানি কি হবে সর্বনাশ—এ রাজ্যে!

হলও তাই—দেবী পদ্মা চাঁদসদাগরকে স্বপ্ন দিয়ে সাবধান করে বললেন,—"চাঁদসদাগর, যদি তুমি আমার পূজা না কর তবে তোমার সমূহ বিপদ! আমার পূজা তোমায় করতেই হবে, নচেৎ আমি তোমার ধনদৌলত, পুত্র, আনন্দের সংসার সব শ্মশানে পরিণত করব, এখনও মন ফেরাও।"

চাঁদসদাগর দেবীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কখনো নয়—আমি মা দুর্গাকে ছাড়া কারও পুজো করব না, তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার।" অপমানে রোষে দেবী অন্তর্দ্ধান হলেন।

এরপরে চাঁদসদাগরের দুর্ভোগ সুরু হয়ে গেল। দেবী বিষহরির কোপে চাঁদসদাগরের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। দেবীর আদেশে সর্পকুল ক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদসদাগরের ছ'টি ছেলের বিনাশ সাধন করলে। ঘরে বাইরে হাহাকার পড়ে গেল—কান্নার রোলে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল। দেবী বিষহরির কোপে যেন চারিদিকে আগুনের হল্কা বইতে লাগল, সকলেই জোড়হাতে দেবী বিষহরির স্তব ধ্যান করতে লাগল, কিন্তু তাতে দেবী শান্ত হবেন কেন—তিনি চান চাঁদসদাগরের পূজা।

চাঁদসদাগরের এতেও ভ্রূক্ষেপ নেই,—মা চণ্ডীর একনিষ্ঠ ভক্ত অচল অটল ভাবে পুত্রশোক বুক পেতে নিলেন, কিন্তু বাড়ীতে তিষ্ঠান দায়! স্ত্রী সনকা ও পুত্রবধূদের বিলাপে—তাঁর মনে অশান্তির ঝড় বইতে লাগল, চাঁদসদাগর ঠিক করলেন আবার বাণিজ্যে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে সপ্তডিঙা নদীর ধারে সজ্জিত হল—তিনি উচ্চকণ্ঠে "জয় মা দুর্গে—জয় মা শঙ্করী" বলে রওনা হলেন।

কিন্তু চাঁদসদাগরকে বেশী দূর যেতে হল না, মনসার আদেশে সমুদ্রে তুমুল তুফান উঠল—সে কি দুর্যোগ, মুহুর্মুহু বজ্রপাত বৃষ্টি ঝড়! আকাশ-পাতাল বুঝি এক হয়ে মিশে যাবে—সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়!

চাঁদসগরের পূজা যে দেবীর চাই-ই, তাই শুধু চাঁদসদাগর বেঁচে রইলেন—আর প্রকাণ্ড কাল কাল ঢেউয়ের মধ্যে সদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা লোক লস্কর নদীগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চাঁদসদাগর নিঃসঙ্গ একা সেই অসীম জলরাশির মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলেন; একবার ভেসে ওঠেন—আবার ডুবে যান—এমন সময় আকাশে নিকষ কালো মেঘের মাঝে দেবী পদ্মা আবির্ভূতা হলেন. উজ্জ্বল স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি তাঁর—সেকি অপরূপ শোভা—চতুর্দ্দিক সেই জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠল, দেবীর চারিদিকে লক্ষ লক্ষ সাপ—তক্ষক ও নাগরাজের আস্ফালনে ও নিঃশ্বাসে বিদ্যুতের ঝলকানি, সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়।

চাঁদ সদাগর অর্দ্ধমৃতাবস্থায় বারেকের জন্য বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। দেবী বললেন, "এখনো মন ফেরাও।"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাঁদসদাগর তখনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,—"কখনো না, আমায় মেরে ফেললেও নয়।"

কিন্তু চাঁদকে মারলেও দেবীর মনোবাসনা পূর্ণ হবে না, কাজেই তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন।

চাঁদসদাগর বেঁচে বাড়ীতে আবার ফিরে এলেন। কিন্তু শোকে মুহ্যমান বাড়ীতে তিনি সুস্থির হতে পারলেন না। সকলে চাঁদসদাগরকে বোঝালেন যে, অবিবাহিত ছোট্ট ছেলে লখিন্দরের বিয়ে দিয়ে আবার নূতন করে সংসার কর। কিন্তু চাঁদসদাগর বিস্মৃত হলেন না যে বিষহরি তাঁকে কখনই সুস্থির হতে দেবেন না। কিন্তু অদৃষ্টে সুখশান্তি চিরতরে

শীত

ফটো—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচা

ঘুচে গেলেও মনসার পূজা তিনি করবেন না। তখন আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য লোকেরা তাঁকে পরামর্শ দিল যে—বেহুলা নামে একটি অদ্ভুত সুলক্ষণা মেয়ে আছে। মেয়ের যেমন রূপ তেমনি গুণ, একমাত্র সেই সর্ব্বসুলক্ষণা বুদ্ধিমতী ধার্ম্মিকা মেয়েই দেবী পদ্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। বেহুলা ছাড়া দেবীর কোপ থেকে তোমাদের মুক্ত করবার সাধ্য আর কারও নেই।

চাঁদসদাগর বেহুলাকে দেখে সত্যই আশ্বস্ত হলেন, আবার বুকে বল বেঁধে তিনি ছোট ছেলের বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। শোক তাপ দাবিয়ে উজান নগরে চলল শুভবিবাহের আনন্দোৎসব। এই পরম শুভ-মুহূর্ত্তে দেবী পুনরায় সদাগরকে দেখা দিয়ে বললেন, "এখনি তোমার আশা আনন্দ উৎসাহ ভেসে যাবে, এখনও ভেবে দেখ।"

চাঁদসদাগরের একই জেদ বজায় রইল তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, "না"।

চাঁদসদাগর এবার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বিধিমতে সকল ব্যবস্থা করলেন। তিনি এক অদ্ভুত লোহার বাসর ঘর নির্ম্মাণ করালেন, যাতে সেখানে সাপ প্রবেশ করতে কিছুতে না পারে। নিরেট লোহার ঘরে একটি ছিদ্রও রইল না।

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হল। বাসর-রাত্রে বর-কনেকে লোহার ঘরে দিয়ে চাঁদসদাগর সেই ঘরের চতুর্দ্দিকে সারারাত আগুন জ্বেলে রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং হাজারে হাজারে নেউল ছেড়ে দিলেন। শুধু এই ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি স্বয়ং লোহার লাঠি নিয়ে দরজার সামনে পাহারায় নিযুক্ত রইলেন। কিন্তু দেবতার সঙ্গে মানুষ পারবে কেন! চাঁদসদাগরের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। দেবী বিষহরি কৌশলে কালনাগিনীকে বাসরঘরে প্রবেশ করিয়ে লখিন্দরকে দংশন করালেন।

আশ্চর্য্য লোক এই চাঁদসদাগর—এই ঘটনার পরও তিনি অচল-অটল—বিষহরির পূজা করবেন না! এরপর আরও মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাঁকে দেখতে হ'ল যখন বালিকা পুত্রবধূ বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে চললেন নিরুদ্দেশের পথে। বেহুলা বিদায় নেবার সময় সকলের উদ্দেশে বল্লেন যে, "আমি যদি সতী হই, আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে, তবে মৃত স্বামীকে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনব।"

বেহুলার কথা মিথ্যা হয়নি, সত্যই তিনি নানা আপদ-বিপদ ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে মহাদেব ও পদ্মার দর্শনলাভ করতে সমর্থ হন—এবং তাঁদের সন্তুষ্ট করে শুধু স্বামী লখিন্দরকে জীবিত ফিরিয়ে আনেননি—সঙ্গে তাঁর ছয় ভাসুরকেও নিয়ে আসেন।

এরপর শ্বশুরকে বেহুলা বুঝিয়ে বললেন, "বাবা আপনি বৃথা এই জেদ করে কষ্ট পেলেন—নিজের সর্ব্বনাশ আর ডেকে আনবেন না। শঙ্করী আর বিষহরী ভিন্ন নন, তাঁরা এক, অভিন্ন। ঐ দেখুন"...বলার সঙ্গে সঙ্গে দেবী শঙ্করী ও বিষহরী আবির্ভূতা হলেন আকাশে চাঁদ-সদাগর অপরিসীম বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন—অপূর্ব্ব এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—চতুর্দ্দিকে তাঁর কিরণ বিচ্ছুরিত করে মৃদু হাসছেন। এই মূর্ত্তির অর্দ্ধেক শঙ্করী অর্দ্ধেক বিষহরি। এতদিনে চাঁদসদাগরের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল, চেতনা হল তাঁর, তিনি করজোড়ে দেবীদের স্তব করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাধূমধামে বিষহরির পূজার আয়োজন চলল উজান নগরে। সেইদিন থেকে পৃথিবীতে মনসা পূজার প্রচলন চলে আসছে।

"মনসা মঙ্গলের" এই কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—দেবভক্তি ও ঈশ্বরবিশ্বাস হলেও, ঘটনার অতিনাটকত্বে ও বিশেষ করে বেহুলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বইখানিতে যে আদর্শগত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা আজও আমাদের নারী সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং মনসামঙ্গলকে করে রেখেছে একখানি দুর্লভ ধর্ম্মগ্রন্থ।

সেরিনাড

বটকৃষ্ণ দে

তবু তো আবার হাওয়ায়-হাওয়ায় হাঁক দিয়ে যাই
তোমার দুয়ারে। শার্শিতে জ্বলে নীল আলো, তার রাঙা রোশনাই
ফোটে,, ফেটে পড়ে হাজারো ফনায়; বাজনার মতো
বৃষ্টির টোকা টুকটুক ক'রে বাজে অবিরত !...
তোমার মনের কথার দরোজা এখনো বন্ধ
রেখেছ কেন গো ! নিবিড় অন্ধ-
কারের এই যে কারাগার, তার পথ কারা চেনে ? পথ চিনে-চিনে
তোমার প্রাণের প্রান্তে অথবা উত্তরে-দাক্ষিণে
আসবো কী ক'রে বলো তো ! তবু-ও দু'হাতে ছড়াও
ছলনার ছায়া, ধু-ধু ঝড়-তোলা ধোঁয়ার ধেয়ানে দু'চোখ ভরাও !
দিকের দৃষ্টি হারিয়ে, হাওয়ায় হাত মেলে দিয়ে
তোমার মনের জানালায়-জ্বলা আলো ভেবে নিয়ে
হৃত-হৃদয়ের হতবাক পথে ঘুরে-ফিরে মরি। বন্ধ গলির
ভুলে যাই নাম, নামের নীলিমা, নীলিমার নীল
বহু-গীত সেই গন্ধ-গানের অন্ধ কলির
মিল ভুলে যাই, ভুলে যাই সুর, সুরের সেতার
ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যায়; জোরে জুড়ে দিই; তবু তো সে তার
ঘুম-চোখ নিয়ে, চুলে-চুলে তার অঢেল ঢেউএর শব্দ ছিটিয়ে
কালোর আলোয় দীপ জেলে দিয়ে, এ মনের সাথে
সেই বিস্মৃত শত রাত্রির গাঢ় আবছাতে
এলো না আর তো এলো না !

এখানে আর্ত আকাশ আঁকলো চোখের শিশির
শিরীষের শীষে ফোটা-ফোটা ঘুম, ঘুম-ঘুম মেঘ
সময়ের ঠোঁটে সাগরের ঘ্রাণ; আকুল আবেগ
হাওয়ার ডানায় ভর ক'রে ফেরে। তবু তো আমার
ঘুমের মতন এই ঘন হাত
শার্শির আড়ে, জানলায় আজো বাজনা বাজায়। সুরের প্রপাত
বন্যার মত কান্নায় ভেঙে কথা ক'য়ে ওঠে :

…"তুমি কথা কও, ম্লান-ছলোছলো
চোখের চকিত দৃষ্টি ফেরাও, কিছু বলো বলো…"

সেই কিছু কথা নিয়ে আমি যদি মুক্তার মালা
গাঁথি, বাসরের বাতি জেলে দিই, সুরের শয্যা সাজিয়ে—
তবু'ও তোমার ভরবে না মন, চাওয়া ও পাওয়ার সাজি এ ॥

চতুর্দ্দশপদী

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

এখানে অনেক ছিলো। বহুতর জীবনের গান
ঘাসে-ঘাসে নীলাকাশে বাতাসে ছড়ানো, সময়ের
ঝিনুকে প্রাণের মুক্তা আঁকা ছিলো, শিশিরের প্রাণ
ছড়াতো সৌরভ। আহা, এ-দ্বীপ হারানো সবুজের !
তারপর শীত এলো : হেমন্তের পাতাঝরা সুরে
বিষণ্ণ গানের কলি। কুয়াশার হিমেল চাদর
ধূসর হাতের স্পর্শে এই সব মাঠঘাট জুড়ে
ছড়ালো ব্যথার মতো কান্নাকাঁপা রিক্ততার স্বর !

তবু এই রৌদ্রম্লান হিমস্বাদ নীলকান্ত মেঘে
যে-মৃত্যুর পদচিহ্ন নেমে আসে, সজল মল্লারে
করুণ পূরবী রাগ যে-বেদনা ছড়ায়, উদ্বেগে
বীতপত্র জীর্ণডালে যে-মর্মর জাগে, এ-ই নয়
উর্বশী এ-পৃথিবীর শেষ গান ! আহা, এ-সেতারে
বসন্তবাহার ফের ঢেকে দেবে সব অবক্ষয় !!

শরৎ-স্মরণি

রণজিৎ কুমার সেন

১৩৪০ সালের মাঘ। ফরিদপুর আর্ট এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এগ্‌জিবিশন সুরু হচ্ছে। এগ্‌জিবিশনকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। তার প্রধান উদ্যোক্তা জমিদার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া)। আমাদের লালুদা। মুসলমান বংশে জন্ম হলেও প্রধানতঃ তিনি হিন্দু-কৃষ্টিতে বর্ধিত। ইতিপূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের আঞ্চলিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে জেল খেটে এসেছেন। মুক্তি পেলে আমরাই সেদিন সহরবাসী মিলে স্টেশন থেকে তাঁকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে এসেছিলাম। চারপাশ থেকে তাঁর উন্নত মস্তকে সেদিন পুষ্প আর আতর-বৃষ্টি ঝরে পড়েছিল। সেই থেকে আমরা লালুদার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠি। যখনই কাছে যেতাম, সস্নেহ আকর্ষণে খুসীর বন্যা বইয়ে দিতেন। লালুদার উদ্যোগেই ক'ল্‌কাতা থেকে এসে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র; কাছে বসে তাঁকে দেখতে পাবো, তাঁর বক্তৃতা শুনবো —এ কি কম ভাগ্যের কথা! উপেন্দ্রনাথ তাঁর মাতুল। ইতিপূর্বে তাঁরও একাধিক গ্রন্থ পড়ে মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কোনো বই হাতে না পেলেও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা পড়ে খুসী হয়েছি। ইংরেজ কবি Browning-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ তাঁর কবিজীবনের অন্যতম কীর্তি। সেই অনুদিত খণ্ড খণ্ড কাব্য-মঞ্জুষাকে একত্রে গেঁথে তিনি 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একসঙ্গে বাংলার এই তিন জন কৃতী শিল্পীকে কাছে পেয়ে সেদিন ফরিদপুর সহর যতখানি না গৌরবান্বিত হয়েছিল, তার চাইতেও ব্যক্তিগতভাবে ধন্য হয়েছিলাম আমরা। ইতিপূর্বে সহরের এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'শরৎ-সাহিত্যে নারী' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলাম, এতদিনে বাংলার সেই দরদী কথাশিল্পীকে কাছে পেয়ে মনে মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। আড়ালে বসে গড়গড়ায় একবার তামুক টেনে এসে সভাপতির আসন থেকে তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেনঃ **'সাহিত্য সম্মিলনের রূপ'**। স্বল্প ভাষণ, কিন্তু দরদ ও যুক্তিতে

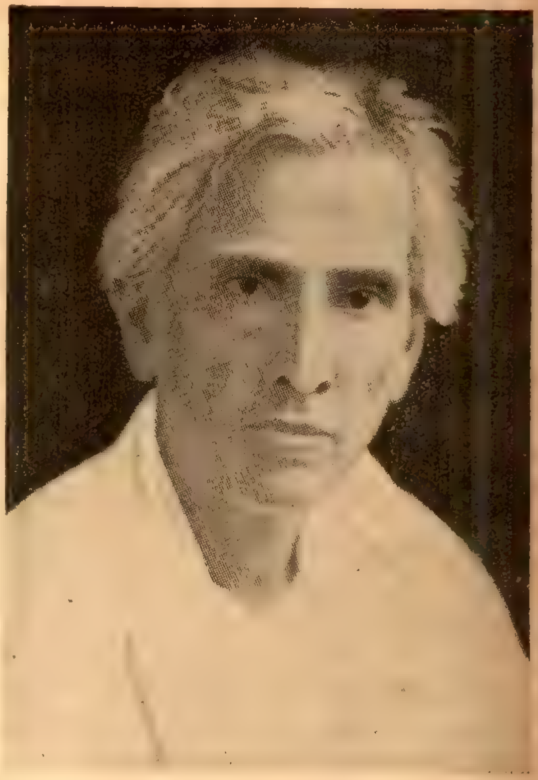

গভীর। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তখন নিয়মিত মাসিক 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের ভাষণটি 'বিচিত্রা'র পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ইচ্ছে হয়নি একটা মুহূর্তও শরৎচন্দ্রের কাছ-ছাড়া হই; বহু গণ্য-মান্য সুধীজন-পরিবেষ্টিত হয়ে যতই তিনি আড়ালে পড়ে যাচ্ছিলেন, ততই একটা মানসিক উদ্বেগ বোধ করতে লাগলাম। কেবলই সুযোগ খুঁজতে লাগলাম—কি করে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা যায়! ইতিমধ্যে তাঁকে স্থানীয় রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র-সভায় গিয়ে যোগ দিতে হলো। ছুটলাম সঙ্গে সঙ্গে। ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বললেনঃ

'তোমাদের এই বিদ্যামন্দিরে এসে আমার নিজের অধ্যয়ন-জীবনের কথাই আজ বার বার করে মনে পড়ছে। আমারও একদিন তোমাদের মতই উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে এমনি করে ছাত্রজীবন সুরু হয়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবীকালকে স্মরণ করে কত আশার মুকুলই না রচনা করেছিলাম! কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হলাম।

বিধাতা যে এমন বঞ্চনা আমার জন্য রেখেছিলেন, ভাবতে পারিনি। বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হলাম। এমনি করেই আজ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এসে পৌঁছেচি। এ জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁক দিয়ে মানুষের চোখ ঝল্‌সাতে গেলে সে-ফাঁক একসময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলবো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সাম্‌নে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও, সত্যাশ্রয়ী হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না; তাতে ঠকতে হয়। তোমরা আমার ভালো-বাসা নাও।'

শুনতে শুনতে কাগজে টুকে নিলাম কথাগুলো। যেখানে যখনই যাঁর ভালো বক্তৃতা শুনেছি, সঙ্গে সঙ্গে কাগজে টুকে নিতে চেষ্টা করেছি। এ অভ্যাসটি আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া। এর একটি মহৎ গুণ হচ্ছে এই যে, বিষয়টি যেমন নিজের করে ধরে রাখা যায়, তেমনি সেই ধৃত বিষয়টিকে অবলম্বন করে মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়! সেইটেই জীবনের পরম সঞ্চয়। প্রকৃতির মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, জীবনে তাকে গ্রহণ করলে সে হয় ধর্ম। জীবনে সত্যকে ধারণ করাই হচ্ছে ধর্মঃ সে সত্য অনুশাসন থেকেই আসুক আর শিল্প-সাহিত্য বা সমাজতত্ত্ব থেকেই আসুক।

কথাগুলো টুকে নিয়ে একসময় লালুদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহিত্য সাধনা করি বলে লালুদা আরও বেশী ভালোবাসতেন। বল্‌লাম, 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন।' লালুদা কিন্তু এতটুকুও ইতস্ততঃ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমার সম্পর্কে কতকগুলো অনাবশ্যক বিশেষণ ব্যবহার করে-আলাপ করিয়ে দিলেন। সুবিধে ছিল এই যে, শরৎচন্দ্রের থাকবার ব্যবস্থা লালুদার বাড়ীতেই হয়েছিল। লালুদার ঘরে ছিল আমার অবাধ গতি। পরিবেশ সম্পর্কে তাই সঙ্কোচ ছিল না। উপুর হয়ে প্রণাম করতে যেতেই আমার মাথার উপর হাত রেখে শরৎচন্দ্র বললেনঃ 'কৃতি হও।'

এমন আশীর্বাদ কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ করেনি। শব্দটার পিছনে যে কতবড় সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে, তার সীমা-পরিসীমা করা যায় না।

হাতের কাগজখানিকে এগিয়ে ধরে বল্‌লাম, 'আপনার কলেজের বক্তৃতা আমি টুকে নিয়েছি, ঠিক হয়েছে কিনা, একবারটি দেখে দিন।'

কাগজখানিকে হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন শরৎচন্দ্র, তারপর চমৎকৃত হবার মতো ভঙ্গীতে বল্‌লেন, 'বাঃ, তুমি দেখছি হুবহু কথাগুলোকে দিব্বি টুকে নিতে পেরেছ! ভবিষ্যতে ষ্টেনোগ্রাফী শিখ্‌লে তুমি ভালো প্রেস-রিপোর্টার হতে পারবে।' বলে কলম বার করে নিজেই গোটা দুই কথা পাল্টে দিয়ে কাগজখানিকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সমস্ত মনটা তখন খুসীর বন্যায় কেবলই উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। বল্‌লাম, 'আশীর্বাদ করুন, অন্ততঃ তা-ই যেন পারি! সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ভিন্ন আমার আর কোনো জ্ঞান নেই।'

শরৎচন্দ্র বল্‌লেন, 'কাগজে টুকে নেওয়া কথাগুলোকে তবে কাজে লাগাতে চেষ্টা কোরো।'

পাশ থেকে রসিকতা করে লালুদা বল্‌লেন, 'কোন্ কথাগুলো শরৎদা, প্রথম দিকের—না শেষের দিকের?'

শুনে হাসি পাচ্ছিল, কোনোরকমে সেটুকু নিজের মধ্যে সম্বরণ করে নিয়ে কাগজখানিকে ভাঁজ করে পকেটে পুরে রাখ্‌লাম।

ভেবেছিলাম—শরৎচন্দ্রও একটা কৌতুকপূর্ণ জবাব দেবেন, কিন্তু কৌতুকের পরিবর্তে অকস্মাৎ তাঁর সারা মুখ-খানিকে বড় ভাববিহ্বল দেখালো। বল্‌লেন, 'আমার মতো অদৃষ্ট যেন কোনো ছাত্রেরই কোনোদিন না হয় লালু! তাদের দুঃখ বইবার শক্তি দিন বিধাতা, কিন্তু নিগ্রহ যেন দেন না জীবনে।'

মনে মনে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম লেখক-শরৎচন্দ্রের কথাগুলির সঙ্গে ব্যক্তি-শরৎচন্দ্রের কথাগুলিকে। এতটুকুও পার্থক্য নেই, এতটুকুও তারতম্য বলে বোধ হলো না কোথাও।

লালুদা কিছু-একটাও আর বল্‌লেন না; অন্দরমহল থেকে হঠাৎ ডাক পড়ায় এবারে সেই দিকেই পা বাড়ালেন।

সহসা একা পড়ে গিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ করছিলাম। ইতিমধ্যে নিজে থেকেই শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'লাইফের মোটো কি তোমার, চাক্‌রী—না ব্যবসা?'

প্রশ্নটার হঠাৎই কিছু জবাব দিতে পারলুম না। কিছু-ক্ষণ থেমে পরে বল্‌লাম, 'এখন তো পড়ছি, পাঠ্যজীবন শেষ হতেই যে এখনও অনেক দেরী! আপাতত পড়ে পাশ করাটাই মোটো; সেই সঙ্গে সাহিত্যসাধনাটাও আছে।'

শুনে অপলকনেত্রে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর স্নেহের হাত প্রসারিত করে দিয়ে শান্তকণ্ঠে শরৎচন্দ্র বল্‌লেন, 'তুমি খুব

ইন্টেলিজেন্ট্। তবে কি জানো, এ পোড়া বাংলাদেশে সাহিত্য আদৌ অর্থকরী নয়।. তার পিছনে অনেক নিগ্রহ, অনেক জ্বালা। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি মেজিস্ট্রেটি করে তবে সাহিত্যরচনা করে গেছেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বংশগত এ্যারিস্টোক্রেসি রয়েছে, আর আমি যে শরৎচন্দ্র, আমাকেও বাড়ী পালিয়ে বর্মা মুলুকে গিয়ে দীর্ঘকাল কেরানীর কাজ করে আসতে হয়েছে। তা হলেই বোঝো, একটা কিছু পাকাপাকি অবলম্বন ভিন্ন এদেশে নিরঙ্কুশ সাহিত্যচর্চা আদৌ সম্ভব নয়।'

উত্তরে যে কিছু-একটাও বলবো, এমন মাথা ছিল না। বলতে চাইওনি কিছু, শুধু কাছে বসে শরৎচন্দ্রের বাণী শুনবো—এই ইচ্ছেই ছিল। যতই তাঁর কথা শুনছিলাম, ততই শুনবার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁকে কাছে পাওয়াটা যে কতখানি পাওয়া, সেদিনের বয়সটা ফিরে না পেলে তা বলে বোঝানো যায় না। ভেবেছিলাম—আরও অনেকক্ষণ বসি, কিন্তু সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে অন্দরমহল থেকে ফিরে এসে লালুদা এবারে শরৎচন্দ্রকেও ভিতরেই কোন্ দিকে নিয়ে গিলেন।

উঠতে উঠতে শরৎচন্দ্র বললেন, 'তোমাদের এই ফরিদপুর শহরটা দেখছি আমাদের হাওড়া-শিবপুর অঞ্চলের মতো নয়; এখানে প্রবীণেরা যে-পরিমাণে তরুণ, তরুণেরাও সেই পরিমাণেই প্রবীণ। এমন বায়গার বাসিন্দা হয়ে সুখ আছে।'

মুখ টিপে হেসে লালুদা বললেন, 'নইলে কি আপনার মতো তরুণকে এত সহজেই পাওয়া যেতো!' বলতে বলতে দুজনেই বাড়ীর ভিতরে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

এখানে উপস্থিত মতো শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার এই প্রথম এবং শেষ দেখা। পরবর্তীকালে লালুদার উদ্যোগেই আরও একবার আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল শরৎচন্দ্রকে, কিন্তু রাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতায় তিনি আসতে পারেননি। সে-কথা থাক্। উপস্থিত মতো শরৎচন্দ্রের আকর্ষণে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাণী শোনা থেকে বঞ্চিত হলাম। আপাতত সে-বঞ্চনা বোধ না করলেও তখনই বিশেষ করে এসে মনে বাজলো—প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে তাঁদের গাড়ী যখন একসময় চোখের আড়াল হয়ে গেল।

এরপর কলেজ-জীবনের ফাঁকে কল্কাতায় এসে দু'বার দু'যায়গায় গিয়ে দেখা করলাম শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। একবার বাজে-শিবপুর, আর একবার দক্ষিণ কল্কাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে। শরৎচন্দ্র তখন বাজে-শিবপুরে পাকাপাকিভাবে না থাকলেও প্রয়োজন মতো মাঝে মাঝে যেতেন।

বাড়ী চিনে যখন গিয়ে পেঁছালাম, শরৎচন্দ্র তখন জরুরী কাজে কোথায় বেরোচ্ছেন। সঙ্গে মধ্যবয়স্ক দুটি ভদ্রলোক। উপুড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লাম, 'চিনতে পারলেন আমাকে?'

চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্মরণশক্তি দেখে আশ্চর্য্য হলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লেন, 'ফরিদপুরের সেই would-be Steno তো, খুব চিনেছি। কেমন আছো বলো, সাহিত্যের কাজ তোমাদের কিরকম এগোচ্ছে?'

বল্লাম, 'ভালো আছি, তবে সাহিত্য খুব বেশী সচল নয়। মফঃস্বল সহর, কতইবা এগোতে পারে! যা কিছু করতে যাওয়া যায়, তার আসল সেন্টার যে কল্কাতা।'

একটুকাল কি যেন চিন্তা করে শরৎচন্দ্র বল্লেন, 'কথাটা মিথ্যে বলো নি। নতুনদের পক্ষে মফঃস্বল জীবনটা একটা মারাত্মক রকমের বাধাস্বরূপ। তবে একবার কিছু নাম করে নিতে পারলে আমার মতো বর্মামুলুকে গিয়েও দিব্বি সাহিত্য-চর্চা করা যায়।'

নতুন করে কিছু-একটা বলবার জন্য মনটা কেবলই উস্খুস্ করছিল, কিন্তু মুখে এলেও কোনো কথা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। কথা-সাহিত্যিক না হলে কথা বানাবার যে কত বিড়ম্বনা, মনে মনে শুধু সেই কথাটাই ভাবছিলাম।

ঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য করে পুনরায় শরৎচন্দ্র বল্লেন, 'তারপর, কি মনে করে কলকাতায় এলে, বেড়াতে?'

বল্লাম, 'বেড়ানোর পার্পাসেই বলা যায়। কলকাতার এতবড় জীবনটাকে চেনাও যে একটা মস্তবড় ব্যাপার! এসে জানলাম, কাছাকাছি আপনি আছেন, আপনার পায়ের ধুলো না নিয়ে তাই ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো না।'

এবারে মুখ টিপে হেসে শরৎচন্দ্র বললেন, 'সেটা কি আমি বামুন বলে—না গল্প-উপন্যাস লিখে ডক্টরেট পেয়েছি বলে?'

বলা বাহুল্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই শরৎচন্দ্রকে 'ডি-লিট্' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

কথা শুনে পাশাপাশি ভদ্রলোক দুটি এবারে হেসে ফেললেন, বললেন, 'আপনার ব্যক্তিগত হিউমরগুলি যদি আপনার সাহিত্যে স্থান পেতো, তবে বাঙালী পাঠক আপনার রমা, কিরণময়ী আর সাবিত্রীদের জন্য কেবল দুঃখই

করতো না; সেই সঙ্গে প্রাণ খুলে প্রচুর হেসে নিতেও পারতো।'

শরৎচন্দ্র বললেন; 'এ দু'চোখ দিয়ে বাংলার মাটিতে শুধু চোখের জলই দেখলাম। আমাদের সমাজ-কর্তাদের অবিচারে কত নিরপরাধিনীর জীবন যে তচনচ হয়ে গেল, তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে বিষ্টু। সারাজীবন ভরে আমি শুধু এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই তুলে গেলুম। এখানে কৌতুক প্রকাশের অবকাশ কোথায়? সেজন্যে তো ডি-এল রায় আর রসরাজ অমৃতলালের সাহিত্যই রয়েছে। এমন সাহিত্য বাংলাদেশে আরও অনেক পাবে। আমার লেখনী সেগুলো নাই বা স্পর্শ করলো!'

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। ভাবলাম—দু'ব্যক্তির একজন যখন বিষ্টু, অন্যজন তখন কেষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কেষ্ট-বিষ্টুর দলে আমি নিতান্ত তিতপুঁটি। তা হলেও উক্ত বিষ্টুবাবুর প্রশ্নটি ভালো লেগেছিল, সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উত্তর। এমন উত্তর ইতিপূর্বে তাঁর রচনা থেকেও প'ড়েছি। এখন দেখলাম—রচনে আর বচনে এতটুকুও আদর্শগত তারতম্য নেই।

ফাঁক পেয়ে এবারে জিজ্ঞেস করলাম, 'বড় হিউমারিজমও কি বড় সাহিত্যের অঙ্গ নয়?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'নিশ্চয়ই, কেন নয়? তবে তার স্থান-কাল-পাত্র এবং প্রকাশের পরিবেশ একেবারেই আলাদা। আমার রচনায় তাও যে নেই, তাই বা বলি কি করে। কিন্তু তা এত গৌণ যে, উল্লেখ করতেও বাধে। রামায়ণ গাইতে গাইতে আমি কখনও ভূতের বাবার শ্রাদ্ধ করতে চাইনি। কোনো সমালোচক আমাকে যদি এজন্যে এ্যাকিউজ করে তো আমার কিছু বল্‌বার নেই।'

প্রশ্নটা তোলার পর নিজেই মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলাম। শরৎচন্দ্রের কথার পর এবারে আর একটি কথাও বলতে পারলুম না।

শরৎচন্দ্র আর-একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করতে পারলে খুসী হ'তাম, কিন্তু তার আর উপায় নেই। একেই দেরী হয়েছে, এবারে বেরোতে হচ্ছে।'

আর-একবার উপুর হয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, 'সভা সমিতির কাজ—না এমনিই কোথাও?'

'এই অবেলায় আবার সভাসমিতি! ও কাজ থেকে দেশ আমাকে মুক্তি দিলে আর-ক'টা বছর বোধ করি বেশী বাঁচতাম। সভাসমিতি কিছু নয়, আসলে সোস্যাল পলিটিক্স। বুঝে দেখ, এ ব্যাপারেও নাক গলাতে হয়। এক-সময় হাওড়া জেলা কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছি বলে বিষ্টুর মতো লোকেরা ধারণা করে নিয়েছে যে বই লেখার মতো ও-বস্তুটাও আমার পুরোপুরি রপ্ত। এর চাইতে বসে বসে গান গাওয়া যে কত আরাম, তা কি ছাই বিষ্টুরা বুঝবে!'

শুনে পাশের লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু-বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। উত্তরে কিছু-একটাও আর না বলে এবারে সামনের পথে পা বাড়ালেন শরৎচন্দ্র।

দ্বিতীয়বারের শরৎ-দর্শন আমার এখানেই শেষ হলো। ক্রমে জেনে বিস্মিত হয়েছি যে, গানের কথাটা সেদিন মিছে-মিছিই তোলেননি শরৎচন্দ্র, তিনি নিজে একজন সত্যিকারের সু-গায়ক ছিলেন; এমনকি এককালে কিছু কিছু গানও রচনা করেছেন। কিন্তু কাব্য বা গীতি রচনায় ধৈর্য্য ছিল না শরৎচন্দ্রের, তার চাইতে দীর্ঘপৃষ্ঠাব্যাপী গল্প-উপন্যাস রচনার মধ্যে তিনি অনেক বেশী জীবন খুঁজে পেতেন। সেই জীবন-বোধের স্বাক্ষর তাঁর সারা জীবনের রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে।

শেষবার শরৎচন্দ্রের দর্শন পাই তাঁর অশ্বিনী দত্ত রোডের নতুন বাড়ীতে। প্রথম দিন গিয়ে শুনলাম বাড়ী নেই। মনটা স্বভাবতঃই বিষণ্ণ হলো। এত কাছের মানুষকে না পাবার বেদনা যে কত গভীর, স্বভাবতঃই সেটুকু মনে মনে অনুভব করলাম। দ্বিতীয় দিন গিয়ে কিন্তু আর ফিরতে হলো না। হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সৈয়দ আব্দুর রব সম্পাদিত একখণ্ড 'মোয়াজ্জিন' (৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৩)। সংখ্যাটিতে আমার নিজের একটি গীতি-কবিতা ছিল। এতবড় আকর্ষণের পরেও প্রধান আকর্ষণ ছিল আর-তিনটি। একটি রবীন্দ্রনাথের 'মানুষকে, সমাজকে ভালো-বাসতে হবে' (রবিবাসরে প্রদত্ত বক্তৃতা), দ্বিতীয়টি শরৎচন্দ্রের 'মুসলমান সাহিত্য' (ঢাকার শান্তি-সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা), এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নজরুল ইস্‌লামের 'গজল-গান'। এ ছাড়াও ছিল কাজী আবদুল ওদুদ, গোলাম মোস্তাফা, প্রবোধকুমার সেন, দিলীপকুমার রায়, বন্দে আলী মিয়া প্রভৃতির বিভিন্ন রচনা। তাঁদের সকলের সঙ্গে একই সংখ্যায় লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ক'ল্‌কাতার কাগজে এই আমার প্রথম সার্থক রচনা প্রকাশ।

অশ্বিনী দত্ত রোডে যাবার পথে মোয়াজ্জিনের পৃষ্ঠা খুলে ট্রামে বসেই আর-একবার পড়ে নিলাম শরৎচন্দ্রের রচনাটি—'মুসলমান সাহিত্য':

লাট সাহেব বল্‌লেন, মুসলমানদের নিয়ে গল্প লিখবে। এ কাজ

যদি করতে পারো, তা হলে বড় ভাল হয়। সাহিত্য নিয়ে আমি কোনদিন ছেলেখেলা করিনি। অন্য ব্যাপারে হয়ত কথা রাখতে পারি। ১৯০৬ সালে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে আসি, স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা, বললেন, তুই নাকি লিখিস? আমায় দিস তো দু'একখানা বই। আমি বললাম, ও কিছুই নয়। তিনি বললেন, দ্যাখ, তোকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তা হলে আমায় বলে দিবি। দ্যাখ, কাগজ চালাতে গিয়ে যাদের গালাগাল দেওয়া উচিৎ নয়, তাদেরও গালাগাল দিতে হয়েচে। তুই তো আমার কাছে পড়েছিস, যা নিজের জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্যি হয়ে উঠবে—অবিশ্যি কল্পনা থাকবে, তাই হবে সাহিত্যবস্তু। নিজের আয়কে অতিক্রম করে কখনও ব্যয় করতে যেয়ো না।

আমি বললাম, আশীর্বাদ করুন।

তিনি বললেন, আশীর্বাদ নয়, এই আমার আদেশ। লোকে বলতে পারে—পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যে লোক ভালো ছিলেন না। কিন্তু তিনি এমন সমালোচনা করেছিলেন, যা হয়ত তাঁর ইচ্ছে ছিল না।

ঐ দুটো কথা, কখনও আয়কে অতিক্রম করে চলো না, আর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখবে। সাহিত্য সত্যও-নয়, পুলিশ-রিপোর্টও নয়। প্রথম যখন লোকে বলেচে, এসব অস্বাভাবিক হয় না—৩৫।৩০ বছর বয়সে প্রথম 'চরিত্রহীনের' সমালোচনা দেখে বুঝলাম, প্রত্যেক পাঠক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। আর আমি ওটা কতবার দেখেছি, আর তোমরা একবার পড়েই আলোচনা করলে।

আমায় যে লোকে ভালবাসল তার প্রধান কারণই হচ্ছে এই লোকের অভিজ্ঞতার সাথে আমার কথাগুলো মেলে। মানুষ সত্যি ছোট নয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার দরুণ অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম —যেটা বাইরে থেকে জানা যায় না।

একসময় মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল, গভর্নমেন্টই একরকম দাবিয়ে দিয়েছিল। Communal Award নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ডাকা হয়েছিল। এক ভদ্রলোক বলেছিলেন—Why are you afraid of this Mohammadan People? Without Hindus' help they can't go on, they have to talk it. এখন ওরা গভর্নমেন্টের সাহায্যে নিজেদের কথাটা বুঝেছে।

আমার বিশ্বাস—সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার গোর্কি প্রভৃতিকে ভাল লাগে—তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিল নেই, তবু তাঁদের appreciate করি। মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজ আমি নিজে একটা গড়বো। এছাড়া আমাদের সত্যি পথ নেই, আমি মুসলমানদের একথাটা অনেকবার বলেছি।

মুসলমান ছেলেরা আমার কাছে একখানা বই রাখলে উপরে লেখা—'শ্যালক বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী'।

বললাম, অপমান করবার জন্যেই কি এসেচ? একজন মৃত ব্যক্তিকে অপমান করা ঠিক নয়। বঙ্কিমবাবু অনেক যায়গায় অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। তখন ওরা ছিল নিতান্ত নির্জীব, কিন্তু সমস্ত action-এরই re-action আছে।

'বঙ্কিম দুহিতা' বলে একখানা বই—অনেক নোংরা কথা তাতে আছে। এগুলো হতে বাধ্য। এখানের কাজী মোতাহার হোসেন বললেন আপনারা আমাদের এক-ঘরে করে রেখে দেবেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন আমার উপর এদের অনেকগুলো চিঠি এসেছে। আমায় চিঠি দিয়েছে—ঔরংজেব সম্বন্ধে কি স্তবকগুলি তুলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ভয়নক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, না, ওসবের ভিতর আর আমি যেতে চাই না। ভোলানাথ মারা গেল, তার অপরাধটা কি? আক্রম খাঁর ছেলেই কাগজ চালায়। তাদের স্পিরিটের একটি দৃষ্টান্ত দিই। নরেন দেবের কাছে লেখা চাইতে গেছে, বলে: 'বাংলা মোড়া বইতে সমজতে হে বোলনে নেই সাকতে'।

আমাদের আশঙ্কা—ওরা প্রথমে বাংলাটাকে নষ্ট করবে। ওরা যখন বাংলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে না।

রচনাটি অসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হলেও আসলে এটা যে একটা বৃহত্তর বক্তৃতার সারাংশ, তা পড়েই বোঝা যায়। এর কোনো কোনো অংশ সম্পর্কে ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রর মুখ থেকেই শুনেছি। এবারে গিয়ে দেখা করতেই প্রথম আলোচনা সুরু হলো আলোচ্য এই বক্তৃতাটি নিয়ে। বললাম, 'আপনার লেখনী থেকে এবারে নতুন সুরের সাড়া পাচ্ছি। আপনি জনগণের দরদী শিল্পী; এতকাল আপনার কলমে শুধু হিন্দুসমাজের চিত্রই ফুটে উঠেছে, মুসলমান সমাজই বা বাদ যাবে কেন? অবশ্যি 'মহেশ' গল্পে গফুরের মতো চরিত্রকে আপনি সার্থকভাবে এঁকেছেন, কিন্তু সেইটেই মুসলমান সমাজের পুরোপুরি রূপ নয়। এবার যদি মুসলমান সমাজ নিয়ে সত্যিই আপনি উপন্যাস লিখতে সুরু করেন, তবে আপনার সাহিত্যে বাংলার বৃহত্তর কমিউনিটি রূপায়িত হয়ে আপনার সৃষ্টিতে সামগ্রিকতার সংযোগ ঘটবে।'

মুখ টিপে হেসে শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেশের একটা কম্যুনিটির গরিষ্ঠতাই যে সবসময় সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াবে, পৃথিবীতে এমন কোনো ইতিহাসের নজির নেই কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কোন বিষয় নিয়ে কত ভালো লেখা যায়—সেইটেই আসল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বার্থরক্ষা চিরকালই বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। কিন্তু তার দায়িত্বও বড় কম নয় স্বার্থ অনেক সময় illogical হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু illogical সাহিত্য চিরকালই সবদেশে অচল।' বলে একটুকাল থেমে শরৎচন্দ্র বললেন, 'ভাদ্রের বিচিত্রায় আমার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' অভিভাষণটি পড়েছ? মোয়াজ্জিনে যা নেই, বিচিত্রায় তা পাবে।'

লজ্জিত কণ্ঠে বললাম, 'ভাদ্রের বিচিত্রা এখনও পড়িনি। আছে আপনার কাছে?'

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বিচিত্রাখানি আনিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'কাগজখানি তুমি বরং নিয়ে যাও। দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়তে সময় লাগবে, হাতে সময় নিয়ে ভালো করে পড়ো।'

আমি উপীনকে বলে আর একখানি আনিয়ে নেবো, এখানি আর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না।'

কাগজখানি হাতে পেয়ে অনুগৃহীত হলাম। বললাম, ঢাকা থেকে তো সাহিত্য আর শান্তি-সম্মেলন সেরে এলেন, এবারে চলুন আর-একবার ফরিদপুরে।'

—'যেতে কি অসাধ, কিন্তু এ দেহটাকে আর বয়ে বেড়াতে পারি না। লালু আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র। ফরিদপুরের কথা মনে হলেই লালুর কথা মনে আসে। লালুকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।' থেমে শরৎচন্দ্র বললেন, 'তোমার সাহিত্যনিষ্ঠা দেখে বড় খুশি হয়েছি। মোয়াজ্জিনে তোমার গান পড়েছি। এককালে আমিও কিছু গান লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার আশীর্বাদের যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে আশীর্বাদ করি—জীবনে তুমি কৃতকার্য হও, সার্থক হও। আমাদের কাল শেষ হয়ে এলো। শরীরের যা অবস্থা, বাঁচবোও না বেশীদিন। আগামীকালের জন্যে রইলে তোমরা। তোমাদের জয়যাত্রা শুভ হোক।'

শুনতে শুনতে শূন্য মন পূর্ণ হয়ে উঠছিল। মাথা নিচু করে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে বললাম, 'আপনার স্নেহ আর আশীর্বাদ পেয়েছি, আর ভয় কি!'

ইতিমধ্যে কে একজন ঘরে এসে প্রবেশ করায় কথা থেমে গেল। উঠে বিদায় নিয়ে নেমে এলাম পথে। হাতের মুঠোয় আমার 'বিচিত্রা' (দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ভাদ্র, ১৩৪৩) আর মোয়াজ্জিন। কলকাতায় এসে উঠেছি তখন বৌবাজারের এক বোর্ডিংএ। ট্রামে আসতে আসতে যতক্ষণ পারলাম পড়লাম শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি, বোর্ডিং-এ ফিরে গোড়া থেকে আবার পড়লামঃ

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচন ক'রেছেন। যদিও এর নাম দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, তথাপি এই নির্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহুদেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন আপনারা করেন নি। শুধু ভেবেছেন—আমি বাঙালী, বঙ্গসাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি। অতএব, সাহিত্যিক দরবারে আমার একটি স্থান আছে। সেই স্থানটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে দিয়েছেন। আমিও সানন্দে সকৃতজ্ঞ মনে সেই দান গ্রহণ করেছি। ভাবি, সকল বিষয়েই আজ যদি এমনি হ'তে পারতো! যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়,—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য যা-ই হোক, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তাঁর যোগ্য আসন তাঁকে দিতে পারতাম। সংশয় দ্বিধা কোথাও কণ্টক রোপন করতে পারতো না। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি পূর্বে একটি পত্রে বলেছিলাম, সাহিত্যের তত্ত্ব বিচার অনেক হয়ে গেছে অনেক মনীষী, অনেক রসিক, অনেক অধিকারী বহু-বার এর সীমানা এবং স্বরূপ নির্দেশ করে দিয়েছেন, সে আলোচনা আর প্রবর্তন করার আমার রুচি নেই। আমি বলি—সাহিত্য-সম্মেলন প্রবন্ধ পাঠের জন্য নয়, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য নয়, কে কত অক্ষম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য নয়, যে-যা লিখেছে তার চেয়ে ভাল কেন লেখেনি এ কৈফিয়ৎ আদায়ের জন্য নয়, এ শুধু সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে মিলন-ক্ষেত্র। এর আয়োজন একের সঙ্গে অপরের ভাব-বিনিময় ও সম্যক পরিচয়ের জন্য। আমার মনে পড়ে—বয়স যখন অল্প ছিল, এ ব্রতে যখন নূতন ব্রতী, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্যসভায় দ্বিধায় সঙ্কোচে উপস্থিত হতে পারিনি, নিশ্চিত জানতাম সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণের একটা অংশ আমার জন্য নির্দিষ্ট আছেই। কখনো নাম দিয়ে, কখনো না দিয়ে। বক্তব্য অতি সরল। আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে এলো, এবং সনাতন হিন্দুসমাজ জাহান্নামে গেল বটে। যাবার আশঙ্কা ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু সে অপকর্ম কোন দিন করিনি—ভাবতাম আমার সাহিত্য-রচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাই হোক্, যে দুঃখ নিজে ভোগ করেছি সে আর পরকে দিতে চাইনে। তবে অকপটে বলতে পারি, আমার অভিভাষণ শুনে সাহিত্যিক বিজ্ঞতা আপনাদের এক তিলও বাড়বে না। এবং বাড়বেই না যখন জানি, তখন কতকগুলো বাহুল্য কথার অবতারণা করি কেন? এইখানে শেষ করলেই তো হতো। হতো না তা নয়, তবে নিজেই নাকি কথাটা একদিন তুলেছিলাম, তাই—তারই সূত্র ধরে এই সম্মিলনে আরও গোটা কয়েক কথা বলবার লোভ হয়।

একদিন, আমার কলকাতার বাড়ীতে কাজী মোতাহার সাহেব এসে উপস্থিত। সাহিত্য-আলোচনা করতে তিনি যাননি, গিয়েছিলেন দাবা খেলতে, এ দোষ আমাদের উভয়েরই আছে—অসুস্থ ছিলাম, খেলা হলো না, হলো বর্তমান সাহিত্য প্রসঙ্গে দুটো আলোচনা। তারই মোটামুটি ভাবটা আমি কল্যাণীয়া জাহানআরার বার্ষিক-পত্র 'বর্ষবাণী'তে চিঠির আকারে লিখে পাঠাই। এবং সেইটি "অবাঞ্ছিত ব্যবধান" শিরোনামায় বুলবুল্ মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মুহম্মদ হাবিবুল্লা সাহেব উদ্ধৃত করেছেন তাঁর আষাঢ়ের কাগজে। দেখলাম, তার একটা জবাব দিয়েছেন শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় আর একটা দিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব।

লীলাময়ের লেখার মধ্যে ক্ষোভ আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। আমি বলেছিলাম সাহিত্য-সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ, সাহিত্য-সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, কৃশ্চান হোক্, তবু পর নয়,—আপনার জন। লীলাময় বলছেন, "প্রতিকার যদি থাকে, তবে তা সাহিত্যে নয়—তা স্বাজাত্যে।" স্বাজাত্য শব্দটায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন, বুঝলাম না। বলেছেন, "ঐক্য জিনিসটা Organic; হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি

হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙ্গালী হয় না, ভারতীয় হয় না।" পরে বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে আপোষ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং, ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।" এসব উক্তি ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বলি, এঁদের মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ যদি এই কথা বলতে থাকেন ত নৈরাশ্যে যে সমস্ত দিক কালো হয়ে উঠবে। এ কি এঁরা ভাবেন না? মনের তিক্ততা দিয়ে কোনো মীমাংসাও হয় না, মিলনও ঘটে না। আবার এমনি হতাশা প্রকাশ পেয়েছে মোহম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "আজ যাঁরা নূতন করে আমাদের দুই প্রতিবেশী সমাজের সম্বন্ধ বিচার করবেন, এনিয়ে যে আশ্চর্য সমাজের সৃষ্টি হয়েছে তার বন্ধন কেটে কল্যাণের অভিসারী হবেন, দীর্ঘ তাঁদের পথ, কঠিন তাঁদের সাধনা।" আমি এই কথাটাই মানতে চাইনে। জোড় করে প্রশ্ন করতে চাই, কেন তাঁদের পথ দীর্ঘ হবে? কিসের জন্য সাধনা তাঁদের সুকঠিন হয়ে উঠবে? কেন একটি সহজ সুন্দর পথে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাবো না? ওয়াজেদ আলী সাহেব পরে বলেছেন, "যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হলো না; একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে।" এর হেতু দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "অচেনা মুসলীম এলো বিজয়ীর বেশে, অধিকার করলো রাজার আসন। আনুগত্য, রাজসম্মান সে পায়নি এমন নয়; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ স্বীকার করেও দেশ-মনের মিতালী তার ভাগ্যে হয়নি, এদের অপরিচয়ের যে ব্যবধান সেটি অবাঞ্ছিত হলেও কোনোদিন ঘোচেনি।" কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? সত্য হলে এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচিয়ে মিতালি করতে ক'টা দিন লাগে? মনে হয় লীলাময় অনেক ব্যথার মধ্য দিয়েই লিখেছেন, "যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন ও আজও তা মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মত থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমান কাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনা-বোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র রচনাই যাঁদের স্বপ্ন, আমরা তাঁদের কে, যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাবো?"

এ কথার এ অর্থ নয় যে ব্যবধান আমরা ভালবাসি, মিতালি চাইনে, পরস্পরের আলোচনা সমালোচনা পরিহার করাই আমাদের বিধেয়। এ উক্তির তাৎপর্য যে কি, সমস্ত সাহিত্য-রসিক বিদগ্ধ মুসলিম সমাজকেই আমি দিতে বলি। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা করে নয়। কোথায় ভ্রম, কোথায় অন্যায়, কোনখানে অবিচার লুকিয়ে আছে, সেই অকল্যাণকে সুস্থ-সবল চিত্ত দিয়ে আবিষ্কার করে দিতে বলি, এবং বলি উভয় পক্ষকেই সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় তাকে স্বীকার করে নিতে। তখন পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা আমরা পাবোই পাবো।

ওয়াজেদ আলী সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন, সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিৎ। বলেছেন, "মুসলীম সাহিত্য সেবক আরবী ফারসি শব্দ বাঙলা ভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না; তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এ দুটি যেখানে নেই সেখানে ভাষা ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।"

পারেই তো। কিন্তু এ জ্ঞান আছে কার? যিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক, তাঁর। ভাষাকে যিনি ভালবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন তাঁর। তাঁকে তো আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু তাঁদের যাঁরা সাহিত্য-সেবা না করেও সাহিত্যের মুরুব্বি হয়ে বসেছেন। প্রিয় না হলেও একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'মহেশ' নামে আমার লেখা একটি ছোট গল্প আছে, সেটি সাহিত্য-প্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে; আবার একদিন কানে এলো সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোনো যোগ নেই, ভাবলাম এমনই হয়ত নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো-হত্যা আছে। অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিঁধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্তামশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই মহেশের স্থানে শুভাগমন করেছেন তাঁর স্বরচিত গল্প 'প্রেমের ঠাকুর।' আমার মহেশ গল্পটা হয়ত কেউ কেউ পড়ে থাকবেন, আবার অনেকেই হয়ত পড়েননি। তাই শুধু বিষয়বস্তুটি সংক্ষেপে বলি। একটি হিন্দুপ্রধান হিন্দু-জমিদার শাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরিব চাষা গফুরের বাড়ী। বেচারার থাকার মধ্যে ছিল বহু জীর্ণ, বহু ছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর দশেকের মেয়ে আমিনা আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান-খড় আটক করলে, তখন সে কেঁদে বললে, হুজুর! আমার ধান তুমি নাও, বাপ-বেটীতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় ক'টি দাও,—নইলে এ দুর্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কি করে? কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হলো—কেউ দয়া করলে না। তারপরে সুরু হলো তার কতরকমের দুঃখ, কতরকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সেই জীর্ণ কুটীরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো, মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভাত ক'টী তুই মহেশকে দে। সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই দশ বছরের মেয়েটার কাছেও তার লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো, গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিসনে গফুর, ওকে বেচে দে। গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, মহেশ, তুই আমার ব্যাটা,—আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস,—তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি, বাবা! এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নিচে গর্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয় জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে, ছোঁয়া-ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পারে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়ে-চিন্তে অনেক

দুঃখে বিলম্বে তার কলসিটী পূর্ণ করে বাড়ী ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে, কলসি ভেঙে ফেলে এক-নিঃশ্বাসে মাটি থেকে জল চুষে খেতে লাগলো। মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—এদৃশ্য তার সইল না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বা সুমুখে পেলে—একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার-দুই হাত-পা ছুড়ে প্রাণত্যাগ করলে।

প্রতিবেশীরা এসে বললে, হিঁদুর গাঁয়ে গো-হত্যা। জমিদার পাঠিয়েছেন তর্করত্নর কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। এবার তোর ঘরদোর না বেচতে হয়। গফুর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে নিঃশব্দে বসে রইলো। মহেশের শোকে, অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা তখন পুড়ে যাচ্ছিল। অনেক রাতে গফুর মেয়েকে তুলে বললে, চল্ আমরা যাই।

মেয়ে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, চোখ মুছে বললে, কোথায় বাবা? গফুর বললে, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

আমিনা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও তার বাবা চটকলে কাজ করতে রাজি হয়নি। বাবা বলতো—ওখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের আব্রু-ইজ্জত থাকে না—ওখানে কখনো নয়। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা?

গফুর বললে, দেরি করিসনে মা, চল্। অনেক পথ হাঁটতে হবে। আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের বাসনটি সংগে নিতেছিল কিন্তু বাবা বারণ করে বললে, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

তারপরে গল্পের উপসংহারে বইয়ে এইরূপ আছে—"অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা-তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ্! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো যেন মাফ্ করো না।"

এই হলো গো-হত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে। তার চেয়ে পড়ুক্ "প্রেমের ঠাকুর!" তাতে ইহলোক না হোক তাদের পরলোকে সদ্গতি হবে। এই-কান্তিমান সুপরিপুষ্ট প্রেমের ঠাকুরটিকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, মুসলমান সম্পাদিত কাগজে এই গল্পটির যে কড়া আলোচনা বেরিয়েছিল তার কি কোনো হেতু নেই? একেবারে মিথ্যা অমূলক?

তাই, আমার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে সসম্মানে নিবেদন করে রাখি যে খুব বড় হলেও মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় থাকা ভালো। ভাবা উচিত, তাঁর রচিত গল্পের সঙ্গে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় না ঘটলেও বিশেষ কোন লোকসান ছিল না। Text Book থেকে পয়সা পাইনে—ও ব্যবসা আমার নয়—সুতরাং, ক্ষতিবৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশ বোধ হয়। নিজের জন্য নয়, অন্য কারণে। শুধু সান্ত্বনা এই যে অযোগ্যের হাতে ভার পড়লে এমনি দুর্দশাই ঘটে। যে ব্যক্তি কোনদিন সাহিত্য-সাধনা করেনি সে কি করে বুঝবে কার মানে কি। শুনেছি নাকি আমার রামের সুমতি গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,—বোধকরি আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুশ্কিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে।

আর শুধু বিদ্যালয়েই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাইনে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ-ধরনের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বনাশ হয়।

যাক্ নিজের কথা।

উপরি-উক্ত হিন্দু মুরুব্বির মতো আবার মুসলমানী মুরুব্বিও আছেন। শুনেছি তাঁরা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মতো লিখতে। ইসলাম-ধর্মী কোন ব্যক্তি কোথাও অন্যায়-অবিচার করেছেন এর লেশমাত্রও যেন কোন পড়ার বইয়ে না থাকে। এখানেও সান্ত্বনা এই যে এঁদের কেউ কখনো কোন কালে সাহিত্যসেবা করেননি। করলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। সত্যিকার সাহিত্যিক-দের হাতে যদি এই ভার পড়ে, আমার বিশ্বাস, না হিন্দু, না মুসলিম কোন পক্ষ থেকেই বিন্দুমাত্র অভিযোগ শোনা যাবে না। ভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি সত্যিকারের দরদ তাঁদের সত্য-পথেই পরিচালিত করবে।

ওয়াজেদ আলী সাহেব একস্থানে বলেছেন, "মুসলিমের এই নব-স্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ, ইস্লামী কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ, সাহিত্য-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো শক্তিমান প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ করলো, হয়ত দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে ওঠে? 'বুল-বুলে' প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে মুসলিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভালবাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব।"

আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে মুসলিমের এই "নবস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ", ইস্লামী কৃষ্টির এই "বলিষ্ঠ জাগরণ" যাঁরা নবীন, উদার, বাঙলা ভাষাকে যাঁরা অকুণ্ঠিত মনে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেন, তাঁদের—না যাঁরা পুরাতন-পন্থী তাঁদের? আমার অভিমত এই যে যাঁরা প্রাচীন-পন্থী, যাঁরা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ কি মুস্লিম্ কি হিন্দু সকল সমাজেরই বিঘ্নস্বরূপ। হিন্দুদের সম্বন্ধে একথা আমি বহুবার বহু স্থানে লিখেছি, মুসলিম সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি এ জাগ-রণ হয় যদি নবীনের—আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা-জোয়ারের মতো সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দু'হাত তুলে সম্বর্ধনা করে নেবো। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর, এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই—এদের হাতে আমরা দুজনেই হবো নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীন-পন্থীদের সম্বন্ধে।

তিনি পরে বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়, —জাতি, এক ছাড়া দুই নয়। একথা সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী

করতে পারে। কিন্তু আরও একটি সহজ কথার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেটি এই যে সাহিত্য মানুষের মনের সৃষ্টি, এবং মানুষের মনকে তৈরি করে তার ধর্ম, তার সমাজ, তার পরিবেশ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণতঃ সেটি কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব?"

এই কথাগুলি শুধু আংশিক সত্য,—সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এটুকু মোটামুটি জেনে রাখা দরকার যে মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্বজন পরিচিত 'আমি'টাকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ হয়। এই জন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাহ্যতঃ কিছুই মেলে না, সেখানেও ম্যাক্সিম গোর্কির মতো সাহিত্য-সেবকরা আমাদের বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন জুড়ে বসে থাকেন। এই কথাটি আমি সকল সাহিত্যিককেই মনে রাখতে বলি। কে কোথায় তার অসতর্ক মুহূর্তে কি কথা বলেছে সেইটিই তার জীবনের পরম সত্য নয়। কেবল তাই দিয়েই বিচার চলে না। এবং এই জন্যই ওয়াজেদ্‌আলী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে যে সব কঠিন উক্তি করেছেন, আমি তার জবাব দিতে বসবো না। রাগ যখন পড়বে, তখন আপনিই মনে হবে আমি সত্যি কথাই বলে-ছিলাম। ওয়াজেদ্‌আলী সাহেব সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা বলেছেন এইখানে, "বস্তুতঃ, দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষে ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না, এ জন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি—তার মনকে করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল। আপনার আভিজাত্যের গর্বে যে চির বিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজও দুর্জয়, বিনা-যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমিত স্থান দান কর্তেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ, মুক্তি যার নেই সে চলে না, চলতে পারে না, সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরিবিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেশ এ দেশের মুসলিমকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করে রেখেছে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজ্‌ছে না।"

এই যে বলেছেন দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির ফলে এই বিক্ষোভ এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক। মাতৃভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এতবড় কঠোর যে তার জন্যে আক্ষেপ পর্যন্ত করা বৃথা —এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিও কি জড়বুদ্ধি? মন তাঁর মুক্ত হয়নি? এ যদি সত্য তবে ওয়াজেদ্‌আলী সাহেবের এ ভাষা এলো কোথা থেকে? সহজ সুন্দর ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাঁকে কে দিলে? এ যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্য-সেবক কে আছে যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নয়? সাহিত্য ধর্মপুস্তকও নয়, নীতিশিক্ষার বইও নয়, অথচ আপন বিশাল পরিধির মধ্যে আপন মাধুর্যে সে সবকিছুকেই আপন করে রেখেছে। তাই সাহিত্য কি, রসবস্তু কি, আজও কেউ তার সত্য নির্দেশ পেলে না। কত তর্ক, কত মতভেদ। এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্বন্ধে মীজানুর রহমান সাহেব জ্যৈষ্ঠের 'বুলবুল' মাসিকপত্রে তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে অকরুণ হয়ে বলেছেন, 'শরৎবাবু তাঁর বাণিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান সমাজের যে সব ছবি এঁকেছেন, তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচুদরের লোকের নয়।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উঁচু-নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভালোমন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয়, তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না। না হোক, কিন্তু উপসংহারে যে বলেছেন, "হিন্দু সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমন ধারা নির্মম কশাঘাতও মুসলিম সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে তা জোর করে বলতে পারি। বাংলার কথা-সাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

সেদিন জগন্নাথ হলে আমার অভিনন্দনের অভিভাষণে একথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করেন, এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্বে আমি দেখে যাবো। সে যাই হোক, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর একজনের পরে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। সেদিন খেতে বসে His Excellency আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম আমার সংকল্প করে পবিত্র করতে চাই, উভয় সমাজের আশীর্বাদ। এক সমাজ নয়—চাই উভয় সমাজের সাহিত্য-সেবকদের আশীর্বাদ। যে ভাষার, যে সাহিত্যের এতকাল সেবা করেছি, তার'পরে অকারণ অনাচার আমার সয় না। আমার একান্ত মনের বিশ্বাস আমার মতো সাহিত্যের যথার্থ সাধনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা হিন্দু-মুসলিম যা-ই হোন কারোও এ অনাচার সইবে না। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্য পরিবর্তন যদি কিছু কিছু প্রয়োজন হয়—এমন ত কতবার হয়েছে—সে কাজ ধীরে ধীরে এঁরাই করবেন। আর কেউ নয়। সে হিন্দুয়ানীর কল্যাণে নয়, মুসলমানীর কল্যাণেও নয়,—শুধু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণে। এই আমার মোট আবেদন।

কোথায় কোন লেখায় মুসলিম সমাজের প্রতি অবিচার করেছি —কিনি বলেই আমার ধারণা—তার চুলচেরা বাদ-প্রতিবাদ প্রতিকারের পথ নয়, সে কলহ-বিবাদের নতুন রাস্তা তৈরি করা।

বুলবুল কাগজখানির নানা স্থান থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি—প্রয়োজনবোধে। এই পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি কামনা করি, কারণ যতটুকু পড়েছি, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই এঁদের কাম্য, আমারও তাই। হয়ত, কোথাও একটু কটূক্তি করে থাকবেন কিন্তু সে মনে করে রাখবার বস্তু নয়, ভুলে যাবার জিনিস।

কিন্তু আর নয়। বলবার বিষয় এখনো অনেক ছিল, কিন্তু আপনাদের ধৈর্যের প্রতি সত্যিই অত্যাচার করেছি। সে জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ অভিভাষণে পাণ্ডিত্য নেই, কারুকার্য নেই, কথাগুলো কেবল সোজা করে বলে গেছি, যেন তাৎপর্য বুঝতে কারো ক্লেশ বোধ না হয়। শোনার পরে কেউ না বলেন যেমন অতুলনীয় শব্দ-সম্পদ তেমনি কারুকার্য—কিন্তু কি কি যে বলা হোলো—ভালো বোঝা গেল না।

বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম, তবু তাঁদের নামোল্লেখ করতে আমি বিরত রইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা নিবেদনের একটি রীতি আছে। যেমন আছে আরম্ভ করবার সময় বিনয় প্রকাশের প্রথা। প্রথমটা করিনি। কারণ, সাহিত্য-সভার সভাপতির কাজ এত বেশী করতে হয়েছে যে এই ষাট বছর বয়সে নিজেকে অনুপযুক্ত, বেকুফ ইত্যাদি যত প্রকারের বিনয়সূচক বিশেষণ আছে নিজের নামের সঙ্গে সংযোগ করে দিলে ঠিক শোভন হবে মনে হলো না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বেলায় তা নয়। সমস্ত বিদগ্ধ মুসলিম সমাজের কাছে আজ আমি অকপটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। বলার দোষে যদি কাউকে বেদনা দিয়ে থাকি সে আমার ভাষার ত্রুটি, আমার অন্তরের অপরাধ নয়। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢাকা। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩

পড়েও যেন পড়ার আশ মিটতে চাইল না। এ যে শুধু হিন্দু-মুসলমানের সমাজগত সমস্যাই তা নয়, একটি বৃহৎ-ব্যাপক কৃষ্টিবোধও সমধিক জাগ্রত। একটি রচনার মধ্য দিয়ে বাংলার বিস্তৃত সংস্কৃতি ক্ষেত্রকেই যেন স্পর্শ করা গেল! চিরকালই আমি কিছু সঞ্চয়ধর্মী। বিচিত্রাখানি দীর্ঘকালের জন্যই সযত্নে আমার কাছে থেকে গেল। তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের শুধু অভিভাষণটিই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদও যে আমার জন্য জাগ্রত হয়ে আছে।

এরপর অনিবার্য কারণেই আবার ফরিদপুরে ফিরে যেতে হলো। গিয়ে লালুদাকে শরৎচন্দ্রের কথা নিবেদন করলাম। লালুদা বললেন, 'দেখি, এবারে কলকাতা গিয়ে যদি শরৎদাকে রাজি করাতে পারি তো আর একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করবো।' সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে একটা কমিটিও গঠন করা হলো। লালুদা চেয়ারম্যান, আমি আর নূরুল হক বলে রাজেন্দ্র কলেজের অপর একটি ছাত্র জয়েন্ট সেক্রেটারী। উদ্যোগ আয়োজনে মাস কয়েক কেটে গেল। লালুদা কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে জানালেন, 'শরৎদা অসুস্থ, আসতে পারবেন না।' শুনে শুধু যে আমাদের মনটাই ভেঙে গেল, তা নয়, সম্মেলনের সমস্ত উদ্যোগই নষ্ট হয়ে গেল। এগ্‌জিবিশন সেবারও যে না হলো এমন নয়, কলকাতা থেকে খুব সম্ভব শিশির ভাদুড়ী সম্প্রদায় গেলেন মঞ্চাভিনয় করতে। লালুদার ব্যবস্থায় চারদিকে জয়জয়কার। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অভাব কোনো উৎসব দিয়েই পূর্ণ হলো না। এমনি করেই এক সময় বছর ঘুরে এলো। লালুদা প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। তাঁর মুখ থেকেই শরৎচন্দ্রের সংবাদ জানতাম। শুনলাম—অসুখ থেকে আর তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। আরও কিছুকাল কেটে গেলে একদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প'ড়ে। বুকখানি দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠলো, অশ্রুতে দু'চোখ ভিজে গেল। শেষবার দেখা করতে গেলে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'এ দেহটাকে আর বয়ে বেড়াতে পারি না।......আমাদের কাল শেষ হয়ে এলো। শরীরের যা অবস্থা, বাঁচবোও না বেশীদিন।—' কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি সমস্ত বাংলাদেশকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এমন করে চলে যাবেন, এ কথা সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি। দিনটি গভীর ক্ষতের মতই সারা মনে জেগে রইলঃ ২রা মাঘ, ১৩৪৪। তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।"

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী দরদী কথাশিল্পী চিরকালের জন্য বাঙালীর হৃদয়ে অমর হয়ে বেঁচে রইলেন। তাঁর সাহিত্য পেলো ক্লাসিকের রূপ। চোখের আড়াল হয়েও আমাদের চোখের সম্মুখেই তিনি রয়ে গেলেন। তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম।

বান্ধা

প্রফুল্ল রায়

আকাশের সামিয়ানায় একটা রক্তচক্ষুর মত কালপুরুষ নক্ষত্রটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। আকন্দ আর আটকিরে ঝোপের ওপর, ঘন কালির মত তরল অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে; দূরের বউন্যাগাছগুলোর মাথায় একটা কাল যবনিকার নির্ম্মম পর্দা নেমে এসেছে, হিজল পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির দীপান্বিতা নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। চিহ্নহীন দিগন্ত পর্য্যন্ত শুধু একটা নিঃসীম অন্ধকারের অতলান্ত।

আর এমনি সময় বিছনার মধুর উত্তাপটুকু নিরুপায় আক্রোশে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে খাপরাছাওয়া দোচালা ঘরখানায় উঠে দাঁড়াল ফরিদ। তারপর ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ খোলার শব্দ হ'ল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে; জীর্ণ ঝাঁপটা একটু প্রতিবাদের মত আর্ত্তনাদ করে উঠল যেন।

বাইরে বেরিয়ে আড়মোড়া ভেঙে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ক্যাপা আবেগে যেন দোলায়িত হয়ে উঠল ফরিদের। আর তখনই পশ্চিমের ভিটার চৌচালা ঘরখানা থেকে এক ঝাঁক মোরগের গলায় আসন্ন প্রভাতের সূর্যবন্দনা একটু একটু করে উচ্চকিত হয়ে উঠল। কঁ-কর-কঁ, কঁ-কর-কঁ—চকিত হয়ে উঠল ফরিদ। ইস্, আজও বিছানার সোহাগ ছেড়ে উঠতে উঠতে ভোরের ঘোষণা এসে পড়েছে একেবারে। ছোট ভুইঞা একবার টের পেলে নির্ঘাৎ একহালি পয়জার ভাঙবে তার পিঠে। ভাবতে ভাবতে আড়ষ্ট হয়ে এল ফরিদের চেতনা।

কাল ইনামগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে একটু মৃদু জ্বরের উত্তাপ এসেছিল শরীরে; সেই উত্তাপটা ধীরে ধীরে উগ্র হয়ে ত্রিযামা রাত্রি অবধি শিরায়-পেশীতে নির্ব্বিরোধ রাজত্ব করে গিয়েছে ফরিদের। তাই নিশিরাত্তিরে ঠিকমত উঠতে পারে নি।

একবার বিড় বিড় করে উঠল ফরিদ, "কবে শালায় যাইতাম গিয়া চপের দলের মাঝি হুইয়া, ভুইঞা হমুন্দির পুতের কত মাইর খাওন যায়। ঐ নজিরমের লেইগ্যাই—থাউক শালায়, একদিন যামু গিয়া পলাইয়া।"

তারপরেই ইকড় ঘাসের জঙ্গলটা দলিত করে আয়নামতীর খালে দ্রুত পদসঞ্চারে নেমে গেল ফরিদ।

শ্রাবণমাসে কাঁচা পাট কেটে খালের জলে জাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল, ভাদ্রের এই শেষ দিনগুলোতে সেই পাট পচে একটা উগ্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পটভূমিটায়। ফরিদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অবাধে প্রবেশ করে স্নায়ুকে যেন অবশ করে আনতে সুরু করেছে পচা পাটের অকৃত্রিম সৌরভ।

জলের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ইতিমধ্যে তিন গোছা পাট পারের শ্যামাঘাসের জাজিম-বিছানো জমিটার এনে তুলেছে ফরিদ।

আবারও ঝুপ্ করে খালের জল তরঙ্গায়িত করে ডুব দিল ফরিদ। বেশীক্ষণ নিঃশ্বাস বন্দী করে জলের ভিতর থাকতে থাকতে বুকের মধ্যটায় কেমন যেন হাপানির দোলা লাগে। আকাশ এখানে নিরাবরণ, উদার বিস্তৃত। আর তারই নীচের এই আয়নামতীর খালটায় ভাদ্রমাসের শেষ দিনগুলোতেই পৌষের হিম যেন সঞ্চারিত হয়েছে। শীতে সমস্ত পেশীগুলো যেন কুঁকড়ে আসতে সুরু করল ফরিদের। তা ছাড়া কাল রাত্রে উগ্র জ্বরটা শরীরের মধ্যে কোথায় যেন খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। কাল ইনামগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে ছোট ভুইঞা ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ দাড়ি পরিপাটি করতে করতে হুকুম দিয়েছিল, "মধ্যি রাইতে উইঠ্যা খালের পাটগুলি সকাল হওনের আগেই পারে তুলবি। কাইলই পাট আর শোলা ছাড়ান শুরু করবি বান্দা। না হইলে পয়জার মাইর‍্যা পিঠের বাকলা (ছাল) তুইল্যা নিমু কবের কথাডা। মনে থাকে যেন।"

সবশুদ্ধ পাঁচ গোছ পাট পারে তুলেছে ফরিদ, আর সঙ্গে সঙ্গেই পূবের আকাশে ছায়া-ছায়া রঙের এক আস্তর অস্পষ্ট আলোর ছোপ পড়ল। হিজল গাছগুলোর মাথায় বথারি আর গাঙশালিকগুলো সমস্বরে প্রভাতের আগমনী সুরু করে দিয়েছে। চমকে উঠে খালটাকে আলোড়িত করে আবার ডুব দিল ফরিদ। আর উঠেই যেন খালের পারে ভূতদর্শন হ'ল তার। ঐ শ্লেটরঙের ছায়াপাণ্ডুর আকাশটা চিরে যেন এইমাত্র ইব্‌লিশের মত মূর্ত্তিটা নেমে এসেছে। এতক্ষণ খালের জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ফরিদের চোখ দুটো রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও দৃশ্যটার কোন ব্যতিক্রম হ'ল না ফরিদের চোখের আয়নায়। নাঃ, ছোট ভূইঞাই এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ডোরাকাটা বাদশাহী লুঙ্গি, চোখের কোলে সুর্ম্মার সেই সতর্ক রেখা; ময়না-কাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাড়ি; আর সন্ধানী আলোর মত দুটো ছোট ছোট সরীসৃপী চোখ—সব মিলিয়ে একটা জীবন্ত আতঙ্কের মত মূর্ত্তিটা শ্যামাঘাসগুলোর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো নিঃসন্দেহ হ'ল ফরিদ।

ছোটভূইঞা ততক্ষণে গর্জ্জন করে উঠেছে, "কি রে সুমুন্দির পুত, ভাখস নাই আমারে কোনদিন। কাছিমের ছাও শুওর। মনে করছস টের পাই নাই আমি? ক' দেখি বিছানা থিকা উঠছিস কখন? ক' শিগ্‌গীর?"

"আইজ্ঞা, আইজ্ঞা—অনেকক্ষণ।"

আতঙ্কে গলাটা বিস্ফারিত হয়ে গেল ফরিদের।

"অনেকক্ষণ? কাছিমের ছাও শুওর। অনেকক্ষণ উঠলে ঐ কয়টা পাট তুলছিস? হারামজাদা মিথ্যুক।"

ময়না কাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাড়ির অন্তরালে দাঁত ঘষার নির্ম্মম শব্দ শোনা গেল।

"আইজ্ঞা, কাইল রাইতে জ্বর হইছিল।"

ফরিদের স্বরটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে আসতে লাগল, ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর থেকে খালের জলের হিমাক্ত শিহরণটুকু মুছে গেল, শুধু চোখের কালো কালো মণি দুটো একটা অসহায় আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে তার।

শঙ্খচূর্ণী সাপের মত হিসিয়ে উঠল ছোটভূইঞা, "উইঠ্যা আয়, উইঠ্যা আয় সুমুন্দির পুত। নবাবের ছাও না কি রে হারামজাত; জ্বর হইছে? বান্দার আবার জ্বর কি? গোলামের আবার ব্যারাম কি? আয় একবার, এই পয়জার দিয়ে তোর ব্যারাম একেবারে ছুটাইয়া দি। জীবনে যাতে আর না আসে।"

আয়নামতীর খালটাকে মুহু মুহু দুলিয়ে কম্পিত পদসঞ্চারে পারে এসে দাঁড়াল ফরিদ, আর সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের থেকে বাদশাহী পয়জারটা খুলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট ভূইঞা।

পিঠের নিরীহ চামড়ার ওপর একটার পর একটা অনেকগুলো আঘাতের ধারা বর্ষণ হ'ল। দাঁতের ওপর দাঁত পিষে, পেশীগুলোকে স্তব্ধ কঠিন করে দাঁড়িয়ে রইল ফরিদ; ক্ষীণ পাণ্ডুর ঠোঁটদুটোর ফাঁক দিয়ে প্রতিবাদের একটি বিবর্ণ শব্দও বেরিয়ে এলো না।

পয়জার চালাতে চালাতে ছোটভূইঞার মেদের পর্ব্বতে তরঙ্গ উঠতে থাকে। এমন একটা বীররসাত্মক কর্ম্মের মধ্যে ঘাতকের উল্লাস রয়েছে নিঃসন্দেহে; তা ছাড়া শীতের আমেজ মাখানো ভাদ্র মাসের এই সকাল আর সন্ধ্যার সন্ধিমুহূর্ত্তে শরীরটা বেশ গরমও হয়ে উঠেছে। দু গ্লাস বিলাতী মদ খেয়েও এমন কবোষ্ণ মৌতাত জমে না।

এতক্ষণে ফরিদের পিঠের ওপরটা রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠেছে।

পয়জার চালাতে চালাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল ছোট ভূইঞা, বলল; "যা কাছিমের ছাও শুওর। দুই পহর বেলার মধ্যে পাট না তোলা হইলে মুরগীর বদলা তোরেই জবাই করুম; মনে থাকে যেন।"

তা অবশ্য ছোট ভূইঞা পারে। একবার জিদ ধরে অনেকটা কাঁচা গোস্তই চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল; দু-কষ বেয়ে টপ্ টপ্ করে টাঁড়লে-কানীর-মত ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। এখনও যেন ছোট ভূইঞার কালো কালো জোঁকের মত ঠোঁট দুটোর ওপর সেই রক্তের চিহ্ন মিশে রয়েছে।

একসময় দূরের হেউলি ঝোপটার আড়ালে ছোট ভূইঞার ডোরাকাটা বাদশাহী লুঙ্গিটা কখন যেন মিলিয়ে গিয়েছিল; এতক্ষণ খেয়াল ছিল না ফরিদের।

আচমকা বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে লাফিয়ে উঠল দ্রুত আর পিঠের ব্যথাটাও কেমন একটা প্রচণ্ড জ্বালা ছড়িয়ে দিল যেন সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোর মধ্যে।

লেবুবতী আমগাছটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট ভুইঞার বড় মেয়ে নজিরম। পনেরো বছর বয়স; ভ্রমর-কালো একজোড়া চোখের সচকিত চাহনি, আর প্রথম বর্ষায় উথল-পাথল জাগানো আয়নামতীর খালের মত দীঘল শরীরটার উপর উচ্ছ্বসিত যৌবনের মাতামাতি—এই সম্পদ নিয়ে নজিরম অজস্র জোয়ান চোখের মণিতে যেন বাদশাজাদী। জারির দলের মস্তান তাকে নিয়ে গান বেঁধেছে—

কাল নাগিনী কইন্যা তুমি, আমার বুকের জ্বালা;
তোমার গলায় দিমু কইন্যা, ডুমুর ফুলের মালা

হ্যাঁ কালনাগিনীই বটে নজিরম।

নজিরমের দিকে তাকিয়ে চোখদুটো যেন জ্বালা করে উঠল ফরিদের; আর সেই জ্বালাধরা চোখের কোণ ভরে এই প্রথম জলের ফোয়ারা নেমে এলো।

কাছাকাছি এসে নজিরম মৃদু গলায় বলল; "ইস্, তোর পিঠটা একেবারে কাটাইযা ফেলাইছে বাজান? বাজানটা মানুষ না—একটা—। আমি সন্ধ্যার সময় তোরে সিঞ্জিনা লতা বাইট্যা আইন্যা দিমু। পিঠের উপর মাখাইয়্যা দিস।"

কথাগুলোর মধ্যে সান্ত্বনার সুরভিত চন্দনস্পর্শ পেল যেন ফরিদ। আচ্ছন্ন গলায় সে বলে উঠল; "আমি আর এইখানে থাকুম না নজিরম। আর মাইর সহ্য করতে পারি না। অসুখ-ব্যারাম হইলেও রেহাই নাই। ইমাম-গঞ্জের হাটে একটা ঢপের দল আইছে, তাগো লগে নাগ্রি হইযা যামু গিয়া। সেইদিন তাগো লগে কথা কইয়া আইছি।"

"চুপ চুপ।" শঙ্কিত গলায় বলল নজিরম।

"চুপ ক্যান? আমি এমুন কি কইছি।"

বোবা চোখ দুটো একটা অসহায় প্রাণীর মত তুলে ধরল ফরিদ। উচ্ছ্বসিত জলের ওপর তার কালো কালো মণি দুটো ভাসছে।

বিন্দু বিন্দু বিস্ময় এবার নজিরমের গলা থেকে ঝরে পড়ল: "চুপ চুপ, এই কথা যেন বাজানের কাণে না যায় ফরিদ; তা হইলে তোরে কাইট্যাই ফেলাইব। তুই যে বান্দা—তোর মায়েরে নানায় কিন্যা আনছিল। নাজানে না কইব তাই তোর করতে হইব। আর কারুর কাছে পলাইয়া যাওনের কথা কইস না য্যান (যেন)। আমার বড় ডর করে।"

ফরিদের মৃদু-দুর্ব্বল ঠোঁটদুটোর ওপর কোন ভাবের তরঙ্গ কেঁপে উঠল না।

নজিরম বলল আবারও: "আমি এখন যাই, বাজানে আইস্যা পড়লে আবার তোরে মারব; সন্ধ্যার সময় তোরে সিঞ্জিনা লতা বাইট্যা দিয়া আসুম'খনে। আর—আর তোর লগে আমার একটা কথা আছে। কই কারুর কাছে কবি না?"

বুকের ভেতর আঠারো বছরের হৃৎপিণ্ডটা কেমন যেন অস্থির মাতন তুলেছে ফরিদের, রুদ্ধশ্বাস গলায় সে বলল: না, জান গেলেও কমু না।"

"মনে থাকে যেন—যা, তুই এখন কামে যা। আমি যাই।"

একজন্মর লেবুবতী আমগাছটার পাশ দিয়ে নজিরমের পাতাবাহারী শাড়ী-জড়ানো দীঘল দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ইকড়ি ঘাসের ঘন জঙ্গলটার ওপর দিয়ে খালের জলে নেমে এলো ফরিদ। এতদিনে তবে কি—?

এতক্ষণে আয়নামতীর খালের ওপর প্রসন্ন প্রভাতের সোনালী আল্পনা এসে পড়েছে; ঝলমল করছে জল-জলল। খালের পারে অর্জ্জুন গাছের ডালে বসে একটা শঙ্কচিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল;—"টি-টিহি-টি-টি-হি—"

পচা পাট আমাবাসের জাজিমে তুলে আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে পশ্চিম আকাশের সোনা-বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। একদিকে স্তূপাকৃতি হয়ে রয়েছে শোলা আর-একদিকে পাটের গোছা জমেছে পর্ব্বতের মত। আর তার মধ্য থেকে নারকীয় দুর্গন্ধটা সঞ্চারিত হয়ে বাতাসকে মন্থর আর বিষাক্ত করে তুলেছে।

এর মধ্যে বিশ বার এসে চোখের মণিতে সন্ধানী তীক্ষ্ণতা জেলে কাজকর্ম্ম তদারক করে গিয়েছে ছোট ভুইঞা; একটা নিঃশ্বাস ফেলবার অবসরটুকুও যেন ফাঁকি

দিতে না পারে বান্দাটা।' আর একবার মাত্র এক সানক রাঙা আউশের ভাত আর ঝিঙে-রশুনের ছালুন খেতে উঠেছিল ফরিদ।

সন্ধ্যার সময় মেঘনার কাইতানের (ঝড়ের) মত হু হু করে ফরিদের ওপর মাতলা জরের ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল। ছেঁড়া কাঁথা-কানির ভেতর বনবেতসের লতার মত হি-হি করে কাঁপতে সুরু করল ফরিদ। পচা পাটের দুর্গন্ধে সারাদিন অনুভূতিটা ভোঁতা হয়ে ছিল; এখন সন্ধ্যার এই মসীলিপ্ত অন্ধকারে পিঠের ওপরে ছোট ভুইঞার পবিত্র সোহাগ স্পর্শগুলো যেন তীক্ষ্ণ বেদনার আগুন ছড়িয়ে দিল।

আজ আবার অনেকদিন পর বিস্মৃতপ্রায় জীবনের ওপর থেকে যবনিকাটা উঠে গেল ফরিদের দৃষ্টির সামনে; কাঁপা কাঁপা চোখদুটোর ওপর বারো বছর আগের একটা নারীমূর্ত্তি যেন একটু একটু দুলতে লাগলো। হ্যাঁ—তার মা নজিমা। তখন ফরিদের বয়স ছিল ছ'বছর; এখনও সে স্মৃতিটা বিবর্ণ হ'তে হ'তে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় নি মনের প্রচ্ছদপট থেকে। প্রথম ভোরের ছায়াচ্ছন্ন আকাশের মত কয়েকটা অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন এখনও তার কানের ওপর রিমঝিম করে বেজে ওঠে: "বড় হইলে বেমুন কইর‍্যা হৌক, এইখান থিকা পলাইয়্যা যাইস ফরিদ। না হইলে আমার মত তোরেও মাইর‍্যা ফেলাইব এই ছোট ভুইঞা।"

জীবন্ত মানুষটা অমন কথা বলে কেন? কই তার মা তো মারা যায় নি। নিষ্প্রাণ দুটো চোখ তুলে ফরিদ তাকিয়ে থাকত তার মার মুখের দিকে।

তার পরের মাসেই কালাজ্বরে মারা গিয়েছিল নজিমা। আর সেই থেকেই এই ভুইঞাবাড়ীর বংশীবটের মত অজস্র ডালা-ঝুরিতে একটা বিশীর্ণ পরগাছার মত জড়িয়ে রয়েছে ফরিদ, সেদিন থেকেই তার পিঠের ওপর ছোট ভুইঞার পয়জার ভেঙেছে হালিতে হালিতে। সূর্য্যের আলোতে তুলে ধরলে তার পিঠের ওপর ছোট ভুইঞার বাদশাহী পয়জারের রক্তাক্ত কারুকার্য্যগুলো এখনও কালো কালো অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে—তা অবাধ পরিষ্কার নজরে আসে।

আরো একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যেদিন প্রথম পৃথিবীটাকে বুঝবার তন্ময় মুহূর্ত্ত এলো, সেদিন পৃথিবীটাকে ভারী নিষ্ঠুর, আর প্রচণ্ড নির্ম্মম মনে হয়েছিল ফরিদের। সেই প্রথম চেতনা-প্রাপ্তির সমস্ত কিছু একটা কুটিল অন্ধকারের অতলান্তে পাক খেতে খেতে মিলিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সে প্রথম শুনেছিল: নজিরমের নানা তার মাকে তিনটাকা ছ'পয়সা দিয়ে তার এক খালার কাছ থেকে কিনে এনেছিল।

ঘরের পাশেই একটা স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ মানকচুর জঙ্গল। সেখান থেকেই একটা রাত্রিবিলাসী শিয়াল ডেকে উঠল— "হুক্কা হুয়া; হুয়া-ক্কা কা-হুক্কা—হুয়া"—

একটু চমকে উঠল ফরিদ। এখন পেশীগুলোর তলায় তলায় খানিকটা আগের সেই কাঁপুনীর তরঙ্গটা থেমে গিয়েছে; কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘামের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেন।

সন্ধ্যার সময় সিজিনা লতা বেটে আনতে বলেছিল নজিরম; কই এখনও তো সে এসে উপস্থিত হ'লো না তার দোচালাটায়।

না আসুক নজিরম; এই মুহূর্ত্তে ফরিদ একটা স্মৃতি-দগ্ধ অতীতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। চোখের উপর দিয়ে ফর ফর শব্দ করে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো উড়িয়ে দিতে দিতে এক জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে গেল ফরিদ। পনের বছর বয়স তখন তার। কোষ ডিঙিটা নিয়ে ইনামগঞ্জের হাটের দিক থেকে ফিরে আসছিল সে; আয়নামতীর খালের দুব বাঁকে আসতেই আগের ছই-ওয়ালা নৌকাটা থেকে কেরায়া মাঝি কিতাব্দী মৃধার কথাগুলো পরিষ্কার ভেসে এসেছিল; তাদের সোনারঙেরই দেবেন পালকে উদ্দেশ করে সে তখন বলছে: "কোঝলা নি দেবেন্দর ভাই; আমাগো ভুইঞা বাড়ীর ঐ যে বান্দা ছ্যামরা—অরে দেখতে ঠিক ছোট ভুইঞার লখানই (মত), কি কও।"

ভুর ভুর করে তামাক টানতে টানতে উচ্ছ্বসিত গলায় উছলে উঠেছিল দেবেন পাল; "হ, হ তুই কি ক'বি—সে আমি জানি তোর জন্মের আগের থিকা। ভাখস্ না নাকমুখগুলি কেমুন চোখা ফরিদার। ও ভুইঞার

পোলাই—এই তত্ত্ব আমি শোনছি নিশি চক্কোত্তির বউর মুখে। এ আর নয়া কথা কি—বান্দীরে কি বাজনা বাজাইয়া সাদি দিব পোলা বিয়ানের লেইগ্যা।"

"তবে তো তুমি জানই; আমি মনে করছি তুমি জানই না।"

দু জনে হো হো করে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত শব্দ তুলে হেসে উঠেছিল; আর ফরিদের হাতটা থেকে আলগা হয়ে কাঁঠাল কাঠের বৈঠাটা জলের ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খেতে খেতে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিল। তখন সোনালী গোধূলি পেরিয়ে ধূসর সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে খালের ওপর—চারপাশের নিস্তব্ধ পটভূমিতে।

আর সেদিন থেকেই, তার নিজের কলঙ্কিত আবির্ভাবের ইতিহাস জানার মুহূর্তটা থেকেই ফরিদ এই রুদ্ধশ্বাস পৃথিবী থেকে মুক্তি চেয়েছে; পালিয়ে যেতে চেয়েছে জীবনের একটা প্রসন্ন দিগন্তে যেখানে অতীতের জ্বালাভরা জীবনটা নিশিরাত্তিরের একটা অপযোনির মত ধাওয়া করে যাবে না। চলেও যেত সে।

আর ঠিক-ঠিক তখনই তার আহত মনটা কি একটা সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজে পেল যেন; জ্বালা-ধরা দৃষ্টিটা তেরো বছরের নজিরনের শাপলা ফুলের মত শুভ্রস্নিগ্ধ মুখের ওপর কি একটা কোমল আশ্বাসের সন্ধান পেল। সেদিন কোন কথাই বলে নি নজিরন; তবু ভুইঞা বাড়ীর অবহেলিত ধূলিবিন্দুগুলোর মধ্যে মুখ গুঁজে যেন কিসের একটা মুঠিভরা প্রত্যাশায় পড়ে রইলো ফরিদ। তারপর আরো তিনটে বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

সমস্ত স্মৃতিটাকে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ঘরের ঝাপটাতে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ উঠল। আবার চমকে উঠল ফরিদ, ত্রস্ত গলায় বলল: কে?

"আমি নজিরন। চুপ। এই যে সিজ্জিনা লতা বাটা, পিঠটায় ভাল কইর‍্যা মাখাইয়্যা দে।" প্রায় অস্পষ্ট গলায় ফিসফিস্ করে বলল নজিরন।

"সন্ধ্যার সময় আসবি কইছিলি।"

স্পষ্ট অভিমান অনুরণিত হ'ল ফরিদের কণ্ঠে। ইতিমধ্যে সে বিছানার ওপর উঠে এসেছে। নজিরন বলল,

"চুপ আহাম্মক; বাজানে জানতে পারলে তোরে আমারে দুই জনেরেই পোচাইব, (কাটবে)।"

ফরিদ বলল চাপা চাপা নিশ্চিহ্ন গলায়, "কি কইবি কইছিলি সকালে।"

"সেই কইতেই তো আইলাম। শোন, কাইল আমারে সাদির লেইগ্যা আইছিল বাসাইলের সিদ্দিআলি বাজানের কাছে সোনার কামরাঙা, নেসর, কানের বনফুল দিয়া গেছে। আমি ঐ শয়তানটারে দেখতে পারি না দুই চোখে। তুই আমারে বাঁচাইতে পারস ফরিদ; একটা কাম করতে হইব। করবি? তোরে করতেই হইব।"

একটা ব্যাকুল আবেগে নজিরনের আচ্ছন্ন গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো; আর সেই কম্পনটা যেন ফরিদের গলাতেও সঞ্চারিত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আবার যেন তার জ্বর আসছে; বলল, "কি করুম! ক' তুই; তুই যা ক'বি তাই করুম।"

"সত্য।"

কাছাকাছি একেবারে নিঃশ্বাসের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে ফরিদের হাতদুটো জড়িয়ে ধরল নজিরন। নাচনের যেন ছন্দঃপতন হ'য়ে গেল। সাতাশের বন্যে ঢেউ খেলানো টিনের খিলান দেওয়া ঘরের পাটাতন অন্দর টুঁয়া কাঁপিয়ে ছোট ভুইঞার তারস্বরে চীৎকার ভেসে আসছে, "কই গেলি রে নজিরন, কই গেলি হারামজাদী?"

ফরিদের হাতের ওপর একটা শিশু-পারাবতের মত কেঁপে উঠল নজিরনের স্পর্শটা। ত্রস্তে উঠে বাঁশের ঝাপটায় শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল সে: "যাই রে ফরিদ; পরে কমু কথাটা। বাজানে আবার চিল্লানি শুরু কইর‍্যা দিছে বুড়া বলদটার মত।" অনেকটা রাত্রি পর্য্যন্ত অভিভূতের মত বসে রইল ফরিদ। তার আঠারো বছর বয়সের সমস্ত চেতনা দিয়েও ঠিক করে উঠতে পারছে না পনের বছরের নজিরনের মনটা। কি সে বলতে এসেছিল? সূর্য্য ওঠার আগের ছায়াচ্ছন্ন আকাশের মত মায়ের মুখটাই কেবল অস্পষ্ট হয়ে যায় নি, নজিরনকে দেখতে দেখতে প্রথম ভোরের স্নেহ অস্বচ্ছ আকাশটার কথাই মনে পড়ে যায় বার বার। পাকা মাঝি ফরিদ, রোজ বিশ পঁচিশ বাঁক জল উজিয়ে দূরের কৃষাণ জনপদ

কি খুঁধু গঞ্জগুলোতে যেতে হয়। কিন্তু তার লগি যেন নজিরমের মনের সমুদ্রে থই পায় না। সে সমুদ্র আয়নামতীর খাল এমন কি কালনাগিনী মেঘনার চেয়েও অনেক গহীন, অনেক গভীর। তা হোক্, সে-সমুদ্রে একটা স্নিগ্ধ চরের প্রত্যাশায় সে অপেক্ষা করবে। কাল হাটে ঢপের দলের অধিকারীকে যাবার কথা বলে এসেছিল; আগামী বুধবারের হাটে বলে আসবে, সে যাবে না। নজিরমের এই হৃদস্পন্দিত পটভূমি থেকে সে যেতে পারবে না। মোরগ-ডাকা সকালে উঠে একটা চার- মাল্লাই নৌকা নিয়ে বাসাইলের দিকে চলে গিয়েছে ছোট ভূইঞা। সিকিমালির বাপ চিটাগাঙের বন্দরে ধানের বড় পাইকার। আর তারই ছেলের হাতে নজিরমকে তুলে একটা হুনের কুটুম্বিতা পাকাপকি ভাবে গেঁথে নিতে হবে।

এখন এক প্রহর বেলা চড়েছে, ভাদ্রের সূর্য্যটা একটু একটু করে উগ্র হতে হতে জ্বালা ছড়াতে সুরু করেছে। ভাঙা দোচালাটার সামনে কাঁথাকানি জড়িয়ে স্তূপাকার হয়ে বসে আছে ফরিদ; অর্থহীন দৃষ্টিটা অনেক দূরের নিঃসীম চক্ররেখায় ছড়ানো।

বাইরের ঘরের আগাল দিয়ে নিশ্চুপ পদসঞ্চারে পাশে এসে দাঁড়ালো নজিরম, ডাকল, "ফরিদ, এই ফরিদ!"

চকিত হয়ে মুখ তুলে নজিরমের দিকে তাকালো ফরিদ।

নজিরম বলল: "কাইল তোর এইখানে যে আইছিলাম বাজানে টের পাইছে। আমি কইলাম বাইর বাড়ী থিকা একটা পুতলা আনতে গেছিলাম। আমারে বজানে আর বাইর হইতে নিষেধ করছে; সিকিমালি শয়তানগো গেরাম থিকা কেউ আইস্যা দেখলে নাকি নিন্দা হইব। খালারে পইর (পাহারা) রাখছে।"

ফরিদ থরথর গলায় বলল, "তুই কি ক'বি কইছিলি কাইল?"

এদিক-ওদিক দৃষ্টির অনুসন্ধানী আলোটা দুলিয়ে নজিরমের গলাটা চমকিত হয়ে উঠল: "চুপ একেবারে। খালা আইস্যা খাড়াইছে ধানের ডোলটার কাছে।" তারপরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তার কণ্ঠ: "আস খালা আস, ফরিদারে দিয়া কয়টা কাউ পাড়ামু, খাইবা?" ধানের ডোলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এ'ল নজিরমের খালা; কাউফলের কথায় তার মুখ-চোখের ওপর কতকগুলো লোভার্ত্ত রেখা ফুটে উঠেছে। বলল, "খামু—নিচ্চয় খামু।"

নজিরম বলল, "ফরিদ, তুই খালের পারের গাছটা থিকা কয়টা পাইড্যা দিবি?

"দিমু।"

নির্ব্বোধ দৃষ্টিটা একবার নজিরমের আর একবার খালার মুখের ওপর স্তব্ধ রেখে উঠে দাঁড়াল ফরিদ। তারপর হন হন করে আয়নামতীর খালটার কাছে এসে তরতর করে বনবিড়ালের মত কাউগাছটায় উঠে গেল।

মচ্‌কা ডাল, গাছের মাথায় বড় কাউটা ছিঁড়তে গিয়ে কাঁথা-কাপড় নিয়ে একেবারে খালের ওপর ভেঙে পড়ল ফরিদ। আর হি-হি করে একটা বুনো ভামের মত কুৎসিত গলায় হেসে উঠল নজিরমের খালা। "ছাখ, ছাখ বান্দাটার কেমুন জলের উপুর ডাল ভাইঙ্গ্যা পড়ছে—হি হি; যেমুন কেরামতি দেখাইয়া গাছের আগায় উঠতে গেছিল। আক্কল হইছে।" আগ্নেয় দৃষ্টিতে খালার মুখের দিকে তাকিয়ে হন হন করে নজিরম অন্দর বাড়ীর দিকে চলে গেল।

দুপুরের দিকে সূর্য্য যখন আরও উত্তপ্ত হয়ে অকৃপণভাবে আগুন ছড়াতে লাগলো, ঠিক তখনই ফরিদ কাঁথা কাপড়গুলো দোচালাটার ওপর ফেলে পিছনের মোথরা জঙ্গলের ছায়ায় মাথা খালের ঘাটে আসতে আসতে সজনে গাছটার পিছনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেশী গাব গাছটার কোমল ছায়াবেষ্টনী আয়নামতীর খালে তির তির করে স্পন্দিত হচ্ছে; আর সেই মৃদু নেশার মত জলে দাঁড়িয়ে নজিরম বুকের কাপড়টা সরিয়ে প্রথম যৌবনের লাল চন্দনের মুকুট-পরানো অপূর্ব্ব পরিপূর্ণতা দেখছে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছে।

আঠারো বছর বয়স ফরিদের; ঠোঁটের ওপর গোঁফের শ্যামলাভ রেখা পড়েছে। কৈশোর আর যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে সেও একটা বাসন্তী চেতনার বাদশাজাদা; তার রক্ত যেন কেমন চনমন করে উঠল

আর সঙ্গে সঙ্গেই গলার মধ্য দিয়ে নিজেরই অজান্তে জারিগানের দলের মস্তাজের বাঁধা গানটা আপনিই গড়িয়ে এলো—

কালনাগিনী কইন্যা তুমি আমার বুকের জ্বালা,
তোমার গলায় দিমু কইন্যা ডুমুর ফুলের মালা।

চকিত হয়ে বুকের ওপর কাপড়টা টেনে দিল নজিরম; তারপরেই আর্ত গলায় চীৎকার করে উঠল: "গেলি, গেলিবে বান্দা! না হইলে আমি এখনই খালাগো ডাক দিমু।"

একটা মধুর ঘুমের আচ্ছন্নতার মত শান্ত কোমল দুপুর। ঘাটের ওপর গাব আর হিজল গাছের ঘনপত্র ছাউনি আর তারই নীচে কুমারী মেয়ের অভিমানী মুখের মত আয়নামতীর গহন-কালো খালটা ছল ছল করছে।

ইতস্তত গলায় ফরিদ বলল: "তুই যে কি কইবি কইছিলি? তাই—"

নজিরমের চোখে মুখে রাঙা লজ্জার ঝাঁঝ ছুটলো; "কিছু ন, যা যা শয়তান। বান্দা কোথাকার? এখানে তোরে আসতে কইছিল কে? গেলি না এখনও?"

একবার আহত দৃষ্টিটা নজিরমের মুখের ওপর ফেলে স্খলিত পা দুটো টেনে টেনে সজনে গাছটার আড়াল থেকে মিলিয়ে গেল ফরিদ।

সন্ধ্যার সময় বাসাইল থেকে চার মাল্লাই নৌকা করে বাড়ী ফিরে এসে ডাকাত-পড়ার মত চীৎকার করে উঠল ছোট ভূইঞা: "কই রে বান্দা, মতিহারী তামুক ভইর‍্যা দিয়া যা এক কলকি। হেইর পর মুরগী জবাই কর তিনটা, আইজ বড় ফুর্তির দিন।"

বিকেলের দিকে আজও আবার কাঁপতে কাঁপতে জ্বর এসেছিল ফরিদের, ছোট ভূইঞার হুঙ্কার শুনতে পেয়ে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে, আর উঠেই অন্দর মহলের ঘরে এসে তামাক সাজতে বসল।

ইতিমধ্যে ফুলবিবি, আতরবিবি, নয়নবিবি আরও অনেকে বৃত্তের মত ঘন হয়ে ছোট ভূইঞার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাতাশের বন্দের ঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে নজিরম। ময়নাকাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাড়ির

সাহিত্যিকের লেখনীতে

কাজল কালি

১৯০৫এ বাঙালী স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে ঝুঁকেছিল। উৎসাহ উত্তেজনায় স্বদেশী শিল্প জন্মলাভ করেছিল অনেকগুলি, কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী বন্যার জলের মত সেগুলিকে ভেসে যেতে দিয়েছিল। সেই ভাববন্যা কাটিয়ে বাঙালীর কীর্তি স্থায়ী হয়ে রয়েছে সামান্য দু-চারটিতে।

১৯২১এ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশী শিল্পের নতুন উদ্বোধন করেছিল তারও অধিকাংশ কালের প্রবাহে ভেসে গেছে। অসহযোগ-আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল 'কাজল কালি' বাংলা দেশে আজও সগৌরবে টিকে আছে। এর কারণ ভাবাবেগের সঙ্গে এর আবিষ্কারক-পরিচালকদের চিত্তে নিষ্ঠা ও সততা ছিল। 'কাজল কালি' এক জায়গাতেই থেমে থাকেনি, সময়ের এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই কালি কলমের মর্যাদা রেখে এগিয়ে চলেছে। দামে এবং গুণে হার মেনেছে যাবতীয় বিলিতী কালি।

বাংলা দেশের একজন সামান্য বাণীসেবক আমি, বিগত শতাব্দীপাদের অধিক কাল এই 'কাজল কালি'র সাহায্যেই বাণী সাধনা ক'রে আসছি। কখনও অসুবিধেয় পড়িনি, শ্লথ হয়নি কলমের গতি, বন্ধ হয়নি লেখনীর মুখ। এরই জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবশে 'কাজল কালি'র অক্ষয় জীবন কামনা করছি।

২৬।১০।৫৩ শ্রীসজনীকান্ত দাস

গুচ্ছে এক শিশি আতর ঢেলে সকাল বেলা বেড়িয়েছিল ছোট ভুইঞা; সেই উগ্র সৌরভ বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে পরিবেশটা মন্থর করে তুলেছে। উচ্ছ্বসিত গলায় ছোট ভুইঞা বলল, "পনের দিন পর নজিরমের সাদি, কত বড় মানুষ সিকিমালিরা। সতেরটা ধানের ডোল দেখলাম খালি আউসের। নজিরম সুখেই থাকব। বেবাক চিন-পরিচিত মাইনেষের মেজবান করুমকি কও বিবিরা?"

আতরবিবির সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে সুর মেলায়; নিশ্চয়, নিশ্চয়—

শুনতে শুনতে ফরিদের হাত থেকে ঠক্ করে মাটির কল্‌কিটা পড়ে বিচূর্ণ হয়ে গেল; আর গর্জে উঠল ছোট ভুইঞা, "হারামজাদা কচ্ছপের ছাও শুওর। তোমারে আবার দশ পয়জার আজই লাগামু। আইচ্ছা থাকুক—এমুন আনন্দের দিন আইজ। যা আর এক কল্‌কি ভইর্যা লইয়্যা আয়।"

কল্কির চিতায় তামাক সাজাতে সাজাতে ফরিদের মনে হ'ল ঘরের ঐ কোণা থেকে নজিরমের জলেভরা আচ্ছন্ন দৃষ্টিটা যেন তারই দিকে একটা করুণ মিনতি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। সারা রাত্রি ঘুম হয়নি ফরিদের। ঘরের চালের ফাঁকা দিয়ে অনেকদূরের তারার চুমকি বসানো আকাশের একটু দেখা যায়। আথাল থেকে বেনে-বউ আর কাঞ্চন ফুলের মিষ্টি সুবাস বয়ে আসছে, কিন্তু ফরিদের সমস্ত চেতনাটার ওপর একটা বিষাক্ত বিষাদের আস্তর কে যেন টেনে দিয়েছে। এই আকাশ, এই সুরভিত বেনে-বউ কি কাঞ্চন ফুল সবই যেন একটা নিরবয়ব শূন্যতার পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আজ দুপুরে তার স্বপ্নময় মধুর প্রত্যাশার ওপর নজিরম প্রথম আঘাত হেনেছে। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা থেকে যেন রক্ত ক্ষরিত হতে সুরু করেছে বিন্দু বিন্দু।

ইনামগঞ্জের হাট থেকে ঢপের দলের নৌকাগুলো এখনো চলে যায় নি। দূর আকাশের দিকে নজরটা ছড়িয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলো ফরিদ—সেই ঢপের দলে চলে যাবে কিনা? তার সমস্ত চেতনাটাকে বিস্রস্ত করে ঘরের ক্যাঁচা বাঁশের ঝাপে একটা পরিচিত আওয়াজ উঠল। ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ করে শুনল ফরিদ; একটা মৃদু কণ্ঠ ঝাপের ওপাশে থর থর করে কাঁপছে।—"ফরিদ, ফরিদ—"

"কে?"

"আমি নজিরম। বাইরে আয়, শোন।"

নজিরমের গলায় একটা সকরুণ প্রার্থনা স্পন্দিত হয়ে উঠল।

বিছানা থেকে উঠে ঝাপটা খুলতেই নজিরম হাতদুটো চেপে ধরল ফরিদের। "তুই আমারে বাচা ফরিদ; আমারে এইখান থিকা নিয়া চল। তোরে আমি খুশী করুম, নিয়া যাবি না আমারে? এই সাদি আমার পছন্দ না—জান গেলেও এই সাদি করুম না।"

"নিমু।"

ফরিদের হৃৎপিণ্ডটা থেকে কথাটা যেন উছলে বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ নজিরম তার পাশে থাকলে সমস্ত পৃথিবীর ভ্রূকুটিকে সে পরোয়া করে না। এতটুকু আশঙ্কা নেই ছোটভুইঞার পয়জারের সামনে বিক্ষত পিঠটা মেলে ধরতে।—"তবে তাড়াতাড়ি চল্, আবার সকাল হইয়া যাইব।"

দুজনে দ্রুত পদসঞ্চারে ইকৃড়ি ঘাসের জঙ্গলটা পেরিয়ে খালের কিনারায় চলে এলো। বউন্না গাছটার শিকড়ে কোষ নৌকাটা রশি দিয়ে বাঁধা। নৌকায় উঠে দক্ষিণ দিকে গলুই ঘোরাতেই নজিরম বলল: "না না, পচ্চিম দিকে বাইয়া যা।"

"ঐ দিকে তো বড় নদী।" বিস্মিত গলায় বলল নজিরম। "ঐ দিকেই আমার কাম আছে।"

একবার নজিরমের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে পশ্চিম-দিকেই নৌকার মুখটা ঘুরিয়ে দিল ফরিদ। দিকচক্র পর্য্যন্ত বিসারিত সমস্ত পটভূমিতে ঘন কালির মত অন্ধকার—সে অন্ধকারে নজিরমের মুখখানি পরিষ্কার নজরে আসে না। কি জানি কি আছে নজিরমের মনে?

এক বাঁক জল উজিয়ে যাবার পর নজিরম বলল, "নাও এই ধইঞ্চা গাছগুলির কাছে থামা। আমি নামুম। এইখানেই আমার কাম। আর এই নে একটা টাকা; তুই একটু ব'স, আমারে আবার লইয়া যাবি। জানিতে পারলে বাজানে কাইট্যা ফেলব। এক টাকায় খুসী তো?"

ধঞ্চে গাছটার কাছে নৌকা ভিড়াতেই পাড়ের মাটিতে লাফিয়ে পড়ল নজিরম, আর সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে একটী দীর্ঘ পুরুষ মূর্ত্তি এগিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো, "এতক্ষণে আইলি নজিরম? আমি মধ্য রাত থিকা খাড়াইয়া রইছি।"

"ব'জানে ঘুমাইতে তবে তো আইতে পারলাম। রাগ করছিস তুই!

অন্ধকারের মধ্যেও মীর বাড়ীর নৈমুদ্দিনকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হ'ল না ফরিদের। দূরের মাদার গাছের আড়ালে নজিরম আর নৈমুদ্দিন অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই।

তবে কি নজিরম—তবে কি নজিরম নৈমুদ্দিনকেই—

গহিন-গভীর আয়নামতীর খালের অনেক নীচে যে মাটির বিছানা রয়েছে, তারও তলায় যেন একটা ভূমি-কম্পের দোলা লেগেছে। মাথাটা টলমল করছে ফরিদের। এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল ফরিদ, তারপর নজিরমের দেওয়া টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে ইনামগঞ্জের হাটের দিকে কোষ নৌকার মুখটা ঘুরিয়ে দিল। কর্ত্তব্য তার স্থির হয়ে গিয়েছে। ঢপের দলটা দু' একদিনের মধ্যেই এই অঞ্চল ছেড়ে বরিশালের দিকে চলে যাবে।…

★

অহীরাবণ

শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী

জীর্ণ পাঁজর ভরলো ঝরা ফুলে…
বিবর্ণ চাঁদ ঘোমটা দিলো তুলে…
    —দেখলো না কেউ তপ্ত আঁখি-জল!
মাটির মেয়ে ডুকরে কাঁদি'
আপন বুকে দেয় সমাধি…
আঁধার রাতে ঝড়-বাদলে নাইকো সংগীদল!
—মত্ত শিবা তুলছে গরল হাস্তে খল-খল্!

কালের সাগর ফেনায় ফেনায় ফুল
গুমরে ফেরে জটার বাঁধন খুলে
    —জোর প্লাবনে জমলো যুগের পলি!
রুদ্ধ পলির রক্ত-ছোঁয়ায়
পাঁজর দোলে জীবন-দোলায়…
চিড় হানে হায় সমাজ-যূপে রাত্রি-শেষের বলি!
—জাগলো একক নবীন শিশু সেই সমাধি দলি'।

নিঃশ্বাসে তার সৌর-কিরণ মেশা…
চক্ষে অধীর মরণ-জয়ের নেশা…
    —অটল পায়ে চলার অভিযান।
দধীচিদের বজ্র হাতে…
সর্ব্বহারার মিছিল সাথে—
কাঁপছে বাতাস, ভাঙছে প্রাসাদ—শিকল-ভাঙার গান!
—অভ্যুদয়ের প্রণাম জানাই—ব্যথায় কাঁদে প্রাণ।

বান্ধবী

সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

সেই দুপুরেরই কথা। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে শুয়ে একটা বিলিতি মাসিকের পাঠোদ্ধার করছি, হঠাৎ লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে বলে উঠল, এই তো শুভ বর। রাগ করনি তো? আরও আগে আসতে পারতাম—মা কি আর ছাড়েন? খুঁটে খুঁটে সব শুনবেন। যার ধ্যান-জ্ঞান তো আজকাল তুমি।

—আমি তোমার হয়ে গেছি তাই বলে বুঝি?

—বলতে দাও না কথাগুলো। সারাদিন তোমার কথা। যে মানুষ কোথাও বেরোন না তিনিই দশবার করে এসেছেন তোমার খোঁজে। প্যানর প্যানর করে কাণের মাথা খেয়েছেন।

হাত ধরে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম, বাপ্ রে বাপ। মাত্র পাঁচ-সাত দিনেই কি কাণ্ডটা তোমরা করলে। যত অনর্থের মূলে তুমি। এমনি করে পাগল হলে লোকে বলবে কি? লক্ষ্মী রেগে উঠে বলল, আবার ঐ লোকের কথা। আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে তারা আসবে? এখন বলছ যত অনর্থের মূলে আমি? তাতো বলবেই, সহজে তোমায় রেহাই দিয়েছি কিনা?

—বাবা, ওকে রেহাই দেওয়া বলে? তার চেয়ে ঐ বেতগাছা দিয়ে সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে, সেও হত ভালো।

লাফিয়ে উঠে গিয়ে বেতগাছা তুলে নিয়ে বলল, বটে? এবার দেখো কেমন লাগে।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, আহা, কর কি? কর কি? লাগছে যে।

—কেন আমার জিভে নাকি বিষ ঝরে, আর বেতে মধু। কেমন লাগছে মধু খেতে?

—বেতটা ওখানে রাখলে কেন? ওর যে পায়া বেড়ে গেল। ওপরে তুলে রাখো।

—রাখবোই তো। কাল থেকে পড়ায় মন না দিলে ঐ তোমার জন্যে তোলা রইল। যত সব বাউণ্ডুলে ছেলের সঙ্গে মেশা। পাস করলে কেউ বলবে না লক্ষ্মী বেতের আগায় ওকে পাস করিয়েছে, বলবে ধারে কাটা ছেলে।

—আর যদি ফেল করি?

—তবে তো বুঝতেই পার। ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না।

—দাদা, সু, আর সমীর তো আমাদের জানে।

—তারা বুঝি সবার কাছে বলতে যাবে? তা ছাড়া দাদার তো এখানকার কাজ ফুরোল। সত্যি, দাদা চলে যাবেন, ভাবতেও কেমন লাগে। সেদিন যখন বললেন চলে যাবার কথা, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল, তোমায় কী বলব। দাদা ছাড়া যেন নিজেদের ভাবতেই পারি নে।

উত্তেজনায় উঠে বসলাম, আমি তো জানতাম এখনও দু'তিন মাস আছেন, কিন্তু যেমন করে বলছ, মনে হচ্ছে কিছু যেন হয়েছে।

—কোলকাতা থেকে চিঠি এসেছে—শিগগিরই ফিরে যেতে হবে। আমার বড় ভয় হচ্ছে। জান, যাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে গড়ে উঠল আমাদের এই দেওয়া-নেওয়া, সেই যদি সরে যায়, কি করে আবার আমরা বাঁচবো? একটু থেমে বলল, বুঝতে পেরেছি, নতুন উপসর্গের কথা দাদা তোমায় বলেন নি কিছু।

উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাতে একটু দম নিয়ে বলল, শোন। এই যে তুমি বাইরে গিয়েছিলে, এর মাঝে আমার জীবনে এক ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। আমার স্বামী আমাকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে গেছে।

—তার মানে? প্রায় অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে।

—যা ভয় করছ—তা নয়। বেঁচেই আছে। আমাকে একটা চিঠি লিখে তার কোন দূর সম্পর্কের মাসির কাছে চলে গেছে আমেদাবাদে। জন্মেও তার নাম শুনি নি।

বুকের ভেতর থেকে চিঠিখানা বার করে দিয়ে বলল, পর। এতদিন পবে চিঠির ভাবার্থটুকুই মনে আছে কেবল। 'লক্ষ্মী, আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনযাত্রায় একদিনও তোমায় একটা ভালো কথা বলিনি—যত্ন করিনি, আদর করে কাছে ডাকিনি। আজ যাবার বেলায় অকপটে স্বীকার করে বিদায় নিচ্ছি—তোমায় দিয়েছি অসহ্য যন্ত্রণা, করেছি অমানুষিক অত্যাচার। আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে, তোমায় আর কষ্ট দিতে চাইনে। তোমার ঐ অনুপম রূপ, উচ্ছলিত যৌবন, অপরূপ লাবণ্য—তোমার সেবা-যত্ন কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে নি। নেশার ঘোরে এমনি করেই আমি আচ্ছন্ন হয়ে আছি। এখন মাথাটা একটু ঠিক আছে তাই এ সব লিখছি। আমার ওপর থেকে যে তোমার মন চলে গেছে তা আমি জানি। জানি না, তুমি আমায় ভালবেসেছিলে কিনা। আমি কিন্তু তোমায় ভালবাসতে পারি নি। তুমি মন থেকে আমায় মুছে ফেলো, আমায় ক্ষমা করো। এই চিঠিতেই আমাদের চিরবিচ্ছেদ বলে মেনে নিও।"

পুঃ—রানাডের কাছ থেকে পনেরটি টাকা ধার করেছি অনেক বলে-কয়ে, শেষ অনুরোধ, ঐ টাকা ক'টি দিয়ে দিও।

শেষের কথা ক'টি পড়ে একটা ঘৃণা বিমিশ্রিত শ্লেষের হাসি হেসে চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে লক্ষ্মী বলল, কথা বলছ না যে?

কাছে টেনে নিয়ে বললাম, তাই দাদা বলে গেলেন—এসে সব বলব। এখন বুঝলাম সব।

স্থির, অচঞ্চল হয়ে ও লুকিয়ে রইল আমার বুকের মাঝে। বিন্দু বিন্দু অশ্রু শিশিরের মত ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দিল আমায়। নিশ্চল, নিথর হয়ে পড়ে রইল সে।

অনেকক্ষণ পরে নিজেই উঠে চোখ মুছে বলল, কী করে যে এ ক'দিন কেটেছে! কাকে বলি মনের কথা? একটা পাখী পুষলেও তার ওপর মায়া হয়, আর এ তো মানুষ!! ভাবি হায়রে! একবার বলেও গেল না! এমনি করেই মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। যাক্‌ ভালই হল। ভুলতে বললেই তো আর ভোলা যায় না—আমার সারা অঙ্গের দাগ মনে করিয়ে দেবে তার কথা। এতদিনে ঋণমুক্ত হলাম আমি।

চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম, আর কেঁদো না। আর কি সান্ত্বনা আমি তাকে দেব? সত্যি সত্যি কি সব উজার করে তাকে দিতে পারি। মিথ্যা কেমন করে আমি তাকে বলব—আমিই তো রয়েছি এখন থেকে একান্ত করে তোমার! ভয় কি লক্ষ্মী? তা যদি বলতাম, বিহ্বল হয়ে আনন্দে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। সে যে নারী! চায় নীড়—চায় আশ্রয়, চায় আকড়ে ধরে থাকতে। নারীর প্রকাশই যে সেখানে। তাই তো নর তরু, নারী বল্লরী।

—কী ভাবছো? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, কিছুই ভাবছিনে। কেবল ভাবছি দাদা চলে গেলে তুমি কি আর এমনি করে আসবে? কে আর আমাদের এমনি করে বুঝবে?

—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।

—তোমার নিজের বাসতো গেল উঠে, এবার তোমায় থাকতে হবে—

পরবাসে? ছি ছি, ও কথা বলো না। উনিতো আমার ঘর আর আছেন মা। উঁর সব অন্যাদের দিয়ে যেতে চান। স্নেহের আধার বই ত আর কিছুই নই? উনি গুজরাটী আমি মারাঠী তবুও আমার ওপর উঁর ভালবাসা পরিমাপ করা সুকঠিন।

তেমনি কঠিন তাঁর অর্থের হদিস পাওয়া। সোনা-জহরতে হবে বোধ হয় লাখ টাকা—নগদ টাকাও কম নেই। তোমায় যে কি চোখে দেখেছেন, কী বলব? মনে মনে তোমাকে আর আমাকে নিয়ে কি ইচ্ছে পোষণ করেন তার আঁচ পেয়েছিলাম অনেক দিন আগেই। মাও জানতে পেরেছিলেন, তাঁর মনের কথা আমার অগোচর নেই। চলছিল বেশ লুকোচুরি খেলা। তিনিও জানেন আমিও জানি, মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলিনে।

কি জেনেছিল তা আমারও অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু কবে তা প্রত্যক্ষে জানতে পেরেছিলেন, লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, তুমি কাছে চলে যাবার পর। আমিই নাকি তোমাকে যেতে দিয়েছি। আমি নাকি জানতাম তুমি যাবে। কেন তাঁকে আগে বলিনি, কেন তাঁর সমস্ত ইচ্ছেকে বানচাল করে দিলাম এই হল তাঁর অভিযোগ।

এক সঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল, একটু হাঁফ ছেড়ে আবার বলতে লাগল, সেই দিনই আমার স্বামী গৃহত্যাগ করেছে সে কথা তাঁকে তখনও বলা হয়নি, হঠাৎ উত্তেজনার মুখে বেরিয়ে গেলো, মা যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

পাখাটা আরো জোরে চালিয়ে দিয়ে কাছে এসে বসলাম।

ও বলে চলল, মনে হল প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তিনি যেন খুসিই হয়েছেন, যেন যাক—আপদ গেছেতো, বাঁচা গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত হয়ে বললাম, মা স্থির হয়ে ভেবে দেখো, যা তুমি মনে মনে পোষণ করছ, তা কি সম্ভব?

মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, শুনতে পাই? কেন না?

তুমিই বল, এ কেনর জবাব কি দেব? মার মন বুঝতে না পেরে বললাম, ভালরে ভাল। ওর রয়েছে বাড়ি-ঘর, মা—ভাই বোন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ও বাধা পড়বে তোমার আর আমার মায়ার জালে?

মা হঠাৎ জ্বলে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এতদিন পরে তুই আমায় এই কথা বললি? আমি জাল পেতেছি! আমি কিনা সর্ব্বস্ব দেব বলে ছেলের মত ভালবেসেছি। কার দিকে চেয়ে তবে আমি বুক বেঁধেছিলাম? কেন তুই তবে আমার মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখলি। কেন ছেলেটার মাথা খেলি তবে। সর্ব্বনাশি? আরও কত কি অনর্গল বকে যেতে লাগলেন—তাঁর দান, ধ্যান, তীর্থ, ধর্ম্ম সব গেল—ভেবেছিলেন তোমার হাতে আমায় আর তাঁর টাকা-পয়সা সব সঁপে দিয়ে তিনি গিয়ে তীর্থবাসী হবেন। সে সব কিছুই হলনা তাঁর।

যে কথাটা হাল্কা মনে বুঝতে না পেরে বলেছিলাম তা যে এমন করে মার মনের কথাটা নিংড়ে বার করে দেবে, বুঝতে পারিনি। একেবারে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চুপ করে আচ্ছন্নের মত বসে রইলাম আমি।'

এতক্ষণ আমিও স্থির হয়ে শুনছিলাম সব কথা, তাই হঠাৎ আগু-পিছু না ভেবে বলে ফেললাম, বিস্ময় কেন?

লক্ষ্মী বুঝতে না পেরে বলল, কি বললে?

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে চুপ করে রইলাম দেখে সে চঞ্চল হয়ে উঠল, কি কথা বলছ না যে? বল কি বললে? বল ত সত্যি কি আমি তোমার কোন ক্ষতি করেছি? তবুও আমার নির্ব্বাক দেখে আমায় তছ্‌নছ্‌ করে বিভ্রান্ত করে তুলল।

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত বলতেই হল। বললাম, বিস্ময় কেন? মার এই মনের কথা স্পষ্ট জেনে না সত্যি সত্যি এ সম্ভব নয় মনে করে?

শুনে লক্ষ্মী খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। তার বুকের মাঝে যে শত সহস্র জটিল সমস্যার সংগ্রাম উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, অশ্রু হয়ে তা ঝরে পড়তে লাগল।

সান্ত্বনা দিতে যেমন তাকে কাছে ডাকলাম, আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল—আমায় তুমি এত ভুল বুঝলে? তুমি কি আমার মন জান না? জান না যে কি সংশয়-দোলায় আমার মন নিরন্তর দুলছে? আমার কী যে ভয়! কোথায় আমরা চলে এসেছি! পাছে তোমায় হারিয়ে ফেলি। এত ভাল কি মানুষ মানুষকে বাসতে পারে? উচ্ছ্বসিত আবেগে আবার কেঁদে উঠল সে।

বললাম, চুপ কর, চুপ কর। বাইরে থেকে কেউ শুনতে পাবে। আমাকে ভুল বুঝোনা লক্ষ্মী। তুমি না থাকলে কোথায় বন্যার জলে ভেসে যেতাম।

লক্ষ্মী উঠে বলল, বেলা পড়ে এসেছে। দাদারও আসবার সময় হয়ে এল। আমি যাই। ওঠ, আর শুয়ে থেকো না। যেতে যেতে আবার ফিরে বলল, পাঁচ সাত দিন আমি আর আসছিনে কিন্তু।

—তুমি না এলে বুঝি খুব পড়ব?

—বারে! তুমিই তো বললে। আর সত্যিই তো এতদিনের টাস্ক তো নিশ্চয়ই বাকী পড়েছে। পরীক্ষার আর তো বেশী দেরী নেই।

—আচ্ছা মা তো আমায় অতিষ্ঠ করে তুলবেন—বলব কি বল তো?

—সে কি আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

লক্ষ্মী হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল সন্ধ্যায় যেও কিন্তু।

দাদার আসার দেরী দেখে, তাগিদ পৌঁছুবার আগেই সন্ধ্যের দিকে, হোটেলে মার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

নগীন আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ওপরে খবর দিতে ছুটল।

তখনও হলঘরে বাইরের লোক আসে নি। চারিদিক থেকে বয়, খানসামা, দল বেঁধে ভীড় করে আমায় দেখতে এল, যেন কী পরমাশ্চর্য্য জিনিষ আমি। লক্ষ্মীও নেমে আসছিল সিঁড়ি দিয়ে, বললাম, আবার সেবারের মত পড়ে যেও না কিন্তু! কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে ওর চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল, চল ওপরে। মা তার ঘরেই আছেন। দাদা এলেন না যে?

—এখনও ফেরেন নি। আচ্ছা, এতদিন পরে আজ আমি হঠাৎ এমন কি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠলাম যে সবাই ভীড় করে আমায় দেখতে এলো?

—দেখতে কি আর তোমাকে এসেছে, দেখতে এসেছে ডুমুরের ফুল।

—তাতো বুঝলাম। তুমি বুঝি এসে সব ফলাও করে লাগিয়েছ।

—না গো না। মা যে কী সব কাণ্ড-মাণ্ড আরম্ভ করেছেন জান না তো তুমি। বয়, বেয়ারা, বাবুর্চি, কারুর আর জানতে বাকী নেই।

—আমি কি করে জানবো। মূলে তো আছ তুমি। আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র।

লক্ষ্মী হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বলল, দেখ, বেশ আছি। আমায় রাগিও না কিন্তু বলছি।

পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললাম, রাগ তোমার আবার আছে না কি? তা তো জানতাম না?

হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, মেনিমুখো হলে আর তোমার মত লোককে শায়েস্তা করতে পারতাম না।

কথা বলতে বলতে মায়ের ঘরের কাছে এসে পড়েছিলাম। আমায় দেখে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে মা বললেন, এতক্ষণ পরে বুঝি মায়ের খোঁজ পড়ল?

—আমি তো বলে পাঠিয়েছিলাম সন্ধ্যের আসব। পাঁচ সাতটা দিন মাত্র ছিলাম না। এতেই আপনারা এতটা চঞ্চল হয়ে উঠবেন বুঝতে পারি নি।

মা ম্লান হেসে বললেন, তুমি কি করে বুঝবে বাবা? নিজের মা না হতে পারি, কিন্তু মায়ের প্রাণ তো! এমনি করে কি যেতে হয়? বলে গেলেই তো পারতে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে বাবা। খেয়ে যাবার সময় শুনে যেও। শুনলাম, তোমার দাদা আসেন নি তিনি থাকলে ভাল হত।

খাবার ঘরে যেতে যেতে লক্ষ্মী বলে উঠল এবার তোমায় পাকড়াও করেছে—আর রক্ষে নেই। দেখবে এবার মজা।

—আচ্ছা কি বলব বল তো?

—উনি যে কী বলবেন কি করে জানব? তাহ'লে না হয় শিখিয়ে দিতাম কি বলতে হবে।

খেয়ে উঠে মায়ের ঘরে গেলে একটু ইতস্তত করে আগের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বললেন, তোমার দাদাকেও যে চাই।

মুক্তি পাবার আশায় বললাম, দাদাকে নিয়েই না হয় আসবো। এখনও যখন এলেন না, মনে হচ্ছে আজ আর আসবেন না। লক্ষ্মী, দাদার খাবার না হয় ওখানেই পাঠিয়ে দিও। আমি যাই।

মা অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে বাবা। আজ বলতে পারলেই মনটা হাল্কা হয়ে যেত।

লক্ষ্মী মায়ের দৃষ্টির কি অর্থ বুঝল জানি না, বলে উঠল, আমি ঘর থেকে চলে যাব মা?

মা উগ্র হয়ে ওর দিকে চাইলেন, কিন্তু আমার সামনে সংকোচে কিছু বলতে পারলেন না।

ও একটুখানি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, দরজাটা বন্ধ করে নাও মা।

মা অপ্রসন্নমুখে বললেন, মেয়ের এখন যত রাগ আমার ওপর। আমায় এখন কিছুতেই কোথাও যেতে দেবে না। যত বাধা, যত আজে-বাজে কথা এনে হাজির করবে। তোরটা তুই বুঝে নে। আমি বুড়ো মানুষ, আর কতদিন দেখবো বল? বাধা দিয়ে আমি বললাম, ও কি মা সব বুঝে নিতে পারবে?

—পারবে না আবার। তা ছাড়া ও কি একলা? এ চালায় কে? ম্যানেজার, মুন্সী আরও সবাই রয়েছেন বৈকি, তবু ওর অজানা কিছুই নেই। তবুও আমি বাইরে যাব শুনলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

—আজ ও সব কথা থাক, মা। দাদাকে নিয়েই না হয় আসব। দাদা ওকে ঠিক বুঝিয়ে দেবেন।

—তাই হবে। যাও ক'দিন একটু বিশ্রাম নাওগে। কোথায় কোথায় যে ঘুরে এলে।

—আর বলবেন না। এমন হবে জানলে কি আর যেতাম! মার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, পেছন থেকে ডাকল নগীন। বুঝলাম এবার দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু হবে।

রেলিং ধরে উদাস দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্মী, আমায় দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, মা-ছেলেতে কি কথা হল শুনি?

—কি আর হবে? হল বাইরে যাবার কথা।

আশ্চর্য্য হয়ে বলল, এতক্ষণ বসে কি ঐ একটি কথাই হল!

—ঘুরে-ফিরে সেই একই কথা। তা ছাড়া আর কি? আচ্ছা আজ যাই—কেমন? যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, সাতদিন তো মুখ দেখা-দেখি বন্ধ—না?

—তাই।

—মা যদি ডেকে পাঠান?

সে আমি বুঝবো। তুমি পড় গে, আমি যেয়ে যেন দেখতে পাই সব বাকী-বকেয়া উসুল হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে দেখি, দাদা খেয়ে-দেয়ে অন্ধকার বারান্দায় বসে আছেন। আমায় দেখে বললেন, ওখান থেকে এলি বুঝি? চেয়ারটা নিয়ে আয়, এখানে বোস্। বাঈএর সঙ্গে কথা হল।

—হল। বিশেষ কিছু নয়।

লক্ষ্মী এসেছিল নিশ্চয়ই। ঝগড়-টগড়া করিসনি তো?

—না দাদা। এত ঝঞ্ঝাট হবে জানলে কখ্খনও যেতাম না।

আমারও কিছু কম পোয়াতে হয়নি। তবে আমার মত লোকের কাছেও কতগুলো জিনিষ স্পষ্ট হয়ে গেল। সব সময়ই কেবল ভাবছি, এ অসম্ভব, কী করে সম্ভব হবে? ভেবে দেখ্। কুমারী হত বা আর কিছু হত কথা ছিল না। বয়সের কথাও না হয় নাই ধরলাম, কিন্তু ওর স্বামী রয়েছে যে। হোক্ সে অমানুষ, আইন তো প্রমাণ করবেই। অন্তদিকে নিজের চোখে দেখেছি ওই বিছানায় পড়ে পড়ে আহত মূক পশুর মত অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। একটু শব্দ হলেই উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। কত বোঝাই। বুঝ কি মানে? ওর ধারণা—নিশ্চয়ই সমুদ্র তোদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কত কথা বলি—ও একটা কথারও জবাব দেয় না।

—শুনলাম খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল।

—কার কাছে শুনলি?

—ঐ নগীনের কাছে। বেচারা কেঁদে কেঁদে সব বলছিল। লক্ষ্মীকে যে কী ভালোই বাসে।

—ওকে আবার লোকে ভাল না বেসে পারে? ওর জন্যেই বোধ হয়, বাঈও তোকে এত ভালবাসে। বাঈএর মনে কি যেন একটা ইচ্ছে আছে—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কী যেন চাপা চাপা কথা—কিছু বলতে চান, বলতে পারেন না। "ঝঞ্ঝাটের আর অন্ত নেই—কিছু ভাল লাগেনা—এখন সব ছেড়ে-ছুড়ে যেতে পারলেই ভাল হয়, ওদের জিনিষ, ওরা বুঝে নিক" ইত্যাদি।

তোকে কিছু বলেন নি?

না তো। কেবল বললেন, আপনার সামনে বলবেন। অনেক রাত হল, চলুন শুয়ে পরা যাক।

অনেকক্ষণ পরে দাদা নাম ধরে ডাকলেন,

ঘুমিয়েছিস? সাড়া দিলে বললেন, লক্ষ্মীকে সেদিন মনে খুব দুঃখ দিয়ে কতগুলো কথা বলেছি। তুই কি মনে করবি জানিনে—উপায়ের কোন পথ নেই দেখেই বলে ফেলেছি। এখন বড্ড অনুতাপ হ'চ্ছে। শুনছিস?

—বলুন।

—বলেছি, তুমি কি জাননা, যার জন্যে তোমার এত প্রাণঢালা ভালবাসা তাকে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব; একদিন না একদিন তাকে তোমায় ছেড়ে যেতেই হবে ভেবেছিলাম কত কথা না বলবে, কিন্তু একটি মাত্র কথা বলেছিল, "আমার চেয়ে তা আর কে বেশী জানে দাদা"

ও তবু একটি কথা বলেছিল, আমি কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম। দাদাও আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

[ক্রমশঃ

★

উত্তল ঃ অবতল

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

এসপ্ল্যানেডে রাত বারোটা বাজে :
অমাবস্যার রাত
মোষের মত গম্ভীর।
ধোঁয়াটে আকাশের
প্রান্ত থেকে প্রান্ত লাল
বিজ্ঞাপনের আলোক-অক্ষরে।
টাকার কুমীর স্বপ্ন দেখে এইরাতে
মুনাফার অভ্রংলিহ প্রাসাদের।

আর কোথায়……
এক জীর্ণ পচা রেস্তরাঁর ভাঙা দাওয়ায়
রাত কাটায়
খোসের অখ্যাত মলমের
এক ক্যানভেসার……
যার অনচেতন অন্তর্লোকে
অতি সস্তাদরের
এক কৌটা মলম বিক্রীর
করুণ ঘাবেদন।।

সুধায় ক্ষুধা ঘুচল না

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

সুধাই শুধু বিলিয়ে গেলাম জীবনটারে নিঃশেষি'
পাত্র কারো ভরল না ত' বুভুক্ষা তার ঢের বেশী।
ক্ষুধায় কাতর সর্ব্বহারা
সুধার কদর বুঝল না,
সুধায় ক্ষুধা ঘুচল না।
মানুষ জাতের অনেক আশ
সর্ব্বনাশা
তাইত নিতি আদুকর
মানুষ নামের অপব্যয়।
অনেক পেয়েও চাওয়ার নেশা
মানুষ জাতের এইত' পেশা
পাত্র ওদের ভরবে না—
তিলে তিলে মরবে তবু নিঃশেষে সে মরবে না।
আমার তবু দেওয়ার ব্রত
নিয়মমাফিক চলবে তা,
একটু শুধু করব পরখ
পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক;
সুধা ছেড়ে উজাড় করে গরল এনায় করব দান
মহাকালের যাত্রাপথে বাঁচুক কে টি জীবের প্রাণ।

মার্গসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিকতা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

সঙ্গীতবিদ্যা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অনুসরণ করিয়া চলিলেও আমাদের দেশে সঙ্গীতের যে আধ্যাত্মিক মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অন্যত্র বিরল। অবশ্য প্রাচীন মিশর ও গ্রীসে ধর্মের সহিত সঙ্গীতাদি শিল্পকলার যোগ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছে; খৃষ্টীয় ধর্মে, চার্চের প্রার্থনাসকল চিরদিনই অতি সুললিত সঙ্গীতের সহিতই গাওয়া হইত। চীন জাপানের প্রাচীন ধর্মে সঙ্গীতনৃত্যাদির পরিচয় আমরা পাই। ইসলাম যদিও গানকে 'হারাম' বলিয়াছেন, তথাপি পারস্যের সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাবে সঙ্গীতের প্রচলন মধ্যপ্রাচ্যে যথেষ্টই হইয়া গিয়াছে। এ সব সত্বেও আমরা বলিতে পারি, যে, ভারতে অধ্যাত্মদর্শন ও সাধনমার্গের বিবিধ বিভাগে সঙ্গীতের যে মহামূল্য স্থান, তার তুলনা অন্যান্য কোন সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায় না। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শব্দব্রহ্মতত্ত্ব এদেশের ন্যায় অন্যান্য দেশের দর্শনেও আমরা পাইয়া থাকি। আমরা যেমন বলি যে অপৌরুষেয় বাক্ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—গ্রীকগণ তেমনি বলতেন Logos হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। বাক্ ও Logos একই তত্ত্ব সূচিত করে। ভারতের ঋষিগণ বলিয়াছেন যে এই বাক্ নাদময়। নাদ হইতেই জগৎ হইয়াছে। গ্রীকগণ ভারতের এই তত্ত্ব কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাই বলিতেন, যে ঊর্দ্ধলোকে ইথারে এক প্রকার সঙ্গীত হয় এবং তাহাকে তাঁহারা Music of the spheres বলিতেন। তবে ভারতের ঋষিগণ গভীরতর জ্ঞান বলে সঙ্গীতের মূল উৎস নাদব্রহ্ম হইতেই সকল সৃষ্টির উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। নাদ সম্বন্ধে সারদাতিলকতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন—

> "সচ্চিদানন্দপ্রভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
> আসীৎ শক্তিস্ততো নাদঃ নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, সচ্চিদানন্দসম্ভূত সগুণ পরমেশ্বর হইতে এক ঐশী শক্তি বা চিৎশক্তি উৎপন্ন হন,—শক্তি হইতে নাদ ও নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি। জগতের আদিতে এক অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ধারণা ঋষিগণের সাধনলব্ধ অনুভূতির কথা। সচ্চিদানন্দব্রহ্ম তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণসকলের বিকাশের ফলে সগুণ ও শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরশক্তি হইতে এক আদি নাদ উৎপন্ন হয়, কেন না সৃষ্টিমাত্রেই স্পন্দনাত্মক। গতি ভিন্ন সৃষ্টি হয় না—আর যেখানেই গতি থাকিবে—সেখানে একটি শব্দও উৎপন্ন হইবে। আদি শক্তির স্পন্দনে তাই যে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাকেই শাস্ত্রে নাদ বলিয়াছেন। আর এই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি। শক্তির প্রাথমিক স্পন্দনকে নাদ ও এই স্পন্দনের ফলে যে অনন্ত অণুসকল গঠিত হয় তাকেই শাস্ত্রে বিন্দু বলা হইয়াছে। আত্মগঠিত বিন্দু বা Monad-এর পরিণাম হইতেই জগতের সৃষ্টি। থিয়সফির Monad-তত্ত্ব যাঁহারা ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিন্দুশব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

নাদ হইতেই এইভাবে বিন্দু ও বিন্দু হইতে জগতের সৃষ্টি শাস্ত্রে আমরা দেখিতেছি। আর এই নাদই সঙ্গীতের মূল কথা—সঙ্গীতশাস্ত্রের সকল সাধ্যসাধনা নাদকে নিয়াই চলিয়াছে। সঙ্গীতরত্নাকর বলিয়াছেন—

> "চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং বিবৃতং জগদাত্মনা
> নাদব্রহ্ম তদানন্দমদ্বিতীয়মুপাস্মহে।"

অর্থাৎ সর্ব্বভূতের চৈতন্য স্বরূপ সেই নাদ-ব্রহ্মকে আমরা উপাসনা করি,—যিনি নিজ আত্মার দ্বারা জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন; যিনি অদ্বিতীয় ও আনন্দস্বরূপ।

তন্ত্র ও বেদশাস্ত্রে আমরা দেখি, যে, নাদ বা শব্দ দ্বিবিধ, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। বর্ণাত্মক নাদ বা মন্ত্রই বেদতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সাধনীয়। কিন্তু নাদের যে ধ্বনিময়

বিকাশ, তাহার চর্চা গৌণভাবে বেদ ও তন্ত্রে থাকিলেও সঙ্গীতশাস্ত্রেই তাহার বিশেষ সাধনা পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীত ধ্বনিময়, কাজেই ধ্বন্যাত্মক নাদের সাধনা যে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়াই অনুশীলিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। তাই সঙ্গীতরত্নাকর বলিয়াছেন 'গীতং নাদাত্মকং'। এই নাদের ধ্বনিময় প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থা আছে। সৃষ্টির আদিতে যে ধ্বনির বর্ণনা শাস্ত্রে আমরা পাইয়া থাকি, তাহাকে পরানাদ বলা হয়। আর কারণ ও সূক্ষ্ম জগতের নাদকে পশ্যন্তী ও মধ্যমা নাদ শব্দে অভিহীত করা হয়। আমরা কণ্ঠ বা যন্ত্রে যে ধ্বনি শুনিয়া থাকি, তাহাকে বৈখরী নাদ বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রে নাদের অনাহত ও আহত এই দুই মোটামুটি বিভাগও দেখা যায়। কানে যে নাদ বা ধ্বনি শোনা যায়, তাহা কণ্ঠের সহিত বায়ুর আঘাত বা বাদ্যযন্ত্রের তারে অঙ্গুলির আঘাত, শ্বাসবায়ুর বংশীবিবরে আঘাত, বা মৃদঙ্গাদিতে হস্তাদির আঘাতের ফলে উৎপন্ন হয়। কোনও না কোনও প্রকারের আঘাতের ফলে উৎপন্ন এই সব ধ্বনিকে তাই আহত নাদ বলা হইয়াছে। আর যে ধ্বনি অন্তরের আকাশে আমরা শুনিতে পাই, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহাই অনাহত। সঙ্গীতশাস্ত্রে অনাহত ধ্বনিকে 'আদি নাদ' বলা হইয়াছে। কোনও ধ্রুপদে আমরা পাই—'অনাহত আদি নাদ গুণসাগরস্বরূপ' আবার আরেকটি ধ্রুপদে দেখি 'আদি নাদ 'প্রণবরূপ ঝঙ্কার', অনাহতধ্বনির বর্ণনা অনেক প্রাচীন ধ্রুপদে দেখা যায়। কলাবিদ্ ধ্রুপদ-গায়কগণ ও যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে ওঁকাররূপ অনাহত ধ্বনিই সকল সুরের উৎপত্তিস্থল। মানব-হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে যোগের দ্বারা উহা শ্রুতিগোচর হয়। এই অনাহত ওঁকারকে শাস্ত্রে কারণধ্বনি বলা হইয়াছে। কারণজগৎ হইতে সূক্ষ্মজগৎ ও সূক্ষ্মজগৎ হইতে যেমন স্থূলজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি ওঁকাররূপী কারণধ্বনি বা অনাহত ধ্বনি হইতে সূক্ষ্ম কল্পনাসৃষ্ট সপ্তসুর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্চ্ছনা ও রাগরাগিণীর সূক্ষ্মধ্বনি সৃষ্ট হইয়াছে। প্রতি গায়ক বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনে মনে সুরের যে কল্পনা করেন তাহাই সূক্ষ্মধ্বনিময় সুর। এই ধ্বনিকে মধ্যমা ধ্বনি বলা যাইতে পারে। আর যখন কণ্ঠে বা যন্ত্রে ধ্বনিসকলের স্থূলরূপ প্রকাশ হয়, তখন তাহাই বৈখরীধ্বনি নামে অভিহীত হয়। ধ্বনির তাই চারিটি ভাগ—শক্তিরূপী পরা ধ্বনি বা supramental; প্রণবধ্বনি বা পশ্যন্তীধ্বনি, কারণরূপী Monadic ও intuitive বলিতে পারি, সূক্ষ্ম মধ্যমাধ্বনি যাহা মন প্রাণ সঞ্জাত imaginative; এবং সর্বশেষে বাহিরের জগতে অভিব্যক্ত স্থূলধ্বনি যাহা physical বা বৈখরীধ্বনি। সঙ্গীতবিদ্যার উৎপত্তি, প্রণব বা causal sound কারণধ্বনি হইতে, কিন্তু ইহার সূক্ষ্মবিকাশ মনপ্রাণনির্মিত সূক্ষ্মধ্বনিময় জগতে ও পরিশেষে ইহার স্থূলবিকাশ কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জাগতিক গীত-বাদ্যাদির রূপে।

মানবীয় সকল সংস্কৃতির সকল সৃষ্টির মধ্যেই অধ্যাত্ম বা কারণজগৎ, মানস বা সূক্ষ্ম জগৎ, এবং বাহ্য বা স্থূল-জগতের শক্তির বিকাশ রহিয়াছে। মানবের মধ্যে এই ত্রিবিধ জগৎই রহিয়াছে। তবে তাহার সৃষ্টিতে অধ্যাত্ম প্রভাব, সূক্ষ্মপ্রভাব ও স্থূলপ্রভাবের তারতম্য থাকিতে পারে। যে সকল সংস্কৃতিতে অধ্যাত্ম ও সূক্ষ্মপ্রভাব সমধিক, সে-সকল সংস্কৃতির স্থান বাহ্য-সর্বস্ব সংস্কৃতি অপেক্ষা উচ্চতর। ভারতীয় শিল্পকলা সর্বদাই অধ্যাত্ম ও সূক্ষ্মপ্রভাবে পরিপূর্ণ তাই ভারতীয় কলাবিদ্যার স্থান প্রায় ব্রহ্মবিদ্যারই তুল্য। সঙ্গীতবিদ্যা সকল কলা বিদ্যার এক মর্মস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—কেননা সঙ্গীতের আকর্ষণী শক্তির তুলনা হয় না। সঙ্গীতের প্রভাবে মানবগণ সহজেই মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া যায় তাই যে-সঙ্গীত অধ্যাত্ম ও সূক্ষ্মপ্রভাবে পূর্ণ, তাহা মানবচিত্তকে সহজেই তাহার স্থূল ক্ষুধা তৃষ্ণা বাসনাদির উপরে সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম অনুভবে বা অধ্যাত্ম আনন্দের প্রবাহে তুলিয়া নিয়া যায়। তাই সঙ্গীতরত্নাকর বলিয়াছেন—'বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতি-বিশারদঃ তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি।

ভারতে রাগরাগিণীর স্বরূপে ও বিভিন্ন তালের ও লয়ের ছন্দে, এক স্বর্গীয়প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সকল রাগরাগিণীগুলি ঐশীশক্তির বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিগ্রহরূপে পরিচিত। গান্ধর্ববিদ্যায় রাগরাগিণীগুলির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সামগানে সঙ্গীতের প্রাথমিক বিকাশ দেখা গেলেও, পৌরাণিক গান্ধর্ববিদ্যাতেই সঙ্গীতের পরি-

পূর্ণ রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধর্ববিদ্যা বা মার্গসঙ্গীত তান্ত্রিক পৌরাণিক সাধনারই সমসাময়িক। নারদ, ভরত, হনুমান প্রভৃতি সঙ্গীতসিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই বিদ্যার সম্যক বিকাশসাধন করিয়াছেন।

গান্ধর্ববিদ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি রাগ এবং পার্ব্বতীর মুখ হইতে অপর একটি রাগ, এইভাবে ষড়রাগ ও সেই সেই রাগানুযায়ী ছত্রিশ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। কোনো কোনও পুরাণে আমরা দেখিয়া থাকি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ওঁকার উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে অন্যান্য রাগরাগিণীগুলি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কল্পনা সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন রসশাস্ত্রে দেখা যায় যে কাব্যশিল্প সঙ্গীতের রসের সহিত ব্রহ্মানন্দরসের সজাতীয়তা কল্পিত হইয়াছে। উচ্চ শিল্পের রসকে 'ব্রহ্মানন্দসহোদর' রূপে শাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন। তাই ঈশ্বরের ও শক্তির প্রকাশরূপে সকল রাগরাগিণীর উপলব্ধি ও বহির্ব্বিকাশ সকল সঙ্গীত-সাধকগণেরই সাধনীয়। শান্ত, দাস্য, মধুর প্রভৃতি চিত্তের প্রধান প্রধান ভাব ও শান্ত, শৃঙ্গার, করুণ, বীর প্রভৃতি বিভিন্ন রস অনুযায়ী ভগবান ও ভগবতীর অনুধ্যান এবং সঙ্গীতের সাহায্যে ঐশ্বরিকরূপ ও লীলার প্রকাশই মার্গসঙ্গীতের লক্ষ্য। হিন্দুরাজত্বকালে বিভিন্নরাগে অনিবদ্ধ আলাপ ও বিভিন্ন স্বর ও তালে নিবদ্ধ গীত, গীতানুযায়ী বীণাদি বাদ্য এবং গীতবাদ্যানুযায়ী ভাব, অঙ্গভঙ্গী ও করচরণাদির বিক্ষেপাদি যুক্ত সাত্ত্বিক নৃত্য, মার্গসঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতির সূচনা করিয়াছিল। ছন্দপ্রবন্ধময় গানই তখন মার্গগীত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তখন বিভিন্ন রাগের বিভিন্ন ভাব ও রস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত, সেরূপ বিভিন্ন ঋতু ও সময়ানুযায়ী মানবচিত্তের ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে তদনুযায়ী রাগ গাওয়া বা বাজানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

হিন্দুরাজত্বের অবসানে মার্গসঙ্গীত হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটী দুই বিভাগে বিভক্ত হয়। তামিল তেলেগু ভাষায় কর্ণাটী সঙ্গীত এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় ধ্রুবপদ সঙ্গীত রচিত হইতে থাকে। হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের আসন ধ্রুবপদকেই দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দ্বারা ধ্রুবপদ বা অধ্যাত্মপদ লাভ হয়, তাহাকেই ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ বলা হয়। ধ্রুপদসঙ্গীতে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রকাশক গীতপদ বহুপরিমাণে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ধ্রুপদই ব্রহ্মের স্বরূপের, ঈশ্বরের ও ঐশী শক্তির বিভিন্নরূপের ও বিভিন্ন ভাবের বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং ভক্তিই ইহার প্রাণস্বরূপ। ধ্রুবপদসঙ্গীতের প্রথম বিকাশ নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজু প্রভৃতির গানে পাওয়া যায়। পাঠানরাজত্বকালেই তাঁহারা ভারতভূমিতে আবির্ভূত হন। বৈজু একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন আর নায়ক গোপাল কর্ণাটদেশীয় একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা দুজনেই সমসাময়িক। সুলতান আলাউদ্দিন নায়ক গোপালকে দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরভারতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন।

পাঠানরাজত্বের অবসানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রাক্‌ভাগে সঙ্গীতের চর্চ্চা মোটামুটি চলিলেও, সম্রাট আকবরের সময়ই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পূর্ণবিকাশ সংসাধিত হয়। ঐ সময় সঙ্গীতসিদ্ধ ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস স্বামী বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি নাদবিদ্যায় দীক্ষিত বহু শিষ্য তৈয়ারী করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে তানসেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তানসেন ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু মুসলমান বংশে বিবাহের ফলে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে যুগে তানসেন, কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকগণ মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের শিক্ষার সহিত বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সংসাধন করেন। ইঁহারা জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে নিরাকার ও সাকার উভয় উপাসনার এক সামঞ্জস্য বিধান করেন। তানসেনের ধ্রুপদগুলি এই সামঞ্জস্যেরই এক প্রধান নিদর্শন। তানসেন আকবর বাদশাহের সঙ্গীতগুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও আকবরের নবরত্ন সভায় প্রধান রত্নরূপে গৃহীত হন। তানসেন সহস্রাধিক ধ্রুপদ রচনা করিয়া বাদশাহের দরবারে গাহিয়াছেন। তাঁহার তুল্য সঙ্গীতকলাবিশারদ ইতিহাসে অতীব দুর্লভ।

তানসেনের পর তাঁহার পুত্র ও দৌহিত্রদের বংশে ও তাঁহার নানা শিষ্যের বংশপরম্পরায় ধ্রুপদ গান ও সঙ্গে

সঙ্গে বীণা, রবাব, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের বাদ্যপদ্ধতি ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার দৌহিত্রবংশীয় শাহ সদারঙ্গ পারস্যদেশীয় কৌলুকলুবানা পদ্ধতির সহিত হিন্দুস্থানী ধ্রুব পদ্ধতির সংমিশ্রণে খেয়াল গানের উৎকর্ষ সাধন করেন। পরে বহু খেয়ালী গায়ক ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে লোক-সমাজের রুচি লঘুতর হওয়ায়, ধ্রুপদ-সঙ্গীত ও ধ্রুপদানুগ বীণা-পদ্ধতির পরিবর্তে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি গান ও সেতার স্বরোদের বাদ্যে গৎ-তোড়ার স্থূল প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশে মোগলযুগের মাঝামাঝি সময় শ্রীচৈতন্য, কবীর, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার যে আধ্যাত্মপ্রভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে আবার নির্জীব হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিকতার অভাব বশতঃ কল্পনাগত সৌন্দর্য্যভোগের প্রবৃত্তি বা অরো তরল সব বৃত্তির লীলাক্ষেত্ররূপে সকল কলাবিদ্যার প্রয়োগ দেখা যায়। ইংরাজ রাজত্বকালে পাশ্চাত্যপ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ববিভাগেই যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও শিক্ষিতসমাজে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। আমাদের আধুনিক সঙ্গীত আধুনিক মনোভাবেরই যোগ্য বাহন। কিন্তু ইহা বহু বৈচিত্রে পরিপূর্ণ হইলেও ইহাতে পূর্ব্বের আধ্যাত্মিক একতান প্রবাহের একান্তই অভাব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ঠাকুর পরিবারে এক সময় ধ্রুপদানুগত আধ্যাত্মিক বাংলা গান রচিত হইতে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু গান ঐরূপ উচ্চভাব ও উচ্চগ্রামের পরিচায়ক। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলার সঙ্গীতস্রষ্টাদের মধ্যে সেই প্রভাব বিলুপ্তপ্রায়। শুধু দিলীপ কুমার, নজরুল প্রভৃতি দুয়েকজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী স্রষ্টা রাগমিশ্র, কাব্যসঙ্গীত ও ভজনে আধ্যাত্মিক ও ভক্তিভাবময় সঙ্গীতের নিদর্শন সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। মার্গসঙ্গীতের ন্যায় ভারতীয় বীণাপদ্ধতির যন্ত্রালাপে ও ভারতনৃত্যেও আমরা আধ্যাত্মিক আদর্শের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি—এখন এ সকলও ভারতবর্ষে ক্রমেই অনাদৃত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আলাউদ্দিন প্রভৃতি ২।১ জন তন্ত্রকার যন্ত্রসঙ্গীতে ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অম্বিনী দেবী নৃত্যকলায় আধ্যাত্মিক মহৎ আদর্শপ্রচারে এখনও ব্রতী আছেন। ইঁহাদের আদর্শ সকলেরই অনুসরণীয়। আমরা একথা বলি না যে, সকলই আধ্যাত্মিক হইবে বা লঘু কলার কোনও স্থানই থাকা উচিত নয়। সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে লঘু গুরু প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন অধিকারানুযায়ী থাকিবেই। আর প্রাচীনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তিও বাঞ্ছনীয় নয়। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ও বিশাল দিক্ সকল উপেক্ষা করিয়াও ক্রমবিকাশ চলিতে পারে না। সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক অংশের মূল্য চিরন্তন—উহা ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া নানা দিকে নানা ভাবে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষসাধন সহজেই সম্ভবপর। লঘু সৌন্দর্য্যের মূল্য স্থান কাল পাত্র বিশেষে অবশ্যই আছে। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগেই প্রতি জাতির স্থায়ী সম্পদ্ তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যে নিহিত, এবং এই বিকাশের যে সকল প্রাচীন নিদর্শন, সেগুলির চর্চ্চা ও আদর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়। প্রাচীনের মধ্যে যাহা কিছু শাশ্বত সে সকল বিকৃতির অতলে বিসর্জ্জন দিবার কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশেও আজো তাহাদের cl ssica music বা প্রাচীন আদর্শসঙ্গীতের সমাদর যথেষ্ট

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় তাই আমরা বলি—

"The object of spir-tual thing is to find our what is eternally true."

অর্থাৎ যাহা শাশ্বত সত্য তাহা আবিষ্কারই আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যেরূপ সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবেই প্রযোজ্য।

অয়েল

আপটন সিনক্লেয়ার ★ অনুবাদ ঃ যতীশ বেদজ্ঞ

চতুর্থ অধ্যায়

ভাবনা চিন্তা সেরে নিয়ে ড্যাড তার ব্যাঙ্কের হিসাবটা একবার দেখে নিল তারপর স্থির করে ফেললো তার কার্যক্রম। 'রস জুনিয়র—এক নম্বর' নাম দিয়ে ওরা প্রথমে বসাতে সুরু করবে ওদের প্রথম কুয়োটা। একসেলসীয়র পিটের গোষ্ঠীকে এবার ওরা দেখে নেবে এক হাত, তাদের এবার ওরা বুঝিয়ে দেবে তেলের ব্যবসাটা তাদের কিছু একচেটিয়া নয়। আপাতত ড্যাড এখন এখানেই থেকে যাবে আর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সুরু করিয়ে দেবে কাজটা। ফোন করে সে ডেকে পাঠাল তার ভূতত্ত্ববিদকে আর একজন ঠিকাদারও যোগার করে ফেললো জলের কুয়ো বসাবার জন্য।

পরদিনই এসে হাজির হলেন ভূতত্ত্ববিদ মিঃ ব্যানিং আর এসেই এক কথায় চুরমার করে দিলেন বান্নির সব আশা ভরসা। ড্যাডের কথা সমর্থন করে তিনি জানালেন মাটির উপরের ওরকম তেলের দাগের পরে খুব একটা কিছু নাকি নির্ভর করা চলে না। সময় সময় দুএকশ ফিট নীচুতেও তেলের সন্ধান মিলতে পারে কিন্তু তা কখনও খুব বেশী হতে পারে না।

ওরকম কুয়ো বসাতে হলে অবশ্য ছোট একটা যন্ত্র নিয়ে এলেই চলতে পারে, ঠিক যেমনটা ব্যবহার করা হতো আগেকার দিনে পেন্সিলভেনিয়ার কুয়োগুলোর জন্য; কিন্তু এখানে সত্যিকারের তেল থাকলে তা খুব নীচুতেই থাকবার কথা আর সে পর্যন্ত কুয়ো না বসিয়ে কোন কিছুই ঠিক করে বলা চলে না। তবে এই অঞ্চলটার বৈশিষ্টগুলো তার নাকি মোটামুটি আশাপ্রদই মনে হচ্ছে—কাজেই একবার দেখলেও দেখা যেতে পারে পরীক্ষা করে। ড্যাড আর বান্নীর সাথে দুদিন তিনি পরীক্ষা করে বেরালেন পাহারের ঢালুটার স্তরগুলো, তারপর শেষ পর্যন্ত ড্যাডের সাথে একমত হয়ে পছন্দ করলেন ওয়াটকিন্সদের খামারটার একটা পাহাড়ের পাশের একটা জায়গা।

জলের কুয়ো বসাবার মিস্ত্রী এসে জানালো নল বসাতে ফুট প্রতি খরচা পড়বে দু ডলার বার সেন্ট। অযথা দেরী না করে ড্যাড চুক্তি করে ফেললো তার সাথে, প্রতিদিন বসাতে হবে নির্দিষ্ট কয়েক ফুট নল, তার বেশী পারলে তাকে দেওয়া হবে উপরি পুরস্কার কিন্তু কম হলে কেটে নেওয়া হবে তার বেতন থেকে।

এরপর ড্যাড আর বান্নী চললো মিঃ জেরেমিয়া ক্যারির সাথে দেখা করতে,—ভদ্রলোক রোজভিলের আশেপাশের একটা খামারের মালিক আর স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের চেয়ারম্যান। রাস্তা-ঘাটের ব্যাপারে সব কিছুই নির্ভর করে এই বোর্ডের পরে।

রাস্তাটার অনেকটাই গেছে ড্যাডের জমির উপর দিয়ে। বান্নী তার সরল বুদ্ধিতে ভেবেছিল কুয়োটার মত এবেলাও ড্যাড বন্দোবস্ত করে ফেলবে একজন ঠিকাদারের সাথে—কিন্তু ড্যাড বললো রাস্তার ব্যাপারে নাকি তা চলবে না।

ঢালুটার পাশ বরাবর প্যারাডাইস থেকে রোজভিল পর্যন্ত গোটা রাস্তাটাই হচ্ছে সরকারী রাস্তা, কাজেই ওটা বাধানো আর পাকা করবার ব্যবস্থাও হওয়া উচিত সরকারী টাকাতেই। অবশ্য ড্যাডকেই এ রাস্তাটা ব্যবহার করতে হবে আর সকলের চাইতে বেশী, কিন্তু সে জন্য ট্যাক্স তো সে দেবেই; তারপর ঢালুটার দুপাশে যাদের জমি আছে তাদের সকলকে এক দিকে যেমন ট্যাক্স দিতে হবে তেমনি আবার রাস্তাটা পাকা হয়ে গেলে ওদের জমির দামও তো যাবে বেড়ে।

এ সব কথাই ড্যাড বুঝিয়ে বললো প্রথমে বান্নী আর তারপর মিঃ ক্যারিকে। বুড়ো মিঃ ক্যারি দিব্যি অমায়িক প্রকৃতির লোক, স্যান এলিডো উপত্যকার একটা পাহাড়ের ঢাল জুড়ে তার এ্যাপ্রিকট আর পীচ ফলের মস্ত বড় আবাদ। ভারী খুশি হলেন তিনি ড্যাডের মত নামজাদা একজন তেল ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় হওয়ায়। আদর করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে ওদেরকে বসালেন গদী-আটা আরাম চেয়ারে, আর মিসেস্ ক্যারিকে ডেকে বললেন বান্নীর জন্য লেমনেড নিয়ে আসতে। পরিদর্শক

বোর্ডের চেয়ারম্যানের দিকে তার সোনালী টিপের চুরুট এগিয়ে দিয়ে ড্যাড তাকে বুঝিয়ে বললো তেল পাওয়ার তাৎপর্য এ অঞ্চলের পক্ষে কত গভীর; প্রসপেক্ট হিলে তার ব্যাঙ্ক সাইড কুয়োটার কথা জানিয়ে সে তাকে বললো—কত লাখ ডলার এ পর্যন্ত সে দিয়েছে ব্যাঙ্কসাইড পরিবারকে, আর তা দিয়ে মিঃ ব্যাঙ্কসাইড এখন গিয়ে বাস করছেন সমুদ্রতীরের কেমন এক প্রাসাদোপম বাড়ীতে; শুনতে শুনতে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো মিঃ আর মিসেস্ ক্যারির চোখ আর ড্যাড মানস চোখে দেখতে পেল এদিককার ঢালুটা কেমন দেখতে দেখতে ছেয়ে যাচ্ছে তেল তুলবার যন্ত্রের জঙ্গলে।

কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করছে একটা সমস্যার 'পর, আর সেটা হচ্ছে রাস্তার সমস্যা। তেল তুলবার যন্ত্র আর কুয়ো বসাবার সাজ-সরঞ্জাম তো আর এখানকার এই ভেড়া চরাবার রাস্তা দিয়ে আনা সম্ভব নয়, এ রাস্তায় চলতে গিয়ে ড্যাডের একটা নূতন গাড়ীর স্প্রীং গেছে ভেঙে কিন্তু তাই বলে সে ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে সরকারী রাস্তা তৈরী করে নেবে এটা আশা করাও তো উচিত নয়। মিঃ ক্যারিকে স্বীকার করতে হলো ড্যাডের কথার যৌক্তিকতা।

ড্যাড বলে চললো, সময়ের প্রশ্নটাই হচ্ছে এখন সব চাইতে বড়; কর্তৃপক্ষ যদি অযথা দেরী করে তার কাজ আট্‌কে রাখেন তাহলে বাধ্য হয়ে তাকেও অগত্যা এখানকার জমিটাকে কোয়েল শীকারের জন্য রেখে অন্য জমিতেই কুয়ো বসাতে হবে আর সত্যি বলতে কি তেমন জমিও তো তার রয়েছে মেলাই। সব শুনে মিঃ ক্যারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বললেন, তিনি অবশ্য তাঁর যথাসাধ্যই করবেন, তবে সরকারী কোন কাজই যে তাড়াতাড়ি হতে চায় না সে কথাও নিশ্চয়ই মিঃ রসের জানা আছে, তারপর নূতন রাস্তা করতে হাঙ্গামাও কম নয়; প্রথমেই তো দরকার হবে সাধারণের মধ্যে শেয়ার বিলি করবার আর তা করতে গেলেই দরকার হবে নূতন করে বোর্ডের নির্বাচন। ড্যাড বললো সেই সব জানবার জন্যই তো তার আসা। অত সব হাঙ্গামা থাকলে তারই বা দরকার কী তার মধ্যে যাবার। তবে যদি এমন কোন উপায় থাকে যাতে করে এখনই কাজটা সুরু করা যায় সে কথা স্বতন্ত্র—এই যেমন কাজটাকে নূতন রাস্তা না বলে পুরানো রাস্তা মেরামতও তো বলা যেতে পারে? মিঃ ক্যারি বললেন, হ্যাঁ, মেরামতের জন্য অবশ্য তাদের আলাদা ফাণ্ড আছে, তবে কত যে আছে সেটা তাঁর ঠিক খেয়াল নেই, তা সে যাই হোক বোর্ডের অন্য সভ্যদের সাথে তিনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করে দেখবেন।

মিঃ ক্যারি উঠে দাঁড়ালেন, ড্যাড আর বান্নীর সাথে হাঁটতে হাঁটতে তিনিও এলেন ওদের গাড়ী পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে করতে ড্যাড এক সময় তার পকেট থেকে একখানা খাম বের করে বললোঃ আপনার মেলা সময়ই আমাদের জন্য নষ্ট হবে মিঃ ক্যারি, খালি হাতে আপনি কাজ করবেন এটা তো আর হতে পারে না, মেলাই ছুটোছুটি আপনাকে করতে হবে এ কাজের জন্য কাজেই পেট্রল আর টায়ারের বাবদ যদি আমি কিছু দেই আশা করি নিশ্চয়ই আপনি তাতে রাগ করবেন না? মিঃ ক্যারি সঙ্কোচ করতে লাগলেন, বললেন, এটা সঙ্গত হবে কিনা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।

ড্যাড বললো তাঁর জন্য কিছু ভাবনা নেই, এটা সে দিচ্ছে নেহাতই শুধু তাঁর সময়ের মূল্য বাবদ, ফলাফল কি হবে না হবে তার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই; ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই তাকে তাঁর সাথে অনেক কাজ-কর্ম করতে হবে, চাইকি হয়তো তাঁর খামারেই একদিন সে এসে পড়বে 'বুনো বেড়াল' শিকার করতে। মিঃ ক্যারি আর উচ্চবাচ্য না করে খামখানা পকেটে পুরে জানালেন শীঘ্রই তিনি ড্যাডকে খবর দেবেন কতদূর কী সম্ভব হয়।

বান্নীদের স্কুলে কিন্তু খানকটা সমাজবিজ্ঞানও পড়ানো হয় আর তাতে করে ও শিখেছে কি করে ওদের দেশের গভর্ণমেন্ট চলে। ক্লাশে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের সাথে "সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি"ও বাদ পড়েনি। সে আলোচনা থেকে অবশ্য যেন এ বিষয়ে কোন জ্ঞানই হয়নি এমনভাবে বান্নী তাদের শিক্ষয়িত্রীকে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে কোন সরকারী কর্মচারীকে তার সরকারী কাজে ব্যয়িত সময় ও কাজের জন্য কিছু উপরি টাকা দেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি তো রীতিমত আঁৎকেই উঠেছিলেন, তাঁর মতে এটা নাকি ঘুষ দেওয়ারই সামিল। বান্নী সে কথা ড্যাডকে বলতেই সে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো। আসলে এটা কোন কিছু সম্বন্ধে নীতিগত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে তো আর তেলের কুয়ো বসাতে হয় না, আর ভেড়া-চলবার পথ দিয়ে ভারী মালপত্র নিয়ে যাবার হাঙ্গামাও পোয়াতে হয় না, তাঁর কাজ হচ্ছে শুধু ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে "আদর্শ গণতন্ত্র" আর "সরকারী কর্তব্য' এমনি সব গালভরা শব্দ আউরে যাওয়া। আসলে শিক্ষা ব্যাপারটার

গলদই তো ঐ জায়গায়, ওখানে এমন সব লোক শিক্ষা দেয় যায়া কোন দিনই কোন কিছু করে দেখেনি, আর তার ফলে বাস্তবজীবন সম্বন্ধে সত্যিকারের কোন জ্ঞান-গম্যিই ওদের নেই।

তাদের এই ব্যাপারাটাই ধরা যাক না কেন—প্রশ্ন হচ্ছে তারা ওয়াটকিন্সদের খামারটাতে কুয়ো বসাবে কি বসাবে না? অবশ্য তারা হয়তো আরও দশ বছর অপেক্ষা করে থাকতে পারতো, যতদিন না জায়গাটার উন্নতির জন্য অন্য কেউ এসে তারা যা করছে তাই করতো, অর্থাৎ কিনা সরকারী কর্তৃপক্ষের তলায় চাকা লাগিয়ে তাতে তেল ঢালতো।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই কর্তৃপক্ষরা হয়ে থাকে লোভী, ইচ্ছে করেই তারা কাজ আটকে রাখে টাকা আদায় করবার মতলবে; আবার অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ওরা সত্যই একেবারে আনাড়ী, কিন্তু যেদিক দিয়েই যাও না কেন কাজ করতে হলে টাকা তোমাকে ঢালতেই হবে। সরকারী আর মালিকানা ব্যবসায়ের তফাৎ বুঝিয়ে ড্যাড বলে, তোমার নিজের ব্যবসায়ে তুমি নিজেই মালিক, সেখানে তোমাকে নিজের তাগিদেই কাজ এগিয়ে নিয়ে শেষ করতে হবে; কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় সবই অন্য রকম, সেখানে দেখবে শুধু আগাছা আর অকর্মন্য লোকের ভীড়, দেখতে দেখতে তোমার বিরক্তি ধরে যাবে।

তবু কিন্তু এমন মূর্খ মেলাই আছে যারা সব সময়ই আছে মালিকানা ব্যবসার উৎখাৎ করবার তালে; তাদের কথা হচ্ছে সব কিছু সরকারের হাতে তুলে দাও, সরকারই সব চালাবে, তাদের খুশিমত ব্যবস্থা হলে একখানা রুটীর জন্যও দেখবে ডজনখানেক দরখাস্তের ফরম পূরণ করে হা করে বসে থাকতে হবে সরকারী বোর্ডের কর্মচারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

ড্যাড বলে, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা বাস্তব শিক্ষা এই কাজটার মধ্য দিয়েই বাম্বী পেয়ে যাবে আর তখন সে তা তার শিক্ষয়িত্রীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে কারণ ঐ এ্যাপ্রিকটওয়ালাকে কিছু বখসিস দেওয়াতেই তো আর রাস্তাটা হয়ে যাচ্ছে না। আর সত্যিই দেখা গেল তা হলো না। দুটো দিন যেতে না যেতেই ড্যাড ফোন পেল মিঃ ক্যারির কাছ থেকে। তিনি জানালেন বোর্ডের অন্যান্য সভ্যদের সাথে দেখা করে তার নাকি মনে হচ্ছে কোন কোন তরফ থেকে আপত্তি ওঠবার আশঙ্কা আছে, এই বছরেই নাকি বোর্ডের নূতন করে নির্বাচন হবার কথা, আর মেরামতের টাকার অপব্যবহার নিয়ে এর মধ্যেই প্রচুর অসন্তোষ দেখা গেছে সাধারণের মধ্যে কাজেই কেউই আর যেতে চাইছে না ঝাড়তি কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে। আসছে সপ্তাহেই বোর্ডের একটা মিটিং আছে, ড্যাডের যদি কোন প্রভাব থেকে থাকে তাহলে সে যেন তা এই সময়ই খাটায়। এ সবই ড্যাড বললো বাম্বীকে তারপর বুঝিয়ে দিল এর মানে হচ্ছে তাকে একবার করে যেতে হবে অন্যান্য সব সভ্যদের কাছে আর বিলি করে আসতে হবে আরও কিছু খাম। আর তা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, একসেলসিওর পিটির গোষ্ঠীরা এখানে কি ঘটছে তা বুঝবার আগেই।

দেখতে দেখতে ড্যাড গিয়ে হাজির হলো মিঃ হার্ড-একরের অফিসে তারপর তার সোনালী টিপ-দেওরা চুরুটের ধুয়ো ছাড়তে ছাড়তে সেই চতুর ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলো স্যানএলিডোতে একটা রাস্তা তৈরী করাবার দরকার হলে প্রথমেই তিনি যেতেন কোন কোন লোকের সাথে দেখা করতে। হো হো করে খানিকটা হেসে নিয়ে মিঃ হার্ডএকর জানালেন প্রথমেই তিনি যেতেন জ্যাক কার্ফির কাছে তারপর বাড়ী ফিরে আসতেন বিশ্রাম করতে। আরও প্রশ্ন করে জানা গেল জ্যাক নাকি হচ্ছে স্যানএলিডো সহরের এক খড়-বিচালির ব্যবসাদার—আর তাছাড়া সে হচ্ছে ঐ অঞ্চলের রিপাবলিকান পার্টীর সবচেয়ে বড় মাতব্বর। ড্যাড বললো, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, তারপর আর দেরী না করে বাম্বীকে নিয়ে গিয়ে চড়ে বসলো তার গাড়ীতে। অভ্যস্ত বেগে স্যানএলিডোর পথ ধরে ছুটে চলতে চলতে এক সময় সে বলে উঠলো "এবার তোমার সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ পাকা হবে, খোকা।"

(২)

"জ্যাকব কার্ফি, খড়, বিচালি, গম, চুণ, সিমেণ্ট আর প্লাস্টার"—তাঁর দোকানের খাস কামরাতেই বসেছিলেন মাঝখানের টেবিলের পরে পা চাপিয়ে দিয়ে। এইমাত্র তাঁর পোকার খেলা শেষ হয়েছে, সাজ-সরঞ্জামগুলো এখনও পড়ে রয়েছে তাঁর পায়ের কাছে। দেখলেই মনে হবে লোকটি কঠিন প্রকৃতির, মুখখানা শক্ত করে বন্ধ আর অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগও সেই একই ধাঁচের; রোদ-পোড়া শরীরটা চামড়ার মতই ট্যান করা আর দাঁত যে কটা দেখা যায় সবই সোনা বাঁধানো। টেবিল থেকে পা নামিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ড্যাডের নাম শুনতেই বললেন—"আপনি আসবেন বলেই আশা করছিলাম।" ড্যাড বললো এইমাত্রই তো শুনলাম আপনার কথা, তারপরই ছুটে আসছি পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী হাঁকিয়ে। দেখতে দেখতে ওরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। মিঃ কার্ফি তার আধ-চিবানো চুরুট ফেলে দিয়ে

ড্যাডের সোনালী টিপ দেওয়া একটা চুরুট তুললেন তারপর ওরা বসে গেল কাজের কথায়।

ড্যাড বললো, "শুনুন, মিঃ কার্ফি, আমি হচ্ছি একজন স্বতন্ত্র তেল ব্যবসায়ী অর্থাৎ কিনা আমাদের ব্যবসার বড় পাঁচজন যাদের বলে থাকেন "ছোট আদমী", কিন্তু তাই বলে আবার এতো ছোটও নই যে এই স্যানএলিডোতেও নজরে পরবো না। এখানে আমি বার হাজার একরের মত জমি কিনেছি আর তাতে কোন তেল পাওয়া যায় কিনা তাও একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই; যদি পাওয়া যায় তাহলে আমার ইচ্ছা আছে শ'খানেক মত কুয়ো বসাবার, আর তাতে করে কাজ জুটবে প্রায় হাজার দশেক লোকের আর জনদের মাইনে হিসাবে আমাকে দিতে হবে কোটী-খানেক ডলার আর তাছাড়া এতে এ অঞ্চলের দু'দশ মাইল জায়গা জুড়ে জমির দামও যাবে কয়েক গুণ বেড়ে। এখন কথা হচ্ছে একসলসিয়র পিটিরাও এসে হাজির হয়েছেন এ জায়গায়, আর স্বভাবতই তারা চেষ্টা করবেন আমি কিম্বা অন্য যে কোন লোককেই এ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। আপনারা যারা রাজনীতি করেন তাদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঐসব বড় কারবারিরা কখনও নেহাৎ বাধ্য না হলে তেল খরচ করতে চান না আর যেটুকু করেন তারও বেশীর ভাগই যায় সরকারী যন্ত্রের চাকায় ঢালতে। অন্য সব কিছুর মত এক্ষেত্রেও ওদেরকে কাবু করতে হলে দরকার হলো কিছু প্রতিযোগীতার। আমরা যারা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করি তারা সাধারণত একটু বেশী তেলই খরচ করে থাকি কাজেই বাধ্য হয়ে ওদেরকেও ছাড়তে হয় সেই অনুপাতে। হ্যাঁ ভাল কথা আমি কিন্তু ধরে নিচ্ছি এ কারবারের একজন সমঝদারের সাথেই আমি কথা বলছি।"

শুষ্ককণ্ঠে মিঃ কার্ফি বললেন, "তা আপনি ধরে নিতে পারেন। কিন্তু আপনার দরকার ঠিক কোন জিনিসটার?"

"আপাতত অবশ্য আমার একটা জিনিসেরই দরকার— আর তা হচ্ছে প্যারাডাইস পর্যন্ত যাবার একটা রাস্তা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে রাস্তা না হলে কুয়ো বসানোও হবে না আর এটা যে কোন ধাপ্পা নয় তা আপনারও নিশ্চয়ই জানা আছে কারণ আপনাকেও তো ভারী মালপত্র নাড়া-চাড়া করতে হয় ঐ ভেড়া চলা পথ দিয়ে, সে যে কি ব্যাপার তা কিছু আপনারও অজানা নয়।"

মিঃ কার্ফি বললেন "হ্যাঁ, তা যা বলেছেন।"

"তাহলে তো কোন কথাই নাই। আমি চাই শুধু একটা রাস্তা, আর তা যাতে আসছে দশ দিনের মধ্যে সুরু হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হয়ে যায়। তা হলেই আমি তখন আমার বাড়ীতে যন্ত্রপাতিগুলো এখানে নিয়ে এসে কুয়ো বসাবার কাজ সুরু করে দিতে পারি। অবশ্য হয়তো এর আগে এভাবে কোন কাজ এখানে হয়নি, কিন্তু আমি চাই এবার তা হোক, আর তা হওয়াতে গেলে কোথায় কি লাগবে তাই জানতেই আমার আপনার কাছে আসা। কেমন বেশ পরিস্কার করেই বলা হলো তো আমার কথা?"

"খুব হলো" উত্তর করলেন মিঃ কার্ফি, সামান্য একটু হাসি খেলে গেল তার কঠিন মুখখানার উপর দিয়ে। বেশ বোঝা গেল ড্যাডের ব্যবসার রীতিটা তার পছন্দ হয়েছে।

এরপর তিনি বলতে সুরু করলেন তার নিজের দিকের কথা; কাজটা যে কি ভীষণ কঠিন তারই একটা মনকাড়া ছবি তিনি এঁকে চললেন ধীরে সুস্থে আর সেটা যে বর কষাকষিরই কৌশল এমনকি বান্নির কাছেও তা লুকানো রইলো না। তিনি বললেন কিছুদিন থেকে নাকি বোর্ডের মধ্যে বেশ গোলমাল পেকে উঠেছে কোন হতভাগা নাকি কিছু টাকা চুরি করেছে, মিঃ কার্ফি তো ভেবেই পান না ন্যায়-পথে আয় করবার হাজারো পথ খোলা থাকতে লোকে কোন বুদ্ধিতে সাধারণের টাকায় হাত দেয়।

তারপর রাস্তাঘাটের ঠিকাদারী নিয়েও সাধারণের মধ্যে বেশ কিছু সমালোচনা সুরু হয়েছে; এই জায়গায়ই এক পাগলাটে ভদ্রলোকের "পাহারাদার কুকুর" বলে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ আছে; সেখানাতো অনবরতই ছাপিয়ে চলেছে অজস্র অভিযোগ। এককথায় এখন রাস্তা মেরামতের জন্য সংরক্ষিত তহবিল থেকে টাকা নিয়ে কোন তেল ব্যবসায়ীর জন্য রাস্তা করতে গেলে তা নিয়ে সাধারণের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব হৈ চৈ দেখা দেবে, ফলে বর্তমান বোর্ডের অনেকগুলো সরকারী ভোটই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া মিঃ রস্ তো নিজেই বলেছেন, একসেলসিয়র পিটির গোষ্ঠীরাও কিছু ড্যাডের রাস্তাটাকে সুনজরে দেখবে না, কারণ তাদের জমির জন্য রাস্তা তো তারা এর মধ্যেই বাগিয়ে নিয়েছে। কেই কি জানে হয়তো ঐ পাগলাটার কাগজটাতেই সুরু করবে নানা সম্বাদ সরবরাহ করতে না হয় তো স্টেট কমিটিতে দরবার করে মিঃ কার্ফির জীবনই তুলবে দুর্বিসহ করে।

তাঁর সব কথাই ড্যাড শুনলো শান্তভাবে, আর দর কষাকষির দস্তুরও তাই। তারপর বললো মিঃ কার্ফির এ সব অসুবিধাই তার জানা আছে আর তার প্রতিকার করবার চেষ্টাও সে নিশ্চয়ই করবে

এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে তো বোর্ডের বর্তমান

সভ্যরা যাতে ভোটে জিতে আবার বোর্ডে ফিরে আসতে পারেন সেইটাই হচ্ছে বড় কথা, আর সে দিক দিয়ে ড্যাড যদি তাদের ভোট-যুদ্ধের তহবিলে হাজার পাঁচেক ডলার দান করবার প্রস্তাব করে সেটা কিছু অসঙ্গত হবার কথা নয়। চুরুট থেকে মস্ত এক রাশি ধূসর নীল ধূয়ো হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে মিঃ কার্ফি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে, বুঝি বা ওর মধ্যেই তিনি পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন একটা পাঁচ আর তার পরে বড় বড় তিনটে শূন্য।

ড্যাড তার কথার খেই ধরে বলে চললো, "নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন মিঃ কার্ফি, এটা নেহাৎই দলের ব্যাপার, এর সাথে আপনার বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে যে প্রস্তাব আমি করতে চাই তার কোন সম্বন্ধই নেই।"

"বেশ তো, আপনার সমস্ত প্রস্তাবটাই না হয় তা হলে শোনা যাক," নির্বিকারভাবে উত্তর করলেন মিঃ কার্ফি।

এবার ড্যাড সুরু করলো, সহযোগীতার পরেই নাকি তার বিশ্বাস সব চাইতে বেশী, তাই যেখানে সে গিয়েছে সেখানেই গড়ে তুলেছে ছোট একটা প্রতিষ্ঠান। রস-ব্যাঙ্ক-সাইডের এক নম্বর কুয়োর কথাও সে বললো, বললো কেমন করে সেখানে সে একটা কোম্পানী গড়ে তুলেছে আর কেমন করে তার কুয়ো বসাবার মালমশলা যথা সময়ে পাবার সর্তে বড় একটা কাঠ কোম্পানীর সভাপতিকে সে বখরা দিতে রাজী হয়েছে লাভের শতকরা দুভাগ, আর সেটা এমন বেশীই বা কি, বন্ধুত্বের প্রতিদান বইতো কিছু নয়। সে কুয়োটা থেকে তার এ পর্যন্ত আয় হয়েছে লাখ ছয়েক ডলার আর তাতে করে সেই কোম্পানীর সভাপতির ভাগে পড়েছে গিয়ে বার হাজার ডলার, কিন্তু তা সে যাই হোক, কাঠ সরবরাহ সম্বন্ধে তো এখন ড্যাড নিশ্চিন্ত।

আর এখানেও তো সেই একই কথা; রাস্তাটার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তো ড্যাড পারে তার প্যারাডাইসের জমিটাতেও একবার কপাল পরীক্ষা করে দেখতে আর তার সাথে মিঃ কার্ফিরই বা একবার কপাল পরীক্ষা করতে দোষ কি! মিঃ কার্ফিকেও অবশ্য ড্যাড রাজি আছে ঐ দুভাগ বখরাই দিতে আর কুয়োটাতে খরচ পড়বে গিয়ে লাখখানেক ডলার, তাতে করে মিঃ কার্ফির তো লগ্নী করাই হবে হাজার দুয়েক ডলারের মত। তারপর যদি বরাত গুণে তেল জুটেই যায় তা হলে তো আর কথাই নাই, তখন তো তাঁর নিজের ভাগেই দশ-বিশ, পঁচিশ-ত্রিশ চাই কি চল্লিশ হাজার ডলার পড়তেই বা বাধা কি! এরকম তো হামেশাই ঘটছে কাজেই একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! অবশ্য তা যদি হয় তা হলে ড্যাড নিশ্চয়ই মিঃ কার্ফির বন্ধুত্ব আশা করতে পারে; তখন দিব্যি একসঙ্গে মিলে মিশে তারা দরকার মত পরস্পরের কাজ চালিয়ে নেবে।

শেষ পর্যন্ত মিঃ কার্ফি আরও কয়েকবার চুরুটের ধূয়ো ছেড়ে, আরও কিছু কাল ধরে সেগুলো পরীক্ষা করে বললো, ড্যাডকে তার বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে; কিন্তু তার মতে ড্যাড যদি দু'হাজার ডলার পার্টীর ভোট যুদ্ধের তহবিলে দিয়ে পাঁচ হাজার ডলার মিঃ কার্ফির নামে দেয় তাহলে সেইটেই হবে আরও বেশী বন্ধুত্বের কাজ। এক-দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে ড্যাড জিজ্ঞেস করে, "কাজ ঠিক হাসিল হয়ে যাবে তো?" উত্তরে মিঃ কার্ফি বললেন, "আলবাৎ"।

দর কষাকষির পালা শেষ হয়ে যেতেই ড্যাড যেন কিছু চিন্তা না করেই তার চেক বই নিয়ে স্থানীয় রিপাবলিকান পার্টীর ভোটযুদ্ধ কমিটির কোষাধ্যক্ষের নামে লিখে দিল একখানা দু'হাজার ডলারের চেক। তারপর মিঃ কার্ফিকে জিজ্ঞেসা করলো তিনি কোন সরকারী কাজ করেন কিনা, উত্তরে তিনি জানালেন, না তিনি শুধু সাধারণ একজন ব্যবসায়ী মাত্র। ড্যাড বললো ঠিক আছে, তাহলে দলিলটা মিঃ কার্ফির নামে লিখলেও কোন ক্ষতি নেই। দেখতে দেখতে সে একখানা দলিল লিখে ফেললো, তাতে বলা হলো সে নাকি মিঃ কাফিসর কাছ থেকে নগদ এক ডলার, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ও মূল্যবান সুবিধা সুযোগ পেয়ে তার পরিবর্তে তাঁর নামে লিখে দিচ্ছে প্যারাডাইসের কাছাকাছি এবেল্ ওয়াটকিন্সের খামারে সে যে রস্-জুনিয়র এক নম্বর নামে তেলের কুয়ো বসাচ্ছে তার মুনাফার শতকরা দু'ভাগ মালিকানা। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হলো, যতদিন পর্যন্ত না প্যারাডাইসের প্রধান সড়ক থেকে এ্যাবেল্ ওয়াটকিন্সের খামার পর্যন্ত বেশ পাকা-পোক্ত রাস্তা তৈরী হচ্ছে সে পর্যন্ত ঐ কুয়োটা বসানো হবে না। আর আগামী ষাট দিনের মধ্যে যদি রাস্তাটা শেষ না হয় তা হলে দলিলে উল্লেখিত জেঃ আরনল্ড রসের ঐ কুয়ো বসাবার কোন বাধ্যবাধকতাই থাকবে না। মিঃ কার্ফিও তাঁর উল্লেখিত এক ডলার, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ও মূল্যবান সুযোগ সুবিধা ফেরৎ পাবেন না। দলিলখানা মিঃ কার্ফির হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে ড্যাড মন্তব্য করলো, "ওখানা নিশ্চয়ই 'পাহারাদার কুকুরের' হাতে গিয়ে পড়বে না"। মিঃ কার্ফিও হেসে বাপ্পীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "এই খোকাও আশা করি ভুলে কোথাও

কিছু বলে বসবে না!" উত্তরে ড্যাড বললো বান্নী নাকি তেলের ব্যবসাই শিখছে, আর তাতে ওকে প্রথমেই শিখতে হয়েছে তার ব্যবসা সম্বন্ধে কোথাও কিছু না বলা।

এরপর কিছুক্ষণ চললো পরস্পরের করমর্দনের পালা, তারপর ওরা দুজনে গিয়ে উঠে বসলো ওদের গাড়ীতে। বান্নী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, "সে কি, ড্যাড আমি তো তোমাকে ডেমোক্রাট দলের লোক বলেই জানতাম!"

শুনে ড্যাড হেসে উঠলো হো হো করে, বললো, এতে আর রাসায়নিক বস্তুর পর শুল্ক ধার্য করা কিম্বা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার প্রশ্ন নয় এটা হচ্ছে শুধু ওয়াটকিন্সদের খামার পর্যন্ত একটা রাস্তা করিয়ে নেবার ব্যাপার। বান্নী বললো, "একটা বিষয় কিন্তু কিছুতেই আমি বুঝতে পাচ্ছি না, ড্যাড, মিঃ কার্ফি নিজে তো কোন সরকারী কাজ করেন না—তা হলে এসব তিনি করবেন কি করে?" উত্তরে ড্যাড বললো, ঠিক ঐ জন্যই নাকি সত্যিকারের নেতারা নিজেরা কোন সরকারী পদ না নিয়ে পছন্দ করেন বাইরে থেকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে। সরকারী কাজে থাকলে ড্যাডের কাছ থেকে টাকা নেবার অপরাধে সহজেই জেল হয়ে যেতে পারতো মিঃ কার্ফির, কিন্তু এখন তো তাঁর কিছুই করা যাবে না, কারণ এখন তিনি হচ্ছেন শুধু দলের একজন নেতা।

ড্যাড বলে, আসলে অফিস নেয় কারা? হয় সেই সব লোক যাদের যেমন তেমন একটা মাইনে দরকার আর না হয়তো সেই সব হামবড়া লোক যারা সস্তা বক্তৃতা দিয়ে হাততালি আর খবরের কাগজে নিজেদের ছবি দেখতে পেলেই খুসী। কিন্তু জ্যাক কার্ফিদের কোন ছবিই কোনদিনই দেখা যাবে না কোন কাগজে, ওরা কাজ করে ওদের নিজেদের অফিসের পিছনের ঘরে বসে, জনসাধারণের চোখের আড়ালে।

বান্নীর মনে পড়লো তার ক্লাশে শেখা সমাজ বিজ্ঞানের কথা, সে জানতে চাইলো সব জায়গায় গভর্নমেন্টই কি এই ভাবে চলে? ড্যাড বললো হ্যাঁ, গ্রাম থেকে প্রদেশ আর সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সব জায়গায়ই প্রায় একই অবস্থা। শুনতে যতটা খারাপ লাগছে আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তত খারাপ নয়; দেশের বেশীর ভাগ লোকের অযোগ্যতাই এজন্য দায়ী। গণতন্ত্রের জয়গান করে যত বক্তৃতাই করা হোক না কেন, আসলে ভোট দেয় কারা? এই স্যানএলিডোর কথাই ধরা যাক, দেখা যাবে, তাদের বেশীর ভাগ হচ্ছে ইলির গীর্জায় গিয়ে যে সব লোক লাফালাফি, গড়াগড়ি আর একসাথে অনেক ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে সেই সব হাঁদা-গঙ্গারামের দল। ওরা একটা গভর্নমেন্ট চালাবে এটা কোন পাগলেও আশা করতে পারে কি?

অথচ নীতির দিক দিয়ে ওদেরই নাকি ঠিক করতে হবে ড্যাড রাস্তাটা পাবে কি পাবে না আর তেলের কুয়ো বসাবে কি বসাবে না। এটা কিছু আর সত্যিই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই তখন দরকার হয় জ্যাক কার্ফির মত লোকের, ওদের হয়ে সেই স্থির করে দেয় সব কিছু, কারণ এর মধ্যেই আছে সেই তৎপরতা আর কর্মকুশলতা যেটা না হলে ব্যবসায়ীদের মোটেই চলে না অথচ আমেরিকার গণতন্ত্রসম্মত রীতিতে যার একান্তই অভাব।

[ক্রমশঃ

★

ছড়া

অমলকান্তি ঘোষ

প্রাণঢালা চেষ্টায়
নামে যদি শেষটায়
পরাজয়-নির্ঝর ঝর ঝর ধারাতে,
করবে কে রোধ তা'।
দুষ না'ক যোদ্ধা
ভাগ্যেরে। তুলো না'ক বুক বেঁধে দাঁড়াতে।

ভারতীয় নাটকের জন্মকথা

মঞ্জু সেনগুপ্তা

আধুনিক গবেষণার ফলে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহু সন্দেহযোগ্য বিষয়ে আলোকপাত হয়েছে; কিন্তু ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তিবিষয়ক প্রশ্নটি আজও তর্ক ও বিবাদের জালে আচ্ছন্ন রয়ে গেছে। ভারতীয় ও বিদেশী পণ্ডিতদের কত বিভিন্ন রকমের মতবাদ যে এই বিষয়টির আশেপাশে ভিড় করে আছে, তার ঠিক নেই। পৃথকভাবে প্রতিটি মতবাদের আলোচনা প্রয়োজনীয় হলেও এক্ষেত্রে স্থানাভাবের জন্য সম্ভব নয়। মোটামুটি প্রধান দুই প্রকার মতবাদ এক্ষেত্রে গ্রাহ্য, একটি ধর্মের ভিত্তিতে প্রচলিত, অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ।

তৃতীয় খৃস্টপূর্বাব্দের মহামুনি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু ভারতীয় নাটকের দৈবউৎপত্তির দাবীই করে থাকে। নাটকের জন্মের সঙ্গে পবিত্র বেদগ্রন্থাবলীর সম্পর্ক অতি নিবিড়, একথাও তাতে পরিস্ফুট হয়েছে। কথিত আছে ত্রেতাযুগে একবার সব দেবতারা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য এমন একটি পঞ্চম বেদ রচনা করেন যা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত না হয়ে শূদ্রদেরও ভোগ্য হয়। তখন ব্রহ্মা এমন একটি পঞ্চম বেদ রচনা করতে মনস্থ করলেন যাতে মানবজীবনের সকল দিকের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি ঋগ্বেদ থেকে আবৃত্তি করার উপাদান, সামবেদ থেকে গীতাংশ, যজুর্বেদ থেকে দৃশ্যকাব্যোপযোগী অনুকরণের কৌশল, এবং অথর্ববেদ থেকে কাব্যের উপজীব্য 'রস' উপাদান সংগ্রহ করে এই পঞ্চমবেদ রচনা করলেন। তারপর তিনি বিশ্বকর্মাকে একটি নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করার ও ভরতমুনিকে তাঁর পুত্রদের সাহায্যে এই রচনাকে মঞ্চস্থ করার আদেশ দিলেন। দেবতারা ব্রহ্মার এই নূতন সৃষ্টিকে সানন্দে স্বীকার করে নিলেন। মহেশ্বর এই নূতন সৃষ্টিতে তাণ্ডব নৃত্য ও পার্বতী লাস্য নৃত্যের সংযোজনা করলেন, বিষ্ণু দিলেন ভারতী, কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটি ইত্যাদি নাটকের চতুর্বিধ রীতি। মহামুনি ভরতের ওপর ভার পড়ল এই পঞ্চমবেদরূপ ব্রহ্মার নূতন সৃষ্টিকে মর্তের উপযোগী করে রচনা করার ও পৃথিবীতে তাকে নাট্যশাস্ত্ররূপে প্রচলিত করার। ব্রহ্মাসৃষ্ট প্রথম দুটি নাটক 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' ভরতমুনির পুত্রেরা মঞ্চস্থ করেছিলেন।

এই পৌরাণিক কাহিনীটিকে নেহাৎ বাজে বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, যে কোন নূতন শিল্পসৃষ্টি কার্যে ত্রয়ী দেবতাঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনেরই সমান অবদান বর্তমান,—ভারতের এই সুপ্রচলিত মতটি এই কাহিনীর দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। তাছাড়া পঞ্চম বেদই যে নাট্যশাস্ত্র, একথাও এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে।

এই তো গেল একেবারে প্রাচীনপন্থীদের মত, বেদ থেকেই নাটকের জন্ম—এই ধরণের মতও অনেকে পোষণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, বেদের সম্বাদসূক্তগুলির (Dialogue hymns) মধ্যে নাটকের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। বেদের দশমমণ্ডলের অন্তর্গত যম-যমীর, পুরূরবা ও উর্বশীর; লৈমা, তার্গব ও ইন্দ্রের; সরমা ও পণীর মধ্যে কথোপকথন ও প্রথম মণ্ডলে অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার কথোপকথন এই ধরণের সম্বাদসূক্ত। ডাঃ হার্টেল (Dr. Hertel) মন্তব্য করেছিলেন যে বৈদিকসম্বাদসূক্তগুলিরই উন্নততর স্বরূপ ভারতীয় নাটকে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি নাকি বেদের অন্তর্গত 'সুপর্ণাধ্যায়ে'ও নাটকের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। অধ্যাপক ভন্‌ শ্যুরোডারও (Von. Schroeder) সামবেদীয় সূক্তগুলিতে কিছু কিছু অভিনয় করার অংশ আছে—একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক উইন্‌ডিশ (Prof. Windisch), ওল্ডেনবার্গ, পিশেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই সূক্তগুলিতে গদ্যপদ্য দুই প্রকার রচনার মিশ্রণ ছিল এবং সেই বিশেষ শ্রেণীর গদ্যপদ্যময়ী রচনার থেকেই নাকি বর্তমান কাব্যরচনার শৈলীগুলি উদ্ভূত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের যে সুন্দর কথোপকথন পাই, ডাঃ উইন্‌টারনিৎস্‌ বলেন—সেটি শুধু নাটকের বীজ নয়, কাব্যরচনারও বীজ।

বৈদিক যাগক্রিয়ার মধ্যেও নাটকের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে, তবে এই বিষয়টিতে বিস্তর মতভেদ আছে। যাগানুষ্ঠানে কেবল সামগানই হতো না, কতকগুলি এমন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল যা সম্পন্ন করতে যজমানকে ঋত্বিকদের ও অধ্বর্যুদের রীতিমত অভিনয় করে দেখাতে হতো। সোমযাগে সোমক্রয় অনুষ্ঠান ও মহাব্রত অনুষ্ঠানের কতকগুলি অংশবিশেষ অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে এইসব যাগক্রিয়া থেকেই নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক হিল্লেব্রান্ড (Prof. Hillebrand) তাঁর 'বৈদিক মাইথোলজি' (Vedic Mythology) নামে বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি বলেছেন মহাব্রত অনুষ্ঠানের অভিনয়াংশগুলি দেবাসুর বিরোধের রূপকমাত্র। ডাঃ বেল্‌ভেল্‌কার (Dr. Belvelker) বলেন, বৈদিক ও প্রাক্‌ বৈদিক যুগে বহু ধর্মানুষ্ঠানিক নাটকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। ব্রত্যোদয় অনুষ্ঠানকে তিনি এইরূপ নাটকের একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। অধ্যাপক কুনোও এই মতবাদের পরিপোষক। তিনি বলেন, এইসব নাটকগুলিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল। মহাব্রত যজ্ঞে শিব ও বিষ্ণুর পূজায়, বিবাহানুষ্ঠান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নৃত্য একটি বিশেষ প্রধান অঙ্গ ছিল।

অধ্যাপক কীথ্‌ কিন্তু এই মতবাদের ঘোর বিরোধী, তিনি বলেন, এই সকল বৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতে কতকগুলি নাটকের উপাদান আছে বটে, কিন্তু এগুলি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারে না যে বৈদিক যুগে বহু ধর্মানুষ্ঠানিক নাটক বর্তমান ছিল। সম্বাদসূক্ত যা ঋগ্বেদের মন্ত্র হলেই তাকে যাগানুষ্ঠানের ব্যবহৃত অঙ্গ হতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। ঋগ্বেদে যতক্ষণ না তিনি একটি পুরোপুরি নাটক খুঁজে পান ততক্ষণ বৈদিক যুগে নাটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব প্রমাণ তাঁর মতে যুক্তিহীন। ডাঃ সুশীলকুমার দে

মহাশয়ও এরূই অভিমত পোষণ করেন। যজুর্বেদে নাকি সকল প্রকার বৃত্তিজীবির নাম পৃথকভাবে উল্লিখিত আছে কিন্তু 'নট' নামে কোন সংজ্ঞা সেখানে নেই। বাজসনেয়ী সংহিতাতে "নৃত্যায় সূতং গীতায় শৈলূষং"—এই পংক্তিটি আছে এবং টীকাকার মহীধর 'শৈলূষং' মানে 'নটং' করেছেন। কিন্তু ডাঃ দে-র মতে বেদের যুগে নটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এটা এমন কিছু একটা বড় প্রমাণ নয়।

এইবার কয়েকজন বিদেশী ও দেশী পণ্ডিতদের এই সম্বন্ধে মতবাদ আলোচনা করা যাক। ডাঃ রিজওয়ে বলেন যে মৃতের প্রতি অথবা কোন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য যে অনুষ্ঠান হোত তাই থেকেই সব ভারতীয় নাটকের সৃষ্টি। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রভৃতি থেকে বিয়োগান্ত নাটক আর নানারকম আনন্দোৎসব থেকে মিলনান্ত নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতটি ডাঃ কীথ্ স্বীকার করেন নাই। ডাঃ এইচ্, এন্, দাশগুপ্তের মতে আনন্দোৎসবের মধ্য থেকেই নাটকের সৃষ্টি হয়েছে—মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন থেকে হয়নি।

ডাঃ নরেন দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই সম্পর্কে কীথ্ সাহেবের মতবাদ উল্লেখ করেছেন। শস্যের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞে অনুর্বর জীর্ণ ভূমির প্রতীক 'কংসবধ' প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপকে নাকি নাটকের আদি বলে ধরা যায়। কিন্তু এই মতটি একেবারে যুক্তিহীন বলে মনে হয়। বলিবন্ধন উৎসবের সঙ্গে মহাব্রত যাগের সাদৃশ্য খাড়া করাও যুক্তিহীন মনে হয়।

এই তো গেল পুরো ধর্মের ভিত্তিতে কতকগুলি প্রচলিত মতবাদ—ধর্মনিরপেক্ষ কয়েকটি মতবাদ নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

পিশেল (Pichel) প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীনকালের পুতুলনাচের থেকে নাটকের জন্ম হয়েছে। পিশেল তাঁর মতের সমর্থনে মহাভারতের নীলকণ্ঠের টীকা থেকে 'পুত্রিকা এবং পুত্তলিক' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন। সূত্রধার, স্থাপক, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় সংজ্ঞাকেও তিনি এই কাজে ব্যবহার করেছেন ডঃ হুটীশং (Dr. Hutt-ysch) এই মতের সমর্থক। কিন্তু এই মতটি ডাঃ কীথ্, ডাঃ দে, ডাঃ দাশগুপ্ত স্বীকার করেননি।

ছায়ানাটক থেকে নাটকের সৃষ্টি অধ্যাপক লিণ্ডারের (Prof. Linder) এই মতটিও অযৌক্তিক বলে অনেকে প্রতিপন্ন করেছেন। লিণ্ডার সাহেবের মতে সৌভিকের কাজ ছিল দর্শকবৃন্দের কাছে মূক অভিনেতাগণের প্রতিনিধিস্বরূপ নাটকের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া। কুনোও সাহেবও এই কথা বলেন। তবে হিলেব্রাণ্ড সাহেব ও কীথ্ সাহেব এটা খুব জোর দিয়ে সমালোচনা করে বলেছেন কৈয়টের টীকা ..."কংসাদ্যনুকারিণাং নটানাং ব্যাখ্যানোপাধ্যায়ঃ"... প্রভৃতি থেকেই 'সৌভিক' শব্দের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার একেবারে নিরর্থক বলে মনে হয় ডাঃ দে বলেন, সুভট প্রণীত 'দূতাঙ্গদা', মেঘপ্রভাচার্যের 'ধর্মাভ্যুদয়' প্রভৃতি নাটকে উল্লিখিত ছায়ানাটক শব্দটির যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে যাত্রাগানের প্রচলন হয়েছিল তা পরবর্তীকালে নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে—অধ্যাপক কুনোও এই মত সমর্থন করেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, ডাঃ উইনটারনিৎস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণ-পূজা থেকেই নাটকের সৃষ্টি।

ডাঃ হিলডেব্রানড্ আবার বলেন, বৈদিক মন্ত্রগুলির যথাযথ উচ্চারণ-প্রক্রিয়া থেকে অভিনয়-পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছে। ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের মধ্যে ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ডাঃ উইনটারনিৎস নাটক, নট, নট্য প্রভৃতি শব্দগুলির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নৃত্য থেকেই নাটকের সৃষ্টি।

কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, গ্রীকগণের সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে ভারতীয় নাটক জন্ম নিয়েছে। ওয়েবার সাহেব বলেন, ব্যাকট্রিয়া, পাঞ্জাব এবং গুজরাটে গ্রীক রাজাদের সভায় যে সব নাটক অভিনীত হোত তারই পরবর্তী রূপ ভারতীয় নাটক। উইনডিশ্ সাহেবও এই মতকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কীথ্ সাহেবের মতে তখন ভারতবর্ষে আদৌ কোন গ্রীক নাটক অভিনীতই হয়নি, ডাঃ দে ও ডাঃ দাশগুপ্তও এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত, আর পিশেল জ্যাকোবি, শ্রোডের, লেভি প্রমুখ পণ্ডিতগণ একে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যবনিকা কথাটি যবন থেকে এসেছে, তা কিন্তু একেবারে অস্বীকার্য, কারণ ভারতবাসীরা বা গ্রীকেরা প্রাচীনকালে কেউই তাদের নাটকে যবনিকা ব্যবহার করতো না, এটি পরবর্তী যুগে এসেছে। গ্রীক ও ভারতীয় নাটকের মধ্যে বহু সাদৃশ্য বর্তমান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যেমন উভয় ক্ষেত্রেই সূত্রধার, নটী, নেপথ্যে উচ্চারণ, বিদূষক প্রভৃতির অস্তিত্ব, রঙ্গমঞ্চের সাদৃশ্য প্রভৃতি। কিন্তু তাই এর থেকেই প্রমাণ করা যায় না যে গ্রীকদের নাটক থেকে আমাদের নাটক এসেছে। তাছাড়া গ্রীক নাটকের যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কাল, স্থান ও নাটকের গতির সাম্য সেটাই আমাদের নাটকে একেবারে নেই।

তাহলে নাটকের উৎপত্তি কবে থেকে হতে পারে এ গবেষণা করে দেখতে গিয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণ অনেকাংশে একমত হয়ে বলেছেন যে চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দেই এর জন্ম। কারণ পাণিনি চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে তাঁর নটসূত্র রচনা করেছেন .. (পারাশর্য্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ ৪· ৩· ১১০...)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (একই শতাব্দীতে লিখিত) আমরা 'কুশীলব' শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাই। দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দের পতঞ্জলীর 'মহাভাষ্যে' আমরা 'যে তথা নটস্য স্রয়ো রঙ্গং গত্বা...' ইত্যাদি থেকে নাটকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই; তাছাড়া 'মহাভাষ্যে' 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামে দুইটি নাটকেরও উল্লেখ আছে। রামায়ণেও নগরবর্ণনা-প্রসঙ্গে মহিলাদের জন্য নাটক অভিনয়ের উল্লেখ পাই—(বধূনাটকসংঘৈশ্চ সংযুক্তো সর্বতঃ পুরীম্), (নাটকান্যপরে প্রাহুর্হাস্যানি বিবিধানি) ইত্যাদিতে। মহাভারতও নাটকের উল্লেখ করেছে...(নাটকা বিবিধা কাব্যা ..) প্রভৃতিতে। তাছাড়া শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে আমরা বহু পূর্ণাঙ্গ নাটকের অস্তিত্ব দেখতে পাই। এই সব প্রমাণ থেকে ডাঃ সুশীলকুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মহাকাব্যের যুগেই ভারতীয় নাটকের জন্ম হয়েছে।

শীতকাল। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীটুকু হিমবিবর্ণ, এক দিকচক্র হইতে আর এক দিগন্তবৃত্ত পর্যন্ত ঘনকুয়াশার তিমিরগুণ্ঠন। তবু ইহার মধ্যেও সৃষ্টির মননশীল প্রেরণা হৃদ্‌স্পন্দিত হইয়া চলিয়াছে।

বারোই পৌষ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি পরম পবিত্র তিথি। ভক্তিস্নিগ্ধতায় রমণীয় এই পুণ্যমুহূর্তে যুগপুরুষ রামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদামণির আবির্ভাব। এই পূতঃ লগ্নটিকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে একটি চন্দনসুরভিত ও ভক্তিবিনম্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমা প্রকৃতি সারদামণির জীবন কেবলমাত্র ভারতীয় সাধনাতেই নহে, ভারতীয় ললিত সাহিত্যেও অপরূপ মহিমায় সমুজ্জ্বল। দেশ বিদেশের বহু ভক্ত-সাধক এই উপলক্ষ্যে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এই সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'শ্রীমা সারদামণি'। লিখিয়াছেন শ্রীতামসরঞ্জন রায়, প্রকাশ করিয়াছেন কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড, কলিকাতা। গ্রন্থখানি সুলিখিত সুচিত্রিত এবং সুমুদ্রিত। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখিবার মতো গ্রন্থ।

এ বৎসর প্রবীণ কবি-সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী পদক দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই এই বিষয়ে আনন্দিত।

গত কয়েকমাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, 'নবগঙ্গা': লেখক, গোপাল হালদার। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী কয়েকদশকে বাঙ্‌লার সামাজিক ও লৌকিক জীবনে নতুন চেতনা-বিবর্তনের যে ধারাস্রোত আসিয়াছিল, তাহারই পটভূমিতে ইহা একটি ইতিহাস-অনুশীলিত আখ্যান।

বামপন্থী লেখক সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস: 'শ্রীমতী কাফে'। একটি 'কাফে'র দর্পণে দুইটি বিপ্লবী চিন্তাধারাকে তুলনামূলকভাবে বিম্বিত করা হইয়াছে। প্রথম চিন্তা ধারাটি স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভূমিকাশ্রয়ী; দ্বিতীয়টি মার্ক্সদর্শনের পটভূমিতে আগামী মানুষের চিন্তামানসের আভাষ।

প্রখ্যাত ছোটগল্পকার সুশীল জানার নতুনতম উপন্যাস: 'সূর্যগ্রাস'। নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবন—যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে মানবতার চূড়ান্ত অপমান; বেকারিত্ব আর দারিদ্র্যের যেখানে একনায়কত্ব, যেখানে প্রতিটি অনুপলে অপমৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিপর্ব—তাহারই মধ্যে, সেই অপমানিত জীবনের গভীরে যে আগামী কালের জন্য একটি বলিষ্ঠ হৃদস্পন্দন ধুক্ ধুক্ করিতেছে, সুশীল বাবুর মরমী দৃষ্টি তাহার সন্ধান পাইয়াছে। সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস-প্লাবিত বাংলাদেশের একটি পরিচিত অথচ অবহেলিত দিগন্তের সংবাদ লইয়া উপন্যাসটি অনন্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ করিয়াছেন বিদ্যোদয় লাইব্রেরী।

আর-একখানি নতুন উপন্যাস: জনকাল। লিখিয়াছেন শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ করিয়াছেন—সাহিত্য-ভারতী প্রকাশনী, কলিকাতা। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের জীবনালেখ্যে গ্রন্থটি রচিত। জীবিকান্বেষী ভাগ্যহত সোমনাথের চরিত্র যেমন মনকে পীড়িত করে, শিপ্রার মতো মহিমময়ী নারীর জন্য তেমনি করুণার উদ্রেক হয়। ভাষা বলিষ্ঠ, প্রকাশভঙ্গী মনোরম। লেখকের মুন্সিয়ানা প্রশংসনীয়।

প্রখ্যাত কবি পাব্‌লো নেরুদার স্তালিন পুরস্কার লাভ এবারকার একটি স্মরণীয় ঘটনা। শান্তির জন্য উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ভারতীয় শান্তিকামী মেজর-জেনারেল শোখে।

ছোটগল্প বাঙ্‌লাসাহিত্যকে পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধকদের মধ্যে বহু প্রতিভাবান লেখক ছোটগল্পের সীমিত

পরিসরে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার পুরাতন গল্পসঙ্কলনের নূতন সংস্করণঃ 'অফুরন্ত'। প্রকাশ করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্‌লিশিং কোম্পানী লিমিটেড। সাম্প্রতিক কালের আর-একখানি উল্লেখযোগ্য গল্প-সঙ্কলনঃ 'এ কালের কাহিনী'। লিখিয়াছেন রণজিৎকুমার সেন। আনন্দ পাব্‌লিশার্স, (১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক পরিবেশিত। স্বাধীনতার ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালীর জীবনে যে বহুমুখী সমস্যা আসিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই পটভূমিকায় রচিত 'একালের কাহিনী'। বাংলা কথাসাহিত্য যে কত বাস্তবধর্মী হইতে পারে, গ্রন্থখানি তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এবৎসর বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ তাঁহাদের উপাধি পরীক্ষায় রণজিৎকুমার সেনের 'সমাজ-দর্শন' গ্রন্থখানি পাঠ্য করিয়া লেখকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। যে আলোকে জীবনকে জানা যায়, যে আলোকে জীবনের সংশয়-বিষাদ-ভয় দূরীভূত হইয়া প্রাণ-পুরুষ অমৃতময় হইয়া ওঠে, সেই আলো হইতেছে সত্যালোক। সমাজদেহে যখন তাহার প্রতিফলন ঘটে, তখনই জাগে কল্যাণ, আর সেই কল্যাণকে জীবনাশ্রিত করিলে জীবন হয় ফলবান। সেই সর্বকেন্দ্রিক মানব-কল্যাণের ভিত্তিতেই রচিত 'সমাজ-দর্শন'। ইহার মধ্যে কোনো বিশেষ 'ইজ্‌ম্‌'-এর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব নাই, অথচ সমস্ত 'ইজ্‌ম্‌'-এরই সমাধান আছে। গ্রন্থখানির একটি ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছেঃ 'Man And Society'. প্রকাশ করিয়াছেন—গুপ্তপ্রেস, কলিকাতা-৯।

কাব্যে উপনিষদের একটি নবতম রূপায়নঃ 'ঔপনিষৎ'। লিখিয়াছেন চিত্রিতা দেবী। প্রকাশ করিয়াছেন—এম্‌, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। উপনিষদ নানা খণ্ডে বিভক্ত। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ এবং কঠোপনিষৎ হইতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগি বিভিন্ন শ্লোক নির্বাচিত করিয়া কাব্যে তাহাকে রূপায়িত করা হইয়াছে। ফলে উপনিষদের সংস্কৃতগত দুর্বোধ্যতা বাংলা কাব্যের সুললিত বন্ধনে প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে। নির্বাচন ও অনুবাদ কবির মরমী দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে গ্রন্থখানি অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে।

বাঙালী লেখকের ইংরেজি গ্রন্থ খুববেশী চোখে পড়ে না। সম্প্রতি দুইখানি গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে। একখানি অম্লান দত্ত লিখিত ও কলিকাতা প্রাচী প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত 'For Democracy'. অন্যখানি অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় রচিত এবং কলিকাতা চক্রবর্তী চাটার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'A Phase of the Swadeshi Movement (National Education: 1905-1910). দুইখানি গ্রন্থই সুচিন্তিত ও সারগর্ভ। মোট দশটি প্রবন্ধ লইয়া For Democracy রচিত। মোটামুটি এই বিষয়গুলি লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেনঃ Democracy and Freedom of thought, The Class and the State Socialism and Equality, The transitional Dictatorship, The Soviet way of Industrialism, on Gandhism, Revolutionary Illusions, The march of Communism, The materialistic interpretation of History, and The Synthesis.

A Phase of the Swadeshi Movement এর যুগ্ম লেখক বাংলার স্বদেশী যুগের শিক্ষান্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া এদেশে কার্জন নীতি হইতে সুরু করিয়া বাংলার বহির্ভাগের আন্দোলন পর্যন্ত এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক যুক্তিনির্ভর আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা বাস্তবানুগ ও সারগর্ভ। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য।

একখানি ইংরেজি কবিতার বই হাতে আসিয়াছেঃ 'The Fountains' by Lakshmi Narayan Sahu, Deulsahi, Cuttack. সাম্প্রতিক কালের কাব্যসম্ভারের দিক হইতে গ্রন্থখানি একেবারে ছোট না হইলেও কবিতাগুলি ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিতে পারে নাই। একাধিক কবিতায় ভাবের দীনতা লক্ষিত হইল। কিন্তু ইহাই কবির সামগ্রিক শক্তিহীনতার পরিচায়ক নয়। লেট্‌ মি এ্যাবজরব্‌, দি পার্সিং ক্লাউড্‌স্‌ স্লাই ড্রিম, মাই ওয়াইফ, আই এ্যাম ইটারনা—প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে কবির যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য সঙ্কলনে সংখ্যার দিক হইতে কম কবিতা দিয়ে অনুরূপ কবিতার পরিবেশন করিতে পারিলে গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।

নতুন ফসল—গৃহকপোতী। শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী। মূল্যঃ তিন টাকা। দ্বিতীয় প্রকাশঃ আশ্বিন, ১৩৬০।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী সেই গোত্রের লেখক যাঁহারা অল্প কথার পরিসরে একটি বিরাট ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করিয়া তোলেন। এই শিল্প-পরিমিতি-বোধ সাহিত্যিকের একটি সুদুর্লভ গুণবস্তু। কয়েকটি কথার তুলিতে, কয়েকটি আপাত তুচ্ছ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্মরণীয় চরিত্রের বা একটি সুষ্ঠু পরিণতির অবতারণা সরোজকুমারের গল্প-উপন্যাসগুলিকে অনন্য মর্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছে। শিল্পের এই আশ্চর্য পরিমিতি-বোধ লইয়াই সরোজবাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। সে আবির্ভাব রচনার বিপুলত্বে নয় সৃষ্টির সতর্ক কুশলতায় তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সরোজবাবুর দৃষ্টি মানসটি সুদূর অতীতের ধূসর পটভূমি হইতে অনাগত কালের অসীম দূরত্বে প্রসারিত। আর সেই দৃষ্টির আয়নায় একালের কাহিনী, সেকালের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের সতর্ক কল্পনাটি নিটোলভাবে বিম্বিত হইয়াছে।

'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' আর 'সোমলতা'—এই তিনটি খণ্ডে একটি গ্রামীণ বাঙালী নারী চরিত্রের আত্মবিকাশের ধারাটিকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে, কোমল দরদে, অপূর্ব রস সৃষ্টির কারুশিল্পে লেখক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

এই তিনটি খণ্ড একত্রে না পাঠ করিলে সম্পূর্ণ রসোপলব্ধি সম্ভব হইবে না।

'নতুন ফশল'—'গৃহকপোতী' এই ট্রিলজীর মধ্যপর্ব। এখানে রসময় বাউলের আখড়ায় কুলবধূ বিনোদিনীর আশ্চর্য-সংযত, সংসার-নির্লিপ্ত জীবনের অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছে। একদিকে স্বামী-সন্তানের জন্য তাহার মন বেদনাপাণ্ডুর, আর একদিকে কামনা-লোলুপ নায়েব কালীশঙ্করের প্রতি অতি সতর্ক ক্রোধ ও ঘৃণা তাহার চরিত্রে একটি মহিমময় দৃঢ়তার সঞ্চার করিয়াছে।

বাঙলার লুপ্তপ্রায় বাউল জীবনকে সরোজকুমার একটি মধুর শিল্পনৈপুণ্যে পাঠকের সংবেদনশীল দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বাউল জীবনের সরলতা, তীক্ষ্ম রসবোধ, সংসার-বিবাগী ভগবৎ-কেন্দ্রিকতার আবেষ্টনে একটি কুললক্ষ্মীর বিচিত্র জীবনযাত্রাকে তাহার পবিত্র সধর্মনিষ্ঠায় অবিচলিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

অল্প কয়েকটি ঘটনার রঙ্গমঞ্চে তারাপদ, বিরহ-কাতর গৌরহরি বৈরাগী, রাধিকামোহন, সুবল, ললিতা প্রভৃতি জীবন্ত চরিত্রগুলি পাঠকের মনে একটি উজ্জ্বল সজীবতার স্পর্শ রাখিয়া যায়। বাউলজীবনকে আরো একটু ব্যাপকতা, আরো একটু গভীরতা ও আরো একটু সুষ্ঠু প্রয়োগ দিতে পারিলে 'নতুন ফশল-গৃহকপোতী' পূর্ণতা অর্জন করিত।

দীপায়নঃ কাব্যগ্রন্থ। শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ঃ কুলগাছিয়া, মহিষরেখা, হাওড়া। দাম—চার টাকা।

অপূর্ববাবুর এই কাব্যসঙ্কলনটিতে ছিয়ানব্বইটি ধারাবাহিক সুরের কবিতা সাজানো হইয়াছে। এত অধিক সংখ্যক কবিতা একসঙ্গে থাকায় কবিমনের একটি পূর্ণাঙ্গ কথাচিত্র হইতে আমরা বঞ্চিত হই না। গ্রন্থের কয়েকটি গাথা কবিতা ভিন্ন বাকী কবিতাগুলি প্রধানতঃ লিরিক-ধর্মী। নিভৃত পল্লীর শৈশবসন্ধ্যা, সুখ-দুঃখের নানা ধারা, যৌবনের উতরোল ছবি, নারীর সুষমাময়ী একবচন অস্তিত্ব, শান্তরস প্রভৃতি মিলিয়া কবিতাগুলিতে কবিমনের এক অপূর্ব দ্যোতনা সঞ্চারিত হইয়াছে। গোধূলি বেলার প্রৌঢ় আলোকে কবি কান্না-হাসি-রোমাঞ্চিত জীবনের দিকে তাকাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেনঃ

'জীবনে আমার পড়ে আসে বেলা,
ভাব ভাবনায় কেঁদে ওঠে বাণী।
আয়ু-সবিতার শেষ হবে খেলা
কখন্ কে জানে যবনিকা টানি।'

অপূর্ব বাবু মূলতঃ রোমাণ্টিকধর্মী কবি। এই কারণে তিনি নিরানন্দ জীবনের বিষের বাঁশী না বাজাইলেও সর্বগ্রাসী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা ও ধিক্কার কম নয়। প্রাণ দিয়া ভালবাসেন তিনি পৃথিবীকে, তাই বলিতে পারেনঃ এ পৃথিবীর সমাধির উপরেই রচিত হইবে নব যুগের শান্তি-কুসুম। বৈষ্ণব রসসিক্ত কবি যখন দেখেনঃ 'হৃদয় হারায়ে গেছে মস্তিষ্কের বিভ্রান্ত উল্লাসে', তখন তাঁহার কণ্ঠে মর্ম-স্পর্শী আক্ষেপ শোনা যায়ঃ 'রাজনীতি দ্যূতক্রীড়া দেখেছ কি বিভিন্ন শিবিরে, রণক্লান্ত সৈনিকেরা বসে আছে মেষপাল সম।'

এক কথায় গ্রন্থখানি কবির সম্যক পরিচয়। কাব্যরসিকেরা 'দীপায়ন' পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

সম্পাদকীয়

আসন্ন কংগ্রেস-অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী নগরীতে এবারে আগামী ২৩শে জানুয়ারী হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে। এই দিনটির একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস হিসাবে ২৩শে জানুয়ারী ইতিহাসে স্মরণীয়। বাংলার বরেণ্য সন্তানের পুণ্য জন্মদিবসে কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাই যথেষ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, এই সঙ্গে একটি শিল্প ও গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী ১৬ই জানুয়ারী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ইতিপূর্বে ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এগ্‌জিবিশনের কথা স্মরণে আসে। তদপেক্ষাও বৃহদাকারে রচনা করা হইয়াছে কল্যাণী কংগ্রেসের শিল্প ও গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনী। ভারতবাসী মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ইহার জন্য কলিকাতা হইতে কল্যাণী পর্যন্ত নিয়মিত সরকারী যানবাহন চালু রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বাংলার লুপ্ত লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিকে যথাসম্ভব উদ্ধার করিয়া প্রদর্শনী ও অধিবেশনে পরিবেশন করার কাজও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রদর্শনীর মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার যে নিজস্ব বিভাগ করিতেছেন, তাহার আয়তনই হইতেছে ১৭৫০০০ বর্গমাইল। সরকারী ব্যবস্থানুযায়ী এই বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী প্রদর্শিত হইবে; প্রবেশ পথে থাকিবে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে 'শ্রমের মর্যাদা'র প্রতীকস্বরূপ একটি প্রতিমূর্তি। প্রদর্শনীর সামগ্রীর মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস রহিয়াছে, সরকারী উদ্যোগ ও ব্যবস্থার দিক হইতে তাহাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও বাণিজ্য দ্রব্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শাখায় সর্বভারতীয় ও বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অবশিষ্ট ভারতের বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের পরিচয়স্বরূপ নানা জাতীয় মডেল, সেচ পরিকল্পনা শাখায় দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাসহ ভারতের আরও কয়েকটি বড় বড় পরিকল্পনার মডেল, বিদ্যুৎশক্তির শাখায় ভারতের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন পরিকল্পনার চিত্র উত্তর কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের নূতন পরিকল্পনার প্রতীকস্বরূপ বৈদ্যুতিক আলোক সজ্জিত ৭০ ফিট উচ্চ একটি গম্বুজ প্রভৃতি ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সকল নূতন ভবন নির্মিত হইতেছে, তাহা এবং গৃহ ও সহর নির্মাণ পরিকল্পনাগুলি একটি পৃথক শাখায় প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার বাহিরেও থাকিবে পশ্চিমবঙ্গে সড়ক উন্নয়ন ও গবেষণা, সংযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নয়ন, খণ্ডজাতিসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী, কৃষি, বন, মৎস্য চাষ ও পশুপালন ব্যবস্থা প্রভৃতির বিভিন্ন শাখা; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগ এই বিষয়ে এ পর্যন্ত যে সকল কাজ হইয়াছে, তাহা; বিভিন্ন উদ্বাস্তু নারীআশ্রমের শিল্প দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বিপণী ও ক্যান্টিন; বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, উচ্চ ও কারিগরী প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প ব্যবস্থা; এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা তেনজিং নোরকের নামে গম্বুজ প্রভৃতি। আকর্ষণের দিক হইতে প্রাচুর্যের অভাব নাই। প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ একটি পুস্তক শাখা খুলিবারও উদ্যোগ করিয়াছেন; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত কোনো কোনো পুস্তকও বিক্রয়ের জন্য এই শাখায় থাকিবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আলোচ্য ৫৯তম কল্যাণী অধিবেশনটি প্রধানতঃ সরকারী অধিবেশনেরই একটি বৃহত্তর রূপ। যদিও প্রাদেশিক কংগ্রেস জনসাধারণকে দলে দলে যাইয়া অধিবেশনে যোগ-

দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে তাহা কতদূর সম্ভব হইবে, তৎসম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। বাঙালীর জীবনেব মান আজ যে পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তাহাতে অর্থব্যয় করিয়া আনন্দে যোগদান করিবার প্রবৃত্তি থাকিলেও কাহারও সামর্থ্য নাই। কলিকাতা হইতে কংগ্রেস-নগরে যাইতে স্টেট্‌বাসের যে ভাড়া নির্ধারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সাধারণ অবস্থায় ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে যাইতে অনেক কম ভাড়া পড়ে। অতএব দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই গভর্নমেন্টকে নিম্নতম ভাড়া নির্ধারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট

সম্প্রতি কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। কমিশনার শ্রী বি, কে, সেন এই বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া বলেন যে, এই বৎসর আয়-ব্যয়ের হিসাবে ৩৮৷৷৹ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে; কিন্তু কোনো প্রকার করবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় নাই। প্রস্তাবিত এই বাজেট-বরাদ্দ অনুসারে পৌর প্রতিষ্ঠানের আয় হইবে ৫,৯৪,৩৫,০০০্ টাকা এবং ব্যয় হইবে ৬,৩২,৮৫,০০০্ টাকা। ইহার ফলে যে ৩৮৷৷৹ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে, উহা প্রারম্ভিক তহবিল ৫৪,৪১,০০০্ টাকা হইতে মিটাইলে বৎসরান্তে তহবিলে ১৫,৯১,০০০্ টাকা থাকিবে। এই বাজেট বরাদ্দে টালীগঞ্জ এলাকাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। চল্‌তি বৎসরে আয়ের ঘরে মূল বরাদ্দ ৫,৬৩,১১,০০০্ টাকার পরিবর্তে সংশোধিত বরাদ্দ দাঁড়াইয়াছে ৬,৬৫,৮২,০০০্ টাকা। মূল বরাদ্দের আয়ের ঘরে টালীগঞ্জের ৬,০১,০০০্ টাকা গণ্য করা হয় নাই; সংশোধিত আয়ের ঘরে উহা যোগ করা হইয়াছে। চল্‌তি বৎসরে ব্যয়ের সংশোধিত বরাদ্দ দাঁড়াইয়াছে ৬,৩২,২৭,০০০্ টাকা। এই অঙ্ক হইতে টালীগঞ্জ বাবদ বরাদ্দ ৯,৮৪,০০০্ টাকা বাদ দিলে সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়ায় ৬,২২,৪৩,০০০্ টাকা। আগামী বৎসরের বরাদ্দে আয়ের ঘরে যে ২৮,৫০,০০০্ টাকা বেশী দেখা যাইতেছে, উহার প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পৌর প্রতিষ্ঠানকে দেয় কর লইয়া পৌর প্রতিষ্ঠানের যে বিরোধ চলিতেছিল, উহার আংশিক সমাধান।

কমিশনারের এই বাজেট বরাদ্দ ফাইনান্স কমিটিতে বিবেচনার পর যথারীতি পৌরসভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হইবে। কমিশনার শ্রীসেন এই প্রসঙ্গে শিল্প, স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, নিষ্কাষণ নালী, নগরীর পার্কগুলির শ্রীবৃদ্ধি, অননুমোদিত ও বিপজ্জনক ভবন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় সকল কার্যে যে ক্রমাবনতি ঘটিতেছিল, তাহা রোধ করাই বর্তমানে পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। কর আদায়ের ক্ষেত্রে এ বৎসর কর্তৃপক্ষ শতকরা ৮৮ ভাগ প্রাপ্য কর আদায় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন। গত বৎসর শতকরা ৮৩ ভাগ আদায় হইয়াছিল। কর ও ফি হইতে মোটামুটি আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ৩ লক্ষ। কিন্তু আগামী বৎসর জল বিক্রয় বাবদ আয় বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নাই, কেন না, টালীগঞ্জ এলাকা কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং নৌকাভাবে জাহাজে জল সরবরাহ করিয়াও আয় বৃদ্ধির আশা নাই। সহরে গৃহনির্মাণের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহনির্মাণে অনুমোদনখাতে কিছু আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বাজারগুলি হইতে ইতিমধ্যেই কিছু আয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং পশু-হত্যার ব্যবস্থাও ৫০ হাজার টাকা অধিক পাওয়া গিয়াছে। অথচ মজার বিষয় এই যে, আয় কিছু বাড়িলেও কর্তৃপক্ষের বক্তব্যানুসারে দেখা যায়—সেই অনুপাতে ব্যয় কমের দিকে না গিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ব্যয় অবশ্যই কমাইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে—তজ্জন্য যেন প্রয়োজনীয় কাজগুলির কোনোটিই পড়িয়া না থাকে। 'Filthy Calcutta' এখনও শোভনতা লাভ করিয়া স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া নব নব উদ্ভাবনী কার্যগ্রহণ করাই হইবে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের আশু কর্তব্য।

মিঃ সৈয়িদায়েন ও ছাত্রসংগঠন

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে ভারত সরকারের যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা মিঃ কে জি সৈয়িদায়েন যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি শিশু ও জাতিগঠনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ছাত্রসমাজের মধ্যে বিক্ষোভ এবং ছাত্রসংগঠনের দায়িত্ব সম্পর্কেও তিনি সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যুবক ও ছাত্রসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। তাঁহাদের শিক্ষা, মনন-

শীলতা, চরিত্র ও নিয়মানুবর্তিতা যত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবে, জাতির গৌরব তত বাড়িবে। কিন্তু আমাদের ছাত্রসমাজের মধ্যে আজ বহুতর স্থলে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই দিকটি সম্পর্কে তাই বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। এই উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সমস্ত দায়িত্ব ছাত্রসমাজের উপর চাপাইলে ভুল হইবে। বৃহত্তর রাজনীতির প্রভাব ইহার একটি অন্যতম কারণ। মিঃ সৈয়িদায়েন বলিয়াছেনঃ 'অবশ্যই ছাত্রগণ এমন অনেক কাজ করিয়াছে যাহার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আমরাও কি সমান দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিই নাই? ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা কি সামগ্রিক জাতীয় বিশৃঙ্খলারই একটা অঙ্গ নহে? আমাদের প্রবীণ ব্যক্তিরাই কি বুকে হাত রাখিয়া একথা বলিতে পারেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক জীবনে, এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরিচালনায় তাঁহারা অধিকতর শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার নিদর্শন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ছাত্রগণ যখন বিদ্যালয় এবং পরে কলেজে প্রবেশ করে, তখন তাহারা সেখানে কি সামাজিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ দেখিতে পায়? আমার মনে হয়, পায় না। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে না। আধুনিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভয়ঙ্কররূপে যে বাণিজ্যিক মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহার অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া অনেক রাজনৈতিক দলও ছাত্রদের বাস্তবিক বা কল্পিত দাবীদাওয়ার সুযোগ লইয়া থাকে।

অযৌক্তিক প্রশ্ন তুলিয়া সস্তা হাততালি পাইবার প্রত্যাশা করেন নাই মিঃ সৈয়িদায়েন। তাঁহার বক্তব্যটি যুক্তিনির্ভর। ছাত্রজীবনে নানা সমস্যা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সমস্যার সঙ্গে আসিয়া যখন রাজনীতি যুক্ত হয়, তখনই হয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। সেই বিশৃঙ্খলাই আজ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহা আদৌ একটি সুস্থ সমাজ দেহের লক্ষণ নয়। ছাত্রজীবনের একটি বিশেষ গণ্ডি থাকা বাঞ্ছনীয়। সেখানে রাজনীতি নিতান্তই গৌণ। কিন্তু মিঃ সৈয়িদায়েনের ইঙ্গিতানুযায়ী সেই রাজনীতিই নানাদিক হইতে আজ ছাত্রজীবনে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে ফলে ধর্মঘট, শিক্ষক ও গার্ডের উপর অবাঞ্ছিত বলাৎকার প্রভৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে যাইয়াও সমভাবেই ছাত্রসমাজ যোগদান করিতেছে। তাহাতে ক্ষতি হইতেছে কাহার? ছাত্রসমাজেরই। অধ্যয়ন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণের হার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, এবং সর্বোপরি জীবিকার ক্ষেত্রে অক্ষমতা আসিয়া পড়িতেছে জাতি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। অতএব ছাত্রসমাজকে যদি কৃতকার্যতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হয়, তবে প্রথমতঃ এই বহিরাগত রাজনৈতিক আবহাওয়া হইতে তাহাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। ছাত্রশক্তির জন্য প্রয়োজন—Student for Students' interest. সেই 'interest'এ তাহাদের শিক্ষা, চরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা ও সৃজনধর্মী মননশীলতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই। ছাত্রসমাজ এ সম্পর্কে অবহিত হইলে আনন্দের বিষয়।

তবে মিঃ সৈয়িদায়েনের বক্তব্যানুযায়ী একমাত্র বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রসংগঠন সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। প্রারম্ভিকসূত্রে বুনিয়াদি শিক্ষা ছাত্রের মনের উপর সুকুমার ছায়াপাত করিতে পারে, নিঃসন্দেহ, কিন্তু বয়স্ক বুদ্ধিমান ছাত্রের জীবনে ইহাই যথেষ্ট নয়, তাহার জন্য চাই মনের দৃঢ় প্রস্তুতি নিজের জীবনের উৎকর্ষ সম্পর্কে যখনই সে সচেতন হইবে, তখনই শিক্ষার আদর্শগত মূল্যায়ন স্বীকৃত হইবে। এই উৎকর্ষধর্মী মননশীলতা সম্পর্কেও আমরা ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদের কাছে দাবী আমাদের বহু। এই দাবী মিটাইয়া তাহারা অবশ্যই নবীন প্রাণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

বিশ্ববিদ্যালয়-সাহায্য কমিশন

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৪৫ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। উক্ত কমিটির কার্যাবলী মাত্র তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানতঃ ঐ কমিটি ছিল মাত্র একটি উপদেষ্টা সংস্থা। একমাত্র সেক্রেটারীই ছিলেন সর্বকালীন কর্মী; এতদ্ব্যতীত সদস্যগণের অনেকেই ছিলেন বেসরকারী ব্যক্তি এবং তাঁহারা স্বল্পকালীন কর্মী ছিলেন মাত্র। এই স্বল্পসংখ্যক কর্মী এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন ব্যাপারে কোনো কার্যকরী সাহায্য করিতে পারেন নাই। ১৯৪৭ সালে কমিটি পুনর্গঠিত হয় এবং সদস্যসংখ্যাও বাড়ানো হয়। কিন্তু ইহার কার্য-

পরিধির বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় ইহাও বিশেষ কার্য্যকরী হয় না।

এই কারণে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার স্থির করেন যে, একজন সর্বকালীন চেয়ারম্যান এবং সর্বকালীন সেক্রেটারী লইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠিত হইবে। স্থির হয় যে, চারিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকী ছাড়াও নিম্নলিখিত কাজের ভার এই কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইবে:

(১) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য বরাদ্দ করা সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ দেওয়া।

(২) অন্যান্য যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যপ্রকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের বিষয় সম্বন্ধে কমিশনের মতামত চাওয়া হইবে, তাহাদের অর্থসাহায্য বরাদ্দ সম্বন্ধে সরকারকে উপদেশ দেওয়া, এবং

(৩) অন্য যে সকল প্রশ্ন সম্পর্কে কমিশনের মতামত চাওয়া হইবে, সেই সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে উপদেশ দেওয়া।

বিষয়গুলি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁহার বক্তব্য অনুসারে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর ভারত সরকারের উপর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উন্নত মান অক্ষুন্ন রাখা এবং সুযোগ সুবিধাদি প্রদান ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধানের গুরুদায়িত্ব ভার আসিয়া পড়ে। বিভিন্ন উপায়ে আলোচনার পর ভারত সরকার স্থির করেন, এই দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ উপায় সংসদে এক আইন পাশ করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন। তদনুসারে একটি খসড়া বিল রচনা করিয়া মতামত সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিকট প্রেরিত হয়। আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডও এই খসড়া বিলটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। কিন্তু তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই সকল আপত্তির কথা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার এই বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যসমূহের শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন সুপারিশ করেন যে, পৃথক একটি সংস্থা না করিয়া ভারত সরকার যেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন গঠন করেন এবং প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদের হাতে যে সকল কাজের ভার দেওয়ার কথা হইয়াছে, সেইগুলি উক্ত কমিশনের হাতে দেন। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকিবেন, তাহাদের অভাব অভিযোগগুলির খবর রাখিতে পারিবেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুবিধা সংযোগাদিরও সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিবেন।

ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন বলিয়া শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তখন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করায় এই বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন গঠন সম্ভবপর হয়। আরও আলোচনার পর এই অর্থবরাদ্দ বাড়িয়াছে। প্রসঙ্গতঃ শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন: 'আমরা এখন একটি বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন গঠন করিতে পারি। এ জন্য একটি খসড়া বিল রচনা করা হইয়াছে। শীঘ্র ইহা সংসদে উপস্থাপিত হইবে।'

কিন্তু সংসদে উপস্থাপিত হইয়া এই বিল পাশ হইতে এখনও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই অবিলম্বে যাহাতে কমিশন কাজ আরম্ভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভারত সরকার নভেম্বর মাসের প্রস্তাব অনুসারেই বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন গঠন করিয়া ইহাকে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিতে দিবার সিদ্ধান্ত করেন। পাঁচজন সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে এবং ডাঃ এস্, এস্, ভাট্‌নগর ইহার চেয়ারম্যান হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে ইহাকে একটি বাহিরের প্রতিষ্ঠান মনে না করিতে পারেন, তজ্জন্য কয়েকজন উপাচার্যকেও এই কমিশনের সঙ্গে যুক্ত রাখা হইবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন: যদিও চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন বাধ্য হইয়াই ভারত সরকারকেই করিতে হইয়াছে, তথাপি কমিশন স্বাধীন ভাবেই কাজ করিতে পারিবেন; ইহার দৈনন্দিন কাজে সরকার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ যদিও কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি ভারত সরকারের নিকট সুপারিশের আকারেই পাঠান হইবে, তথাপি সরকার ঐগুলি দ্বারাই পরিচালিত হইবেন এবং ঐগুলি মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন। বৎসরের বাজেট সরকারের অনুমোদন লাভ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য কত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা কমিশনকে জানানো হইবে। এই সীমার মধ্যে কমিশন ইচ্ছামত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থ বরাদ্দ করিবেন এবং ভারত সরকার কমিশনের উক্ত উপদেশই মানিয়া লইবেন। কমিশনের সুপারিশ ছাড়া ভারত সরকার আর কোনো নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বিবেচনা করিবেন না বা প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য প্রদানের কথাও বিবে-

চনা করিবেন না। প্রসঙ্গতঃ শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সুযোগ সুবিধাদির সামঞ্জস্য বিধান করার যে উদ্দেশ্য ভারত সরকারের আছে, এই কমিশনের মাধ্যমেই তাহা সিদ্ধ হইবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলির সঙ্গে মিল রাখিয়া এদেশের শিক্ষানীতির পরিবর্তনের দ্বারা যাহাতে অবিলম্বে ভারতের নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়, সর্বপ্রথম অনুরূপ কার্যভার গ্রহণ করাই ভারত সরকারের কর্তব্য হইবে, তৎপর দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বকেন্দ্রিক উন্নতির দ্বারা জাতি গঠনের নূতন পথ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত সরকার তথা ভারত সরকার-নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনকে এই কথাটি স্মরণে রাখিয়া তাঁহাদের আশু কর্তব্য পালন করিতে বলি।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি

পাক-মার্কিন চুক্তিসম্পর্কে আমরা গত সংখ্যায় কিছু আলোচনা করিয়া ইহার ভবিষৎ ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশীয় মতামত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেনঃ পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্য পরিকল্পনা যদি বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে উহা যুদ্ধের দিকেই পদক্ষেপসরূপ হইবে। উহা কেবল মাত্র যুদ্ধ, এমন কি বিশ্বযুদ্ধের দিকেই পদক্ষেপ নহে, বাস্তবিক উহা এমন একটি ব্যবস্থা, যাহার ফলে যুদ্ধ আমাদের দেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিবে। সমগ্র এশিয়ার পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য নীতি হওয়া উচিৎ, উহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে কাজটি এশিয়াবিরোধী বলিয়াই মনে হইবে। পাকিস্থানের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। পাকিস্থানও এ নীতি অনুসরণ করিবে কিনা জানিনা। কিন্তু এসকল ঘটনাবলীতে আতঙ্কিত হইয়া অস্ত্রসজ্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া মূর্খতার পরিচায়ক হইবে।' নাগপুরের কংগ্রেসকর্মিবৃন্দের এক সভাতেও এই প্রসঙ্গে শ্রীনেহেরু বলেনঃ 'আমেরিকা পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দানের যে প্রস্তাব করিয়াছে, উহার বিপদ সম্পর্কে আমি কেবল ভারতেরই নহে, সমগ্র এশিয়ারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহা ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সমস্যা নহে। বাস্তবিক মিশর, ইরাণ, আফগানিস্থান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি মুস্লিম রাষ্ট্রে প্রস্তাবিত চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য ভারত বৈদেশিক সাহায্য চাহে না। নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারাই তাহারা নিজের দেশ রক্ষা করিবে। কোনো বিদেশী সেনাকেই আমরা এখানে আসিতে দিব না। যদি তৎসত্ত্বেও তাহারা আসে, তবে সংগ্রামের দ্বারাই আমরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিব।'

ভারতের এই মনোভাবকে পাকিস্থান কিন্তু শান্তমনে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী ভারতের প্রত্যুত্তর স্বরূপ সম্প্রতি দম্ভোক্তি করিয়া বলিয়াছেনঃ 'প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির জন্য ভারত পাকিস্থানের প্রতি চোখ রাঙাইতেছে এবং প্রস্তাবিত সাহায্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতেছে কিন্তু পাকিস্থান কিছুতেই নত হইবে না। পাকিস্থানের ভিত্তি খুব দৃঢ়, চোখ রাঙানি, হৈ চৈ বা চীৎকারে পাকিস্থান স্খলিত হইবে না।—এই ব্যাপারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতে কংগ্রেস যে আন্দোলন চালাইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য মার্কিন সাহায্যের প্রস্তাব বানচাল করিয়া দেওয়া। কিন্তু প্রস্তাবিত মার্কিন সাহায্যের উদ্দেশ্য হইতেছে পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। পাকিস্থানের পররাজ্য আক্রমণের অভিপ্রায় নাই। দেশ বিভাগের সময় ভারত পাকিস্থানকে তাহার প্রাপ্য সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। এখন পাকিস্থান যদি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হইতে চায়, তবে তাহাতে ভারতের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ থাকিতে পারে না।' প্রসঙ্গতঃ শ্রীনেহেরুর প্রতি পূর্বের ন্যায়ই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহাকে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বৃহৎ দেশের নেতা বলিয়া মনে করিতে গৌরব বোধ করেন।

কিন্তু দেখিবার বিষয় যে, ভারতের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রাথমিক কার্য সাধিত হইয়াছে। গত ৬ই জানুয়ারী আন্কারা পাক-দূতাবাস হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সামরিক সাহায্য হিসাবে পাকিস্থানকে ২০ কোটি ডলার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তুরস্কের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

এক্ষেত্রে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাকিস্থানকে এই সামরিক সাহায্য দানের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে যে ছয়দফা পরিকল্পনার ধ্বনি তুলিয়াছেন, তাহারও অন্তর্নিহিত বিষয়টি উপলব্ধি না

করিতে পারার মতো নয়। উক্ত প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ছয়দফা বিষয় এইরূপঃ (১) মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে আণবিক শক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাধীনে যদি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদির আদান-প্রদান হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দৃঢ়তর হইবে। (২) মানবিক শক্তি সাশ্রয়। আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে মানুষ এবং বস্তুর মধ্যে নূতন সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে এক্ষণে মানবিক শক্তি সাশ্রয় সম্ভব হইবে। (৩) কেন্দ্রীভূত সামরিক শক্তি সঞ্চয়। আকস্মিক আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। (৪) সৈন্যবাহিনীর লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। (৫) সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করার জন্য উন্নততর ঘাঁটি নির্মাণ। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সেণ্ট্ লরেন্স বন্দর গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টায় কানাডার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের প্রস্তাব সমর্থন করিবার আবেদন জানান। (৬) মহাদেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন, আগামী বৎসরে সরকার ১৯৫৫ সালের তুলনায় এক সহস্র কোটি ডলার অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন।

নূতন সামরিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন, এই নূতন পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বর্তমান সঙ্কটের যুগে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে কোনো বাধাই তাঁহারা গ্রাহ্য করিবেন না।

এই পরিকল্পনা শুধু মার্কিন মুলুকেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাহাদের মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যেও সম্প্রসারিত হইবে। সেই সূত্রে পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দানের ভিত্তিতে পাকিস্থানের মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই পরিকল্পনা-কার্য পরিচালিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সাম্যবাদভীতি আজ যেভাবে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে শান্তি-আন্দোলনের ছদ্মবেশে এইরূপ নিজেদের এবং মিত্রশক্তিগোষ্ঠীর শক্তি-সামর্থকে বাড়াইয়া তোলার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে সর্বাঙ্গীনভাবে আশ্রয় করিয়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়াকেও এই ভীতির ভিত্তিতে স্বদলে টানিবার জন্য মার্কিন সরকার হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বহুলাংশেই তাঁহাদের সেই আশা অদ্যাবধি পূর্ণ হয় নাই। এমন কি ভারতকেও সামরিক সাহায্য দিয়া উপকার করিতে চাহিয়াছিলেন মার্কিন সরকার, কিন্তু ভারত তাহা গ্রহণ করে নাই। অতএব পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ভারতে যদি মার্কিনী শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলা যায়, তবে এমন আশা করা অযৌক্তিক নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সংস্থাকে অনায়াসেই বানচাল করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। ভারত ব্যবচ্ছেদের পর হইতে পাকিস্থানও এইরূপ একটি সক্রিয় মনোভাব লইয়াই প্রায়শঃ ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এই মনোভাব আরও দৃঢ় ও সম্প্রসারিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে মহম্মদ আলী ব্যক্তিগত জীবনে নেহেরু-সম্পর্কিত যত শ্রদ্ধাই পোষণ করুন না কেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ। অতএব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু যতই নিরপেক্ষতানীতি অবলম্বন করুন না কেন, যদি যথার্থই যুদ্ধ বাধে, এবং পাক-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠির দিক হইতে দুর্বার চাপ আসে, তবে ভারতের পক্ষে কতখানি নিরপেক্ষ থাকিয়া শান্তির জন্য লড়াই করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে, ইহাই আজ বড় প্রশ্ন। শ্রীনেহেরু ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তিনি স্বভাবতঃই পাকমার্কিন সামরিক চুক্তি-সম্পর্কিত ভীতির দিকটি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যতই নিকটতর হইতেছে, পৃথিবীব্যাপি শান্তি-আন্দোলনও ততই জাগ্রত হইতেছে। পৃথিবীর মানুষ যুদ্ধ চায় না, কিন্তু না চাহিলেও কোনো বিশেষ শক্তিশালী জাতির প্রয়োজনায় যদি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াই পড়ে, তবে পৃথিবীর শান্তিবাদী লোকেরা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারাও শান্তির জন্য লড়াই করিবে। সে লড়াইয়ে ভারতও এক দেশ। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীনেহেরু যে নিরপেক্ষতা নীতির প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা যথার্থই কি দৃঢ় ভিত্তিশীল, না একটি রম্য কথা মাত্র? ভারতবাসীর কাছে ইহাই আজ বড় জিজ্ঞাসা। অতএব আশা করি, শ্রীনেহেরু অবিলম্বে এতদ্-সম্পর্কিত একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের উৎকণ্ঠা নিরসন করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড,
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসন্তের ডাক ফটো—ক্ষীরোদ রায়

একবিংশ বর্ষ ফাল্গুন—১৩৬০ ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

আরব যুদ্ধের ইতিকথা

অধ্যাপক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়ার পশ্চিমাংশে আরব নামে এক বিস্তৃত ঊষর মরুভূমি হাতপা মেলে দিগন্তের কোলে ছড়িয়ে আছে উদাস হাহাকারের মতো। চারিদিক ধূধূ বালুকাময় প্রান্তর—মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের ইঙ্গিত। অধিবাসীরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই স্বাস্থ্য আশাতীত রকম মজবুত ও কষ্টসহিষ্ণু। আরবের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল হতে কিছুদূরে মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কা নগরী অবস্থিত। হিজরা ৫৭০ বর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পয়গম্বর মোহাম্মদ এইখানে জন্মেছিলেন বলেই প্রকাশ।

ইসলাম ধর্মের সার মর্ম হলো পরমেশ্বরের অখণ্ডত্বে-পূর্ণ বিশ্বাস। এই শিক্ষার ফলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরব জাতি 'ইউনিটি' বা সাম্যের বন্ধনে বাঁধা পড়ে। ৬৩২ খৃঃ অব্দ হতে হজরতের উত্তরাধিকারী খলিফাদের শাসন সুরু হয়। দিগ্বিজয়ের ধূয়ো ওঠে ঐ সময়েই।

অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত আরবের বিজয়বৈজয়ন্তীর ছায়া তখন সিরিয়া প্যালেষ্টাইন, মিশর, পারস্য ও সুদূর স্পেনের ওপরেও পড়েছিলো। ভারতবর্ষও তাদের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনি। আরবদের সিন্ধু বিজয় কাহিনী তো সবাই ছেলেবেলায় স্কুলে পাঠ করেছেন। আমি শুধু পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য—যতদূর সম্ভব—গোড়া থেকেই আরবদের জাতীয় জাগরণের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে হাজির করে দেব।

৭১০ খৃঃ অব্দে গুয়াদালেত্তের যুদ্ধে মুরেরা গথ রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। অর্ধসভ্য ইউরোপীয়দের মাথার ওপর নেমে আসে আরব 'কালচারের' মর্সৃক্ষ আবরণ। অক্সাস অবধি পারস্যের প্রায় সবটুকুই তখন ওদের দখলে।

খলিফা ওমরের রাজত্বকাল হতেই ভারত জয়ের কল্পনা দোলা দিচ্ছিল তাদের চঞ্চল চিত্তকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা রোমন্থন করলে দেখতে পাই আনুমাণিক ৬৩৬-৩৭ খৃঃ অব্দে আমান হতে প্রেরিত একদল আরব সৈন্য ভারতের উপকূল ভাগ লুণ্ঠন করছে। ৬৪৩-৪৪ খৃঃ অব্দে মহত্মা ওমরের

দক্ষিণহস্ত আবদুল্লা বিন অমর রবি কার্ম্মান অধিকার করে সিস্তান অভিমুখে পাড়ি দেন। অবরুদ্ধ সিস্তানের রাজা উপায়ন্তর না দেখে বাধ্য হয়ে সন্ধি করেন। আবদুল্লার ইচ্ছা ছিলো তিনি সিন্ধু ও মেকরান পদানত করেন কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসন কর্তাদের হস্তে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হওয়ার ফলে খলিফার হুকুমে তাঁকে পথিমধ্যেই তল্পি গুটোতে হয়।

অল-হজ্জাজ ও মোহাম্মদ বিন-কাশিম

খিলাফতের খ্যাতি-ক্ষমতা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয় তার উদয়াচল বিজয়ের পর। ওমায়েদদের আমলে এই 'চতুর্গুণ' 'সহস্রগুণ' হয়ে উঠে মাথা ঠেকিয়েছিলো চন্দ্রলোকের কড়ি-কাঠে। গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজকেই এর দরুণ 'দুশো বাহবা' দেওয়া উচিত। সুদূর পারস্যে বসে তিনি যে ষ্টীমরোলার ধাক্কা দেন তা বোখারা, খোজান্দ, সমরকন্দ, চীন ও কাবুলের উপর দিয়ে আবর্তন করতে করতে অবশেষে সিন্ধুদেশের দেবল বন্দরে এসে থামে।

সিংহলের রাজা খলিফা ও হজ্জাজ সাহেবের মনস্তুষ্টি-কল্পে আটখানি জাহাজ ভরে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে বোম্বেটে দলের কৃপায় নজরানা বেবাক্ হাত ফেরতা হোলে বাঁধলো মুস্কিল। দুর্বিনীত-সিন্ধুবাসীদের শায়েস্তা করতে ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে এলো মুসলিম বাহিনী। উপর্য্যুপরি কয়েকবার মার খেয়েও শেষরাত্রে বাজি জিত্‌লো তারা। 'তামাক গেলো, কল্কে গেলো, গড়গড়াটা তাও গেলো।' ধনে পুত্রে নির্বংশ হোলেন চাচকুলতিলক সিন্ধু-গৌরব ব্রাহ্মণ দাহির। তাঁর বিধবা পত্নী রাণী বাই অতঃপর রাওড় দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অন্যান্য হিন্দু মহিলাসমেত জীবন বিসর্জন দিলেন। 'তারপর যাহা, ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোনো কালে।'...

দাহিরের দুই কন্যা ছিল। সুরযদেবী ও পরমলদেবী। পাহাড়-সমুদ্রের বেড়া ডিঙ্গিয়ে তাঁদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ৫৫০ ভোল্ট বিদ্যুতের পাখায় চড়ে পৌঁছেছিল খলিফা ওয়ালিদ বিন-আবদুল-মালিকের হেড-অফিসে। খলিফা আদেশ ভেজলেনঃ হিন্দুস্থানের এই হুরী দুজনকে যেন অবিলম্বে তাঁর জেনানায় আমদানী করা হয়। হজ্জাজের ভাগিনেয়-জামাতা মোহাম্মদ বিন কাশিমের হাতেই উক্ত কমিশনের যাবতীয় খবর্দারী ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু অহো! কি মন্দভাগ্য। বিশ হাত বস্ত্রেও যাঁদের 'বিধবা' (অর্থাৎ বিবস্ত্রা) বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, তথাকথিত বহু বিদগ্ধ জনার মতে বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও যাঁদের মস্তকে নেই—সেই অসহায়া, সরলা অবলা ভাবতীয় নারীদের মাত্র দুটীর একটি চালেই "খেলার মোড় (সংবাদপত্রের ওজস্বিনী ভাষায়) অন্যদিকে ফিরিয়া গেল।" ভাগিনীযুগল শির দিলেন বটে, কিন্তু সার দিলেন না। সিংহাসনারূঢ় আমীরুল মুমনীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে বল্লেন সুরযদেবী-পরমলদেবীঃ "ধর্মাবতার! খলিফার হারেমের গুলবাগে শোভা পেতে বেকবুল এমন আওরত বেহেস্তেও মিল্‌বে না। তবে কিনা কাশিমপুত্র মোহাম্মদ ইতিপূর্বেই আমাদের দুইজনকে তাঁর প্রসাদ করে দিয়েছেন এই অসুবিধা। আঘ্রাত নৈবেদ্য সর্বশক্তিমান শ্রীল শ্রীযুক্ত খলিফা বাহাদুরকে কি প্রকারে...

অলমিতিবিস্তরেণ। মেঘের পাহাড়ে পাহাড়ে, গগণের কোণায় কোণায় একসঙ্গে শোনা গেলো হাজারটা 'কেশর ফোলা সিংহের' প্লীহা বিদারক হুহুঙ্কার। এতো বড়ো গোস্তাকী? ওয়ালিদ ডান হাতের শেল তুললেন 'ঝড়ের মেঘ পানে।'

..."শেষ বজ্রপাত
নামিল আঘাত।'

খলিফার অনন্যথা করণীয় ফার্মানখানি পাঠ করে হজ্জাজের ভাগিনেয়-জামাতার চক্ষে লাগলো রাশি রাশি সরিষাপুষ্পের জরদ ছোঁয়াচ। হক্কা। দরিঘা। একি আদেশ করেছেন ঈশ্বরের অবতার? 'বৃষের কাঁচা চর্মে মহম্মদ বিন কাশিমের দেহ যেন সেলাই করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়!' যে দিগ্বিজয়ের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তাঁর মাতুল-শ্বশুর হজ্জাজ, যাব মণ্ডপীঠে রসারসি সংযোগ করেছিলেন মোহাম্মদ স্বয়ং, আজ তারই সুঁড়ি-পথের ঠিকানা ধরে এশিয়ার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে অগণিত মুমীন-উ-মুসলমানা ও 'ক্যারাভানের' দল। নিম্ন-বর্তী সিন্ধু অঞ্চল আজ আরব অধ্যুষিত। মার্ম্মাদ (মাড়ওয়ার?), অলমন্ডল (মান্দোর? বীরগাঁও-এর কাছে?), দহনাজ, বরওয়াস (ব্রোচ), উজ্জয়িনী মালিভা (মালওয়া), বাহরিমাদ, অল-বৈলমান (বল্লমন্ডল?) ও অল-জুর্জ্জ (গুর্জ্জর) হয়েছে অধিকৃত। কচ্ছ, সুরাষ্ট্র, চভোটক (সম্ভবতঃ গুজরাট কিংবা পশ্চিম রাজপুতানার কোনও চাপ রাজ্য), দক্ষিণ রাজপুতানা ও ভীনমালের অবস্থাও তথৈবচ। বাকী আছে—শুধু দক্ষিণে চালুক্য, পূর্বে প্রতিহার ও উত্তরে কারাকোটদের সঙ্গে ফায়শালা করার অপ্রিয় ওয়াস্তা-টুকু। এমন সময় হুজুরের মস্তকাবরণের মধ্যে হঠাৎ মৌমাছি সেঁধাবার কারণটা কি? পারসী কবি সাদী বলেছেনঃ

"হর কি শাহ আন কুনদ কি উ গুইয়দ
হইফ বাসদ কি ভাজ নিকু গুইয়দ"

সাদা বাঙ্গালায়—'যাঁর উপদেশানুসারে রাজা কাজ করেন, তিনি যদি সত্য ভিন্ন আর কিছু বলেন তাহলেই 'ল দাঁড়াবে' অর্থাৎ খতেরার 'পসিবিলিটি।' বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একে নারী মোহিনী, তায় সুন্দরীর মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা হোলো মুগ্ধবোধের অমৃতবিন্দু। বড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দিকচক্রবালের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন কাশিমতনুজ মোহাম্মদ। তাঁর শেষ নিরাশ পলকের স্পর্শে দিগন্তের রক্তিমা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছিল কিনা কে দেবে সেই সংবাদ?

খলিফার 'অর্ডার মুতাবিক' বলীবর্দ্দের চর্মাবৃত তরুণ সেনাপতির মৃতদেহ তুরন্ত এসে পৌঁছালো দরবারে। খলিফা বল্লেনঃ "কেটে ফেলো আচ্ছাদন! দেখুক হিন্দুস্থানের বিবিরা দুশমনের হাল।" "কি লা দুরা লা ভিপে" —ক্ষুদ্র মূষিকও সময় পেলে স্থূল রজ্জু ছিন্ন করতে পারে সুরযদেবী-পরমলদেবীর চেষ্টায় তা হোলো অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত। পথের কণ্টক সাফ। কিন্তু...! কিন্তু কবীন্দ্রের অমর ভাষায় তখন কি তাঁরা মনে মনে নিশ্চয় বলেন নি যে "আমাদের এ প্রাণে কি কাজ ছিল? এ জন্মের জন্য পিতৃহন্তার জীবনের পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী অস্তিত্ব তো ধিক্কৃত হয়েছেই। ধিক এ নিশ্বাস যা তার কাছে ঋণী। ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে?" তাঁরা স্বীকার করলেন ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত তাঁদেরই সাজানো। মুহূর্তের তরেও মোহাম্মদ খলিফার নিমকের বেইমানি করেননি।" কলেজ-জীবনে এই কোপার্ডের একটি বিখ্যাত গল্প পড়েছিলেম। টাইটেলটা বোধ হয় 'দুনিয়ার রাজা' বা ঐ জাতীয় একটা কিছু হবে। গল্পটিতে আছে, কেমন করে হাজার হাজার বছর আগে আসিরিয়ার সম্রাট সেনাচেরিবের এক সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষ পথভ্রষ্ট হয়ে সিনারের মরুভূমিতে গিয়ে হাজির হয়। নামু-সারকন ছিলেন আসিরিয়দের একডাকে সাড়া দেওয়া দেবতা। ভক্তদের আত্মা গ্রহণ করে বিনিময়ে বেচারাদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য অহল্যা বানিয়ে রাখাই ছিল তাঁর পেশা। সময়ান্তরে ঠাকুরের মেজাজ সরীফ হোলে দুএকজন অবশ্য ফিরে পেতেন তাঁদের প্রাক্-প্রস্তরীভূত মূর্তি. তবে সেটা ঘটত কদাচিৎ বিড়ালের কিসমতে শিকেছিঁড়লে। তালাক্কু (সেনাপতি ওরফে নায়ক) গিয়ে দাঁড়ালো এমনই একটা ভাঙ্গা দেউলের সামনে যেখানে বহুদিন যাবৎ সারকনের পূজার বালাই হয়েছে বন্ধ।

পূজাহীন তার পূজারি
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারী!
সন্ধ্যাগগণে ঘোষে না শঙ্খ তাহার আরতি-বারতা।
তার মন্দির স্থিরগম্ভীর, ভাঙ্গা দেউলের দেবতা॥

হঠাৎ 'কেল মেয়রভিএ!' মন্দিরের দেওয়ালের কাঁচা জমাটের উপর একটি পরমাসুন্দরী তরুণীর মূর্তি ছিলো চিত্রিত। এক মুহূর্তে কেমন করে সেটি উঠলো প্রাণবন্ত হয়ে। তালাক্কুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পালা সুরু হতে না হতেই যুগলে পা দিলে প্রেমদরিয়ার ঘূর্ণিপাকে। হায়রে ভালোবাসা! তালুক্কু শুনলে সারকনের কাছে মেয়েটি কামনা করেছিল শাশ্বত প্রেম। ঈশ্বরের কৃপায় সে প্রার্থনা পূরণ হয়েছে তার। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে পাথরের বন্ধনে এই যা বেদনা। কথা বলতে বলতে মেয়েটির অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে লেগেছিল সঙ্কোচন। ভীত, বিস্মিত যুবক এইবার অনন্তের দিশাহারা কিনারায় বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে যা দেখলো তা সত্যিই অদ্ভুত! 'রামনাম সত্য হ্যায়!' ধীরে ধীরে সুন্দরীর পেলব তনু অভিশপ্ত 'কৃষ্ণদ্বীপের রাজপুত্রের' মতো—অধোভাগ হতে নয়, উর্ধভাগ হতে—কঠিন হয়ে যাচ্ছে!

সুরযদেবী-পরমলদেবীও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন এই অদৃষ্টপূর্ব 'মিরাকল্' বিমূঢ় অবচেতনার অগাধ ডুবজলে ভাসমান প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তখন উত্থান শক্তি রহিত। মীর মাসুম লিখেছেন, "এই ঘটনার তিন দিন পূর্বে জীবন্তে চিড়িয়া মোহাম্মদের দেহপিঞ্জর ত্যাগ দিয়েছিল বেহেস্তে পাড়ি।"

আরবজাতির উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে গিয়ে একি বাক্তুলতা আমার! ধান ভানতে ত্রিলোচনের কীর্তন বরদাস্ত করা যায় না কোনো মতেই। সুধী পাঠক, আমি সাহিত্যিক নই। আমার উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষ কোনোকালেও সাহিত্যের ছুঁচো মেরে হস্ত কলুষিত করেন নি। আমি ঐতিহাসিক। তাই বুঝি বা কোন কারো উপর ইতিহাসের চুণ-শুরকী চাপানো আমার 'হ্রাবিট্' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ গুনাহ্ বাস্তবিক অমার্জনীয়।

অপ্রাসঙ্গিক বোধে খলিফা দুই ভগিনীর কি ব্রত শাস্তি বিধান করেছিলেন সেটা না হয় অজ্ঞাত রাখলেম। পাপের ভাণ্ড তো টইটম্বুর, কেন সেটা এবার ফুটকড়া করি বলুন তো?

টমটিড্ লারের যুগে

এর পর চলে আসুন 'তপ্ত খোলা থেকে গনগনে আগুনে।' কৃষ্টি, সভ্যতা ও নূতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গেলের

পাঁচন—নূতন আইডিয়া ও বহুমুখী 'কনফ্লিকটিং ইনটারেষ্টের' জগাখিচুড়ী অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইংরেজ, ফরাসী ও মিশরীয়, রাশ্যা, তুরস্ক ও পারস্য যে শতাব্দীর রাক্ষুসে কড়াইয়ে একসাথে ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে—ফুটছে আর ফুটছেই যুগের চমকদারী অ্যাটম বোমার কারখানায় —তরল লাভার মতো।

তিন শতেক যাবৎ অটোম্যান প্রভুত্বের গোড়ালীতোলা জুতো চেপে বসেছিলো আরব জাতির গলায়। তার দরুন বিদ্রোহ বিস্ফোরণও অল্প হয়নি। সিরিয়ার ফাক্‌রুদ্দীনের উত্থান, আরবে ওয়াহাবী প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা, তুর্কী অধিরাজের বিরুদ্ধে মেহেমেদ আলীর অভিযান—সব কিছুই হোলো এই বিদ্রোহ-বিস্ফোরণের বিভিন্ন উদগতাংশ বা শাখা-প্রশাখা। এরা আরব জাতীয়তাবাদের দড়ির সিঁড়ি—চরম পরিণতি নয়, স্বতন্ত্রীকৃত কারণ, দেশাত্মবোধের গোলপোষ্টের দিকে পবননন্দনের লম্ফপ্রদান নয়; অঙ্কুশতাড়িত অবিভক্তব্য অধ্যাবসায়ের হঠাৎ বল্‌সে ওঠা 'এ্যামবিশন্‌' কিংবা বিশ্বাসের প্রতীক, জাতির শিকড়ের মূলে কষ্টভোগী আদর্শবাদীদের যুগব্যাপী যে উদ্যম ছট্‌ফটিয়ে মরে দিনের পর দিন তাও নয়। "যে আলোর?"

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে সিরিয়ার বৈরুত সহরে আমেরিকান-দীনবন্ধুদের উদ্যোগে একটি 'সাহিত্যিক মজলিস' খোলা হয়। নামে 'সাহিত্যিক' হোলে কি হবে, আড্ডার টেবিলে অন্যান্য জঙ্গলের হস্তী-গন্ডারও মারা পড়তো প্রচুর। 'সুকুমার রায়ের নোট বইয়ের মতো এই ক্লাবটি ছিলো 'সকল সমস্যার সমাধান, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দান।' তবে...., তবে ভবিষ্যৎ আরবজাতীয় আন্দোলনের বীজ যে 'জীবনের মাল্য হতে' খসে এইখানেই পড়েছিল এইটা কি এক মস্ত সান্ত্বনার কথা নয়?

যাক্‌ সে কথা। আসরে নামবার আগে 'আরব দুনিয়া' বল্‌তে কি বোঝায় তাই নিয়ে খানিকটে আলাপ-আলোচনা করি আসুন।

ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে 'আরব' কথাটার অর্থগত ব্যুৎপত্তিও যায় বদলে। প্রাচীন শিলালিপি হাতড়ে বিশেষজ্ঞরা এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, পূর্বে পৌত্তলিক-আরবে যে দুটি জাতি বাস করতো তাদের একটি ছিল প্রধানতঃ যাযাবর ও অপরটি অচলিষ্ণু। দক্ষিণের উচ্চভূমি অর্থাৎ ইয়ামান ও হাদ্রামাউৎ অঞ্চলে তারা ফেলে তাঁবু। কমচওড়া ethnographic ভাষায় 'আরব' বল্লে বোঝাত এদের বা এদের একটিকে।

মোহাম্মদ গতাসু হোলে প্রায়োম্বীপের আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে বেরিয়ে আসে 'ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো' মুসলমান। বিষ্ণু পুরাণের বামন এরা। স্বর্গ, মর্ত্ত্য হোলে হবে না, বলী রাজার ন্যাড়া মাথাটাও চাই তৃতীয় চরণ রাখবার জন্যে। এককলা চাঁদ আর তিন টুকরো নক্ষত্রের সবুজ ঝান্ডা কাঁধে করে এরা এক দৌড়ে পেরিয়ে যায় উত্তর দিকে (১) সিরিয়া, আনাতোলিয়া ও কনস্তান্‌তিনোপল; পূর্ব-দিকে (২) ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান ও তদানীন্তন তুর্কীস্তান; পশ্চিমদিকে (৩) মিশর, গোটা উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগ, আটলান্টিকের তীরভূমি, (আরও একটু উত্তরে) স্পেন, পেরেনীসের অনুপ্রস্থে ফ্রান্স, আভিন্যঁ, কারকাসন, নারবন এবং বর্দ্দোর সীমারেখা। কোথাও ছেদ নেই, ভেদ নেই। স্পেন-পর্তুগাল থেকে বেতারের 'এরিয়ল' খাটালে দেখতে পেতেন পশ্চিম দক্ষিণোপকূলের তটরেখা ধরে ভূমধ্যসাগর অবধি ও পূর্ব সিন্ধুর তরঙ্গাবিধৌত কিনারা হতে আরাল সমুদ্র পর্যন্ত সিধে চলে গিয়েছে এই শব্দ-মন্ডলের চৌহদ্দি। সুধী পাঠককে সবিনয়ে বলি, "কথাটাকে ভেবে দেখো কি রকম সঙ্গিন?" এ যেন রাতারাতি পড়ো জমির ওপর সাতমহলা কোঠা বানিয়ে তোলা! পয়গম্বরের চেলা-চামুন্ডাদের নাগরার শুঁড়ে শুঁড়ে 'সেলাম-আলেকুম'। সাবাস হিম্মৎ! 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের' গল্প এরাই লিখ্‌তে পারে বটে।

আরবরা যে সসাগরা এক বিরাট ভূখন্ড দখল করেছিলো সেইটা তাদের একমাত্র বড়ো 'বাহবা' নয়। তখনকার পৃথিবী এদের পাঠশালে এক নূতন শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। পেয়ে-ছিলো এক নূতন সভ্যতার দীক্ষা। কৃষ্টিমূলক এই অভি-ব্যক্তির সমবায়জনিত বলও ছিল দুই প্রকার। যথা—(১) সামাজিক, ও (২) ধর্মসম্বন্ধীয়। কিন্তু স্বাভাবিক সরল রেখার জের টেনে হাঁটলেও একের সঙ্গে অপরের যে কোন সম্পর্কই ছিলো না একথাটাও প্রণিধেয়। সমাজপন্থীরা চেয়েছিলেন আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তাঁরা পদানত জাতিগুলিকে 'পাক্কা আরব' করে তুলবেন। পরিকল্পনাটা ষোল আনা কার্যকরী না হোলেও বারো আনা যে হয়েছিল সে বিষয়ে মাথা ফাটাফাটি করবার কোনো কারণ দেখিনে। দেশে যারা খাঁটি আরব এসেছিলো তাদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে 'রাম ও রহিম' হোলো 'হরিহর।' লবণের পুত্তলিকা সাগরে জল মাপতে এসে গেল লোনা জলে তলিয়ে। একাধিক ভিন্ন জাতি এবং কুলের মধ্যে ঘট্‌তে সুরু হোলো বিবাহার্থ আদান-প্রদান। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'

যোগে ভুল ?

Arabization প্রথায় দস্তক-কোষ্ঠি ঘাঁটিতে হোলে ইতিহাসের রাজদরবারে অনেকটা পথ পিছু হে'টে যেতে হয়। ইস্‌লামের অভ্যুত্থানের বহু শতাব্দী আগে তাদের তাগাদা মাফিক আরবেরা যে বহুবার সিরিয়া এবং ইরাকের ওপর চড়াও হয়েছে এমত নজীরের অভাব নেই। ভূমধ্য-পোসাগরের কূলে খৃষ্টাব্দের দু'শো বৎসর পূর্বে স্থাপিত হোমস্ ও এদেস্‌সার আরব রাজ্যযুগল অন্ততঃ তাই প্রমাণ করে। খৃঃ অব্দ তৃতীয় শতকে পামীরা, হিরা প্রভৃতি নগরে পয়গম্বরের 'পোলা-পিলেরা' তো রীতিমতো দাপট সহকারেই খবরদারী করে গিয়েছে।

দিগ্বিজয়ের গাঁটছড়া আলখেল্লায় বেঁধে অসংখ্য আরব সিরিয়া ও ইরাকে গিয়ে আড্ডা গাড়ে। কিন্তু এখানেও আবার সেই ঝাণ্ডার ঝট্‌পটি! ধর্মোন্মাদনার ঘূর্ণি হাওয়ায় পড়লো দিগন্ত ঢাকা আর ইস্‌লামের মাণিক্যমণ্ডিত মস্ত স্তীর শুন্ডের তাড়নায় একে একে চতুর্দিকে সবেগে ক্ষিপ্ত হতে থাকলো 'উড়কী ধানের মুড়কী' 'কোই এ'হা কোই ও'হা।' সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাকীদের পাল্লায় পড়ার ফলে আরবদের স্বাতন্ত্র্যবোধ অল্প ক্ষুণ্ণ হয়নি, তবে তারা যে ইহ-কালেই দুনিয়ার হিসেব চুকিয়ে নিতে পেরেছিল এই হোলো আসল কথা। আরব ভাষার 'ল্যাসো' কাফেরদের সমাজ-সভ্যতার কোমর-উঁচু মেহেদী বেড়াতে আট্‌কে যেতে দেখেও তারা ভড়কায়নি। যাবার সময় সিরিয়া ইরাক এবং মিশরের বর্ণসঙ্কর, হীনশক্তি "গ্রীকো-আরমাইক", "সাসানিয়," ও "গ্রীকো-কপটিক" কলচরের গোড়ায় তারা ঢেলে দিয়েছিল আশু বিনাশের মারাত্মক এ্যালকোহল। সুখের কথা 'অঙ্ক' দুই আর দুই-এর একুন ওঠে চার।

ইস্‌লাম চেয়েছিলো সারাটা এশিয়ার ঝোল নিজের কোলে টান্‌তে। আরবদের সম্বন্ধেও এক কথা প্রযোজ্য। কিন্তু প্রথমটির পক্ষে বস্তুতান্ত্রিক জীবনের বহু বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হোলেও দ্বিতীয়টির পক্ষে অনেক সময় পা বাড়ানোই ছিলো এক কঠিনতম সমস্যা। স্থূলতঃ, যে সব দেশ আরবরা কায়েমী ভাবে দখল করে সে-সব দেশেই পড়ে ইস্‌লামের পায়ের ছাপ। কারণ অপরিহার্য যে ভদ্রলোক বাগ্‌দা চিংড়ী কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ফুলকপির জোড়াটাও যে তাঁর কেনা হবে এই হোলো সংসারের চিরদিন-কার নিষ্পত্তি। তবে ক্ষেত্র বিশেষে 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে'-ও শিবহীন যজ্ঞ হয়ে থাকে। পারস্য এবং আফগানি-স্তানের' দিকে তাকান, দেখবেন, ইসলামের বুড়ো ব্রহ্মদৈত্য তাদের স্কন্ধে বরাবরের দরুণ মৌরসী পাট্টা জমাতে সক্ষম হোলেও আরব ভাবধারা সেখানে একেবারেই পাত্তা পায়নি।

ঠিক তেমনই (যদিও ডিগ্রীর তারতম্য স্থানকালপাত্র-ভেদে অনেকখানি কমবেশী) Arabization প্রথার দুটি মস্ত বড় প্রত্যঙ্গের—যথা, বিজিত রাজ্যে আরব ভস্মর প্রসার ও আরব শোণিতের অন্তঃক্ষেপণ—মধ্যখানে ছিল পাল্লা এবং আয়ত্তির আকাশ পাতাল ব্যবধান। অবিশ্রাম বাইরের লোককে ঘরে আশ্রয় দেবার বেলাতেও একটা সাম্যাসাম্যের কথা ওঠে। অনেকে প্রবলতর আরব শক্তির দোহাই দেখাবেন। কিন্তু আমার হাতেও তো তাসের দুর্ভিক্ষ হয়নি? বলি, 'শারিরিক' ও 'আর্থিক' প্রশ্ন দুটো কি অনুধাবনের পক্ষে এতোই নগণ্য? লক্ষ্মণের গণ্ডী টেনে আরব ভল্লার অগ্র-গতিকে রোধ করে রাখা যায়নি সত্য—কিন্তু সর্বনাশা এগিয়ে চলার পালা শেষে যখন আরব জাতির মস্‌নদে চেপে বসবার সময় এলো তখন অপরিসর কয়েদখানার 'ল্যাবিরিন্থের' মধ্যে racial penetration-এর মিনোটরকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে কি তার বিফল আক্রোশে 'আবোল-তাবোলের' লড়াই ক্ষ্যাপা জগাইদাদার মতোই "ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সামলে নিয়ে কোঁচা" 'এইনে' বলে" শূন্যে খোঁচা মারতে ইচ্ছা হয়নি? প্রখ্যাতনামা ফরাসী অধ্যাপক লুই মাসিনো তাঁর 'রেভ্যু দ্য ম'দ মুসুলম' শীর্ষক গ্রন্থের ৫৭তম খণ্ডে (১৯২৪) লিখেছেন যে, 'আরব উপদ্বীপের প্রান্তস্থিত যতগুলি দেশ আছে তার ভিতর প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডানই গ্রাস করেছিল দশ আনা বিদেশীকে, মিশর দু আনা ও সিরিয়া এবং ইরাক আধআধি। প্যালেস্টাইনের মুসলিম অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ হোলো আরবগোষ্ঠি-উদ্ভূত। ট্রান্সজর্ডানের শতকরা পরিমাণের না হয় দিলাম ছেড়ে। অদ্ভুত তাকৎ এই আরব জাতির। বংশবিস্তরের নামে তামাম দুনিয়ার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে তুলেছিলো এরা। আরব ভাষায় 'আন্ডালাস' (হিমবাহ) বাধিবে কে? সপ্তম শতাব্দীর চাকা ঘোরাবার আগেই সিরিয়া ও ইরাক সানাই বাজিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আরবীকে তাদের অন্দরে আবাহন করে নেয়।

তাড়াই পুরুষের মধ্যে এতগুলো জনপদের সাবেক ইতিহাস পাল্টে দিয়ে আবার নূতন সুরে নূতন বীণ বাঁধা কি যার তার কর্ম্ম? আমার জনৈক জার্মান বন্ধু মোরগ চক্ষু করে একদা আমাকে বলেছিলেন, "সমস্ত সম্পাদনাটার মূলে যে শৃঙ্খলাশক্তি, যে উদ্যম কাজ করেছে তা হচ্ছে সত্যিই আইন ভেল্‌ৎভুন্দের (ein weltwunder অর্থে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়)।" আমি উত্তর করেছিলেম, 'ইয়া, রাইন

ফ্রয়েন্দ, জি রেখ্‌তিক্‌ হাবেন (Ja, mein fround, sie rcchtig haben, হাঁ দোস্ত, আপলোক ঠিক বাতায়া) কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত হচ্ছে অন্যোন্য বিনিময়ের ফলে যজ্ঞের চরুর মতো যে মিশ্র পদার্থটি উৎপন্ন হয়েছিল সেটি। বিজেতা মুসলিম এসে ঘুনধরা মুমূর্ষু জ্ঞান এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির বৃক্ষ কোটরে সুপ্রচুর জীবনীশক্তির যে জলধারা সিঞ্চন করে ছিল সেটি।" দধিচীর মতো নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এরা জগতকে করলে জয়। ইথে কি সংশয়? খোদ রক্তবীজ মরেছিল একদিন কিন্তু রক্তের বীজ তো মরেনি।

আধুনিক 'আরব দুনিয়া' এমনই কতকগুলো দেশকে নিয়ে গঠিত যেখানে—বিশেষভাবে—আরব কৃষ্টি ও সামাজিক সংস্কারের জবরদস্তী আজও বিদ্যমান। মার মুখে গল্প শুনেছি, পল্লীগ্রামের ছোক্‌রারা কলার খোসার মধ্যে আফিম পুরে বানর ধরে থাকে। জানোয়ারটা প্রথম প্রথম দূর থেকে ফল নিয়ে পালায়। তারপর নেশাটা যখন তাকে পেয়ে বসে তখন বাধ্য হয়েই সে ছেলেদের কাছে আসে গলায় শেকলের হার ঝুলোবে বলে। কিন্তু দৈবাৎ মনিবের খোঁয়ারির রসদ জোগাতে ভুল হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তখন পোষ্যটির আঁচড়-কামড়ের ধাক্কায় বেচারার দশা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা সেই 'তাতারধরা সিপাহীর' মতো। 'মাথার রতন চেপ্টে থাকে আঠা হেন, ফেলতে তারে পারবে নাকো এইটি জেনো।' পথের ধার থেকে আরবরা তুলে এনেছিল মধ্য প্রাচ্যের একাধিক দেশকে। দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, তাদের 'গুরুমারা চেলাগিরীর' চোটে 'মেজরিটি' আরবরাই শেষে হটে যায়। শিরোমণির চতুষ্পাটিতে যারা 'ক'-তে কমললোচন শ্রীহরি, 'খ'-তে খগআসনে মুরারি ইত্যাদির নামতা অভ্যাস করতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যেতো, তারাও তো আজ রিমলেশ চশমা নাকে দিয়ে ব্রায়ার পাইপ টানতে টানতে পলিতকেশ অশীতিপর পণ্ডিতমশায়কে নর্মান হেয়ার, ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ষ্টেকেল ও মেরী ষ্টোপসের বিভিন্ন থিয়োরী শোনাতে মস্তক কণ্ডুয়ণ করে না দেখেছি। কিমাশ্চর্য্যম্‌ অতঃপরম?

বেঁচে থাক স্পেন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপমালা। জিন্দাবাদ পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান কিংবা সিন্ধু ও আমুদরিয়ার (অক্সাস) অপর তীরস্থ যে কোন দেশপুঞ্জ। যে গিয়েছে যাক্‌। মন্দ হয়ে থাকে তো আফ্‌শোসের কথা। ভালো হোলে তো কথাই নেই। কিন্তু তারিফ করুন তাদের যারা চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্যে বিদেশী ভাষার কাজল চোখে মাখায়নি বা আমাদের মতো 'পুঁটেচুন্নীর ব্যাটা' হয়ে 'জন বুলের' অর্ধদগ্ধ লাঙ্গুলে আয়োডেক্স মর্দন করতে যায়নি। আরব প্রভুত্ব ছিল তাদের কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। অপেক্ষা যা ছিল তা ফুরসৎ অনুযায়ী ঝেড়ে ফেলার। ঝড়ে ছোটো গাছ পড়ে না কিন্তু দুম্বা-বকরীও তাদের গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে যায় তা সবাই জানে। যাদের ঐতিহ্য বলে কোনো সম্পদ নেই, তারা সেটা হারাবে কেমন করে? উদাহরণ?—পশ্চিমে, অতলান্তিক সমুদ্রোপকূলবর্তী, দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের তটসংলগ্ন ও পূর্বে পারস্যের সীমান্তস্থিত দেশসমষ্টি। মরক্কো হতে মিশর অবধি, উত্তর আফ্রিকার উপকূল, সিরিয়া ও ইরাক এবং আরব উপদ্বীপের ভূখণ্ড। আরব এখানকার জাতীয় ভাষা।

প্রথম সেলিম ও অটোম্যান প্রাধান্যঃ
সোলিমানের স্বর্ণযুগ

'আরব' শব্দের ভাবনির্বাচন করলে তাই আমরা সাবেককালের একদল 'অজ্ঞাতকুলশীল' যাযাবরকে বুঝি না। বুঝি মহা-মানবের সাগর-তীরে সুদূর অতীতে যারা একদিন জাতি-ধর্ম ও সবকিছু একের অনলে আহুতি দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল 'একটি বিরাট হিয়া' তাদের—শুধু তাদেরকেই। খৃষ্টান, মুসলমান, জরথুস্ত্রপন্থী—যাই হোক না কেন—লোকটির চালচলন, আদব-কায়দা, কথাবার্তা আরবী কিনা, সেইটাই সকলে জানতে চাইবে গোড়ায়।

এই নয়া আরব দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র। গুটিকতক 'ছেঁড়া-ল্যাঠা' বাদ দিলে দেখতে পাবেন যে এই রেখাচিত্র ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম আদরার মাঝে অতি অল্প অসামঞ্জস্যই বর্তমান। মরু-সমুদ্র মন্থন করে ইতিহাস মাথা নাড়া দিলে সেদিন, যেদিন আনাতোলিয়ার দুর্গ হতে কদম্‌ কদম্‌ কুচ্‌কাওয়াজ করে জনৈক তুর্কী যোদ্ধা যাত্রা করলেন কায়রো অভিমুখে। আরব জগতের ওপর অটোম্যান শাসনের বুনিয়াদ সংস্থাপন প্রথম সেলিমের এক অমর কীর্তি (১৫১৭)।

১৫১৫ খৃঃ অব্দে পারস্যের শাহের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে সেলিম মিশরের দিকে দৃষ্টি দেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, মিশরও যায় পারস্যের পথে (১৫১৬)। দুটো প্রকাণ্ড অন্তরায় যখন দূরীভূত হয়েছে সিরিয়া, ইরাক কুক্ষিজাত করতে তখন বিশেষ কাঠ-খড় পোড়াবার কথা ওঠে না। 'দেখ্‌ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি দেখ্‌রে খেলা দেখ্‌ চালাকি।' গোষ্ঠমামা গাছের তলায় থাপ্‌ পেতেই ছিলেন। সিরিয়া ও ইরাকের জোড়া 'বুলবুল হাজারদস্তান' তীরের এক আঘাতেই পাকা আমের মতো ভূঁয়ে টুপ্‌ করে পড়লো আছড়ে। কায়রো এলো সেলিমের হাতে।

সেলিম কায়রোতে বেশীদিন ছিলেন না। কিন্তু তার মধ্যেই মক্কার সরীফ তাঁর কাছে এসে আনুগত্য স্বীকার করে যান। সেলিমকে পবিত্র নগরীর চাবি কয়েকটি উপহার দেওয়া হয়। তখন থেকে তিনি সমগ্র মুসলমান জাতির পুণ্য-তীর্থ দুটির—মক্কা এবং মদিনা—রক্ষক অর্থাৎ 'খাদেম অল-হরমাইন অল-সরীফাইন' উপাধি লাভ করেন ('যুগল ধর্ম-মন্দিরের সেবক')। উত্তরকালে ইসলামের খলিফার পৈতৃক সম্পত্তি বলে পরিগণিত হতে থাকে এই উপাধি।

"ঈশ্বর কোথায়?" প্রাচীন মিশরীয়দের এ প্রশ্ন করলে তারা সাফ উত্তর দিত, "ফারাওর তলোয়ারের ডগায়।" সার্লিমেন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, অষ্টম হেনরী, আলেক-জন্ডর তো হামেশাই তা দেখিয়ে গিয়েছেন। সেলিমের পদ-মর্য্যাদা এইবার ফুলে ফেঁপে উঠলো। তাঁর শত্রুপক্ষের মতে, তিনি নাকি শেষের দিকে ইস্তেক লাঠির জোরে খলিফার আসনটুকুও হজম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতানৈক্যের অন্ত নেই। যাঁরা কৌতূহলী, তাঁরা স্যার টমাস্ আর্নল্ডের (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত) The Caliphate (১৯২৪) নামক প্রামাণ্য পুস্তকখানি পড়তে পারেন।

সেলিম চলে গেলেন কনস্তান্তিনোপলে। তাঁর পূত পবিত্র নাম শ্রদ্ধাভরে মুসলমানরা খুত্বা পাঠকালে উচ্চারণ করতে লাগলো। সম্মিলিত আরব জাতি তাঁকে মেনে নিলো 'স্বামী' বলে।

তারপর?...

তারপর এলো 'সোলিমান দি ম্যাগ্নিফিসেন্ট্' বা 'জমকালো সোলিমানের' যুগ। সোলিমান শোধ করলেন পূর্বপুরুষের রক্তের ঋণ। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার উপ-কূল ও দাক্ষিণে ইয়ামান এবং আদন পর্যন্ত তির্যক্ রেখায় ঝল্‌সে গেলো অটোম্যান কৃপানের প্রাখর্য। নিজস্ব বলে আর কিছুই রইলো না আরবের।

তুরস্কের ইতিবৃত্তে উজ্জ্বলতম অধ্যায় সোলিমানের রাজত্বকাল। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে তার অবসান হোলে বিস্মিত এশিয়াবাসী দেখলে যে আলজিরিয়া থেকে পারস্যোপসাগর ও আলেপ্পো থেকে ভারত মহাম্বুধি পর্যন্ত তিনি জয় করে ফেলেছেন। ইসলামের কলিজা ও মগজ অটোম্যানদের হাতের মুঠোয়। মক্কা, মদিনা ও জেরুসালেম ছাড়াও আরব সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী দামাস্কাস ও প্রাচীন সংস্কৃতির 'নার্ভ-সেন্টার' বোগদাদ পরদেশী তুর্কের পাদুকা চুম্বন করছে।

কখনো নির্মম হস্তে বিদ্রোহ দমন করে কখনো ব্যাপক ভাবে নরহত্যা করে কায়ক্লেশে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি অটোম্যানরা এই দেশগুলির সীমান্তে তুর্কী প্রভুত্ব বজায় রাখে। দশাননের চিতার মতো দ্বন্দ্ব ছিলো উভয়ের মাঝে চিরবহ্নিমান। সময় সময় কোনও বিদ্রোহী সেনাপতি 'ঝোপ বুঝে কোপ' দিলে শিথিল, অরক্ষিত রাষ্ট্রের পত্তন-ভূমি কাঁপতে থাকতো থরথর করে। বালুকার দেশ এই আরব। মাটির তলা থেকে সে সুকৌশলে গ্রাস করে নেয় তিলে তিলে ফোঁটায় ফোঁটায় আততায়ীর 'খুন-ই-জান'। তার বুকে টিকে থাকতে হোলে তারই মতো কঠিন হতে হয়। নচেৎ মৃত্যু অবশ্য অবশ্য। এ ছাড়াও আছে বোঝার চাপানো শাকের আঁটি—অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাগৃধ্নুতা ও বেই-মানির প্রশ্ন। দুর্বল সুলতান প্রায়শঃই এঁদের হাতে ব্যাডমিন্টন কোর্টের ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় পানিচালিত হোতেন। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তিনশো বছরের মধ্যে ফকরুদ্দীন ও দাহের অল-উমরের মতো বীর যোদ্ধা অথবা আহমদ অল-জজ্জার ও কায়রোর মামেলুকদের মতো রক্ত-পিপাসু পশুপ্রকৃতি অধিক পদার্পণ করেন নি বটে কিন্তু ঐ আগে যা বলেছিঃ এঁরা হয় একক অর্থাৎ—ইংরাজীতে যাকে বলে 'সলিটারি'—নয় নম্বর ওয়ান স্বার্থদর্শী—অর্থাৎ 'সেলফ-সিকিং।' এঁরা এসেছিলেন আর ছায়া পুতুলের মতো কিছুক্ষণ সূর্যবাতির চৌদিক প্রদক্ষিণ করে নিজের নিজের দুন্দুভি বাজাতে বাজাতে উইংসের অপর দিক দিয়ে সসম্মানে প্রস্থান করেছিলেন। ঠিক মতো 'নটোরিয়াস' বা 'ফেমাস—বলতে গেলে—দুটোর কোনটাই হরদম পয়দা হয় না। আর একটা জিনিষ, আরব দুনিয়ার গলার চারপাশে সোলিমান ফাঁসির দাঁড় বেশ কায়েমী করেই লটকে রেখে গিয়েছিলেন। সেই বন্ধন এক ইঞ্চি আল্‌গা করতে পারে এমন আদমী তখন জমিনে পা ফেলে আদৌ হাঁটতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আপত্তিকারীর দল আরব জাতীয় আন্দোলন শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে সামান্য লম্ফ-ঝম্ফ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। রাত্রির তপস্যা ভাঙে মোহাম্মদ ইবন-আবদুল ওয়াহাবের আগমনে। তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে আবার চোখ মেলে চায় সনাতন আরব ধর্মের যুগ-প্রহরী। পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ আবদুল-ওয়াহাবের পুণ্যজীবন সেক্সপীয়রের ভাষায়, উপন্যাসের চেয়েও আশ্চর্য! উত্তরকালে তাঁরই আদর্শ আরব-সিংহ মেহমেদ আলীর প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। বলদর্পী ইউরোপ অনধিকার চর্চা না করলে মেহমেদ যে কনস্তান্তিনোপলের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন এ অবধারিত।

কবিতা

পথ চলে যায় দিল্লী

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

রৌদ্র প্রখর আজ।
রুক্ষ উষর ধূসর ধূলায় ওরা করে যায় কাজ।
ছিন্ন মলিন বাস
ঘাম ঝরে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়, ক্ষেতে খাটে ভূমিদাস।
পাষাণের প্রান্তর
হঠাৎ গাছের কাছে ঘেঁসে আসে খড়ে-ছাওয়া কুঁড়ে ঘর।
পায় যদি অবকাশ
হয়তো বা ভাবে কোন দিন নিয়ে চলে যায় কোন মাস।
নতুবা নতুন ফুলে
ঘাস থেকে তুলে পরাইয়া দেয় চকিতে সাথীর চুলে।
ইতিহাসে নাই নাম
ক'টী বছরের জীবন কিনেছে, দাম কপালের ঘাম।
এই সাধারণ মাঝ
হাড়ের পাহাড় মনে হয় যেন মর্মরমায়া তাজ।
যমুনায় নাই জল,
নিঙাড়ি চলে না নীল শাড়ী কেউ, তেতে উঠে বালুতল।
উট আলস্য ভরে
ছিন্নপক্ষ জটায়ুর মত রয়েছে উদাস পড়ে।

এলো ওর পিঠে চড়ে
রাজ্যলোলুপ দস্যুর দল কত রাত্রির ঝড়ে!
এখনও তাদের শব
কবরে কবরে রিমিঝিমি রাতে তোলে কুহকের রব।
ভাঙ্গা দুর্গের ধারে
কামনা তাদের মাথা কুটে মরে সাপ হয়ে বারে বারে।
পথ চলে যায় দিল্লী—
ঝাউ বীথিকায় তারকা তৃষায় কাঁদে কল্লোলে ঝিল্লী।
দূরের কাণায় কাণায়
নিভে নিভে আসে দীপালোকমালা, মিলায় সোনার শানাই।
দিল্লী অনেক দূর।
দুর্গম পথ মরুপর্বত ধ্বনিত অশ্বক্ষুর,
অসি নিশানের জেল্লা,
শত শহীদের শোণিত ধৌত উদ্ধত লাল কেল্লা।
দিল্লী অনেক দূর।
গম্বুজে তার পথ গেছে বুজে, স্বাক্ষর মৃত্যুর।
কখন নীরবে ঘাস
মাটীর উপর ঢেকে রেখে দিল বংশের ইতিহাস।

মনোলীনা

সনৎকুমার মিত্র

ফিস্ ফিস্ কথা একটি কি দুটি,—চোখে চোখ রাখা আর
আঙুলে আঙুলে ঘন জড়াজড়ি—হাত ধরাধরি করে,
গুঁড়ো গুঁড়ো বালি দুপায়ে গুঁড়িয়ে সময়ের স্রোত ধরে;
কত পথ পিছে হারিয়ে ফেলেছি হিসাব মেলে না তার।

স্বপ্নিল রাত নীল ওড়নাতে হাজার তারার ফুল
সাজিয়ে জেগেছে। আমরা জেগেছি ঢেউ গুনে নদী কূলে।
কুল-কুল গান দুই কূল ভেঙ্গে কত না উঠেছে দুলে।
কুয়াসায় ঘেরা প্রভাত বেলাতে কত না করেছি ভুল!

সবুজ ঘাসের সোনালী রোদের মিঠে পরিবেশে—সেই:
দোয়েলের ডাক, চিলের ভ্রমণ, তিতিতের কিচিমিচি,
শালিখের নাচ, প্রজাপতি পাখা খুঁটে নেয়া মিছিমিছি,
সাড়ীর আঁচলে মৃদু টান দেওয়া—আজ আর মনে নেই।

মনে আছে শুধু একটি সকালে—একটি নামের ঢেউ—
একটি পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে একা চুপে চুপে শোনা,
সেই নাম নিয়ে কতদিন ধরে স্বপ্নের জাল বোনা;
আর এক সকালে জোর করে ভাবা ছিল না আমার কেউ!

পাঁচ-সাতে আটান্ন

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শীতের রাত্রে আকাশে যদি হালকা কুয়াশা থাকে, আর তারই ওপারে থাকে চাঁদ, তাহ'লে আমার আর রক্ষা নেই। চোখে ঘুম কিছুতেই নামবে না।

সে রাত্রিও তাই হোল।

একটা গল্প লেখার প্রয়োজন। না লিখলে আর মান থাকে না। কিন্তু মাথায় কিছুই আসছে না। পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিয়ে খাটের শিয়রে বালিশটা উঁচু ক'রে লেপ মুড়ি দিয়ে অর্দ্ধশায়িত হ'লাম।

হায় হরি! কোথায় গল্প, কোথায় বা গল্পের প্লট! কে জানতো বাইরে আজ ফুটফুটে চাঁদিনী! জানালা খুলে দিতেই এক ফাঁলি জ্যোৎস্না বাইরের ন্যাড়া গাছের ডালগুলির তালে তালে আমার ঘরের মেঝেয় যেন নাচতে লাগলো।

কী গাছ ওটা,—ওই ন্যাড়াগাছটা? দিনে ওটা আমার নজরেই পড়ে না। আর রাত্রে, বিশেষ ক'রে চাঁদনী রাত্রে, নিয়ে আসে যত রাজ্যের উদ্ভট কল্পনা আর কৌতূহল।

পাশের খোলার বস্তিতে কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। ঠিক যেন একটা শাদা-কালো ডোরাকাটা সতরঞ্চি মুড়ি দিয়ে মৌজে নিদ্রা দিচ্ছে। এক কোণে ওটা কি? ছাইগাদা? তাই হবে। কিন্তু ওটা নড়ছে কেন? একটা অস্ফুট শব্দও পাওয়া যাচ্ছে যেন। সেই খেঁকী কুকুরটা না? অনেকগুলি বাচ্ছা নিয়ে বেচারা ওই ছাইগাদায় রাত কাটাচ্ছে,—শীতের কনকনে ঠাণ্ডা রাত! ভগবানের এত বড় পৃথিবীতে বেচারা ওর বেশি জায়গা আর পায়নি। বাচ্চাগুলোকে বুকের মধ্যে গরমে রেখেছে, আর নিজে, শীত যখন অসহ্য হচ্চে, তখন একটুখানি কুঁই কুঁই ক'রে ভগবান এবং মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে বস্তির ওদিকের ওই নড়বড়ে পোড়ো বাড়িটা। দিনে মনে হয়, একটা মরা হাড় বের করা বাড়ি। চাঁদিনী রাত্রেও যেন যৌবন ফিরে পায়। ওর আধখানায় পড়েছে আলো, আধখানায় ছায়া। ত্রিভঙ্গ কাঠের ভাঙা সিঁড়িটা ছায়ায় ঢেকে গেছে,—দেখা যাচ্ছে না। বড় রাস্তার ওপারে বড় বাড়িটার মাথায় উঁচু লোহার শিকে যে পতাকা ওড়ে রাত্রে সেইটেকে কে যেন এই বাড়িটার মাথাতেই বসিয়ে দিয়েছে। যেন ওর নবযৌবনের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

ওরই নিচেতলার একটা ঘরে একটা পাগলা থাকে। দিনে তার গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না। রাত্রে সমস্ত সহর যখন নিদ্রামগ্ন, তখন ও ওর সংকীর্ণ এক ফালি ঘরের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বেগে পায়চারী করে আর উচ্চ-কণ্ঠে অনর্গল নামতা পড়ে, নয় তো বক্তৃতা করে। মাঝে মাঝে কাঁদেও। সে কান্নায় সাড়া দেয় শুধু ছাইগাদার ওই খেঁকী কুকুরটা। সেও হঠাৎ ওই সুরে সুর মিলিয়ে করুণভাবে কাঁদতে আরম্ভ করে। শীতে, কিংবা ওরই মতো দুঃখী আরেকজনের বেদনায় সহানুভূতি জানাতে, কে জানে।

বাইরের ওই অদ্ভুত, ওই অত্যন্ত অদ্ভুত, যাদুতে ভরা চন্দ্রালোকের দিকে কতক্ষণ চেয়েছিলাম জানি না। অকস্মাৎ আমার মনে হোল, পৃথিবী যেন তার ভার হারিয়ে ফেলেছে। এই ন্যাড়া কি-জানি-কি গাছটা, ওই ঝোপের সারির মতো ঘুমন্ত বস্তিটা, তারও ওদিকের ওই আলো-ছায়ায় মোড়া বাড়িটা,—তারও, কিছুরই যেন কোনো ভার নেই, ওজন নেই। যেন আকাশের গায়ে টাঙানো অপূর্ব্ব একখানা ছবি। স্থির। কিন্তু একটা ভ্রান্ত গতি যেন ওর মধ্যে সংহত হয়ে আছে। সেই গতি যদি হঠাৎ কোন মন্ত্রবলে ছাড়া পেয়ে যায়, তাহ'লে

ও নক্ষত্রবেগে কোথায় মিলিয়ে যাবে কেউ দিশে পাবে না।

মনে হোল, এই খেঁকী কুকুরের আর্ত্তনাদ, ওই বদ্ধ পাগলের প্রলাপ, আমার ইন্দ্রিয়ের অগোচরে এই রাত্রে যেখানে চলছে নবীন কোন দম্পতির বিহ্বল গুঞ্জরণ, বিরাট কোনো পণ্ডিতের নীরন্ধ্র গবেষণা,—সব যেন এই প্রচণ্ড গতিভরা চন্দ্রালোকের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। সব যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ পিছনে কি যেন একটা খস্ খস্ শব্দ হোল। শুকনো পাতা উড়ে এলো কি? পিছনে চেয়ে দেখি…

অদ্ভুত! ওদিকের দেওয়ালে, যেখানে জ্যোৎস্নার দীর্ঘ একটা রেখা পড়েছে, সেইখানে শীর্ণ, দীর্ঘ একটা নারীমূর্ত্তি! আপাদমস্তক সাচ্চা রুপালি চুর্ণ চুমকি-দেওয়া ফুটফুটে শাদা একখানা শাড়িতে ঢাকা।

—কে?—আচমকাই আমার মুখ থেকে বার হোল।

মূর্ত্তি অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলে। সে হাসিতে আমার সমস্ত শরীর কেমন ঝিম ঝিম ক'রে উঠলো।

বললে, অর্থাৎ আমার নামটা চাও? তোমাদের কাছে নামটাই তো সব চেয়ে বড় পরিচয় কি না। কিন্তু নাম তো আমার একটা নয়। কোন্‌টা বলি বল? যদি বলি আমি বস্রাওনের নবাবপুত্রী। কিংবা ধরো দুর্গেশ-নন্দিনী। কিংবা সব চেয়ে পরের নামটা: যূথিকা দে। তোমার কোনটাতে সুবিধা বল।

বলার কথা কিছুই আমার ছিল না। ঠোঁট বন্ধ হয়ে গেছে। চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

জিগ্যেস করলে, কি করছিলে?

কোনমতে বললাম, একটা গল্পের প্লট ভাবছিলাম।

শুনে মূর্ত্তি যেন খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। বললে, গল্পের প্লট? আমার কাছে অনেক গল্পের প্লট আছে। কি রকম প্লট চাও বল। প্রেমের?

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, না, না। প্রেমের নয়। এ বয়সে প্রেমের গল্পে বিশেষ রুচি নেই। অন্য গল্প বলুন।

মূর্ত্তি হো হো ক'রে এমন হেসে উঠলো যে, সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো। হাসি থামলে বললে, যখন আমি বস্রাওনের নবাবপুত্রী তখন আমার স্বামীকে হত্যা ক'রে প্রণয়ীর সঙ্গে অন্ধকার বর্ষণ পীড়িত বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম। ও অঞ্চলের গাথায় সে কাহিনী এখনও মরেনি। যখন দুর্গেশনন্দিনী তখন নর্ত্তকী পরিবেষ্টিত মণ্ডপ স্বামীর প্রতীক্ষায় সারারাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়ে বাতায়নে চেয়ে থাকতাম। আর যখন যূথিকা,

মূর্ত্তি থেমে কি যেন ভাবতে লাগলো।

আমি জিগ্যেস করলাম, তখন কি করলেন?

অন্যমনস্কভাবে মূর্ত্তি উত্তর দিলে, তখন? বিয়ে করার সময়ই পেলুম না।

—সময়ের এমন অভাব ঘটলো কেন?

—কাজের চাপে। বাবা মারা গেলেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রেখে। তখন আমি সবে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। সংসারের সব ভার পড়লো, আমি বড় মেয়ে, আমারই ওপর। তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার পরে—

—পরে?

—আর সময়ও রইলো না, রুচিও রইলো না।—মূর্ত্তি খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো, যেন খুব একটা মজা করেছে।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—শুনছ?

মূর্ত্তি যেন তার নির্ব্বাক ভাষা দিয়ে আমাকে একটা নাড়া দিলে। চমকে তার দিকে চাইলাম।

বললে, প্রেমের গল্প আর লিখো না। কেন জান?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি না।

—প্রেম নিয়ে আর গল্প হয় না। তার উপকরণের অভাব ঘটেছে।

—উপকরণগুলো কি?

—যেমন ধরো চাঁদের আলো, কোকিলের গান, মলয় হাওয়া।

—নিতান্ত সেকেলে ব'লে আমরাই ওগুলো বিদায় দিয়েছি।

—হ্যাঁ। তাই প্রেমের গল্প আজ আর জমে না।

—কিন্তু তার বদলে সিনেমা আছে, কফি হাউস।

—তা আছে। কিন্তু ওগুলো গদ্য। কবিতা নইলে মানুষ পাগল হয় না। পাগল না হ'লে প্রেমের গল্প জমে?

জমে কি না ভাবতে লাগলাম।

মূর্ত্তি বললে, সেকালে আমরা যখন বক্রাওনের নবাব-পুত্রী তখন প্রেম ক'রেছি উদ্দাম। পথে যা কিছু বাধা পড়েছে রক্তের স্রোতে দিয়েছি ভাসিয়ে। ঝড়ের মতো দুর্ব্বার সে প্রেম। দুর্গেশনন্দিনীরাও প্রেম করেছেন, ঘোমটা-ঢাকা যুঁই ফুলের মতো মিঠে মিঠে প্রেম,—তুলসীতলার প্রদীপশিখার মতো স্নিগ্ধ। আর একালের যুথিকারা।

—যুথিকারা?

—চাকরী করেন টেলিফোন-অফিসে, নয়তো মেয়ে-ইস্কুলে মাষ্টারী।

—তাতে কি হোল?

—আর কি হোল জানি না, কিন্তু প্রেমের গল্প জমলো না।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় জানলাটা দুম ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার। কার যেন পায়ের শব্দও পেলাম।

—যাবেন না, যাবেন না। আমার আরও কথা আছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে এই শীতের রাত্রেও।

কেউ তো ঘরে নেই!

আলো জ্বাললাম। না, কেউ নেই ঘরে। দরজা যেমন ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, তেমনি আছে। জানালাটা খুলে ফেললাম।

বাইরে চাঁদের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে।

খেঁকী কুকুরটা কুঁই কুঁই করছে কি না বোঝা গেল না। হয়তো বাচ্চাগুলিকে তপ্ত বুকের মধ্যে নিয়ে ক্লান্তিতে একটুখানি ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

কিন্তু পাগলটা এতটুকু দমে নি। সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে: তিন সাত্তে বত্রিশ, পাঁচ সত্তে আটান্ন···

★

সিম্ফনি

শ্রীঅধীর মল্লিক

স্বস্তির নিশ্বাসে ভরা শান্তির পেয়ালা—
অশথের ছায়াতলে মিঠে মিঠে সুরের বেহালা।
অরণ্যের ঘনপত্রে বাতাহত
মর্ম্মরিত হাহাকার নয়।
পাতায় পাতায় আর বর্ণে বর্ণে
উচ্ছল ফেনিল দোলা নয়।
কোটি কোটি বুদ্বুদের প্রক্ষোভ ও নয়।

কেবল······ ······
স্থৈর্য্যের ক্লান্তিতে পুষ্ট—
হরিনাম সংকীর্ত্তন পালা।

সমুদ্র গর্জ্জন তোলো—
সুস্থিরের শান্তিকে ভোলো।
সমুদ্রের উদ্বেলতা দাও,
উর্ম্মিঘাতে নেচে নেচে আলোর কণিকা—
অসংখ্য অসংখ্য শিখা,
উজ্জ্বল হৃদয় দিয়ে করি অনুভব—
একক সূর্য্যের বৈভব।

আর নয় বর্ণহীন, গন্ধহীন শান্তির আশ্বাস।
সপ্তকের প্রত্যেকের সুরে—
সঙ্গীতের ঐকতান রচনার গভীর বিশ্বাস।

কণ্টকাপল্লী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর সমস্যার কণ্টকে ঘেরা এই ক্ষুদ্র পল্লীটির একধারে তার জীর্ণ তালপাতাছাওয়া ঘরটিতে ব'সে ধর্ম্মরাজু একমনে তার কাজ ক'রে যেত। গ্রামের কারুরই কোনদিন আগ্রহ ছিল না তার কাজের ওপর, শুধু মাঝে মাঝে দেখা যেত, যখন সে সকালে অথবা বিকেলে তার দাওয়াটিতে এসে বসেছে তার কাজ নিয়ে, তাকে ঘিরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়াবিষ্ট কতগুলি নিরাবরণ মানবক ও মানবিকার দল।

প্রভাত পার হ'য়ে বেলা হয় ত বেড়ে যাচ্ছে, ক্রমশ শিশুর দল তাদের মা-বাবার তাড়া খেয়ে চ'লে গেছে তাকে ছেড়ে, ধর্ম্মরাজু কাজ করতে করতে মুখ তুলে চায়। তার ঘরের সামনেই ছোট ছোট আল-বাঁধানো ক্ষেত, উঁচু-নীচু বস্তুতঃ এ গ্রামটাই চাষীদের গ্রাম, যে যেখানে একটুও জমি পেয়েছে, লাঙল চালাতে ছাড়ে নি। ক্ষেত্র প্রায় প্রস্তুত—আকাশের দেবতার কৃপাবর্ষণ হ'লেই বীজ রোপণ করা যাবে।

সামনের ক্ষেতটিতেই এখন কাজ করছিল মেয়েটি। একেবারে একা। মাঠের পারে কতগুলি গাছের জটলা, তারপরে পাহাড়ের শ্রেণী, দিগন্ত। গাছের সবুজ আর আকাশের নীলের পটভূমিকায় অপরূপ দেখাচ্ছিল কর্ম্মরতা মেয়েটিকে। হলুদ শাড়ীটা গায়ের হলুদবর্ণের সঙ্গে যেন মিশিয়ে রয়েছে। এদেশের শ্রমিক-মেয়েদের মত শাড়ীটা পীবর উরুদেশের ওপর পর্য্যন্ত তুলে মালকোঁচার ভঙ্গীতে আঁট ক'রে পরা। দুটি পায়ে বড়ো দুটি রূপোর বাঁকা মল, তার অনেক ওপরে পায়ের পিছনদিককার সুডৌল মাংসপেশীতে দুটি সবুজ লতাপাতার উল্কি আঁকা। বিস্তৃত নিতম্বপ্রদেশের ওপরে ক্ষীণ কটি। কটি ও নাভি-দেশের কিছুটা অংশ নিরাবরণ রেখে গায়ে একটা লাল-লাল-ফুলতোলা ছাপার ব্লাউজ। শাড়ীর আঁচল সমুন্নত বক্ষদেশ ঢেকে এসে পিছন দিয়ে কোমরে শক্ত ক'রে জড়ানো। ঘন কালো চুলের মধ্যে গোঁজা লাল কৃষ্ণচূড়ার একটা গুচ্ছ আলো হ'য়ে আছে, দীর্ঘ সর্পিল বেণীটা খেলা করছে দেহের ভঙ্গীমার তালে তালে—কখনো ঝুলে পড়ছে পাশ দিয়ে কখনো পীন জঘনপ্রদেশে এসে নিচ্ছে আশ্রয়।

কী একটা ক্ষেতসংক্রান্ত কাজ করছে মেয়েটি, নীচু হ'য়ে নিড়ুনী দিয়ে কেটে কেটে তুলছে আলগুলির কাছ থেকে শাকপাতার দল অথবা ঘাস। এক-একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে নয়ত অপাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে অদূরের পায়ে-চলা পথটির ওপর, তারপরে কেমন একটা খুশী হওয়ার ভঙ্গীতে একটা হাত প্রসারিত করে একটু ঘুরে চঞ্চল পায়ে স'রে যাচ্ছে একটু দূরে। চেয়ে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারে না ধর্ম্মরাজু, মেয়েটিকে আরও কতবার সে দেখেছে, কিন্তু এমন চোখ নিয়ে এমন ভঙ্গীতে কোনদিন দেখেনি ত সে ওকে। মনে হচ্ছে, এক দিব্যশ্রী পীবরতনু দেবদাসী নৃত্যছন্দে আরতি করছে এক দেবমন্দিরে। চারিদিকে কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু দেবতা আর ও। বাদ্য নেই প্রদীপ নেই, পায়ের নূপুরে নূপুরে ঝংকৃত হয়ে উঠছে অপরূপ সঙ্গীত, অবারিত আকাশের নীলে নীলে মিশে আশীর্ব্বাদের মতো এসে পড়ছে সূর্যদেবের করুণা। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো নিজেকে মনে হলো ধর্ম্মরাজুর। কী একটা দুরন্ত আবেগে সে যেন এখুনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে। একী অপরূপ আনন্দ! এ অনুভূতি ত কোনদিন আসেনি তার মনে।

*   *   *

দলে দলে লোক ছুটেছে সেদিন দূরে ঐ পাহাড়ের দিকে, ঐ জঙ্গলে। গাঁয়ের সর্দ্দার বৃদ্ধ ভেঙ্কটেশ্বর মাথায় পাগড়ী হাতে লাঠি নিয়ে স্বয়ং এগিয়ে গেছে। আগে সহর থেকে বহু গণ্যমান্য লোক এসেছেন, এসেছে ছাত্র আর ছাত্রীর দল। পাহাড়তলীর জঙ্গলে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু পুরানো যুগের এক দেবমন্দির।

গাঁয়ের লোক সবাই ছুটেছে কৌতূহলী হয়ে। এ গাঁয়ের লোক কেন, আশেপাশের বহু গ্রামের লোক। কেউ গেছে কাজের চেষ্টায়, জনমজুরীর কাজ যদি কিছু মেলে। কেউ গেছে নতুন কিছু দেখবার আশায়। একঘেয়ে গ্রাম্য কৃষক জীবনে অসামান্য বৈচিত্র্য। মাঠের কাজ মাঠেই রয়েছে পড়ে, লোক দৌড়ে গেছে আগ্রহে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ সবাই। একে অপরকে ডেকে নিয়ে গেছে, আয়, আয়, দেখবি আয়, দেবমন্দির।

ধর্ম্মরাজুকে ডাকেনি কেউ, চুপচাপ সে ব'সে আছে তার দাওয়ায়। তার ঘরের সামনের পথটি দিয়ে কত লোক ছুটে গেল, শুধু সে-ই রইল পড়ে। কেমন একটা গুমরে-মরা অব্যক্ত অভিমান বুকে নিয়ে স্তব্ধ ব'সে রইল সে। সব কাজের জিনিষ পড়ে আছে তার সামনে, কাজ করাও হচ্ছে না। বেলা বাড়ছে, একটা জলভরা কালো কালো মেঘের টুকরো কোথা থেকে হঠাৎ ভেসে এলো, আবার চলে গেল হাওয়ায় উড়ে। সামনের নারকেল গাছটার পাশ দিয়ে দুটি টিয়ে পাখী ডাকতে ডাকতে চলে গেল দূরে।

ধর্ম্মরাজুর কেউ নেই। বুড়ী মাটা ছিল ঘর আগলে, ঘুঁটে বেচে, মাঠ থেকে ঘাস কেটে এনে সেই ঘাস বেচে কোন রকমে দিন-গুজরাণ ক'রত। ধর্ম্মরাজু চলে গিয়েছিল কাজ খুঁজতে দেশ-দেশান্তরে, সে সব কাজে মন দিতে পারে নি, ফিরে এসেছিল মায়ের কাছে। বছর দুই হ'লো মা-ও চলে গেছে। একবেলা সে খায়, আরেক বেলা খায় না, এমনি অবস্থা। ঘর জীর্ণ, এমন হয়েছে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়তে পারে। গ্রামের প্রধান ভেঙ্কটেশ্বর তাকে এসে ধমকেছে শাসিয়েছে, বলেছে এসব ছাইভস্ম কুঁড়ের কাজ না ক'রে জনমজুরী খাটতে, পরের ক্ষেতে আগে লাঙল চালাতে। সে রাজী হয় নি। ভেঙ্কটেশ্বর তার মতো অকেজো লোককে গ্রাম থেকে বার করে দেবে, এমন কথাও এই সেদিন তাকে বলে গেছে। মাথা নীচু ক'রে সব শুনে গেছে ধর্ম্মরাজু, কিছু বলে নি। সত্যিই সে ছন্নছাড়া, সত্যিই সে অদ্ভুত, দলছাড়া গোত্রছাড়া সম্পূর্ণ অকেজো লোক।

হঠাৎ একসময় তার উঠোনে কার যেন ছায়া পড়ে, চমকে ওঠে ধর্ম্মরাজু, মুখ তুলে তাকায়। হলদে-শাড়ী-পরা সেই মেয়েটী। যেন পুণ্যময় মন্দির চত্বরে অতর্কিতে আবির্ভাব হ'লো দেব-শরীরিণী দেবদাসীর—নৃত্যময় আরম্ভির হবে শুরু, তাকে যেন এইবার তালে ছন্দে মৃদঙ্গ বাজাবার পালায় মন দিতে হবে। স্বপ্নিল হ'য়ে ওঠে ওর দুটি চোখ।

'ধর্ম্মরাজু ?'

তালভঙ্গ হওয়ায় যেন ভ্রূ-ভঙ্গী ক'রে ওঠে দেবদাসী মৃদঙ্গশিল্পীর প্রতি। অপরাধভারে নুয়ে পড়ে ধর্ম্মরাজু সাড়া দেয়, 'কী' ?

মেয়েটী এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আরো এগিয়ে আসে দু'পা, বলে,—'তুমি গেলে না ?'

'কোথায় ?'

'কেন, মন্দির দেখতে ? সবাই গেছে। কতো লোক।'

ধর্ম্মরাজু ওর চোখের দিকে তাকায়, বলে,—সবাই যা করে আমাকে তা' ক'রতে নেই, জানো না ?'

'কেন ?'

একটু হেসে ওঠে ধর্ম্মরাজু, বলে—'নিয়ম। আমি যে লক্ষীছাড়া।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটী বলে,—'আনো না কেন লক্ষী ঘরে ?'

'আসবে না। বহুদিন হ'লো চলে গেছে পরের ঘরে।'

'দিলে কেন যেতে ?'

ধর্ম্মরাজু বলে,—'বাঁধব কী কারে ? ক্ষমতা কই ?'

চুপ করে থাকে মেয়েটী, অনেকবার তাকায় পথের দিকে, তারপরে একসময় ওর দাওয়ায় উঠে এসে ওর সামনে বসে পড়ে। এবার প্রশ্ন করে ধর্ম্মরাজু,—'তুমি যে গেলে না ?'

'যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে ফিরে এলাম।'

'তোমার বর ?'

মুখ তুলল মেয়েটি, বলল,—'আমার বরের কথা তোমার মুখে আনতে নেই না কি ? শুধু বর-বর করছ যে ?'

রাজু হাসল, বলল,—'রাগ ক'রো না। কতদিন পরে তুমি আমার দাওয়ায় এসে বসেছ। ভারী আনন্দ হচ্ছে।'

মেয়েটী বলল,—'সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকি। তোমাকে-আমাকে নিয়ে যদি কোনো কথা ওঠে। ক্ষেতে কাজ করতে আসি, কতবার ও এসে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে দেখে-দেখে যায়, কোনো দোষ করে ফেললাম বুঝি?'

'খুব সন্দেহ করে বুঝি?'

'খু-ব। বুড়ো-বরের তরুণী বৌ যে!' বলেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

রাজু মৃদুকণ্ঠে বলে,—'শুধু তরুণী নয়, সুন্দরীও।'

'যাও। ওসব বোলো না।'

'না। বলি না কখনো। মনেমনেই রেখেছি।'

'বড়ো অন্যায়। পরের বউ না আমি?'

একটু থেমে থেকে তারপরে হাতের কাজটা তুলে নেয় হাতে ধর্ম্মরাজু, বলে,—'কে জানে কার বউ!'

মেয়েটী তাকায় ওর হাতের দিকে, বলে,—'ওটা কী? নতুন-নতুন লাগছে যে?'

রাজু হেসে বলে,—'এটা? রঙ না লাগালে কী বুঝবে?'

'বেশ ত বলো না তুমি?'

'রঙ্ লাগাই, তখন দেখো। এই ওর চুল, কালো বেণী, খোঁপায় লালফুল। এই ওর হলদে শাড়ী। নাচের ভঙ্গীতে......'

খিলখিল ক'রে মেয়েটী হেসে উঠল, তারপর একসময় হাসি থামিয়ে বলল,—'এই সবই হচ্ছে বুঝি আজকাল? কিনবে কে এসব? ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি ছেড়ে নাচিয়ে মেয়ের পুতুল গড়ছ, বেশ যা হোক।'

'নাচিয়ে-মেয়েই আমি গড়ব এবার থেকে, আর কিছু না।'

মেয়েটী উঠে দাঁড়ালো, বলল,—'ভয়ানক ঠকবে, কেউ কিনবে না। খাবে কী?'

'জানি না।'

প্রায় ধমকেই উঠল মেয়েটী,—'জানো না? কী সব তুমি করছ রাজু, আমি বুঝি না। না খেয়ে খেয়ে দেহটা ত গেছে,—মরে যাবে যে? পুতুল-গড়া কী একটা কাজ? ফেলে দাও ও-সব, চাষায় ছেলে চাষ করো,—বাঁচো।'

রাজু শুধু বলে,—'তুমিও একথা বলবে?'

'হ্যাঁ। এসব ছেড়ে দাও!'

রাজু তবু ছাড়ে না। তার নতুন ধরণের পুতুলগুলি ঝাঁকায় সাজিয়ে হাটে-হাটে নিয়ে যায়,—দরিদ্র গ্রামগুলিতে পুতুল কেনার ক্রেতা সত্যই কম। দু'একজন ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তির খোঁজ করে, কিন্তু নাচিয়ে মেয়েকে কেউই ছোঁয় না।

তবু ঘরে ফিরে এসে না খেয়ে দেয়ে ধর্ম্মরাজু নাচিয়ে মেয়েই গড়ে যেতে থাকে পাগলের মতো। নানান্ আকার। ঘরের ঘটী বাটী বিক্রী হ'য়ে যায়। তবু খেয়াল ছাড়ে না অবুঝ শিল্পী,—নাচিয়ে-মেয়ে গ'ড়ে চলে। ক্রমে রঙ্ ফুরিয়ে যায়। রঙ কেনার পয়সা থাকে না—তৈরী হয় রঙ্ না-করা মাটির মূর্ত্তি শুধু। ক্ষুধা-অবসন্ন দুর্ব্বল দেহে চোখে আঁধার দেখে, হাত অবশ হ'য়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে এসে বসে ঘরের দাওয়াটিতে অসীম প্রত্যাশায়, কিন্তু চোখের তৃষ্ণা মেটে না,. শূন্য ক্ষেত নির্ম্মম শূন্যতায় তেমনি প'ড়ে থাকে। শুধু টিয়ারা ডেকে যায়, জলভরা মেঘ ভেসে এসে আবার সরে যায়,—বর্ষণ আর হয় না।

ভেঙ্কটেশ্বরের সঙ্গে ছোট দলটি গ্রামের ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে অনেকদূর পর্য্যন্ত চলে আসে। চশমা চোখে প্রবীণ অধ্যাপক, দুটি তরুণ ছাত্র, ছাত্রীটিও সাদা শাড়ী-পরা তরুণী মেয়ে। সবশুদ্ধ চারজন। উৎসাহী মধ্যবিত্ত-ভাবপ্রবণ, প্রেরণা-উজ্জ্বল, হয়ত বা একটু স্বপ্নিলও।

ভেঙ্কটেশ্বর হিসাবী মানুষ। এদের সঙ্গে দিব্যি খাতির জমিয়েছে। মন্দিরের ব্যাপারে তার গ্রামের লোকেরাই কাজ পেয়েছে বেশী। পুরাণো মন্দিরের খনন-কার্য্য সরকারী লোকেরা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে। কিন্তু এই বাবুরা 'নতুন মন্দির' 'নতুন মন্দির' ক'রে কী সব বলাবলি করছে। নতুন মন্দির তুলবে নাকি ঐ পুরাণো ভিটেটার পাশে? তাহলে ত অনেক কাজ হবে,—রাজমিস্ত্রী ছাড়া সাধারণ মজুরই দরকার হবে অনেক। জমিদার নাকি অনেকটা জমি বাবুদের দিয়ে দিয়েছে,—এখন শুধু মন্দিরটা তুলতে পারলেই হয়।

'স্যর !,—ছাত্রীটি বলল,—'আমারও মন কিন্তু সায় দিচ্ছে না। মানুষ খেতে পায় না; চাঁদা তুলে বরং তাদের খাওয়ান, মন্দির তোলার চাইতে সে অনেক ভালো কাজ হবে।'

অধ্যাপক হাসলেন, বললেন,—'তুমি ঠিক বুঝছ না সাবিত্রী। করুণা বা দয়া করে এভাবে অন্নদান করলে ওদের সমস্যার কোনো সমাধানই তুমি করতে পারবে না। ওদের কাজ ওদেরই করতে দাও,—আমাদের প্রয়োজন ওদের শুধু সচেতন ক'রে দেওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে দেওয়া।'

তরুণদ্বয়ের একজন কথা বলল,—'মন্দির তুলে সেটা সম্ভব হবে আপনি বলছেন ?

'হ্যাঁ। মন্দিরের দার্শনিক ব্যাখ্যা এখানে নিরর্থক। আমি সামাজিক ব্যাখ্যাটাই দেবো। মন্দির হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান,—ইন্‌ষ্টিটিউসন। দেবতা এখানে পবিত্রতার সাক্ষী মাত্র। দিনে মন্দির হ'চ্ছে বিদ্যালয়, এখানে পঠন-পাঠন হবে ; সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত। সভা সামাজিক সম্মেলন এইভাবে বিদ্যার মধ্য দিয়ে, নৃত্য-গীত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, সভাসমিতি—সামাজিকতার মধ্য দিয়ে গ্রামগুলির ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হবে, সংগে শক্তি বাড়বে। আরও একটু অগ্রসর হ'য়ে বলা যাক,—ক্রমে একদিন এই মন্দিরে হবে কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্‌,—কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক কিছু।'

অপর তরুণটি হেসে বলল,—'আপনি বড্ড বেশী স্বপ্ন দেখছেন স্যর।'

'স্বপ্নই দেখছি'—অধ্যাপক বললেন,—'আমার টাকা থাকলে আমার স্বপ্ন আমি বাস্তবে পরিণত করতাম।'

'টাকার জন্য আপনি ভাবছেন কেন ? টাকা দেবে পাবলিক্‌। চাঁদা তুলতে হবে।'

'দেখা যাক।'

এই সময় ছাত্রীটির চোখ পড়ল অদূরের একটা জীর্ণ কুটীরের দিকে। অস্ফুটকণ্ঠে সে একটু আর্তনাদ তুলল বলা যায়। তারপর ছুটে গেল। হাতের মুঠোয় একটা অর্দ্ধ সমাপ্ত মাটির পুতুল, একটি জীর্ণ কালো লোক ঘরের দাওয়ায় ওপর পড়ে আছে মুখ থুবড়ে।

'জল-জল !' ব'লে চেঁচিয়ে দাওয়ায় ব'সে তাড়াতাড়ি লোকটির মাথাটা তুলে নিলো কোলের ওপর। তরুণদ্বয় জলের জন্য বাধিয়ে দিল ছুটোছুটি,—অধ্যাপক সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। শুধু ভেঙ্কটেশ্বর বুঝে উঠতে পারল না, এতলোক থাকতে ঐ কুঁড়ে হতভাগাটার জন্য এঁদের এতো মাথাব্যথা কেন। ভারী তো একটু কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে ছোঁড়াটা, তার আবার এতো ?

তরুণদের একজন বললে,—'লাক্ষ্ণি! দেখছেন স্যর।'

'দেখেছি। এরিয়্যাল আর্টিষ্ট।'

'তোমার নাম কী ?

দুধের গেলাসটা মুখ থেকে নামিয়ে আর্টিষ্ট বলল,—'ধর্ম্মরাজু।'

'মূর্ত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য আছে কী সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ।'

চারজনের হাতে হাতে ফিরতে লাগল ছড়-না-বরা মাটির মূর্ত্তিগুলি। সবকটিই নারীমূর্ত্তি। নাচের ভঙ্গী। সাবিত্রী বলল,—'নাচের সংগে হাতের মুদ্রাগুলিও পারফেক্ট। এই নগণ্য চাষীদের গ্রামে এভাবে এদের মধ্য থেকেই যে একজন শিল্পী আবিস্কৃত হবে, তা কে ভেবেছিল ? ধর্ম্মরাজু নাচের মুদ্রা শিখল কোথা থেকে ?'

ধর্ম্মরাজু 'মুদ্রা' কথাটার অর্থ ভালো বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল মেয়েটার দিকে, তারপরে বলল,—'আমি কিছুই শিখিনি। যা কিছু ক'রেছি সব মন্দির দেখে।'

একটি তরুণ বলল,—'সত্যিকার শিল্পী। যাকে বলে Inspired Artist !'

অধ্যাপক একটা মূর্ত্তি বিশদভাবে লক্ষ্য করছিলেন, সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'অরে একটা জিনিষ দেখেছ ? কী পারফেক্ট অ্যানাটমির জ্ঞান।'

শরীরতত্ত্বের ইঙ্গিতে মেয়েটির মুখে আবির ছড়িয়ে পড়ল যেন। মুখ নামিয়ে শুধু বলল,—হ্যাঁ।

অপর তরুণটি বলল,—'এই অবহেলিত গ্রামের শিল্পীদের বাঁচানোর জন্যও মন্দির দরকার, মন্দিরের শিল্পকার্য্যের দরকার,—নয় কী স্যর ?'

অধ্যাপক বললেন,—'সবচেয়ে বড়ো দরকার শিল্পবোধের। মানুষের মধ্যে একটা স্বতস্ফূর্ত্ত শিল্পবোধ আছে,

তার অনুশীলন দরকার। জীবনবোধের সংগে শিল্পবোধ এক না হ'লে জীবন সুন্দর হয় না।'

সাবিত্রী বলল,—'স্যর, একটা suggestion আছে। আমাদের মন্দিরের শিল্পী করা হোক এই ধর্ম্মরাজুকে। ও খোদাইয়ের কাজ জানে না। কিন্তু ওর মূর্ত্তি ও পুড়িয়ে পাকা করে দিতে পারবে।' অধ্যাপক বললেন,—'সে কথা ভাবছি। আগামী সভায় সভাপতির কাছে এই প্রস্তাব পেশ ক'রব আমরা, কী বলো?'

অদম্য উল্লাসে ঝলোমল করে উঠল সাবিত্রী; বলল,—'শুনলে ত ধর্ম্মরাজু, তুমি হবে আমাদের মন্দিরের শিল্পী। মূর্ত্তি গড়ে দেবে আমাদের মন্দিরের।'

'আমি!'—বিস্ময়ে-আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়ে ধর্ম্মরাজু।

সাবিত্রী লীলায়িত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকায়, বলে,—'হ্যাঁ, তুমি।'

* * *

কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত নেশার মধ্য দিয়ে কাটে। তাকে কাজ করতে হবে মন্দিরের। মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে সে সাজিয়ে দেবে তার নিজের হাতে গড়া মূর্ত্তি। আনন্দের আবেগে যেন চুরমার হ'য়ে যাবে ধর্ম্মরাজু। গ্রামের লোক এতদিনে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে তার কাজের প্রতি। অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকায়। তাদের এই অকর্ম্মণ্য ছেলেটা শেষে কিনা কাজ করবে, মন্দিরের বাবুরা এসে ব'সেছে ওরই ঘরের দাওয়ায়,...কী জানি কী আছে ছেলেটার মধ্যে!

এই গ্রামে কেন, আশেপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে তার কথা। গ্রামান্তরের মাতব্বরেরা জিজ্ঞাসা করে ভেঙ্কটেশ্বরকে,—'তোমাদের ধর্ম্মরাজু নাকি...।'

ভেঙ্কটেশ্বরের তখনি নতুন ক'রে মনে পড়ে ধর্ম্মরাজু তার গাঁয়েরই ছেলে, তার গৌরবে তার গ্রামেরই গৌরব, বলে,—'হ্যাঁ আমাদেরি ধর্ম্মরাজু মন্দিরে কাজ করবে।'

কথাটা বলার সংগে-সংগে মনের মধ্যে একটা স্নেহাপ্লুত আবেগ অনুভব করে ভেঙ্কটেশ্বর,—ছেলেটার সত্যিই কৃতিত্ব আছে। বাবুদের টেনে এনেছে ত ঘরের দাওয়ায়, না খেয়ে দেয়ে শুধু পুতুল গড়া!

এক সময় গ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ায় ওর ঘরের সামনে, হেঁকে বলে,—'রাজু আছিস?'

দুটি হাতে কাদা শুকিয়ে আছে, অনাহারে শীর্ণ কৃশ ছেলেটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে, বলে,—'কে? কাকা?'

'হ্যাঁ। মূর্ত্তি ত গড়ছিস, বাবুরা হয়ত পরে টাকাও দেবে, কিন্তু এখন খাবি কী, ভেবেছিস?' হাসিমুখে ছেলেটা বলে,—'কাল হাটে অনেক মূর্ত্তি বিক্রী হ'য়েছে কাকা। একটাকা বারো আনা রোজকার হয়েছে কাল। তা—এ দিয়ে আমি দিন কয়েক বেশ চালিয়ে নেবো।'

উজ্জ্বল মুখখানার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ভেঙ্কটেশ্বর,—কী অদ্ভুত যে ছেলেটা। দিনের পর দিন উপোস দেয়, তবু হাসি নেভে না মুখে, তবু কামাই নেই পুতুল-গড়ার।

রাজু বলে,—'কাকা? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'কী'?

'সেই বাবুরা সেই দিদিমণি ওরা আর এসেছিল?'

ভেঙ্কটেশ্বর বলে,—'এসেছিল ঐ জঙ্গলে। মন্দির তৈরীর কাজ শুরু হ'য়েছে যে।'

'শুরু হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বাবুরা বলছিল বিরাট মন্দির হবে, অনেক টাকা লাগবে।'

'আমার কথা বলে নি কিছু?'

'কী আর বলবে? তুই মূর্ত্তি গড়া আরম্ভ করে দে।'

* * *

বহুদিন পরে বর্ষা নেমেছে। প্রবল বর্ষণ। আকাশ কালোমেঘে ঢাকা। তবু সমস্ত কৃষিপল্লীতে যেন আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে। মাথায় টোকা দিয়ে মেয়ে-পুরুষ সবাই নেমে পড়েছে ক্ষেতে। শালিক পাখীরা ভিজছে এসে জলে। বনফুল আর ভিজে মাটির গন্ধ মিলে একটা চমৎকার সৌরভের সৃষ্টি ক'রেছে। গাছগুলি যেন আনন্দ-স্নানে মগ্ন হ'য়ে গেছে। চঞ্চল হ'য়ে উঠল ধর্ম্মরাজুর আঙুল,—একটা বড় মূর্ত্তিতে এবার হাত দিয়েছে সে। একেবারে অন্তঃপুরের মূর্ত্তি। দেবদাসী নয়। এবং সেই জন্যই হয়ত মন্দিরে এটা ওঁরা বসাতে দেবেন না। শাড়ীটা

আঁটো ক'রে পরা, মাথায় জলেভরা কলসীর ওপরে একটা হাত ওঠানো, আরেকটি হাত পায়ের কাছে শাড়ীর একটা অংশ সামান্ত তুলে ধ'রেছে,—মলপরা বাম চরণখানি পথে পড়বার জন্ত উন্মুখ।

মাথা থেকে চোকাটা নামিয়ে একেবারে হুড়মুড় ক'রে দাওয়ার ওপরে এসে পড়ল মেয়েটি, ভিজে শাড়ীর জল নিংড়ে প'ড়ে দাওয়ার মাটি ভিজিয়ে দিলো অনেকটা, সেই ভিজে মাটির ওপর থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে ওর চোখের দিকে তাকালো ধর্ম্মরাজু, বলল,—'এসেছো ?'

মেয়েটা বলল,—'তুমি নাকি মন্দিরের কাজ পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি !'—বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে মেয়েটা। খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়েছে, ভিজে শাড়ী নিটোল শরীরটার সংগে মিশে আছে,—ভিজে চুল দিয়ে জল পড়ছে দুই গাল বেয়ে। দূরে বিদ্যুৎ চমক'চ্ছে, তারই আলোয় ক্ষণিকের জন্ত ঝিলমিল ক'রে উঠছে জলের বিন্দু। শিল্পী বলে,—'ঈস্ বড্ড ভিজে গেছ।'

'গেছিই ত। বেশ লাগল ভিজতে। কিন্তু তুমি ত খুব ব্যস্ত। সহরের মেয়েটা বুঝি অনেক কাজ দিয়ে গেছে ?

ধর্ম্মরাজু একটু হাসে, বলে,—'কে জানে কে দিয়েছে এই কাজ। 'সহরের মেয়ে না গাঁয়ের মেয়ে ?'

গাঁয়ের মেয়ে মুখ্যু মানুষ, সে কী জানে কোন্ জিনিষের কী আদর।'

ধর্ম্মরাজু গাঢ় কণ্ঠে বলে,—"রাগ কোরো না। আমার কাজের দাবী আসে তোমার কাছ থেকে। তুমি পথ দিয়ে নীরবে চলে যাও,—তোমার চলে যাওয়া যেন আমাকে বলে যায় কাজের কথা। আমি মন্দিরের গায়ে তোমাকেই সাজিয়ে রাখব,—কেবল তোমাকেই।'

অবাক হ'য়ে শুনে যায় ওর কথা মেয়েটী, যেন নতুন, একেবারে নতুন কোনো লোকের কথা শুনছে সে! তারপরে এক সময় এগিয়ে এসে বসে ওর কাছে, হাঁটু মুড়ে একটু ঝুঁকে পড়ে সামনে, তারপরে একটা হাত ওর হাতের ওপরে রেখে কেমন কান্নাভরা কণ্ঠে বলে, 'রাজু।'

রাজুর মুখখানা হাসির উজ্জ্বলতায় ভরে যায়, আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেয় হাতখানা, শুধু বলে,"আমার কোনো দুঃখ নেই।'

* * *

দিন ঘনিয়ে আসে। দুর্নিবার অশান্ত মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়ে চলে ধর্ম্মরাজু, সবই প্রায় নাচের ভঙ্গী। ভেঙ্কটেশ্বর এসে-এসে খোঁজ নিয়ে যায়, গ্রামের লোকেরা দেখে যায় অবাক বিস্ময়ে। ধর্ম্মরাজু কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে তাকায়,—'কাকা! কতদূর হলো মন্দির ? আমি কবে যাবো ?

ভেঙ্কটেশ্বর সহসাই উত্তর দিতে পারে না। অথচ না দিলেই নয়। অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রছে ছেলেটা দিন-রাত, ঘরে ব'সে ব'সে। কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, 'মন্দির প্রায় শেষ হয়ে এলো, শীগ্‌গির তুমি যাবে।'

পাগল ছেলে কোনো খবরই রাখে না। কদিন ধরে গ্রামে চলেছে এ নিয়ে চাপা উত্তেজনার ভাব, তা' ও জানে না। গ্রামের প্রায় সবাই জেনে গেছে, কিন্তু ওর দুঃখে তারা আজ সমান দুঃখী ব'লে ওকে এ' দুঃসংবাদ তারা কেউই দিতে পারেনি। আজ দুঃখের দিনে অনেক ব্যবধান ঘুচে গেছে তাদের।

মন্দির তৈরী হচ্ছিল চাঁদা নিয়ে কিন্তু যা হয়,—এই সুযোগে নাম করবার লোভে এসে পড়লেন ধনী ব্যবসায়ীর। টাকা ঢালতে লাগলেন অজস্র,—খবরের কাগজে ছাপা হ'তে লাগল নাম। বিরাট মন্দির হবে ওটা। সেখানে নগণ্য গ্রাম্য কারিগরদের স্থান কোথায় ? দেশ-বিদেশ থেকে আসছে নামকরা শিল্পীরা। সেই অধ্যাপক আর তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রভাব প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে গেছে।

সব চেয়ে বেশী দুঃখ পেলো ভেঙ্কটেশ্বর। শুধু দুঃখ নয়, একটা অব্যক্ত জ্বালাও যেন জ্বলতে লাগল অন্তরটায়। বাবুরা কেন আশা দিয়ে গেল,—আজ এই তীব্র তাচ্ছিল্যের দিনে তাঁরা ত এগিয়ে এলেন না কাছে। কারু বলে আবার ঐ অবুঝ ছেলেটা যখন তাকে ডাকবে, তখন কী উত্তর দেবে সে এর ? উত্তেজনায় মাথার পাগড়ীটা টান মেরে খুলে ফেলে ভেঙ্কটেশ্বর। এরকম পরামর্শ বসে

গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে। সবাই আজ একযোগে ভাবছে,—কী করা যায়। রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে চুরমার ক'রে দিয়ে আসবে ওদের ঐ মন্দির?

'কাকা!'

ভেঙ্কটেশ্বর ছুটে এলো ওর কুটীরে, ধরল হাত ওর শক্ত ক'রে, ব'লল, 'আয় আমার সংগে।'

'কোথায় কাকা? মন্দিরে আমার ডাক পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ডাক পড়েছে। আয়।'

ভেঙ্কটেশ্বরের কুটীরের পাশে তারই জমিতে সে পাকা বাড়ী তুলবে বলে পাথর জমিয়ে রেখেছিল বহু। আজ সেখানে বহুলোকের জটলা। এ একেবারে গ্রামের ঠিক মধ্যখানটা। একটি ঘরের পাশে উঠোনে একটি নতুন বাছুর খেলা করছে তার মায়ের সংগে। অদূরে চলেছে দধিমন্থন। গ্রামের মেয়েরা মাথায় ক'রে নিয়ে আসছে জল। কেউ কেউ মাথায় ক'রে নিয়ে আসছে মাটির ঢেলা। পুরুষদের অনেকেরই হাতে কোদাল। একটা অদ্ভুত সংকল্পে মানুষগুলি দৃঢ় হয়েছে আজ। একটা প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরে গেছে সবাই। ওকে দেখে জনতা এগিয়ে এলো কাছে।

'রাজু? তোকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে মন্দির থেকে। ওখানে সহরের শিল্পীরা এসেছে, তোর সেখানে স্থান নেই।'

'নেই!' অস্ফুটকণ্ঠে বলে ওঠে রাজু, তারপরে বসে পড়ে একটা বড়ো গাছের শিকড়ের ওপর। ভেঙ্কটেশ্বর বলে, 'কিন্তু এই তোর মন্দির। আমরা গ্রামে প্রত্যেকে পালা ক'রে খেটে মন্দির তোলবার সংকল্প করেছি। আজ তার ভিৎপত্তন। চেয়ে দেখ চারিদিকে। মেয়েরা পর্য্যন্ত কাজে হাত দিয়েছে।'

সত্যি দেখবার মতো দৃশ্য। পুরুষরা মাটি কাটছে, মেয়েরা নিয়ে আসছে সেই মাটি মাথায় করে। একটি ছোট্ট ছেলে মায়ের হাত ধ'রে ধ'রে আসছে, তারও ছোট্ট মুঠিতে মাটির ঢেলা। ঐ ওদের উঠোনের বাছুর, দধি-মন্থন, মেয়েদের জল নিয়ে আসা, এই পুরুষের মাটিকাটার কাজ,—সব মিলিয়ে জীবনধারার একটা অখণ্ড সুর। মানুষ তার জীবনের কর্ম্মচ্ছন্দ দিয়ে এমনিভাবেই ত ফুটিয়ে তুলছে আনন্দকে।

ধর্ম্মরাজু উঠে দাঁড়ায়। এই তার সত্যিকার কর্ম্মক্ষেত্র। এই তার কাজ। শুধু নৃত্য নয়, জীবনের প্রতিটি চিত্রকে সে ফুটিয়ে তুলবে এই মন্দিরের গায়ে। ঐ মায়ের হাতধরা ছেলে, ঐ নতুন বাছুরটি, ঐ মেয়েদের জল তুলে আনা। দুর্নিবার আনন্দের আবেগে যেন চুরমার হ'য়ে যাবে ধর্ম্মরাজু, কোনক্রমে জড়িয়ে ধরে ভেঙ্কটেশ্বরকে, বলে,—'কাকা!'...

মাথায় মাটি ব'য়ে নিয়ে আসতে আসতে মেয়েটী একটু থমকে দাঁড়ায়, হলদে শাড়ীর আঁচলটা ঠিক ক'রে নেয় একবার, তারপরে এগিয়ে আসে,—হাসিমুখে।

★

আসবে না ফিরে

সেখ হাবিবুল ইসলাম

সুরের সঞ্চার নিয়ে এলো ফের ঘুরে
সুখের বাসরে আমার স্বপ্ন হেসে।
পথের আঁধার, পথ ছেড়ে গেছে দূরে,
উড়ো পাখীর মত উড়ে যাই শুধু ভেসে।

আলোর শলিতা আশা ভরে খালি জলে,
প্রাণে বয় রাঙা ইসারার মৌসুম।
কিচিমিচি জ্বালা সব গেছে রসাতলে,
এ জীবনে আর আসবে না ফিরে ঘুম।

মোঘলযুগের চিত্রকলা

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগ্বিজয়ী পারস্য সম্রাট তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ এবং নিষ্ঠুর হত্যা লুণ্ঠনের কাহিনী আমাদের সুবিদিত। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন এবং তাঁহার সৈন্যগণ রাজধানী দিল্লী নগরী অবরোধ করিয়া অধিবাসী-দিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া, অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। কিন্তু তৈমুরলঙ্গের বংশধরেরা সুসভ্য এবং শিল্প-কলায় অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে পারস্য দেশীয় চিত্রকলার বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পারস্য দেশে তখন বহু কুশলী চিত্রকর ছিলেন এবং তাঁহারা বংশানুক্রমে সম্রাট বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রাঙ্কন করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পারস্য দেশীয় চিত্রকলা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সেই সময়ে খোরাসানে সুলতান হুসেনের রাজত্বকালে বিজাদ নামে একজন খ্যাতনামা চিত্রকরের পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি সেই সময়ে পারস্যদেশে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন। সম্রাট বাবরের লিখিত তাঁহার জীবন-কাহিনীতেও এই চিত্রকরের উল্লেখ আছে।

তৈমুরলঙ্গের বংশধর বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ জয় করেন। সেই সময় ভারতবর্ষীয় ভাবধারার সহিত পারস্যদেশীয় চিত্রাঙ্কন রীতির সংমিশ্রণে এক নূতন চিত্রাঙ্কন রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাকেই অনেকে Indo-persian art বলিয়া থাকেন। বাবর চিত্রকলায় সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই এই নূতন চিত্রাঙ্কন রীতি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই চিত্রাঙ্কন রীতি চরম উন্নতি লাভ করে।

সম্রাট আকবরের নানাবিধ শিল্পকলায় অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁহার উৎসাহে স্থাপত্যশিল্প, নানাবিধ কারুশিল্প এবং চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সম্রাটের মন্ত্রী আবুল ফজল প্রণীত সুবিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে সম্রাটের চারু ও কারু শিল্পে প্রবল অনুরাগের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে বহু খ্যাতনামা শিল্পী রাজদরবারে চিত্রাঙ্কন কার্য্যে নিযুক্ত হইত; পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতেও চিত্রশিল্পীরা এদেশে আগমন করিতেন এবং সম্রাটের দরবারে শিল্পচর্চ্চা করিতেন। ফলে পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতীয় চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়েও এই সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

মোঘলযুগের এই চিত্রাঙ্কন রীতি পারস্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল এবং ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের চিত্র-কলার ক্ষেত্রে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পারস্যদেশীয় চিত্র-কলা খুব প্রসার লাভ করে। চিত্রের বর্ণবিন্যাসে পারস্য-দেশীয় চিত্রকরগণের বৈচিত্র্য এবং নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা চিত্রে খুব উজ্জ্বল রংএর ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের চিত্রে আকাশের মত গাঢ় নীল রং, টকটকে লাল রং এবং সোনালী রংএর বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মনুষ্যদেহ অঙ্কন করিতে গিয়া পারস্যদেশীয় চিত্র-করগণ শারীরিক গঠনতত্ত্বের স্বাভাবিকতার আশ্রয় লইতেন না। কিন্তু দেখা যায় যে বৃক্ষলতাদি অঙ্কনে ইহারা কতকটা স্বাভাবিকতার অনুসরণ করিয়াই চলিতেন। অনেকক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায় যে একই চিত্রের মধ্যে মনুষ্যদেহটী হয়ত গতানুগতিক decorative ধরণে অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু বৃক্ষলতা পুষ্পাদি বাস্তবের বৃক্ষলতা প্রভৃতির মত করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য decorative composition, অতিশয় সূক্ষ্ম অথচ সুনিপুণ রেখাসম্পাত, চিত্রের background এবং পোষাক-পরিচ্ছদে সোনালী রংএর বহুল ব্যবহার, পারস্যদেশীয়

চিত্রের এইরূপ কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। পারিপ্রেক্ষিক, শরীর গঠনে স্বাভাবিকতা এবং আলোছায়ার সম্পাত এই সময়ের চিত্রে মোটেই লক্ষিত হয় না। চিত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক বিষয়বস্তুর রং flat ভাবে ব্যবহৃত হইত এবং চারিদিকের আবেষ্টনী সূক্ষ্ম ও লালিত্যময় রেখাদ্বারা অঙ্কিত হইত।

কিন্তু পারস্যদেশের প্রচলিত চিত্রপদ্ধতি এদেশের সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। পারস্যদেশীয় গতানুগতিক ভাব এই নূতন পদ্ধতিতে লুপ্ত হইল, এবং বাস্তবের অনুকরণ, কিছু কিছু আলোছায়ার সম্প্রাত, পারিপ্রেক্ষিকের অল্প অল্প প্রচলন সুরু হইল। ভারতীয় বিষয়বস্তু, ভাবধারা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ইহা এমনভাবে মিশিয়া গেল যে ইহা ভারতেরই একটী নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিণত হইল। ইহাকেই Mugol Painting আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আকবরের সময়েই মোঘল চিত্রকলা সবিশেষ উন্নত হয়। আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই সময়ের চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্রাটের নানাবিধ শিল্পকলায় অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া বহু শিল্পী তাঁহার দরবারে আগমন করিয়াছিলেন; বিদেশ হইতে আগত বহু শিল্পীও তাঁহার দরবারে ছিলেন। বহু খ্যাতনামা হিন্দু চিত্রকরও তাঁহার দরবারে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেশুদাস, দশবন্ত সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কেশুদাস জাতিতে 'কাহার' ছিলেন। এই সমস্ত শিল্পীরা পুরাণো গতানুগতিক decorative অঙ্কন পদ্ধতির বাঁধন হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া বাস্তবের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজদরবারের নানাবিধ দৃশ্য, অন্তঃপুরের কাহিনী, যুদ্ধ এবং শিকারের নানাবিধ বিষয়বস্তুর অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করিতেন। চিত্রে আলোছায়ার সম্পাত এবং পারিপ্রেক্ষিকেরও প্রবর্ত্তন করিলেন। ছবির backgroundএ বৃক্ষলতাদির চিত্র অঙ্কন করিতে হইলে পুরাণো decorative form পরিত্যাগ করিয়া নিকট এবং দূরত্ব ও আবহাওয়ার প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টাও হইল। সম্রাট আকবরের সময়ে চিত্রকলা সাধারণতঃ রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, দরবারের সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, চিত্রকলায় অনুরাগ জনসাধারণের মধ্যে তখনও প্রসার লাভ করে নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একজাতীয় নিচুস্তরের প্রতিলিপি অঙ্কনের বহুল প্রচলনে জনসাধারণের মধ্যেও চিত্রকলা প্রসারতা লাভ করে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই মোঘলচিত্রকলা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সম্রাট বাবরের শিল্পানুরাগ প্রবল ছিল, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে দেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তাই শিল্পকলার উন্নতিও ততটা প্রসার লাভ করে নাই। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে দেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—নানাবিধ শিল্পকলাও উন্নতিলাভের সুযোগ পায়। ক্রমে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোঘল শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার রাজসভায়ও বহু শিল্পী নিযুক্ত থাকিত। এই সময়কার অঙ্কিত নানাপ্রকার পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির ছবি দৃষ্ট হয়। শিকার জাহাঙ্গীরের একটী প্রিয় জিনিষ ছিল। বহু শিকারের দৃশ্যও তিনি তাঁহার শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় ছবিও এদেশে কিছু কিছু আমদানী হইত—এইসব ছবির অনুকরণও চিত্রকরেরা অনেক সময় করিতেন। ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত দুই একখানা চিত্রের নিদর্শনও পাওয়া যায়। এই সময়ের শিল্পিগণ বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনের নূতনত্বে, রেখা এবং বর্ণসম্পাতের কুশলতায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অঙ্কিত চিত্রের ভাবসমৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসের চমৎকারিত্ব বাস্তবিকই অতুলনীয়।

প্রতিকৃতি অঙ্কন মোঘলচিত্রকলার একটি প্রধান অঙ্গ। বাদশাহরা প্রতিকৃতি অঙ্কনে চিত্রকরদের খুব উৎসাহ দিতেন; এবং এইরূপ উৎসাহিত হইয়া প্রতিকৃতি অঙ্কন খুব উন্নত হইয়াছিল।

অধিকাংশ চিত্রের মানুষের মুখই profile অঙ্কিত হইত; খুব সূক্ষ্ম রেখা এবং খুব finish থাকিত। বাদশাহদের ছবির মাথার পিছনে halo দেখিতে পাওয়া যায়। বহুমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত পোষাক পরিচ্ছদে উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ খুব প্রচলিত ছিল। সোনালী রংএর বহুল

ব্যবহার এই সমস্ত চিত্রে খুব লক্ষিত হয়। হাল্কা রংএর background-এর against-এ মূর্তিটী নানা রংএর সমাবেশে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। মাঝে মাঝে background-এ গভীর কাল রংএর ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। অবয়বের গঠন প্রদর্শনের উপযোগী সামান্য আলোছায়ার প্রয়োগ থাকিত। সমস্ত চিত্রটী উজ্জ্বল বর্ণের সুসামঞ্জস্যে, কোমল এবং সরস রেখাচিত্রের পরিবেষ্টনীতে এবং সর্ব্বোপরি একটা decorative effect-এ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিত। শুধু যে অঙ্কন এবং রেখা ও বর্ণসমাবেশের নৈপুণ্যই ছিল, তাহা নহে—মনুষ্য-চরিত্রটীও তুলির টানে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত।

বিভিন্ন স্থানের অঙ্কন পদ্ধতির বিভিন্ন নাম চিত্রকরেরা রাখিয়াছিলেন, যেমন Delhi Kalm, Patna Kalm, Joypur Kalm ইত্যাদি। রাজধানী দিল্লীর চিত্রকরেরা যে পদ্ধতি অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করিতেন, তাহাকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল Delhi Kalm; পাটনার শিল্পীদের অনুসৃত পদ্ধতি Patna Kalm আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের অঙ্কন পদ্ধতির বিশিষ্ট নিজস্ব ভঙ্গী ছিল; এইজন্য সহজেই একটী হইতে অন্যটি পৃথক করিতে পারা যায়।

শাজাহানের রাজত্বকাল হইতেই মোঘল চিত্রকলার পতন আরম্ভ হয়। দেশে চিত্রাঙ্কনের চর্চ্চা পূর্ব্বকরই ছিল, কিন্তু উচ্চধরণের চিত্র খুব কম অঙ্কিত হইত। তাঁহার সময়ে স্থাপত্য-বিদ্যা খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই দেশীয় চিত্রকলার অধঃপতন দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। রাজদরবারের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া দেশীয় চিত্রশিল্পের ধারা ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছিল। দেশের কতকশ্রেণীর লোক অবশ্য চিত্রকলায় অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু রাজশক্তির অনুকম্পা হইতে বঞ্চিত হইয়া দেশের চিত্রকলা টিকিয়া থাকিতে পারে না। আওরঙ্গজেবের পর তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা বাদসাহদের সময়েও মোঘল চিত্রকলার কোনই উন্নতি হয় নাই—দিন দিনই ইহা অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। পরে দেশে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানী হইল, দেশের শিল্পপদ্ধতিও তখন পাশ্চাত্যসভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পরিতে লাগিল।

★

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের বার্ষিক কলাপ্রদর্শনী

শ্রীপরাশর

শীত জমে উঠতে না উঠতেই প্রতি বছরের মত এবারেও কলকাতায় প্রদর্শনীর মরশুম শুরু হয়ে গেল। নহবৎ আর আলোকসজ্জার মাঝে যারা ফিবছর আত্মপ্রকাশ করে তারা তো আছেই, এ ছাড়াও এবারে একটি নূতন প্রদর্শনী তার অনাড়ম্বর বেশভূষা নিয়েও কলকাতার কলারসিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। একাডেমী অব ফাইন আর্টসের আভিজাত্য আছে, কাজেই সেখানকার ছবির বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে আদব-কায়দা এমন কি প্রবেশমূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারেও এমন সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে যাতে করে সাধারণ লোকের অযথা ভীড় সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর দর্শক ও ক্রেতাদের বিরক্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। অবশ্য এর ফলে এক দিক দিয়ে কিছুটা 'শুভ'ফলই ফলেছে। ছবি কেনার পয়সা যাদের আছে তারা এখানে এসে নিঃসংকোচ পছন্দটা সারতে পারেন স্বগোত্রীয়দের মাঝখানে, বাজে হট্টগোলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। এককালে এটাই ছিল কলকাতার ছবি বিক্রীর সেরা বাজার। কিন্তু ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে ধনীদের বিলাসের খাতে ব্যয়ের বরাদ্দটা কমে

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ছবির বাজারেও মন্দা পড়েছে। রাজা—উজির সাহেব—সুবোদের কথা বাদ দিয়েও যুদ্ধোত্তর মুদ্রা-স্ফীতিতে স্ফীতোদরদের কটিদেশের

নির্জ্জন (২৭৮)

পরিধিও দিন দিন ক্ষীয়মান, কাজেই আজ ছবির বাজারের সমস্যাটা এক মহা সমস্যায় দাঁড়িয়ে গেছে। ছবি কিনবে না তবুও স্থান মাহাত্ম্যের গুণে এখনও ওখানেই সব চাইতে বেশী ছবি বিক্রী হয়। বাজার হিসাবে ওটা অনেকটা নিউমার্কেটের মতই আভিজাত্যপূর্ণ।

কিন্তু নিউমার্কেটের আভিজাত্য যতই থাকুক না কেন কলকাতার বিপুল জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশের চাহিদাও সে মেটাতে পারে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ বাজারের মতও সার্ব্বজনীন বাজারের সৃষ্টি হয়েছে। এ না হলে দেশের পণ্য যেমন চাষার ঘরে পচতো তেমনি ক্রেতাদেরও থাকতে হত পেটে হাত দিয়ে।

ছবির বাজার হিসেবে একাডেমীর ভীড় কমে এল। মাৎস্যন্যায়ের অদ্ভুত বিধানে কোন কোন বিশেষ উদর যেমন স্থিতি-স্থাপকতার সীমাকেও অতিক্রম করেছে তেমনি আবার অপরদিকে নিঃস্বদের সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। তাই আজ এই প্রশ্নটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে সাধারণ লোকের জন্য ছবি কেনাবেচার কোন সাধারণ বাজার হবে কি না! ছবি নিয়ে যারা কম বেশী কারবার করেন এ প্রশ্ন শুনে তারা হয় তো অট্টহাসি হেসেই বলবেন যে জনসাধারণ কিনবে ছবি, আর সে অর্থে দেশের শিল্পীরা বাঁচবে এতো পাগলের প্রলাপ। আমাদের দেশে এটাকে আপাত দৃষ্টিতে পাগলামী বলেই মনে হবে। কেন না আমাদের দেশের জনসাধারণ ছবি সম্বন্ধে যতটা উদাসীন, শিল্পীরাও ঠিক তাদের কাছ থেকে ততটা দূরে চলে গিয়েই তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে। এর ফলে আজ এই দুই দলের মাঝখানে এমন এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে যে এদের মধ্যে সহজ আদান প্রদানের পথটিও রুদ্ধ হয়ে গেছে। শিল্পীরা আজ জীবনে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে প্রাচীনের সমাধিতে অর্ঘ্য রচনায় ব্যস্ত। যারা প্রাণের চাঞ্চল্যকে সহ্য করতে পারে না তারাই এত দিন দেশের এই শিল্পীগোষ্ঠীর অভিভাবকত্ব করে এসেছেন, কিন্তু আজ তাদের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে। এদিকে দেশের সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই মুষ্টিমেয় লোকের

কপোতী (৮৫)

তাবেদারী করে শিল্পীরাও আজ সমাজ বহিভূ'ত পরগাছায় রূপান্তরিত হয়েছে। পরগাছার বাঁচার প্রশ্ন ততদিনই যতদিন তার রসদ সরবরাহকারীর রসের ভাণ্ড নিঃশেষ

না হয়। মাটির বুকে নিজের শেকড়কে শক্ত করে বেঁচে থাকা তার স্বভাব নয়।

কিন্তু দুনিয়ার হালচাল দেখে শিল্পকলা সাধক ও আগ্রহশীল ব্যক্তিমাত্রের মনেই আজ একটি প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটালে দেশের শিল্পকলার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের কথা বাদ দিয়ে সে দেশের জাতীয় শিল্পকে বাচিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি না! বর্ত্তমান শীতে ক'লকাতার প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী এই বিরাট সমস্যার সমাধানের পথে একটি ছোট্ট ইংগিত দিয়েছে। জানি না এই প্রচেষ্টা দেশের শিল্পী সমাজকে বাঁচার পথে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবুও এই তরুণ তরুণীরা দেশের শিল্পীদের প্রচলিত তোয়াজ করার মনোভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে দেখে এই আশাই হচ্ছে যে হয়তো এরাই দেশের আধমরা শিল্পীদের ঘা মেরে শিখিয়ে দেবে যে তাদের অবলম্বিত পথ সত্যিকারের বেঁচে থাকার পথ নয়। সমাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে বাঁচার রসদ সংগ্রহ করতে হবে সমাজজীবন থেকেই। চাঁদের দেশ থেকে মধু আমদানী করে বুভুক্ষু জনসাধারণের ক্ষুধা মেটান যাবে না।

নতুন বসতি (৩৭২)

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের প্রদর্শনীতে ছবি যা বিক্রী হয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে, কিন্তু এখানে সাধারণ দর্শকের ভীড় দেখে এই কথা মনে হয়েছে যে তারা তাদের বক্তব্যকে জনসাধারণের মর্ম্মস্থলে পৌছে দিতে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন। এই প্রচেষ্টাকে যদি তারা বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তবেই অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পকলার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর একটি জিনিষের জন্য এদের প্রশংসা না করে পারা যায় না, সেটি হল এরা যেমন এদের আশেপাশের পরিবেশকে অবহেলা করেন নি, তেমনি এদের ছবির আঙ্গিকের কোথাও এতটুকু জাতিপাত ঘটে নি, বরং সেখানে বিষয়ের রসোদ্ঘাটন জন্য ছাত্রসুলভ আন্তরিকতার পরিচয়ই দিয়েছেন।

বেচাকেনা

এই প্রদর্শনীর ছবিগুলোর মধ্যে তুলি কালিতে আঁকা কয়েকজন শিল্পীর শিয়ালদহ থেকে উদ্বাস্তদের কয়েকটি স্কেচ উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে শিল্পীদের ব্যথিত মনের উত্তাপ খুঁজে পাই। এর মধ্যে শ্রীঅশোক বসু, অজিত বর্ম্মা ও সুনীল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। তেলরং ও প্যাষ্টেলে আঁকা প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে অজিত বর্ম্মার 'প্যাষ্টেলে আঁকা একটি মুখ', সুনীল ঘোষের 'নিজ-প্রতিকৃতি' (সভাপতি পদকপ্রাপ্ত), 'একটি ছিন্নমূলের মুখ-

ছবি, মৃণাল সরকারের 'অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের মুখ' ও মধুমোল্লার 'হেডষ্টাডি' প্রশংসাযোগ্য। তেলরংয়ের দৃশ্য চিত্রের মধ্যে নির্ম্মল দত্ত ও মোহন্ত কোলের কাজ আমাদের ভাল লেগেছে। প্যাষ্টেলে আঁকা দৃশ্যচিত্রের মধ্যে উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও জগন্নাথ দত্ত উল্লেখযোগ্য। জলরং বিভাগে কয়েকটি কাজে আমরা তরুণ শিল্পীদের প্রতিভার স্বাক্ষর পেয়েছি, এর মধ্যে অজিত বর্মা, বিরথ দত্ত, জনতোষ চক্রবর্ত্তী, বীরেন গৌতম, অশোক বসু, রমেন সরকার, চিত্তরঞ্জন রায়, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, অমৃতোষ গাঙ্গুলী, সুশান্ত মণ্ডল, মনীষা বসু ও আভা মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। সহ-সভাপতি পদক প্রাপ্ত শ্রীহরিশচন্দ্র দাস পেন্সিলের কাজে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে সত্যিই তা প্রশংসার যোগ্য। নবাগতদের মধ্যে ইরা গাংগুলী, ফুলচাঁদ পাইন, রমা ঘোষ, কুমুদ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রা ঘোষ, প্রণব ঘোষ, পরিতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাজ তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে।

পরিতোষ পাইনের কালিকলমের আঁকা ছবিগুলো ভাল লেগেছে। বাণিজ্য কলা বিভাগে অমিতকুমার বিশ্বাস, মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, সতীকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুশীল পোদ্দার ও বিনয় সরকারের কাজ আমাদের ভাল লেগেছে।

সর্ব্বোপরি আগাগোড়া প্রদর্শনীতে একটি শুভ লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, ছাত্রছাত্রীরা কোন সস্তা প্রলোভনে পড়ে রাতারাতি শিল্পকলার চেষ্টা করে নি; তাদের প্রতিটি কাজে আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রচেষ্টা দেশের শিল্পীদের মনে শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করুক এই প্রার্থনা।

★

ডাক

বংশীধারী দাস

কে ডাকো আমায় আজ শীর্ণ এই কল্লোলিনী তীরে
যে-মুহূর্ত্তে মুঠো মুঠো দু'হাতে ছড়ায় পৃথিবীর
রক্ত রঙ মুছে নিয়ে সন্ধ্যা তার কুয়াসা তিমির
হিম হাতে ছুঁয়ে যায় এ হৃদয়, সন্ধ্যাকাশ ঘিরে
মিটি মিটি দু'একটি তারা জ্বলে। এই ডাক শুনে
অযুত বছর আগে নেমে আসি হামাগুড়ি দিয়ে
সবুজ ঘাসের দেশে, স্বপ্নের সোনালী ফুল নিয়ে
সেদিন যে মালা দিলে রূপগ্রাসী কালের আগুনে
সব রঙ সব গন্ধ ঝরে গেছে তার। তবু সেই
স্মৃতিকূলে ছিন্ন মালা কেন আজ দাও উপহার
বেদনার দীপাধারে মায়াবিনী আলোর পাথার
মিথ্যে এই বিধুনন: কাজ নেই এতে কাজ নেই।

তবুও দুর্জ্জয় ডাক। মায়াবিনী। তবুও ফোটাও
সূর্য্যমুখী চেতনার নীলবৃন্তে, দু'হাতে ছড়াও
সূর্য্যসাধ অগ্নিকণা নীলরক্ত শিরায় শিরায়।
তোমার গভীর ডাক অতনুর তনুপিপাসায়
মিলনের দেহতীর্থে: কামনার আরক্ত চুম্বনে
আমাকে বিবশ করো, মৃত্যু হানো উষ্ণ আলিঙ্গনে।

বৈদিক কর্ম্মবাদ

ডক্টর মতিলাল দাশ

নিঃশ্রেয়স লাভের বাঞ্ছা মানুষের সহজাত। মানুষ তার চরম অভিব্যক্তি পায় নিখিলের মধ্যে যখন ঐক্যকে অনুভব করে। ব্যক্তি মানুষ স্বতন্ত্র—কত তার ভেদ, কত তার বিসংবাদ, কিন্তু চৈতন্যলোকে মানুষ এক ভূমার স্পর্শ উপলব্ধি করে—এই পরম পরিপূর্ণতাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করে নেয়—বৃহৎ মানুষের আনন্দ ব্যক্তি-সীমাকে পেরিয়ে ফুটে ওঠে—তাই বৃহত্তর বোধ, মানব চৈতন্যের জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে এই মহা বিকিরণ, এই বিস্তৃত প্রসারণ সত্যে এবং সমগ্রতায় ঝলমল করে ওঠে—। অথর্ব্ববেদ এই কথাটিকে রসে ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন—তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে। মানুষের মধ্যেই আছেন মানব-দেবতা—বিদ্বান যিনি তিনি জানেন মানুষ প্রত্যক্ষতঃ যাহা, তার চেয়ে পরমার্থতঃ অনেক বৃহৎ। এই ব্রহ্মোপলব্ধি—এই ব্রহ্মবিহারকে আমাদের শাস্ত্র একদিন চরম পুরুষার্থ বলে রায় দিয়েছিলেন।

দুঃখের মধ্যে দিয়ে তপস্যার সহায়তায় মানুষকে এই এক ও অমৃতকে জানতে হয়—এই জানবার পথ নানাবিধ এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিভিন্ন। সাধনের অন্যতম কর্ম্মমার্গ। কর্ম্মকাণ্ড ভারতীয় সাধনার প্রথমস্তর। কর্ম্ম-মীমাংসা সর্ব্বপুরাতন দর্শন—সর্ব্বপ্রথম এর উদ্ভব হয়েছিল।

Keith বলেছেন :—"We must assume that the Mimamsa as a science developed before the Vedanta. The former was plainly necessitated by the development of the sacrificial ritual with which it is immediately connected, and it serves an important practical end; the latter is proof of the growth of a philosophical spirit, which sought to comprehend as a whole the extremely varied speculations which are scattered in the Aranakyas and Upanishads. while, of course it is not impossible that the reduction of the two Sutras was contemporaneous, despite the earlier development of the Mimamsa, the probability surely lies in favour of the other view that the as Mimamsa Sutra was redacted first and served a model for the other schools."

কর্ম্মমীমাংসা আমাদের চোখে এনে দেয় শ্রৌতযজ্ঞের এক বিরাট আড়ম্বরময় চলচ্চিত্র—হোতা ও তাহার সহকারী মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ গ্রাবস্তুৎ—এই সব ঋত্বিক-গণ ঋক্‌মন্ত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান করছেন—পাশে রয়েছেন যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থিতা, নেষ্টা, উন্নেতা—তাদের কাজ যজ্ঞপরিচালনা। তারা আহুতি দানাদি কাজ করছেন—সঙ্গে চোখে পড়ে সামবেদী উদগাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য—তাঁরা সামমন্ত্র গান করছেন—অথর্ব্ববেদী ব্রহ্মা, ব্রহ্মনাচ্ছংশী, পোতা ও অগ্নীধ্র যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করছেন। পূর্ব্বদিকে জ্বলছে আহবনীয় অগ্নি—পশ্চিমে মার্জ্জালীয়, দক্ষিণে গার্হপত্য এবং উত্তরে অগ্নীধ্রীয়—অগ্নিই যজ্ঞের পুরোহিত—তিনিই যজ্ঞে দেবতাদের নিয়ে আসেন। কিন্তু আমি আপনাদের সেই যজ্ঞযুগের নানা বিচিত্র কথা বলছি না।

কর্ম্মকে এখানে আমি তার সহজ ও সরল অর্থেই গ্রহণ করেছি—কর্ম্ম অর্থে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা। বৈদান্তিকেরা ধ্যান ও বিচার প্রভৃতি মানস-কর্ম্মকে কর্ম্ম বলেন না। কিন্তু এই সব দার্শনিক সূক্ষ্মতার মধ্যে না গিয়ে আমি কর্ম্মবাদে অভ্যুদয় ও প্রগতির জন্য কৃত সকল কাজকেই কর্ম্ম-অর্থে গ্রহণ করেছি।

এই কর্ম্মবাদকে বৈরাগ্যবাদের উত্তর হিসাবেই দেখতে চেয়েছি। একদিন এই দুর্ভাগা দেশে বৈরাগ্যসাধনাই মুক্তির উপায় বলে মানুষ স্থির করেছিল—সংসার মায়াময়

এখানে সবই তুচ্ছ, সবই হেয়, সবই ঘৃণ্য এই মনোভাব আমাদিগকে ইহলোক-বিমুখ এবং পরলোক-প্রেমিক করে তুলেছিল। এই পলায়নপর বৈরাগ্যবোধ আমাদের দেশের মহৎ সর্ব্বনাশ করেছিল এবং এখনও করছে—আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতি এই মৃত্যুর সঙ্গীত শোনায় নি—আমাদের পিতামহেরা জলদনির্ঘোষে জীবনের জয়গাথা গেয়েছেন এবং কর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করেছেন।

কর্ম্মযোগী বৈদিক ঋষি চেয়েছেন জীবনের প্রতিদিন নব নব রূপে বিকশিত হতে—তাই তিনি ভালবেসেছেন মাটির ধরাকে। অন্তরের মাঝে জীবনের যত গূঢ় মধু বিকশিত, তাকে নব নব রসে প্রকাশিত করে সার্থকতা চেয়েছেন। বৈদিক কর্ম্মবাদের মূল উৎস তাই পৃথিবীর প্রতি প্রীতি। মৃত্তিকার ধরণীকে তিনি আনন্দনিকেতন বলে অভ্যর্থনা করেছেন। অথর্ব্ববেদ বলছেন :—

গিরয়স্তে পর্ব্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবি স্তোনম্ অস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিং
পৃথিবীম্ ইন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্॥

হে জননী পৃথিবী, তোমার পর্ব্বত হোক প্রাণারাম, হিমবান্ অভ্রংলিহ নগাধিরাজ হোক সুন্দর ও প্রীতিকর—তোমার বিস্তীর্ণ অরণ্য হোক আরামপ্রদ। হে মাতা, তোমার ধূসর মৃত্তিকা, কৃষ্ণা, রক্তবর্ণা এবং নানারূপা মৃৎ-শোভা কি সুন্দর, দেবরক্ষিত তোমার প্রতিষ্ঠিত ধ্রুব ভূমি শাশ্বত শান্তির আকর হোক।

আমি এসেছি এই পৃথিবীতে—পরাজয়ের কলঙ্কতিলক আমার ললাটে নয়, আমি অজেয়, আমি অজিত, মৃত্যু আমার ক্লিষ্ট করে না, আমি অহত, ক্ষতি আমার নয়, আমি অক্ষত। এই উর্ব্বী পৃথিবীই আমার লীলাভূমি। পুনরায় বলেছেন :—

যস্তাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্তাম্ আক্রন্দ যস্তাং বদতি দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমি প্রণুদতাং সপত্নান্ অসপত্নং
মা পৃথিবী কৃণোতু॥

সেই পৃথিবী, যার বক্ষতলে মর্ত্ত্যমানুষ কলকোলাহলে নাচে আর গায়, সেই বসুধা যার পথে প্রান্তরে জাগে রণহুঙ্কার—বাজে দুন্দুভি—চলে রণতাণ্ডব, সেই মহীয়সী পৃথ্বী আমার পক্ষে আনন্দদায়িনী হোক, শত্রুনিধন করে আমায় অসপত্ন প্রতাপের অধিকারী করুন।

পৃথিবীপ্রেমিক এই মানুষ বসুন্ধরার কোলে মুগ্ধ তনু মেলে অনুভব করেন আপন দেহকে, যে দেহকে তিনি পবিত্র ও পুণ্য মনে করেন—তাকে সর্ব্বতোভদ্র, সর্ব্বসুন্দর করে দেখতে চান। কারণ দৃঢ় তনু যদি না হয় তবে ত মৃত্যুঞ্জয় অসম্ভব। তাইত প্রার্থনা জাগে—

বাঙ্ম আসন্ নসোঃ প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্ণোঃ শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ।
অপলিতাঃ কেশা অশোণা দন্তা বহু বাহ্বোঃ বলম্॥
অথর্ব্ববেদ ১৯।৬০।১

ঊর্ব্বোরোজো জঙ্ঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ।
প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্ব্বাত্মনি ভৃষ্টঃ॥ ১৯।৬০।২

আমার রসনায় ফুটুক বাক্য, নাসিকায় বহুক প্রাণ, চোখে নামুক শোভন দৃষ্টি, কর্ণে শ্রবণশক্তি। আমার কেশ যেন পলিত না হয়, দন্ত যেন অক্ষত থাকে, বাহুতে যেন বীর্য্য রাজে। উরুতে আসুক বল, জঙ্ঘায় আসুক দ্রুতগতি এবং পায়ে আসুক দৃঢ়তা, আমার সর্ব্বাঙ্গ অরিষ্টহীন হোক এবং আমার আত্মা হোক অক্ষয়শক্তিসম্পন্ন।

মাধুরীময় ভুবনে মধুময় পরিবেশে সুন্দর সবল ও সুস্থ দেহের অধিকারী হয়ে মানুষ স্থির হয়ে থাকবে না। তার শিরায় শিরায় জাগবে কর্ম্মের স্পন্দন,—উৎসাহ ও আবেগের ছন্দ তাকে করবে ব্যাকুল। মানুষ জগতে আসে রিক্ত শূন্য হস্তে—একমাত্র সম্বল তার ক্রন্দন। দিনে দিনে আসে পুষ্টি—দেহে মনে জাগে তুষ্টি—তার সমস্ত প্রাণ সংসারে পূর্ণ হয়ে ওঠে—যে চায় নব নব কর্ম্মে তার ভালবাসার ধন এই ভূলোককে সুন্দর, মধুর মোহন করতে।

এই জীবন পিপাসা ঋষি গৃৎসমদের কণ্ঠে ত্রিষ্টুপ ছন্দে আবেগে স্ফূর্ত্ত হয়েছে।

ইন্দ্র! শ্রেষ্ঠানি দ্রবিনানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়িণাম্ রিষ্টিং তনুনাং
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥ ২।২১।৬

হে ইন্দ্র! দাও আমাদের শ্রেষ্ঠ ধন, দাও আমাদের দক্ষ চিত্ত, দাও আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের পার্থিব ও অপার্থিব ধন নিত্য নূতন পুষ্টিলাভ করুক, আমাদের তনু অরিষ্টহীন হোক; আমাদের বাক্য সুন্দর হোক, আমাদের দিনগুলি সুদিন হোক—দীপ্ত, উজ্জ্বল ও সুখময় হোক।

সুখময় সম্পদময় এই জীবন কর্ম্মে হবে মুখর—যজুর্ব্বেদ যেখানে শেষ হয়েছে—সেখানে ঈশোপনিষদে এই কথাটিই বলা হয়েছে:—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

কাজ কর, কাজ কর, কাজ করেই এখানে একশত বৎসর বেঁচে থাকবে, কর্ম্মছাড়া অন্য পথ নেই—কর্ম্মই ভুক্তি ও মুক্তির উপায়—কর্ম্মে মানুষের বন্ধন হয় না। জ্ঞানবাদীরা কষ্টকল্পিত অন্য যে অর্থ করেন, সেই সাম্প্রদায়িক অর্থ নিলে ভুল বিচার হবেই—এখানে কর্ম্মের সাধারণ অর্থ আচরণই বলা হয়েছে। মানুষ যা কিছু করে, খাওয়া, পরা, বসা, খেলা, উৎপাদন করা, ব্যবসাবাণিজ্য, দানধ্যান, যজ্ঞপূজা সবই কর্ম্ম।

ঋষির আদেশ—কাজ কর, কাজ কর—শতবৎসর বাঁচবে—পরিপূর্ণ পুষ্টিময় জীবনের জন্য—কর্ম্ম ছাড়া অন্য পন্থা নেই—আর কর্ম্ম জলস্রোতের মত নির্ম্মল ও পাবন—তা কখনও মলিনতার লেপ রাখে না।

অতন্দ্র হয়ে সারাজীবন কাজ করতে হবে—মেধাতিথি কাণ্ব বলেছেন:—

ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ।

দেবতারা যজ্ঞজীবনকারী ভক্তকে ইচ্ছা করেন; যারা স্বপ্নালু, যারা অলস, তারা তাঁদের অপ্রিয়, নিদ্রা ও স্বপ্ন দেবতাদের অবাঞ্ছিত, অতন্দ্রদেবগণ প্রমাদকে শাসন করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ তারস্বরে এই অতন্দ্র কর্ম্মের বার্তা ঘোষণার একান্ত প্রয়োজন।

আশা করা গিয়েছিল স্বরাট ভারতবর্ষ কর্ম্মের উদ্দীপনায় মুখর হয়ে উঠবে—চারিদিকে কর্ম্মের কলগুঞ্জন শোনা যাবে, কিন্তু আজও দেখা যাচ্ছে সর্ব্বত্র মৃত্যুর অবসাদ। সর্ব্বোপরি প্রবঞ্চনার মনোবৃত্তি। বহুশতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের চারিত্র্য বলকে বিধ্বস্ত করেছে—আমরা জানি ফাঁকি—আমরা জানি ঠকাবার কৌশল, আমরা জানি নিজেকে এবং অপরকে প্রতারিত করবার বুদ্ধি।

এই ফাঁকির শেষ করে দেশে আনতে হবে অতন্দ্রকর্ম্মের ব্যাপক আয়োজন আর অতন্দ্র অধ্যবসায়ের সেই কর্ম্মব্রতের উদ্‌যাপন।

এই অতন্দ্র বিরামবিহীন কর্ম্মের জয়গান বেদসংহিতার মন্ত্রে মন্ত্রে। যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের লভ্য নয়, তার মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য তপস্যা—সে মূল্য সাধনা। তার পথ অক্লান্ত অধ্যবসায়, অনলস কর্ম্ম।

কথাটি শুনতে যত সহজ, করতে তত কঠিন কিন্তু এই অতি পুরাতন উপায়ের মাঝেই আছে অভ্যুদয়। বামদেব ঋভুদের যখন স্তব করছেন তখন বলছেন—

"ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।"

যাদের কর্ম্মে শ্রান্তি আসে না—দেবতাদের সাহায্য তারাই পায়। ঘর্ম্মক্লান্ত পথিকেরই বন্ধু তাঁরা। অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার তনয়—ঋভু, বিভু ও বাজ। নিপুণ ও শক্তিমান এই তিন ভ্রাতা সমর্থ কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করেছিলেন। তপস্যায় দেবত্ব লাভ করে তারা মানুষের কাছে মহত্তর ও বৃহত্তর জীবন যাত্রার পথিকৃৎ বলে আদর্শস্থানীয়। তাদের কাহিনী দুঃস্থ ও শ্রান্ত মানুষকে আশা দেয়—দিব্যজন্ম, ভাগবতসত্তার অধিকার, সৎকর্ম্মেই পাওয়া যায়। সুধন্বার পুত্রগণ সুকৃতির ফলে অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন—সেই সৎদৃষ্টান্ত আমাদেরও আহ্বান করছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কর্ম্মের প্রসঙ্গটি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—সেখানে পাই:—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি।
পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাশ্চরৈবেতি॥
আস্তে ভগ আসীনোর্দ্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি॥৩

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতঃ সম্পদ্যতেশ্চরৈবেতি ॥৫
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু উদুম্বরম্
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তি চরংশ্চরৈবেতি ।৫

এই অনবদ্য ভাবগর্ভ কথাগুলির স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ দিচ্ছি—

শ্রান্ত যে জন পন্থা চলি, শ্রী যে তারই নান্য,
ইক্ষাকুসুত রোহিত ওগো এই চিরশ্রুতি
রইলে শুয়ে শ্রেষ্ঠ জনও লভে পাপের হানা
ইন্দ্র সখা পান্থ জনের, লও চলার আকুতি।
জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত তার যে জন চলে পথে,
ফলগ্রাহি আত্মা যে তার বৃহৎ নেয় লুটি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা। চড়ি মৃত্যুরথে
পথে চলার শ্রমে হত, চল পথে ছুটি।
যে জন বসে ভাগ্য যে তার রয়ত বসে বসে,
উচ্চশিরে যে রয়, সে রয় উন্নতিরই রথে
যে জন রহে শয়ন সুখে ভাগ্য তাহার খসে,
যে চলে তার ভাগ্য বাড়ে, চল চল্ল পথে।
কলি কোথায় যে রয় শুয়ে, আছে তারই কাছে
যে জেগেছে জীবনে তার, দ্বাপর ওঠে ভাসি;
যে উঠেছে, যে চলেছে ত্রেতা যুগের পাছে
যে চলে, সে সত্যযুগে, বাজাও চলার বাঁশী।
যে চলেছে, সে পেয়েছে অমৃতময় মধু,
যে চলেছে স্বাদু ডুমুর পায় সে রাশি রাশি,
চেয়ে দেখ দীপ্তসূর্য্য আকাশপথের বঁধু
তন্দ্রাবিহীন চলছে শুধু, বাজাও চলার বাঁশী।

এই আহ্বান নিরবধি সংগ্রামের আহ্বান—জীবন্মৃতের মত অলস শয়নে কালযাপন, পরাভবের কবলে আত্মসমর্পণ, সংসারের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের চাপে হতাশ হয়ে থাকার কথা এ নয়—দৃপ্তভঙ্গীতে রণযাত্রার ডঙ্কাধ্বনি।

জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে হলে, সম্পূর্ণতার স্পর্শ পেতে হলে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের মত অতন্দ্রকর্ম্মে জীবনে জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা আনতে হবে। বিদীর্ণ বিকৃত জীবনে প্রয়োজন কি—মাথার উপর থেকে নিঃসীম আকাশ হতে প্রতিনিয়ত ইথারের স্রোতে বৃহৎ প্রবাহ ভেসে আসছে—সে শুধু বলছে—চরৈবেতি—চল চল। আলস্যের সহস্র সঞ্চয় ছুঁড়ে ফেল আবর্জ্জনার মত—তারপর হে চির পথিক, কর্ম্মের বিচিত্রপথে যাত্রা কর—কণ্ঠে বাজুক একটী মাত্র মন্ত্র—চরৈবেতি।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে প্রথম সূক্তে বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রার্থনা করলেন—"হে পরম জ্যোতির দেবতা—তোমার কাছে বাঞ্ছা করি সেই ঐশ্বর্য্য, যা দিনে দিনে নব নব পুষ্টিলাভ করে।"

এত দিনগত পাপক্ষয়ের কথা নয়—জাড্যের উপাসনা নয়, আলস্যে জয়গান নয়—এযে পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির মহোৎসব—যে পূর্ণতা নূতন নূতন মুকুলে আপনাকে মুকুলিত করে—এ ত তারই বিকাশের কথা।

এই প্রার্থনাই অষ্টম সূক্তে :—

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর॥ ১।৮।১

হে পরম শক্তিময়, আমাদের স্বস্তির জন্য সার্থকতা আনো, যে সার্থকতা সম্ভজনীয়, যা সকল অধিকারে অধিকারী—সকল গৌরবে মণ্ডিত, যে কল্যাণ বীর বিক্রমে শত্রু দলন করে নিত্য অগ্রসর হয়ে চলে; যা সব প্লাবিত করে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে—সেই পরম চিত্ত আমাদের দাও।

ভারতবর্ষে আজ এই তারুণ্যের বোধকে জাগ্রত করবার বিশেষ দরকার—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্মবিসর্জ্জনের ঝোঁক মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—আজ দেশের প্রতি মানুষের প্রাণে মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী নূতন সুর-লয়-তালে বাজিয়ে তুলতে হবে—তাদের বলতে হবে, কর্ম্মযজ্ঞে আত্মবিসর্জ্জন করো।

বিজ্ঞ বিষয়ী বা ফাঁকিবাজ হলে অধঃপাত অনিবার্য্য—চাই সেই প্রাণের তারুণ্য—যৌবনের সেই উদারতা—যা মানুষকে লক্ষ্যের জন্য মৃত্যুকে বরণ করে উৎসাহিত করে,স্বার্থকে ভুলায় এবং দুঃখক্লেশকে অনায়াসে লঙ্ঘন করায়। ব্রতের এই অমর মহিমা আমরা যেন আজ সাহসে গ্রহণ করি।

ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্ম্মের পথই মহৎ অভ্যুত্থান। কর্ম্মের স্বল্পভাগও মহৎ ভয় হতে

পরিত্রাণ করে—নিজের শক্তি সম্বল করে কর্ম্মশালায় প্রবেশ করলে মঙ্গলবিধাতার আশীর্ব্বাদে মানুষ পুণ্য ও ধন্য হয়।

আমাদের প্রপিতামহদের সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি, সতেজ কর্ম্মশক্তি এবং সকল গতিবোধ আজ আবার ফিরুক নূতন উৎসাহে ও নবীন উদ্যমে। আমরাও তাদের মত প্রার্থনা করব অগ্নির কাছে :—

অস্বপ্নজস্তরণয়ঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ।
তে পায়বঃ সধ্র্যঞ্চো নিষদ্যাগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর॥ ৪।৪।১২

হে প্রোজ্জ্বল দেবতা! হে অগ্নি; পাপের ধূমজাল তোমাকে ক্লিষ্ট করে না, তুমি চিরজাগ্রত, স্বপ্ন এবং নিদ্রা তোমার নয়, তুমি চিরগতিশীল, তোমার বদান্য অবদান, তুমি অতন্দ্র হয়ে কর্ম্ম কর, তুমি দুঃখের তরঙ্গাঘাতে ভেঙ্গে পড় না—শ্রমে তোমার ক্লান্তি নেই—তোমার সেই পাবন পালনশক্তি একত্র হয়ে মিলিত হোক এবং আমাদিগকে রক্ষা করুক।

দেবতার মহিমার পথ মানুষের অনুকরণীয়, তাই মানুষ মানুষ ও দেবযানে চলবে—যে দেবপন্থা সত্য ও কর্ম্মে চির প্রতিষ্ঠিত। অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব এই বলিষ্ঠ কর্ম্মমুখর সাধনার পথেই প্রাপ্তব্য।

পৃথিবীর ধূলার মন্দিরে মানুষের ভগবান নিত্যই ধূলি মাখছেন—তাই ধুলোয় মহোৎসবে আমরাও যে তাঁর লীলা-সঙ্গী। বৃহৎ পৃথিবীর দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচিত্র কর্ম্মের মাঝেই তাকে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পরে।
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে, বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।

শ্রমের ঘর্ম্মফলে এই যে পূজার অঞ্জলি, সেইত দেবতার সত্য পূজা। ভজন, পূজন, আরাধনা সমস্তই বৃথা কর্ম্মের শুচিতায় যদি জীবন পবিত্র না হয়, কর্ম্মের সৌরভে সুরভিত না হয়, তবে সকল সাধনাই ব্যর্থ।

গোতম-রাহূগণ মনুষ্যত্বের যে পরিপূর্ণ আদর্শ এঁকেছেন, চরিত্রে উজ্জ্বল, কর্ম্মের প্রাচুর্য্যে মহিমাময় মানবতার সেই স্তুতি এখন শোনাব।

সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি।
সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ॥
১।৯১।২০

সোম, তিনি প্রসন্ন দেবতা, তিনি ভক্তজনকে দেন ধেনু তিনি দেন দ্রুতগতি তুরঙ্গম, তিনি দেন সেই বীর পুত্র, যার কর্ম্মের গৌরবচ্ছটায় দিগন্ত মুখর, যে পুত্র কুলপাবন গৃহভূষণ—যে পুত্র সভা ও সমিতির মাঝে আগম বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভায়, প্রতিভার তেজস্বিতায় চিরদীপ্তিমান্—সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ত্তব্যে কুশল—যে পুত্র আপন সুকৃতির রশ্মিতে পিতার হৃদয়-লুকানো ধন—গর্ব্বের বস্তু।

পিতৃশ্রবণ এই সব মানুষই হবে ভাবী ভারতের নাগরিক, নিত্যবর্দ্ধমান নব নব জীবনক্ষেত্রে যারা কর্ত্তব্য-কুশলতায় যথাযথ ব্রতপালন করবে—আপন গৃহজীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যারা গৌরবমুকুট পরবে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র দীপ্ত আচরণে, যাদের কৃতকীর্ত্তি সত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত, সেবার দীনতায় শোভন এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে চরিতার্থ।

কর্ম্মের পথে ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্য কর্ম্মযোগী চান বিধাতার কৃপা। বশিষ্ঠ প্রার্থনা করছেন :—

যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ।
ঋগ্বেদ ৭।৮৯।৫

হে দেবতা বরুণ! তুমি চির করুণ, আকাশের মত চির সমুদার, যে কিছু দ্রোহ করি, যে কিছু পাপে পড়ি দেবজীবনের মহিমার পথ হতে যে কিছু স্খলন—সবই তুমি ক্ষমা কর। হে অনন্তমহিমাময়, চেতনার অভাবে, অবহেলায় যে পাপাচরণ করি, ধর্ম্মের অন্যথা করি, তোমার

ধর্ম্মপথ থেকে অনৃতে চলি, সে সব পাপের জন্য তুমি আমাদের হিংসা করিও না।

কর্ম্মচঞ্চল জীবনের জয়গান কিন্তু বেদের সব কথা নয়। বৈদিক ঋষি অনুভব করেছিলেন—

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ আছে তার মাঝখানে।

তাই তাঁহারা জীবনে সর্ব্বত্র অমৃতের আবির্ভাব চেয়েছিলেন, সুন্দরের প্রকাশ দেখেছিলেন এবং শ্রী ও কল্যাণে বিভূতি স্পর্শ করেছিলেন—সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে এই জগতের সুষমা ও মাধুর্য্য উপভোগ করতে চেয়েছিলেন—

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈতনূভ্যঃ।
সংচেদং বি চ পশ্যেম। ঋগ্বেদ ১০।১৫৮।৪

আমার চোখে দাও জ্যোতি, দাও দৃষ্টি সকল অঙ্গে—আমি দেখব এই পৃথিবীর রূপশোভা—দেখব বিশেষ করে—ব্যক্ত করে ও বিশদ করে।

তাই বাতাসকে তারা বলেছিলেন :—

যদদো বাত তে গৃহে অমৃতস্য নিধিহিতঃ।
ততো নো দেহি জীবসে।

হে বায়ু, তোমার গেহে রয়েছে সুধাকলস—তার সঞ্জীবন শক্তি দাও আমার—আমি বাঁচব।

কিন্তু হাস্য ও গানের উল্লাসের পিছনে তাঁরা চেয়েছিলেন একটী মিলনের বন্ধন—যে আগমসূত্র মানুষকে প্রতিনিয়ত এই আনন্দানুভূতিতে ডুবিয়ে রাখবে। এই কর্ম্মযোগের কৌশল—সংক্ষিপ্ত নাম যজ্ঞ জীবন।

বৈদিক কর্ম্মবাদ বুঝতে হলে যজ্ঞের এই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কথাটি, কর্ম্মের এই রহস্য জানতে হবে। গীতায় পার্থসারথি সুন্দর ও সরল ভাষায় যজ্ঞের এই মর্ম্ম কথাটি অভিব্যক্ত করেছেন—তিনি যা বলেছেন তার সারকথা হল কর্ম্মের বন্ধন তখনই বেদনাদায়ক, যখন তা স্বার্থবোধে উদ্দীপ্ত—বিশ্বাত্মবোধে যে কর্ম্ম, সে কর্ম্ম সত্য ও সুন্দর—সে কর্ম্ম ভাগবত কর্ম্ম—সেই কাজই যজ্ঞ।

জীব যা, শিব তাই। প্রতি জীবের অন্তরে জাগেন সেই পরম দেবতা। জীবাত্মা বা পরমাত্মার সেই যোগ এই যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি মানুষের মাঝে রয়েছে যে অনন্ত সম্ভাবনা, তা তপস্যায় শুদ্ধ হয়, সাধনায় দীপ্ত হয় এবং অবশেষে মানুষের মাঝেই সচ্চিদানন্দকে প্রস্ফুট করে দেয়।

জীবনে জড়িয়ে থাকে আবিলতা, তাইত সেই পরম চৈতন্যের স্পর্শ পাই না—সেই সত্যস্বরূপ, সেই আনন্দময় আছেন আড়ালে, কর্ম্মের মাঝে, যজ্ঞের মাঝে তিনি আপনাকে প্রকাশ করবেন। যে কর্ম্ম বাসনায় পঙ্কিল, যে কর্ম্ম প্রতিবন্ধক, যে কর্ম্ম নিষ্কাম, কামসংকল্প বর্জ্জিত সেই কর্ম্ম মানুষকে ধীরে ধীরে দিব্য চেতনার মাঝে নিয়ে যায়—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পথ মুক্ত করে—কর্ত্তব্য-বুদ্ধিসঞ্জাত ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্ম বাসনা দগ্ধ করে—নির্ব্বাসনা তখন মানুষকে পরমানন্দে মগ্ন করে।

এই নিষ্কাম কর্ম্মই যজ্ঞ—এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় ! মুক্ত সঙ্গ সমাচর। গীতা ৩।৯

হে পার্থ ! যে কর্ম্ম যজ্ঞের জন্য নয়, সে কর্ম্ম এই লোকে বন্ধন আনে, অতএব অনাসক্ত চিত্তে তুমি যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর। কামনা অন্তরায়, কর্ম্ম নহে। কর্ম্ম করতে হবে, কিন্তু কামনার উদ্বেল আবেগে নয়, ঈশ্বরনিবেদিত ত্যাগ বুদ্ধিতে কাজ করতে হবে।

যে কর্ম্ম আত্মকরণে কৃত—সেই স্বার্থ কুটিল কর্ম্ম—পাপ—তার পরিবর্ত্ত যজ্ঞ—সে কর্ম্ম ত্যাগে উদ্দীপ্ত, পরোপকারে কৃত—জগতের যজ্ঞ চক্র চালাবার উদ্দেশে কৃত। ত্যাগাত্মক কর্ম্মই তাই অবন্ধন—সে যজ্ঞকর্ম্ম মানুষকে উচ্চতম ও মহত্তম পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। যজ্ঞ ত্যাগ, বিসর্জ্জন, আত্মদান।

এই বিশ্বজগৎ এসেছে সেই পরম পুরুষের আত্মদানে। বিশ্ব তাঁর বিসৃষ্টি, সেই মহাত্মাবদানই আমাদের কর্ম্মের নিয়ন্তা ও আদর্শ। পুরুষসূক্তে আছে :—

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০।৯০।৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং যাতমগ্রতঃ।
তেনা দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে। ১০।৯০।৭

দেবতারা যখন সেই পরম পুরুষকে হব্য প্রদান করে' যজ্ঞ করেন, তখন সেই মহাযজ্ঞে বসন্ত ঋতু ঘৃতস্বরূপ

হয়েছিল—গ্রীষ্ম হয়েছিল হর্বিকাষ্ঠ আর শরৎ হবি। সেই নারায়ণ যিনি অগ্রজন্মা, সকলের পূর্বেই যিনি জাত, তাকে যজ্ঞের অনলে পশুর মত আহুতি দিয়ে ঋষিগণ ও সাধ্যগণ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

পরম পুরুষের এই আত্মবিসর্জ্জনেই বিশ্বজগতের উদ্ভব—এই বিসর্জ্জন ও ত্যাগের মাঝে দিয়েই পথভোলা গৃহহারা মানুষ আবার তার অমৃতনিধি ফিরে পাবে—তাই যজ্ঞের আয়োজন। তাই যজ্ঞের প্রয়োজন। বিশ্বজগতের পরিপালনের জন্য এই মহৎ যজ্ঞ চলছে—দান ও প্রদানের মাঝে গ্রহণ ও ত্যাগের পথেই জগতের স্থিতি—তাই লোকসংগ্রহের জন্য যজ্ঞচক্র প্রবাহিত রাখতে হবে—এই যজ্ঞার্থই ধর্ম্মরীতি-বেদের প্রতিপাদ্য বক্তব্য। গীতা এই বেদের রহস্যকে সরল ও সুন্দর করেছেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

★

কন্যাকুমারীকে

বারীন্দ্রনাথ মিত্র

মন-সাগরের বন্দর আজ পূর্ণ
করুণ-কোমল তোমার চরণ প্রান্তে;
ওরা এনে দিল অনেক বোঝায় শূন্য—
কন্যাকুমারী জানতে তুমি কি জানতে?

শিশিরের মত তোমার কোরক বক্ষে
আকাশের মত আমিও ছিলাম লগ্ন।
অবাক তবাক ঘুমে ঢ'লে পড়া চক্ষে
কন্যাকুমারী, তুমি কি তখন মগ্ন?

হয়ত বা তুমি সন্ধ্যাবেলার পান্থ—
বাঁকা জীবনের চাবুকের দাগ ললাটে;
চাঁদ কোলে করা আকাশ যখন শ্রান্ত
ব্ল্যাকবোর্ড কালো তোমার জীবন মলাটে।

হোতে পারো তুমি কন্যাকুমারী কন্যা
রাতের ক্লাসের অর্থনীতির ছাত্রী;
খাতার সাগরে 'নোট' ছোটে যেন বন্যা
তবু সে আমার মনের বিশ্বধাত্রী।

বামহাতে তার অমৃত সুধার পাত্র
ডানহাতে তার অভয় মধুর শঙ্খ।
পায়ে ভাঙ্গে ঢেউ মূর্চ্ছিত দিনরাত্র
কন্যাকুমারী, তুমি আছ নিঃশঙ্ক।

সবুজ দ্বীপ

পরিমলকুমার ঘোষ

কতোবার, আহা, কতোবার এই ফেরারি জীবনপথে
দিয়েছো স্পর্শ, অশ্রেয় জীবন কণার পাত্র হাতে
এসেছো; কতোনা আশাজর্জর হতাশানিবিড় রাতে
এনেছো স্বপ্ন উজ্জীবনীর আশামন্দ্রিত রথে।
স্তিমিত নদীতে ভরা শ্রাবণের কামনার আশ্লেষে
এসেছে জোয়ার। খরযৌবন উপলকে গেছে ভুলে।
ঊষর তটের মরুভূমি জুড়ে সবুজের ঝড় তুলে
হৃদয় তখন কলকল্লোলে কী সুদূরে গেছে ভেসে।
আজো তো সুদূর কতো বিদিশার জাগর নিশার নেই
সুর জেগে আছে। এখনও স্মৃতির নির্জন নীল জলে
কতো কামনার দ্বীপ গড়ে, আর ভেঙ্গে ফেলে। অহো কোন্
আশায় বা বলো সাজাবো বাসর? জানিতো আজ আর নেই
উতলরাত্রে তোমার পায়ের লঘুমঞ্জীর সুর
শিশিরের ঠোঁটে ঠোঁট রাখা ম্লান বিবর্ণ ঘাসফুলে।
যতো চাই জানি আনবেনা আর কালের ঘোমটা খুলে
তুমি বলো তবে ক্লান্তির ঢেউয়ে একরে কি হবে দূর
সেই সুদূরের বাণী-উন্মন গানের সীমিত রেশ?
সাড় দেবে না কি? এতোটুকু ছোঁয়া দেবে না কি দিশাহীন
নাবিকের পালে? জানি তা দেবেনা ফুরিয়েছে সব দিন,
অচিন সাগরে তবু খুঁজে ফিরি সবুজ ঘাসের দেশ॥

ধর্ম্মঘট

শ্রীমন্মথ রায়

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গিয়া যখন পুনরায় আলোকিত হইল, তখন দেখা গেল, হুমড়া বেদের দল পালাগানে বর্ণিত সাজ-সজ্জা লইয়া খেলা দেখাইতে যাইতেছে লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের মাধ্যমে।]

—পালাগান—

হুমড়া বাইন্তা ডাক দিয়া বলে মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
ধনু কাড়ি লইয়া চল তামসা করতে যাই ॥
যখন নাকি হুমড়া বাইন্তা ভুলে মাইলো বাড়ী।
নম্বাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি ॥
একজনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক জনের ঠাঁই।
ঠাকুর বাড়ী বাইন্তার তামসা চল দেইখ্যা আই ॥

*   *   *

যখন নাকি বাইন্তার ছেরি বাশে মাইলো লাড়া।
বইস্তা আছিল নম্বার ঠাকুর উঠ্যা অৈল খাড়া ॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে।
নইন্তার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে ॥
করতালের রুমুঝুমু ভুলে মাইলো তালি।
গান করতে আইলাম আমরা নম্বা ঠাকুরের বাড়ী ॥

[নৃত্য-গীত শেষ হইল। মহুয়া যাদুকরী মূর্ত্তিতে নদেরচাঁদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে করযোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল হুমড়া বেদে।]

বাজী করলাম তামসা করলাম ইনাম বক্সিস চাই।
মনে বলে নম্বার ঠাকুর মন যেন তার পাই ॥
হাজার টেকার শাল দিল আরো টেকা কড়ি।
বসত করতে হুমড়া বাইন্তা চাইল একখান বাড়ী ॥
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর‍্যা খাইও।
নতুন বাড়ীতে খাইয়া তোমরা সুখে নিদ্রা যাইও ॥

[বেদের দল আনন্দচিত্তে নৃত্য-গীত সহকারে চলিয়া গেল। মহুয়া ছিল সর্ব্বপশ্চাতে। নদের চাঁদ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিল। মহুয়া দাঁড়াইল।]

নদের চাঁদ—

শুন শুন কইন্তা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক ॥
সন্ধ্যা বেলায় চান্নি উঠে সুরুয বইসে পাটে।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে ॥
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাক্ষে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি ॥

মহুয়া। সাপ খেলা দেইখবে গো—আইসো—আইসো—

[মহুয়া রহস্যময় ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া ছুটিয়া পালাইল। নদেরচাঁদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

কলসী করিয়া কাক্ষে মহুয়া যায় জলে।
নম্বার চান ঘাটে গেল সেইনা সন্ধ্যাকালে ॥

[মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, জলভরা কলসী কাঁখে মহুয়া ও তাহার সম্মুখে নদেরচাঁদ দাঁড়াইয়া আছে।]

নদের চাঁদ—

জল ভর সুন্দরী কইন্তা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্তা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্ব্বে ছিলি কোথা ॥

মহুয়া—

নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্তা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইন্তার সঙ্গে ঘুরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥

এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা।
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া॥

নদের চাঁদ—

কইন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া॥

মহুয়া—

কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ॥
কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া॥

নদের চাঁদ—

কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া॥

মহুয়া—

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥

নদের চাঁদ—

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি॥

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

একজন হয় গহীন্ গাঙ—আর একজন তাতে ডুইব্যা মরে। এইসব কথা কি কখনও ছিপা থাকে? এককান থাইকা পাঁচ কান হয়। তাবে হুমড়া বাইত্তাও খবরটা পায়। পাইয়া ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া তার দোস্ত মাইন্-কিয়ারে ডাইক্যা কয়—

শুন শুন মাণিক ভাইরে বলি যে তোমাই।
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই॥
কি করবো ভাই বাড়ী ঘরে খাইবাম ভিক্ষা মাগে।
আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে॥

তখন সেই বাইদ্যার দল—

বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইদ্যার দল আইন্ধ্যারিয়া নিশিতে।

যখন নাকি নদ্যার ঠাকুর এই কথা শুনিল।
বাইদ্যার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল।
কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন।
বাদ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর ভরমে তিরভুবন

[খুঁজতে খুঁজতে গহন বনে মহুয়ার সন্ধান পেল নদের ঠাকুর। প্রেমের হলো জয় মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে মহুয়া তার প্রাণপতি নদেরচাঁদের হাত ধরে বেদের দল থেকে পালিয়ে গেল দূরে…দূরে…বহুদূরে! কতো আপদ, কতো বিপদ—সব কিছু কাটিয়ে তারা নবদম্পতি হয়ে যখন স্বর্গ-সুখে বাস করছিল, তখন অকস্মাৎ একদিন—]

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

পালাগান—

চৌদিকে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর।
সন্ধান করিয়া বাদ্যা আইল এত দুর॥
সামনেতে হুমরা বাদ্যা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা॥

[মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা গেল, নদেরচাঁদ ও মহুয়ার সামনে সদলবলে হুমড়া দাঁড়াইয়া আছে। হুমড়ার হাতে শাণিত ছুরিকা।]

হুমড়া প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার॥
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ

মহুয়া কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি
কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে মারিয়া।
তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া॥
আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ যাঙ্কা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জোনি যেমন জ্বলে॥
সোনার তরুয়া বন্ধু একবার দেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ॥

[হুমড়া গর্জিয়া উঠিয়া বিষলক্ষের ছুরি মহুয়ার হাতে দেয়। মহুয়া সেই ছুরি লইয়া একবার সঙ্গী পালংকের দিকে চাহিল, পরে নদেরচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল—

মহুয়া। শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে॥
শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেথা॥
শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়॥
ছুট কালে মা বাপের কুল শুন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরেছিলে চুরি॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্ম্ম দোষে এতদিনে প্রাণ মোর যায়॥

[মহুয়ার নিজের বক্ষে ছুরিকা আঘাত ও পতন। হুমড়ার আদেশে বেদের দল কর্ত্তৃক নদেরচাঁদের প্রাণবধ।]

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে লালমিঞার কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—

লালমিঞা। আলো—আলো—শীগ্‌গীর আলো—আমার কপালে লেগেছে।

[মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, লালমিঞা হুমড়ার দলের অস্ত্রাঘাতে সত্য সত্যই আহত হইয়াছে এবং তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে হাত দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল।]

লালমিঞা। কণক, এ তোমাদের কি কাণ্ড? আমার কপালটা কেটে ফেলেছো?

(সকলে ছুটিয়া আসিল)

একজন। তাই তো।

২য় জন। উঃ, কী ভীষণ রক্ত পড়ছে!

মায়া। আপনাদের কী কাণ্ড বলুন তো! প্লে করতে এসে মানুষ খুন করে ফেললেন!

(এমন সময়ে দীনবন্ধু, লোহারাম ও নটবর উইংস্-পথে সেখানে ছুটিয়া আসিল। দীনবন্ধুর হাতে পোর্টফলিও ও ওয়াটারপ্রুফ)

দীনবন্ধু। কপাল কেটে গেছে দেখছি—First Aid! First Aid!

লোহারাম। গোস্বামী—First Aid—

নটবর। yes Sir! আসুন লালমিঞা।

লালমিঞা। কিন্তু আপনারা—এখন—এখানে!

দীনবন্ধু। প্লের পর আমাদের তো এখানে একটা সভা হবে কথা ছিল। এসে দেখি, তোমাদের শেষ দৃশ্য প্লে হচ্ছে। চমৎকার লাগছিলো। কিন্তু তোমাদের প্লেটা যে এতো মারাত্মক রকম ভালো হ'বে—এতো ভাবতে পারি নি। থাক্, তুমি আর দেরী করো না। গোস্বামী, তুমি একে এখনি ডিস্‌পেন্সারীতে নিয়ে যাও।

নটবর। হ্যাঁ স্যার। (লালমিঞাকে) আপনি আসুন। ডক্তোরের আবার বাড়ী চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

লালমিঞা। না না, এতো ঘাবড়াবার কিছু হয়নি।

লোহারাম। বিলক্ষণ! ঘাবড়াবার ব্যাপার নয়? বিবেচনা কর, সেপ্‌টিক্ হয়ে যেতে পারেতো!

মায়া। তুমি একা যাবে লালু দা?

লালমিঞা। (হাসিয়া) আরে না না, তোমাদের ব্যস্ত হবার মতো কিছুই হয় নি। আমি একাই যাচ্ছি। তোমরা এখনি ষ্টেজটা খালি করে দাও, মিটিং হবে। দেখছো না, ওঁরা সব এসে পড়েছেন। (নটবরকে) না, না, আপনাকেও আসতে হবে না। আপনি পোষাক-টোষাকগুলো kindly বুঝে নিয়ে তুলে রাখুন।

লালমিঞার প্রস্থান।

দীনবন্ধু। (মায়ার প্রতি) তুমি এতো ভালো অভিনয় করতে শিখলে কোত্থেকে?

মায়া। (নমস্কার করিয়া) যদি ভালো করে থাকি, সে প্রশংসা লালুদার প্রাপ্য। আর যদি খারাপ হয়ে থাকে সে দোষটা আমার।

দীনবন্ধু। আমি যেটুকু দেখছি, খুবই ভালো লাগলো। নাঃ, সবাই সত্যি খুবই ভালো করেছে।

(নটবর ইতিমধ্যে পার্শ্বকক্ষ হইতে দুইখানি চেয়ার আনিয়া হাজির করিয়াছে)।

নটবর। বসুন স্যার। আমি মিটিং-এর এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। (অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দকে) আসুন, আসুন, আপনারা সব ষ্টেজ থেকে সরে আসুন। এটাকে এখনি মিটিংএর জায়গা করতে হবে। লণ্ঠন,

লণ্ঠন—আঃ, কোথায় যে সব থাকে। সব কাজ এক আমাকে করতে হবে।

(নটবর পার্শ্বকক্ষে চলিয়া গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রী-বৃন্দ তাহাকে অনুগমন করিল। মায়াও চলিয়া যাইতে ছিল, এমন সময়ে দীনবন্ধু তাহাকে ডাকিল)।

দীনবন্ধু। (মায়াকে) শোন, শোন,—তুমি এত ভাল অভিনয় করতে শিখলে কোত্থেকে?

মায়া। লালুদা শিখিয়েছে।

লণ্ঠনের প্রবেশ

লণ্ঠন। মায়াদি—কে?

মায়া। আমি। কেন?

লণ্ঠন। আপনার মার শূল-বেদনা হয়েছে। আপনাকে এখনি বাড়ী যেতে বলেছেন।

মায়া। শূল-বেদনা হয়েছে? কে বললে?

লণ্ঠন। পাড়ার কেউ হবে। আমি নতুন লোক,—চিনি না। নাম বললো আবদুল।

মায়া। আবদুল। ইব্রাহিম কাকার শালা। কোথায় সে?

লণ্ঠন। যখন এসেছিল, তখন প্লে হচ্ছিল। বলে গেল প্লে ভাঙলেই আপনাকে চলে যেতে। বললো, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

মায়া। আমি যাই।

[মায়া যাইতে গিয়া পোষাকের কথা মনে পড়ায় পার্শ্বকক্ষের দিকে ফিরিল।]

দীনবন্ধু। দাঁড়াও, দাঁড়াও (লণ্ঠনকে) ওহে ছোকরা, কোথায় থাক? গোস্বামীবাবু একা একা খেটে মরছেন। যাও, ভেতরে তাঁর কাছে যাও।

লণ্ঠন এই তাড়াতে ভিতরে পালাইল।

দীনবন্ধু। কলিক্‌পেন উঠেছে তোমার মার। তা এক কাজ কর। আমার গাড়ী রয়েছে,—তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে?

মায়া। তাহ'লে খুব ভাল হয়। সাজ-সজ্জা ছাড়তে রঙ তুলতে অনেক দেরী লাগবে। গাড়ীটা পেলে আমি এসব নিয়েই বাড়ী ছুটতে পারি।

দীনবন্ধু। নিশ্চয়, নিশ্চয়—এখনি। (লোহারামকে ইঙ্গিত) দাস, তুমি ড্রাইভারকে বলে দিয়ে এসো

মায়া। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লোহারামের সহিত মায়ার প্রস্থান।

[দীনবন্ধু চেয়ারে বসিলেন এবং পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহা ধরাইলেন। অদূরে সমবেত কণ্ঠে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি শোনা গেল। ছুটিয়া লোহারামের প্রবেশ।]

লোহারাম। স্যার, মিটিং ভেঙেছে—ওরা সব এসেছে। বিবেচনা করুন,—আমাদের আর একটু দেরী হলেই সব ভেস্তে যেতো।

দীনবন্ধু। গাড়ীটা আশা করি ওদের পথে পড়বে না।

লোহারাম। না স্যার।

[নেপথ্যে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি শোনা গেল। জনার্দ্দন ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।]

জনার্দ্দন। মিটিংটা শেষ হতে আমাদের একটু দেরী হয়ে গেল। আপনি হয়তো অপেক্ষা করছেন।

দীনবন্ধু। (হাতঘড়ি দেখিয়া) তা' করছি বটে, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতি হয়নি। ছেলে-মেয়েদের পালাগানের শেষ দৃশ্যটা দেখছিলাম। সত্যি, ওরা বেশ করে। কিন্তু তোমরা মাত্র দু'জন এলে? আর সব।

ইব্রাহিম। আমাদের দু'জনকেই তারা প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।

দীনবন্ধু। বেশ, বেশ। (জনার্দ্দনকে) হিন্দুদের প্রতিনিধি বুঝি আপনি? (ইব্রাহিমকে) আর মুসলমানের প্রতিনিধি বুঝি আপনি?

জনার্দ্দন। না, না, হিন্দু মুসলমান হিসেবে আমরা আসিনি। খেটে-খাওয়া মজুরের কি আর কোন জাত আছে? ও মজুর—মজুর।

ইব্রাহিম। দুনিয়ায় দুটো মাত্র জাত আছে স্যার। শ্রমিক—আমরা, আর ধনিক—আপনারা। এ ছাড়া আর কোন জাত নেই।

দীনবন্ধু। (হাসিয়া) ওহে আমরাও শ্রমিক—খেটেই খেতে হয়। বেশ, বেশ। কিন্তু জাতিতত্ত্বের কথা ছেড়ে

এখন মিটিং-এ কী সিদ্ধান্ত হলো, সেইটেই আমি জানবার জন্যে উৎসক।

জনার্দ্দন। বাড়তি মজুরী না পেলে বাড়তি কাজ আমরা করবো না।

দীনবন্ধু। তাহ'লে ছাঁটাই অনিবার্য্য।

ইব্রাহিম। না, তাও চলবে না। তা আমরা সইবো না।

জনার্দ্দন। একজন লোকও যদি ছাঁটাই হয়, তাহ'লে আমরা ধর্ম্মঘট করবো।

দীনবন্ধু। (হাসিয়া) বেশ! এ সব সিদ্ধান্ত তোমরা সব দিক ভেবে-চিন্তেই করেছো, আশা করি।

জনার্দ্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা ভেবে দেখেছি যে, গুদামে যখন ছাতা অনেক জমেই রয়েছে, তখন তো আর পুরো কাজ করবার কোম্পানীর দরকার নেই। কাজেই হপ্তায় ৪৫ ঘণ্টার মধ্যে কোম্পানী অর্ডারী লাঠি তৈরী করে নিতে পারবে।

দীনবন্ধু। পারে কি না পারে, সেটা বোধ হয় আমরাই বেশী বুঝি। বেশ, তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের বোর্ডের মিটিং-এ কালই পেশ করবো এবং আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের জানতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে,—আমি উঠি। আমাকে আবার এই রাত্রেই কলকাতায় ছুটতে হবে।

ইব্রাহিম। আপনার মোটরটা চলে গেল দেখে আমরা ভাবছিলাম, আমাদের দেরী দেখে আপনি বোধ হয় চলেই গেলেন।

দীনবন্ধু। (হাসিয়া) সিদ্ধান্তটা না জেনে কী করে যাই? মোটরটা পেট্রোল আনতে গেছে।

ইব্রাহিম। আপনাদের সিদ্ধান্তটা আমরা কবে জানতে পারবো?

দীনবন্ধু। পরশু। আজ একটু রিহার্স্যাল দেখে আমি এতো খুসী হয়েছি যে, পরশু ছেলে-মেয়েদের পালা-গান শুনতে আমি নিজেই আসছি। এরা করলো বেশ, কিন্তু বিষয়টা বড় সেকেলে। বেদের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ে হলো না,—অথচ উভয়েই পরস্পরকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আজকালকার দিনে এটা অচল—নয় কি? রিহার্স্যাল দেখতে দেখতে দাসসাহেবই বলছিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে কিম্বা হয়েই গেছে।

জনার্দ্দন। কই না তো।

লোহারাম। বিবেচনা করুন, আমি কানাঘুষা যা শুনেছি, তাই বলছি স্যার।

জনার্দ্দন। আমি প্রতিবাদ করছি। এ রকম কোন কথা হয়নি, হ'তে পারে না। ইব্রাহিম তুমিই বল।

ইব্রাহিম। না, এ সব কথা মিথ্যা। একসঙ্গে ওরা খেলাধূলা করেছে, মানুষ হয়েছে। মেলামেশাতে তাই ওদের কোনো বাধা নেই।

দীনবন্ধু। তাই বল। আমিও ভাবছিলুম, এ কী হতে পারে!

[এমন সময়ে মোটর পৌঁছিবার শব্দ শোনা গেল।]

লোহারাম। ওই গাড়ী এসে গেছে।

(গাড়ীর শব্দ শুনিয়া লঙ্ঠন ও নটবর ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল)।

লোহারাম। (লণ্ঠনকে) সাহেবের জিনিষগুলো গাড়ীতে তুলে দে।

(চেয়ারে রক্ষিত ওয়াটারপ্রুফ ও পোর্টফোলিও লণ্ঠন তুলিয়া লইল)।

দীনবন্ধু। (জনার্দ্দনকে) তোমার স্ত্রীর খুব অসুখ শুনে গেলাম। কলিক্ পেন্ হলেও অবহেলা করা ভাল নয়। ডাক্তার দেখিও। আচ্ছা চলি।

জনার্দ্দন। আমার স্ত্রীর কলিক্ পেন্? কই না। কে বললো?

দীনবন্ধু। এই ছেলেটা এসে তোমার মেয়েকে খবর দিতেই তোমার মেয়ে ছুটে বাড়ী চলে গেল।

জনার্দ্দন। (লণ্ঠনকে) তোকে কে বললে?

লণ্ঠন। প্লের সময় একটা লোক এসে মায়াদিকে নিজে বলতে না পেরে আমাকে বলে গেল। নাম বললো আবদুল।

ইব্রাহিম। আমার শালা!

জনার্দ্দন। আমার স্ত্রীর কলিক্ পেন্? কোনো-কালে তো ছিল না।

দীনবন্ধু। হয়নি—হ'তে কতক্ষণ। কলিক্ পেনের কথা বলা যায় না। না, আজ দিনটাই খারাপ। তোমার মেয়ে তো এই খবরে পাগল হয়ে বাড়ী ছুটলো। তুমিও যাও—আর দেরী করো না—দ্যাখ গিয়ে কি হলো।

জনার্দ্দন। কলিক্ পেন্! ইব্রাহিম, আমি যাই তাহ'লে তুমি থাকো—কথাবার্ত্তা শেষ করে নাও।

ইব্রাহিম। চলুন—আমিও যাই।

জনার্দ্দন। তুমি এখানকার কাজ শেষ করেই এসো।

[জনার্দ্দনের প্রস্থান]

দীনবন্ধু। নাঃ! আজকের দিনটাই খারাপ। তোমার ছেলেও তো আবার কপাল কেটে গেছে বলে দৌড়োলো ডাক্তারের কাছে।

ইব্রাহিম। আমার ছেলে—হাল? কপাল কেটে গেছে তার?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ, এইতো রিহার্সাল দিতে দিতে কি করে কাটলো—সে রক্ত-টক্ত বার হয়ে—তুমিই বা আর থেকে কি করবে? যাও দেখ—

ইব্রাহিম। কপাল কাটলো—আচ্ছা, আমি যাই দেখি আবার।

[ইব্রাহিমের প্রস্থান]

দীনবন্ধু। (লোহারামের দিকে তাকাইয়া ও ইউনিয়নের চিঠি পড়িতে পড়িতে) কী দাস ওরা ধর্ম্মঘট করবেই? আচ্ছা করুক। (পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া টানিতে লাগিল)।

★

হিমছায়া

মানস রায় চৌধুরী

যতোদূরে সরে যাই, সেই ছায়া পিছু পিছু ঘোরে,
শীর্ণশীত দুই বাহু মেলে ধ'রে, বিষণ্ণ প্রহরে .
আকাশে ছড়ায় হিম। চুপে চুপে পালাতে গেলেই
আবার সামনে দেখি সেই ভয়, পীত ছায়া। অন্য কিছু নেই।

কে যেন নিভিয়ে দিলো মাঠে মাঠে আকাঙ্ক্ষার আলো,
হাওয়ার তীক্ষ্ণ হাতে বনে বনে যন্ত্রণা ছড়ালো;
কই রৌদ্র, যাদুকর সেই সূর্য কই এ আকাশে,
আলোর উত্তাপ আর প্রাণের সংকেত কই বিকালের ঘাসে?

মনে ভাবি, বাঁচাবোই হৃদয়ের নীল করতালি,
টানাবো স্বর্ণাভ জাল, যাতে কালো কুয়াশার কালি
না মাখে এই আকাশ। জ্বলে গান বসন্তবাহার,
—সহসা স্বপ্ন ভাঙে, মনের শার্সিতে ঐ ছায়া কাঁপে,...কার?

দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

৭ই জুলাই ১৯৩১। স্থান—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।

তখনও রাত্রি শেষের শান্ত নীরবতার মাঝে অবসন্ন ম্লান শেষ তারকাটীর প্রাণস্পন্দন ধুক্ ধুক্ কচ্ছে। চোখে তার শেষ নিমেষ করুণ হয়ে আসছে। অপাস্রিয়মাণা রজনীর মন্থরতা ব্যর্থ করে, তার স্নেহাবরণ ভেদ করে, নিষ্ঠুর প্রভাত রশ্মি তার রক্তলোলুপ রসনা-দশনাবলী তখনও পৃথিবীর দিকে প্রসারিত করেনি। এমন সময় কারাগারের সান্ত্রীদের পদক্ষেপ ধ্বনি, সুদূর হতে অদূরে, স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। কারাগারের লৌহ-কপাটের উপর লোহের মতই কঠিন করাঘাত শোনা গেল। ফাঁসির মঞ্চে নরমেধের আয়োজন প্রস্তুত। বাংলার বীর সন্তান প্রস্তুত হয়েই ছিল। দীনেশ প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে, তা'র অনমনীয় শির, জননী জন্মভূমির দক্ষিণ হস্তে মূর্দ্ধাভিষেক লাভ ক'রে, তাঁর বেদীর তলে লুটিয়ে দেবার জন্য সানন্দে মুহূর্ত গণনা কচ্ছিল। হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হল। রুদ্ধ দ্বার কারাকক্ষগুলির অভ্যন্তর হতে যজ্ঞাহুতির মন্ত্রপাঠের মত, দেশমাতৃকার নান্দীবচনের মত দেশভক্তের জয়ধ্বনির মত ধ্বনি উঠল— "বন্দে মাতরম্"। প্রভাত বিহঙ্গমের কলধ্বনি তার প্রতিধ্বনি তুলল। কিশোর বীর উন্নত ললাটে ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের উপর আরোহণ করে ফাঁসির দড়ি পুষ্পমাল্যের মত স্বহস্তে গলায় পরল।

৫ই জুলাই ১৯৩১, দীনেশ তাঁর মাকে যে শেষ পত্রখানি লেখেন, তা'র মর্মাবলম্বনে এবং তারই উদ্দীপনায় কবিতাটী পরিকল্পিত।

মা! আসবে জানি কালকে ভোরে
তবুও মা আজকে তোরে
আগেই লিখে জানাই প্রাণের বেদনা—
(আমার) এই কথাটী মনে রেখো—
আমার তরে কেঁদো না।
এই যে পরের পদানত
দেশের ছেলে কত শত
শহীদ হল এই ভারতে
তাদের তরে কেঁদো মা
লুকিয়ে গেলে অশ্রুবারি
পাষাণে বুক বেঁধো মা।
হয়তো তুমি কাঁদছো পড়ে
ধুলায়, করে প্রণতি
দুহাত জুড়ে ঠাকুর ঘরে
কাতর সুরে মিনতি—
"প্রভু তোমার পাষাণ-হৃদয়
কৃপার কণা নেই দয়াময়!
নইলে আমার দুখের ছেলে
বাঁচতে সে কি পারতো না?
নিঠুর তুমি, কঠোর তুমি
তাইতো আসন, টলল না—!
(ওগো) আমার হৃদয় চূর্ণ হল
(তবু) তোমার হৃদয় গল্‌ল না।
বাছা আমার ব্যাধের ফাঁদে
বজ্র হেন বাঁধন বাঁধে
আমার হৃদয় আর্তনাদে
বাছার আমার অস্থি চূর
তোমার কানে পৌঁছে না কি
মিথ্যা কাঁদি, হায় নিঠুর!"
ভগবান কি জানিনে মা—
জানতে কভু পারবো না,—
বক্ষে হেঁটে তাঁর সমীপে
হাঁটে যেমন সরীসৃপে
কোমর-ভাঙা 'দ'-য়ের মত
ধুলায় মাথা পাতবো না।
আর্ত হয়ে মৃত্যুমুখে
কৃপার কণা চাইবো না।
কিন্তু তবু এই কথাটা স্পষ্ট আমার মনে লয়—
তোমার আমার হয় তো তাতে একটু কিছু কষ্ট হয়
সৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টি ভরা
সুশৃঙ্খলে বসুন্ধরা
লালন-পরিপালন করি
চালন করি সর্বদা—
ঢালেন তাঁর স্নেহের ধারা
সিন্ধু হতে নর্মদা।
বিচারে তাঁর চুলটী চেরা
ভুলটী নাহি এক তোলা

তাঁহার ধর্মাধিকরণের
নিত্য কালই দ্বার খোলা—
ইতিহাসের পাতায় পাতায়
লেখা চিরকালের খাতায়—
পূর্ণ সে যে ন্যায়পরতায়
হায় রে মানুষ মন ভোলা!
মিথ্যার মরীচিকার আশা
মন-দোলানো হিন্দোলা।

প্রাণ, সে তো তাঁর অনন্ত দান—
নয়তো শ্বাসে নিঃশ্বাসে,—
নাকের হাওয়া ফুরিয়ে গেলেও
হারিও না মা বিশ্বাসে।

তাঁহার পায়ে পাতবো মাথা
শঙ্কাতে নয়, সন্তোষে—
তাই ভালো যা' তাঁহার ভালো
তাঁহার যাতে মন তোষে।

তিনি যারে পরান মালা
বিদ্যুতেরি বহ্নিতে
বজ্রাঘাতে বক্ষপাতে
হাস্যমুখে সঙ্গীতে।
দিন-দুনিয়ার মালিক তিনি
আমরা কি তার জানি চিনি?
দু'চার কড়ার বিকি কিনি
এই তো করি রাত্রি দিন—
সেই কানুনের কি জানি মা—
চালান যাতে ভুবন তিন?

মৃত্যুটারে মস্ত দেখি
সে মৃত্যু তো সত্য না—
সে-মৃত্যু সে হবেই হবে।

মরার ভয়ে মরবো না
দুদিন শুধু বাঁচার তরে—
খাঁচার ঘরে লোভ কিসে?
মুক্তি লাগি সবার তরে
মরার পরে ক্ষোভ কিসে?

মিথ্যা জুজু বুড়ীর ভয়ে
ভয় তরাসে ডরব না
মরার ভয়ে জ্যান্তে মরে
ধরণা কারো ধরব না।

ওই যে—
মৃত্যু হাসে মিত্র সম
আসছে যেন দুস্যি সে
হাসছে মুখে অট্ট হাসি—
রংটী কালো মিশ্‌মিশে।

তারিখ দিয়ে সমন দিয়ে—
—(আসছে না তো পিছন ফিরে—
চোরের মত)—এই জুলাইয়ে
আসছে সে তো শত্রু সে
কোল বাড়িয়ে আসছে সে যে
বলছে মুখে —মাভৈঃ—সে।

মরবো যবে, তরবো তবে,—দেখবে সবে কিসের ভয়!
হয় তো মৃত্যু—নয়তো মুক্তি,—নয়তো মৃত্যু মানেই জয়।
নিত্যকালের সেই কাহিনী
সেই তো দিল মন্ত্র বল
গীতার বাণী সেই রাগিণী
গাইবে কবি চারণ দল।

মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই
অনন্ত এ চলার পথে মধ্যে মাঝে নিদ্রা যাই
মৃত্যু আমার ঘুম সে পাড়ায়
মৃত্যু ঘুমের আপন ভাই।

সঙ্কটেরি আবর্তনে
নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জনে
হাস্য করি আপন মনে
কই সে মৃত্যু কোথায় ভয়?
এই জীবনের জয়ধ্বনি
জীবন-পণে মৃত্যু জয়।

তোমার বুকে দুধ খেয়েছি
তোমার হাতে ক্ষুদ কুঁড়া
ভয়কে আমি হারিয়েছি মা
হাড় যদি যা হয় গুঁড়া।

দুর্গমেরি কান্তারে কি সঙ্গহারা প্রান্তরে
মৃত্যুরে কে চিনতো বল; মৃত্যুরে কে জানত রে
হাস্য দিয়ে জয় করেছি
দৃষ্টি দিয়ে দিগ্বিজয়
হাস্য দিয়ে মন্ন করেছি
মৃত্যু হল হাস্যময়
উড়িয়ে দিছি এক তুড়িতে
ভানুমতীর মন্তরে

ঊর্ধ্বাকাশে প্রাণের পাখী
মুক্তি সুখে সন্তরে।
মৃত্যু যেদিন ক্লান্ত হলে—
তোমার কোলে স্নেহের চুম
চলতে সেথা টলবো না মা
পোঁছে দেবো লম্বা ঘুম—
তুমি সেথায় যাবে যবে—
আমার সঙ্গে দেখা হবে
আমায় ডেকে বল্‌বে তবে
"ওরে নন্দ!
রাত পোহালো
ঊষার আলো দেখ চেয়ে
উদয় হল বিভাবসু
ওরে নন্দ!
অরুণ আলো দেয় ছেয়ে।
দেখবো চেয়ে নূতন রবি
নূতন স্বাধীনতার ছবি
নান্দী গাথা চারণ কবি
বৈতালিকে যায় গেয়ে
(আমার) ভুবন মনমোহিনী মা'র
রূপে ভুবন যায় ছেয়ে।
(তখন) মরা ছেলের মায়ের দলে
সেই মায়েতে মিশবি তুই
'জয় মা' বলে ভূমণ্ডলে
(আমরা) কাঁপিয়ে দেবো আকাশ ভুঁই।

★

জীবন-স্বপ্ন

শ্রীকরুণাময় বসু

কানে শুনি সায়াহ্নের ভিজে কণ্ঠস্বর;
চড়াই, উৎরাই পথ ভেঙে ভেঙে এ-জীবন হয়েছে ধূসর।
রামধনু রঙ সব মুছে গেছে, হয়ে গেছে ম্লান,
হঠাৎ শুনিনু কানে কাজরীর ছলোছলো গান।
অসীম নেপথ্য হ'তে বাড়ালে কি হাত?—
পাঠালে অপার স্নেহ, মোহময় ফুলফোটা রাত।

ভিজে রাতে একা একা মন জেগে রয়,
আশ্চর্য চম্পক-মনে গন্ধ ভাসে, দূরে দিগ্বলয়।
আরতো পারিনে যেন ক্লান্ত হাতে দাঁড় টেনে চলা,
বৃত্তের কি শেষ নেই? গুনে গুনে কাটি কথা বলা,
ঘাড় গুঁজে প্রতিদিন কাজ করে যাওয়া,
কোথায় চন্দন দ্বীপ, কোথা আসে এত হাওয়া?
তিমি-র শিকার করা কোথা আছে তিমির সাগর?

চিত্রিত মোমের মত প্রাণহীন মর্মর নগর;
আমাদের মৃতদেহ, ফেলে যাব চলে
যেখানে সমুদ্র দেশে শুক্তি হ'তে মণি-মুক্তা ফলে।
আলোক লতার ডালে মণিময় জোনাকির ফুলে
হীরের লাবণ্য রঙ, মনে হয় সেই রঙ এঁকে রাখি মনের পুতুলে।

জ্বলন্ত তারার পুঞ্জ আকাশের প্রান্ত হতে টেনে ছিঁড়ে আনা
এই সব কাজ আমাদের, ক্লান্ত হাতে মরে মরে শুধু দাঁড় টানা,
ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিদিন, মনে মনে অশান্ত আক্ষেপ
আর তো লাগে না ভালো!—
আত্মার আকুতি আজঃ আলো, কোথা আলো?
উজ্জ্বল আলোর স্বপ্ন এনে দাও অন্ধকার জীবনের
পটভূমিকায় জ্যোতির্ময় ওগো সূর্যদেব!

কুয়াশা

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

আজ আর কেউ আসবে না। এই দুর্যোগ মাথায় করে আসবে কেমন করে? বিকেল হ'তে বৃষ্টি নেমেছে। সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার নেমে এসে ঘরখানাকে বিষণ্ণ আর বিশ্রী ভারী করে তুলেছে। শীতের দিনের বর্ষা যেন প্রকৃতির পাশব শক্তির মতো মনে বিভীষিকা জাগায়। প্রত্যহই প্রায় এমন সময় তুষারের ঘরে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের আসর জমে। আজ আর কেউ আসেনি। একা বসে বসে তুষার খোলা জানালাটা দিয়ে অনেকক্ষণ ঝাপ্‌সা বাড়ীগুলোর পানে অসহিষ্ণু দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখে। ভেতরে, বাইরে সর্বত্র ঝাপ্‌সা গোধূলি।

তুষার একজন প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক। খ্যাতি নেই অখ্যাতি আছে। অখ্যাতি তাকে দমাতে পারেনি। তার লেখা কোনদিন বিক্রী না হলেও দুঃখ নেই। সে অর্থের জন্য লেখে না। লেখে জীবনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে। চেহারাটি রোগা হলেও সুশ্রী। মজবুত দেহ, মন কোমল এবং দুর্বল। কবির মত সূক্ষ্ম তার অনুভূতি, সকলের ওপর একটা সার্বজনীন প্রীতির ভাব।

তুষার একসময় লিখতে বসে। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে চলন্ত কলম আর মগজে পাক খায় সিগারেটের নীল ধোঁয়ার মত স্বপ্নে সত্যে মেশানো অদ্ভুত আশা আকাঙ্ক্ষা

দৈবাৎ স্বপ্নের জাল যায় ছিঁড়ে। আচম্বিতে ব্রেক কষে কে যেন পঞ্চাশ মাইলের স্পিড্‌কে একেবারে বিরতিতে পোঁছে দিল। ব্রেক্ কষার কর্কশ শব্দের মত ধপ্ ক'রে সশব্দে ঘরের মাঝে ছিটকে এসে পড়ে একটা ভারী চটের থলি। তুষার চম্‌কে ওঠে, বোমা নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে গলিপথে আবির্ভাব হয় একটি ছায়ামূর্তির।

—কে? তুষার সভয়ে প্রশ্ন করে।

চাপা, ভীরু নারীকণ্ঠে উত্তর আসে, আমি—এখুনি চলে যাবো। পুলিশে তাড়া করেছে। দেখ্‌তে পেলে ভারী মারবে আর চালগুলো কেড়ে নেবে। তাই চালগুলো তোমার ঘরে ফেলে দিয়েছি।

—কিন্তু আমার ঘাড় ভাঙতো যে।

আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ভীরু খরগোসের মত মেয়েটি কাঁপতে থাকে। বৃষ্টিতে ভিজে এবং উদ্বেগ আশঙ্কায় তার মুখখানি পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

তুষার জিগ্‌গেস করে, তুমি চাল বেচ্‌ছিলে?

নিঃশব্দে মেয়েটি মাথা নীচু করে।

—পাশের ঘরে চালের থলি নিয়ে বসো।

চালের থলিটা তুলে নিয়ে মেয়েটি সংশয়াকুল শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, পুলিশ এলে ধরিয়ে দেবে না তো?

মৃদু হেসে তুষার বলে, না। কিন্তু চাল বেচ্ছ কেন?

কম্পিতগলায় মেয়েটি উত্তর দেয়, নইলে খাবো কি?

—আর ধরা পড়লে?

—কিছু দিলেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু বড্ড মারে আর নোংরা কথা বলে। আজ কিছু বেচতে পারিনি। একটি পয়সাও কাছে নেই।

—তোমার কে আছে?

—কেউ না। সম্পর্কে এক মাসি আছে। তার চাল বেচ্‌তে না পারলে মারবে, খেতে দেবে না।

তুষার মেয়েটির পানে চোখ তুলে চায়। বয়স সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে। বাড়ন্ত দেহের গড়ন ভাঙেনি। লম্বা বলা চলে। গায়ের রঙ্ মেটে। রুক্ষ একমাথা চুল, ভিজে আলুথালু। পরণে একখানা জীর্ণ, তেলচিটে ছেঁড়া শাড়ী। ভরাট মুখের ওপর কালো বড় বড় চোখদুটো প্রখর ও উজ্জ্বল। জিপ্‌সী মেয়ের মত চাউনিতে একদিকে দুঃসাহস অন্যদিকে সঙ্কোচ। ঐ দৃষ্টির কুহক মনকে আচ্ছন্ন করে।

কিছুক্ষণ পরে তুষার তাকে ডেকে বলে, পুলিশ চ'লে গেছে। এইবার তুমি যাও।

মেয়েটি কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলে, আমার চালগুলো তুমি কিন্‌বে বাবু? নইলে আজ খেতে পাবো না।

—আমি চাল নিয়ে করবো কি? আমি তো রেঁধে খাই না। হোটেলে খাই। আমি একা।

সংশয়ভরা দৃষ্টিতে মেয়েটি তুষারের পানে চেয়ে কম্পিত গলায় বলে, আজ সারাদিন কিছু খাইনি। চাল বেচে টাকা না নিয়ে গেলে খেতে পাবো না।

—সারাদিন খাওনি? ব্যথিত স্বরে তুষার প্রশ্ন করে।

—না। আমার চালগুলো নাও বাবু। কাকুতি ক'রে মেয়েটি বলে।

তুষারের মনে করুণা জাগে। সে বলে, তোমার চাল তুমি নিয়ে যাও। আমি দুটো টাকা দিচ্ছি, নাও। চাল আর বেচো না।

মেয়েটি হঠাৎ চোখদুটি নামিয়ে নীচু গলায় বলে, শুধু শুধু তোমার কাছে টাকা নেব কেন? ভিক্ষে আজো করিনি।

তার স্বরের কাতরতার মাঝে একটা স্পর্দ্ধার আভাস পেয়ে তুষার চমকে ওঠে। তবে?

মেয়েটি আর্তস্বরে বলে, তোমার পায়ে পড়ি, আমার চালগুলো নাও বাবু!

—কতো দাম? তুষার জিগ্‌গেস করে।

—চার সের—চারটাকা।

তুষার বলে, চারটাকা তো আমার কাছে নেই। দু'টাকা আছে। দু'সের চাল দিয়ে দু'টাকা নিয়ে যাও।

টাকা দুটো মেয়েটির হাতে দিয়ে, তুষার প্রশ্ন করে, তুমি থাকো কোথা?

—নারকেলডাঙ্গা—খালপারে।

—এই রাত্রে, একা অতদূর যাবে কেমন করে?

মেয়েটি নিঃশব্দে বাইরের পানে তাকায়। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে আর দুরন্ত বাতাস বইছে। মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে শাড়ীর আঁচলটা টেনে গায়ে জড়ায়। তুষার বলে, ওইখানে বরং আরেকটু বসো, বৃষ্টি থামলে যেয়ো। কিছু খাবে?

কি ভেবে তুষার বলে, না, সেও তো ভিক্ষে করা হবে? উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তারপানে চেয়ে মেয়েটি হাসে। পাণ্ডুর ঠোঁটদুটি ঈষৎ কেঁপে ওঠে। সে বলে, তার চেয়ে আর চার আনা পয়সা দাও, কিছু খাবো আর বাস ভাড়া দোব। চাল কিছু বেশী দিয়ে যাচ্ছি।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে তুষার বলে, আর তো আমার কাছে কিছু নেই। যা ছিল সব তোমায় দিয়েছি।

বিহ্বল, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে মেয়েটি জিগ্‌গেস করে, সেকি, তুমি খাবে না?

মৃদু হেসে তুষার বলে, হোটেল হ'তে আমার খাবার আসে। মাসের শেষে টাকা দিই। তোমারও ভাত দিয়ে যাক্—সারাদিন তো কিছু খাওনি।

ঝড়ের বেগে আর বৃষ্টির দাপটে ঘরের দরজা জানালাগুলো কাঁপছে। মেয়েটা পাশের ঘরে এককোণে চুপটি করে বসে তুষারের পানে চেয়ে দেখছে,—অদ্ভুত কোন প্রাণীকে মানুষ যেমন করে দেখে। তুষার আপন মনে লিখচে। তার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় সে ভুলে গেছে। দৈবাৎ মেয়েটি বলে ওঠে, রাত বেড়ে গেল। ঘুমে দেহ ভেঙে পড়চে। আর আমি যেতে পারবো না। এইখানে ঘুমোবো বাবু?

—ঘুমোবে? তুষার চমকে উঠে দাঁড়ায়।

হাই তুলতে তুলতে মেয়েটি বলে, এ বৃষ্টি রাতে আর থামবে না। শুনচো না ঝড়ের শব্দ। এইখানে ঘুমই। সকালে উঠে চলে যাবো।

তুষার বিব্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যিই তো, এই দুর্যোগে, এতোখানি পথ একা যাবে কেমন করে? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আস্তে আস্তে বলে, তাই ঘুমোও। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় ওখানে ঘুমোবে কেমন করে?

তৃপ্তির আভাসে মেয়েটির ঘুমজড়িত চোখদুটি সহসা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, চালের থলিটা মাথায় দিয়ে বেশ ঘুমোব।

—না, না। মাটিতে নয়। ঐ তক্তাপোষের ওপর একটু জায়গা করে নাও। ভারী ধুলো আর নোংরা কিন্তু—

অস্ফুট কণ্ঠে মেয়েটি বলে, ঘরদোরে কি কোনদিন ঝাঁট পড়ে না?

—একা মানুষ। দেবে কে?

একটা অজানা আশঙ্কা আর অস্বস্তিতে সারারাত তুষার ঘুমোতে পারে না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সারারাত সে বৃষ্টির শব্দ শুনেছে আর অস্থির ভাবাবেগে প্রহর গুনেছে। অবাঞ্ছিত উপদ্রবের মত পাশের ঘরে একটা অজানা, অচেনা, বয়স্থা মেয়ে ঘুমোচ্ছে! নিশ্চিন্তে, অকাতরে। ভোরের দিকে তুষার ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝের বন্ধ দোরে আঘাতের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দিনের আলো চুঁইয়ে এসে ঘরে ঢুকেচে।

—বাবু, ওঠো। বেলা হয়ে গেছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিদারুণ ঠাণ্ডায় তুষার বিছানা ছেড়ে ওঠে। মাঝের দরজাটা খুলে তুষারের বিস্ময়ের অবধি রইল না। ধূলি-ধূসরিত আবর্জনা-ভরা ঘরখানা তক্‌তক্ করচে। রাত্রের মধ্যে ঘরখানার চেহারা গেছে বদলে। স্তূপীকৃত পুরোনো খবরের কাগজগুলো একপাশে ভাঁজ করে গোছানো। আবর্জনা ও ছেঁড়া কাগজপত্রগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তক্তাপোষখানা ধোওয়া মোছা, ছেঁড়া সতরঞ্চখানা ধূলিমুক্ত হয়ে নবকলেবর ধারণ করেছে।

মেয়েটি কালো বড় বড় চোখ মেলে তার পানে তাকিয়ে

হাসতে হাসতে বলে, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মুখ-হাত ধুয়ে নাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তুষার অবাক হয়ে মেয়েটির পানে চাইলো। মুখে তার প্রভাতের সজীবতা। তামাটে মুখের দুপাশে, কাঁধ ও পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এলোচুলের কালিন্দি। ময়লা শাড়ীখানার আঁচলটা কোমরে জড়ানো। রাত্রের মধ্যে যেন মেয়েটির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে।

তুষার প্রশ্ন করে,—তোমার নাম কি?

—কেয়া।

—বেশ নাম তো। তা কেয়া, কাল রাত্রে আমার খেয়েছে বলে কি, কাজ করে শোধ দিয়ে যাচ্ছ?

চোখে বিদ্যুৎ হেনে কেয়া বলে, তা কেন? ঘরখানা বড্ড নোংরা হয়েছিল, তাই ঘুম হতে উঠে পরিষ্কার করলুম আমার কাজ করতে খুব ভালো লাগে। তুমি এ ঘরে বসে কাগজ পড়ো। আমি ও-ঘরটাও ঝাঁট দিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে দিই।

মৃদু হেসে তুষার বলে, একদিন ঘর গুছিয়ে দিয়ে আমার কী দুঃখটা ঘোচাবে কেয়া?

ঝাঁটা হাতে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে কেয়া বলে, বেশ তো, আমাকে তুমি রাখো না। দুজনেরি দুঃখু ঘুচবে। আপনার জন তো কেউ নেই দেখছি—

একটু থেমে স্বরটা খুব মোলায়েম করে কেয়া বলে, একা থাকো কেমন করে?

ব্যঙ্গস্বরে তুষার উত্তর দেয়, দোসর জোটেনি এবং সামর্থ্য নেই বলে।

—লেখাপড়া জানা সোমত্ত পুরুষ,—সামর্থ্য নেই কেন?

অভিভাবকের সুরে কেয়া যেন কৈফিয়ৎ চায়।

তুষার বলে, তা সত্যি। কিন্তু সামর্থ্য নেই কিংবা অদেষ্ট মন্দ, জানি না।

—সত্যি আমাকে রাখবে? আমি সব কাজ করে দেব।

—কিংবা আমার কাজ যে তুমি করবে?

কেয়া বলে, কেন, রান্না থেকে, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সবই করবো।

তুষার নিঃশব্দে তার নির্ভীক মুখের পানে চায়।

কেয়া বলে, ঐ তো হোটেলের খাওয়া, আর এই নোংরা ঘরদোর, শরীর থাকবে কেন? তা ছাড়া সুখ-অসুখ আছে—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তুষার যেন আপন মনে কথা কয়, তা বটে। সবই তুমি করবে?

কেয়া বলে ওঠে,—সব। শুধু কাছে শোয়া ছাড়া আর সব করবো।

তুষার চমকে ওঠে। মনে হয়, কে যেন সহসা তার গালে থাপ্পড় মারলে।

সে মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

কেয়া নীচু সুরে প্রশ্ন করে, তুমি রাগ করছো নাকি? অন্যায় বলেচি?

—রাগ করবো কেন? কিন্তু ও-রকম কোন কথা তো আমি বলিনি।

—তুমি বলোনি। কিন্তু অনেকে বলে কিনা, তাই বললুম।

মৃদু হেসে তুষার বলে, তা জানিয়ে রাখা ভালো। তোমার কথা শুনে তোমাকে রাখতে ইচ্ছে করে কিন্তু আসল কথা কি জানো। আমার নিজেরি সবদিন জোটে না। তুমি আমার কাজ করলে মাইনে এবং খেতে দিতে তো হবে।

কেয়া বলে, মাইনে এখন নাই দিলে। খেতে পরতে দিলেই হবে।

—তাই বা দোব কোথা থেকে? এই বাড়ীখানা মাত্র সম্বল। নিজের জন্যে এইটুকু রেখে বাকিটা ভাড়া বিলি করেছি। সামান্য ভাড়া পাই।

—চাকরী করো না?

—না। আর যা করি তার আয় নেই, ব্যয় আছে। যদি কখনো বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটা উপরি পাওনা—

—সেটা কি?

—লেখা বিক্রী। নজর উঁচু পানে, কিন্তু চেষ্টা অসার।

প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে কেয়া বলে, তুমি লেখক?

—হাঁ, পাঠকহীন লেখক। দোকান আছে, খদ্দের নেই।

—হোটেলে কত লাগে? কেয়া জিগ্‌গেস করে।

—চল্লিশ টাকার মত। সবদিন তো খাই না। মাঝে মাঝে উপবাসটা শরীরের পক্ষে উপকারী।

কেয়া হেসে বলে, বাড়ীতে রেঁধে খেলে, ঐ টাকাতেই দুজনের চলে যাবে। উপবাস দেবার দরকার হবে না। শরীর ভালোই থাকবে।

—তাই নাকি?

—হাঁ। আমি ঐটাকাতেই দুজনের চালিয়ে নোব আর হোটেলের চেয়ে ভালো খেতে দোব।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে তুষার আমতা আমতা করে বলে, কিন্তু—

কেয়া কটাক্ষ হেনে বলে, আমার হাতে খেলে জাত যাবে না। আর চুরি করবো না, ভয় নেই।

অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত হলেও কেয়া তুষারের এই সুদীর্ঘ প্রাণহীন নির্জনতাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই ছোট্ট পরিবেশটি ঘিরে একটি শান্তির নীড় রচনা করেচে। বুনো ফুলের মত সজীবতাই মেয়েটির প্রধান আকর্ষণ। তার চলাফেরায় আদিম নারীর অদ্ভুত প্রাণশক্তির পরিচয়। আভিজাত্য না থাকলেও তার হৃদয়ে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। সতেজ ও সবল তার চোখের দৃষ্টি। যার দিকে তাকায় তার অন্তরে প্রবেশ করে ওর দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে দ্বিধা নেই, সংশয় নেই।

সকাল হতেই সধূম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে কেয়া তাকে জাগায়। তুষারের নিঃসঙ্গ নিরানন্দ মরুর মত জীবনে এ একটা নতুনতরো বিলাস। ঘুম হতে উঠে আর তাকে নোংরা চায়ের দোকানে পাঁচজনের সঙ্গে বসে চা খেতে হয় না। মনের গভীরে একটা অজানা তৃপ্তিই সে অনুভব করে। তার ভালো লাগে কেয়ার এই সেবার ধারাটি। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে একা একবাড়ীতে বাস করতে ওর মনে লেশমাত্র শঙ্কা নেই, বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। ওর পানে চেয়ে চেয়ে তুষারের মনে হয় যেন ওর ভয় ভাবনা মন হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। পরমাত্মীয়ের মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। যেন নিজের বাড়ী।

মাসের প্রথমে বাড়ীভাড়া পেয়ে তুষার কেয়ার জন্যে কিছু জামা-কাপড় কিনে বাকি টাকাটা তার হাতে দিল। নিজের ঝক্কি আর নিজেকে পোয়াতে হয় না, খিদের জ্বালায় হাবাতের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় না। তুষারের পক্ষে এ একটা কম নিষ্কৃতি নয়। কেয়া তার জীবনে এনেছে আরামের আশ্বাস আর সাহিত্য সাধনার অখণ্ড অবসর।

শাড়ী আর টাকা নিয়ে কেয়া হাসতে হাসতে বলে, আমার শাড়ী কেনবার জন্যে এরি মধ্যে ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না। খাবার টাকাটা আগে রাখতে হবে। কেয়ার কণ্ঠে যেন অভিভাবকের মৃদু ভর্ৎসনা। তুষার নিঃশব্দে তার অনাবরিত অঙ্গের পানে তাকায়। কেয়া হাসে।

এলো চুলগুলো মুখের ওপর হতে সরিয়ে দিতে দিতে কেয়া বলে, আজ আমি ঘরের যতো জঞ্জাল, ভাঙা হারিকেন শিশিবোতল, ছেঁড়া কাগজ বেচে চারটাকা দশ আনা পেয়েছি।

তুষার হেসে বলে, যেন আমার লেখা কাগজগুলো বেচে দিও না। অবিশ্যি, ছাপার খদ্দের না জুটলে ওদেরি শরণাপন্ন হতে হবে।

দুপুরে, পূর্বের মতই তুষার বেরিয়ে যায় পত্রিকা আফিসে ও প্রকাশকদের দোরে ধর্ণা দিতে। আবার সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় তুষারের ঘরে আগের মতই সাহিত্যের মজলিস ও গানের আসর বসে। শুধু তাদের চিরাচরিত উচ্ছৃঙ্খল রসালাপকে সংযত করবার জন্যে মাঝে মাঝে তুষারকে পাশের ঘরে একটি স্ত্রীলোকের উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে তাদের সতর্ক করে দিতে হয়। বন্ধুরা কিভাবে কে জানে, তবে তাদের আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হয় না, বরং পূর্বে যা কখনো সম্ভবপর ছিল না এখন তাদের পরিতৃপ্তির জন্যে মাঝে মাঝে কেয়ার হাতের চা এসে পোঁছয়।

একজন বন্ধু প্রশ্ন করে, আসলে ও'র ষ্টেটাস্‌টা কি?

আরেকজন কৌতুকের স্বরে উত্তর দেয়, কুক্‌-কাম-মিষ্ট্রেস্ (cook-cum-mistress)।

তুষার ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়ঃ মোটেই না। বরং গভরনেশ (Governess) বলতে পারো।

তুষার বলে, কী করে যে সম্ভবপর হয়, ধারণা করতেও পারি না। অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলো না, আর যথাপূর্বং, একজন লোক বেড়েছে অথচ পূর্বের দৈনন্দিন হাহাকার ঘুচেছে। অভাবের চেহারাটা যেন একটু মোলায়েম হয়ে এসেছে।

—তা না হলে পুরুষের জগৎ চিরদিন নারীকে পুজো দিয়ে আসবে কেন? একজন মন্তব্য করে।

এদের সম্বন্ধে কেয়ার কোন কৌতুহল নেই। সে ভেতরেই থাকে, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় সে অভ্যস্ত নয়, ভালোও বাসে না। তা ছাড়া স্বভাবতঃ সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সে হাসে বেশী, কিন্তু সে হাসি অলস কৌতুকে উচ্ছল নয়। কেয়া শিক্ষিত এবং মার্জিত না হলেও তুষার তাকে প্রথম দিনটি হতেই সশ্রদ্ধ মমতার চোখে দেখেছে। তার মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে সম্মান বা সম্ভ্রমের দাবী না করলেও কেয়া সে শ্রেণীর মেয়ে নয় যাদের যৌবন নিয়ে অনায়াসে ছিনিমিনি খেলা চলে। ওকে দেখলেই মনে হয় ওর ভেতর একটা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে।

বিকেলের দিকে, কেয়ার জন্যে একটা বিছানা কিনে নিয়ে এসে তুষার ডাকলে, কেয়া।

ঘরের ভেতর হতেই কৌতুকের স্বরে উত্তর এলো, কে-আ?

বিছানাটা বাইরে রেখে ভেতরের ঘরে এসে তুষার দেখে কেয়া রাশিকৃত সরু কাঠিতে আটার মতো কি লাগাচ্ছে। দুহাতে কালিমাখা, একটা অপরূপ সুগন্ধিতে ঘরখানা ভরে আছে।

কৌতুকের হাসিতে মুখ ভরে কেয়া প্রশ্ন করে, কেয়া বাবুজি?

—ইস্! রস আছে। এসব কি?

—ধূপ তৈরি করছি।

—হঠাৎ?

কেয়া বিদ্যুৎভরা চোখে তার মুখের পানে চেয়ে, এক-গাল হাসতে হাসতে বলে, দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায়। হাজার ধূপ তৈরি করতে পারলে মজুরী পাবো, চার টাকা। মালমশলা কারখানার। রোজ যদি হাজার ধূপ বানাতে পারি- তাহলে আর আমাদের ভাবনা কি?

—তুমি ধূপ তৈরি করতে জানতে?

—না। এই চারদিন ধরে কারখানায় গিয়ে শিখ্লুম। বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টিতে তুষার তার পানে চায়।

উৎসাহ পাবার আশায় খুব মোলায়েম মিহিসুরে বলে, পারবো না বাবু? আজ সারা দুপুরে সাড়ে সাতশো গড়েচি। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাকিটা গড়বো।

কেয়া উঠে তার সামনে দাঁড়াল,—তার মজবুত দেহে স্বাস্থ্যের জৌলুষ নিয়ে। তার সামনে তুষারের জড়ত্ব তার পৌরুষকে ধিক্কার দেয়।

বিছানাটার সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু কেয়ার মুখের আলো নিভে যায়। সে মুখ তুলে তুষারের পানে তাকাতে পারে না। তুষার বলে, পনেরো টাকায় একটা লেখা বিক্রী হলো, তাই—

বিষন্ন জলভরা চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে কেয়া বলে ওঠে, তাই প্রথমেই মনে হলো যে বিছানা না হলে আমার ঘুম হচ্ছে না। আমার কপাল ভালো তো? —তার স্বর বন্ধ হয়ে আসে। মুখখানা আগুনের মত রাঙা হয়ে ওঠে তার উদ্ধত দেহটা যেন আরো দীর্ঘ হয়ে ওঠে। তুষার তার মুখের পানে চাইতে পারে না। দৈবাৎ কেয়ার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সে ভেতর চলে যায়।

কেয়া দুর্বোধ্য। সত্যিই এ মেয়েকে বুঝে ওঠা তুষারের মত ভাবপ্রবণ দুর্বল তরুণের পক্ষে দুষ্কর। অদ্ভুত ওর প্রকৃতি। একদিকে যেমন সাংসারিক রূঢ়, অন্যদিকে তেমনি কোমল ও মধুর। প্রভুর মত রক্তচক্ষু পাকিয়ে দাঁড়াতেও যতোক্ষণ, আবার দাসীর মত বিনয়ে নত হতেও ততক্ষণ। এর নীতি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়। তুষারের মনে চমক লাগিয়ে দেয়।

একটু পরেই কেয়া চায়ের বাটি হাতে নিয়ে, দাঁতে ঠোঁট চেপে মৃদু হাসতে হাসতে ঘরে এসে বলে, আমারি বোঝা ভুল। স্বভাব কি মানুষের একদিনে বদ্লায়? আমারি অন্যায়। আমি বল্ছিলুম কি, টাকা কটা পেলে আগ্‌ ধাঁ করে মহারাণীর জন্যে শয্যে কিনে আন্লে? এদিকে খবরের কাগজের দাম দেওয়া হয়নি তিন মাসের। ইলেক্‌ট্রিক বিল দিতে হবে, রেশন আনতে হবে।

তুষার আড়চোখে তার মুখের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চায়ের বাটিতে চুমুক দেয়। কেয়া হাসতে হাসতে বলে, এতো লেখা-পড়া শিখেও, পুরুষের বুদ্ধি হয় না কেন বলতে পারো?

তুষার হেসে ফেলে। কেয়া সামনে বসে হাসতে হাসতে জিগ্গেস করে, আমাকে তুমি কি ভাবো? আকাশের তলায় বার রাত কেটেছে দিনের পর দিন, বিছানা না হলে তার ঘুম হচ্ছিল না? তক্তাপোষ রয়েছে, কাঁথা সেলাই করেছি, মাথার একটা বালিশ দিয়েছো। আবার এই পনেরোটা টাকা পাবা মাত্রই আপদ-বালাই ঢুকিয়ে দিয়ে এলে? পকেটে টাকা থাকলে কি বিছের কামড় দেয়? আশ্চর্য মানুষ! এই স্বভাবের দোষেই অর্ধেক দিন অন্ন জুটতো না।

কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। বাড়ীভাড়া আদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই টাকা কটা, কে যে কোন্‌দিক দিয়ে শুষে নিতো, সে বুঝতেই পারতো না। তারপর আবার আরম্ভ হতো, অভাবের নির্মম তাড়না। সময়ে সময়ে পাওনাদারের জ্বালায় বাড়ী ঢুকতে পেতো না। খালি পেটে পথে পথে শুধু চা খেয়েই দিনের পর দিন কেটেছে। মিতব্যয়ী হবার সংকল্প করেও কিছুতে পারেনি। কেয়া এসে তো তাকে সে সব দুশ্চিন্তার হাত হতে মুক্তি দিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেয়া আস্তে আস্তে বলে, একটা কথা বলবো, রাগ করো না।

—বলো। বলতে আর বাকি রাখলে কী?

দুজনে একসঙ্গে হাসে। কেয়া বলে, টাকা পেলে পথে অমন ভাবে খরচ করো না। করতে নেই। মা লক্ষ্মী বিরূপ হন্।

তুষার অপাঙ্গে তার পানে চেয়ে কৌতুকের স্বরে বলে, অর্থাৎ ঘরের লক্ষ্মীর হুকুম না নিয়ে—

—ধেৎ! বলতে নেই। কেয়া দৈবাৎ হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে জিভ্‌কেটে অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বলে ওঠে, লক্ষ্মী না হাতি! তুমি বড়, আমি ছোট। তুমি মনিব, আমি—

চোখ্ পাকিয়ে তুষার ধমক দেয়, —চোপ্!

কেয়া কি-জানি কি-ভেবে তুষারের পায়ের ধুলো নেয়। তুষার দুহাতে তার হাত দুখানা শক্ত করে চেপে ধরে। কেয়া বলে, ছেড়ে দাও। নতুন কাজ পেয়েছি তাই তোমার আশীর্বাদ চাইচি। আশীর্বাদ করো, যেন আমাদের দুঃখু

ঘোচে—যেন আমাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কেয়ার গলার স্বরে স্পষ্ট একটা আকুলতা, একটা প্রার্থনার সুর! তুষার তার হাতদুটি ধরে আচ্ছন্নের মতো তার পানে অপলকে চায়। কেয়াও সম্মোহিতের মত দীর্ঘপল্লবে ঢাকা কালো ডাগর চোখ মেলে তার পানে তাকায়। আদিম নারী যেমন ভাবে প্রথম পুরুষের পানে বিস্ময়ে চেয়েছিল। দুজনে দুজনের পানে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। মুখে কারুর কোন কথা নেই, অথচ দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই যেন দুজনে দুজনের সঙ্গে কথা কইছে। তুষারের মনে হয় ওর আদুড় নিটোল দেহের স্পর্শ একটা শিখার মত তার হাতদুখানা পুড়িয়ে দিচ্ছে। ওর দেহে আদিম নারীর স্বাস্থ্যসম্পদ, ওর চোখে বহ্নি, ওর রক্তে উন্মাদনা। ওর মাঝে কৃত্রিমতা নেই। যুগের সভ্যতা আর শিক্ষা ওকে বিকৃত করতে পারেনি। স্থূল হলেও সাধারণের মাঝে ও স্বতন্ত্র।

দৈবাৎ কেয়া তার হাতদুটি মুক্ত করে নিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে, না, না! অমন করে তুমি আমার পানে চেয়ো না।

—তোমার পানে আমায় চাইতে মানা করচো কেয়া, কিন্তু তোমায় যে আমি চাই। কেয়াকে কাছে টেনে নিয়ে চাপা গলায় তুষার বলে।

কেয়া খিল্ খিল্ করে সশব্দে হেসে ওঠে। সে কি গো?

—সত্যি। তোমাকে ছেড়ে আমার চলবে না।

গম্ভীর হয়ে কেয়া উত্তর দেয়, আমারো তো তোমাকে ছেড়ে চলবে না। তাই বলে কি আমি আকাশের পানে হাত বাড়াবো? আমাকে নিয়ে তুমি করবে কী? দুটো কথা বলতেও তো জানি না।

—যা জানো, তাতেই আমি খুশী। যা জানো না, তা আমি চাই না।

কেয়া একটু ভেবে জিগ্গেস করে, তা কি ভাবে আমাকে পেলে তুমি খুশী হবে?

উৎসাহের কণ্ঠে তুষার বলে, সনাতনী প্রথায় চিরদিন যে-ভাবে পুরুষ নারীকে পেয়ে আসচে।

চকিত দৃষ্টি হেনে কেয়া বলে, তুমি কি আমায় বিয়ে করবে নাকি?

—জীবনের পথে চলতে হলে, স্পষ্ট ও পরিচিত পথেই চলা ভালো।

তুষার তাকে আরো কাছে টেনে নেয়। স্পর্শ তার অগ্নিময়। চোখ দিয়ে সূক্ষ্ম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। কেয়া অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে কম্পিত গলায় বলে, আমাকে পাবার জন্যে তুমি আমায় বিয়ে করবে?

তুষার হাসে। কেয়া হঠাৎ হাসতে হাসতে বলে ওঠে, তোমার মাথা খারাপ। দিনরাত আবোল তাবোল রূপকথা লিখে, আমাকে ভেবেচো রূপকথার রাজকন্যে। পাগল তুমি!— হাসতে হাসতে কেয়া লুটিয়ে পড়ে।

কী যে কেয়া চায়, তার কোন পরিচয়ই তার মধ্যে পাওয়া যায় না। কী চোখে যে সে তুষারকে দেখে তারো কোন হদিস মেলে না। তুষারের আশ্রয়ে সে থাকতে চায় আর তার সেবা-যত্ন করতে চায়। বাকি সময়টুকু সে কাজ করে। কাজই তার নেশা। কাজেই তার উত্তেজনা। নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে সে তুষারের শূন্য ভাঁড়ার পূর্ণ করে। অন্তরাল হতেও কেয়ার সযত্ন জাগ্রত দৃষ্টি সর্বক্ষণই এই ঘরের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। অবসর পেলেই কেয়া তার ঘরের খোলা দরজাটার সামনে পায়চারী করে। খাবার সময় হলে তাকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ভেতর থেকে একটা অনুরাগই প্রকাশ পায়। অথচ ঐ একটা জায়গায় তার নিদারুণ অবজ্ঞা। এতো কাছে থেকেও, তার দিক হতে কোন লোভ বা লোলুপতা চোখে পড়ে না।

কেয়া ধূপ গড়ে। অসহিষ্ণু তুষার বলে, জীবনটা শুধু খেটে মরবার জন্যে নয়।

—না খাটলে পেটের খোরাক জুটবে কেমন করে?

—পেটের ভাবনা ছাড়া আর কোন কিছু কি তুমি ভাবতে পারো না কেয়া? সব চেয়ে বড় ভাবনার জায়গাটা তোমার কাছে মিথ্যে হয়েই রইল?

তীব্র কটাক্ষ হেনে কেয়া বলে, সময় কোথা? ফুরসৎ কোথা ও সব সৌখিন কথা ভাববার?

তুষার কি এমনিভাবে ওর পেছনে ছুটতে থাকবে আর ও নিজেকে লুকিয়ে রাখবে? তুষারের স্নায়ুতে টান পড়ে। কাছের মানুষকে এমনভাবে দূর হতে দেখতে আর সে পারে না। কেয়া বাধার সৃষ্টি করে তার আকর্ষণকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। কেয়াকে তার পেতেই হবে। সে পণ করে। কেয়া যদি আকাশের পানে হাত বাড়াতে না পারে আকাশকে মাটিতে নেমে আসতে হবে।

তুষার শুধু ভাবে আর ভাবে। কেয়াকে পাবার জন্যে যে তাকে তপস্যা করতে হবে, একথা সে মনেও ভাবেনি। লেখায় আর তার আগ্রহ নেই। সে লেখা বন্ধ করেছে। বই আর খোলে না। একা বসে বসে ভাবে আর নিজের মনে মতলব আঁটে। ভেতরে ভেতরে সে যেন গলে যায়। দুর্বোধ্য এই মেয়েটিকে তাকে বুঝতেই হবে। তুষারকে বাদ দিয়ে যে নিজের অস্তিত্ব নেই এ কথা কেয়া বোঝে। তুষারকে সেবা করে নিজে গৌরববোধ করে। তুষারের ভালোবাসা

হয়তো ওকে স্পর্শ করে না অথবা নিজেকে তুষারের অযোগ্য মনে ভাবে।

কেয়া ধূপ গড়ে। সময়ে অসময়ে তুষার তার কাছে বসে ধূপ তৈরি দেখে। ধূপের উপাদান, মালমশলা, তৈরি প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন করে করে জেনে নেয়। মাঝে মাঝে সাগ্রহে নিজেও কেয়ার সঙ্গে ধূপ গড়তে বসে। কেয়া হাসে। বলে, এটা কিন্তু মেয়েদের কাজ। পুরুষে মেয়েদের মত এত শিগ্‌গিরী এমন সুন্দর ভাবে বানাতে পারে না।

তুষার বলে, আমাদের এই ব্যবসা করলে হয়। বেশ লাভের ব্যবসা।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে কেয়া তার মুখের পানে চেয়ে বলে, খুব লাভ। কিন্তু মালমশলা জিনিষপত্তর কেনবার টাকা কোথা? হাতে কিছু টাকা জমাতে পারলে, বেশ হয়, না?

দুজনে পরামর্শ চলতে থাকে। তুষার বলে, এই ব্যবসাই আমরা করবো। দুজনে কাজ করলে, চালাতে পারবে না?

কেয়া সোৎসাহে বলে, খুব পারবো—কিন্তু টাকা?

টাকার জোগাড় হলো, বাড়ীর এই অংশটা আগাম নিয়ে ভাড়া বিলি করে। বেলঘোরে রেল লাইনের ধারে খানিকটা ফাঁকা জায়গার ওপর ছোট্ট একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে তারা চলে এলো। ফাঁক জমিতে ছাউনি দিয়ে কারখানার ঘর তৈরি হলো। কেয়া মেয়ে কারিকর জোগাড় করলে। কেয়ার তত্ত্বাবধানে হয় ধূপ তৈরি। তুষার মাল মশলা কেনে, প্যাকিং করায় এবং দোকানে দোকানে গিয়ে ধূপ-বিক্রী করে।

পুরোদমে কারবার চালু হলো। টাকা আসে। দুজনে মেতে ওঠে নতুন রক্তের স্বাদ পেয়ে। প্রচণ্ড আকুলতা নিয়ে তুষার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়ায় শহরের প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্যন্ত। তার চেহারা গেছে বদলে। পোষাক পরিচ্ছদ গেছে বদলে। তার রক্তস্রোতের গতি ও ছন্দ গেছে বদলে। সাহিত্যিক তুষারকে আর তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার সৌখিন আভিজাত্য ও অভিমান গেছে লুপ্ত হয়ে। কেয়া লক্ষ্য করে শান্ত কোমল প্রকৃতির লোকটি যেন হঠাৎ উদ্দাম ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ব্যবসা ভিন্ন কোন কথা আর তার মুখে নেই।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত হিসেবের খাতা নিয়ে সে কাজ করে। তারি মাঝে কেয়ার ডাক পড়ে। কেয়া সারাদিনের কাজের একটা ফিরিস্তি দেয়। গম্ভীর মুখে নিবিষ্ট মনে সে শোনে। কেয়া লক্ষ্য করে তার মুখে অবসাদ ও ক্লান্তির ছায়া। সে অস্বস্তিতে তার মুখের পানে তাকায়। মুখে কিছু বলবার সাহস হয় না। আজকাল ভেতরে ভেতরে সে যেন সব সময়ই কেমন সঙ্কুচিত। কেয়ার মনে হয় জীবনের অভিজ্ঞতায় ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। অতীতের বেদনাময় নিস্ফলতা ওর বর্তমানকে রূঢ় ও কঠোর করে তুলেছে। ওর হাবভাব দেখে কেয়ার মাঝে মাঝে ভয় হয়।

ব্যবসা হু হু করে বেড়ে চলে। ধূপের নাম হয়েছে 'কেয়া ধূপ'। বাজারে ধূপের প্রচুর চাহিদা ও সুনাম। প্রায় পঁচিশজন মেয়ে এবং পাঁচ-সাতজন পুরুষ কাজ করে। তা ছাড়া ক্যান্‌ভাসার ও অন্যান্য লোকজন আছে। কেয়া ও তুষারের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

ব্যবসা কিন্তু যতই প্রসারলাভ করে, কেয়ার মনের ব্যর্থতা ততই বাড়তে থাকে। তুষারের মুখের বেদনা কেয়ার অন্তরে সমবেদনার ছায়া ফেলে। তুষার আর আগের মত ওর পানে তাকায় না, তার পানে চেয়ে চাপা হাসিতে তার মুখখানা ভরে ওঠে না। তার সেবাযত্নের স্বীকৃতি নেই। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে মুখে দুটো মিষ্টি কথা পর্যন্ত নেই। সম্পদ-সঞ্চয়ের দুরন্ত নেশায় সে যেন সর্বক্ষণ মাতাল হয়ে থাকে। কেয়া সইতে পারে না এই ঔদাসীন্য। ব্যবসার অংশীদার ছাড়া কেয়ার যেন এখন এখানে অন্য পরিচয় নেই। সে যে নারী সে কথাও যেন তুষার ভুলে গেছে। যে সব চিন্তা নিয়ে কেয়া কোনদিন মাথা ঘামায়নি সেই সব চিন্তা কেয়াকে বিব্রত করে তোলে। কেয়ার মনে হয়, তুষারের যে কামনার সে মৃত্যু ঘটিয়েছে সেই কামনার দুর্বিপাকে নিজে জড়িয়ে পড়েছে। একটা দুঃসহ দৈহিক যন্ত্রণার মত এই কামনার হাত হতে সে নিষ্কৃতি পায় না।

তুষারকে খেতে দিয়ে কেয়া বলে, ব্যবসার জন্যে যে প্রাণটা দিতে বসেচো। সবতাতেই তোমার বাড়াবাড়ি। শরীরের কি হাল হচ্চে, মুখ চোখের চেহারা কি হচ্চে আর্শিতে একবার দেখেচো কি?

—সময় কোথা? মুখ না তুলেই তুষার উত্তর দেয়।

ব্যঙ্গস্বরে কেয়া বলে, ইস্! যে রাঁধে সে আর চুল বাঁধে না। আমাকে তা হলে তো সংসারের কাজকর্ম আর করতে হয়।

নির্লিপ্তের মত তুষার উত্তর দেয়, তুমি দুকূল রাখতে জানো। আমি জানি না।

—যা জানো না, আমার কাছে শিখলেই পারো

—যা শিখেচি তাই ভুলতে পারলে বাঁচি।

কেয়া রুখে দাঁড়িয়ে প্রভুত্বের সুরেই বলে, ভুললে আমার চলবে না। ভুলতে আমি দোব না।

বলেই কেয়া হেসে ফেলে। সে হাসিতে অনুরাগের চেয়ে আক্রোশই বেশী ফুটে ওঠে। আক্রোশটা যেন সে হাসি দিয়ে ঢাকতে চায়।

কেয়া বলে, প্রাণের জন্যেই ব্যবসা। ব্যবসা প্রাণের চেয়ে বড় নয়।

অনেকদিন পরে আজ তুষার কেয়াকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলে। কেয়া যেন হঠাৎ সৌখিন হয়ে উঠেছে। দেখতে বেশ সুশ্রী মনে হলো। রঙটা আরো একটু ফ্যাকাশে হয়েচে। চুলগুলি সযত্নে পরিপাটি করে বাঁধা। পরনের পরিচ্ছন্ন ছাপা শাড়ীখানি বেশ মানানসই। কানে দুটি দুল, নিটোল হাতে কগাছি চুড়ী, অনাবৃত সুকোমল কণ্ঠে একগাছি সরু সোনার হার চিক্‌চিক্ করছে। তুষার আজ প্রথম কেয়ার মুখে লোভের ছায়া দেখতে পেলে। সে যেন এতোদিন মধুসঞ্চয় করে আজ তাকে পান করাতে এসেছে। তুষার চকিতে তার পানে চেয়ে মৃদু হেসে আবার চোখ নামিয়ে নিলে। তার মুখে এক অদ্ভুত বিদ্বেষ ফুটে ওঠে। হাসিতে বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। সেই বিদ্রূপ মেশানো হাসি কেয়ার সর্বাঙ্গে আগুন ছিটিয়ে দেয়। সে রুক্ষ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে, তোমার ভালো না লাগে চেয়ে দেখবার দরকার কী? আমি তো লোভ দেখিয়ে তোমাকে জয় করতে আসিনি।

বিদ্রূপের গম্ভীর কণ্ঠে তুষার বলে, হঠাৎ কিনা, তাই চোখে লাগে।

—তোমার চোখে লাগে বলে যে চিরদিন আমায় দাসী সেজেই থাকতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। পাঁচজনের মত আমারো প্রাণে সখ আহ্লাদ আছে।

তুষারের মুখে ফুটে ওঠে একটা হিংস্র জয়ের উল্লাস। সে তার পানে না চেয়েই বলে, সকলেরি আছে। আমারো ছিল।

কেয়া এ ধরনের বাঁকা কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। তুষারের কথায় ঘৃণার ও তাচ্ছিল্যের আভাস পেয়ে তার মুখখানা শক্ত হয়ে ওঠে। সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার চোখে চোখ রেখে জিগ্‌গেশ করে, সে সব গেল কোথা? সে সখ আহ্লাদ, মুখের সে প্রাণখোলা হাসি গেল কোথা? কে কেড়ে নিল?

—মন বলে যদি কোন পদার্থ ঐ দেহের নীচে থাকতো তা হলে এ কথা জিগ্‌গেস করতে হতো না। মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়ো খেলা চলে না।

গভীর অবজ্ঞার কণ্ঠে তুষার উত্তর দেয়। রাগে ও আঘাতের যন্ত্রণায় কেয়ার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। তুষারের সব কথার মর্ম হয়তো কেয়ার বোধের বাইরে। কিন্তু এ কথা সে বুঝতে পারে যে যতই একটা পরিণতির পানে সে এগুতে চায়, তুষার ততই তাকে নিষ্ঠুর ভাবে পেছনের পানে ঠেলে দেয়। সে বোঝেনা কেন যে কেয়ার আর ফিরে যাবার পথ নেই।

কেয়া দৈবাৎ আর্তস্বরে বলে ওঠে, আমি তোমায় ধরে উঠতে চেয়েছি, তোমায় নিয়ে জুয়ো খেলিনি।

ক্ষুধিত তুষারের মনে একটা জ্বালা ছিল। তাই কেয়ার এই প্রথম আবেগকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে পেরে তার আনন্দই হলো। সে যখন কেয়াকে চেয়েছিল, তার মাঝে ফাঁকি ছিল না। কিন্তু কেয়ার নীরব বিরুদ্ধতা তাকে দিনের পর দিন উৎপীড়িত করেছে। নিরুপায় হয়ে সে পথের শেষ সীমায় বসে তার অপেক্ষা করেছে। সে রীতিমত কৃচ্ছসাধন করে নিজেকে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়ে দিয়েছে। তাই কেয়াকে আঘাত করে তার মনে হলো সে প্রতিশোধ নিয়েছে। আজ কেয়া যেন নিজে তৈরি হয়ে যেচে ধরা দিতে এসেছিল, কিন্তু সে কোন কিছু জানবার ও বোঝবার চেষ্টা না করেই তাকে নির্মম আঘাত হেনেছে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিজেকে হঠাৎ তার কেমন খাপছাড়া মনে হলো। সে তার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে। তরুণ অনাস্বাদিত জীবনের পিপাসা নিয়ে কেয়া তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল,—সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তাকে অপমানে বিধ্বস্ত করেছে।

কেয়াকে সে বুঝতে পারেনি। সে ব্যর্থ হয়েছে, শুধু তাকে বুঝতে পারেনি বলে। ভালোবাসায় হৃদয় শতধা হয়ে গেলেও, কেয়া কেন, কোন মেয়েই মুখ ফুটে জানাতে চায় না, তার অন্তরের কামনা। তার কালো চোখের বেদনাময় একাগ্র চাউনিতে ফুটে উঠেছে তার মনের বাসনা। তুষার সমস্ত শরীরে একটা তীব্র গোপন উত্তেজনা অনুভব করলে। রক্তের মাঝে একটা দুরন্ত উন্মাদনা। কেয়াকে সে চায়। হ্যাঁ, সে তাকে চায়, শুধু তাকেই সে চায়। তার সঙ্গে সে এক হয়ে যেতে চায়। অদ্ভুত কামনাবেগে অস্থির হয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। স্পন্দহীন পৃথিবী যেন প্রতীক্ষায় উন্মুখ। বাতাস পর্যন্ত থেমে গেছে। শাদা আকাশে কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তারি মাঝে তারাগুলো উজ্জ্বল। নিবিড় রাত্রির এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কেয়াকে সে পেতে চায়—কেয়াকে নিয়ে একটা সমাপ্তিতে পৌঁছতে চায়।

কিন্তু কোথায় কেয়া? কেয়ার ঘরে এসে তুষার পাথর হয়ে গেল। বিছানা শূন্য, শূন্য ঘর। সব আছে। বাক্সর চাবি, নিজের টুকিটাকি গয়না, ব্যবসার মজুত টাকা, এমনকি সন্ধ্যায় যে শাড়ীখানা পরেছিল সেখানা পর্যন্ত। শুধু কেয়া নেই।

কোথাও তার সন্ধান মিলল না।

তার অধিকার ছেড়ে কেয়া যে কোথাও যেতে পারে, একথা বিশ্বাস করতেও মন চায় না।

বাইরের পানে যখন সে মুখ ফেরালে, পৃথিবী যেন আঁধারের প্রলেপ মেখে তার চারপাশে নেমে এসেছে। অন্ধকার,—সামনে, পেছনে, আশেপাশে শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার। বাতাস পর্যন্ত অন্ধকারে কালো আর ভারী হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকার তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে চিরতরে। কেয়াকে সে হারিয়েছে। সে পেয়ে যা হারাল, তা দুহাত দিয়ে সাদরে গ্রহণ করল কি এই প্রগাঢ় অন্ধকার?

এই মুক্ত অন্ধকারে সে একলা। এই নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব নিয়ে আবার জীবনে ফিরে যাবে কেমন করে? তার তরুণ মনের উর্বর মাটিতে উত্তপ্ত প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হলো, আঁধারের বেদনায়। বেদনাতেই হবে কি তার সমাপ্তি?

অন্ধকারের প্রান্তরে সে অসহায় দৃষ্টি মেলে দিল। দু'জনের জীবনের এই অনাবিল শান্তি ভাঙবার জন্যে নিজেকেই অপরাধী মনে হলো। যে আঘাত সে কেয়াকে করেছে সে আঘাতটা পর্যন্ত নিজের ওপরই ফিরে এসেছে। রেল-লাইনের সিগন্যালে নীল আলো জ্বলেছে। একখানা ট্রেন আসছে। তীব্র হুইসেলের সঙ্গে লাইনের পাঁজর-দোলা ধক্‌ধকানি শব্দ। চম্‌কে উঠল' তুষার। কেঁপে উঠলো তার বুকের পাঁজর। প্লাটফরমে গাড়ী এসে পৌঁছবার আগেই একটা তীব্র ঝাঁকানির সঙ্গে ব্রেক্‌-কষার কর্কশ আওয়াজ হলো। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল।

—কেউ চাপা পড়ল নাকি? কেয়া নয়তো? উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হয়ে তুষার সদর দরজা পার হয়ে পথের ধারে এগিয়ে গেল। চলার শক্তি তার শিথিল হয়ে এলো। পা উঠলো না। স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

দুজন লোক,—যাত্রী বোধ হয়—সামনের পথ বেয়ে বলাবলি করতে করতে গেল, একটুর জন্যে মেয়েটা বেঁচে গেছে। এঞ্জিনের ড্রাইভার না দেখলে কেউ জানতেও পারতো না।

তুষার বজ্রাহতের মত দরজার বাজুদুটো শক্ত করে চেপে ধরলে।

★

আবেদন

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

দিনের সবটা নাও—আমাকে রাত্রিটা শুধু দাও,
একান্ত নিজের করে পেতে দাও এটুকু সময়।
দিনের জোয়াল খুলে আমি হই অনন্তে উধাও,
রাত্রির পেলব বুকে আমি হই নিঃশেষে বিলয়।
শান্ত ধীর পদক্ষেপে সন্ধ্যা-চুল এলিয়ে যখন
রাত্রি আসে চুপি চুপি পূর্ব্ব তোরণের দ্বার খুলে,
আমি শুনি তার ডাক—ডাক শুনে স্বপন-মগন!
আমাকে থাকতে দাও এই স্বপ্ন মাঝে সব ভুলে।
জীবন আজ কী ভীষণ! রক্ত ঝরে প্রতি পদক্ষেপে!
জীবনের সব গান পিষে মরে রথের চাকায়!
যান্ত্রিক-সভ্যতা-পিষ্ট মন ওঠে মৃত্যুভয়ে কেঁপে!
পলাতক তবু নই—বিচরণ করি না ছায়ায়।
রণক্ষেত্রে সারাদিন রয়েছি তো সৈনিকের মত:
রাত্রির আবেশটুকু শুধু দাও সেরে নিতে ক্ষত।

মহাভিনিক্রমণ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শূন্য শয্যা; কাঁদে গোপা,—গৌতম কোথায়!
সুষুপ্ত কপিলাবস্তু ওঠে চমকিয়া;
স্তন্য-তৃপ্ত রাহুলের সুপ্ত শিশু-হিয়া
সহসা কাঁদিয়া ওঠে; চন্দ্র অস্ত যায়;
অন্ধকার ছায়া নামে নগরীর গায়।
আকাশ-অলিন্দ-পথে চাহিয়া—চাহিয়া
সহস্র—সহস্র তারা আঁধার বাহিয়া
ভীড় করে; নগরীতে ওঠে হায়—হায়!
সিদ্ধার্থের গোপা কাঁদে,—গৌতম কোথায়!
তাহার প্রেমিক কা'র মহা-প্রেমে ভোর,
ছিন্ন ক'রে চ'লে যায় ক্ষুদ্র প্রেম-ডোর!
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-মার কাঁদে হতাশয়
রাজত্বের শেষ ভাবি'। স্তম্ভিত হৃদয়,
আচম্বিতে হেরে গোপা নব-সূর্য্যোদয়।

পাশ্চাত্যে সমুদ্র-পূজা

শ্রীযতীন্দ্র সেন

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য-জগতের কোনো অংশে দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে, বা সেখানকার অধিবাসীরা কোনো দেবতার মূর্ত্তি-কল্পনা করে থাকে,—একথা জানলে অনেকের মনেই বিস্ময়ের ভাব জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই

বাঁ-দিকে : ব্রাজিলে পূজিত সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ইয়েমাঞ্জা'র দারুময় মূর্ত্তির চিত্র।

ডান দিকে : স্পেনীয়দের আরাধ্যা 'সাগর-রাণী' বা 'কুইন অব্ দি সী'র কল্পিত মূর্ত্তির চিত্রের প্রতিলিপি।

সেখানকার সকল দেশ হ'তেই মূর্ত্তিপূজা নির্ব্বাসিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দেব-দেবীর অনুপম মূর্ত্তিগুলি ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের অনবদ্য নিদর্শন-বস্তু রূপে বিভিন্ন মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে এবং এখন সে-সব মূর্ত্তি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণের মনে ভক্তির সঞ্চার না করে', অপূর্ব্ব গঠন-সৌষ্ঠবের জন্য কেবল তাদের মনে বিমুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব জাগ্রত করে, আর চোখের পরিতৃপ্তি সাধন করে।

কাজেই নিরাকার একেশ্বরবাদে যারা বিশ্বাসী এবং যারা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, তাদের দেশে কোথাও যদি মূর্ত্তিপূজার বা পৌত্তলিক আচার-পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়, তা হ'লে তা অদ্ভুত মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডের খৃষ্টধর্ম্মযাজকেরা স্ব স্ব রাষ্ট্রের অর্থসাহায্য-পুষ্ট হয়ে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে পৌত্তলিকতা দূরীকরণের পবিত্র ব্রত ও মহান্ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডেরই দুইটি দেশে পৌত্তলিকতার আধিপত্য যে আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে কৌতুকাবহ।

আমার এক বন্ধু পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামের দেশীয় খৃষ্টানদের এক পল্লীতে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করলেন যে, সেই পল্লীর অধিবাসীদের সকলেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হ'লেও তাদের অনেকের বাড়ীতে হিন্দুদের মতোই তুলসী-মঞ্চ রয়েছে এবং তাদের অনেকেই বাহুতে ও গলায় তাবিজ, কবচ ও মাদুলী ধারণ করেছে।

বন্ধুটি বিস্মিত হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : "তোমরা খৃষ্টান হয়েছ, কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে তুলসীমঞ্চ কেন? তুলসী-মঞ্চে রোজ সন্ধ্যায় তোমরা প্রদীপ দাও কেন? এবং তোমরা তাবিজ, কবজ ও মাদুলী ধারণ করেছ কেন? এ সবই কি খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী নয়?"

এই প্রশ্নগুলির তারা যে উত্তর দিল, তা বেশ

কৌতুকাবহ। তারা বলল: "খৃষ্টান হয়েছি বলেই কি আমরা ধর্ম্ম ছেড়েছি নাকি?"

এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস ও বংশ-পরম্পরাগত বিশ্বাস নিঃশেষে উন্মূলিত করা—মুছে ফেলা কত কষ্টসাধ্য!

ব্রাজিল ও স্পেনের অধিবাসীদের অনেকেই সমুদ্রের পূজা করে থাকে। কেবল সমুদ্রের উদ্দেশে অর্ঘ্য-নিবেদন নয়, সমুদ্রের অধিদেবীর মূর্ত্তি-কল্পনাও তারা বংশ-পরম্পরাক্রমে করে আসছে।

ব্রাজিলে ও স্পেনে সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে 'সাগর-রাণী' বা 'সমুদ্রের রাণী' ('Queen of the Sea') নামে অভিহিত করা হয়।

সমুদ্র-দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিশ্বাস

ব্রাজিলে 'সমুদ্রের রাণী'র নাম 'ইয়েমাঞ্জা' (Yemanja)। সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সাগর-রাণী ইয়েমাঞ্জার কর্ত্তৃত্ব সমুদ্রের উপর এবং যেখানে যত লবণাক্ত জলরাশি আছে, তার উপর।

ব্রাজিলবাসী ও স্পেনীয়দের বিশ্বাস, সমুদ্রের দেবী কেবল সমুদ্রের বিপদই দূর করেন না, ইনি অর্চ্চনাকারী নর-নারীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, স্বাস্থ্য দান করেন, সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন, দেহে যৌবন ও বর্ণশ্রী দান করেন এবং রক্ষা করেন, আনন্দ-ঘন মিলনে তরুণ-তরুণীদের প্রণয় সার্থক করে তোলেন, বিদেশে প্রবাসী আপনার জনকে বা নিরুদ্দিষ্টকে সত্বর গৃহে ফিরিয়ে আনেন, সমাজে ও কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ স্থান ও মর্য্যাদা দান করেন এবং এমন কি, ইনি ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ করিয়ে দেন। এক কথায়, সাগর-রাণী মানুষের মনের প্রায় সকল কামনাই তাঁর দেবীশক্তির বলে পূর্ণ করেন।

অর্চ্চনাকারীদের মধ্যে যুবতী নারীদের সংখ্যাই বেশী। অর্চ্চনাকারীরা, বিশেষতঃ পূজার্থিনী নারীরা তাদের মনের কামনার কথা এক চিঠিতে লিখে, সমুদ্রের বুকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে জলের উপর সেই চিঠি নিক্ষেপ করে সাগর-রাণীর কাছে অটুট অকপট বিশ্বাসের সঙ্গে তা নিবেদন করে। তারা এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে গৃহে ফিরে যায় যে, সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাদের নিবেদিত মনোবাঞ্ছা কখনও অপূর্ণ রাখবেন না।

ব্রাজিলে ও স্পেনে সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা কবে থেকে প্রচলিত হ'য়েছে, তা বলা কঠিন। তবে এ পূজা যে বহুকাল থেকেই চলে আসছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আদিম অধিবাসীদের প্রভাবেও এই পূজা প্রবর্ত্তিত হয়ে থাকতে পারে।

ঝুমঝুমির মতো বাদ্যযন্ত্র: মধ্যস্থলে মীনপুচ্ছ-বিশিষ্টা সাগর-রাণীর মূর্ত্তি-সমন্বিত, বৃত্তাকার, প্রান্তদেশে বহু-সংখ্যক ঘুঙুর-যুক্ত এই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পূজার সময় দেবীর সন্তোষ বিধান করা হয়।

কিন্তু দু'টি মহাদেশে অবস্থিত দু'টি ভূ-খণ্ডে একই পূজা-পদ্ধতি কিভাবে প্রবর্ত্তিত হ'ল, তা বিস্ময়ের বিষয়।

স্পেন ইউরোপের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে অবস্থিত, আর ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত, ইউরোপ মহাদেশ থেকে আকারে সামান্য ছোট একটি বিস্তীর্ণ প্রজাতন্ত্রী রাজ্য।

ব্রাজিলের উত্তর উপকূল থেকে সমুদ্রপথে স্পেনে

পৌঁছতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে। উভয় মহাদেশের মধ্যে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে একই পূজাপদ্ধতি প্রচলন নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ব্যাপার।

স্পেন ও ব্রাজিল—উভয় দেশেই সাগররাণীর পূজা প্রচলিত থাকলেও, দুই দেশের জনগণের সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য আছে।

ব্রাজিলে সমুদ্র দেবীর-মূর্ত্তি কল্পনা

ব্রাজিল-বাসীদের সাগররাণীর মূর্ত্তিকল্পনার মধ্যে তেমন

সুগন্ধি প্রসাধন-সাবানের পুলিন্দা: নৌকার উপর থেকে পূজার্থিনীরা সমুদ্রের দেবীর উদ্দেশে এই পবিত্র উপহার জলে নিক্ষেপ করছে।

কোনো বিশেষত্ব নেই। ব্রাজিলের সাগররাণীর মূর্ত্তি দেখতে তেমন সুন্দরও নয়। আমদের দেশে রথের নীচের দিকে যেমন অপটু হস্তে খোদাই করা, দেহাবয়বের অনুপাতিক পরিমান-বিহীন নারী-মূর্ত্তি দেখা যায়, এ মূর্ত্তিও দেখতে কতকটা সেই রকম। মাথার তুলনায় দেহ খর্ব্বাকৃতি।

কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তির সামুদ্রিক কড়ি ও ঝিনুকের মালা-বেষ্টিত মস্তকের উপর একটি আধার স্থাপিত। হাত দু'টি পরস্পর সংবদ্ধ ভাবে বুকের নীচে, কোমরের কাছে রক্ষিত। মূর্ত্তির দেহের উর্দ্ধভাগে আবরণের কোনো চিহ্ন নাই। দেহের নিম্নভাগে পরিধানে ঘাগরার মতো পরিচ্ছদের আভাস। তার নীচের দিক ঘিরে উৎকীর্ণ সামুদ্রিক কড়ি ও শঙ্খের নক্সা। চোখ দু'টি আয়ত, নাকটা দীর্ঘ, তীক্ষ্ণাগ্র। মোটের উপর মূর্ত্তিটি দেখতে অনেকটা আমাদের সুভদ্রার মতো বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। দারুময় দেবী-মূর্ত্তির মস্তকে দীর্ঘ কেশের কোনরূপ আভাসই নাই। এই কারণেই সম্ভবতঃ পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা দেবীর কেশবৃদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট কেশতৈল, লোশন ইত্যাদি উপহার দিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে।

স্পেনীয়দের সমুদ্র-দেবীর মূর্ত্তি-কল্পনা

স্পেনীয়দের সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ যৌবনের পরিপ্রকাশ সুস্পষ্ট। ব্রাজিলের সমুদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন অধিকতর প্রবীণা।

স্পেনীয়দের সাগর-রাণীর মূর্ত্তিরও উর্দ্ধভাগে কোনো আবরণ নাই। দেহের নিম্নভাগ আমাদের দেশের পৌরাণিক পরিকল্পনার মৎস্য-নারীদের মতো মীনপুচ্ছ-বিশিষ্ট। দেবীমূর্ত্তির কটিদেশ থেকে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সারিসারি আঁশের নিদর্শন বিদ্যমান।

দেবীর অজস্র উচ্ছ্বাসময়, সুদীর্ঘ, ঘন কেশরাজি আলুলায়িত। দক্ষিণ বাহুমূলে, বাম করপ্রকোষ্ঠে, কণ্ঠে বেষ্টিত এবং বক্ষোদেশে প্রলম্বিত সামুদ্রিক কড়ি ও ঝিনুকের মাল্য-আভরণ। দেবী উর্দ্ধমুখী হয়ে বাহুদ্বয় উর্দ্ধদিকে তুলে জলরাশির তলদেশ থেকে পূজার্থী নর-নারীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহার-দ্রব্য-সম্ভার গ্রহণ করছেন। এই ভাবে স্পেনে সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সাগর-রাণী'র মূর্ত্তি কল্পনা করা হয়েছে।

দেবীর সন্তোষ-বিধানের জন্য নানাবিধ উপচার

ব্রাজিলের জনগণের বিশ্বাস, সমুদ্রের দেবী তাঁর সুদীর্ঘ কেশরাজির অজস্রতা বিধান ও বৃদ্ধির জন্য কেশের পক্ষে হিতকর নানারকমের লোশন এবং তাঁর অপরূপ দেহের বর্ণ-সুষমা রক্ষা ও উজ্জ্বলতা-সাধনের জন্য প্রসাধন-দ্রব্যসমূহ

ভালবাসেন। দেবী তাঁর অসামান্য অলোক-সাধারণ রূপ-লাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ হ'লেও ব্রাজিলের মূর্ত্তি-শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দেবীর দারুময় মূর্ত্তিতে তার পরিপ্রকাশ হয়নি মোটেই। স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত দেবীর মূর্ত্তিতে অবশ্য দেবীর রূপ-লাবণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমুদ্রের দেবী প্রসাধন-দ্রব্যাদি ভালবাসেন বলে পূজার্থী নরনারী দেবীর প্রসন্নতাসাধনের উদ্দেশ্যে নানবিধ প্রসাধনদ্রব্য দেবীকে উপহার দিয়ে থাকে। দেবীকে প্রদত্ত উপহার দ্রব্যাদির মধ্যে প্রসাধন-দ্রব্যই প্রধান। পূজার্থী জনগণ দেবীকে প্রদানের উদ্দেশ্যে চুলের লোশন, পমেড, নখ-রঞ্জনী, ওষ্ঠাধর-রঞ্জনের জন্য লিপষ্টিক্, দেহের বর্ণ-সুষমার জন্য নানাবিধ ক্রীম, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, হার, দুল ও অন্যান্য ধরণের কর্ণাভরণ ইত্যাদি অলঙ্কার, রিষ্ট-ওয়াচ, হেয়ার-পিন ও ক্লিপ, লেস্, সুদৃশ্য সূচীকর্ম্ম-মণ্ডিত রুমাল, চুলের রিবন, অজস্র ফুল, ফুলের স্তবক, কৃত্রিম ফুল ইত্যাদি নিয়ে আসে।

ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব শক্ত করে সিদ্ধ করা ডিম, কেক্, ফলমূল ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয়ে থাকে।

এই সমস্ত উপহার-দ্রব্য পাত্রে পাত্রে সাজিয়ে, তার উপর যার যার মনের কামনা এবং সেই কামনা পূর্ণ করবার প্রার্থনা-লেখা চিঠি রেখে দেওয়া হয়।

দেবীর উদ্দেশে উপহার-দ্রব্যাদি উৎসর্গের পদ্ধতি

ভক্তির উন্মাদনায় অস্থির পূজার্থী নারী ও পুরুষ মনের অপূর্ণ কামনা ও প্রার্থনার বিবরণ-সংবলিত পত্র সমেত উপহার-দ্রব্যপূর্ণ খাঁড়ির তীরভূমিতে বহন করে নিয়ে যায়। উপহার-সামগ্রী-বহনের জন্য তীরভূমিতে বহু নৌকো অপেক্ষা করতে থাকে। এই সমস্ত নৌকোয় করে তীর-ভূমি থেকে বহুদূরে উপহার-দ্রব্য-সজ্জিত পাত্রসকল নিয়ে যাওয়া হয়। এই সমস্ত নৌকোয় সকলেই আরোহণ করতে পারে না, যাঁরা এই পূজা-উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁরাই নৌকোয় থাকেন। নৌকোয় ঢাকের মতো বাদ্যযন্ত্র ও এক প্রকারের ঝুমঝুমি নিয়ে যাওয়া হয়। উপহার-দ্রব্য জলে নিক্ষেপের সময় এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়।

নৌকো থেকে জলে দেবীর উদ্দেশ্যে উপহার-দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করেই নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তীরভূমির দিকে নৌকো চালিয়ে নিয়ে আসা হয়। যদি দেবীর সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হয়ে যায়,—এই ভয়েই নাকি নৌকোর আরোহীরা উপহার-দ্রব্যাদি জলে নিক্ষেপ করবার পরে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে চলে আসে।

উপহার-দ্রব্যাদি বহনকারী নৌকোসমূহের সঙ্গে আরও বহু নৌকোও গভীর জলে যায়। উপহার-দ্রব্য জলে নিক্ষেপের পর এই সমস্ত নৌকোও তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

দেবী কর্ত্তৃক উপহার-দ্রব্য গ্রহণের ইঙ্গিত

জলে নিক্ষেপের পর উপহার-দ্রব্যগুলি যদি ডুবে যায়, তা হলে অর্চ্চনাকারী নারী ও পুরুষ অকপটভাবে বিশ্বাস

ব্রাজিলে সমুদ্রের একটা খাঁড়ির মধ্যস্থলে নৌকোয় চড়ে গিয়ে ব্রাজিলের পূজার্থী নর-নারীরা সমুদ্রের দেবীর উদ্দেশে নৌকো থেকে নানারকমের উপহারদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করে, পাল তুলে তাড়াতাড়ি তীরের দিকে নৌকো চালিয়ে নিয়ে আসছে: দেবীর সঙ্গে যদি তাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, এই তাদের ভয়।

করে যে, ঐ সমস্ত উপহার-দ্রব্য জলরাশির তলদেশে সমুদ্রের দেবী 'ইয়েমাজা'র কাছে গিয়ে পৌঁছেছে এবং দেবী তা গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে পূজার ফল শুভ মনে করে সকলে নিশ্চিন্ত ও উল্লসিত হয়। নিক্ষিপ্ত উপহার-দ্রব্যসমূহ ডুবে না গিয়ে জলের উপর ভেসে উঠলে অনি-বার্য্যরূপে ধারণা জন্মে যে, দেবী ঐ সমস্ত উপহার-দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার ফলে জনগণের মন বেদনায় ও অমঙ্গল আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে পড়ে।

বান্ধবী

সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

খুব জোরে পড়াশোনায় মন লাগিয়েছিলাম। বাকী বকেয়া সব উসুল হ'য়ে গেল। না রইল ড্রইং বাকী, কারখানার এরিয়ারও প্রায় শেষ হয়ে এল। দায় যেমনি গেল কেটে, লক্ষীর সতর্কবাণী ভুলে, গল্প-গুজবে, খেলা-ধূলোয় মন উঠল মেতে।

সত্যি সত্যি সাতদিন পার হয়ে আটদিনও পার হতে চলল, লক্ষীর দেখা নেই। ওকে চিনতে আমার তখনও অনেক বাকী ছিল, তাই ভেবেছিলাম, আসবে না বলেছে, ও কিছু নয়, কথার কথা। মন উন্মুখ হয়ে উঠল ওর চিন্তায়। কাছে থেকে ওর বকুনি না খেলে, ওর শাসন না পেলে যেন আর চলে না। কেমন একটা মধুর আবেশ যেন আছে ওর শাসনের মাঝে, যা বলে স্পষ্ট করেই বলে। ন্যাকামো নেই, চাপল্য নেই ভালবাসার প্রকাশে, যা থাকে সাধারণ মেয়েদের মাঝে। তাইতো লক্ষী আমার কাছে তার সমস্ত সত্তা নিয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, বাসায় ছিল না কেউ। ব্যালকনীতে বসে বসে তাই যত রাজ্যের আজে-বাজে ভাবনা ভাবছিলাম। হঠাৎ লক্ষীর প্রসংগে মনে পড়ে গেল অসিতের কথা, গায়ে পড়ে কেমন করে লক্ষীর সঙ্গে ভাব করতে গিয়েছিল। শিষ্টতার মাত্রা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ি ও করে ফেলেছিল একটু, কিন্তু তাই বলে কি তাকে চপ্পল দিয়েই মারতে হবে? লক্ষী তাই মেরেছিল। এ নিয়ে ক্লাবে-হোটেলে, ছাত্রমহলে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল। অপমানের উত্তেজনায় অসিতের পক্ষের ছেলেদের মুখ হয়ে উঠেছিল লাল—লক্ষী যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত তবে তারা কি করত বলা যায় না। লক্ষীর সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয় নি। বেশীদিনের কথা না হলেও সে কথা সবাই আজ ভুলে গেছে, কিন্তু অসিত আজও ভোলে নি। যে মারে, সে ভুলে যায়, যে মার খায় সে ভোলে না। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই সে তাই লক্ষীর সম্বন্ধে কটূক্তি করতে ছাড়ে না। আর ভুলি নি আমি। লক্ষী কিন্তু নির্ব্বিকার—কোনদিন তাকে সে কথার উল্লেখ করতেও শুনি নি।

চিন্তার জাল বোনা থেমে গেল। দেখি রাজমহল রোড ধরে এগিয়ে আসছে রায়। কলেজে তার দেখা পাইনে, তাই ঔৎসুক্য জাগলো মনে। নীচু করে ফিনফিনে ধূতি পরা, সারা রাস্তার ধূলো কুড়িয়ে চলেছে কোঁচাটি। পাঞ্জাবিটী বিশেষ করে তৈরী, এসে নেমেছে পায়ের কাছে। বাঙ্গালী কাপড় পরবে, এতে হয় তো নতুনত্ব নেই তবু ওর পোষাকের বিশেষ ভঙ্গিটি দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। কলেজে ওকে পড়তে হয় না, যেতে হয় না কারখানায় কাজ করতে, তাই ও খায়-দায় আর প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়। আড্ডার দৌলতে ওর পড়ার প্রয়োজন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ছাত্রজীবনে যার পরীক্ষার চিন্তাই নেই, তার আবার ভাবনা কি! বাড়ি থেকে নগদ টাকা আসছে মাসে মাসে, খেয়াল-খুসিমত ওর যেন আনন্দ যমুনায় উজান বয়ে চলেছে। ওর সম্পর্কে নানারকম কথা শুনি এখানে-ওখানে, মনে মনে তাই একটা ঔৎসুক্য ছিল। কাছে আসলে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, এসো, এসো। খবর কি? এই অভাজনের কাছে কি মনে করে?

—এই জন্যেই তো আসিনে। না খুঁচিয়ে কথা বলতে পারিসনে তুই।

—ভালভাবে কথা বলতে চাইলেই তুমি এসে থাক নাকি?

জবাবদিহি দেবার মত করে রায় বলল, সত্যি ভাই, মোটেই সময় পাইনে। এই ছাখ, কাল আবার চ্যারিটি শো। তোকে কিন্তু একখানা টিকিট নিতে হবে। পরশু দিন ব্রীজ টুর্ণামেণ্ট।

—একেবারে টুর্ণামেণ্টই?

—তা নয়তো কি? একটা না একটা লেগেই আছে। এই তো, টেনিসে খেলা হবে মিকসড ডাবলে, লিলি বলছে তার সঙ্গে খেলতে, ডলি বলছে তার সঙ্গে। বলতো কি করি?

শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বললাম, গাধা কোথাকার! দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে খেল না। তোকে কী নাচিয়ে নিয়েই না বেড়াচ্ছে! এসব ছেড়ে ছুড়ে আবার পড়ায় মন দে। ক্লাসে কি ভাল ছেলে ছিলি তুই! এমনি করেই কি দিন কাটাবি! মাসে মাসে বাপকে ঠকিয়ে টাকা আনছিস। নিজেকে যে কত ঠকালি বুঝতে পারছিস নে? এই তো ছাখ, বোস তোদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াল এতদিন, এখন তোদের মাথা খেয়ে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে জার্মানী চলে গেল। তোদের কি হল? এমনি করে দিন কাটবে ভাবিস?

অসহিষ্ণু হয়ে রায় বলল, তোর এত তত্ত্ব কথা শুনতে আসিনি, সারা দিনের আনন্দটাই মাটি করে দিলি আমার। ভেবেছিলাম এক-আধ পেয়ালা চা হবে, তারতো কিছুই দেখছিনে, কেবল কথায় বৃহস্পতি তুই।

বললাম, বোস্, বোস্। এক্ষুনি চা আসবে। কথা গুলো তোর ভালর জন্যেই বলছি। বড় লোকের মোসাহেবী করা ছেড়ে দে।

কথা কেড়ে নিয়ে, নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে রায় বলল, এ শর্ম্মা কারুর মোসাহেবী করেনা জানিস? আমাকে ছাড়া ওদের চলে না। ওরাই আমার পিছনে ঘুরে বেড়ায়।

শ্লেষ করে বললাম, দেখিস্। অত খাতির ভাল নয়।

এ প্রসঙ্গের সূত্র ছিন্ন ক'রে রায় বলল, তোর পায়ে ধরেছি, আর সিরিয়াস টক নয়। আমার আসাটাই মাটি ক'রে দিলি। যা বলতে এসেছিলাম শোন এবার। আমি হিপনটিজম্ শিখেছি। হাসছিস্, সবই হেসে উড়িয়ে দিলে কি করে চলবে। আরে না না—তুইই আমার প্রথম অবজেক্ট্ নোস্। দাঁড়া—তোর সব জারি-জুরি আমি ভেঙে দিচ্ছি। হেসে বললাম, বৃথা চেষ্টা। শোন তবে। দেশে যখন স্কুলে পড়ি, আমাদের সহরে এসেছিলেন একজন হিপনটিষ্ট্। সেদিনের বিলেত ফেরত। বুঝতেই পার। এ. বি. সি. ডি করে নামের পেছনের লম্বা লেজ—যা ওদেশের রাস্তা-ঘাটে পাওয়া যায়। আমাদের ছোট্ট সহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। স্কুলে প্রথম দিন শো হল। অনেককেই তিনি কাবু করলেন, পারলেন না কেবল আমাকে। বিশ্বাস কর।

—রায় টেবিল চাপড়ে বলল, হতেই পারে না।

—থাক ও সব। অন্য কথা বল।

ও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। ভয় জেদ গেল বেড়ে। আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "sleep, sleep, sound sleep, deep sleep—think you are fast asleep." আমি চোখ মিটি মিটি করছি। ও আবার চোখ টিপে ধরে সেই একই কথা বার বার বলে যেতে লাগল। ঠিক এমনি সময় দাদা আফিস থেকে ফিরে এসে, ঘরে ঢুকে বললেন, হ্যালো। মিঃ রায় যে। এ আবার কী হ'চ্ছে?

রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, চুপ করুন দাদা আমি ওকে হিপনটাইজ করছি।

দাদা টাই খুলতে খুলতে শংকিত হয়ে বললেন, দেখো, এ নিয়ে ছেলে-খেলা করো না কিন্তু।

রায় নাছোড়বান্দা। প্রায় দশ মিনিট ধরে বসে সাপের ওঝার মত মন্ত্র পড়ল, ঐ একই কথা বলে। অতিষ্ঠ হয়ে চোখ খুলে বললাম, দেখলি তো?

দাদা বললেন, বাঁচলাম বাবা। থাকুগে ও সব। চা আসবার সময় হয়েছে, বোস, চা খেয়ে যাও।

হঠাৎ রায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, ভাখ্ ভাখ্ কে আসছে। তোর পায়ে পড়ি ভাই, একবার চোখ বুঁজে, মরার মত চেপে পড়ে থাক, দেখবি মজা।

—ও কিন্তু ভারী রাসভারী মেয়ে, ঠাট্টা-তামাসা বোঝে না।

দাদারও সায় আছে দেখে আর বিশেষ কিছু বলতে পারলাম না।

লক্ষ্মী এসে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে নি, বেয়ারাও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। লক্ষ্মী যখন শুনল হিপনটাইজ করার পর আর জ্ঞান ফিরে আসছে না তখন দৌড়ে জল নিয়ে এসে আমার চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে, মুখে আঙুল পুরে দিল দাঁত খুলবে বলে। তখনও জ্ঞান হ'চ্ছে না দেখে একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে অসহায়ের মত দাদাকে ডাকতে লাগল। দাদা আর রায় দু'জনেই অপ্রতিভ হয়ে গেল। ওরাও বুঝতে পারে নি, ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। ভাবলাম আর নয়, বড্ড বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে। জিনিষটাকে হাল্কা করে নেবার জন্যে লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে হো হো করে হাসতে লাগলাম। রাগের মাথায় লক্ষ্মী আমার গালে কষে এক চড় বসিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

দাদা হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে গেলে অশ্রুপ্লুত চোখ দুটি তুলে বলল, এ সব বাজে ঠাট্টা আমি পছন্দ করি নে। জীবন নিয়ে খেলা! আছেই তো একটা না একটা ঝঞ্ঝাট!

দাদা বললেন, তোর কপালে দুঃখ আছে অনেক।

এই প্রথম ওকে এত সস্নেহ সম্ভাষণ। লক্ষ্মী চোখ মুছে বলল, আছে বৈ কি। সে কি আর বলতে। আপনি তো যাচ্ছেন চলে; শেষে যে কি হবে জানিনে।

বেচারা রায় সংকোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। ওকে বিব্রত দেখে মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, হয়েছে কি? হেরেছিস তাই? এবার চা-টা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নে।

তবুও ও গুম হয়ে বসে রইল। কাঁধ দেখিয়ে বললাম, বারে, মার খেয়ে মরলাম আমি আর রাগ করলি তুই?

ঘরের ভেতরে সব কথা লক্ষ্মীর কাণে যাচ্ছিল, এবার বেরিয়ে এসে খাবারের প্লেটের ঢাকনা খুলে দিয়ে মুখে হাসি ফোটানর চেষ্টা করে বলল, নিন। রাগ করে না থেকে এবার খান।

রায় দিল-দরিয়া লোক, এবার সব রাগ তার জল হয়ে গেল। যাবার সময় আমার কানে কানে বলে গেল, তোকে আর বাংলায় ফিরে যেতে হবে না।

দেখতে দেখতে দাদার যাবার দিন এল ঘনিয়ে। বাড়িতে বাঙালীদের আনাগোনা সুরু হল। সবারই মুখ গম্ভীর। লক্ষ্মী যেন জড় হয়ে গেছে। মুখে নেই হাসি, নেই উচ্ছ্বাস, চলনে নেই আর সে গতিভঙ্গি, কথায় নেই ঝঙ্কার। ওর মা প্রায়ই দাদার কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে যাচ্ছেন অথচ বাড়ি থেকে প্রায় বেরোন না। কলেজ থেকে এসে দু'একদিন চোখে পড়ে আমায় দেখে ওঁরা কেমন যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে যান।

দাদা তাঁর সব কাজ সেরে এসেছেন, এবার যাবার পালা।

কোন কাজেই আজকাল আমার মন বসে না, কিছুই ভাল লাগে না, অসীম শূন্যতায় যেন মন গেছে ভরে।

এ' ক'দিন লক্ষ্মী আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি, দাদার সঙ্গেও তেমন না। চোখে চোখ পড়লেই ওর চোখ আসে ছলছলিয়ে।

বাঁধা-ছাদা শুরু হয়ে গেল, দেখা-শোনা বিদায় অভিনন্দনের পালাও শেষ হয়ে এলো। লোক-জনের আনাগোনাও হয়ে এল বিরল। কাল ওঁর চলে যাবার দিন। মিটিয়ে এসেছেন সব কাজ। আজ পূর্ণ অবসর।

লক্ষ্মী নিজের হাতে কত যে খাবার তৈরী করেছে তার ঠিক নেই। কত দিলে যে ওর শান্তি হবে জানিনে। দাদা গাড়িতে আর পথে যেখানে-সেখানে খান না তাই তাঁর খাবার জন্যে মিষ্টি, লুচি, বরফি এমন করে বোঝাই করেছে টিফিন কেরিয়ারটায় যে সেটার ডালা লাগানই দায় হয়ে উঠল। একটিও উঠিয়ে রাখতে মন চায় না। দাদা আপত্তি করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। ভোরের গাড়িতে চলে যাবেন বলে রাতারাতি বাঁধা-ছাদা সব ঠিক করতে হল। কাজ শেষ হলে দাদা বললেন, আর রাত করিসনে। কাছে আয় দেখি। দাদা ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। লক্ষ্মী বাঙালী মেয়ের মত পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, যদি রাতে আসতে না পারি, উঠিয়ে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

দূর পাগলী, রাত করে তুই কেন ষ্টেসনে যাবি? আরও কত কি হয় তো বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল, বলতে পারলেন না কিছুই।

লক্ষ্মী একটি কথাও না বলে শুধু আমার দিকে চেয়ে

চলে গেল, যার অর্থ আমিই বুঝলাম—আমায় নিয়ে যেও কিন্তু।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি, দাদা ডেকে বললেন, ঘুমিয়েছিস রে ?

আস্তে বললাম, না।

যেন নিথর দিঘীর জলে টুপ করে পড়ল বৃন্তচ্যুত একটি ফল।

আবার সব হয়ে এল নিথর, নিশ্চল।

এই দুর্ভেদ্য গুমোট নিস্তব্ধতা মনকে দিল আরও নিস্তব্ধ করে। এত নীরব, বালিসে কান রাখলে হৃদপিণ্ডের ধুকধুকুনি পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায়। ষ্টেসনে একটা গাড়ি এসেছে বোধ হয়, যাত্রীবাহী টাঙা গাড়ির ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে—শক্ত পাথুরে রাস্তায়। কচিৎ পেঁচকের ডাক আসছে ভেসে। সে শব্দ আবার মিলিয়ে যাচ্ছে দিগদিগন্তের আঁধারে। কেবল ঘরের টেবিলে রাখা টাইমপীসটা একটানা টিক টিক শব্দ করে চলেছে অবিরাম গতিতে।

—শুনেছিস বাঈ কি বলেছেন ?

চিন্তার গতি প্রতিহত হল। চমকে উঠে বললাম, তার কাছ থেকে শুনিনি, তবে লক্ষ্মী কিছু আঁচ দিয়েছিল।

—কী ? বল্‌না কি শুনেছিস ? চুপ করে রইলি যে ? যাবার আগে শুনে যেতে চাই তোর মনের কথা।

আমার তো বাঈ নিজে কিছু খুলে বলেননি, লক্ষ্মীও ভাসা ভাসা কি সব বলছিল। আমি কিছুই বলতে পারিনি। কিইবা বলবার আছে বলুন। ওর মায়ের মনের কথা আমি বুঝি কিন্তু মনকে বোঝাতে পারিনে। যে স্নেহ দিয়ে এতদিন তিনি আমায় ঘিরে রেখেছিলেন তাকে পরিশোধ করব কি দিয়ে ?

—মায়ের ঋণ কি পরিশোধ করা যায়। আপন বা নাইবা হলেন, উদাস গলায় দাদা বললেন।

—এমনি করে জড়িয়ে পড়ব বুঝতে পরিনি। বা মনে মনে এতটা পোষণ করতেন তাও বুঝিনি। কী বলে যে তাঁকে এখন বিরত করব তারও তো ভাষা পাইনে খুঁজে।

—কিছু মনে করিসনে ভাই, একটা কথা বলছি তোর কি ঐ অপার ঐশ্বর্য্যের কোন মোহই নেই ?

—নেই বলতে পারিনে দাদা। যে দিন থেকে শুনেছি, সেদিন থেকেই ঐ হীরা—জহরতগুলো আমার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠছে একটা রহস্য নিয়ে। কিন্তু তার দৌড় বেশী নয়, বোধ হয় ঐ পর্য্যন্তই। আপনি তো সবই জানেন। লক্ষ্মীর ভাবনা ছাপিয়ে, ও সব ভাবনা আমার কাছে বড় হয়ে ওঠে না। তার এই অপার ভালবাসা, স্নেহ, প্রেমকে অবহেলা করা চলে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ গর্ব্ব আর পুলক ধরে রাখবারও আমার জায়গা নেই যে, লক্ষ্মীও সেটা বুঝতে পেরেছে, তার মার ঐশ্বর্য্য আমায় প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই একদিন কথা-প্রসঙ্গে হেসে সে আমায় বলেছিল, ও সবে ভুলবার পাত্র তুমি নও।

দাদা বললেন, আবারও সেই একই কথা বলছি, এর শেষ কোথায়। কী যে শংকা জাগে ওই মেয়েটাকে নিয়ে, ও কি শেষ-পর্য্যন্ত—।

বাধা দিয়ে বললাম, আমাকে দিয়ে বলছেন ? আপনি চলে গেলে— ?

—আরো না, না। কী পাগল।

—শুনুন দাদা, মনের আর স্নেহের টান বড়ই থাক, সংযমের টান তার চাইতে আমাদের কম নয়। বড়াই করে বলছিনে, তবে কিছু হলেও তাই নিয়ে অপশোষ করবার কিছু থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

মনে হল দাদা ইচ্ছে করে প্রসঙ্গকে চাপা দিলেন।

তোর কাছে তোদের বাড়ির কথা সবই শুনেছি, যতদূর শুনেছি তাতে বুঝেছি এখান থেকে একদিন তোকে চলে যেতেই হবে। বাঈকে সে কথা আমি বার বার বলেছি, কিন্তু তার মন ফেরাতে পারিনি। তাঁর ঐ একই কথা। পেটের ছেলে নয় বলে কি ছেলে নয়। তাছাড়া, অন্যদিকে বাঈ-এর মন হয়েছে চঞ্চল। তিনি আর এখানে থাকতে চান না।

—এতদিন এত আলোচনার পর কি সিদ্ধান্তে এলেন জানতে পারি ?

—এ সমস্যার সমাধান কি করে হবে? যে ঘুমিয়ে জেগে আছে তাকে যেমন জাগান যায়না, তেমন যে বুঝেও বুঝ মানে না, তাকেও বোঝান যায় না। ওকে তোর দেশের কথা, বাড়ির কথা সব বললাম, বললাম, লক্ষ্মীর স্বামী বেঁচে থাকতে এ হতে পারে না। আইনের চোখে, কাগজে কলমে সে-ই স্বামী। উত্তরে বললেন, এ কোলকাতা নয়। এখানে এত আইন-টাইন চলে না। তাছাড়া সে তো ছাড়পত্র লিখে দিয়ে চলেই গেছে। এ সুযোগ তিনি ছাড়তে চান না। তোমার হাতে রাজকন্যা আর গোটা রাজত্ব তুলে দিয়ে তিনি তীর্থবাসী হবেন। কি রে, ঘুমুচ্ছিস নাকি?

—ঘুম কবে পালিয়েছে চোখ থেকে।

—মনে হচ্ছে কি জানিস? আমারা সবাই যেন পথের মাঝে তোকে একলা ফেলে চলে গেলাম। এ আমি ভাবতে পারিনে। আবার তুই চলে গেলে ওর নিঃসঙ্গ জীবনটার কথাও ভাবি। তা ছাড়া টাকার পরিমাণটাও তো কম নয়। বারো ভূতে এসে লুটে-পুটে খাবে।

আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বললাম, ভূত তাড়াবার মন্তরও জানে। ওকে চিনতে এখনও কি আপনার বাকী আছে?

—তাই যেন হয়। ও যেন সব দিক বজায় রেখেই চলতে পারে। মনে হল দাদা হাত তুলে ভগবানের উদ্দেশে ওর হয়ে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন।

যাবার আগে দাদার সঙ্গে যে কথা হল তার সাক্ষী রইল ঐ বাকমুখর টাইম-পীস্ আর নিস্তব্ধ রাত্রি।

কথা বলতে বলতে দু'জনেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরের দিকে দারোয়ানের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল।

লক্ষ্মী দু'টো টাঙ্গা পাঠিয়ে দিয়েছে। একটাতে মাল-পত্র চাপিয়ে, আর একটাতে নিজেরা চেপে রওনা হলাম। খুব ভোরেই গাড়ির সময়। তখনও অন্ধকার কাটে নি। মোড়ের মাথায় হোটেল ডাইনে রেখে ষ্টেশনে যেতে হয়। দাদাকে একটু ধাক্কা দিয়ে আঙুল দিয়ে ইসারা করে বললাম, দেখেছেন দাদা, রেলিং ধরে কে দাঁড়িয়ে আছে।

—ও বেচারার বোধ হয় সারারাত ঘুম হয়নি। কতবার হয়তো ওপর-নীচ করেছে।

গাড়ি এসে হোটেলের গেটে থামলে বাঈ নিচে নেমে এলেন। দাদা আর উনি একান্তে গিয়ে কি যেন চুপি চুপি বলে বিদায় নিলেন। গাড়ির কাছে এসে দাদা বললেন, তোরা পেছনে বোস্, আমি আগে যাই, ও যখন যাবেই।

লক্ষ্মী আপত্তি জানিয়ে বলল, না, না, আপনার কষ্ট হবে। আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমক দিয়ে উঠল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? সামনে যেতে পার না?

দাদা তখন নিজে হাত ধরে ওকে পেছনে বসিয়ে দিয়ে আমায় বললেন, বোস্ তুই, আর নিজে গিয়ে সামনে বসলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিলে বাঈ আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি আবার ফিরে এসো কিন্তু। সে কথা শুনে, এত দুঃখেও সবাই হেসে উঠল। দাদা অস্ফুটস্বরে বললেন, একেবারে ক্ষেপে গেছেন।

গাড়ি ছেড়ে দিলে হঠাৎ লক্ষ্মীর চোখ প'ড়ল—ওভার-কোট আনি নি।

—ভুলে গেছ না ইচ্ছে করে আনো নি?

—ইচ্ছে করেই আনি নি। ঐ জবরজং বোঝা নিয়ে চলতে পারি নে বাপু।

এরপর একটা কথাও না বলে ওর শালটা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে দিল। মনে হল নতুন দিনের আগমনী ক্ষণে, শিশির-স্নাত পবিত্র উষায় সমব্যথী বেদনা-বিধুর দুটি হৃদয় যেন যুগ্ম হয়ে গেল।

একটু পরে অনুযোগ করে লক্ষ্মী বলল, এইতো খুক খুক করে কাশছো। কি বুঝে এমনি করে বেরুলে?

ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, তাহ'লে তো আর শালটা দিয়ে ওমনি করে জড়িয়ে দিতে না, এত নিবিড় করেও তোমায় পেতাম না।

কিন্তু কিছুই না বলে শুধু ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে, যেখানে আলো-আঁধারে আমাদের গাড়ির ছায়াটা একবার খর্ব্ব আর একবার দীর্ঘ হয়ে লুকোচুরি খেলছিল।

প্রায় ষ্টেশনের কাছাকাছি এলে, লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করল, দাদা, গাড়ি যেন ক'টায় ?

—সাড়ে চারটায় ইন্ করে পৌণে পাঁচটায় ছেড়ে যায়, এই তো ও বলল।

আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রত্যুত্তরে বলল, নিজে গাইড দেখেন নি ? ওর কথা।

ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি তখনও গাড়ি ইন্ করে নি। দাদা ওয়েটিং রুমে আমাদের দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে বসে উপদেশের বেড়াজালে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গেঁথে দিয়ে যেন একটা পরম আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে গেলেন। এত কথা তাঁকে কোনদিন বলতে শুনি নি, গম্ভীর না হলেও প্রগল্‌ভ ছিলেন না। কিন্তু আজ যেন তাঁর সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেছে।

তাঁর যে আর সময় নেই। এই অল্প সময়ে তাঁকে যে সব কথা শেষ করে যেতে হবে। যত সম্ভাব্য বিপদ হতে পারে তার একটি একটি করে তালিকা তিনি দিয়ে গেলেন। এ যেন ডাক্তারের রোগ নির্ণয় আর তার ব্যবস্থা-নির্দেশ।

কিন্তু শত সহস্র কথার চাপে আসল সমাধানটি পড়ে রইল চাপা। কত ভাবে, আভাষে ইঙ্গিতে বলতে গেলেন, কিন্তু বলা হল না।

আমাদের এ যোগযোগকে তিনি না পেরেছিলেন গ্রহণ করতে, না ছাড়তে। যার নিজের মাঝেই চলেছে দ্বন্দ্ব, সে কথা দিয়ে আরও কথার জাল বুনে যেতে পারে কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অসীম ধর্মভীরু তিনি, ভাবছিলেন কি অন্যায় না জানি আমাদের ওপর করে ফেলেন। আবার সংস্কারের দুর্ভেদ্য বেড়াজালকে ছিঁড়ে বাইরে বেরুবার সামর্থ্যও ছিল না তাঁর। হঠাৎ কথা থামিয়ে দাদা বললেন, বড্ড বকে যাচ্ছি নাবে ?

—একি, গাড়ি তো এখনও আসছে না।

যত দেরীতে আসে ততই ভালো, আবার কবে দেখা হবে জানিনে। কোলকাতায় গিয়ে চিঠি দেবেন কিন্তু। আপনার তো আবার যা ভুলো মন, বললাম আমি।

—তাই বলে কি তোর কাছে চিঠি দিতে ভুল হবে ?

—এদিকে আবার কবে আসবেন দাদা ? লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল, চোখদু'টো ওর ছলছল করছে।

ঢং ঢং করে গাড়ির ঘণ্টা পড়ে গেল। আমরা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ি ইন্ করলে পাশের একটা বার্থে দাদার বিছানা করে দিয়ে আমরা দাদার পাশে বসলাম। খাবার ঝুড়ি আর টিফিন কেরিয়ারট ওপরে ওঠাতে ওঠাতে লক্ষ্মী বলল, একটি খাবারও কিন্তু ফেলতে পারবেন না। অনেক কষ্ট করে নিজের হাতে করেছি। টিফিন কেরিয়ারে যা আছে আগে খেয়ে ফেলবেন, ঝুড়ির গুলো বাড়ির জন্যে। কয়েকদিন থাকবে।

—আচ্ছা। এবার কাছে এসে বোস্ দেখি।

লক্ষ্মী বসতে যাচ্ছিল কিন্তু এবার গাড়ি ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। আমরা দু'জনেই প্রায় একই সময়ে ওঁকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এসে জানলার কাছে দাঁড়ালাম।

সবারই চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। দাদার দৃষ্টি সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল, কী যেন বলা হয়নি, কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এমনি ভাব। কী যেন বলা হয়নি, কী যেন করা হয়নি।

হঠাৎ আমাদের দু'জনের হাত দুটো টেনে নিয়ে এক করে দিতে চাইলেন। লক্ষ্মীর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দকে ছাপিয়ে বেজে উঠল গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা—গার্ডের বাঁশী। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমাদের হাত দু'টি দাদার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। দাদা আর্তনাদ করে উঠলেন। লক্ষ্মী পড়ে যাচ্ছিল। আমি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে দু'হাতে তাকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে এক দিকে চেয়ে।

ঝাপসা হয়ে এসেছিল চোখের দৃষ্টি। চোখ মুছে ফেলে দেখি বাঁকের মুখে অন্ধকারের বুকে দাদাকে নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে যেন নিশ্চল পাথর প্রতিমা।

কবি রংগলাল

(১৮২৭-৮৭)

শ্রীঅণিমেশ চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বংগকবিগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের পরে রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান। তিনি বংগসাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যের প্রবর্তন করিয়া এক নব-যুগের উদ্বোধন করিলেন। তাঁহার রোমান্টিক কাব্যের মূলমন্ত্র নারীপ্রেম নহে,—স্বদেশ প্রেম।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার বিকাশ হয়। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি কাশীধাম যাত্রা করেন এবং তখন তিনি 'কাশীযাত্রা' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং তখন হইতেই ইঁহার কাব্যরচনা স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তখন 'সংবাদ প্রভাকরে' রংগলালের বহু কবিতা প্রকাশিত হইত। পরে তিনি 'রসসাগর' নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন এবং তাহাতেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে তিনি 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ও 'শরীর-সাধিনী বিদ্যার গুণকীর্তন' নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫৫ খৃঃ 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশিত হইলে তিনি এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'কর্মদেবী' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'শূর-সুন্দরী' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময়ে রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র সম্পাদিত 'রহস্যসন্দর্ভ' নামক সংবাদপত্রে কবির "মনসাদেবীর গুণকীর্তন' বিষয়ে কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্মস্থল কটকে অবস্থান কালে 'উৎকল দর্পণ' নামক উড়িয়া-ভাষায় একখানা সংবাদপত্র বাহির করেন।

১২৮৪ বংগাব্দে কবি 'বংগদর্শনে', 'নীতি কুসুমাঞ্জলি' নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপর সংস্কৃত 'কুমার সম্ভব' কাব্যের বাংলা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর মেদিনীপুরে অবস্থান কালে 'কবি কংকণ চণ্ডী' নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কবি 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামক 'জগন্নাথের মাহাত্ম্য-সূচক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি কালিদাসের 'ঋতু-সংহার' অনুবাদ, 'উত্তর রাম চরিতে'র 'লক্ষ্মণ-বিজয়' ও 'চন্দ্রহংস নাটক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন, কিন্তু তৎসমুদয় মুদ্রিত হয় নাই। কবির 'শক্তি ও বিষ্ণু বিষয়ক গীতি গ্রন্থ'খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রংগলাল স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কোন বস্তু দেখিলে কবিতা লিখিতেন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপাদান লইয়া তিনি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' 'শূর সুন্দরী' ও 'কর্মদেবী' এই তিনখানি খণ্ড কাব্য রচনা করেন। খাঁটি ঐতিহাসিক কাব্য রচনার প্রবর্তক এই রংগ-লাল। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন কতক বাস্তব ও কতক অবাস্তব ঘটনার বর্ণনা থাকে ইহাতেও তাহা আছে। রংগ-লাল টড্ সাহেবের ইতিহাস হইতে রাজপুত কাহিনী হইতে তাঁহার কাব্যের মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষিত রংগলাল যে দেশপ্রীতি, শৌর্য, তেজ-স্বিতা, নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের আদর্শ লাভ করিয়া-ছিলেন তাহারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে তাঁহার কাব্যে। রংগ-লাল ইংরাজী কাব্য হইতে প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার আদর্শ ছিল স্কট, সেক্সপীয়র, বায়রণ, মূর প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণ। মাইকেল মধুসূদন রাজ-নারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেনঃ

> "Rangalal is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his estimation."

রংগলালের কাব্যের বহু স্থানেই ইংরাজ কবিগণের ভাবানুবাদ পাওয়া যায় সত্য কিন্তু নিজ প্রতিভা প্রভাবে সেগুলি এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

রংগলালের কাব্য শুধু নবীন সমাজে নয়, প্রাচীন সমা-জেও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার কারণ রংগলালের কাব্যে নূতনত্বের সঞ্চার হইলেও ভাষা ও রূপ ছিল পুরা-তন।

পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮):

দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন রাজপুতনার অন্তর্গত চিতোরের অধিপতি ভীম সিংহের পত্নী অপরূপ সুন্দরী পদ্মিনীর রূপ গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার মানসে

বিপুল সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করেন; এবং কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রাজপুত ও পাঠানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইলে, পাঠানদিগের জয় এবং চিতোর নগরের ধ্বংস হয়;—পদ্মিনী ধর্মলোপ ভয়ে 'জহরব্রত' অবলম্বন করেন এবং ভীম সিংহও যুদ্ধে প্রাণ হারাণ।—রাজপুত ইতিহাস হইতে কবি এই কাহিনী সংগ্রহ করিয়া 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেনঃ

"কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ" পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।"

রাজপুত কাহিনী গ্রহণ করিবার কারণও তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেনঃ

"পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান, ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐসকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ গ্রন্থার্হ নহে এবং এতদ্দেশীয় জন-সমাজে বিদ্যাবুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধান কালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এ-দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরতা, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ, সতীত্ব, প্রজ্ঞা এবং সাহসিকতা গুণে সেরূপ রাজপুত রমণীরাও প্রসিদ্ধ ছিলেন, অতএব স্বদেশীয় লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয় এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক মৎ কতৃক রচিত হইল।"

বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও আলোচনা পদ্ধতির মধ্যেও নূতনত্বের আভাষ পাওয়া যায়ঃ—পদ্মিনীর রূপবর্ণনায় বহুকাল প্রচলিত উপমা বর্জন করিয়াছেনঃ

"অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভামিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসী সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে।"

যুদ্ধ বর্ণনার ব্যাপারেও তাঁহার নূতনত্ব চোখে পড়ে। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় দ্বৈরথ যুদ্ধ-প্রথা বর্জিত হইয়াছে।

রংগলালের কাব্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরে নাটকীয় গন্ধ পাওয়া যায়ঃ—ভীম সিংহ ও আলাউদ্দীনের বাক্‌বিতণ্ডা আলোচনা করিলেই আমরা তাঁহার নূতনত্ব সম্পর্কে পরিচিত হইতে পারি। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হইল;—

বন্দী ভীম সিংহের প্রতি আলাউদ্দীনের উক্তিঃ—

যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন॥
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ-ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি॥"
...ইত্যাদি

তদুত্তরে ভীম সিংহ বলিতেছেন —

"এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর
নিপট লম্পট শঠ কুনীতি-আকর॥
যায় যাক্ ছার প্রাণ নাহি তাহে ভয়।
দেখি কোন সাচ্চা বাচ্ছা পদ্মিনীরে লয়॥"
...ইত্যাদি

ভীম সিংহের এইরূপ বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তি শুনিয়া আলাউদ্দীন যেন সহস্র সর্প-দংশনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন;—তিনি বলিলেনঃ—

"আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ॥"
...ইত্যাদি

আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ভীম সিংহ নিজ সৈন্যগণকে যে উত্তেজক বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিতেছিলেন, তাহাতে Thomas Moore-এর এক কবিতার ভাবানুবাদ পাওয়া যায়।

ভীমসিংহের উত্তেজনাপূর্ণ বাণীঃ—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরক প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।"
...ইত্যাদি।

তুলনীয়;—

"From life without freedom oh! who would not fly?
For one day of freedom oh! who would not die?"

পদ্মিনী অগ্নি প্রবেশকালে সহচরিগণের প্রতি যে উৎসাহ বাণী দিয়াছিলেন; তাহাও অতি মর্ম্মস্পর্শীঃ

"এসে এসো সহচরীগণ।
হুতাশন-গ্রাসে করি জীবন অর্পণ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধো বিনাইয়ে কেশ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥
* * *
এস যাই অমর-নগরে
সবে আনন্দ অন্তরে।
বিলম্ব উচিত নহে এসো গো সত্বরে॥"
...ইত্যাদি।

পদ্মিনীর বর্ণনা, পদ্মিনী প্রদর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন-দশা, ভীমসিংহের পরিত্রাণ, সেনাগণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য, পদ্মিনীর অগ্নি-প্রবেশ, রাজপুত নরনারীগণের তেজস্বীভাব প্রভৃতি বেশ উৎকৃষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। এত সুন্দরভাবে কবি এই সব গুলি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে এইরূপ কাব্য-গ্রন্থ বোধহয় আর রচিত হয় নাই।

কবি পাঠানের ধ্বংসাভিযানের কথা বলিতে যাইয়া কালের ধ্বংসলীলার উল্লেখ করিয়াছেনঃ

'করাল কালের কাণ্ড যেন সব ক্রীড়াভাণ্ড
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।"

পরাধীনভারতে একমাত্র চিতোর নগর ছিল স্বাধীন, তাহাও নষ্ট হইতে চলিলঃ

"সেরূপ ভারত দেশ, স্বাধীনতা-সুখশেষ
ছিল মাত্র রাজপুতানায়॥
কি হইল হায় হায়, যে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল॥"

এই কাব্যগ্রন্থটি নিছক দোষ-ত্রুটিহীন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না;—স্থানে স্থানে বেশ দুর্বোধ্যতা দোষ আছে, এবং স্থল বিশেষে ব্যাকরণের অশুদ্ধি ও দোষ আছে। সর্বোপরি, যখন আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন; কিন্তু চিতোরের দুর্গে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন পদ্মিনীকে খুঁজিয়া পাইলেন না—পদ্মিনীর জন্য দুঃখ করিলেন না,—পদ্মিনী না পাইয়াও এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের অনর্থক অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া একবারের জন্যও আক্ষেপ করিলেন না।—এখানে খেদোক্তি থাকিলে, আরও হৃদয়গ্রাহী হইত।

কর্ম্মদেবী (১৮৬২)

'কর্ম্মদেবী' কাব্যের আখ্যায়িকার উপাদানও রাজপুত কাহিনী হইতে লওয়া হইয়াছে। দুই রাজপুত পরিবারের মধ্যে বিবাদই এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

ঔরিস্টপতির কন্যা কর্ম্মদেবী যশল্মীর অধিপতির পুত্র সাধুর শৌর্য, বীর্য ও রূপে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাঠোরের রাজপুত্র অরণ্যকমলের সহিত বিবাহ দিবার সংকল্প করেন। কিন্তু কর্ম্মদেবী পিতৃকৃত এই সম্বন্ধ ভংগ করিয়া সাধুকে বরমাল্য দিলেন;—এই সূত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অরণ্যকমলের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সাধু হত হন। কর্ম্মদেবী পতির মৃত্যুর পর স্বহস্তে এক বাহু ছেদন করিয়া পিতৃ কুল-কবির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং অপর বাহু নিজ শ্বশুরকে দেখাইবার জন্য ছিন্ন করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন। যে স্থানে এই সকল ঘটিয়াছিল, সেই স্থানে 'কর্ম-সরোবর' নামে এক সরোবর খনন করা হয়।—এই উপাখ্যানই 'কর্ম্মদেবী' কাব্যের প্রাণ।

'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের ন্যায় 'কর্ম দেবী' কাব্যেও রাজপুত রমণীগণের সাহসিকতা, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীত্বধর্মের পরিচয় সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাব্যের নায়িকা কর্ম্মদেবী চরিত্রে ওজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি গুণাবলীর প্রকাশ পাইয়াছে। সাধুর মৃত্যুর পর ভ্রাতার নিকট কর্ম্মদেবীর বক্তৃতা কি সুন্দর তাহা পাঠক সমাজ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারেন। সেই বক্তৃতার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলামঃ

"ক্ষণেক হইয়ে সচেতন,
প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-কংকণ।
পূর্বকথা সকাতরে, শোকমগ্ন ভগ্নস্বরে,
কহিছেন সহোদরে, পরিহরি রোদন॥
আর মম জীবনে কি ফল ভাই,
আর বল বাঁচিয়ে কি ফল?
নাথ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই,
জ্বলে যেন প্রবল অনল॥
এ অনল জুড়াইতে আছে ভাই,
কেবল সে চিতার অনল।
দেহ তার আয়োজন,
এই শেষ ভিক্ষা ভাই করহ সফল॥"

আবার মৃত্যুমুখী কর্ম্মদেবী ভ্রাতাকে বলিতেছেনঃ

"শুন শুন ভাই,
করিহ পালন মম চরম বচন॥

আমাদের কুল-কবিবরে,
দিও এই হস্ত রতন মণ্ডিত,
সতীত্বের সংগীত আখ্যানে ভাই,
গান যেন দাসীর চরিত॥

* * *

করবালে ছেদন দক্ষিণ বাহু,
হোক মম সুখেতে মরণ॥"

.........ইত্যাদি।

এ সকলি বেশ হৃদয়গ্রাহী রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে কবি যে সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে নীতিঘটিত আলোচনা আছে এবং ইহার মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ভাবা ও শব্দ নির্বাচনের ভিতর দিয়া কবি খানিকটা শান্তরসের অবতারণা করিয়াছেন:

"দিবা অবসান হয়, নভোলোক-তমোময়,
ধূসর বরণা দিগঙ্গনা।
স্থির নেত্রে দেখা যায়, শোভা পায় দীপ প্রায়,
দুই এক তারা খ-ভূষণা॥
যেন নায়িকার আশে, প্রেমিকের হৃদয়াকাশে,
দুই এক ভরসার ভাতি।
একবার একবার, ভাব পথে অবতার,
হয়ে পুনঃ নিভায় সে বাতি॥
পরে প্রিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেই ক্ষণে,
আর তারে মলিন কে করে?
অস্ত ক্ষোভ দিন-পতি, আশা তার দীপ্তিমতী,
সুখ শশী উদয় অন্তরে॥"

যুদ্ধ বর্ণনা প্রসংগে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ আছে:

"সাজ হে সাজ হে যত সাজ বীরগণ।
নিজ নিজ সমযোগ্য সহ কর রণ॥"

এখানেও 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র মতই উৎসাহ বাণী ধ্বনিত হইতেছে।

বিদেশীয় বণিককে বাণিজ্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে কিনা তাহার যুক্তি তর্ক এই কাব্যের মধ্যে আছে। বণিক রাজাকে প্রলোভিত করে:

"আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য ব্যবসা।
জগতের হিতব্রতে ভাগ্যের ভরসা॥

* * *

সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি।
বণিকের ধনবৃদ্ধি তাহার সংহতি॥"

.........ইত্যাদি।

রাজা তদুত্তরে বলিলেন:

"ধন আশে পুনঃ আর এস না এদেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে॥
এত বলি অশ্ব দিয়া করিল বিদায়।
সেলাম করিয়া পদে পাঠান পলায়॥"

কর্মদেবী কাব্যে বহু ঐতিহাসিক বিষয়ের বর্ণনা আছে। কাবুলী মেওয়া, আম্র, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি দেশীয় ফল, ঢাকাই মসলিন কাশ্মিরী শাল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের চিত্তাকর্ষক রূপে বর্ণনাও আছে:

"ঢাকা কাশ্মিরীরের তন্তে কি শিল্প চাতুর্য।"

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের তুলনায় 'কর্মদেবী' কাব্য কিছু উন্নত ধরণের হইলেও, প্রথমোক্ত কাব্যের ন্যায় শেষোক্ত কাব্যও দোষ গুণে সমতুল্য।

শূর-সুন্দরী (১৮৬৮)

'শূর-সুন্দরী'র মর্ম কথা এই:—দিল্লীশ্বর আকবর শাহ, নিজ শ্যালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরের রাণার উপর কুপিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তাঁহার কুলে কলংক দিবার মানসে দিল্লীর অন্তঃপুরের রমণীদিগের 'নৌরোদা' নামক সখের বাজার স্থাপন পূর্বক তথায় উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্যা পৃথিবরায়-পত্নীকে কৌশলে আনয়ন করিয়া তাঁহার সতীধর্ম নাশের চেষ্টা করেন। শূর-সুন্দরী আক্রমণ সময়ে তরবারি দ্বারা বাদশাহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 'আর কখনও কোন রাজপুত মহিলাকে অন্তঃপুরে আনিবেন না এতদ্বিষয়ে এক স্বীকৃতিপত্র লিখিয়া দেন।'—রংগলালের প্রতিভার প্রভাবে এই পুরাতন কাহিনীও নূতনত্ব রূপে প্রকাশিত হইল এই 'শূর-সুন্দরী' কাব্যে।

এই কাব্যেও রাজপুত রমণীদিগের সাহস, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'কর্মদেবী' কাব্যে 'কর্মদেবী' চরিত্রের ন্যায় 'শূর-সুন্দরী' কাব্যের নায়িকা 'শূর-সুন্দরী'র চরিত্রও ওজস্বী, উদার ও অতি নির্মল রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিলে হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ভাবের উদ্রেক হয় তাহার প্রমাণ রংগলালের এই কাব্যে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বারা মনে ভাবের উদয় হইয়াছে, এইরূপ প্রকাশ ইতিপূর্বে আর কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। 'শূর-সুন্দরী' কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনায়ও কবির যথেষ্ট মৌলিকত্বের পরিচয় পাই। প্রভাত বর্ণনা প্রসংগে তিনি লিখিয়াছেন:

"দেখ কমলিনী-কলি প্রভাতে উদয়।
নব বধূ-সম কিবা লালিত্য-নিলয়॥
অর্দ্ধ বিকসিত মুখ,
নয়নে বিতরে সুখ,
অস্ফুট কারণে দুঃখ,
ভাবে অনিচয়॥"
......ইত্যাদি।

Byron, Scott প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণ গীতি-কবিতার কবি হইলেও আখ্যায়িকার কবি নহেন, কিন্তু রংগলাল এই দুই বিষয়েরই কবি। এই কাব্যে আমরা কবির এই দুই-বিষয়েরই কৃতিত্ব দেখিতে পাই।

এতদিন আমরা কবিতাকে সরস্বতীরূপে কল্পনা করিয়াছি;—কিন্তু রংগলাল কবিতাকে প্রেয়সী, অপ্সরারূপে কল্পনা করিয়াছেন।—এখানেই তাঁহার নূতনত্ব। কাব্যারম্ভের প্রথমেই তিনি কবিতা শক্তির প্রতি মংগলাচরণ প্রসংগে উল্লেখ করিয়াছেনঃ

"বহুদিন দেখি নাই শান্তি মুখ-শশী।
দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা-মসী॥
* * *
তুমি মম কিশোর-কালের সহচরী।
তব সংগে যেত রংগে দিবা-বিভাবরী॥
* * *
কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয়।
অপ্সরার বেশে মুগ্ধ করগো হৃদয়॥
.........ইত্যাদি।

হলদিঘাটের যুদ্ধ চমৎকার ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনা প্রসংগে তিনি লিখিয়াছেনঃ

"কি কহিব হলদীঘাটে দুঃখের কাহিনী।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী॥
থাকিল হাজার অষ্ট চরম প্রহরে।
বহিল রুধির নদী কন্দরে কন্দরে॥"
ইত্যাদি।

আবার রাণা প্রতাপ-সিংহের ঘোড়া চৈতকের বীরত্বও সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেনঃ

"প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা প্রস্থান।
নির্ভর চাতকগতি পবন সমান॥
পুরোভাগে পয়স্বিনী বহিছে ঝংকারে।
একলাফে তুরংগ যাইল তার পারে॥

'নৌরোজা'র বর্ণনাতেও বেশ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। উৎসবের সুন্দরীদের বর্ণনায় তিনি নানাদেশের নানারকমভাবে বিভিন্ন রূপ-বিশিষ্টা নারীদের বর্ণনা দিয়াছেনঃ

"কিবা অপরূপ শোভা নারীর হাট।
ন-ভূত ন-ভবী কীর্তি করিল সম্রাট্॥
বিবিধ কুসুম যেন কুসুম কাননে।
* * *
কেহ শোভে নবীন নীরদ রেখা-প্রায়।
কেহ বা তুষার ছবি অমলিন-কায়॥
নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে।
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে॥
যার দিকেই পড়ে দৃষ্টি, তারি দিকে রয়।
পালটিতে পলকের প্রমাদ-নিশ্চয়॥
কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি।
নয়নের দাস করে কাহার মাধুরী॥
এই রূপ নানা দেশ জাত নানা নারী।
বসাইল মণিহারী মুনি মনোহারী॥"
.........ইত্যাদি।

'শূর-সুন্দরী' কাব্য, রংগলালের পূর্বোক্ত দুইটি কাব্য অপেক্ষা অধিকতর দোষ ত্রুটি হীন, এই কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

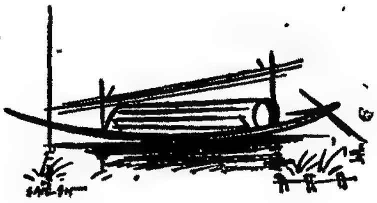

খেলোয়াড়

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কাজল মেঘে ছেয়ে আছে সমস্ত আকাশ। ধরণীর সবুজ বুকে পড়েছে মেঘের সজল ছায়া। ক্লান্ত-বর্ষণ মৌন আকাশ স্তব্ধ হয়ে আছে।

মনু মিঞা বসে আছে তার বারান্দায়। মনটা তার আজ বড়ই ভারাক্রান্ত। জীবনের সব আনন্দ যেন ছুটি নিয়েছে তার মন থেকে।

আজ তিন দিন হল, তার বড় ভাই তমিজুদ্দীন সাহেবকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে বাড়িতে আর কারো মুখে হাসি নেই।

তমিজুদ্দীন সাহেবের যে অপরাধ ছিল তা নয়। অপরাধ করেছে তার ছেলে আনোয়ার। অপরাধ করে সে পালিয়েছে। পুলিশ তার খোঁজে এসেছিল। তাকে না পেয়ে তার বদলে তার বুড় বাপকে ধরে নিয়ে গেছে। এখন বুড় 'ভাবী' স্বামী-পুত্রের শোকে তিন দিন জল গ্রহণ করেননি। ছেলে কোথায় গেল, কি হল তার খোঁজ নেই। স্বামীর কি হবে তাও অনিশ্চিত। তাকে কিছুতেই জামিনে খালাস করে আনা যায়নি। এমন কি স্থানীয় কোন লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তাকে উদ্ধার করার জন্য। তাঁর কান্নায় একটা শোকের ছায়া পড়েছে বাড়ির উপর। বাড়ির বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে তাঁর দীর্ঘনিশ্বাসে।

অনেক দিন তাদের বাড়িতে এসব ব্যাপার হয়নি। দেশ বিভাগের পর কিছু দিন তারা অবশ্যই একটা অশান্তির ভিতর ছিল। সর্বদা তখন তাদের একটা আশঙ্কার ভিতর থাকতে হয়েছে। কিন্তু তারপর অবস্থা ক্রমশ শান্ত হয়ে আসে এবং অবশেষে ইলেকসনের আয়োজন শুরু হতেই তাদের সকল দুশ্চিন্তা কুয়াসার পর্দার মত আকাশে মিলিয়ে যায়। তখন মেঘ-মোছা আকাশে আবির্ভাব হল নূতন দিনের। আবীরের রঙে সহসা লাল হয়ে উঠে সমস্ত আকাশ।

প্রত্যেকটি দল তখন তাদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। তখন তারা ভুলে গেছিল যে, আংশিকভাবে তারা পাকিস্থানের লোক। সে যে এক কালে মুসলেম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিল, সে কথাও কেউ তখন মনে রাখেনি। মুসলমান সমাজের অবিভক্ত ভোট পাওয়ার আশায় সবগুলি দল তাদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল তখন।

তারপর থেকে হিন্দুস্থানে তাদের আর কোন অভিযোগ ছিল না। কোন অভিযোগ থাকলে বলা মাত্র তার প্রতিকার হয়েছে। এখনো সেই অবস্থাই চলছে। কিন্তু তার ভিতর এ কি হল

মনুমিঞা প্রায় অন্যমনস্ক ছিল। স্ত্রী রিজিয়ার আগমনে তার সংবিৎ যেন ফিরে এল।

রিজিয়া চা নিয়ে এসেছিল। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কেটলি থেকে চা ঢালতে লাগল। আয়ত চক্ষু, চাঁপার কলির মত আঙুল, সাবলীল তনুদেহ, মেরুণ রঙের একখান শাড়ি তার সুকুমার দেহখানি বেষ্টন করে রয়েছে। রিজিয়া নীরবে চা করছিল। চা হয়ে গেলে স্বামীর কাছে প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললে, গেছিলে কল্যাণী বাবুর কাছে?

কল্যাণী বাবু স্থানীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী, বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক। ইলেকসন উপলক্ষে মনু মিঞার সঙ্গে তার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। মনু মিঞা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, তিনি কোনই আশা দিতে পারলেন না।

তিনি থানায় গেছিলেন তোমার সঙ্গে?

না।

তিনি তো তোমার বন্ধু। চেষ্টা করলে কি ক্ষতি হত তাঁর?

সকল ব্যাপারেই চেষ্টা করা যায় না।

রিজিয়া প্রতিবাদ করল না। সত্যই আনোয়ারের অপরাধটা তুচ্ছ নয়। সে কয়েকটি গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মিশে তাদের পাশের বাড়ির একটি হিন্দু ভদ্রলোকের একটা বাছুর চুরি করে নিয়ে ফিস্ট করেছে। এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারে কোন হিন্দু? যদি পাকিস্থানে কোন হিন্দু মসজিদ অপবিত্র করত, তবে করত ক্ষমা কোন মুসলমান? রিজিয়া ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল এর পর আর কোন সরকারী সাহায্য পাওয়ার আশা করা যাবে না।

মনুমিঞাও সেই কথাই ভাবছিল। ইলেকসনের পূর্ব থেকেই সরকার থেকে সে কম সাহায্য পেয়েছে তা নয়। কংগ্রেস কর্মীদের ধরে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে সে বার বার বিভিন্ন জিনিষের পারমিট পেয়েছে এবং তাই বেচে

বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছে। ভোটযুদ্ধে কংগ্রেসকে সাহায্য করার পুরস্কার সে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে। এখন সে ভাবছিল, আগামী নির্বাচনে সে নিজেই দাঁড়াবে। কংগ্রেস থেকে মনোনীত হওয়া এখন তার পক্ষে তেমন আর কিছু কঠিন নয়। সে এখন খদ্দর পরা শুরু করে দিয়েছে এবং তার দোকানের একটি যোগ্য কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছে, তাকে ইংরেজী শেখাবার জন্য। ইংরেজীতে যদি সে একটু কথা বলতে পারে, তবেই সে কাউন্সিলের জন্য দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু যদি তার আপন ভাইপো কি ভাইয়েরি-জেল হয়ে যায়, এই রকম অপরাধে, তবে সে কি আর কংগ্রেসী দলে মিশতে পারবে? সে বলল, সকল আশাই নষ্ট হল। আনোয়ার তো গেছে নিশ্চয় পাকিস্থানে। আমাদের সকলকেই যেতে হবে।

রিজিয়ার পরিচারিকা এসে তাকে ডাকল, খানসামা মসলা চাচ্ছে।

রিজিয়া উঠে গেল। পায়চারি করতে লাগল মমু মিঞা নির্জন বারান্দায়।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে চামেলির কোমল গন্ধ। ভেজা বাতাস এসে লাগছে গায়। আকাশে কাল মেঘ মিছিল করে চলেছে।

কিছুই ভাল লাগছে না মমুমিঞার। সে এসে বসে পড়ল আবার চেয়ারে। টেবিল থেকে পত্রিকাটা তুলে নিল হাতে। কিন্তু কোন অর্থবোধই হল না তার।

হঠাৎ পিছনের দরজাটা খুলে গেল।

চাচা!

ফিরে চাইল মমুমিঞা। চেয়ে দেখল, তার ভ্রাতুষ্পুত্র আনোয়ার।

সে শঙ্কিত হয়ে বলল, কেউ দেখেনি তো তোকে?

দেখলই বা। আমি কাউকে ভয় করি না, বলে সে চেয়ারের উপর বসে পড়ল।

মমুমিঞা তাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। তারপর বসিয়ে দিয়ে বলল, কোথায় ছিলি এই তিন দিন?

এই জেলাতেই ছিলাম।

আমরা ভেবেছিলাম, তুই পাকিস্থানে চলে গেছিস।

যেতে হয় যাব। পালিয়ে যাব কেন?

মমুমিঞা অবাক হয়ে গেল তার কথায়। সে বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেলে কতক্ষণ আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, তুই দেখি গ্রাহ্যই করছিস না কিছু। কি বিপদ আমাদের মাথার উপর ঝুলছে, বুঝতে পারছিস না তুই? জানিস কংগ্রেসীদলের কারো একটু সাহায্য আমি পাইনি।

আমি কংগ্রেসী দলের সাহায্য চাই না।

তবে জেলেই যাবি স্থির করেছিস তো?

আমাকে জেলে দিতে পারে, এ ক্ষমতা কারো নেই। আমিই এদের কি করি দেখ। ছেলের অপরাধের জন্য বুড়ো বাপকে গ্রেপ্তার করবে, এ বর্বরতা কোথাও চলে না। আমি কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে গেছিলাম। তারা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছে। আজ দারোগার নামে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে কোর্টে জান?

মমুমিঞার কমিউনিষ্ট পার্টির বহু নেতার সঙ্গেই জানা আছে। গত নির্বাচন উপলক্ষে ওদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। তখন মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য যেমন কংগ্রেসের নেতারা তাদের খোশামোদ করেছে, তেমন করেছে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা। প্রথম সে কোন দলকে মত দেয়নি। হাতে মোয়া নিয়ে পাকা খেলোয়াড়ের মত তাদের নাচিয়ে বেড়িয়েছে। যদি সে বুঝত কমিউনিষ্টরাই জিতবে, তবে সে সকল ভোট কমিউনিষ্টদেরই দিত। কিন্তু সে দেখল, বাংলা দেশে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত, তখন সদলবলে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যোগ দিল এবং কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করে তুলল। যে দিকে চাঁদ, সেই দিকে সেলাম, এই সনাতন নীতির সে অন্যথা করেনি।

সে জানে কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী। কংগ্রেস যেমন তাদের হাত করার জন্য বহু প্রসাদ বিতরণ করেছে, এরাও তাদের হাত করার জন্য না করতে পারে এমন কাজ নেই। এই ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টির যে সাহায্য পাবে আনোয়ার তাতে আশ্চর্য কি।

ঢুম্, ঢুম্ ঢুম্—ঢুম্, ঢুম্, ঢুম্। রাস্তা দিয়ে একটি ছেলে ঢোল বাজিয়ে যাচ্ছে, আর একটি ছেলে ঘোষণা করছে একটা সভার কথা। মমুমিঞা জানালা খুলে জানালার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভাল করে শুনল, তারা কি বলে।

বৃদ্ধ তমিজুদ্দীন সাহেবের অন্যায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আজ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সভা হবে স্থানীয় ময়দানে। সর্বসাধারণের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

মমুমিঞা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা?

আনোয়ার তার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, কমিউনিষ্ট পার্টির ঢোল।

মমুমিঞার হাসি এল। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করার একটা সুযোগ পেয়েছে তবে কমিউনিষ্ট পার্টি।

মনুমিঞার মনে হল পাকিস্থানের কথা। কি আতঙ্কে আছে হিন্দুরা সেখানে। কেউ একটি টু শব্দ করতে পারে না। হিন্দুদের মাথা হেঁট হয়ে আছে সেখানে। আর কত নিশ্চিন্ত আছে এখানে তারা! কেবল যে তারা নিরাপদ আছে তাই নয়। তাদের সন্তুষ্টি ক্রয় করার জন্য সকলেই ব্যস্ত। ভারতবর্ষ যে কেবল হিন্দুর দেশ নয়, তাতে আর সন্দেহ কি আছে?

হঠাৎ দৌড়ে এল আবার রিজিয়া। আরে সর্বনাশ! দারোগা আসছে এই দিকে। আনোয়ার তুমি পালাও শীগগির।

আনোয়ার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর বলল, কেবল দারোগা নয়, বাজান সাহেবও আসছেন। সঙ্গে তো কল্যাণী বাবুকেও দেখছি।

মনুমিঞা কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, তবে কল্যাণী বাবুই ভাই সাহেবকে ছাড়িয়ে এনেছেন।

আনোয়ার বলল, আপনি তো গেছিলেন কল্যাণী বাবুর কাছে। কল্যাণী বাবু তো আপনার কথা কানেও তোলেননি তখন!

মনুমিঞা বলল, দারোগা এসে পড়েছে। তুমি পাশের ঘরে যাও, বলে তাকে জোর করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিল।

দারোগা এসে ঘরে ঢুকল। সে মনুমিঞার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, আপনার ভাইকে আমি নিয়ে গেছিলাম, আবার আমিই ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। এ সবই সম্ভব হল কল্যাণী বাবুর জন্য।

মনুমিঞার বুঝতে বাকি ছিল না, কি জন্য এ সব সম্ভব হয়েছে। এক তরফা অনুগ্রহ কি অকারণে হয়? তার ভিতর আবার সেই খেলোয়াড় মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। সে বলল, আনোয়ারের নামের সেই ওয়ারেণ্টটা?

তা বাতিল করে দেব। তার জন্য ভাববেন না।"

বাইরের আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে একফালি রৌদ্র এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের ভিতর।

আনোয়ার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

কাজল কালি

—নেতাজীর অভিজ্ঞতা—

"৫৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে অবস্থিত কেমিক্যাল এসোসিয়েশান-এর তৈরী **'কাজল কালি'** আমি ব্যবহার করেছি। বড়ই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই কালি ফাউণ্টেন পেনের সম্পূর্ণ উপযোগী। যতদিন ইহা ব্যবহার করেছি, কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি 'কাজল কালি'র প্রস্তুতকারকদের তাঁদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। আশা করি, ভারতবর্ষের জনগণ এই কালি ব্যবহার ক'রে এই জাতীয় শিল্পটি শ্রীবর্ধন ক'রবেন।"

বঙ্গানুবাদ :—স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

Subhas Chandra Bose

★

স্মৃতি

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সেকালের কথা যদি বা ফুরায় কখনো সূর্য্যস্নানে—
তবু তুমি আজো সবার শীর্ষে, ভারত-রমণী জানে।

আজকের এই চৈত্রযুগের গন্ধ-মদির পথে :
শূন্যে মেঘের যে ভেলা ভেসেছে—উতলারণ্য চুলে,
লাল-শাড়ি-পাড় আঁচলে ; যেথায় আকাশের তারা দুলে
তেপান্তরের মাঠ পার হয়, শন্-শন্ বায়ু রথে।

ডায়েরীর পাতা ছিঁড়ছে। এখানে জঞ্জালে গেছে ঢাকা
কথার টুকরো ; খুপরীর আলো হয়েছে স্তিমিত, ম্লান।
দিনাগত পাপ ইতিহাসে ক্ষয় ; মনের প্রলেপে আঁকা
রঞ্জিত ব্যথা-বেদনার স্তূপ : অলস দু'মুঠি ধান।

তার পরে কত শীর্ণ মুখের ছায়া-ছবি মনে পড়ে
মুছে যা নিয়েছে অন্ত-আঁধারে ; নিশুতি রাতের ঝড়ে।

অয়েল

আপটন সিনক্লেয়ার ★ অনুবাদ ঃ যতীশ বেদজ্ঞ

(৩)

জলের কুয়ো বসাবার লোকেরা কাজে লেগে গেছে আর সেই সাথে শুরু হয়ে গেছে টেলিফোনের তার বসাবার কাজ। ড্যাড্ বলে লোকজনের থাকবার জায়গার চিন্তাও নাকি এখনই করা দরকার। আপাতত ওরা চেষ্টা করবে কতগুলো ডেরা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে, তারপর তেল পাওয়া গেলে, সুন্দর সুন্দর সব ঘর করে দেওয়া যাবে তাদের পরিবার নিয়ে থাকবার জন্য। ড্যাড পলকে বলে এ সময় ষ্ট্র-বেরী আর সীমের ক্ষেত নিয়ে সময় নষ্ট করা তার পক্ষে নাকি নেহাৎই বোকামীর কাজ হবে, ওতে করে চিরকালই তাকে থাকতে হবে হা-ঘরে হয়ে, তার চেয়ে বরঞ্চ তার উচিৎ ছুতোর মিস্ত্রী হয়ে এই কাজটায় লেগে যাওয়া, তার পর সুবিধামত এক সময় তেল তোলার বিদ্যাটাও শিখে নিলে চলবে। ড্যাড তার প্রধান ছুতোর মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছে, সে এসে ডেরাগুলোতে কত কি মালমশল্লা দরকার হবে তা ঠিক করে দিয়ে যাবে আর সেই সাথে দিয়ে যাবে সেগুলোর ভিৎ আর দরজা জানালার কাঠামোগুলো বসিয়ে। বাকী কাজগুলো পলই শেষ করে ফেলতে পারবে এখান থেকে লোকজন যোগাড় করে আর সে জন্য ড্যাড্ তাকে দৈনিক পাঁচ ডলার করে দিলেও তার কিছু অসুবিধা হবার কথা নয়। পল রাজী হলে তার আয় বেড়ে যাবে—ঐ পুরানো খামারে একা একা কাজ করে সে এখন যা পাচ্ছে তার প্রায় পাঁচগুণ।

পল বললো, তাই ভাল; তার পর একদিন সন্ধ্যায় বসে ওঁরা প্ল্যান করে ফেললো বাড়ীগুলোর। ড্যাড্ বললো সব কিছুই হওয়া চাই বেশ সুন্দর, কারণ এটা হচ্ছে বান্নীর নিজের কুয়ো আর সেতো হয়ে উঠেছে ছোট খাট একটি সমাজ সংস্কারক। সে চাইবে লোকজনরা তার সব ভাল থাক, পরুক। একটানা একটা লম্বা ঘরের বদলে ওরা প্ল্যান করলো ছোট্ট ছোট্ট সব ঘর তৈরী করবার আর তার প্রত্যেকটাতেই থাকবে আলাদা আলাদা জানালা আর দিন আর রাতের সিফটের লোকদের জন্য একটার মাথার পরে আর একটা করে ঝোলা বিছানার ব্যবস্থা। দু দুটো স্নানের জায়গা, তারপর খাবার ঘর, রান্নাঘর আর মালপত্রের ঘর ছাড়াও ব্যবস্থা থাকবে দিব্যি সুন্দর একটা বসবার ঘরের। সেখানে থাকবে নানা রকমের কাগজপত্র আর সেই সাথে কিছু বই।

এই শেষের পরিকল্পনাটা অবশ্য বান্নীর নিজেরই, সে নাকি তার তেল মজুরদের ভদ্র না করেই ছাড়ছে না।

এর পর ওদের নিজেদের ঘরটা শেষ হয়ে যেতে ড্যাড আর বান্নী একদিন চললো রোজভিলে কিছু আসবাবপত্র আর সাজসরঞ্জাম কিনতে। সেখান থেকে ড্যাড একখানা "ঈগল" কিনে সুরু করলো চোখ-বুলাতে—, তখনই কেবল প্রেস থেকে বেরিয়েছে কাগজখানা। প্রথম পাতা খুলতেই ড্যাড্ ফেটে পড়লো হাসির হররায়। বান্নী জীবনেও তাকে হাসতে দেখেনি অমন করে, কাজেই সেও একবার তাড়াতাড়ি করে চোখ বুলিয়ে নিল কাগজখানায়। প্রথম পাতাটা জুড়েই দেখা গেল এ্যাডনিজা প্রেসকট্ বলে একজন লোকের কাহিনী, ভদ্রলোক নাকি একটা খামারের মালিক, থাকেন প্যারাডাইস আর রোজভিলের মাঝামাঝি ঢালুটার এক পাশে; প্রায় মাস তিনেক আগে ও'র মাল-লরীটা উল্টে গিয়ে ভদ্রলোকের গলার হাড়টা নাকি গেছে ভেঙ্গে আর সেজন্য এখন নাকি তিনি পনের হাজার ডলারের দাবীতে মামলা আনছেন স্থানীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, রাস্তাটাকে বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলে রেখে সরকারী কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার দায়েও তিনি অভিযোগ আনছেন বোর্ডের প্রত্যেক সভ্যের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া সম্পাদকীয় পাতায়ও দু'কলম জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে রাস্তাটার ভয়াবহ অবস্থার কথা। রাস্তাটার পাশেই নাকি কোথায় রয়েছে ধাতুমিশ্রিত একটা জলের ফোয়ারা আর কে নাকি একবার প্রস্তাবও করেছিলেন সেটাকে জনসাধারণের কাজে লাগাবার কিন্তু যানবাহনের অসুবিধার জন্যই নাকি শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। এখন নাকি আবার শুনা যাচ্ছে এ-অঞ্চলে তেলের সম্ভাবনার কথা, কিন্তু এবার হয়তো সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে—এই রাস্তাটারই জন্য, আর এমনি করে স্যান এলিডো পড়ে থাকবে

এই প্রদেশের সব জায়গার পেছনে। সব শেষে 'ঈগল' জানিয়েছে, মিঃ জেলিমেচার বলে কে একজন সমাজসেবী খামার-মালিক নাকি এক আবেদন বের করেছেন ঢালু বরাবর রাস্তাটার আশু সংস্কার দাবী করে আর আশা প্রকাশ করেছে এখানকার সমস্ত অধিবাসী আর করদাতাই সই করবেন সেই আবেদনে।

পর দিন ঝরঝরে এক ফোর্ডে চড়ে মিঃ লিমেচার এসে হাজির ড্যাডের ছাউনিতে। দেখে শুনে ড্যাড তো ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো, কি সর্বনাশ, এতে যে অনেকগুলো টাকাই গুনতে হবে ট্যাকস্ বাবদ। সমাজসেবী মিঃ লিমেচার কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, জ্যাক কার্ফির কাছ থেকে তিনি পাচ্ছেন দৈনিক করকরে তিনটি ডলার করে। কিছুক্ষণ ধরে তাঁর তর্ক চললো ড্যাডের সাথে, অগত্যা ড্যাড্ বললো, ঠিক আছে, তার প্রতিবেশীরা তাকে কৃপণ ভাবুক এটা তো আর সে চায় না, কাজেই আর সকলের মত সেও না হয় দেবে আবেদন পত্রটায় সই করে। এর চার দিন পরে খবর এলো পরিদর্শক বোর্ডের বিশেষ সভায় নাকি এক প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়ে গেছে ঢালু বরাবর পথটাকে অবিলম্বে মেরামত করবার আর তারই দু'দিন পরে দেখা গেল দলে দলে সব রাস্তা মেরামত করাবার লোক এসে হাজির হলো, বড় বড় সব ঘোড়া আর ভারী লাঙ্গল নিয়ে। দেখতে দেখতে মাটি খুঁড়ে ফেললো কোদালীরা, সব পাথরের টুকরোগুলোকে সরিয়ে রাখলো পথ থেকে, তারপর আরও কয়েকদল লোক এলো আবর্জনা সাফ করাবার গাড়ী নিয়ে আর ময়লাগুলো সব ঠেলে ফেলে দিল রাস্তাটার দুপাশে। এমনি করে কয়েক দিনের মধ্যেই সরু পথটা হয়ে উঠলো দিব্যি চওড়া একটা রাস্তা। প্যারাডাইসের ওদিক থেকে বড় বড় সব লরী এলো পাথরের গুঁড়ো ভর্তি হয়ে আর ওরা পেছনের দিক উঁচু করে মালগুলো সব ঢেলে দিয়ে ফিরে চলে গেল যে যার জায়গায়। এর পর কতকগুলো যন্ত্র এলো পাথর গুঁড়োগুলোকে সব সমান করে ছড়িয়ে দিতে আর তার পর সব শেষে ভারী ভারী সব ষ্টীমরোলার এসে সেগুলোকে দিল রাস্তার সাথে চেপে বসিয়ে। উঃ! ড্যাডের টাকা যে কত যাদুই জানে।

কাঠের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে ওদের মজুরদের থাকবার বাড়ীটার জন্য আর তার কিছু কিছু এসে সুদ্ধও করেছে পৌঁছতে; পল কাজে লেগে গেছে আশপাশ থেকে জনা ছয়েক লোক যোগাড় করে। সে নিজেই ওদেরকে ফোন করে ডেকে আনিয়েছে প্যারাডাইস থেকে; বিশ বছরের এক ছোকরার অধীনে কাজ করতে তাদের অপমান বোধ হলেও প্রতি শনিবার সাড়ে বারোটার সময় ড্যাডের কাছ থেকে নিয়মিত বাইশ ডলারের একটা করে চেক পাবার আশায় তারা আর আপত্তি করেনি। এমনকি পল্লের বাব বুড়ো মিঃ ওয়াটকিন্সও তার এই "বেয়াড়া ভেড়াটার" হঠাৎ পদোন্নতিতেই যেন খুসী হয়ে ভুলে গেছেন "নরকের আগুন" আর "গলায় পাথর বেঁধে" শাস্তি দেবার কথা। এখানকার সমস্ত কাজকর্মই তো চলছে তার খামারের মধ্যে; সমস্তদিন ধরে ঠক ঠক করে চলছে ছুতোরদের হাতুড়িগুলো, গল গল করে জল উপচে পড়ছে নালাটার মুখের কাছের জলের কুয়োটা থেকে। আর একদল মানুষ আর ঘোড়ায় মিলে রাস্তাটাকে সমান করে চলছে কুয়ো বসাবার জায়গাটা বরাবর। ওয়াটকিন্সদের মনে হচ্ছে যেন সমস্ত গ্রামটাই এসে ভীড় জমিয়েছে তাদের খামারটাতে। আর এর মনে হচ্ছে তারা যা কিছু খাবার তৈরী করতে পারবে তাই-ই বিক্রী হয়ে যাবে চড়া আর নগদ দামে। কার না আনন্দ হয় এতো সব কাজ কর্ম দেখলে, তা হোক না কেন সে সবই শয়তানের কাজকর্ম

কিন্তু সব চাইতে খুসী হয়েছে রুথ। পলের উন্নতিতে তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে। নিজের আর পলের কাজ-কর্ম ছাড়া ড্যাড্ আর বাম্নীর দেখাশুনার ভারও পড়েছে রুথেরই পরে, কিন্তু তাতেও যেন তার কোন কষ্ট নেই, খুসী মনেই সে করে চলে সবকিছু। দেখতে দেখতে তার শরীরও উঠলো পুষ্ট হয়ে আর গাল দুটো হয়ে উঠলো গোলাপী। বাম্নীর মত সেও এখন ড্যাড্‌কে মনে করে একজন মহাপুরুষ আর অন্তরের শ্রদ্ধা জানায় তাকে বেশী করে পিঠে, পুডিং খাইয়ে, যদিও ড্যাড্ চেষ্টা করছে তার ওজন কমাতে। দিনের কাজ শেষ হলে বুগেনভিল লতায় ঘেরা ব্র্যাশ্‌হামদের খামারটায় বসে রোজই ওরা একসাথে শেষ করে নেয় ওদের রাতের খাওয়া। তারপর চাঁদের আলোয় বুগেনভিল ছাওয়া বারান্দাটায় বসে ওরা গল্প করে সমস্তদিন কে কি কাজ করলো আর সেই সঙ্গে পরামর্শ করে—তার পর দিন ওরা কে কি করবে। সত্যি, বেঁচে থাকবার পক্ষে পৃথিবীটা কি সুন্দর!

[ক্রমশ

আলোচনী

বিশ্বনাগরিক শ্রীনিত্যগোপাল

রেণু মিত্র

আধুনিক সভ্যতার দান সত্যের অপর দিকটাকে প্রকাশ করায়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কি এ দেশে, কি ওদেশে মানুষ প্রায় একই রকম করে ভেবে এসেছে—অর্থাৎ চৈতন্যকে জড়নিরপেক্ষ সত্তা দান করে তাকে অজড় অমর করে জরামরণশীল এই জড় জগৎটাকে নিম্ন স্তরে স্থাপন করে এসেছে। জড়ের ওপরে চৈতন্যের এই চাপ কি শঙ্করাচার্যীয় বেদান্ত কি হেগেলীয় দর্শনসিদ্ধান্ত উভয়ত্রই রয়েছে। কিন্তু ক্রমে জড়ের নূতন রূপ ও অর্থ মানুষের কাছে প্রতিভাত হতে লাগল। বিজ্ঞান জড়ের এই নূতন রূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। মার্ক্সীয় দর্শন জড়ের চৈতন্য নিরপেক্ষ সত্তা দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করে বিশ্বের বুকে আজ বিশিষ্টতা অর্জ্জন করে আছে। এই মার্ক্সীয় চিন্তাধারা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে জড়, বাস্তব, মাটী, মজুর, কৃষক ও নারীর দাবীকে অগ্রণী করে তুলেছে।

সত্যের এই দুইটী দিকই আত্মপ্রকাশ করার ফলে মানুষের জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিষম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। জড়বাদী পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বটা জড়েরই বিভিন্ন রূপের মধ্যে। কেননা হেগেলীয় মতবাদ যদিও চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন তথাপি পাশ্চাত্য সে মতবাদকে জীবনের মধ্যে রূপ দেবার কোনো প্রয়াস কোনদিন করেনি। কিন্তু ভারতবর্ষ অজড় চৈতন্যের প্রাধান্যকে শুধু দর্শনের জগতেই সীমাবদ্ধ করে রাখে নি—সে তার দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকেও সেই ছকে ঢেলে সেজেছে। অর্থাৎ অল্প মূল্যের জড়কে সে নিজস্ব কোন পারমার্থিক মূল্য না দিয়ে, একে শুধু ব্যবহারিক মূল্যে স্বীকার করে একে ছেড়ে সেই অজড় চৈতন্যে স্থিতি লাভ করাতেই মানুষের জীবনের পরম সার্থকতা বলে ধরে নিয়েছে। অথচ কালের ধর্ম্মে ও অর্দ্ধ সত্যের প্রতিক্রিয়ায় যখন জীবনের মধ্যে জড়ের মূল্য আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে চাইল, তখনই দেখা দিল দ্বন্দ্ব—আজকে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাই দ্বন্দ্বের শেষ নেই। জড়ের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে বলেই জগতের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হবে, বাস্তবের মূল্য বেড়ে যাবে, অথচ তা দিতে আমরা অভ্যস্ত নই—দ্বন্দ্ব সেইখানে। এতদিন দিয়েছি রাজার মূল্য, ধনিকের মূল্য, নরের মূল্য, উচ্চবর্ণের মূল্য; আজ প্রজা তার নিজস্ব মূল্য দাবী করছে, দাবী করছে নারী, তেমন দাবীই উঠেছে নিম্নবর্ণের কাছ থেকে, উঠেছে মাটীর এই জগতের কাছ থেকে। দুই দল দুইটী সত্যকে প্রকাশ করছে। দেখা যাচ্ছে সংসারে আছে দুটোই, একের অস্বীকৃতির ফলে অপরে নিঃশেষ হয়ে মুছে যায় নি, কেবল আমিই যে অপরকে প্রাণখুলে স্বীকার করতে না পেরে তার সঙ্গে একটা বিদ্বেষের সম্পর্ক রেখে দিলাম, সেইখান দিয়ে সে তার অস্তিত্বকে আরও পাকাপোক্ত করে নিতে পারলে। চিন্তায় ভাবনায়, কর্ম্মে, বুদ্ধিতে, সমাজব্যবস্থায় অধ্যাত্মজগতে সর্বত্র জীবনের সামগ্রিকতা হারিয়ে গিয়ে এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে পরিপাক করা যাবে কি করে? দু'রকম চিন্তাধারাতেই সত্য আছে; সত্য নেই কেবল তারা দুজনে যে একই জীবনের প্রকাশ এইটে না বোঝার মধ্যে। এই দুটো সত্যকে মেলাতে আমরা কিছুতেই পারছিলাম না।

এই মেলাবার ভার নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল (ইহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব)। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে আমাদেরই এই বাংলা দেশের মাটীতে তিনি দেহ ধারণ করে এসেছিলেন আর তাঁর যুগান্তকারী অভিনব সমন্বয় ধর্ম্মের কথা অনেকগুলি স্বরচিত বইতে রেখে গেছেন, সে-ও আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে। সভ্যতার অভিব্যক্তি কালের অপেক্ষা রাখে। তাই জড় অজড় সমন্বয়ের তাঁর এই ব্যাপকতম চিন্তাধারা দীর্ঘদিন

আগেই তিনি রেখে গেলেও প্রকাশ হয়নি। সে কথা বোঝবার সময় আজ হয়েছে।

শ্রীনিত্যগোপাল সত্যকে এককেন্দ্রিক করে সমাধান সহজ করলেন না। যুক্তি ও বাস্তবতার দৃষ্টান্তে তিনি সত্যের দুইদিকেই সমান মূল্য ও স্থান দিয়ে সত্যের সামগ্রিক রূপের সমন্বয়কে প্রস্থাপন করলেন। তিনি বললেন একটাকে যদি সত্য বল, তাহলে তার অপেক্ষায় অন্য একটাকে সত্য বলতেই হবে। ব্রহ্ম সত্য হলে জগৎও সত্য, সুষুপ্তি সত্য হলে জাগ্রৎ অবশ্যই সত্য—জাগ্রৎ অবস্থা আছে বলেই সুষুপ্তির অস্তিত্ববোধ সম্ভব। এমনি করে ব্রহ্ম ও জগৎকে, মায়া ও মায়াতীতকে, আদর্শ ও বাস্তবকে নর ও নারীকে, রাজা ও প্রজাকে, ধনিক ও শ্রমিককে সমান সত্যে স্বীকার করে শ্রীনিত্যগোপাল সমস্ত পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধান দিয়ে এক অভিনব সমন্বয়ের বার্ত্তা শুনিয়ে গেলেন। তিনি কাউকে অস্বীকার করলেন না, কাউকে অমর্য্যাদাও দিলেন না—কেবল ঐকান্তিক হয়ে উঠে যে কেউ সর্ব্ব দেশকাল পাত্রে যে বিশেষ অধিকারবলে অপরকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করছিল, তার সেই বিশেষ অধিকার তিনি মানলেন না। উপনিষদের 'তদ্ এজতি তন্নৈজতি'র মত তিনি এক নিঃশ্বাসে বলতে পারলেন, 'সমন্বয়।' নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার-সাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।'—শ্রীনিত্যগোপালের এই দার্শনিক ফরমুলার মধ্যে সমস্ত বিপরীতের দ্বন্দ্ব মিটে গিয়ে নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের সংযোগে এক বৃহত্তর মিলনভূমি রচিত হয়ে আছে।

নিজের সত্যকে একমাত্র সত্য বলে অপর সকলের উপলব্ধিকে মিথ্যে বলার সাধনা চলে আসছে। অপরকে আমরা শুধু মিথ্যে বলি নে, প্রাণপণে সে দিক থেকে নিজেকে আমরা বাঁচিয়ে চলি। তাই অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে দ্বৈতবাদীর, শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের বিবাদ কিছুতে ঘুচল না। রাজনীতিক্ষেত্রে তাই কেউ যে-কোন পথে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়, কেউ বা পথের শুচিতায় বিশ্বাসী, সৎ উদ্দেশ্যের সাথে সৎ পথের ঐকান্তিক সম্বন্ধে বিশ্বাসী। সকল বিবাদের মূল এইখানে। নিত্যগোপাল বললেন, আমার মত পথের মত অপরের মত পথ সত্য—এইটুকু স্বীকৃতিতেই চলবে না। তোমার পথ তোমার কাছে সত্য, আমার পথ আমার কাছে সত্য—এ কথা সত্য নয়। প্রত্যেকের পথই প্রত্যেকের কাছে সত্য—এ কথা সত্য নয়। প্রত্যেকের পথই প্রত্যেকের কাছে সত্য—তবে কোনোএকটাই সমগ্র সত্য নয়—সকল পথের সত্য সম্মিলিত হয়েই একটা সমগ্র সত্য। তোমার পথকে যদি আমি অন্তরে অন্তরে সত্য বলে না জানি, তবে তাতে স্বীকৃতি-কারের সম্মান দেখানও হয় না, আমার অন্তরও পরিতৃপ্ত হয় না। প্রতি পথের সত্যকে আমার নিজ জীবনে কোনো না কোনো সময়ে আস্বাদন করে সব পথের সমন্বয়ে সমগ্র ব্রহ্মবস্তুকে আস্বাদন করতে হবে। এটা ওটা বাদ দিয়ে যে ব্রহ্ম—সে কেমন ব্রহ্ম? সে কেমন বড়? সব কিছুকে হজম করে, সব স্বজাতীয় বিজাতীয় বিপরীতকে নিজ আলিঙ্গনের মধ্যে এক করে নিতে পারে যে সে-ই বড়,সে-ই ব্রহ্ম। নিত্যগোপালদর্শনে তাই কোনো কিছুকেই বাদ দিয়ে চলতে হয় না—সমস্ত মতবাদ বা ভাবধারার মধ্য দিয়ে যিনি সহজ বিচরণ করে কোন উপাধিতেই আটকে না পড়ে চলে যেতে পারেন, তিনিই সত্য মুক্ত। রবীন্দ্রনাথের পুরন্দর সন্ন্যাসী তিনি কেমন সন্ন্যাসী এ প্রশ্নের উত্তরে জানান—যেমনটী হওয়া দরকার। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। সর্ব্বোপাধিসমন্বিত সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত, এই মুক্তির খবর দিয়ে গেলেন শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর জীবন ও দর্শন দিয়ে।

তাই নিজেকে তিনি বলেন তিনি দ্বৈতবাদীও বটেন, অদ্বৈতবাদীও বটেন, অভেদবাদীও বটেন, প্রভেদবাদীও বটেন, শাক্তও বটেন, শৈবও বটেন, মুসলমানও বটেন, খ্রীষ্টানও বটেন—তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন 'I am a Cosmopolitan.' সন্ন্যাসী হয়ে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হয়েও তিনি বলতে পারেন, 'সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ আর গার্হস্থ্য হেয়—এ বোধও বন্ধন।' এইজন্যেই সন্ন্যাসী হয়েও নিজ পিতৃপরিচয় দিতে তাঁর যুক্তিতে আটকায় না। তাঁর রক্তমাংসের সম্বন্ধও তাঁর সন্ন্যাসকে নষ্ট করতে পারে নি।

এইখানে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন নিত্যগোপাল। মনে পড়ে 'নটীর পূজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যে প্রশ্নকে উত্থাপন করে গিয়েছিলেন, রাণী লোকেশ্বরীর একমাত্র পুত্র চিত্র বুদ্ধের ডাকে ঘর ছেড়েছে; পিতামাতার দেওয়া নাম সে ছেড়েছে, আজ তার নাম কুশলশীল। রাণী শুনে বলেন, 'যে-নামে তার মা তাকে ডেকেছে, সেটা আজ তার কাছে অশুচি। তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।' পুত্রের সঙ্গে হয়তো মহারাণীর দেখা হতে পারে, ভিক্ষুণীর কাছে এ কথা শুনে তিনি বলেন, 'হয়তো, হয়তো, হয়তো। নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে হয়তো ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃঋণের দাবী আজ এই একটুখানি হয়তোয় এসে ঠেকল। একেই বলে, ধর্ম।' রাণী শুনলেন, 'রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্ম্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।' মাতৃহৃদয় শুনে বলে, 'হায়রে রক্তমাংস! হায়রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা। রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম?'

সমস্ত কিছুকে স্বীকার করেও সমস্ত কিছু থেকে মুক্তির এই যে একটা সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনবোধ, এটা তখনই সম্ভব, যখন সেটা বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে বিশ্বদর্শনরূপে আস্বাদিত হয়। জড়াজড় সমন্বয় তখনই সত্য, যখন অজড়ের ক্ষেত্রের প্রতিটী রূপকে স্বীকার করে তাদেরকে আস্বাদন করবার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবন যদি রাখতে চাই কোনো একটীকেই একমাত্র সত্য ধরে নিয়ে, তবে সেখানে অজড়ই একমাত্র সত্য, বিশ্বের অতীত ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র কাম্য। কিন্তু সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শ্রীনিত্যগোপাল প্রতি অংশকে সত্য স্বীকার করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ মিলনের বাণী রেখে গেছেন। এই পরিপূর্ণ সমন্বয়মূর্ত্তি, সকল বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের মীমাংসাদাতা, একটা জটিল সভ্যতাকে পরিপাক করে তার বুকে সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রবর্ত্তক শ্রীনিত্যগোপালকে আজ তাই আনন্দের আকাঙ্ক্ষী আমাদের বড় প্রয়োজন।*

*১৩৬০ সালের চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপালের শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষ জন্মোৎসব আরম্ভ। ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯-এর তাঁহার সমাধিক্ষেত্র মহানির্ব্বাণ মঠে এই উপলক্ষে সেইদিন হইতে শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইবে।

বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থের নাম অনেকের কাছেই পরিচিত যাঁরা দৈনিক এবং মাসিকপত্র পড়ে থাকেন। তার কারণ নাম এবং নামধারীর কাজের মধ্যে একটা অসঙ্গতি এই স্মরণ রাখাটাকে সম্ভব করে দিয়েছে। বৈদ্যনাথ কবিতা লিখতেন—কাব্যপুরাণতীর্থ যিনি হবেন তাঁর কবিতা লেখার কথা নয়। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—যদি কবিতা লেখেনই তবে সংস্কৃতে লিখতে পারেন—বাংলায় নয়। আমার মনে হয় এক পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এর আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

আমার তাঁকে মনে রাখার অবশ্য অন্য কারণ আছে। তিনি আমার স্বগ্রামবাসী। শুধু স্বগ্রামবাসী বল্লে সবটুকু বলা হল না। ছোটবেলা থেকে নানা ঘটনা এবং অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখেচি। বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ বৈদ্যনাথের মারফৎ পেয়েছিলাম বললে অত্যুক্তি হবে না। কিছুকাল পূর্বে কলকাতার লেক হাসপাতালে তাঁর দেহান্ত হয়েছে।

বৈদ্যনাথ আমাদের গ্রামের (যশোর জেলায় মহেশপুর, এখন পাকিস্তান) গুরু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবা পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ তদানীন্তন কালের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আমাদের গ্রাম জমিদারপ্রধান—সকল জমি-

দারদেরই গুরু ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। গ্রামের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চে। আমাদের বাল্যকালে এবং স্কুল জীবনে যত সভাসমিতি হতে দেখেছি তার সবগুলিরই সভাপতি হতেন ব্রজেন্দ্রনাথ—এমন কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে যখন বিলিতি বস্ত্র পুড়িয়ে দেওয়ার এবং বিলিতি নুণ ফেলে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করা হয় তখন তারো সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি স্বাধীনচেতা উগ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন —ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, এই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ তাঁকে দিতে চাওয়া হলেও তিনি গ্রহণ করেননি—তিনি চাকরি করবেন না। অপরপক্ষে তিনি বাড়িতে "নারায়ণী চতুষ্পাঠী" নাম দিয়ে টোল স্থাপনা করলেন। তাতে অনেকগুলি ছাত্রকে খেতে দিতেন এবং পড়াতেন। বলা বাহুল্য এতে খরচ বেড়েছিল ছাড়া কমেনি।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য বৈদ্যনাথ কি আবহাওয়ার মধ্যে ছোটবেলায় মানুষ হয়েছেন তাই দেখানো। ব্রজেন্দ্রনাথের তিনি বড় ছেলে ছিলেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের বিদ্যাবত্তার এবং জীবিকার্জনের উপায়ের উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে সংস্কৃত লেখাপড়ায় তখনকার দিনে আর অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত ছিল না। তাই বড় ছেলেকে সংস্কৃক লেখাপড়া এবং শিষ্য সংরক্ষণের কাজে দিয়েছিলেন। বাকি অন্য তিনটি ছেলেকে ইংরেজি পড়তে দিয়েছিলেন।

বৈদ্যনাথ বাপের প্রথম ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন—তিনি সংস্কৃত পাঁচ বিষয়ে উপাধি লাভ করে পণ্ডতীর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু শিষ্য যাজনের কাজ তাঁর দ্বারা ভাল হত না—যদিও বাপের ইচ্ছা অনুসারে এ কাজ তিনি পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু এ কাজে তাঁর মন ছিল না। এর একটু সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল। ছোটবেলায় একবার খুব অসুস্থ হওয়ার পর বৈদ্যনাথকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য সমস্তিপুরে পাঠান হয়। সেখানে তিনি এক রাজনীতিক বিপ্লবী দলের সংস্রবে আসেন। এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনপদ্ধতি এক নতুন রঙে আঁকা হয়ে যায়। টোলে সংস্কৃত-পড়া ভালমানুষ পণ্ডিতের বদলে বৈদ্যনাথ এক স্বাধীনচেতা রোম্যান্টিক বিপ্লবী হয়ে গড়ে ওঠেন। তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। সমস্তিপুরে আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছিল। অনেক খ্যাতনামা বিপ্লবীর সঙ্গে বৈদ্যনাথের সংযোগ ছিল এবং তাঁদের কাজে বৈদ্যনাথের সহযোগিতা ছিল। স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী

বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

বাসন্তী দেবী বৈদ্যনাথের আত্মীয় ছিলেন। আমরা ছোট বেলায় দেখেছি বিনা কারণে মাঝে মাঝে বৈদ্যনাথ বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যেতেন এবং ফিরে এসে কোথায় গিয়েছিলেন কিছু জানাতেন না। তাঁর এই জীবনের সঙ্গে তাঁর পিতার কিংবা পরিবারের অন্য কারোর কোন যোগ কিংবা সহানুভূতি ছিল না। তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্য কারোর কাছে এ সব কথা বলতেন না। বললে বিপদও ছিল। কিন্তু আজ তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জীবনের এই অধ্যায় উদ্ঘাটিত করে না ধরলে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান হবে না।

বৈদ্যনাথের স্বভাবে যে গুণটি আমাকে সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ করতো সে হল তাঁর গ্রামের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি। এ গুণ অবশ্য উনি ওঁর দেশপ্রেমের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। গ্রামের প্রত্যেক লোক শিশু সন্তান, এমন কি গ্রামের প্রতি বৃক্ষ-লতাকে পর্যন্ত তিনি প্রাণ দিয়ে ভাল-

বাসতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবান তাঁকে কোন সন্তান দেননি কিন্তু গ্রামের সব ছেলেমেয়েই তাঁর নিজের সন্তানের মত ছিল। এদের এক একজনের মৃত্যুতে তিনি নিজের সন্তান হারানোর ব্যথা অনুভব করেছেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর পর তিনি আমাকে একখানি চিঠি লিখতেন এবং এ-চিঠি সব সময়েই কবিতায় লেখা হত। অর্ধ শতাব্দীর উপর বিস্তৃত আমাদের উভয়ের জীবনে এই নিয়মের কোন বছর ব্যতিক্রম হয়নি—কেবল এই বছর ছাড়া। এ বছর পূজার পর তাঁর বিজয়া দশমীর চিঠি না পেয়ে আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম কিন্তু এতটা অশুভ কল্পনা করিনি। যখন জানলুম তখন বুঝলুম যে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত অপর কোন ঘটনা এই চিঠি লেখার কাজকে স্থগিত রাখতে পারেনি।

এই চিঠিগুলি ছিল সম্বৎসর ধরে গ্রামে যে যে মৃত্যুর ব্যথা তিনি বুক পেতে নিয়েছেন তার কাঁদুনিতে ভরা। এই চিঠিগুলির পারমার্থিক মূল্য যাই হোক্, এ যে একজনের অনুভূতি গ্রামের আকাশে বাতাসে লতাগুল্মে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে তার অব্যর্থ প্রমাণ। সব চিঠিগুলি রক্ষাও করতে পারিনি, সব চিঠি উদ্ধৃত করার স্থানও এ নয়। আমি কেবল তাঁর শেষের দিকের একখানি দু'খানি চিঠি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করবো ঃ—

"বিজয়া বেদন আমারে বন্ধু
  প্রতি বৎসর কাঁদায়ে তোলে;
সে বেদনা মাঝে প্রীতির ভাষণ
  বল না কেমনে জানানো চলে।
পুরাতন স্মৃতি বুকে চেপে বসে
  গেছে যারা, তারা দাঁড়ায় পাশে।
কালাচাঁদ গেছে কোন ক্ষতি নাই;
  তাতে নাহি আঁখি সলিলে ভাসে।
এবারের বলি আশা মুখার্জি
  বিজয়ায় হল বিসর্জন;
প্রভাতনাথের ঝুরীদির ব্যথা
  করিতে পারি না সম্বরণ।
ব্ল্যাক ওয়াটারে কালিদাসে রাখি
  কলিকাতা হতে ফিরেছি বাড়ি;
তবু 'বিজয়ার আলিঙ্গনের
  হে সখা প্রীতির লেখনী ছাড়ি।" (তারিখ ৪।৭।৪৯)

তাঁর যে এত সাধের গ্রাম মহেশপুর তাও তাঁকে একদিন ছাড়তে হয়েছিল। তিনি পাকিস্থান ছেড়ে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে বাসা বেঁধেছিলেন। কত দুঃখে যে তিনি গ্রাম ছেড়েছিলেন, সেকথা তিনি নিজে একখানি চিঠিতে আমাকে জানিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথাতেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করা ভাল। কিন্তু তার আগে গ্রাম ছেড়ে, গ্রামে 'পূজা করতে না পেরে তিনি যে গভীর ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তার প্রমাণ স্বরূপ একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি ঃ—

"এবারো অবনী, বিজয়ার দিনে জানাই তোমায় সম্ভাষণ।
রিক্ত কবির তিক্ত মনের প্রীতির পুলক আমন্ত্রণ।
পঞ্চাশের বিজয়া কেটেছে বুঝি রামগিরি তরুর ছায়ে,
পারিনি ফিরিতে মহেশপুরেতে; হেথায় এবার এসেছি মায়ে।
এ যে ভাই মোর বিষাদে হরিষ; বিরহী যক্ষ কেঁদে আকুল।
বুঝি না এ কোন নিয়তি লিখন; বুঝি না আমার সবি কি ভুল?
এ যে ভাই মোর বিষাদে হরিষ; বিরহী যক্ষ কেঁদে আকুল।
বলিতে পারি না কবির ভাষায় যশোহরে নাই যশের আলো।
মন পড়ে রবে জগন্নপুরে, কাল্‌না, বরিশা কলিকাতায়—
এ সকল ছেড়ে কোন্ প্রাণে বল সেইখানে পড়ে থাকা কি যায়?
বলিতে পারি না অবনী আসে না, ললিত শম্ভু ছেড়েছে দেশ;
নব রাজনীতি প্রাণে আনে ভীতি, আমারো আজিকে হয়েছে শেষ।
সব হারা হয়ে জনমের মত ফুরিয়ে গিয়েছি মহেশপুরে।
আজিকে বিজয় মেলানি জানাই তাই ত তোমায় করুণ সুরে।
আমার বলার নাহি অধিকার, আমিও ছেড়েছি সাধের দেশ।
পূর্বস্থলী করিয়াছি পূজা, হয় ত এ পূজা এখানে শেষ।
কত ব্যথা বাজে, কত বড় দাগা, শূন্য আমার পূজার ঘর;
অক্ষমতার নিদারুণ ব্যথা আমাকে জ্বালায় নিরন্তর।
শুষ্ক বুকের বুক এ ভাষা বুঝিবে কি তুমি আমার সাথ?
আজি বিজয়ার মধু কোলাকুলি জানায় তোমায় বৈদ্যনাথ।"

গ্রাম ছেড়ে চলে আসার কারণ জানিয়ে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা এই ঃ—"বাড়ী কেন ছেড়েছি এ কৈফিয়ৎ কাউকে দিইনি। তোমায়ও দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। দুর্বল মুহূর্তে পথে চিঠি লিখতে বসায় কৈফিয়ৎ দিয়ে ফেললাম।

তুমি জানো না, অনেকেই জানে না—আমি পাকিস্থানের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা বার হয়েছে। এ অবশ্য আজকের কথা।

প্রথম কথা যারা দেশে একদিন হুকুম চালিয়ে এসেছে তারা আজ হুকুম মেনে খোসামোদ করে থাকতে পারে না।

আমি বাড়ী ছাড়ার আগে ৪ খানি বেনামী চিঠি পাই—তা যত অশ্লীল তত কদর্য। যদিও তার দাম না দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখনো ফণীর মেয়ে প্রীতির বিয়ে দিতে পারিনি। আমার অন্ন পশ্চিম বাংলায়, বাড়ী পূর্ব পাকিস্থানে। সীমান্ত রেখা পার হওয়া কঠিন ব্যাপার। গত চৈত্র মাস পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমি একলা বাড়ী থাকতাম। চৈত্র মাসে যশোহর যেয়ে বিনা অপরাধে ভাষা আন্দোলনে ধৃত হই।

মনে প্রাণে অনুভব করি রাজনীতির সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে তাদের স্থান দেশে নেই।

শ্রাবণ মাসে বাড়ীতে চুরি হয়; যথা সর্বস্ব চোরে লুটে নিয়েছে। এই সংবাদ "বসুমতী"তে বার হয়। ফলে আমি পাকিস্থানের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। বল এর পর আমি কি আর করতে পারি?"

তাঁর পাকিস্থান ছেড়ে আসার কারণ সুস্পষ্ট এবং সতেজ। যারা একদিন হুকুম চালিয়ে এসেছে তারা হুকুম মেনে সেখানে থাকতে পারে না এই তাঁর অভিমত। এই মতের রাজনীতিক মূল্য এবং যুক্তিযুক্ততা কতটা তা আমি জানিনে কিন্তু যে বীর এই মতের মূল্য দিতে প্রস্তুত তার পক্ষে যে এই পথই প্রশস্ত এই কথা আমার মন বলে দেয়।

বৈদ্যনাথের সাহিত্যপ্রীতি আন্তরিক ছিল। পঁচিশ থেকে তিরিশ বৎসর আগে "স্বস্ত্যয়ন" নাম দিয়ে একখানি মাসিকপত্র আমাদের গ্রাম থেকে প্রকাশ করা হয়। বৈদ্যনাথ ছিলেন তার যুক্ত সম্পাদকদের মধ্যে একজন। আমি "পারিবারিক স্মৃতি প্রসঙ্গ" নাম দিয়ে কিছু স্মৃতিকথা লিখে সেই কাগজে হাত মক্‌সো করি। লেখার উদ্যম সেই আমার প্রথম। তখনো বৈদ্যনাথের পিতা জীবিত—সুতরাং মূলধন বলতে আমাদের কারোর হাতে কিছু ছিল না। শুধু বৈদ্যনাথের স্বল্প মূলধন (সম্ভবত স্ত্রীধন) ভাঙিয়েই কাগজ চলতো। এ অবস্থায় যা হবার তাই হল। কিছুকাল পরে প্রেসওয়ালার তাগিদে কাগজ উঠে গেল। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই প্রসঙ্গে লিপিবন্ধ করতে পারি। সাহিত্যক্ষেত্রে অধুনা খ্যাতনামা শ্রীবুদ্ধদেব বসু আমাদের "স্বস্ত্যয়নে" একটি স্বরচিত কবিতা (যতদূর মনে পড়ে চাষী সম্বন্ধে) পাঠিয়েছিলেন এবং সেটি ছাপা হয়েছিল। বৈদ্যনাথের কয়েকখানি ছাপা উপন্যাস আছে—একখানির নাম "ভুল" তিনি স্বভাব-কবি ছিলেন। উপরে যে কবিতা উদ্ধৃত করেছি অমন কবিতা উনি পোষ্টকার্ডে লিখে বসে অজস্র লিখতে পারতেন।

বৈদ্যনাথ তাঁর জীবন সাঙ্গ করে গেছেন। জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছিলেন—দুঃখের হাত থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। আজ কেবল মনে হয় জীবনে দুঃখ পাওয়াটা কি তাঁর নিরর্থক হয়েছে? যে মহতেরা পরের দুঃখ নিজেরা বুক পেতে নেন তাঁদের জীবনে বৈদ্যনাথের জীবন স্বর্থপূর্ণ হয়েছে।

★

বিকাশ

শ্রীসুগোতম

অজস্র অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তি এখানে,
এভারেষ্ট-এ,
বিশ্বের সমস্ত রূপ নিরেট জমাট।
সুউচ্চ হিমাশ্রমে সবই কেবল স্বচ্ছ, শুভ্র—
সমস্ত জ্ঞান ভক্তি হ'য়ে, সমস্ত প্রেম ঊর্দ্ধমুখী।
পৃথিবীর নাভিস্থল থেকে
আত্মা-চমকান কলরোল পৌঁছে না এখানে।
এখান থেকে
খালি চোখে কিংবা দূরবীনে কিংবা ধ্যানে
আমাদের ফেলে আসা পথ পরিষ্কার।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা
পার হ'য়ে অনেক মাঠ পথ নদী
অতিক্রম ক'রে বনানী শ্বাপদ সংকুল স্থান
শরীরকে নাশ ক'রে তিল তিল
তৈরী ক'রে রাখা এই পথ—
বহুর সমষ্টি দিয়ে সৃষ্টি।
শেষকালে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ।

এত সোজা নয় মানুষকে ভালবাসা পৃথিবীতে।
ভালো যাহা কিছু যাহা নিষ্কলুষ সবই
অজস্র কষ্টের ক্ষয়ের বিনিময়ে।
সাধনা কষ্টের তাই, মুক্তি বহুদূর।

সাহিত্যে শিবরাত্রি

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"শিবরাত্রি" বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় উৎসব। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে যে রাত্রি হয় সেই রাত্রির নাম শিবরাত্রি। ঐ দিবসের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ত্রয়োদশী দিবসে একবার মাত্র হবিষ্য বা নিরামিষ আহার করিয়া শুদ্ধ দেহ-মনে তৃণশয্যায় কাটাইয়া পরদিন উপবাসী থাকিতে হয়। রাত্রে প্রতি প্রহরে শিবলিঙ্গকে দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি দ্বারা স্নান করাইয়া বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা ও নৃত্যগীতাদি সহযোগে অর্চনা করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিলে শিবের সন্তোষ সাধনের দ্বারা দেহান্তে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

এই প্রথার মূলে রহিয়াছে এক ব্যাধের উপাখ্যান, যাহা সাধারণ ব্রতকথায় নীরস ও সংক্ষিপ্ত—কিন্তু সাহিত্যে পল্লবিত হইয়া নানা রসাশ্রিত মনোহররূপ ধারণ করিয়াছে।

ব্রতকথায় বক্তা স্বয়ং শিব, শ্রোতা পার্ব্বতী; অন্য চরিত্র বিশেষ নাই; ঘটনাস্থল চিত্রকূট পর্ব্বত। ব্রতকথার ব্যাধ দুশ্চরিত্র বর্ব্বর, নিষ্ঠুর; একদিন বহু পশুপক্ষী বধ করিয়া মাংসভার বহনে অসমর্থ হইয়া দিবাবসানে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ক্লান্তিবশে ঘুমাইয়া পড়িল; অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে জাগিয়া বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ মাংসভারটি সেই বৃক্ষের এক শাখায় বাঁধিয়া নিজে একটি শাখায় উঠিয়া বসিয়া রহিল; সহসা তাহার হস্ত সঞ্চালনে একটি পত্র বৃন্তচ্যুত হইয়া গেল। সেই বৃক্ষটি বিল্ববৃক্ষ, তাহার মূলে একটি শিবলিঙ্গ ছিল; পত্রটি উহার উপর পতিত হওয়ায় আশুতোষ ব্যাধের উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই অজানিত পূজার জন্য কিছুকাল পরে তাহার স্বগৃহে মৃত্যুর পর তাহার আত্মাকে যমদূতের বন্ধন মুক্ত করিয়া শিবালোকে আনয়ন করেন।

সাহিত্যে এই কাহিনীর নাম "মৃগলুব্ধ" বা "মৃগলুব্ধ সংবাদ" (লুব্ধ অর্থে ব্যাধ)। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১ চট্টগ্রামস্থ সুচক্রদণ্ডী নিবাসী প্রাচীন সাহিত্য ও পুঁথি সংগ্রহকারী কবি মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পুঁথি সংগ্রহ ও সংকলন তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল—যদিও তিনি পটিয়া স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অফিসের কর্ম্মচারী (পরে অফিসার) রূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। চাকরীর জন্য একটি ও লেখক হিসাবে আর একটি পেন্সন তিনি পাইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েকখানি পুঁথি উপহার দেন এবং বাংলা ভাষার সমর্থনের আন্দোলনে যোগদান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার সম্পাদিত "মৃগলুব্ধ" ও "মৃগ্লুব্ধ-সংবাদ" নামক দুইখানি পুঁথি ১৩২২ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত করেন, ইহার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার সম্পাদিত ও সংকলিত অন্যান্য অনেকগুলি পুঁথিও দানবীর লালগোলার রাজা রাওএর অর্থানুকূল্যে এই পরিষদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরিষদের সহিত তিনি বহুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

"মৃগলুব্ধ"—দ্বিজ রতিদেব বিরচিত

"মৃগলুব্ধ-সংবাদ"—রামরাজা বিরচিত

গবেষণামূলক আলোচনার দ্বারা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় অনুমান করিয়াছেন রামরাজা-বিরচিত পুঁথিখানি দ্বিজরতি দেব-বিরচিত পুঁথিখানির পূর্ব্ববর্ত্তী; রতিদেবের পুঁথিতে উহার রচনাকালজ্ঞাপক একটি পদ আছে যাহা হইতে বলা যায় ১৫৯৬ শকাব্দের কার্ত্তিক মাস উহার রচনা কাল। রামরাজার পুঁথিতে ঐ প্রকার কালজ্ঞাপক কোন পদ নাই। বর্ত্তমানে ১৮৭৬ শকাব্দ চলিতেছে—সুতরাং 'মৃগলুব্ধ' ২৮০ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। সম্ভবতঃ ভাষা হিসাবে ইহা আরও প্রাচীন এবং মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাকে সুলতান হোসেন শাহের সময়ে রচিত বলিয়া অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন, রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' রচিত হইবার পর রঘুরাম রায় এই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। আবদুল করিম সাহেব একজন অজ্ঞাতনামা কবির রচিত 'মৃগলুব্ধ' নামক

অন্ত একখানি পুঁথির রচনা-প্রণালী দেখিয়া বলিয়াছেন ঐ অজ্ঞাতনামা কবিই বঙ্গভাষায় এই ব্যাধকাহিনীর প্রবর্ত্তক। সেই পুঁথিখানি চট্টগ্রাম গৌড়লা নিবাসী ৺দিগম্বর সেন দারোগা মহাশয়ের বাড়িতে দেখিয়া সামান্ত "নোট" লইয়াছিলেন—পরে সেই "নোট" সাহায্যে "প্রাচীন পুঁথির বিবরণ" নামক গ্রন্থে করিম সাহেব সেই 'মৃগলুব্ধে'র একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। এই উপাখ্যানের মূল কি, এবং উহার আদি কবিই বা কে তাহা নির্ণীত হয় নাই। কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে বাঙ্গলা ভাষায় এই উপাখ্যান রচিত হইয়া থাকিবে—ইহাই করিম সাহেবের সুচিন্তিত মত।

'মৃগলুব্ধে' (রতিদেব বিরচিত) হরপার্ব্বতির কথোপকথনে অনেক অনাবশ্যক ও স্থানে স্থানে শালীনতাহীন ভাষায় লিঙ্গপূজার উৎপত্তির বিবয় রহিয়াছে; পয়ার (পয়ার) ও লাচারী ছন্দে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

'মৃগলুব্ধ-সংবাদে' (রামরাজা রচিত) লিঙ্গপূজার উৎপত্তির বিবয় কিছুই নাই—সরল অনাড়ম্বর পয়ার, দীর্ঘছন্দ (ভাটিয়াল), সর্ব্বছন্দ, কামোদরাগ প্রভৃতিতে উপাখ্যানটি রচিত। এই দুইটি পুঁথিরই গল্পের সূচনায় হরপার্ব্বতী, কিন্তু প্রধান বক্তা হস্তিনাপুরের রাজা মুচুকুন্দের পত্নী রুক্মিণী, শ্রোতা রাজা মুচুকুন্দ। ঘটনাস্থল চিত্রকূট কিন্তু গল্পটি বলা হইয়াছে হস্তিনাপুরীতে যেখানে শিব পার্ব্বতীকে লইয়া গল্পটি শুনিতে আসিলেন। ব্যাধ সামান্ত লোক নহে, ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত বিশারদ চিত্রসেন নামে এক বিদ্যাধর (গন্ধর্ব্ব)—একদিন নৃত্যকালে অদূরে দেখিল একটি হরিণকে একটি ব্যাধ মারিতেছে—অমনি নৃত্যের তাল কাটিয়া গেল—ইন্দ্র ক্রোধে তাহাকে শাপ দিলেন—

"ব্যাধ হইয়া জন্ম গিয়া পাপ দুষ্টমতি"

চিত্রসেন শাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত অনেক স্তুতি করায় "শাপের মুকতি বর দিলা সুরেশ্বর।
ব্যাধ হইয়া জন্ম গিআ চিত্র গিরিবর॥
ভদ্রসেন মৃগ সঙ্গে হবে দরশন।
সেইদিন শাপমুক্ত তোরা দুইজন॥"

শাপগ্রস্ত চিত্রসেন (কালকেতু ব্যাধ) কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বতনু বিকট দর্শন; মাথায় পিঙ্গল কেশভার, হাতে শরধনু ও কাঁধে জালদড়ি লইয়া একদিন মৃগ মারিবার জন্ত বনে চলিয়া গেল, কিন্তু সেদিন একটিও পশু পাইল না, যদিও "বিচারি সকল বন কৈল পাতিপাতি।" সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ বায়ুবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত শিলা বরিষণ আরম্ভ হইল— "মাঘ চতুর্দ্দশীর" প্রচণ্ড অন্ধকার "ঠানাঘাতে বজ্রঘাতে" কাঁপিয়া উঠিল, ব্যাধ প্রাণভয়ে এক 'উচ্চতর বৃক্ষোপরে' উঠিয়া বসিল ও

"নিদ্রানিবারণ হেতু পত্র ছিড়ে কালকেতু
বৃক্ষমূলে পেলাএ নিরবধি"

সেই বৃক্ষটি বিল্ববৃক্ষ, শিশিরশিক্ত বিল্বপত্র সারারাত্রি তলস্থ এক শিবলিঙ্গের উপর পতিত হওয়ায় "আপনে সদয় ভোলানাথ।"

প্রভাতে ধর্ম্মরাজ যম "মৈষ পৃষ্ঠে আরোহিয়া করে কালদণ্ড নিয়া" উপস্থিত; ব্যাধ ত আতঙ্কে কম্পমান যম অভয় দিয়া বলিলেন—

"...গেল নিশি শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী—সেই পুণ্যে তোমার পাপ নাশি।"

যম বর দিতে চাহিলেন—ব্যাধ বর মাগিল
"পশুর বিত্তান্ত (বৃত্তান্ত) যেন বুঝিবারে পারি।"

যম বলিলেন—তথাস্তু; হরষিত মনে ব্যাধ স্বগৃহে ফিরিয়া গেল।

পরে একদিন মৃগ মারিবারে সাজিয়া চলিল বিন্ধ্যপর্ব্বতে এবং গাছের ভিতর লুকাইয়া রহিল; এমন সময়ে—

শাপভ্রষ্ট হৈয়া তবে এক বিদ্যাধর।
মৃগরূপ হৈয়া রৈছে বনের ভিতর॥
মৃগের সহিত মৃগী তথাতে চরে বনে।
বেড়াই কোমল ঘাস খাএ জনে জনে॥
হেনকালে সেই মৃগ চরিছে বনএ।
পড়িল আসিআ কালব্যাধের জালএ॥

মৃগী দূর হইতে মৃগের বেয়াকুলি শুনিয়া তাহাকে মুক্ত করিবার বৃথা চেষ্টার পর অনেক শোক প্রকাশ করিয়া পাশবদ্ধ স্বামীকে "আগুছিয়া রহিল।" ইতিমধ্যে "যমের দোসর ব্যাধ" শূলহাতে মৃগটিকে বধ করিতে আসিলে মৃগী বলিল

নিশ্চিন্তে মরিমু আমি শুন মহাশয়।
আগে আমারে মার ব্যাধ মহাশয়॥

ব্যাধের সহিত মৃগী শরণার্থীকে রক্ষা করার ধর্ম্ম ও প্রাণিহিংসার মহাপাপের কথা বলিয়া দুইজনেরই প্রাণভিক্ষা চাহিল। অনেক কাকুতি ও অকারণ নির্দ্দোষ জীবহত্যার নৃশংসতার বিষয় করুণতম ভাষায় ব্যক্ত করিবার পর—

"মৃগীর বচন শুনি তুষ্ট হইলা ব্যাধ পুনি
মনে হইল সকরুণ মতি।
মৃগীরে প্রশংসা করি শূল হস্তে মুষ্টি ধরি
ভূমিতে সে এড়িল সকল"

শূল নামাই বটে, কিন্তু তখনও মৃগকে পাশমুক্ত না করিয়া ব্যাধ মৃগীর নিকট আরও অনেক বিষয় জানিতে চাহিল।

মৃগী বলিল সে ব্রহ্মার পাশে থাকিবার কালে মুনিদের মুখে শুনিয়াছে—

"ধর্ম্ম অধর্ম্ম যেবা করে পরলোকে পাএ তারে
বিনি ভোগে না জাএ খণ্ডন।"

মৃগী বলিতে লাগিল—প্রভুর আজ্ঞায় ব্রহ্মা ত্রিভুবন সৃষ্টি করিলেন কিন্তু সংহার করিতে না জানায় সৃষ্টের ভারে ক্ষিতি রসাতলে যাইবার উপক্রম। এই দেখিয়া ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন—যজ্ঞে "মৃত্যু-নারী" নামে এক কন্যার উৎপত্তি হইল—ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—

'আজি হোতে কর্ত্তা তুম্মি সব অধিকার
জথেক প্রাণীরে তুম্মি করিবা সংহার'

মৃত্যু-নারী এই নিদারুণ কর্ত্তব্য করিতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করায় এবং অন্য কাহাকেও এই 'দারুণ কর্ম্মে' নিয়োজিত করিবার অনুরোধ করিলে—ব্রহ্মা কুপিত হইয়া বলিলেন—নিজ কর্ম্মের দোষে জীবের মরণ হইবে—তপন তনয় ধর্ম্ম তাহার বিচার করিবেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা লোভ মোহ কাম ক্রোধ—এ চারিরিপুকে সৃষ্টি করিয়া "জথেক প্রাণীর তরে সমর্পণ কৈলা"; মৃত্যুনারীকে মৃত্যুরূপে সংসারে ভ্রমণ করিতে বলিলেন। প্রাণীর মৃত্যুর পর ধর্ম্মরাজ তাহাদের বিচার করেন।

ব্যাধের প্রশ্নে মৃগী বলিল—

'আছএ চৌরাশী লক্ষ নরক দুর্গম।
এ হার অধীন চারি নরক অধম।

'মৃগলুব্ধ সংবাদ' ইহাদের উল্লেখ করিয়াছে—রৌরব, কুম্ভীপাক, খড়্গধার ও গজকর্ণ; 'মৃগলুব্ধে' উল্লেখ আছে—রৌরব, কুম্ভীপাক, হস্তিকর্ণ, খড়্গধার।

প্রত্যেকটি নরকের বর্ণনা ও কোন্ পাপীকে কোন্ নরকে যাইতে হয় ও কী ভীষণ যন্ত্রণা পাইতে হয় তাহার বিবরণ সুললিত পদ্যে বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে রৌরব ইত্যাদি নরকের অপূর্ব্ব বর্ণনা স্মরণীয়। Dantea ডিভাইন কমেডিতে বর্ণিত নরকের ও ভাগবতাদি পুরাণে ও মহাভারতে উল্লিখিত নরকের আদর্শ মধুসূদনের অনির্ব্বচনীয় কল্পনা ও ভাষার লাবণ্যে রূপায়িত হইয়া বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে;

তাহাদের মণিমুক্তা খচিত আসনের পার্শ্বে চট্টগ্রামের অন্তঃপুরের অখ্যাত কবি রামরাজ (সম্ভবতঃ বড়ুয়া) ও কবি রতিদেব (ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য্য) বিরচিত উপরোক্ত দুইখানি পুঁথির নরক বর্ণনা স্বর্ণাসন না পাইলেও কাষ্ঠাসন পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মৃত্যুর পর "বৈতরণী নদী" পার হইবার ব্যাপারে ও পাপীর জন্য যমের দক্ষিণ দ্বার চিহ্নিত থাকার বিষয়ে প্রায় সবদেশের মহাকবিরাই একমত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্বে—(কাশীরাম দাসের মহাভারত).

"দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের কায়॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি॥
মস্তকে মারয়ে দূত মুষল প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাতে পার॥"

মৃগলুব্ধ—(মৃগী ব্যাধকে বলিতেছে)

"যমের দক্ষিণ দ্বার অবিশ্রাম হাহাকার
যেন ডাকে সমুদ্রের জল
সদাএ ঘোর অন্ধকার নিশিদিশি কাটে মার
রাত্রি দিন করে হাহাকার।
বৈতরণী মহানদী অগ্নিজলে নিরবধি
রক্ত মাংস অস্থিএ পূর্ণিত।

ক্ষুরের সাঁকোআ চড়ি কেশের ধরনি ধরি
তবে জাএ যমের পুরীত ॥
সেই নদী পার হইলে জাইতে পারে যমপুরে
জথ প্রাণী সব হএ পার।
পাপীসব ছিঁড়ি পড়ে সর্ব্বাঙ্গ বিঁধএ ক্ষুরে
অগ্নি মধ্যে করে হাহাকার ॥

ইত্যাদি

ভার্জ্জিলের ঈনীড কাব্যে এই নদীকে বলা হইয়াছে—Stream of sulphurous flow, dark and dreadful flood, musky deep ইত্যাদি—আর সেতু-রক্ষক বিকট-দর্শন. নির্ম্মম কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রতিহারীরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

মধুসূদন—"*পাপী যারা
সাঁতারিয় নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে
জলে অগ্নে পাপ প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!"

মৃগীর নিকট পাপীর পরিণাম ও নরক বর্ণনা শুনিয়া ব্যাধের "সর্ব্বাঙ্গে উঠিলো জ্বর" পাপভয়ে অস্থিভেদ হইবার উপক্রম ; সেইজন্য মৃগীকে ধর্ম্মকথা বলিতে অনুরোধ করিল। মৃগী তাহাকে ধর্ম্মের বাখান, পুণ্যের বিধান শুনাইল এবং নানাপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বুঝাইল—

"সুখ জে সম্পদ লৈআ থাকে নানা ধর্ম্মে।
তিনজন্মের সুখ ব্যাধ পাএ এক জর্ম্মে।"

তারপর অনেক আলোচনার পর ব্যাধ

"জালপাশ কাটি মৃগ করিলো মোচন।
ধরণী লোটাইয়া বন্দে দুহার চরণ ॥"

[দুহা, অর্থাৎ মৃগী ও মৃগ].

মৃগ পাশমুক্ত হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—

"ভদ্রসেন-নাম মোর ভার্য্যা রত্নবতী।"

এইরূপে ব্যাধ (গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন) ভদ্রসেনের সহিত মিলিত হওয়ায় ইন্দ্রের শাপ মুক্ত হইলেও ব্যাধজীবনের বহু পাপ হইতে মুক্তির কামনা করিল। ভদ্রসেন পূর্ব্বে রাজা ছিলেন। কিন্তু প্রজা পালন না করার অপরাধে মৃগ হইয়া জন্মিতে হইল ; একশত পত্নীর মধ্যে মাত্র এক জন তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া মৃগীরূপে জন্মগ্রহণ করিল—পতিব্রতা রত্নবতী সেই মৃগী তাহারই পুণ্যে ভদ্রসেন মৃগরূপে ব্যাধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। মৃগী রত্নবতীকে শিবধামে লইয়া যাইবার জন্য বিমান আসিল। মৃগী সারথিকে বলিল স্বামীসহ স্বর্গে যাইতে অনুমতি পাইলে যাইবে, নতুবা নয়। শিবের মহিমায় এই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তখন মৃগী তাহার দুই পুত্র ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে ফেলিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হওয়ায় আশুতোষ ছয়জনকেই স্বর্গে আসিবার অনুমতি দিলেন ; এই দেখিয়া ব্যাধ মৃগীর পাএ ধরিয়া নিজের মুক্তির উপায় জানিতে চাহিল ; মৃগী তাহাকে বলিল, চন্দ্রভাগা নদী তীরে পশ্চিমাংশে এক বিল্ববৃক্ষের নীচে অতি প্রত্যক্ষ (পরত্যেক) এক শিবলিঙ্গ আছে—

"একমনে চিত্তে পূজ তাঁহার চরণ।
সর্ব্বপাপ নাশ হইবো তরিব শমন ॥
অন্যথা না কর ব্যাধ শীঘ্রে চলি জাও।
স্বর্গপুরী জাইবা ব্যাধ এড় দুই পাও ॥

উপদেশমতো কার্য্য করিয়াও ব্যাধের অসুবিধার অন্ত নাই। বিল্বপত্রে শিবলিঙ্গ পূজা করিবার সময় ব্যাধ আচম্বিতে এক পূজক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রহৃত ও নির্য্যাতীত হইল—কারণ সে চণ্ডাল হইয়া 'অখিলের পতি'কে স্পর্শ করিয়াছে। অনেক ক্ষমা প্রার্থনা ও কাকুতি মিনতির পর ব্যাধ ব্রাহ্মণের উপদেশে স্নান করিয়া শুচিস্নান কুশ হস্তে বাঁধিয়া, মূলমন্ত্র জপ করিয়া শিবের বর লাভ করিল। তারপর শিবের আদেশে নন্দী রথ লইয়া তাহাকে স্বর্গে লইতে আসিল ; ব্যাধ স্তবস্তুতির দ্বারা নিজপত্নীকেও লইয়া যাইবার অনুমতি পাইল ; ইতিমধ্যে যমদূতেরা আসিয়া ব্যাধদম্পতিকে প্রহারে জর্জ্জর করিয়া হস্ত পা বাঁধিয়া যমপুরে লইবার চেষ্টা করিল। শিবদূতেরা এই অন্যায় আক্রমণের যথোচিত শাস্তি দিল এবং দম্পতীকে শিবের নিকট লইয়া গেল ; যমদূতেরা সংজ্ঞালাভ করিয়া যমকে এই ভীষণ পরাজয়ের বার্ত্তা শুনাইল ; যম ক্রোধে অভিমানে শিব সন্নিধানে গিয়া নালিশ করিলেন এবং চাকরীতে ইস্তফা দিবার সংকল্প জানাইলেন। দেবাদিদেব শিব তখন যমকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বে ঐ ব্যাধ চতুর্দ্দশী রাত্রে শিবপূজা করার জন্য, তিনি যম

সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সকল পাপ নাশ করিয়া তাহাকে বর দিয়াছিলেন।

যম লজ্জিত হইয়া শিবের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই সম্পূর্ণ-কাহিনীটি রাণী রুক্মিণী তাঁহার স্বামী হস্তিনাপতি রাজা মুচুকুন্দকে শোনাইবার পর, রাজা তাঁহাকে লইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে বিল্ববৃক্ষ তলস্থ শিবলিঙ্গের পূজার জন্ম প্রজাগণের সহিত গমন করিলেন। রাজদম্পতির ভক্তিপূর্ণ আরাধনায় আশুতোষ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কৈলাস-শিখরে রাজ সিংহাসন দান করিয়া "পুরী সমে" (প্রজাগণের সহিত) দম্পতিকে স্বর্গে আনয়ন করিলেন।

"সেই শিবপদপদ্মে মধুগন্ধ পাইআ।
রতিদেবে গাএ এই লোকেতে ভুলিআ॥"

রামরাজা বিরচিত 'মৃগলুব্ধ-সংবাদে' ঘটনার প্রবাহ এইরূপই। তবে তাঁহার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, শালীনতাময় ও অপেক্ষাকৃত আবেগহীন। উভয়েই চট্টগ্রামের অধিবাসী; শিবের প্রভাব বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রামেই সমধিক। মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ-স্বয়ম্ভুনাথ হইতে এদেশে শৈবভাবধারা শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের দিনেও অব্যাহত ছিল—যদিও বাঙ্গলায় শৈবসাহিত্যের বিকাশ হইতে পারে নাই। মঙ্গলকাব্যে চণ্ডী মনসা প্রভৃতি দেবতাদের প্রাধান্ত—শিবকে লইয়া যে সামান্ত সাহিত্য চর্চা হইয়াছে তাহার মধ্যে রামেশ্বরের শিবায়ন উল্লেখযোগ্য; কিন্তু তাহাতে অনেকস্থানে শিব ও দুর্গাকে দিয়া যে সকল কার্য্য করান হইয়াছে ও যে ভাষায় তাঁহাদের মনোভাব (কল্পনায়) ব্যক্ত করা হইয়াছে—তাহাতে সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। শিব অল্পে সন্তুষ্ট, তাঁহার "শিবরাত্রির" মূল কথাটি এদেশের হিন্দু-জনসাধারণ যেন কখনও বিস্মৃত না হয়।

★

স্মরণ

শ্রীমতী বাণী রায়

আমার জগতে তুমি ফেলেছ যে ছায়া
আপনার কায়া দিয়ে।

জানিনে তো আমি
স্মরণের যূপকাষ্ঠে বাঁধা দিনযামি
মুক্তি পেলে কি বা হবে।

ভারবাহী জীবে
সহসা বিশ্রাম দিলে লাগে বা কেমন?
বন্ধন চাইনে, তবু অভ্যস্ত বন্ধন।

যে তুমি জীবনে এই, শোন প্রিয়তম,
মেশালে আপন সত্তা,—
অন্ধ দিবা মম
একটি সূর্য্যের কক্ষে করে যে ভ্রমণ;
জানিনে কেমন লাগে বিচ্যুত বন্ধন।
এই যে শঙ্কিত দীপ আলো করে গৃহ,
তোমার বিদায়ে বল্ রবে কি উজ্জ্বল?
যদি তুমি নাই থাকো, লাগিবে কি ভাল
বিভ্রান্ত বাদল রাত্রে বর্ষণের জল?
হয় তো হাসিব আমি—
তবে ভুলে যাব?
—দক্ষিণা সমীর বয় স্মরণের পারে?—
নির্নিমেষ রুক্ষ আঁখি মৃদু তিরস্কারে
যদি না শাসন আনে,
চির অন্ধকারে কেমনে জাগিয়া থাকে সামান্ত স্মরণ?
শুনেছি মৃত্যুর দেশে জ্বলে না তপন।

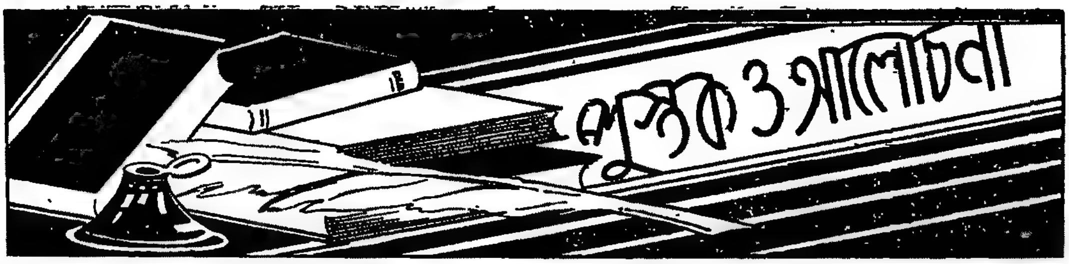

ফাল্গুন মাস। দিকে দিকে বসন্তের উদার আমন্ত্রণ। ক্লান্তিবিস্তৃত আকাশে তারার ঘৃতপ্রদীপ; তুলার মত লঘু খণ্ডছিন্ন বলাকা; সন্ধ্যামালতী আর দ্রোণ ফুলের মদির সৌরভ—এই দিয়া শীতবিবর্ণ শূন্যতা ভরিয়া উঠিয়াছে। কবি গাহিয়াছেন:

ফাল্গুন এসে ঐ হেসে হেসে,
ভরি দিল তব শূন্যতা—
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

যুগে যুগে প্রকৃতির রূপময়তার সংবাদ লইয়াই ফাল্গুনের অভ্যুদয়। কিন্তু বসন্তের রূপরসের যেমন একটি দিক রহিয়াছে, তেমনি ক্ষুধাজর্জর মলিনতার আর একটি সংবাদও পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। আজ ক্ষুধা, হাহাকার আর অভাবের জীর্ণ দীর্ঘশ্বাস বিষুবরেখার দুদিকেই ক্রমে ক্রমে চণ্ড হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুধা আজ বিশ্বজনীন; এই ক্ষুধার সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন, সামন্ততান্ত্রিক ব্যভিচার দেশে দেশে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। ফাল্গুনের মাদকতা-ভরা সৌরভের উপর অপমৃত্যুর করাল যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। তবু ইহারই মধ্যে আশার চকমকি ঝিকমিক করিয়া উঠে 'যখন দেখি সংগ্রামী মানুষের পেশীতে পেশীতে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা আগ্নেয় হইয়া উঠিয়াছে। রুশের অগ্নিবীর্য বীরত্বের সংবাদ লইয়া 'স্প্রিং অন্ দি অডার'—উপন্যাসখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্তালিনগ্রাদ হইতে বার্লিন'—এই সুবিরাট পটভূমিতে ফ্যাসিজমের কামান বার বার সুখী-পরিশ্রমী মানুষের হৃদপিণ্ড কম্পিত করিয়া দিয়াছে, জীবনের বসন্তবাহার ছারখার করিয়া দিয়াছে। তাহারই বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের অমর রক্তযজ্ঞের ভূমিকটিকে 'ষ্টার'-এর কুশলী কথাশিল্পী কাজোকেবিচ্ বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

ষ্ট্যালিন-পুরস্কার-প্রাপ্ত আর একটি উপন্যাস 'ষ্টুডেন্টস্'। সোবিয়েত ছাত্র জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ও তাহার বলিষ্ঠ সমাধানের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন তরুণ ঔপন্যাসিক ওয়াই. ত্রিফোনভ্।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ চীনের উপর একটি ট্র্যাভেলগকে শ্রদ্ধাবিস্ময়ে অভিনন্দন জানাইয়াছে। রচনাটির নাম, 'চায়নাজ নিউ ক্রিয়েটিভ্ এজ্'—রচয়িতা ক্যান্টারবেরীর ডীন হিউলেট জনসন। জনসন চীনের নতুন মানুষদের অমর কথকতা করিয়াছেন তাহাদের জীবনরচনার উজ্জ্বল পর্বে পর্বে।

চীন প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী 'চীন দেখে এলাম'। নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। রচনা করিয়াছেন খ্যাতনামা কথাশিল্পী মনোজ বসু। চীনের গণজীবনকে গরীয়ান শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখক স্মরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি চীন-পরিভ্রমণে যে ভারতীয় সংস্কৃতি দলটি গিয়াছিল, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু তাঁহাদের অন্যতম।

বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের প্লাবন আসিয়াছে।

গর্কির 'মা' রুশ দেশের মা; স্তেলেন্দার রচনা অমরতা লাভ করিয়াছে ইতলির মা আর চীনের মাকে শ্রদ্ধাশীল সন্তানের দৃষ্টিপ্রদীপে উপস্থিত করিয়াছেন পার্ল বাক। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদার'—অনুবাদ করিয়াছেন হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। অনুবাদ প্রসঙ্গে পি. জি. ওডহাউসের 'থ্যাঙ্ক ইউ জীভ্স' নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পনৈপুণ্যে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি' অনুবাদ করিয়াছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। ম্যাক্সিম গর্কীর 'লাবলেস্ পল্' উপন্যাসটি 'অভাগা' নামে অনূদিত হইয়াছে। অনুবাদক—সত্যগুপ্ত। ই. ক্যাজাকোবিচের 'ষ্টার' উপন্যাসটি অরুণা হালদার অনুবাদ করিয়াছেন। বাঙলা নামকরণ হইয়াছে 'তারা'।

গান্ধীজী সম্পর্কিত নতুন তথ্যবহুল গ্রন্থ 'GANDHI', লিখিয়াছেন প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসার। A Signet Key Book Publication প্রকাশ করিয়াছেন, The New American Library of World Literature, Inc 501 Madison Avenue, New York-22. মূল্য—২৫ সেন্ট্। লুই ফিসারের রচনার সঙ্গে পরিচয় নাই, এমন বিদগ্ধ পাঠক দুর্লভ। জীবনের একটি

মূল্যবান অংশ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে কাটাইয়াছেন এবং গান্ধীজী সম্পর্কিত রচনা প্রকাশ করিয়া ইতিপূর্বেই তিনি ভারতীয় পাঠকসমাজের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন। আলোচ্য-গ্রন্থখানি রচনা করিয়া গান্ধীজী সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক তথ্য তিনি বিশ্বের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চমকপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ কোনো একটি ঐতিহাসিক পটক্ষেপকে অস্বীকার করিয়াই গান্ধীজীর জীবন ও কর্ম-সাধনাকে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করা হয় নাই। লুই ফিসারের পাণ্ডিত্য ও ভারত-মনীষী-প্রীতি সম্পর্কে তাঁহার প্রতি পূর্ব হইতেই আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িয়া তাঁহার প্রতি আমাদের সেই শ্রদ্ধা আরও গাঢ় হইল। গ্রন্থখানি শেষ প্রচ্ছদপটে গান্ধীজী-ব্যবহৃত চপ্পল, খড়ম, ঘড়ি, বই, চশমা প্রভৃতির চিত্র মুদ্রিত করিয়া দেওয়ায় লেখকের মহাজন-পূজার্ঘ্য সাজানো পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। ভারতবাসীমাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে বিমল মিত্রের বিপুলকায় উপন্যাস 'সাহেব-বিবি-গোলাম'। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ঐতিহাসিক পটক্ষেপে কলিকাতা মহানগরীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন বিমল মিত্র। বাঙলা উপন্যাসের কলেবরের দিক হইতে একটি দুঃসাহসিক অভিযান।

প্রেমের ব্যর্থতার তীব্রতা লইয়া অনুসন্ধানী মনঃসমীক্ষা করিয়াছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার নূতন উপন্যাস 'তেইশ বছর আগে পরে' সেই বিরাট অনুভূতিকর সমীক্ষারই অপরূপ আলেখ্য। মানিক বাবুর দিক্‌বিস্তারী প্রতিভার আর একটি অপূর্ব বৈচিত্র্য 'তেইশ বছর আগে পরে'।

বাংলায় আর একটি অপূর্ব সংযোজন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অণোমদর্শী সুত্তবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত **'ধম্মপদং'**। গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি-অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এবং প্রকাশ করিয়াছেন কলিকাতা প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী (১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট্)। দাম—সাড়ে চারি টাকা। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সমবেত হইয়া ভগবানের বাণীকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি পিটকে ভাগ করিয়া লিপিবন্ধ করিয়া যান। এই তিনটি পিটক—বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম, এককথায় ত্রিপিটক নামে পরিচিত। বৌদ্ধ আচার ও অনুশীলন সংক্রান্ত গ্রন্থের সমষ্টি হইল বিনয় পিটক, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের স্থান সুত্তপিটকে এবং ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বের সমন্বয়ে অভিধম্ম পিটকের জন্ম। সুত্তপিটকের পঞ্চম বা সর্বশেষ নিকায় খুদ্দকণিকায়ের অন্তর্গত থের-গাথা, থেরীগাথা, জাতক, উদান প্রভৃতি পনেরখানি অমূল্য গ্রন্থের অন্যতম হইল আলোচ্য 'ধম্মপদ', এবং ধম্মপদই হইল ত্রিপিটকের সর্বশ্রেষ্ঠ। জগতের যে কোনো সমৃদ্ধ ভাষাতেই ধম্মপদ অনূদিত হইয়াছে। আলোচ্য নবতম বঙ্গীয় সংস্করণে মূল গাথার শুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াই গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই, কি পরিবেশে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে গৌতম বুদ্ধ এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, মূল ধম্মপদ অট্‌ঠ কথা হইতে তাহার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াও 'পরিচিতি' নামে এই গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। এই 'পরিচিতি'র মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ ও তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকসমাজের একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারিবে বলিয়াই মনে করি। ধম্মপদকে বৌদ্ধগীতি আখ্যা দেওয়া যায়। শুদ্ধ ধর্ম বা দর্শনের গ্রন্থ নয়, কাব্য হিসাবেও ইহার মূল্য অনস্বীকার্য। বিভ্রান্তিকর নানা মতবাদদুষ্ট পৃথিবীতে আজ এই জাতীয় গ্রন্থের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী তাঁহাদের এই পরিশ্রমলব্ধ সম্পাদনা ও অনুবাদের জন্য দেশবাসীমাত্রেরই অভিনন্দনীয়।

স্বাধীন ভারতীয় সংস্থায় বাংলার গৌরবময় অবদান এবং বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিরূপণের ভিত্তিতে সম্প্রতি শ্রীসুধীরকুমার মিত্র **'ভারত ও বাংলা'** (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ করিয়াছেন, (১১০।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা), দাম—১৸০ আনা মাত্র।

বাংলার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রহিয়াছে, ভারতদেহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হইয়াও সেই ঐতিহ্যের দ্বারা বাংলা চিরকাল ভারত-সংস্কৃতির জয়যাত্রার পথকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অথচ সমস্ত আঘাত বাংলাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে বাঙালী মরিয়াছে, দাঙ্গায় বাঙালী বিধ্বস্ত হইয়াছে, দেশ বিভাগেরও বৃহত্তর ক্ষতি বাঙালীর অদৃষ্টেই ঘটিয়াছে। অথচ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীই ছিল অগ্রগামী। সেই বাঙালীর ক্ষমতাকে নানাভাবে খর্ব করিবার একটা দুর্জয় প্রয়াস নানা দিক হইতে দেখা দিয়াছে, 'বাঙাল-খ্যাদা'-আন্দোলনে সারা ভারত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বাঙালীর অর্থনৈতিক ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িল। কিন্তু প্রশ্ন হইল—বাংলার মতো একটা জাগ্রত প্রদেশকে দুর্বল রাখিয়া ভারতীয় ঐতিহ্য সর্বাংশে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব কিনা। এই বিষয়টিকে আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ঐতি-

হাসিক ভিত্তিতে বিচার করিয়া যে তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। লাঞ্ছনাগ্রস্ত বাংলার বর্তমান পরিবেশে বাঙালীমাত্রের কাছেই গ্রন্থখানি আদৃত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সকলেই যে সমান শক্তিমান ব দক্ষ শিল্পী, এমন নয়; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে ভালো লেখেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভালো লিখিয়েদের মধ্যেও এমন এক-একজন শিল্পী আছেন—যাঁদের লেখনীতে আগামীকালের সার্থকতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত শিল্পীদেরই বিশেষতম একজন। **'এ জন্মের ইতিহাস'** তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ এবং সর্বশেষ উপন্যাস। প্রকাশ করিয়াছেন ষ্টারলাইট পাবলিকেশন্‌স ঃ ১৯এ, চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা। মূল্য—৫৲ টাকা মাত্র। আয়তনে দীর্ঘ হইলেও গ্রন্থখানি প্রাঞ্জল ও ঋজু। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যে প্রসাদগুণ, 'এ জন্মের ইতিহাসে'ও প্রায় সেই প্রসাদ গুণ বর্তমান। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ একটি ছোট ছেলে নিখিলেশ। সুখ ও প্রাচুর্যের কোলে লালিত হইয়াই ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে সে। জ্ঞানের পরিধিও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে। মা তাহার ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা। পিতা শ্বশুরের আশ্রিত। কিন্তু আশ্রিত হইলেও কর্মী, জ্ঞানতপস্বী। এই পিতার সঙ্গে সে গেল পিতার বাল্যসঙ্গিনী বাণী পিসীর বাড়ী। এবং সেইখানে পরিচয় ঘটিল বাণী পিসীর মেয়ে গৌরীর সঙ্গে। গল্প সুরু হইল।—দিদিমা মারা গিয়াছেন। দাদামহাশয় কর্মস্থলে আহত হইয়া শয্যা নিয়াছেন। তাঁহার সেই অক্ষমতার অন্তরালে সম্পদের বিলুপ্তি সাধিত হইল। মার আশা ছিল স্বামীর উপর। কিন্তু নিখিলেশের পিতা রাজনীতির অগ্নিস্পৃষ্ট পথে যাত্রা করিয়া কারাগারে অন্তরীণ হইলেন। পাছে পিতার অগ্নিপথে পুত্রেরও উত্তরাধিকার হয়, এই ভয়ে মা ব্যাকুল হইয়া নিখিলেশকে মফঃস্বলে পাঠাইয়া দিল। মফঃস্বলের দিনগুলি অবশ্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া রহিল না; নিখিলেশ সেখানে বসিয়াই অকস্মাৎ আবিষ্কার করিল নিজেকে। কবিতা লিখিল সে, মামাতো বোন মাধুরীদির অহেতুক পীড়নে চোখের জল মুছিল এবং বন্ধু হিসাবে পাইল মামাতো ভাই সুকুমার ও সহপাঠী সলিলকে। মাঝে মাঝে ছুটির ফাঁকে সে কলিকাতায় আসিতে লাগিল, ক্রমে জীবন-নাটকের আরও দুইটি দিক তাহার খুলিয়া গেল। পিতা যেদিন কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন, সেদিন সে স্পষ্টই বাণী পিসীর সঙ্গে পিতার ভালবাসার পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারিল, আরও উপলব্ধি করিতে পারিল যে, এই কারণেই বাণী পিসী স্বামীগৃহহারা। কিন্তু গৌরীর ভালোবাসা উপলব্ধি করিয়াও মনে মনে কম বিস্মিত হইল না নিখিলেশ। ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল সে। প্রবাসের দিনগুলিও তাহার শেষ হইল। বাড়ী ফিরিল নিখিলেশ। দাদামশাই মৃত। জীবনের উপর নিদারুণ বীতরাগ বাবার, প্রায়ই বাড়ী আসেন না তিনি। ঘর অলংকার তবুও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রী করিয়া দিন চলে। নিখিলেশ দেখিল—বাণী পিসী আবার স্বামীগৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাবার সঙ্গে তাঁহার আজ শত্রুতা। কিন্তু নিখিলেশের বুকের কাছে আজ ঘন হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে গৌরী, বাড়াইয়া দিয়াছে দুইটি কোমল বাহুবল্লরী। নিখিলেশ পারিল না তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া থাকিতে। ক্রমে আই-এ পরীক্ষা শেষ হইল। সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল নিখিলেশ। কিন্তু হারাইল সে গৌরীকে। বাণী পিসীই বিরোধিতা করিলেন গৌরীর সঙ্গে তাহার বিবাহের। গৌরীর বিবাহ হইল অন্য পাত্রের সঙ্গে। এইভাবেই দিন আগাইয়া চলিল। এদিকে সারা সংসার দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত। এই দুঃস্থ অবস্থার মধ্যেই একদিন নিখিলেশের একটা চাকুরী জুটিয়া গেল; চাকুরী লইয়া চলিয়া আসিল সে পদ্মাতীরের কোনো শহরে। জীবনের যে কাব্যময় রূপময় বাতায়নপথ গৌরী চলিয়া যাওয়ায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে আবার তাহা উন্মোচিত হইল। নিখিলেশের জীবনে আসিল মায়া। পদ্মার জলকল্লোলের মত বিপুল মায়ায় সে নিখিলেশের অন্তরতমা হইয়া নতুন নিখিলেশকে ছন্দেগানে জাগাইয়া তুলিল। ভাগ্য কিন্তু সুপ্রসন্ন নয়। যে মায়া তাহার কালো চোখের আলো দিয়া, মিষ্ট কণ্ঠের গান দিয়া নিখিলেশকে নতুন করিয়া গড়িল, সেই মায়াও হারাইয়া গেল নিখিলেশের জীবন হইতে। এবারে তাহাদের মিলনের বিরোধিতা করিলেন মা।—কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল নিখিলেশ। বিবাহ হইল সুনন্দার সঙ্গে। ধনীর একমাত্র দুলালী সুনন্দা। নিখিলেশকে সে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তুলিল। নিখিলেশ যখন নিজের মধ্যে এইভাবে পুড়িতেছে, সেইসময় আগুন লাগিল দেশের জীবনে, জাতির জীবনে। বিয়াল্লিশ আসিল জীবনহন্ত্রী হইয়া, পঞ্চাশ আসিল মন্বন্তর লইয়া আর অভিযাত্রীর বেশে আগাইয়া আসিল আজাদ হিন্দ। নিখিলেশের জীবনে তাহারাও ছায়াপাত করিয়া গেল। সেই ছায়াপাতকেও হঠাৎ

একদিন আলোয় ভরিয়া দিয়া মায়া ফিরিয়া আসিল। শুধু সে ফিরিয়া আসিল না, যে সুনন্দা নিখিলেশের কাছ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহাকেও সে ফিরাইয়া আনিল নিখিলেশের পাশে। শেষ হইল এ জন্মের ইতিহাস।

অসংখ্য চরিত্র ভিড় করিয়া আসিয়াছে উপন্যাসে। প্রতিটি চরিত্রই দীপ্তিমান ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। লেখকের পরিমিতি বোধ ও রচনা বিন্যাসের সংযম লক্ষ্য করিবার মতো। সুদীর্ঘ রচনার মধ্যে কোথাও সুর কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শচীন বাবুর কাছে বাংলা সাহিত্যের বহু প্রত্যাশা রহিল। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট রুচিকর। সব দিক হইতেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার মতো সম্পদ 'এ জন্মের ইতিহাসে' রহিয়াছে।

সাময়িকপত্র অধ্যুষিত বাংলাদেশে সম্প্রতি দুইখানি নতুন মাসিকপত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। একখানি—'পূরবী', সম্পাদক—বিমলকুমার শীল ও সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কার্য্যালয়—২৩ ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা। প্রতিখণ্ড চারি আনা মাত্র। অন্যখানি—'সব্যসাচী', সম্পাদক—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। কার্য্যালয়—৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি খণ্ড—ছয় আনা মাত্র। উভয় পত্রিকারই প্রথম সংখ্যাটি বাংলার খ্যাতিমান লেখকবৃন্দের রচনায় সমৃদ্ধ। আমরা পত্রিকা দুইখানির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ হইতে একখানি স্মারকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বাংলার লোকসঙ্গীত ও লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন—ডাঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী, ডাঃ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীমীরা মিত্র, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রভৃতি। সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যুগ্মসম্পাদক শ্রীমদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার সরকার। যাত্রা, লোকনৃত্য, বাউল, কথকতা, কীর্তন, পটুয়া প্রভৃতি বিষয়গুলিকে স্মারকপত্রে চিত্রিত করিয়া বুঝানো হইয়াছে। বাঙালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জাতীয় উদ্যম অভিনব। আবহ মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপটটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হওয়ায় স্মারকপত্রটির শিল্পমূল্য আরও বাড়িয়াছে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে এইরূপ একটি পত্র সংগ্রহ অনস্বীকার্য।

ইতিমধ্যে কতকগুলি কবিতা পুস্তিকা আমাদের হাতে আসিয়াছেঃ

(ক) **অতিক্রান্তাঃ** সুশান্ত ভট্টাচার্য। আগমনী প্রকাশনা-ভবন, ৮।এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৵০ আনা।

(খ) **অশোকের সময়ের গ্রামঃ** দুর্গাদাস সরকার। একক প্রকাশনী, ৪৪৬।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা। দাম—।০ আনা।

(গ) **অশ্রু অর্ঘ্যঃ** সত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ৫১বি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৵০ আনা।

(ঘ) **জীবনায়নঃ** শান্তশীল দাস। বেলেভিউ পাবলিশার্স, পি-১৩ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু নর্থ, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা।

(ঙ) **পূজাঃ** কেলসাম। বৈষ্ণবচক, মেদিনীপুর। দাম—দু' টাকা।

(চ) **ময়ূখঃ** (সঙ্কলন, শরৎসংখ্যা, ১৩৬০)। কলিকাতা ২০।৩, বিহারী ডাক্তার রোড হইতে সুবোধকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—দশ পয়সা।

(ছ) **লাল-কালো-শাদাঃ** প্রফুল্লচন্দ্র গুহ। ৮।৪এ, হাতীবাগান রোড, কলিকাতা। দাম—দু' টাকা।

জাতের দিক হইতে কবিতাগুলির পারস্পরিক কিছু মিল থাকিলেও কবিদের জীবন-দর্শন স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। গ্রন্থ প্রকাশের আপাত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে কবিরা যে ভবিষ্যতে স্থায়ী কিছু পরিবেশন করিতে পারিবেন, কবিতাগুলি তাহার আভাষ দেয়।

সম্পাদকীয়

কল্যাণী-কংগ্রেসে সভাপতি শ্রীনেহেরুর ভাষণ

কংগ্রেসনগর কল্যাণীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম অধিবেশন সবে সমাপ্ত হইয়াছে। অধিবেশনে জনগণের দিক হইতে কিছু একটা বিপুল সাড়া না পাইবার যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কার্যকালে জনতার অত্যধিক চাপের ফলে সে-আশঙ্কা দূরীভূত হয়। কংগ্রেস যে এখনও ভারতের বৃহত্তর শক্তিমান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, কল্যাণী-কংগ্রেস তাহা নতুন করিয়া প্রমাণ করিল। তথাপি একথা নিশ্চিত যে বৃটিশভারতের সংগ্রামী কংগ্রেস এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের রাষ্ট্রশাসক কংগ্রেস এক নহে। কংগ্রেসের সে-দিন গিয়াছে। আজ কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা প্রধানতঃ কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর জনপ্রিয়তার উপরেই ভিত্তিশীল। গান্ধী—উত্তর ভারতে মাঝগাঙ্গে কংগ্রেস-তরী যখন ডুবিতে বসিল, তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেখিলেন—ক্ষমতা লইয়া নিজেদের মধ্যে যতই তাঁহারা কাড়াকাড়ি করুন না কেন এ তরী নির্বিঘ্নে তীরে লইয়া যাইতে হইলে পণ্ডিত নেহেরু ভিন্ন দ্বিতীয় কাণ্ডারী নাই। পণ্ডিত নেহেরুর উপরে ইহার সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া তাই কংগ্রেসকর্মীবৃন্দ নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেন; কারণ—ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে যিনি অধিষ্ঠিত, তাঁহার স্কন্ধে কংগ্রেস-সভাপতিত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত হইলে কংগ্রেসের কপালের জোরে না-হউক, সরকারী ঠেলায় কংগ্রেসের জয় শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হইবে। যদিও জাতির জনক ইহা চাহেন নাই, তথাপি দশের ইচ্ছায় তাহাই হইল। ভারতের প্রাণপ্রতিভূ পণ্ডিত জওহরলাল; তাঁহার অতিবড় শত্রুরও তিনি বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং অমিতশক্তির অধিকারী শ্রীনেহেরু তাই দুই স্কন্ধে দুই দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করিয়া দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাতে একনায়কত্বের ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও নান্য পন্থা; শ্রীনেহেরুর সমকক্ষ এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্তমানে ভারতে দুর্লভ—যাঁহার উপর এমন কঠোর দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া সুলভ নিশ্চিন্তে রাষ্ট্রের আরাম-শয্যায় মুখ লুকানো যায়। শ্রীনেহেরুও তাঁহার দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায়ই পালন করিয়া চলিয়াছেন।

কল্যাণী কংগ্রেসে যে বৃহৎ জনতার ভিড় লক্ষিত হইল, তাহার একটি বড় অংশ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীনেহেরুরই দর্শনপ্রার্থী হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রদর্শনীর আকর্ষণও ছিল। শ্রীনেহেরু তাঁহার উনিশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ভাষণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রচার এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা প্রতিরোধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেনঃ পৃথিবীতে কেহই যুদ্ধ চাহে না। অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, আজিকার পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের জীবনই যুদ্ধের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন এবং প্রভাবিত।—এশিয়াবাসীদের নবলব্ধ স্বাধীনতার আদর্শের সহিত জঙ্গীবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর যে সংঘাত দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি বলেনঃ পাকিস্থান কর্তৃক আমেরিকার সামরিক সাহায্য গ্রহণ এশিয়াবাসীদের যুগযুগান্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী এবং এই সংগ্রামের ফলে এশিয়াখণ্ডে স্বাধীনতার যে অরুণোদয় দেখা দিয়াছে, তাহাও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির দ্বারা ব্যাহত হইবে এই চুক্তি বিশ্বশান্তির সমস্যা এবং এশিয়াখণ্ডে বহু দেশের স্বাধীনতাকে গভীরভাবে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। পাকিস্থান যদি এই সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে পরস্পর বিবদমান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্যতম অংশীদারে পরিণত হইবে। ক্রমশঃই পাকিস্থান অপরাপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদারে পরিণত হইয়া একটি অগ্নিগর্ভ যুদ্ধ এলাকায় রূপান্তরিত হইবে। এই সত্যকে অস্বীকার করা অর্থহীন। পাকিস্থানের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা এশিয়া হইতে সরিয়া যাইবে, মানুষের বর্তমান ইতিহাস ভিন্ন পথে পরিচালিত হইবে।—এই প্রসঙ্গে শ্রীনেহেরু পাকিস্থানের সহিত অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পাকিস্থান সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিন্তু ভারত-

বর্ষ যুদ্ধ চাহে না বলিয়াই সেই প্রস্তাবের দ্বার এখনও উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি বলেনঃ আমরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আওতায় বসবাস করিতেছি। এই স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা যে আমাদের কোন্ তমসাচ্ছন্ন রণবিধ্বস্ত রাত্রিতে টানিয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আশা-উজ্জ্বল নবপ্রভাতের অরুণোদয়কে সম্ভব করিয়া তুলিবে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। অতঃপর শ্রীনেহেরু দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলেন যে, ভারত মার্কিন জোট কিম্বা সোভিয়েট জোট, কাহারও নিকট হইতেই সামরিক সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত নয়। যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দেশবাসীর শক্তি ও সঙ্কল্প থাকিলে এমন কি আণবিক বোমারও দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের শক্তি নাই।

বিগত সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে পণ্ডিত নেহেরু-উল্লেখিত ভারতের নিরপেক্ষ নীতির প্রকৃত রূপ কি হইবে—এ বিষয়ে তাঁহাকে আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আলোচ্য ভাষণে তাঁহার ইঙ্গিতপূর্ণ জবাবের মধ্যে ভারতের অনেকখানি আশ্বস্ত হইবার কারণ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু দেশবাসীর শক্তি ও সঙ্কল্প কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া দৃঢ় হইলে ভারতের পূর্ণ আত্মরক্ষা সম্ভব, তদ্বিষয়ে শ্রীনেহেরু অদ্যাবধি দেশবাসীকে কোনো সুপরিকল্পিত নির্দেশ দিতে পারেন নাই। কল্যাণী-অভিভাষণেও তাহা পুরাপুরিই অনুপস্থিত দেখা গেল। অপর একটি বিষয়েও আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল। তাহা হইতেছে কংগ্রেসকর্মীদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে। স্বাধীনতার পর তাঁহারা রাষ্ট্রের আরামশয্যায় এমনভাবে গা এলাইয়া দিয়াছেন যে মাথা তুলিয়া কাজে নামিবার উৎসাহ তাঁহাদের মধ্যে একেবারেই নিভিয়া গিয়াছে। অথচ জাতিকে প্রাণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে আজ তাঁহাদেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাঁহাদের এই নির্বীর্য নিষ্ক্রিয়তা ধিক্কৃত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শ্রীনেহেরু এ সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার স্নেহাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়া তিনি যদি তাঁহার এই অগণিত কংগ্রেসকর্মীকে কর্মী ঘরের শান্ত ছেলে করিয়া রাখিতে চান; তবে তিনি ভুল করিবেন। এতকাল এই ভুলই হইয়া আসিয়াছে। এ সম্পর্কে বারংবার আমরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। জাতীয় পরিকল্পনাগুলিকে সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে নানারূপ লোকসংস্কৃতিমূলক সঙ্গীত ও নাট্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ইহা দ্বারা উক্ত কার্যাবলী কতদূর সার্থক হইবে, তাহা আমাদের ধারণাতীত। এ জন্য প্রয়োজন ছিল—কংগ্রেসকর্মীদের দলে দলে গ্রামে নগরে বাহির হইয়া জনগণকে রাষ্ট্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা এখনও তিমিরাচ্ছন্নই হইয়া রহিয়াছে। আমরা পুনরায় এ বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনেহেরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এ অধ্যায়ের ছেদ টানিতেছি।

শিক্ষক-ধর্ম্মঘট

দেশের সর্ববিধ সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের জীবনও আজ চরম সঙ্কটে উপনীত হইয়াছে। একটা জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মেরুদণ্ড হইলেন শিক্ষকসমাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশে সেই শিক্ষকেরাই আগাগোড়া অবহেলিত। রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও শিক্ষাখাতে সর্বপেক্ষা কম মূলধন ধার্য হয়, পশ্চিমবঙ্গের চল্‌তি বৎসরের শিক্ষাখাতেও সেই পরিচয়। অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করিয়াই গভর্ণমেন্ট পাশ কাটাইয়া যাইতে চান। চল্‌তি বৎসরেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু ইহা একটা স্বাধীন দেশের শক্তিমান কোনো প্রদেশেরই সঙ্কীর্তির পরিচায়ক নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়েক শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের বিগত চুঁচুড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় করার জন্য 'কর্মবিরতি' সূচক ধর্মঘট করিতে দৃঢ়সংকল্প হন। এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহারা শিক্ষকদের কর্মবিরতির দিন ধার্য করেন। মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবীগুলির মধ্যে প্রধান দুইটি দাবী হইতেছে ৩৫্ টাকা সরকারী মাগ্গীভাতা এবং মাধ্যমিক পর্ষৎ কর্তৃক স্কুলকোডের নির্ধারিত বেতন। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের বিবৃতিতে প্রকাশ ঃ ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে পাশকোর্সের গ্রাজুয়েটগণের যে বেতন নির্ধারিত করা হইয়াছিল, ডাঃ রায় তাহা বৃদ্ধি করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যানুসারে—দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিলে পাশকোর্সের গ্রাজুয়েটগণের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সুপারিশ অনুযায়ী ৮০্ টাকা নিম্ন বেতন হইবে। পূর্বে এই বেতন ৭০্ টাকা হইবে বলিয়া স্থির ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ কাব্যতীর্থ অথবা অনুরূপ শিক্ষকগণকে পাশকোর্সের গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণের তুল্য

বেতনদান, শিক্ষণ শিক্ষালাভের সুযোগ যাহাতে সবল শিক্ষক লাভ করিতে পারেন, সেজন্য সংক্ষিপ্ত বি টি. কোর্স প্রবর্তন এবং দিনে দুইবার বি. টি. ক্লাসের ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি আরও কতকগুলি সুযোগ আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণ শিক্ষকগণের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়ন-কাল বৃদ্ধি, অবসর গ্রহণকালে গ্রাচুয়িটিদানের ব্যবস্থা, জীবনবীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেন্সনের ব্যবস্থা সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সুপারিশসমূহ কার্যকরী সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। প্রধান শিক্ষক সমিতি স্থির করেন যে, সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া শিক্ষকগণের ন্যায্য দাবীসমূহ সরকারের নিকট উপযুক্তভাবে পেশ করিয়া সরকার যাহাতে সেগুলি মানিয়া লন, সেজন্য সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইবেন এবং এইরূপ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়াই যে মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবীসমূহ পূর্ণ হইবে, সমিতি সেই আশা ও বিশ্বাস পোষণ করে।

কিন্তু এ সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে না-আসার ফলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তাঁহাদের নির্ধারিত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতেই ধর্মঘট সুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের দুইসহস্রাধিক বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষিকা ধর্মঘটে যোগদান করেন। কলিকাতার মোট ১৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩০টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এই ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত। এ সম্পর্কে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক মুদ্রিত আবেদনপত্রে ঘোষণা করেন যে, এই ধর্মঘটের সূত্রে ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা এবং সহরতলিতে সাধারণ হরতাল পালন করা হইবে। কিন্তু হরতাল সর্বাংশে সার্থক হয় নাই।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় এক ঘোষণা করিয়া ধর্মঘটের পূর্বাহ্নে জানান যে—মাধ্যমিক শিক্ষকগণকে আরও কিছু সুবিধা দেওয়া যাইতেছে। সুবিধাগুলি হইতেছে: (১) সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের যে ৪,৩২১ জন শিক্ষক স্নাতক অথবা ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহেন, গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে তিন বৎসরের মধ্যে বিনাব্যয়ে ট্রেনিং শেষ করার সুযোগ দিবেন। এই তিন বৎসর কালের মধ্যে সংশিলষ্ট শ্রেণীভুক্ত সমুদয় শিক্ষক তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতার অতিরিক্ত মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে মাথাপিছু সাময়িক সাহায্য পাইবেন। (২) বর্ধিতহারে দুর্মূল্যভাতা দিবার দায়িত্ব সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। তবে শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের প্রত্যেক শিক্ষককে আগামী তিন বৎসরের জন্য তাঁহার প্রাপ্য দুর্মূল্য ভাতার অতিরিক্ত ৫৲ করিয়া মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে। কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত নহে এরূপ যে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সাড়ে সাত শতের অধিক তাহার কোনো শিক্ষক এজাতীয় সাহায্য পাইবে না।

কিন্তু এ ঘোষণাও শিক্ষকশ্রেণীর ন্যূনতম দাবি মিটাইতে পারে নাই। ফলে তাঁহাদের ঘোষিত ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। অবস্থা বিবেচনা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক আবেদন করিয়া জানাইলেন: নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত খোলাখুলিভাবে আলোচনার সময় আমি সকল অবস্থা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলাম; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ১০ই বুধবার হইতে ধর্মঘটের নির্দেশ দিয়াছেন, এই সংবাদে আমি উদ্বেগ বোধ করিতেছি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ জানেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের চাকুরীর উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা আমি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সহিত উক্ত সমস্যার আলোচনা করিয়াই আমি ঘোষণা করিয়াছি। আমি পুনরায় একথা বলিতে চাই যে আমার সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ইহারই জন্য আমাদিগকে শিক্ষকদের চাকুরীর আরও উন্নতি ও তাঁহাদের ট্রেনিং-এর সুযোগ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত ধর্মঘটের উদ্যোগ আয়োজন শিক্ষকদের হাত হইতে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের হাতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও অভিভাবকদিগকে সহযোগিতা করিতে এবং শিক্ষকদিগকে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাইয়া যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। শিক্ষক ও ছাত্রদের উপকার হইবে না—এমন কোনো আন্দোলনে যেন তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে না দেওয়া হয় আমি আশা করি—দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকেরা এমনভাবে কাজ করিবেন, যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারের নিকট দৃঢ়তাসহকারে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিতে আমি সমর্থ হই।

কিন্তু এ আবেদন নিতান্তই অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'কথার চাইতে কাজ বড়' বলিয়া যাঁহারা নীতি

প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বর্তমানে কাজের চাইতে কথাকে বড় করিয়া ভারত শাসনের গদিতে বসিয়া আছেন। কিন্তু কথার-দিন যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি আজ আর নতুন করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরাও ধর্মঘট অনুমোদন করি না, বিশেষ করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রের ধর্মঘট তো নয়ই! কিন্তু কেন শিক্ষকসমাজকে এই পথ গ্রহণ করিতে হইল, সেইটাই বড় প্রশ্ন। জাতির শিক্ষার ভার লইয়া চিরকাল তাঁহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার খাইয়া আসিয়াছেন। শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াও শিক্ষাকার্যে সর্বদা তাঁহারা মন দিতে পারেন নাই, নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে সংসার পালন ও পরিজন পোষণ করিতে হইয়াছে। একটা স্বাধীন জাতির পক্ষে আজ ইহা কলঙ্কের পরিচয়। শাসনকার্য হাতে লইয়াই আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে এ-সম্পর্কে যাহা কিছু করণীয়—তাহা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমাদের গভর্ণমেণ্ট সে দায়িত্ব পালন করেন নাই। এখন উপস্থিত মতো ক্ষতস্থানে সাময়িক একটা পটি বাঁধিয়া দিতে চাইলেই কার্যোদ্ধার হইবে না। অতএব পশ্চিমবঙ্গ তথা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে আমরা বলিব—তাঁহারা যেন শিক্ষক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করিয়া বিষয়টির সত্বর সমাধান করিতে যত্নবান হন। অন্যথায় সারা দেশের শিক্ষাসঙ্কটের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহার কলঙ্ক স্খালন করিতে তাঁহারা আর পথ পাইবেন না।

বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন

কলিকাতা মহম্মদআলী পার্কে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে'র দ্বারা বাংলার নিজস্ব কৃষ্টির ক্ষেত্র যে আবার বহুদূর সম্প্রসারিত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মেলনের উদ্যোক্তাবৃন্দকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাই। গ্রামীণ সভ্যতায় সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ, বাংলার লোক-সাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প প্রভৃতির মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব ইতিহাস গাঁথা রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনুশীলন, চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগের অভাবে তাহা ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল। কোনো কোনো সাহিত্যিক এ পর্যন্ত মাঝে মাঝে সেইগুলিকে সাহিত্যে রূপ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু গোটা একটা জাতির অনুশীলনের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত নয়। এতদিনে আলোচ্য এই সম্মেলনের মাধ্যমে তাহার একটা সার্থক রূপ প্রকাশিত হইবার সুযোগ ঘটিল। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল বিষয় সূচীই হইতেছে বাংলার লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা। ইহাতে কীর্তন, বাউল, গম্ভীরা হইতে সুরু করিয়া পটশিল্প, কাঁথাশিল্প প্রভৃতি সর্ব বিষয়ই সংযোজিত হইয়াছে। বক্তৃতার দ্বারা, সঙ্গীতের দ্বারা, প্রদর্শনীর দ্বারা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিশ্বের সামনে তুলিয়া ধরার এই মহৎ প্রয়াস ইতিপূর্বে হয় নাই; সেদিক হইতে এই সম্মেলন অভিনব। আমরা এই সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা কামনা করি।

আধুনিক কবি সম্মেলন

কাব্যের একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, সেটা তাহার বিশেষতম ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রটি একান্তভাবে মনোধর্মী। গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রও মন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেখানে অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং মননের প্রগাঢ়তা ততখানি প্রয়োজন হয় না—যতখানি কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। কাব্যের রসসুধা কেবল তাহার পংক্তিবন্ধ পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাহার একটি বড় দার্শনিক দিকও রহিয়াছে—যাহার পিছনে কল্পনা ও যুক্তি উভয়েই সম্বন্ধযুক্ত। এ জন্য কবিরা শুধু কাব্য-রস স্রষ্টাই নহেন, তাঁহারা দার্শনিকও বটেন। গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দর্শনের উপস্থিতি সর্বত্রই যে প্রত্যক্ষ—তাহা নয়। যেখানে প্রত্যক্ষ, সেখানে গদ্য সাহিত্যিকও নিজের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কবি-দার্শনিকের পর্য্যায়ে উন্নীত হন। রসের জগতে কাব্যরস হইতেছে শ্রেষ্ঠ রস, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই অনুভূতিশীল অধ্যয়ন বা মনন-শীল চর্চাসাপেক্ষ। সংস্কৃত কাব্যমাত্রেই রসমধুর, কিন্তু সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তাহা ততক্ষণই চিত্তাকর্ষক নয়—যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি সেই মধু-ভাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রসের পূর্ণতা আহরণ করিতে পারিতেছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্পর্কেও সেই একই কথা। সর্বযুগের সবদেশের জনসাধারণই অল্প-বিস্তর কাব্য-নিস্পৃহ, তজ্জন্য কাব্যকে একটি সীমানির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করিতে হয়; তাহার বাহিরে ভাগ্যক্রমে যদি কোনো কবির কাব্যবিস্তৃতি ঘটে তো তাহা ভাগ্যের কথা। তাহা লইয়া কবিমাত্রেরই দুঃখবোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু সান্ত্বনা এই যে, কাব্যপাঠকের সংখ্যা বহু ব্যাপক না হইলেও কাব্যের মহনীয়তা স্থানভ্রষ্ট হইবার নয়। কাব্যের এই মহনীয়তা আছে বলিয়াই কোনো স্বল্পখ্যাত শক্তিমান কবিই কোনো বহুখ্যাত গদ্যসাহিত্যিক অপেক্ষা কম শ্রদ্ধার্হ বা কৃতী নন। ইহার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না, মহাকালের হাতেই একসময় সকল প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ বিচার ঘটে।

তবে শিল্প-সাহিত্য-কাব্য প্রভৃতি লইয়া জনসাধারণের

সহযোগে সর্বদাই চর্চার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহাতে একদিকে যেমন সৃষ্টির উৎস বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে তেমনি শিল্প-সাহিত্য—কাব্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলা যায়। সব দেশেই এই জাতীয় চর্চানুশীলন চলিয়া আসিতেছে। এদেশেও কোনোকালেই তাহার অন্যথা ঘটে নাই। নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই চর্চানুশীলিত বৈঠকগুলি হইয়া আসিতেছে। বিগত ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা সিনেট হলে অনুষ্ঠিত আধুনিক কবি সম্মেলন এই জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য বৈঠক। এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা চিরকালই থাকিবে এবং এই জাতীয় সম্মেলনের উদ্যোক্তাবৃন্দ সর্বযুগেই বিদগ্ধ-সমাজের শ্রদ্ধাভাজন। আলোচ্য সম্মেলনেরও যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তবে এই সূত্রে আমাদের মনে যে কিছু প্রশ্নও না জাগিয়াছে, তাহা নয়। প্রথমতঃ, 'আধুনিক' শব্দটির অর্থ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সংজ্ঞার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত করা সহজ নয়। কেহ হয়ত ভাবের দিক হইতে আধুনিক, কিন্তু প্রকাশব্যঞ্জনায় আধুনিক প্রয়োগে অসমর্থ; আবার কেহ হয়ত আধুনিক প্রয়োগে সুনিপুণ, কিন্তু ভাবের দিক হইতে আধুনিক নন, ইঁহাদের মধ্যে কাহারা প্রকৃত আধুনিক বলিয়া বিবেচ্য হইবেন? সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যে এই উভয় রূপই বর্তমান। সুতরাং আধুনিক বলিয়া কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা বড় সহজ নয়। সেদিক হইতে প্রবীণ নবীন জীবিত কবিদের প্রত্যেককে একত্রিত করিয়া যদি মাঝে মাঝে এইরূপ সম্মেলনের আয়োজন করা যায়, তবে সংস্কৃতির একটি বড় কাজ সাধিত হয়, সন্দেহ নাই। আলোচ্য সম্মেলনে এবারে বিশেষভাবে যেমন কাজী নজরুলের কাব্য পাঠের ব্যবস্থা হয় নাই, তেমনি বহু তরুণ শক্তিমান কবিকেও আহ্বান করা হয় নাই, উদ্যোক্তাদের ইহা একটা মস্তবড় ত্রুটি। এ ত্রুটি ভবিষ্যতে না ঘটিলেই সুখকর হইবে।

প্রেস কমিশন ও সাময়িক পত্র

ইতিপূর্বে প্রেস কমিশন ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র, মুদ্রণালয় ও সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠানের নিকট এক দীর্ঘ ফিরিস্তিসম্বলিত প্রশ্নাবলী পাঠান। মূল উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় প্রেসসমূহ এবং দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলির উন্নতি সাধন। আমাদের হাতেও এই প্রশ্নাবলী আসে এবং যথানির্দিষ্ট সময়ে আমরা উহার জবাব লিখিয়া পাঠাই। ইহার পর প্রেস কমিশন ভারত সফরে বাহির হন এবং ইতিমধ্যেই কলিকাতায় আসিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। এই সূত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় নিখিলবঙ্গ সাময়িক পত্রিকা সঙ্ঘের সঙ্গেও কমিশনের কথা হয়। সাময়িক পত্রের দিক হইতে আজ বহু কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় সাময়িকপত্রের মূলগত প্রেরণা জাগ্রত হয় বঙ্গীয় সাময়িকপত্রের সুদীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহ্যের মাধ্যমে। এদেশে যখন নিজস্ব দৈনিকপত্র ছিল না তখন দেশের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রগুলি এক দিকে যেমন টুকরো সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনগণের সংবাদপাঠের তৃষ্ণা মিটাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি রসসাহিত্য ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক রচনা পরিবেশন করিয়া দেশবাসীর জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইয়াছে। তৎপর সংবাদপত্রের ধীরে ধীরে বিস্তৃতি ঘটিল। কিন্তু এই বিস্তৃতি দ্বারা সাময়িকপত্রের বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্য ম্লান হইল না, উভয়ের ক্ষেত্র সীমানির্দিষ্ট হইল মাত্র। সংবাদপত্রের ব্রত হইল দেশবিদেশের ঘটনা সংগ্রহ করিয়া স্বাদেশিক ও বৈদেশিক জাতিসমূহের কল্যাণ ও মানোন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি। সাময়িকপত্রেরও ইহাই ব্রত বটে, সেই সঙ্গে তাহার একটি বিশেষতম ক্ষেত্র হইল দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি। জাতির জীবনে এই উভয় কার্যবিধিরই প্রয়োজন। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধিকল্পে ধীরে ধীরে সংবাদপত্রগুলি সাময়িকপত্রের বিষয়গুলিকে সাপ্তাহিক পর্যায়ে নিজেদের সূচীবদ্ধ করিয়া লইয়াছে। সংবাদপত্রের নানা সুবিধা ও বহু ব্যাপ্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়া ওঠা সাময়িকপত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এদেশের মোট সংবাদপত্রের প্রচারাপেক্ষা মোট সাময়িকপত্রের প্রচার বেশী। কিন্তু এই মোট হিসাব লইয়া বিচার করিয়া সাময়িকপত্রের ঐতিহ্যকে অনেক সাধারণ লোকের ন্যায় গভর্ণমেন্টও বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের যাহা কিছু বিজ্ঞাপন তাহা দৈনিক সংবাদপত্রগুলির জন্যই সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সাধারণ বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীরাও সাময়িকপত্রের চাইতে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট। ফলে ব্যবসার দিক হইতে সাময়িক পত্রিকাগুলিকে দিন দিনই পিছাইয়া পড়িতে হইতেছে। অথচ দৈনিক সংবাদপত্রের চাইতে সাময়িকপত্রের স্থায়িত্ব যেমন দীর্ঘস্থায়ী, তাহার ঐতিহ্যও তেমনি কালজয়ী। তাহাকে রক্ষা করা জনসাধারণের যেমন কর্তব্য, গভর্ণমেন্টেরও ততোধিক দায়িত্ব রহিয়াছে। সে দায়িত্ব পালনের জন্য সাময়িকপত্রের উন্নতিকল্পে যাহা যাহা প্রয়োজন, আশা

করি প্রেস কমিশন তৎসমুদয় কার্যের অনুগামী হইয়া জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প সর্ববিধ বিষয়ের সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নে যত্নবান হইবেন।

ভারতে লুই ফিশার

বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারের সাম্প্রতিক ভারত আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রধানতঃ রাজনৈতিক সম্পর্ক। কিন্তু সেই রাজনীতির কূটজাল ছিন্ন করিয়া লুই ফিশার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ভারতের মর্মের মাঝখানে। গান্ধী-জীবনী রচনা করিয়া তিনি ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে ইতিপূর্বে

মীরচান্দানী, দেবদাস গান্ধী, লুই ফিশার, জি. টি. প্রিম

তিনি দীর্ঘকাল পর্যটন করিয়া কাটাইয়াছেন। একাধারে সাংবাদিকতা ও পাণ্ডিত্যের সম্মেলন ঘটিয়াছে লুই ফিশারের মধ্যে। তিনি মঃ স্ট্যালিন, গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও নানা তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করিয়া বিদগ্ধসমাজের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতে তিনি একাধিকবার সাংস্কৃতিক ব্রত লইয়া আসিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার বোম্বাই-পর্যটন-টিকেও আমরা সেই আলোকেই লক্ষ্য করি। ভারত সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে যতই তিনি জানিতে চেষ্টা করিবেন, ভারত ততই তাহার আসল রূপ লইয়া অবিকৃতভাবে পাশ্চাত্য জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। ভারতের পক্ষ হইতে লুই ফিশারকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কল্যাণমুলক পরিকল্পনা কার্য্যাবলী সম্পর্কে পরিকল্পনা-কমিশনের বিবরণী

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে—অর্থকৃচ্ছ্রতা ও সম্পদের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনামূলক ব্যবস্থাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, অনুন্নত শ্রেণী, পুনর্বাসন, স্বেচ্ছামূলক কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা প্রভৃতিসহ নানা প্রকার কল্যাণমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় নির্দিষ্ট সমাজ উন্নয়ন কার্যসূচী রূপায়ণে স্বেচ্ছা-মূলক সেবা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সমাজকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য-দানের পদ্ধতি নির্ণয়কল্পে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড স্থাপন করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ কল্যাণমূলক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যার্থে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। উক্ত বোর্ড এই পর্যন্ত ৪৫০টি কল্যাণ পরি-কল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। এইগুলি রূপায়ণে ১৬ লক্ষ টাকা লাগিবে। উক্ত বোর্ডের উদ্যোগে দিল্লীতে একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। মাসিক পঞ্চাশ টাকা হইতে দুইশত টাকা আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবার-গুলির সাহায্য করাই প্রধানতঃ উক্ত কেন্দ্রগুলির কাজ। কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের জন্য ১৯৫৩ সালে পরিকল্পনা কমি-শনের উদ্যোগে বিবিধ আন্দোলন চালান হয়। ইহাদের মধ্যে (১) স্থানীয় জনসাধারণের উন্নয়ন কার্যসূচী, (২) নারীদের মধ্যে সঞ্চয় আন্দোলন এবং (৩) যুবশিবির—এই তিনটিই প্রধান।

এই কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সকল অঞ্চলের কোনোও উপকার হয় নাই, সেই সকল অঞ্চলের জন্যই এই কার্যসূচীর ব্যবস্থা। জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলেই এই কার্যসূচী রূপায়ণ সম্ভব বলিয়া স্থানীয় লোকদের মধ্যে ইহাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। মোট ব্যয়ের অর্ধেক জন-সাধারণ সংগ্রহ করিতে পারিলে বাকী অর্ধেক ভারত সরকার প্রদান করিবেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই কাজে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং এ পর্যন্ত ১২,৫০০টি কাজের নক্সা অনুমোদিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় হইবে। জল সরবরাহ, কৃষির উন্নতি, গ্রাম্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি এই

কার্যসূচীর অন্তর্গত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য নারীদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ১০০টি মহিলা সংঘ উক্ত কমিটির সদস্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছাত্রদের দ্বারা শ্রম ও সামাজিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। উহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে ১৮ হইতে ২২ বৎসর বয়স্ক সুস্থ ছাত্রকে প্রায় এক বৎসরকাল দেশোন্নয়ন কার্যে নিযুক্ত করা। ১৯৫৩ সালে ঐরূপ ৬০টি যুবসমাবেশে প্রায় চারি সহস্রাধিক ছাত্র যোগদান করে। তাহারা আনুমানিক পনের দিন দেশোন্নয়ন কার্য করিয়াছে এবং ঐ বাবদ মোট ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ

দেশের বিভিন্ন অংশের ভূমি সংস্কার কার্য যাহাতে জাতীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে গত মে মাসে যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়, তাঁহারা ইতিমধ্যেই পেপসু, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশের ভূমি সংস্কারের বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এ সম্পর্কে তাহাদের যথোচিত পরামর্শ দিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য এবং খাদ্য ও কৃষিসচিব এবং স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যসচিবদের লইয়া এই কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত। যদিও ভূমিসংস্কার বিষয়ে অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের সকল রাজ্য সমতালে চলিতে পারে না, তথাপি যাহাতে এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মোটা-মুটিভাবে একটি সঙ্গতি রক্ষিত হয়, তাহার সুযোগ সৃষ্টি করাই কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিসংস্কার বিভাগ এবং খাদ্য ও কৃষি দপ্তর এই উদ্দেশ্য-সাধনে কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথমার্ধেই ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার বিশেষ উদ্দীপনা দেখা দেয়। এই বিষয়ে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সব সুপারিশ আছে, ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন রাজ্য অধিকতরভাবে তৎসমুদয় বিবেচনা করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে যেসব সুপারিশ করা হয়, তাহা প্রধানতঃ মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ। প্রজাস্বত্বের সংস্কার, টুকরো টুকরো জমির একত্রীকরণ, ন্যূনতম জমির পরিমাণ নির্ণয়, সর্বাধিক জমির পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সব কয়টি রাজ্যই মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের উচ্ছেদনীতি গ্রহণ করিয়াছে। এখন এই নীতিকে যাহাতে দ্রুত কার্যকরী করা যায়, পরিকল্পনা কমিশন সকল রাজ্যকে সেই মর্মে সুপারিশ জানাইয়াছেন।

শুধু মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ব্যতীত ভারতের সব কয়টি 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায়ও জমিদারী উচ্ছেদ বিল গৃহীত হইয়াছে। 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের মধ্যে বিন্ধ্যপ্রদেশ, হিমাচল এবং দিল্লী রাজ্যে মধ্যস্বত্বভোগী উচ্ছেদ বিল গৃহীত হইয়াছে। আজমীর, বিলাসপুর ও ত্রিপুরায় এখনও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

ভারতের যে সব রাজ্যের আয় যথেষ্ট এবং শাসনব্যবস্থা ব্যাপক, আইন পাশের পর সেই সব রাজ্যে উহা কার্যকরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের সকল জমিদারীই সরকার ইতিমধ্যে হস্তগত করিয়াছেন। সকল রাজ্যের মধ্যে মদ্রাজেই সর্বপ্রথম জমিদারী উচ্ছেদ বিল গৃহীত হয়। সেখানেও এতদিনে প্রায় সব কয়টি জমিদারীই দখল পাওয়ার কথা। বিহারের যে সকল জমিদারীর আয় বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা বা ততোধিক ছিল, সরকার এ পর্যন্ত সেগুলির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উড়িষ্যাতেও প্রায় সব কয়টি জমিদারীর মালিকানা লওয়া হইয়াছে এবং আগামী এক বৎসরের মধ্যে বাকীগুলিরও কর্তৃত্ব গ্রহণ করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৫১ সালে আসামে এ বিষয়ে আইন পাশ হয়। ইহার ফলে উদ্ভূত মামলা সম্পর্কে সুপ্রিম-কোর্ট হইতে যে রায় দেওয়া হয়, তদনুযায়ী সম্প্রতি আসামের আইনটি সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের খুব কম জমিই মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে ছিল। যাহা ছিল, তাহার এখন উচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্তির পথে বলিয়াই জানা গিয়াছে।। পাঞ্জাবে নিয়ম হইয়াছে, জমির দখলকারগণ কিস্তিবন্দীতে ক্ষতিপূরণের টাকা শোধ করিয়া নিজেরাই জমির মালিক হইবে।

'খ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ ১৯৪৯ সালে এবং সৌরাষ্ট্র ১৯৫১ সালে সকল জায়গীরদারের অধিকার গ্রহণ করে। মধ্যভারত ও রাজস্থানে জায়গীর-দারী উচ্ছেদের প্রচেষ্টা আপাতত মামলার জন্য স্থগিত আছে। রাজস্থানে সম্প্রতি সরকার ও জায়গীরদারদের মধ্যে একটি চুক্তি হইয়াছে এবং তদনুযায়ী আইনটি

সংশোধন করা হইতেছে। মধ্যভারতে ১৯৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদ হয়। সৌরাষ্ট্রে প্রজাদেরই নিজ নিজ দখলীকৃত জমি ক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সরকারী ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের জন্য তাহাদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহার অধিকাংশই শতকরা আড়াই টাকা হইতে তিনটাকা সুদের বণ্ডে পরিশোধ করা হইবে। বণ্ডের জন্য প্রাপ্য টাকা পরিশোধের মেয়াদ সর্বাধিক ৪০ বৎসর পর্যন্ত ধার্য হইয়াছে। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে সরকারের যে ভূমিরাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইতেই এই দেনা শোধ দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে এবং বণ্ড ইসু করিতে সময়ের প্রয়োজন হইবে বলিয়া অন্তর্বর্তীকালের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের কিছু কিছু অর্থ দেওয়া হইতেছে বলিয়াও জানানো হইয়াছে। এই বাবদে মাদ্রাজে সাড়ে তিন কোটি টাকা ধার্য করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত আরও তিন কোটি টাকার বণ্ড ইসু হইয়াছে। অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ হিসাবে উত্তর প্রদেশ ইতিমধ্যে আড়াই কোটি টাকা দিয়াছে। মধ্য প্রদেশ মোট আটটি কিস্তিতে সমুদয় ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং ইতিমধ্যে তাহারা অর্ধেক দিয়া দিয়াছে। ক্ষতিপূরণ ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীদের বাস্তু-বাগান রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে স্থির হইয়াছে যে, যে সব জায়গীরদারদের নিজস্ব কোনো আবাদী জমি নাই, চাষযোগ্য পতিত জমি হইতে তাহাদের আবাদী জমি দেওয়া হইবে। যে সব প্রজা জমিদারের অধীনে ছিল, মধ্যস্বত্বলোপের পর তাহারা সরাসরি সরকারের অধীনে আসিবে। ভূমিস্বত্ব সংস্কারের কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য হইল: খাজনার পরিমাণ হ্রাস, জমির মালিকানা সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্নতা এবং প্রজা কর্তৃক জমি ক্রয়ের অধিকার। জমিতে মোট উৎপাদন যাহা হইবে, খাজনা যাহাতে তাহার এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশের বেশী না হয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেই মর্মে সুপারিশ জানানো হইয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যেই খাজনা কমাইয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কোনো কোনো রাজ্যে মেয়াদী বিলিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু জমিদারীর পূর্ণ উচ্ছেদ কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত সর্বৈব কল্যাণ সুদূরপ্রসারী বলিয়াই মনে হয়। সেইদিকে আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পাক-মার্কিন চুক্তি সম্পর্কে 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর'এর বিবরণ

ইতিপূর্বে আমরা পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির সম্ভাব্য ফল সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া এই চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি। শুধু ভারতই নয়, আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীও এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়া ইতিমধ্যে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখা যাইতেছে—মার্কিণী শক্তি ইহাকে নিতান্ত অবহেলার চোখেই দেখিতেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে প্রেরিত 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর'-এর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত ও আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াই হউক না কেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের ভিতর দিয়া পাকিস্থান ও ইরাককে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার সহিত যুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতা রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যালয় হইতে জানান যে, মার্কিন গভর্ণমেণ্ট পৃথক পৃথক সামরিক চুক্তি সম্পাদনের পরিবর্তে একটি সম্মিলিত সামরিক সংস্থা গঠনের পক্ষপাতী এবং সেইরূপ পরিকল্পনাই তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে। পাকিস্থানকে প্রথমে ইহাতে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করা হইতেছে। তৎপরেই ইরাক ইহাতে যোগ দিবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে যে সব বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, উক্ত সংবাদদাতা সেগুলিরও একটি বিবরণ দিয়াছেন, যথা: (১) পাকিস্থানে শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচনে মুসলীম লীগ দলের জয়ী হইবার সম্ভাবনা সমধিক হইলেও এই আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক নয় যে, বিরোধী দলগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক আসন লাভ করিবে। কেন না নির্বাচন উপলক্ষে বিরোধী দলগুলি আগের চাইতে অনেক বেশী সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। পশ্চিমী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিকল্পনায় পাকিস্থানের বৃহৎ একটা অংশ যে পুরাপুরি খুসী হইতে পারে নাই, সে সংবাদ এখন আর গোপন নাই। পাশ্চাত্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠী সম্বন্ধে এখনও তাহাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলিতে যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও কিছুটা সংশয় রহিয়া গিয়াছে। (২) মার্কিন গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রস্তাবিত সামরিক মৈত্রীর বিরুদ্ধে ভারতের আপত্তি চরমে পৌঁছিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু এ ব্যাপারে আর বেশীদূর অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু এখানকার

পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন যে, মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে লঘু করিয়া দেখিতেছেন। কংগ্রেসের বহু সদস্যেরও ইহাই ধারনা। (৩) প্রস্তাবিত চুক্তিদ্বারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন—এই চুক্তি সম্পাদিত হইলে ভারতের নিরপেক্ষতার নীতির অনুগামী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এবং (৪) পাকিস্থান ও ইরাকের সহিত সামরিক মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন হইলে মিশর সম্ভবতঃ চটিয়া আগুন হইবে। প্রেসিডেন্ট নগীবের গভর্ণমেন্ট সমগ্র অঞ্চলে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে সুয়েজ খাল সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসায় অন্তরায় দেখা দিবে। তাহা ছাড়া ইরাক ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে মিতালীর ফলে আরব ঐক্যেও চিড় খাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এ সম্পর্কে মার্কিণী শক্তিকে কোনো কিছু বলিবার দিন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর ৩০শে জানুয়ারীর দিল্লী অভিভাষণটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন ঃ 'আমেরিকার পাকিস্থানকে সাহায্যদানের ফল অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। উহাতে শান্তিস্থাপনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হইবে। উহার ফলে অবিলম্ব প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ না হইলেও এশিয়ায় ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হইবে। ভারত এক সঙ্কটময় সময়ের মধ্যে কাল কাটাইতেছে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহারই মধ্যে আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি ও সুসংহত করিয়া আমাদের যে কোনো বিপদের জন্য সদাসর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। আমেরিকা যদি মনে করিয়া থাকে যে, পাকিস্থানের সহিত সামরিক চুক্তি শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে, তবে আমেরিকা অত্যন্ত ভুল করিবে।'

চুক্তিস্বাক্ষর পাকাপাকি হইবার পূর্বে আমরা এ বিষয়ে মার্কিণ কর্তৃপক্ষকে পুনরায় অবহিত হইতে বলি।

ভারতভুক্তি সম্পর্কে জম্মু ও কাশ্মীরের অবিচলিত নীতি

জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যাটিকে এখনও যেমন রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের রজ্জুতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, অন্যদিকে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্থানের হুমকিও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য তাঁহাদের নীতি সম্পর্কে আজও অটল। ভারতভুক্তি ভিন্ন তাঁহাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা নাই, এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্ত উক্ত রাজ্যের কর্ণধারগণ আগাগোড়া সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কল্যাণী কংগ্রেসেও সেই ঘোষণা বিঘোষিত হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ ঘোষণা করিয়া বলেন ঃ 'আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, কাশ্মীরকে পর্যুদস্ত করিয়া তথায় সামরিক ঘাঁটি প্রস্তুত করার জন্য যে সব বৈদেশিক শক্তি অগ্রসর হইবে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহা প্রতিরোধ করিব যত শক্তিশালীই হউক না কেন; কোনো শক্তিই আমাদিগকে আমাদের আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না অথবা ভারতের সহিত আমাদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাইতে বাধ্য করিতে পারিবে না। জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসিগণ গভীরভাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে এবং কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, কাশ্মীরের স্থান ভারত ছাড়া অন্য কোথাও হইতে পারে না। আমরা ইহা জানি যে, যদি কাশ্মীরের জাতীয় আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হয় এবং তাহার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়াই তাহা করিতে হইবে। কাশ্মীরের বিলোপসাধন করিয়া উহাকে নিজেদের জায়গীর হিসাবে ব্যবহার করাই পাকিস্থানী নেতাদের অভিপ্রায়। কাশ্মীরের অধিবাসীদের স্বার্থ সম্পর্কে তাহাদের কোনো চিন্তা নাই। তাহাদের অধীনে কাশ্মীরের স্বার্থ বিনষ্ট হইবে।'

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী কাশ্মীর গণপরিষদের অধিবেশনেও ইহারই ভিত্তিতে বলা হয় যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য যে সকল অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, তাহা লইয়া জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য গঠিত হইবে। এই রাজ্য স্বায়ত্তশাসনশীল হইলেও উহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

অতএব জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য আজ হইতে ভারতেরই যে একটি বড় অঙ্গ, তাহাতে এখন আর সংশয়ের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ সম্পর্কে পাকিস্থান তথা রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ সচেতন হইলে বুদ্ধিমানের কাজ করিবেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকে শ্রীএম্. এন্. রায়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বিপ্লবী নেতা ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের আকস্মিক মৃত্যু সমসাময়িক বিশ্বের একটি, বিশাদপূর্ণ ঘটনা। মৃত্যুকালে তিনি চিন্তার পূর্ণতালাভ করিলেও বয়সের পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙালী জীবনের দিক হইতে ৬১ বৎসর বয়স সুদীর্ঘ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই একটি জীবনের পূর্ণতা নয়। এদিক হইতে শ্রীযুক্ত রায়কে অকাল মৃত্যুই বরণ করিতে হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি একাধারে দুঃসাহসী কর্মী ও চিন্তানায়ক ছিলেন। ভারতের শৃঙ্খলমোচনে প্রথম তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের দুর্জয় পথে পদক্ষেপ এবং 'নিউ হিউম্যানিজ্‌ম্'-এ তাঁহার সর্বশেষ পরিণতি। তাঁহার আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবন হইতেই নরেন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক কর্মধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৯০৬ সালে সর্বপ্রথম তিনি একটি স্বদেশী ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হন। অতঃপর যথাক্রমে ১৯০৮ ও ১৯১৪ সালে তাঁহাকে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা ও গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। ইহার পর ১৯১৪ সালেই নরেন্দ্রনাথ গদর পার্টিতে যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতে বিপ্লব আন্দোলন এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। বৃটিশ তখন ইয়োরোপে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। তাহাকে আঘাত হানিবার মতো এমন শুভ মুহূর্ত হয়ত আর আসিবে না। এমনিই একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ভারতীয় বিপ্লবী দল। বৃটিশ-শত্রুদের আনুকূল্য ও সহায়তায় তাঁহারা ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিলেন এবং ইহার অন্যতম নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই সময়ে বাঘা যতীনের সঙ্গে তিনি একসহযোগে কাজ করেন। অতঃপর ছদ্মবেশে তিনি ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া চীনে যাইয়া ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এই সময়েই এম্. এন্. রায় নাম গ্রহণ করেন। ইহার পর চীন হইতে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং তথা হইতে মেক্সিকোতে যান। এখানে তিনি সাম্যবাদী দল গঠন করিয়া সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার রাজ্যগুলিতে সাম্যবাদ প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রুশিয়ার বাহিরে মেক্সিকো কম্যুনিষ্ট পার্টিই সর্বপ্রথম সংগঠিত সাম্যবাদী দল। এককথায় শ্রী এম্. এন্. রায়ের অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও বৈপ্লবিক প্রতিভা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার খ্যাতি ক্রমে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট মহলে এবং বিশেষভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। লেনিন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশ্‌নালের হইয়া কাজ করার জন্য রুশিয়ায় আহ্বান জানাইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মানবেন্দ্রনাথ পার্টিতে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত উদ্যম ও কর্মশীলতা, মার্কসীয় মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণশক্তি, মার্কস-নির্দেশিক কর্মনীতি প্রয়োগের অপরিমেয় শক্তি—মানবেন্দ্রনাথকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষে স্থাপন করিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি লেনিনের ঘনিষ্টতম সহকর্মীদের অন্যতম হইলেন। শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনব্যাপারেই নয়, রুশিয়ার বাহিরে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্টদের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়েও লেনিন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে অশান্তিময় চীনে বিপ্লব সংগঠনের সময়ে সোভিয়েট নেতা লেনিন মানবেন্দ্রনাথের উপরেই এই গুরুদায়িত্ব সাধনের ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চীনেই কম্যুনিষ্ট নেতা হিসাবে মানবেন্দ্রনাথের কর্মদীপ্ত জীবনের অবসান সূচীত হয়। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল তাঁহার প্রচেষ্টা। ক্রমে রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার মতবিরোধ ঘটিল। লেনিন তখন পরলোকে। পরবর্তীকালে রুশিয়ায় অবস্থান করা দুঃসাধ্য মনে করিয়া চিরকালের জন্য মানবেন্দ্রনাথ রুশিয়া ত্যাগ করিয়া আসেন। লেনিন ও ট্রট্স্কির সহিত সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল তিনি কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশ্‌নালের সদস্য ছিলেন। এমন কি ভারতবর্ষ ও এশিয়ার দেশগুলিতে কাজ করার জন্য তিনি উক্তপ্রতিষ্ঠানের পূর্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। রুশিয়ায় অবস্থানকালে মানবেন্দ্রনাথ 'ভ্যানগার্ড' ও 'ম্যাসেস' নামক দুইখানি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ১৯৩০ সালে তিনি পলাইয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বোম্বাই সহরে ধৃত হন এবং তাঁহার ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৬ সালের ২০শে নভেম্বর তিনি দেরাদুন জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং ভারতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু

কংগ্রেসের সংগঠন ও নীতি লইয়া গান্ধীজী ও অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ অচিরেই কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামগড় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে মৌলানা আজাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি পরাজিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করার জন্য আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করেন; এই সম্পর্কে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁহাকে একবৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিস্কৃত করেন। কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি র‍্যাডিকাল ডিমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন। জানা প্রয়োজন যে, 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব্‌ লেবার'-এরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পর 'ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট্‌ ইণ্ডিয়া' নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া মানবেন্দ্রনাথ একদিকে কংগ্রেস ও গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার নিজের নূতন সমাজ গঠনের আদর্শ ও নীতির প্রচার করিতে থাকেন। বহুতর রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার নয়া মানবতাবাদী রাষ্ট্র গঠনের আদর্শকে রূপ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার From Savagery to civilization, Science and Superistition, Heresies of 20th Century, Historic Role of Islam, Message of India, Materialism and Reason, Romanticism and Revolution প্রভৃতি গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন না করিলেও ভাবসম্পদ ও আদর্শবাদে সমৃদ্ধ। তাঁহার নয়া মানবতাবাদে বিপ্লব ও সংগঠন দুইই পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে বর্তমান বিশ্বের তিনি ছিলেন অন্যতম বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক মতবাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সকলের নমস্য আজ তিনি সমস্ত মতবাদের ঊর্ধ্বে। আমরা তাঁহার পরলোকগত পবিত্র আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড,
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক: বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৮।০ টাকা ষাণ্মাসিক ৪৶০ টাকা। ভি পি খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য বারো আনা।

আষাঢ় হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে-কোন মাস হইতেই গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গশ্রী প্রকাশিত হয়। সাধারণত সার্টিফিকেট-অব-পোষ্টিং-এ পত্রিকা পাঠান হয়।

জমা টাকা নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাহকরা অনুগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো এখন আর সম্ভব নয়। মানি-অর্ডারে টাকা পাঠানোই শ্রেয়; খরচও কম।

নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মানি-অর্ডার-কূপনে অথবা নির্দ্দেশ-পত্রে "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা অথবা পত্র পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যাটি উল্লেখ করিবেন।

রচনা: রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় পত্রাদি 'সম্পাদক, বঙ্গশ্রী', এই নামে পাঠাইতে হইবে। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। রচনাদি ফেরতের জন্য উপযুক্ত ডাক-মাশুল দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞাপন: বিজ্ঞাপনের সর্ত্তাদি পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য। পুরাতন বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ ১০ তারিখের মধ্যে না আসিলে সেই অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলেও ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

জেনারেল ম্যানেজার—বঙ্গশ্রী,
৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩।

মনে রাখবেন

সংস্কৃতির একটি বড় অঙ্গ হ'চ্ছে পরিচ্ছন্নতা। আর পরিচ্ছন্নতার আঙ্গিক হ'চ্ছে অঙ্গরাগের আধার। আমাদের সুগন্ধি **প্যারাডাইস, নিম, প্রীত** আর **পাইলট** অঙ্গরাগের আতিশয্যে একদিকে দেহশ্রীকে যেমন সুঠাম ও কমনীয় করে, তেম্নি ত্বকের কোমল মসৃণতার কাজেও অদ্বিতীয়।

নির্ভেজাল **খাঁটি সাবানের গুণই** হ'চ্ছে মানুষের মননের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে সভ্যতার জয়-তোরণ রচনা। আমাদের **মিলকাইট বার** এবং **ওয়াশিং বল** পরিচ্ছদকে রসগ্রাহী ক'রে তুলতে আধুনিক বিজ্ঞানের শীর্ষ ক্ষেত্রে আসন ক'রে নিয়েছে। দামে সস্তা অথচ মালিন্য কাটিয়ে পরিচ্ছদকে টেঁকসই ক'রে তুলতে অতুলনীয়।

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্ লিমিটেড

হেড অফিস:
৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

রস

ফটো: তারাদাস নাগ

রস

ফটো: তারাদাস নাগ

বনানী ফটো-

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

একবিংশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৬০ | ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভবানী সেন

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাটি ভারত সরকারের নীতি বুঝবার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৩০০ খানি গ্রাম নিয়ে এক একটা এলাকা গঠিত হবে। এইরকম একটা এলাকা বিভক্ত হবে তিনটি ব্লকে, অর্থাৎ এক এক ব্লকে থাকবে ১০০ খানা গ্রাম। ১৯৫২ সালে এই রকম ৫৫টি ব্লকে কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হয়, ১৯৫৩-৫৪ সালে স্থির হয় যে এ ছাড়া আরও ৫৫টি ব্লক এর সাথে যোগ করা হবে। এ ছাড়া আছে জাতীয় পরিবর্ধন পরিকল্পনা (ন্যাশনাল এক্সটেনসন্ সার্ভিস)। এই সমস্ত নিয়ে মোট ব্লকের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩০০ এবং তার মধ্যে গ্রাম থাকবে মোট ৩০ হাজার।

ভারতীয় ইউনিয়নে মোট গ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লাখ। সাড়ে পাঁচ লাখ গ্রামের মধ্যে ৩০ হাজার গ্রামে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ এই যে শতকরা ৫ ভাগেরও কম গ্রাম এর আওতায় পড়বে—শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী গ্রাম এর বাইরে থাকবে। এক একটা ব্লক মানে ১ লাখ লোকের গ্রাম সমষ্টি, সুতরাং ৩০০ ব্লকে ৩ কোটি লোক থাকবে। সারা ভারতে লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি। সুতরাং লোকসংখ্যার দিক থেকে শতকরা ৮ জনের মত এই উন্নয়নের ভিতর আসছে এবং শতকরা ৯২ জন থাকছে বাইরে। পাঁচ বছরের পরিকল্পনার এই অংশটি আরম্ভই হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হবার দু বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। সুতরাং এটা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার (১৯৫৫-৫৬) মধ্যে গ্রাম উন্নয়ন ও ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসের আধাআধি হবে। তা যদি হয় তো ঐ সময়ের মধ্যে শতকরা আড়াই ভাগ গ্রাম এবং শতকরা ৪ জন লোকের বেশী এই পরিকল্পনার আওতার মধ্যে পড়বে না। সুতরাং কৃষির উন্নতি, রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ এবং জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে গ্রাম-কল্যাণজনক যে ব্যবস্থাই এতে থাকুক না কেন, তার সুবিধা এত অকিঞ্চিৎকর যে বিস্তীর্ণ ভারতের বিশাল জনসংখ্যার বিপুল সর্বাধিক অংশ তা টেরই

পাবে না। মোটের উপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, জনস্বার্থের ভালোর দিক ধরে নিলেও, একটা নমুনামূলক ব্যাপার। এই পদ্ধতিতে গ্রামোন্নয়ন করতে হলে এই রকম ২০টা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা, অর্থাৎ ১০০ বছর লাগবে।

(২)

সময়ের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে উক্ত পরিকল্পনার মূল বিষয়-বস্তুতে আসা যাক।

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন ঃ-

"গ্রাম উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য যতটা বৃহৎ আকারে সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি।"

[ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, প্রগ্রেস রিপোর্ট, ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫২-৫৩, ৪৮ পৃষ্ঠা]

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন ঃ—

"সুতরাং পরিকল্পনার পরিচালকদের জরুরী কাজ ভাল বীজ ব্যবহার, সার সরবরাহ, কো-অপারেটিভ গঠনের আন্দোলন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত উপায়ে সমগ্র গ্রামের প্রতিনিধিমূলক পরিচালকমণ্ডলী গঠন প্রভৃতি দ্বারা কৃষির উন্নত পদ্ধতি চালু করার দিকে জরুরী মনোযোগ দেওয়া। এখন থেকে আরও একটা ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, সেটা হচ্ছে ভূমি সংস্কার, ন্যূনতম মজুরীর মান নির্ধারণ এবং ভূমিহীন চাষীদের জন্য কাজ দেবার ব্যবস্থা।" [ঐ, ৪৯ পৃষ্ঠা]

এবার কমিশন কর্তৃক বর্ণিত এই উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থার সারবত্তা এবং প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া দরকার যে গ্রামবাসীদের মূল সমস্যাটা কি এবং কৃষিসংকট কোন্ সমস্যার সমাধান অপরিহার্য করে তুলেছে। কেননা, তার সমাধানের জন্যই সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত পরিকল্পনাটিকে একমাত্র সম্ভাব্য ও কার্যকরী উপায় বলেই দাবী করা হচ্ছে।

(৩)

সারা ভারতের গ্রাম সমস্যা এবং কৃষি সংকটের বিষয় এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার দরকারও নেই। পশ্চিমবংগের সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য পরিচয় থেকেই সারা ভারতীয় সমস্যার ধারাটা বোঝা যাবে। কারণ, বিভিন্ন রাজ্যে সমস্যার ও অবস্থার বিভিন্ন রকম জটিলতা থাকলেও মোটের ওপর মূল সমস্যার ধরণ এবং তার প্রধানতম কার্যকারণ সম্বন্ধ মূলতঃ একই।

পশ্চিমবংগের গ্রাম অঞ্চলে কার কত জমি আছে এবং সেই জমিতে কত ফসল উৎপন্ন হয়, ঐ ফসলে কৃষকদের কত অংশ নিজ জমিতে নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্যের ঘাটতি পড়ে আর ভূস্বামীদের কত অংশের ঘরে কত খাদ্য জমা হয়—এই বিবরণটি থেকে গ্রাম্য অর্থনৈতিক অবস্থার ধারাটা আন্দাজ করা যাবে ঃ—

পশ্চিমবংগে কৃষি উৎপাদন (১৯৫০—৫১)

(১) জমির পরিমাণ	(২) মোট কৃষি পরিবারের কত অংশের হাতে ঐ জমি আছে	(৩) দ্বিতীয় কলমে বর্ণিত লোকেদের জমিতে কত খাদ্য-শস্য হয় (হাজার টন)	(৪) তাদের কত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি পড়ে (হাজার টন)
২ একরের কম	৪৪·১	৩৯৫	−৪৭৮
২ থেকে ৩ একর	১১·৭	২৬২	+ ১৫
৩ থেকে ৪ একর	৯·৬	৩০১	+ ৮৯
৪ থেকে ৫ একর	৮·৫	৩৪১	+১৪৭
৫ থেকে ১০ একর	১৮·৪	১২৩২	+৬৫১
১০ থেকে ২৫ একর	৭	১০৯২	+৫২২
২৫ একরের বেশী	০·৭	২৭৩	+১০৯

[১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১(ক) ভাগ, ৪৮৭ পৃষ্ঠা]

উল্লিখিত বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়—

প্রথমতঃ, কৃষিজীবীদের শতকরা ৪৪ জনের হাতে হয় জমি নেই অথবা অতি সামান্য জমি আছে (২ একরের কম), যেটা না থাকারই সামিল। বাজার থেকে এদের কিনে খেতে হয় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টন খাদ্যশস্য। সুতরাং এ বিরাট অংশটি নিজেরা কৃষিজীবী হয়েও খাদ্যশস্যের বাজারে অনবরত ক্রেতা হিসেবে চাপ দিচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, ৫ একরের বেশী জমি আছে এমন লোক-সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৫ জন এবং তাদের হাতেই বাজারে বিক্রয় যোগ্য সমস্ত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের শতকরা ৮০ ভাগ।

তৃতীয়তঃ, যাদের জমির পরিমাণ ১০ একরের বেশী তারা হল সমস্ত কৃষিজীবীদের মাত্র শতকরা ৭·৭ জন আর তাদের হাতে উদ্বৃত্ত ফসলের শতকরা ৪০ ভাগ।

অর্থাৎ গ্রাম্য সমাজের একদিকে আছে বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন চাষী যারা চাষের জন্য মেহনত করে অথচ বাজার

থেকে ফসল কিনে খেতে হয়, অন্য দিকে আছে মুষ্টিমেয় একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ যাদের হাতেই বিক্রয়যোগ্য ফসলের একটি বিরাট অংশ মজুত হয়। বাজারের চাপ বুঝে এরাই বেদম দর হাঁকে আর ঐ শতকরা ৪৪ জন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।

ঐ যে মুষ্টিমেয় দশ একরের বেশী জমির মালিক, এবং বিশেষ করে যারা ২৫ একরের বেশী জমির মালিক—তারা কি ভাবে জমি চাষ করে?

সমস্ত চাষের জমির শতকরা ২০ ভাগে বর্গাচাষ হয়। যাদের জমি আছে ৩৩⅓ একরের বেশী তারা তাদের জমির শতকরা ৫৫·৩ ভাগ বর্গাদার দিয়ে ভাগচাষ করায়, যাদের জমির পরিমাণ ২০ থেকে ৩৩⅓ একরের মধ্যে তারাও তাদের জমির শতকরা ৪০—৪১ ভাগ ভাগে লাগায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যাদের হাতে বেশী জমি মজুত হয়েছে এবং যারা বেশী ফসল মজুত করতে পারে, তারা জমি বেশী এবং আয় বেশী হওয়া সত্বেও উন্নত প্রণালীতে চাষ করে না, চাষ করে প্রধানতঃ বর্গাদার লাগিয়ে অর্থাৎ চাষের সমস্ত খরচ বর্গাদারের ঘাড়ে চাপিয়ে অলস ভাবে ফসলের অর্ধেক ভাগ আদায় করে।

(৪)

সুতরাং গ্রাম উন্নয়নের প্রথম সমস্যা হ'ল জমি বণ্টন। অর্থাৎ যারা প্রকৃতই চাষী, যারা চাষ করে জীবনধারণের জন্য, দুস্থ শ্রমিক-শোষণ দ্বারা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য নয়, তাদের হাতে জমি দিলে চাষের উন্নতি হয়, গ্রাম্য গরীবের ক্রয় শক্তিও বাড়ে।

কিন্তু সরকারী গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় **জমি বিতরণের কোন ব্যবস্থা নাই**। এই পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কারের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পশ্চিমবংগ সরকার যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন তাতে ক্রয়শক্তিহীন ভূমিহীনকে জমি দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। জমিদারী ক্রয় আইন অনুসারে এক একটি মধ্যস্বত্ব পরিবারের জন্য ২৫ একর পর্যন্ত চাষের জমি, তাছাড়া ২০ একর অন্য জমি, এবং তাছাড়াও মেছোঘেরী, ফলের বাগান ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ৪।৫ লাখ মধ্যস্বত্বভোগী পরিবার, প্রত্যেক পরিবার ২৫ একর চাষের জমি রাখতে পারলে—১ কোটি একর জমি পর্যন্ত তারা রাখতে পারে। সারা পশ্চিমবংগে মোট চাষের জমি আছে কিঞ্চিদধিক ১ কোটি একর। উক্ত আইনের ৬নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রায়ত অধীন রায়তরা যে জমি ভাগ-চাষে লাগায় তার ৩৩ একর বাদ দিয়ে বাকিটা সরকার খেসারত দিয়ে নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তারা যদি ভাগচাষীকে কণ্ট্রাক্ট লেবরে পরিণত করে তা হলে হাজার হাজার একর জমিও রেখে দিতে পারে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ভাগচাষীর স্থানে কণ্ট্রাক্ট লেবরের সংখ্যাই বাড়ছে দেখা যায়।

সুতরাং জমি পুনর্বণ্টনের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই হচ্ছে না। এ অবস্থায় গ্রাম্য গরীবের ক্রয় শক্তি বাড়বে না।

সরকারী গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কথা হলো "......কৃষির উন্নত প্রণালী—ভাল বীজ ব্যবহার, সার সরবরাহ এবং কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেণ্ট।"

গ্রামে যাদের পাঁচ একরের কম জমি আছে এমন চাষীর সংখ্যাই গ্রামবাসীদের শতকরা ৭৪ জন। স্বভাবতঃই এরা ভালো বীজ এবং সার কেনার মত আর্থিক সংগতি থেকে বঞ্চিত। এমন কি সেচের জল—যা না হলে চাষ অচল হয় তাও বিনামূল্যে না দিলে তাদের পক্ষে নেওয়া অসম্ভব। সারের দর প্রতি একরে ১৬্ টাকা, আর সেচের জল নিতে হলে ট্যাক্স ধার্য হয়েছে ১০্ টাকা প্রতি একরে (ময়ূরাক্ষী প্রজেক্ট)। শতকরা ৭৪ জন চাষীর পক্ষে উন্নত চাষের এই ব্যবস্থা অচল। এ ব্যবস্থার সুযোগ ভালোভাবে নিতে পারে শুধু তারাই যাদের ২৫ একরের বেশী জমি আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হল গ্রামবাসীদের শতকরা ০·৭ জন। তারাও তাদের জমি যতক্ষণ বর্গাদার কিংবা কণ্ট্রাক্ট লেবর দিয়ে চাষ করাবার সুযোগ পাবে ততক্ষণ কৃষির জন্য খরচ করবে না, কেন না বিনা খরচায় ফসলের অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ ফসল পাবার সুযোগ থাকতে কৃষির জন্য তারা ট্যাঁকের পয়সা খরচ করতে যাবে কেন? মনে রাখতে হবে যে অদের টান কৃষির উপর নয়, টাকার উপর। কৃষকের টান কৃষির উপর, কিন্তু তাদের শতকরা ৭৪ জন একরকম ভূমিহীন বললেই হয়।

গ্রামে আছে ৩০ লক্ষ ভাগচাষী এবং ৩০ লক্ষ ক্ষেত মজুর। ২ একরের কম জমি আছে তাদের সংখ্যা (ভাগ-চাষী ও ক্ষেতমজুর সমেত) কৃষিজীবীদের শতকরা ৪৪ জন। গ্রামে এই বিপুল শ্রমশক্তি যতক্ষণ এই রকম ভূমিহীন থাকবে ততক্ষণ মুষ্টিমেয় ধনী-জোতদারদের পক্ষে বিনা খরচায় ভাগে জমি চাষের সুযোগও থাকবে।' এদের জন্য আইন করে ভাগচাষ যদি বা বন্ধ করেন, তবু "কণ্ট্রাক্ট লেবর" এই বেনামীতে ভাগচাষ চলবে। কেন না এই প্রধান মূলধনের সমস্ত খরচা চাষী বহন করে আর মালিক শুধু বসে বসে ফসলের ভাগ পায়। গ্রাম্য অর্থনীতির এই মূল অবস্থাটির আমূল পরিবর্তন ছাড়া—ভালোবীজ, ভালো সার এবং সেচের

জল কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে না। সুন্দরবনের খাশমহালে লাটদের হাতে হাজার হাজার বিঘা জমি আছে, টাকার অভাব তাদের নেই, তবু সুন্দরবনে উন্নত প্রণালীতে চাষ হয় না কেন? কারণ বিনা খরচায় চাষ করাবার মত দুস্থ চাষীর ভিড় যেখানে আছে সেখানে মুনাফাখোর মালিক উন্নত প্রণালীর চাষে টাকা ঢালতে চায় না।

এ অবস্থার সমাধান হলো মালিককে চাষী করার চেষ্টা না করে চাষীকে মালিক করার চেষ্টা। জমিদার-জোতদারদের জন্য প্রচুর খাসজমির ব্যবস্থা না করে ভূমিহীন এবং গরীব চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণ করতে হবে। স্বভাবতঃই তাদের জমি দিতে হবে বিনামূল্যে, কেন না জমির জন্য মূল্য ধার্য করলেই তা ধনবানের হাতে গিয়ে পড়বে। সেচের জল সরবরাহের জন্য শুধু সেচব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের খরচই কৃষকের উপর ধার্য করা চলতে পারে, বিনামূল্যে দেবার চেষ্টাই করতে হবে। সিন্দ্রী কারখানায় সার তৈরী এত ব্যয়সাধ্য যে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় তা অচল। যে ব্যবস্থায় এক একর জমিতে সারের খরচ ১৬৲ টাকা, তা ভারতের গ্রাম্য অর্থনীতির অনুপযুক্ত। সার এবং সেচ এত ব্যয়সাধ্য করা হয়েছে বোধহয় এই জন্যই যে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনার পিছনে আমেরিকার গ্রাম্য অর্থনীতির ছবিটাই কাজ করেছে; ভারতের গ্রাম্য অর্থনীতি সম্বন্ধে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে—তারা ভারতীয় গ্রাম উন্নয়নের জন্য এরকম ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা করবে না, যদি না গ্রাম উন্নয়নের নামের আড়ালে অন্য কোন মতলব থাকে।

(৫)

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ্ ম্যানেজমেণ্টের ব্যবস্থাই প্রধান। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাদ্বারা কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ্ উৎপাদনের দুইটি প্রাথমিক সর্ত অপরিহার্য। প্রথমতঃ কো-অপারেটিভ-এ যারা যোগ দেবে তারা একাধারে মালিক এবং শ্রমিক হবে। কো-অপারেটিভের ভিতর একাংশ যদি হয় শুধু জমির মালিক, আর এক অংশ যদি হয় মালিকানাহীন শ্রমিক, তাহলে সেটা হবে কো-অপারেটিভের অপলাপ। সরকারী গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেখা যায় যে ঐ কো-অপারেটিভের মধ্যেই জমি লীজ-দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টের (বিস্তৃত ভল্যুমের) দ্বাদশ অধ্যায়ের ৩১ ধারা অনুসারে "প্রত্যেক মালিকের পক্ষেই জমি লীজ দেবার ব্যবস্থা থাকবে সরাসরি নয়, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মারফত।" ঐ অধ্যায়ের ২৮ ধারায় আছে—"জমির কোন মালিক যদি নিজ হাতে চাষ নাও করে, তবে কো-অপারেট কর্মি সোসাইটি যতদিন চলবে, ততদিন তার জমিতে অপর কারু প্রজাস্বত্ব বর্তাবে না।" এই দুটি ধারা কো-অপারেটিভের মূল নীতির বিরোধী। বস্তুতঃ এই দুটি ধারা থেকে, এইটেই নির্ধারিত হচ্ছে যে ওর নাম কো-অপারেটিভ হলেও আসলে ওটা হচ্ছে জমিদার কোম্পানি। এরকম একটা কোম্পানির মধ্যে ভূমিহীন চাষীর সাংসারিক অবস্থার উন্নতির কোন আশা তো নেই-ই, বরং তাদের উপর শোষণ আরও তীব্রতর হবে। কেন না, এই ব্যবস্থায় মালিকেরাই হবে সংগঠিত। জমি লীজ-দেওয়া চলবে, সুতরাং টেনাণ্টের কাছ থেকে খাজনা আদায়ও চলবে, আবার শুধু মাত্র মালিকানার জন্য একটা লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) দেওয়া হবে—যে কো-অপারেটিভের মধ্যে এই সব ব্যবস্থা থাকে তাকে কো-অপারেটিভ বলে না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র—পাক্ষিক অর্থনৈতিক রিভিউ পত্রিকাতে এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেঃ—

"মালিকানার জন্য মুনাফা দেওয়া কো-অপারেটিভ্ ভিলেজ ম্যানেজমেণ্টের মূলসূত্র। কিন্তু এর বাক্যচ্ছটা বাদ দিলে কি দাঁড়ায়? এর মানে দাঁড়ায় এই যে জমির মালিক যদি গ্রাম থেকে দূরে সহরে বাস করেন, এবং জমি-চাষে তিনি যদি একটি অংগুলি হেলনও না করেন, তিনি যদি ব্যবসায় বা অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহলেও তাঁকে কৃষির মুনাফা দেওয়া হবে।..."

[ফর্টনাইটলি একনমিক রিভিউ ৩য় ভল্যুম, ৮ সংখ্যা]

(নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত।)

উক্ত পত্রিকা আরও অন্তব্য করেছেন যে জমির মালিকানার জন্য মুনাফা দেওয়া, চাষীকে জমি দেওয়ার অস্বীকৃতিরই সামিল। এই শিরোনামা দিয়েই উক্ত পত্রিকার উদ্ধৃত প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কো-অপারেটিভের নামে গ্রাম অঞ্চলে যা গঠন করার পরিকল্পনা হয়েছে তাতে তার প্রাথমিক নিয়মই লঙ্ঘিত হয়েছে। বস্তুতঃ এটা হবে ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার একটা বিশেষ পদ্ধতি।

কৃষিক্ষেত্রে কো-অপারেটিভের দ্বিতীয় সর্ত এই যে সদস্যগণের জমির পরিমাণে আকাশ পাতাল ভেদ থাকবে না। সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে কো-অপারেটিভে ১০০০

বিঘার মালিক জোতদারও থাকবে আবার ১ বিঘার মালিক রায়তও থাকবে। যে প্রতিষ্ঠানে এই রকম বিপুল বৈষম্য থাকে তাতে সমবায় সমিতির যে মূল উদ্দেশ্য সমানে সমানে সহযোগিতা, তাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে সেখানে চলবে মাৎস্য ন্যায়, অর্থাৎ বড় ছোটকে গ্রাস করে ফেলবে। ১০০০০ বিঘা জমি নিয়ে যদি একটা "কো-অপারেটিভ" হয় আর তার মধ্যে শতকরা ১০ জন সভ্য যদি হয় শতকরা ৯০ ভাগ জমির মালিক, তা হলে স্বভাবতই তার উৎপাদন, বণ্টন এবং পরিচালনায় শতকরা ১০ জনের স্বার্থই বলবৎ হবে। জমি পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা না করে কো-অপারেটিভ গড়তে গেলে এ ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে।

ভূমিহীন এবং গরীব চাষীদের জমির সমস্যার সমাধান না করে কো-অপারেটিভ ও উন্নত চাষের যে চেষ্টা হবে তাতে যদি কৃষির ফলন কিছুটা বাড়েও, তা হলেও গ্রাম্য জীবনের সংকট তাতে ঘুচবে না। কেন না, সমস্যা তো শুধু উৎপাদনের নয়, বন্টনেরও। যে ধরনের "কো-অপারেটিভ" গঠনের চেষ্টা হচ্ছে তাতে বণ্টন সমস্যার কোন সমাধানের ব্যবস্থা নেই। বণ্টন সমস্যার মূলে রয়েছে **বেকার সমস্যা** এবং **ক্রয়শক্তির অভাব।**

আলোচ্য ব্যবস্থায় যে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না বরং তার তীব্রতা বাড়বে তার স্বীকৃতি রয়েছে প্ল্যানিং কমিশনের নিজস্ব রিপোর্টেই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার "ড্রাফ্‌ট্ আউটলাইনে" বলা হয়েছে—"কো-অপারেটিভ্ ম্যানেজমেণ্টে কৃষির জন্য এখনকার চেয়ে আরও কম লোক লাগবে।" (১০১ পৃষ্ঠা) এই মূল্যবান স্বীকারোক্তিটি প্রমাণ করে যে গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর যাই থাক বেকার সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা নেই। রাস্তা বানানো এবং খাল কাটার জন্য বেকারদের কাজ দেওয়া যাবে সত্য, কিন্তু উন্নত প্রণালীর চাষ যদি সত্য সত্যই করা হয় তাতে বিপুল সংখ্যক ক্ষেতমজুর এবং ভাগচাষীদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। বড় মালিকদের অতিরিক্ত জমি নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে যদি বিনামূল্যে বণ্টন করা হয়, এবং তার পর স্বহস্তে চাষ করবে এমন সব মালিক নিয়ে কো-অপারেটিভ গড়া হয় তা হলে উন্নত প্রণালীর চাষে তাদের কাজের সময় কমবে, বেকারী বাড়ার প্রশ্নই উঠবে না। কিন্তু কো-অপারেটিভের জমি চাষ যদি ভূমিহীন শ্রমিক-নিয়োগের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল হয় তা হলে যে ব্যবস্থায় অল্প শ্রমিকে বেশী চাষ হয়, সে ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বাড়ে। গ্রাম অঞ্চলে বেকার সমস্যা এখনু যা আছে তাই অতি ভয়াবহ, সেটা যদি আর একটু বাড়ে তাহলে ক্রয়শক্তির অভাব দারুণভাবে বৃদ্ধি পাবে। সে অবস্থায়, উৎপাদন যদি বাড়েও ত তা কিনে খাবার মত সংগতি অধিকাংশ গ্রামবাসীর আরও কমবে। ফলে কৃষিসংকট আরও গভীরতর হয়ে উঠবে। এই সূত্রে মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকট কেবলমাত্র উৎপাদনেরই সংকট নয়, বণ্টনেরও সংকট। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বস্ত্র উৎপাদনের বৃদ্ধি হওয়াতে, লোকের বস্ত্র-ব্যবহার বাড়েনি, বরং বস্ত্র-ব্যবসায়ে অত্যুৎপাদনজনিত সংকটের মত সংকট দেখা দিয়েছে। তার কারণ সাধারণ মানুষের ক্রয় শক্তির অভাব। সুতরাং কেবল যেন তেন প্রকারেন উৎপাদন বাড়াবার কথা চিন্তা করলেই হবে না, উৎপাদন এমন পদ্ধতিতে বাড়াতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় শক্তি বাড়ে। সমগ্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই চিন্তাটার একান্ত অভাবই তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৬)

বেকার সমস্যা এবং খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা ছাড়াও গ্রাম্য জীবনে আরও দুটি অর্থনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। সমস্যা দুটি হ'ল ঋণ সমস্যা, এবং চাষী কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের বাজার সমস্যা। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই দুটির কোনটিকেই বিশেষ আমল দেওয়া হয়নি। কৃষকদের ঋণ মকুব করা অথবা তাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া—কিংবা তাদের শতকরা তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা সুদে কৃষির জন্য আবশ্যকীয় ঋণ সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থা না থাকাতে এই পরিকল্পনা গ্রাম্য অর্থনীতির কোন আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করবে না। জমিদারদের খেসারত দেবার জন্য ৫০ কোটি টাকার ঋণ সরকার জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন অথচ কৃষকদের ঋণমুক্তির কথা তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি। কৃষক এবং কুটিরশিল্পীরা তাদের পণ্য বিক্রয় করে ন্যায্য দর পায় না বলে মেহনত করেও তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা হয় না। ভারতের শতকরা ৫ ভাগ গ্রামে নমুনামূলক উন্নয়নের জন্য ৩৬০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে, কিন্তু এই টাকায় ভারতের অন্তত এক তৃতীয়াংশে কৃষকদের ঋণমুক্তির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা যেত—এবং সেটা হল গ্রামাঞ্চলে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন। অথচ এই টাকায় নমুনামূলকভাবে যদি গ্রাম্য কৃষক ও খরিদ্দারদের সম্ভার বিক্রীর কো-অপারেটিভ্ গড়া হোত—তাহলেও তা ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে সেটা উল্লেখযোগ্য অবদান হ'তো। সরকারী পরিকল্পনায় এইরকম সমস্যা-ওয়াড়ীভাবে সাধারণের চিন্তা না করায়, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকটি দ্বীপে অনুষ্ঠিত নমুনা-প্রদর্শনী।

আসলে যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এই যে কয়েকটি অঞ্চলে সরকারী টাকায় কিছু কন্ট্রাক্টর এবং জোতদার দু পয়সা করে নিতে পারবে। জনসাধারণের আসল সমস্যায় এই বিপুল অর্থব্যয় মহাসমুদ্রে বারি বিন্দুর মত হবে, এবং কোন কোন দিক থেকে সমস্যাগুলো আরও তীব্রতর হয়ে উঠবে। ভারতের দুজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এই মন্তব্য করেছেনঃ—"এই পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীন ফল আয়ের বৈষম্য কমানো নয়, বরং তা আরও বাড়ানো। কারণ, পাব্‌লিক সেক্‌টরে যা ব্যয় হবে তাতে কৃষি-মজুর এবং ছোট চাষীর চেয়ে কৃষিক্ষেত্রের উচ্চবিত্তদের সুবিধা হবারই বেশী সম্ভাবনা।"—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ওয়াড়িয়া এবং মারচ্যাণ্ট, ৭৯ পৃষ্ঠা।

(৭)

সরকারী গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হ'লো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ। আমেরিকান সরকারের সংগে ভারত সরকারের চুক্তি অনুসারে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পরিচালিত হবে। উন্নয়ন ব্লক যেখানে স্থাপিত হয়েছে তা পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে সেগুলি অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত অনুন্নত গ্রাম বেছে বের করা হয়নি, বেছে বের করা হয়েছে সামরিক কৌশলের দিক থেকে উপযোগী এবং আবশ্যকীয় জায়গা। এর প্রত্যেকটি জায়গায় থাকবে একজন করে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গে যে আটটি ব্লক স্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে এই—(১) বারুইপুর (২৪ পরগণা), (২) ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর), (৩) গুসকরা (বর্ধমান), (৪) শক্তিগড় (বর্ধমান), (৫) নলহাটি, (৬) আহ্‌মেদপুর (বীরভূম), (৭) মহম্মদ বাজার, (৮) ফুলিয়া (নদীয়া)।

এই অঞ্চলগুলো স্ব স্ব জেলায় সবচেয়ে সমস্যাবহুল দুর্গত গ্রাম নয়, এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সহর অঞ্চল। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে এগুলি একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই রকম কয়েকটি অঞ্চলে গ্রাম্য অর্থনীতির গভীর প্রদেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধি-পোষণ করা বিদেশীর কাছে দেশটাকে বিক্রী করে দেবারই সামিল। গ্রাম উন্নয়নের কাজে দেশের ভিতর থেকে বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় না, তার জন্য আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ আনতেই হবে—এ যুক্তি নিতান্তই হাস্যাস্পদ। যদি বলা হয় যে আমেরিকানদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে, কাজেই মহাজনদের এই সুবিধা না দিলে চলে না। তার উত্তরে বলব যে ঋণের বিনিময়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘাঁটিতে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি বসানো জাতীয় স্বাধীনতা বিক্রী করারই সামিল। তা ছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংগৃহীতব্য ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে বিদেশীদের কাছ থেকে মোট পাওয়া গেছে ১৮৯ কোটি টাকা, এর মধ্যে আমেরিকানসূত্রে পাওয়া গেছে ১৭৯ কোটি টাকা। এই সামান্য ঋণের বিনিময়ে তারা পেয়ে যাচ্ছে একটি সাম্রাজ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

অতল

শিশিরকুমার দাশ

ধু ধু করে চর দুপাশে শুধুই মাঝেতে অথৈ জল
অবাক সূর্য্য, দুরন্ত হাওয়া, দিগন্তময় নীল
ছড়ালো অনেক—অনেক কিছুই, সবুজের ঝিলমিল ;
রুদ্ধ আবেগে ডুব দিয়ে তবু পেলাম না খুঁজে তল।

বেঁধে দিল মন এপারের মাঠ ; ওপারের বন টান
দিল, বারবার শিষ্‌ দিয়ে কোন ক্লান্ত পাখীর মত
নীরব প্রহরে চকিতে দাঁড়াই, ডাক শুনে অবিরত
এপারে ওপারে দু'পারেই মন চঞ্চল আনচান।

সূর্য্যের কণা তবুও ছড়াই বনে বনে নির্জ্জন
দিশাহারা জল ব্যাকুল বাতাসে অজানা মন্ত্র দিয়ে
ডেকে আনে আর বাক্‌হারা মুখে নিরুদ্ধ মন নিয়ে—
খুঁজে মরি তল শুনি ভেসে আসে জলেদের গর্জ্জন।

অন্যদেশে

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে আমেরিকান সাহিত্যের খ্যাতিমান কথাশিল্পী। 'স্নো'জ অব বিলিমেন্‌জারো' লিখে এঁর সাহিত্যিকখ্যাতি বিশ্বব্যাপী হয়েছে। এঁর লেখার মধ্যে ঘটনা ও কল্পনা চলে পাশাপাশি। কয়েকটি গ্রন্থ ইতিমধ্যেই সিনেমার পর্দায় রূপায়িত হয়েছে। সম্প্রতি বিমান দুর্ঘটনার হাত থেকে সস্ত্রীক দু'দুবার রক্ষা পেয়ে সকলের মনেই বিস্ময় এনেছেন—তাঁর প্রাণরক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর সৌভাগ্যকেই অনুভব করা যাচ্ছে। প্রাচুর্য্যের মধ্যে, খ্যাতির মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসর হোন, এ সকলেই চান। বর্ত্তমান গল্পটি তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প। এতে প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক সভ্যতাকে একত্রিত করে তিনি যুদ্ধোত্তর যুগকে রূপায়িত করেছেন। ১৮৯৮ সালের ২১শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়তে হেমিংওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'টু হ্যাভ এণ্ড্ হ্যাভ্ নট, 'ফর হুম্ দি বেল টেল্‌স্' প্রভৃতি অন্যতম।

জলপ্রপাতের ওধারটার আগে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো, কিন্তু আমরা সে যুদ্ধে আর কখনো যাইনি। মিলানের জলপ্রপাত অঞ্চলটা এম্নিতেই ছিলো ভীষণ ঠাণ্ডা আর ওদিকটায় সন্ধ্যের অন্ধকারও নেমে আসে তাড়াতাড়ি। আজকাল বৈদ্যুতিক আলো এসেছে, এখন জানলা থেকে আলো ঝল্‌মল্ রাস্তাগুলো চমৎকার দেখায়। রাস্তার ধারে দোকানগুলোতে কতো রকমের মনোহর খেলনা থরে থরে সাজানো। শেয়ালের চামড়ায় বরফের ছোট ছোট কুচি জমেছে, ফাঁপা ঋজু হরিণের চামড়াটা ঝুলছে সমস্ত দোকানটা জুড়ে। ছোট ছোট পাখীরা বাতাস কেটে উড়ে চলেছে, বাতাসে তাদের নরম পালক হয়ে গেছে এলোমেলো। জলপ্রপাতের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে হু হু শব্দে।

হেমিংওয়ে

প্রত্যেক দিন বিকালে আমরা যেতাম হাসপাতালে। শহরের বিভিন্ন দিক থেকে রাস্তা হাসপাতালে এসে মিশেছে। তারমধ্যে দুটো রাস্তা এসেছে খালের ধার দিয়ে, রাস্তা দুটো একটু দীর্ঘ। তিনটে ব্রিজ বেছে নিয়ে যে কোনটা পার হয়েও হাসপাতালে আসা যায়। একটা ব্রিজে একটি মেয়ে বসে বসে বাদামভাজা বিক্রী করে, সকলের সামনেই কয়লার আগুনে বাদাম সেঁকে গরম করে দেয়। হাসপাতালটি খুব পুরণো হলেও দেখতে ভারী চমৎকার। দরজা দিয়ে ঢুকে চত্বর দিয়ে

বেড়াতে বেড়াতে ওপারের দরজা দিয়েও বেরিয়ে যাওয়া যায়। হাসপাতাল থেকে খানিকটা দূরে নোতুন ইটের তৈরী সৈন্যদের ছাউনি। আমাদের নির্দ্দিষ্ট 'মেসিনের' সামনে বসে আমরা বিকেল বেলাটা সৈন্যদের শিবিরই দেখি শান্ত হয়ে।

আমি যে মেসিনটার সামনে বসেছিলাম সেখানে ডাক্তারবাবু এসে প্রশ্ন করলেন আস্তে আস্তে: "যুদ্ধের আগে আপনি কি করতে ভালবাসতেন? খেলতেন-টেলতেন নাকি?"

উত্তরে শুধু বলি—হ্যাঁ ফুটবল খেলতাম।"

—"তাই নাকি? বেশ, বেশ।" ডাক্তার স্তোক দিয়ে বললেন, "আবার আপনি আগের মতই ভালো খেলতে পারবেন।"

হাঁটু থেকে গোঁড়ালী পর্য্যন্ত, পা-টা আর আমার বেঁকে না,—সোজা হয়ে থাকে। মেসিনের ওপর সাইকেলের প্যাডেল করার মত অভ্যাস করা সত্বেও এখনো সমস্ত পা-টা মুড়ছে না। তবে খানিকটা উন্নত অবস্থা। পা বেঁকাবার সময় মেসনিটা বার বার কাৎ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বললেন,—"এম্নি করতে করতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি তো ভাগ্যবান মশায়, ভবিষ্যতে আবার ফুটবল চ্যাম্পিয়ান্ হবেন!"

আমার পাশের মেসিনে বসেন একজন মেজর। মেজরের একটা হাত ছোট ছেলেদের মতো অপুষ্ট। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন। চামরার ষ্ট্রাপ দিয়ে হাত বাঁধা থাকলেও নাড়া-চাড়া যায়। হাতটা পরীক্ষা করেন ডাক্তার অত্যন্ত সতর্কভাবে। পরীক্ষার মাঝখানেই মেজর প্রশ্ন করে বসেন ডাক্তারকে: "আমিও ফুটবল খেলতে পারবো তো ডাক্তার?" মেজর একজন বড় খেলোয়ার, যুদ্ধের আগে তিনি ইতালীর সেরা খেলোয়ার ছিলেন।

অফিসঘর থেকে ডাক্তার ফিরে এলেন একটা ছবি হাতে করে, তাতে দেখা গেলো মেজরের মতই একজনের অপুষ্ট ছোট হাত এই মেসিনের সাহায্যে বড় করা হয়েছে। ভাল হাত দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে মেজর ছবিটি অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন, তারপর প্রশ্ন করেন—"চোট লেগে এমনি হয়েছিলো বুঝি!"

—"না, যান্ত্রিক দুর্ঘটনায়",—ডাক্তার কারণ বিশ্লেষণ করেন।

—"খুব আশ্চর্য্য তো"—চিন্তিত মুখে মেজর ছবিটি ডাক্তারের হাতে ফেরৎ দেন।

—"আপনার হাতও সেরে উঠবে এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো?"

—"না"—সরাসরি মেজর উত্তর দিয়ে দেন।

ঠিক আমারই মতো আরও তিনটি ছেলে আসতেন রোজ হাসপাতালে মিলান থেকে। তাঁদের একজন আইনজীবী, একজন শিল্পী আর একজন সৈনিক। মেসিনের কাজ শেষ করে আমরা চারজনে এক সংগে বেড়াতে বেড়াতে কাফে কোভা যেতাম। এইটুকু পথ যেতে হতো আমাদের কম্যুনিষ্ট ব্যূহ ভেদ করে। আমরা অফিসার বলে তারা আমাদের ওপর ছিলো খুব খাপ্পা! মদের দোকান থেকে অভব্যভাবে কটূক্তি করতো আমাদের লক্ষ্য করে। আমাদের সংগে আর একটি ছেলেও এসে জুটেছিলো, তার মুখে বাঁধা থাকতো কালো সিল্কের একটা রুমাল, কেননা তার নাক ছিলো না। যুদ্ধে সে নাক হারিয়েছে। নোতুন করে তার মুখ তৈরী হচ্ছে হাসপাতালে। মিলিটারী স্কুল থেকে বেরিয়ে সে সীমান্তে যায় যুদ্ধ করতে, কিন্তু যাবার চার ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। মুখ তৈরী হচ্ছে বটে কিন্তু পুরণো অভিজাত বংশের ছেলে বলে তার নাকটা কিছুতেই সঠিকভাবে হচ্ছে না, বলে বার বার

ব্যর্থতা আসছে মুখ তৈরীতে। দক্ষিণ আমেরিকায় একটা ব্যাংকেও নাকি সে কিছুদিন চাকরী করে, কিন্তু কেন যে সে চাকরী ছেড়ে দেয় তার আলোচনা অবশ্য হয়নি কোনদিন।

যুদ্ধে সাহস ও দক্ষতা দেখানোর জন্যে আমরা প্রত্যেকেই মেডেল পেয়েছিলাম, পায়নি শুধু শেষোক্ত ছেলেটি। আমাদের মধ্যে যে ছেলেটি সবচেয়ে লম্বা সে ছিলো লেপ্টেন্যান্ট, যে পুরস্কার পেয়েছে তিনবার, আর আমরা একবার করে। বহুদিন মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে আজ আমরা খানিকটা মুক্ত। মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করেই আমরা ক'জন এখানে মেলবার সুযোগ পেয়েছি। শহরের মধ্যে দিয়ে তাই বুক ফুলিয়ে যেতাম বটে, কিন্তু প্রত্যেকের দেহে একটা-না-একটা খুঁত থাকায় ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে আমাদের চলাফেরা করতে হতো একটু লজ্জিত ভাবে।

নিয়মিত যাতায়াতের ফলে কাফের সব কিছুই ছিলো জানা। আর কিছু হোক-না-হোক কাফেটি ছিলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর উজ্জ্বল আলোতে ফিটফাট। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে এখানে এলে এতো আরাম হতো। ভেতরটা ছিল চমৎকার গরম, ফলে ছেলেমেয়েদের ভিড় হতো বেশি। সমস্ত টেবল থাকতো মেয়েতে ভর্ত্তি আর দেয়ালের র‍্যাকে রংদার সব বইএর যেন হাতছানি অনুভব করতাম। কাফের মেয়েগুলি বেশ রসিকা এবং দেশপ্রেমিকা তাছাড়া লক্ষ্য করেছি তারাই দেশের কাজ বেশি করতো, মনে হয় এখনো তারা তেমনিটিই আছে।

ছেলেরাও বেশ মিষ্টি স্বভাবের, অন্তত আমাকে সম্মান করে কথা বলতো, আমার মেডেল দেখতে চাইতো এবং সে সম্বন্ধে আলোচনাও করতো কেউ কেউ। তাদের মতে আমি মেডেল পেয়েছি শুধু নাকি আমেরিকান বলেই। আমেরিকান বলে ব্যবহারের খানিকটা তারতম্য হওয়া সত্বেও আমিই ছিলাম তাদের বেশি আত্মীয় বিদেশীদের মধ্যে। আমাকে তাদের বন্ধু বলে মনে করতো। এ সম্পর্কে নির্জ্জনে বহু চিন্তাও করেছি, আমার অন্যান্য বন্ধুদের সংগে নিজেকে তুলনাও করেছি। কেন জানি না তাদের সংগে মোটেই নিজেকে মেলাতে পারি নি কোনদিন। তারা জাত সৈনিক, আর আমি বীরত্বের জন্যে মেডেল পেলেও এখনও মরতে ভয় খাই, এখনও স্বপ্নের মধ্যে শিউরে উঠি আবার যদি আমাকে সীমান্তে পাঠিয়ে দেয় যুদ্ধ করতে। মেডেল চিহ্নিত হয়ে আমার অন্য সব বন্ধুদের দেখতে লাগে শিকারী বাজপাখীর মতো, কিন্তু আমি বাজও নই, শিকার করতেও জানি না। একথা সবাই ভালোভাবে জানতাম বলেই একে একে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি।

আমার পাশের মেজরও বীরত্বে বিশ্বাসী নন তাই মেসিনে বসে বসেই আমাকে ব্যাকরণের পাঠ দেন। কিছুদিন থেকে তিনি আমাকে ইতালী ভাষা শেখাচ্ছেন, এখন আমরা বেশ চটপট্ কথাবার্ত্তা বলতে পারি। ইতালীভাষা যা সোজা তাতে এর পেছনে আর বেশি খাটতে হবে না বলে মনে হচ্ছে' —আমার অভিমত পাশ করি মেজরের কাছে। একটু হেসে মেজর জবাবে শুধু বলেন—"তাহলে এবারে ব্যাকরণটা শিখুন একটু।" ব্যাকরণ পড়তে পড়তে ইতালী ভাষার সম্পর্কে ভুল ভেঙে গেলো।

হাসপাতালে মেজর ঠিক নিয়মমত আসতেন, মেসিনে বিশ্বাসী না হলেও তাঁকে কোনদিন কামাই করতে দেখিনি। একদা যন্ত্রকে কেউ বিশ্বাস করতো না, তখনকার দিনে যন্ত্রের ওপর বিশ্বাস ছিলোটা বোকামীর পর্য্যায়ে পড়তো। "যন্ত্রকে আমরাই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং এটা থিয়োরীর মতোই অস্বাভাবিক। মেজর বলেছিলেন একদিন। ব্যাকরণ শিখতে পারিনি বলে বলেছিলেন "বোকা হওয়া

সত্যিই লজ্জাকর ব্যাপার।' তিনিও বোঝা তাই আমার পেছনে অর্ত সময় অপব্যয় করেছেন।

'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কি করবেন আপনি?' অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসেন আমাকে। "ব্যাকরণ ঠিক রেখে কথার জবাব দিন।"

—"দেশে ফিরে যাবো।"

—"বিয়ে করেছেন?"

—"না, তবে ইচ্ছে আছে।"

—"বোকামী করবেন না", হঠাৎ চটে যান মেজর—"মানুষের বিয়ে করা উচিত নয়।"

—"কেন, সিনর ম্যাজিগোর?"

—"আমাকে সিনর ম্যাজিগোর বলবেন না কোনদিন।"

—"মানুষের বিয়ে করা উচিত নয় কেন বলুন?"

—"না, মানুষ বিয়ে করবে না, কখখনো করবে না"—উত্তপ্ত সুরে বলেন।

"সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেলেও নিজেকে কোনদিন হারিয়ে ফেলবেন না। খোঁজ দেবেন, কিন্তু নিখোঁজ হবেন না।" তিক্তস্বরে কথা শেষ করেন।

—"বিয়ের ওপর আপনার বিদ্বেষ কেন?"

—"তর্ক করবেন না আর।"—লোক ডেকে রাগের চোটে মেসিন বন্ধ করে দেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে চলে যান অন্য ঘরে হাতে মালিস লাগাতে। একসময় শুনলাম ডাক্তারকে টেলিফোনের জন্যে কি যেন বলছেন। ফোন সেরে যখন মেজর এলেন তখন আমি অন্য মেসিনে বসেছি। আমার কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন,—"খুব দুঃখিত, আর কোন দিন রূঢ় হবো না। এই মাত্র খবর পেলাম আমার স্ত্রী মারা গেছেন। আমাকে ক্ষমা করুন।"

—"য়্যাঁ।" চমকে উঠি আমি তাঁর এই আকস্মিক বিপদে,—"সত্যি, আমি বড় দুঃখ পেলাম।" নীচের ঠোঁটটা শক্ত করে কামড়ে তিনি শুধু উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন,—"বড় বিব্রত বোধ করছি, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না।" কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কেঁদে ফেলেন মনের দুঃখে। "নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না"—গলা তাঁর বুঁজে আসে, দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। প্রাণপণে চোখের জল থামিয়ে তিনি বেরিয়ে যান তাড়াতাড়ি।

ডাক্তার এসে বললেন—"মেজরের তরুণী স্ত্রী এইমাত্র মারা গেছেন নিমোনিয়াতে। সামান্য কদিন ভুগে এমনভাবে মারা যাবেন কেউ ধারণা করতে পারিনি।"

তিনদিন অনুপস্থিতির পর মেজর আবার হাসপাতালে এলেন কালো পোষাক পরে। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর বসবার জায়গার চারধারে তাঁরই হাতের মত বহু হাতের ছবি টাঙানো, সব হাতই সেরে গেছে সুচিকিৎসার ফলে। জানি না এত ছবি ডাক্তার কোথায় পেলেন। এতকাণ্ড করেও মেজরের বিশ্বাস কিন্তু ফিরিয়ে আনা যায়নি যন্ত্রের ওপর, তাই তাঁর ক্ষেত্রে সুফলও ফলছে না! মেসিন চালাতে চালাতে তিনি মাঝে মাঝে উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন।

অনুবাদক : মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

বাঁশী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

পূজার ছুটির কয়েকটা দিন বিন্ধ্যাচলে কাটাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইতে দু'দিন দেরী হইয়াছিল, পৌঁছিয়া দেখিলাম হোটেলে স্থান নাই, কোন বাড়ীতেও ঘর খালি পাওয়া যায় না। দুদিন ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অন্য কোথাও যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় নগরীর উপকণ্ঠে একখানি খালি বাড়ীর সন্ধান মিলিল। নগরের শেষপ্রান্তে গঙ্গার তীরে পুরাণো বড় বাড়ী, আমাদের দু'জনের থাকার পক্ষে নেহাৎ বেমানান হইবে, তা হোক, বাড়ীটায় আসিয়া উঠিলাম। দোতলায় একখানি বড় ঘর ও বারান্দাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আমরা আস্তানা পাতিলাম। জায়গাটা ভালই লাগিল, বেশ নিরিবিলি, বারান্দা হইতে গঙ্গা দেখা যায়। রাত্রে আহারাদি সারিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত দুই বন্ধুতে গঙ্গার দিকে চাহিয়া বারান্দায় বসিয়া থাকি। শুক্ল পক্ষের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নদীর জলধারা একখানি পালিশ করা নীলাভ ইস্পাতের ফলা বলিয়া মনে হয়। সামনের অশ্বত্থ গাছটার পাতার মর্ম্মর গান শুনিতে শুনিতে চোখ যখন ঘুমে জড়াইয়া আসে তখন ঘরের মধ্যে আসিয়া শুইয়া পড়ি।

প্রথম দিন ঘুমটা ভালোই হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিন কিন্তু মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাঁশীর তীক্ষ্ণ করুণ সুর কাণে আসিয়া বাজিল। এতো রাতে কে বাঁশী বাজায়? তা সে যেই বাজাক, সে বাজায় ভালো। শুনিতে শুনিতে মনে হয় একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস সহসা সুরের মূর্চ্ছনায় বাতাসের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুরটা মনের উপর কেমন যেন একটা আবেশ বিস্তার করে। শুনিতে শুনিতে আবার কখন্ ঘুমাইয়া পড়ি।

পরদিন মধ্যরাত্রেও আবার সেই সুর, ঘুম ভাঙাইয়া কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনকে আবিষ্ট করিয়া তোলে। বন্ধুবরেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল, বলিলাম—এমন জ্যোৎস্না রাত্রে এতো সুন্দর বাঁশী ঘরের মধ্যে বসে শুনতে ইচ্ছা করে না, চলো বাইরে যাই।

বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলাম। কোজাগরী পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রি, শারদীয় শুক্লা চতুর্দ্দশী। জ্যোৎস্না যে এমন স্নিগ্ধ সুষমা লইয়া ধরিত্রীর বুকে ছড়াইয়া পড়ে, তা ইহার আগে আর এমন ভাবে চোখে পড়ে নাই। ঘুমপুরীর রাজকন্যা রূপার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া পালঙ্কের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার আঁচলটি লুটাইয়া পড়িয়াছে পালঙ্কের পাশে। ওই লাল কাঁকড়ের পথটি সেই আঁচলের প্রান্ত, নীলাভ নদী দিয়া সাড়ীর পাড় দেওয়া হয়েছে। রূপকথার এক রাজপুত্র বাঁশীতে ফুঁ দিয়াছে সেই রাজকন্যার তন্দ্রা ভাঙাবার জন্য, কিন্তু ঘুমন্ত পুরীতে সে বাঁশীর সুর বেদনার প্রতিধ্বনি তুলিয়া ফিরিয়া আসিতেছে শুধু।

বংশীবাদককে ঠাহর করিবার চেষ্টা করিলাম। নদীর কিনারে অশথ গাছে হেলান দিয়া একটি লোক বসিয়া আছে, এক মাথা চুল ও শাদা জামাটি শুধু চোখে পড়ে। মধ্যরাত্রে নদীতীরের স্তব্ধ নির্জ্জনতার মাঝে বসিয়া মানুষটি নিবিষ্টমনে বাঁশীতে সুরের আলাপ করিয়া যাইতেছে চারিপাশে জ্যোৎস্না তার স্নেহের আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। শিল্পী প্রকৃতির বুকে একটি খণ্ডকাব্য রচনা করিতেছে।

কোন এক সময় সুরের আলাপ শেষ করিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর পদক্ষেপে নদীর পথ ধরিয়া বরাবর দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু বাঁশীর সুরটুকু সে যেন পিছনে রাখিয়া গেল।

সকালে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—রাত্রে নদীর কিনারে বাঁশী বাজায় ও লোকটি কে?

—হোগা কোই দেওয়ানা।

—ভারী মিষ্টি বাজায় কিন্তু!

—হুম্—বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া আমাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া আর কোন কথা না বলিয়া

দারোয়ান চলিয়া গেল। বুঝিলাম ওই প্রসঙ্গে ইহার বেশী আর কিছু বলিতে সে ইচ্ছুক নয়।

বন্ধুকে বলিলাম—এমন জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর কিনারে বসিয়া বাঁশী বাজায় লোকটি নিশ্চয়ই ভাবুক কবি। আজ রাত্রে ওর সঙ্গে আলাপ করবো।

রাত্রে বাঁশীর সুরে ঘুম ভাঙিতেই, ঘরে তালা লাগাইয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটি পার হইয়া অশথ গাছের নীচে লোকটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের পায়ের শব্দ বোধ হয় সে শুনিয়াছিল, কিন্তু মুখ ফিরাইল, দুইজনে তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। চাঁদের আলোয় মুখখানি দেখিয়া লইলাম। দাড়ী গোঁপ কামানো সুপুরুষ, বয়স বেশী বলিয়া মনে হয় না। চোখ বুঁজিয়া একমনে মানুষটি বাঁশী বাজাইয়া যাইতেছে।

বাঁশী শুনিতে শুনিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলাম, লোকটির সুরজ্ঞান অপূর্ব্ব, অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে সুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া রসসৃষ্টি করিয়া চলে। কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুনিয়াছিলাম বলিতে পারি না। বাঁশী থামাইয়া লোকটি যখন মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিল, তখনও আমাদের আবেশ কাটে নাই। বংশী বাদকই প্রথম কথা বলিল—নমস্তে!

এবার যেন সহসা ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম, বলিলাম—অপূর্ব্ব! এমন বাঁশী কখনো শুনি নাই, অপূর্ব্ব!

বাদক হাসিল।

বলিলাম—এতো রাত্রে এখানে এসে আপনি রোজ বাঁশী বাজান?

—রোজ তো আসি না বাবুজী, শুক্লপক্ষে তিনরাত আসি—ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা। কাল আর আসবো না।

—শুধু তিন দিন?

—সে অনেক কথা বাবুজী!

কি কথা জানিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সেকথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইবে কি না বুঝিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া আছি, বাদক আমাদের মুখের পানে তাকাইয়া আবার হাসিল, তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া বসিয়া আবার বাঁশীটি তুলিয়া লইল। এবার বাঁশীর সুর, মৃদু থেকে অতি মৃদু খাদে নামিয়া যাইতেছে, মনে হইল কে যেন দূর থেকে দূরান্তরে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে; নদীর ওপারে, পাহাড় গুলির ওপাশ হইতে যেন আহ্বান আসিতেছে, এখান থেকে যেন টানিয়া লইয়া যাইবে, লাল কাঁকরের পথ ধরিয়া দিক সীমার শেষে। চোখ বুজিয়া শুনিতেছিলাম, সম্মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম কি না জানি না, মনে হইল বংশী বাদকের হাত ধরিয়া নদীর কিনারে লাল কাঁকরের পথ ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। যতই চলিতেছি ততই চারিপাশের রূপ বদলাইয়া যাইতেছে।

চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে এক দীর্ঘ প্রাচীরের তোরণে আসিয়া পৌঁছিলাম। বিরাট লৌহ-কপাট মুক্তই ছিল, কপাটের পাশে চারিজন অশস্ত্র শাস্ত্রী পাহাড়া দিতেছিল, তাহাদের পাশ কাটাইয়া নগরে প্রবেশ করিলাম। প্রশস্ত পথ, দুইপাশে সারি সারি গাছ। কিছুটা অগ্রসর হইবার পর বাজারের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, সারি সারি বিপণি। বিপণিতে খরিদ্দারের ভীড়। পুরুষদের কাহারও গায়ে আধুনিক কালের জামা নাই। মেয়েদের গায়ে আছে কাঁচুলি ও ওড়না। চলিতে চলিতে মনে হইল শত শত বছরের কোন প্রাচীন নগরীর মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

চলিতে চলিতে সহসা কাণে আসিয়া বাজিল—মগধ সম্রাটের জয় হোক্! দেখা গেল সামনের পথে পরপর কয়েকটি হাতী আসিতেছে, হাতীর গায়ে ঝালরের উপর সূর্য্যকিরণ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। পিছনে কয়েকটি আসা-শোঁটা ও রাজছত্রের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চোখ ঝলসাইয়া দিতেছে। রাজা নগর পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম, সপারিষদ সম্রাটের হাতী আগাইয়া গেল। আমরা আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি উদ্যান বাটিকার সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ফটকের ভিতর হইতে একখানি রথ বাহির হইতেছিল, রথের মধ্যে সুবর্ণখচিত জমকালো উষ্ণীষ-মাথায় এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন, আমার সঙ্গী যুবক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, বলিল—নৌবলাধ্যক্ষের জয় হোক!

রথ থামিল। রথারূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি? কি চাও?

—চরণাদ্রির দুর্গাধিপ রবিদত্ত ছিলেন আমার পিতা, আমি তাঁর একমাত্র পুত্র দেবদত্ত।

—মণ্ডলেশ্বর রবিদত্ত তো দীর্ঘদিন স্বর্গতঃ হয়েছেন, এতদিন তো তোমায় দেখি নাই ?

—পিতার মৃত্যুর পর গত আটবছর আমি তক্ষশিলায় ছিলাম। সেখানে শস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করছিলাম, কাল ফিরেছি।

—বেশ, বেশ। শুনে সুখী হলাম।

—কিন্তু এবার আপনি কৃপা করে ভদ্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের একটা সুযোগ করে দিন।

—কিন্তু, বাবা, ঠিক এখনই তো একটা কোন কর্ম্ম দেওয়া কঠিন। তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়ের আরো চারজন অস্ত্রবিদ আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। অথচ কোথাও কোন পদ শূন্য নেই, কার জন্য যে কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

—আমার পিতা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মগধ-সম্রাটের সেবা করে গেছেন, সেদিন থেকে আপনাদের কাছে আমার দাবী আছে।

—অবশ্য। তা তুমি সংবাদ রেখো, কোন পদ শূন্য হলেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।

মহাবলাধ্যক্ষের রথ দেবদত্তকে পাশ কাটাইল। দেবদত্ত বিমনা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক জলসত্রের পাশে আসিয়া বসিল, হাত মুখ ধুইয়া আকণ্ঠ জলপান করিল, তারপর পাশের মর্ম্মর মণ্ডিত চত্বরে দেহ এলাইয়া দিল।

দেবদত্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কোন এক সময় সঙ্গীতের সুরে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। পথের ওপাশের একটি গৃহের দ্বিতল হইতে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে। অতি মিষ্ট কণ্ঠে কে যেন একখানি ভজন গাহিতেছে। কণ্ঠ ভালো, শুনিতে শুনিতে সহসা কেমন যেন একটু বেসুরো লাগিল, গায়িকা সুর পালটাইল কেন ? দেবদত্তের আর ভালো লাগিল না। কি যেন ভাবিয়া অঙ্গবস্ত্রের ভিতর হইতে বাঁশীটি বাহির করিয়া ফুঁ দিল। বাঁশীতে ফুটিয়া উঠিল মৃদু মিষ্ট সুর। দেবদত্ত বাঁশীতে একখানি ভজন ধরিল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বেশ কিছুক্ষণ সে সুরের আলাপ করিয়া চলিল।

চোখ বুঁজিয়া সুরের আলাপ করিয়া যাইতেছিল, পদশব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া চাহিল—এক রমণী সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁশী থামাইয়া দেবদত্ত জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি ? কি চাও ?

রমণী কহিল—মা আপনাকে ডাকছেন।

—মা ?

—ওই যে, ওই বাড়ীর মা, গবাক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন —সামনের বাড়ীর গবাক্ষে এক মহিলা দাঁড়াইয়া ছিলেন, রমণী তাহাকে দেখাইয়া দিল।

—উনি আমাকে ডাকছেন কেন ?

—চলুন, স্বকর্ণে শুনবেন।

দেবদত্তের কৌতূহল হইল, পরিচারিকার সঙ্গে সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বিতলের সুসজ্জিত মখমল বিছানো এক প্রশস্ত কক্ষে মহিলা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কক্ষের চারিপাশে নানা বাদ্যযন্ত্র সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত এক ধারে একটি তানপুরা লইয়া এক তরুণী বসিয়াছিল। গৃহস্বামিনী দেবদত্তের আপাদমস্তক একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন—তুমি এই নগরে নবাগত বলেই মনে হয়, আমি এই নগরের প্রত্যেক সুরশিল্পীকেই চিনি, কিন্তু তোমাকে তো কখনও দেখি নাই।

দেবদত্ত বলিল—হ্যাঁ, আমি আজ এখানে এসেছি।

গৃহস্বামিনী বলিলেন—তুমি এখানে কোথায় আছ ?

—এখনও কিছু স্থির করিনি।

—উত্তম। তুমি আমার গৃহে অবস্থান কর।

—কিন্তু—

—কিন্তুর কিছু নেই। তুমি সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রের নগরবধূ চন্দ্রার নাম শুনেছ, আমি সেই চন্দ্রা। আর এটি আমার কন্যা তন্দ্রা। একে আমি গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলতে চেষ্টা করছি তন্দ্রা তোমার কাছে বাঁশী বাজাতে শিখবে, আর তারই বিনিময়ে তুমি এখানে আহার, বাসস্থান ও পঞ্চশত রজতখণ্ড হাতখরচ পাবে।

দেবদত্ত নিজের মূল্য জানিত না। যাহা সে পাইল তাহা তাহার কাছে খুব বেশী বলিয়াই মনে হইল। সে তখনই তাহা স্বীকার করিয়া লইল।

নিরাশ্রয় দেবদত্তের আশ্রয় মিলিল, নিঃস্ব দেবদত্তের আহার ও অর্থের সংস্থান হইল, শিল্পী দেবদত্তের সঙ্গীত-চর্চার সুযোগ ও সঙ্গিনী মিলিল। দেবদত্ত মাতিয়া উঠিল। তন্দ্রাকে হাতে ধরিয়া সে বাঁশী শেখায়। তন্দ্রার গানের সঙ্গে সে বাঁশীর সুর মিলাইয়া দেয়। দেবদত্তের বাঁশী না বাজিলে তন্দ্রার কণ্ঠে যেন সুর জাগে না। নগরবধূ চন্দ্রার গৃহে দুটি তরুণ তরুণী একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল—তন্দ্রা ও দেবদত্ত, দেবদত্ত ও তন্দ্রা।

দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল ভালই, কিন্তু মাঝে আসিয়া পড়িলেন মহাকুমার বাসুদেব। বৈশাখী পূর্ণিমার মহোৎসবের দিনে বুদ্ধমন্দিরের চত্বরে তন্দ্রার সঙ্গে তাঁহার দেখা। তরুণীর রূপ দেখিয়া কুমার চমকিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রা চাহনি চিনিতেন, আগাইয়া আসিয়া মহাকুমারকে বলিলেন—এটি আমার কন্যা তন্দ্রা। আমার চেয়েও স্বর মিষ্টি, এর গান শুনবার জন্য আপনার নিমন্ত্রণ রইল, যে কোন সন্ধ্যায় আমার গৃহে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হব!

পরদিন সন্ধ্যায় নগরবধূ চন্দ্রার গৃহে মহাকুমার বাসুদেব আবির্ভূত হলেন।

প্রতি সন্ধ্যাতেই কুমার আসিতে লাগিলেন। সম্রাট-পুত্র নিত্য নতুন উপহার সঙ্গে লইয়া আসেন। মহা-কুমারের প্রদত্ত মুক্তার মালা তন্দ্রার মরাল গ্রীবার শোভা বড়াইয়া দেয়, মহাকুমারের প্রদত্ত পান্নার আংটিটি তন্দ্রার বামহস্তের মাধ্যমিকায় ঝলমল্ করিয়া ওঠে, কাণের বড় বড় চুণী বসানো কুণ্ডল দুটি, তন্দ্রার মাথা দোলানোর ক্ষণে ক্ষণে রক্তিম আভা প্রতিফলিত করে দুই গণ্ডের উপর। দেবদত্ত যতই দেখে ততই তার বুকের মধ্যে করকর করিয়া ওঠে, মনে হয়, ওই উপহারগুলি তন্দ্রাকে বাঁধিয়া দেবদত্তের কাছ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবদত্ত কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। একদিন একান্তে তন্দ্রাকে পাইয়া সে বলিল—তন্দ্রা, এখানে আমার আর ভালো লাগে না, চলো তুমি আর আমি এখান থেকে বহুদূরে চলে যাই, কোন পাহাড়ের কোলে কোন ঝর্ণার কিনারে মাটির ঘর বেঁধে দু'জনে থাকবো। শুধু তুমি আর আমি।

তন্দ্রা প্রশ্ন করিল—খাব কি?

—এই বিরাট বিশ্বের বুকে দুটি প্রাণীর আহার জুটবে না?

—বনের ফলমূল খেয়ে আমি থাকতে পারবো না। রাত্রে বাঘ ডাকলে ঘুমোব কেমন করে? তার চেয়ে এখানে অনেক ভাল আছি, অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে, রাজা মহারাজার সঙ্গে খাতির আছে। এ অনেক ভাল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দেবদত্তের মুখের পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া তন্দ্রা বলিল—তুমিইবা কোন্ দুঃখে বিরাগী হবে শুনি, মহাকুমারকে বলেছি, তিনি তোমাকে শীঘ্র চরণাদ্রির মণ্ডলেশ্বর করে দেবেন।

দেবদত্তের মন বিষাইয়া ওঠে, মনে হয় বলে যে মহাকুমারের কাছ হইতে সে কোন অনুগ্রহ লইবে না, কিন্তু তন্দ্রার মুখের পানে তাকাইয়া সে কোন কথা বলিতে পারে না।

প্রতি রাত্রে দেবদত্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সন্ধ্যার আসরে মহাকুমারের মনস্তুষ্টির জন্য সে আর বাঁশী বাজাইবে না, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় তন্দ্রার নাচগানের আসরে যথা-রীতি সে উপস্থিত থাকে। তন্দ্রা গান ধরিলে সে বাঁশী না বাজাইয়া পারে না।

এইভাবেই কাটিতে থাকে।

একদিন সন্ধ্যায় মহাকুমার আসিয়া তন্দ্রার হাতে এক-খানি পত্র দিলেন, বলিলেন—এই নাও, এবার খুসি হলে তো?

তন্দ্রা পত্রখানি পড়িল। মগধ সম্রাটের স্বাক্ষরিত নিয়োগ পত্র। চরণাদ্রি দুর্গাধিপের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সম্রাট সেখানে চরণাদ্রির ভূতপূর্ব্ব দুর্গাধিপ স্বর্গীয় রবিদত্তের পুত্র শস্ত্রবিদ দেবদত্তকে নিয়োগ করিয়াছেন। তন্দ্রা পত্রখানি দেবদত্তের হাতে দিল, বলিল—আজ থেকে তুমি চরণাদ্রির দুর্গাধিপের মর্য্যাদা লাভ করলে।

দেবদত্ত নিয়োগ পত্রটি পড়িল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

মহাকুমার বিদায় লইবার পর তন্দ্রা বলিল—কাল প্রত্যুষেই তুমি তাহলে বেরিয়ে পড়।

দেবদত্ত বলিল—তুমিও আমার সঙ্গে চল।

—তা হয় না—তন্দ্রা বলিল—একজন নগরবধূকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চরণাদ্রির তরুণ দুর্গরক্ষকের সুনাম নষ্ট হবে।

—কিন্তু আমি তো তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না।

—ভুল করো না। সম্মান ও প্রতিপত্তি মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেয়। প্রতিষ্ঠার সুযোগ কখনও অবহেলা করতে নেই। আমি তো এখানেই রইলাম, তুমি যখনই আসবে, তখনই তো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাছাড়া আমি এখানে থাকতে চাই, মহাকুমারকে খুসি রেখে আমি তোমাকে আরো উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, চরণাদ্রির দুর্গরক্ষকের পদ তার ভূমিকা মাত্র। আমি তোমাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

কথাটা শুনিলে অপরে হয়ত উল্লসিত হইত, কিন্তু দেবদত্তের উল্লাস হইল না। তন্দ্রা মহাকুমারকে খুসি রাখার জন্য এখানে থাকিয়া যাইবে, মহাকুমারের বিপুল সম্পদ তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছে, দরিদ্র দেবদত্ত তাহার অবহেলার পাত্র। দেবদত্তের সুরজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু মহাকুমারের বিত্ত তাহার চেয়েও লোভনীয়। দেবদত্তের অন্তরে ঈর্ষার বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, মুখে সে কিছু বলিল না।

তন্দ্রা বলিল—কাল প্রত্যুষেই বার হবার ব্যবস্থা কর, আমি তোমাকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসবো। আমি নৌকোর ব্যবস্থা করতে এখনই লোক পাঠাচ্ছি।

তন্দ্রা চলিয়া গেল, দেবদত্ত অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে অলিন্দের একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এক আকাশ জ্যোৎস্না বাগানের গাছগুলির মাথায় ঝরিয়া পড়িতেছে। পাতার ফাঁক দিয়া নীচে পড়িয়া মাটির বুকে আলো-ছায়ার আলপনা আঁকিয়াছে। দেবদত্ত বাঁশীটি মুখে তুলিয়া লইল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবদত্ত বাঁশী বাজাইয়াছিল, সেই কারণে প্রত্যুষে তাহার ঘুম ভাঙে নাই। তন্দ্রা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া দেবদত্ত তন্দ্রার হাত ধরিয়া ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকা প্রস্তুত ছিল, দু'জনে নৌকায় আসিয়া উঠিল। দেবদত্ত বলিল—আবার কবে কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে তন্দ্রা জানি না, তোমায় ছেড়ে যেতে মন চায় না।

দেবদত্ত তন্দ্রার একখানি হাত দু'হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তন্দ্রা চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—এবার আমি যাই।

কিন্তু ফিরিয়া দেখিল নৌকা তট ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়াছে। তন্দ্রা বলিল—একি? আমি নেবে যাব যে!

দেবদত্ত হাসিয়া বলিল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে তন্দ্রা

—না না, তা হয় না।

—তাই হবে তন্দ্রা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারবো না।

—তুমি ভুল করছ দেবদত্ত।

—ভুল আমি করিনি তন্দ্রা, আমি চরণাদ্রির দুর্গে দিন গুণবো আর তুমি এখানে মহাকুমারের মনোরঞ্জন করবে সে আমি সইতে পারবো না।

—সব দিক থেকে বিচার করে দেখ দেবদত্ত, তোমার মঙ্গলের জন্যই—

—আমার মঙ্গল আমি তোমার চেয়েও কম বুঝি না তন্দ্রা।

—তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি চরণাদ্রির দুর্গরক্ষক।

—তোমাকে ছেড়ে আমি চরণাদ্রির দুর্গরক্ষক হতে চাই না।

—কিন্তু আমি যদি তোমার সঙ্গে না যাই?

—এখন আর ফেরার পথ নেই, যা করতে হয় চরণাদ্রি পৌঁছে করো।

সহসা তন্দ্রা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—আমি চরণাদ্রি যাব না, আমি এখান থেকেই ফিরবো। মাঝি, নৌকা তীরে ভেড়াও।

—না, নৌকা চলুক।

—কী! তুমি আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাও!

—হ্যাঁ।

—তবে শোন দেবদত্ত; আমি তোমাকে ভালবাসতাম,

কিন্তু এখন আমি তোমাকে ঘৃণা করি—ঘৃণা করি—ঘৃণা করি। মহাকুমারের মন তোমার চেয়ে অনেক উদার, আমি তাকে ভালবাসি। তুমি তো একজন ভিখারী মাত্র, তুমি কি নিজেকে মহাকুমারের সমকক্ষ মনে কর।

—তাই তুমি তাকে ভালবাস, না?

—হ্যাঁ তাই। আমি মহাকুমারকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

দেবদত্ত সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—'তবে মর'—বলিয়া নৌকা হইতে এক ঝটকায় তন্দ্রাকে জলে ফেলিয়া দিল।

মাঝি চমকিয়া উঠিল, ডাকিল—বাবু!

—কিছু না, চালাও।

তথাপি মাঝি বলিল—বাবু!

—চালাও।

নদীতে জোয়ার ছিল। তন্দ্রা সেই যে ডুবিল, আর ভাসিল না। দেবদত্ত কিছুক্ষণ নদীর স্রোতের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মহাকুমারের নিয়োগ পত্রটি বাহির করিয়া কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল, তারপর বলিল—মাঝি নৌকা তীরে ভেড়াও।

—চরণাদ্রি যাবেন না বাবু?

—না।

নৌকা তীরে আসিয়া ভিড়িল। দেবদত্ত তীরে নামিয়া প্রত্যুষের আবছায়ায় পথ চলিতে সুরু করিল। তাহার মাথার মধ্যে চন্‌চন্‌ করিতেছিল। রাগের বসে সে যাহা করিয়াছে তাহার জন্ম তাহার মন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কয়েকটা দিন সে স্নানাহার করিতে পারিল না, শুধু পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে আসিয়া পড়িল বিন্ধ্যাচলের গঙ্গাতীরে। জ্যোৎস্না রাত্রি। গঙ্গার তটে বসিয়া আনমনে সে বাঁশী বাজাইতেছিল। কোন এক সময় তাহার চোখে পড়িল নদীর কিনারে একটি গাছের আড়ালে কাহাকে যেন দেখা যাইতেছে। কাছে আসিয়া সে চমকিয়া উঠিল, একটি নারীদেহ তীরে আসিয়া লাগিয়াছে। কাপড়ের রং দেখিয়া সে বিকল হইয়া পড়িল। একটি ঢেউয়ের ধাক্কায় দেহটি ঘুরিয়া গেল। কাণে রক্তাভ চুনীর কুণ্ডল টল্‌টল্‌ করিয়া উঠিল। গলার মুক্তার মালা চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিল। অভিভূতের মত সেই মৃতদেহের পানে তাকাইয়া দেবদত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দেবদত্ত সেই মৃতদেহের পাশে বসিয়া পড়িল। তারপরেই তাহার বাঁশীর সুর আকাশ বাতাসে মূর্চ্ছনা তুলিল।

জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গাতীরে গাছতলায় তন্দ্রার মৃতদেহের পাশে দেবদত্তের বাঁশী বাজিতেই লাগিল। একটা ক্ষীণ ক্রন্দনের সুর চারিপাশে মূর্চ্ছনা তুলিল। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে সেই সুরের রেশ এ পারের পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া ওপাশের বালুচরে প্রতিধ্বনি তুলিল। নিথর নিস্পন্দ নিস্তব্ধ রাত্রি, সুরের ব্যঞ্জনায় যেন সজীব হইয়া উঠিল। দেবদত্তের বাঁশী বাজিয়াই চলিল।

কখন বাঁশী থামিল জানি না। দেখিলাম দেবদত্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। সোজা নদীর পথ ধরিয়া সে চলিয়া গেল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথাভরা চুল—নদীর সীমান্তে কখন হারাইয়া গেল।……

চমকিয়া উঠিলাম। মুখের উপর রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা দুজন গাছটায় হেলান দিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। এতক্ষণ কি তাহা হইলে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

কিন্তু তাহার পর আর যে কয়দিন বিন্ধ্যাচলে ছিলাম, মধ্যরাত্রে সে বংশীধ্বনি আর শুনি নাই।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ভূমিকা

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ভূমিকা ॥

"Assamese prose literature developed to a stage in the far distant sixteenth century, which no other literature of the world reached except the writings of Hooker and Latimer in England.......The Katha Gita shows clearly that Assamese literature developed to a standard in the sixteenth century which the Bengali language reached only in the time of Iswarchandra and Bankimchandra."

এ উক্তি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের। গদ্যসাহিত্য সম্পর্কেই যখন এটা প্রযোজ্য, প্রাচীন পদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা সহজেই অনুমেয়। অসমীয়া পদ্যসাহিত্যের জন্ম ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে—সেটাকে অসমীয়া সাহিত্যের 'গীতি যুগ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ঘুমপাড়ানী গান, গাথা কবিতা, বারমাসী গীত, বিহুগীত, ডাকের বচন ইত্যাদি এ যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। দ্বিতীয় যুগ 'মন্ত্র আরু ভণিতার যুগ'—লিখিত সাহিত্যের জন্ম এই যুগে। এর পরের যুগ প্রাক-বৈষ্ণবযুগ। এই যুগের সুরু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। কবি হেম সরস্বতী, মাধব কন্দলী ও পীতাম্বর দ্বিজ এই যুগের লেখক। হেম সরস্বতীর 'প্রহ্লাদ-চরিত' প্রাচীন অসমীয় সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পুরাণ, রামায়ণ ইত্যাদির অনুবাদে এই যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ। শঙ্কর দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব যুগের সুরু—প্রাচীন সাহিত্যের সমৃদ্ধতম অধ্যায় এই বৈষ্ণব যুগ। শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। রামানুজের বৈষ্ণববাদকে আশ্রয় করে ইনি বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেন। সমাজ এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযানের ফলে সাহিত্যেও নতুন প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। শুধু সমাজ-সংস্কারক নয়, কাব, নাট্যকার, সুরকার ও ভাগবতের অনুবাদক হিসেবেও শঙ্করদেবের নাম স্মরণীয়। শঙ্করদেবের পরবর্তী যুগকে বলা হয়ে থাকে বিস্তারের যুগ—এই যুগের প্রধান অবদান 'বুরঞ্জী সাহিত্য'। অহমরাজ ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের বংশেতিহাস নিয়ে এই সাহিত্য রচিত। ইতিহাস বুরঞ্জী সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হলেও এর সাহিত্যমূল্যও বড় কম নয়। আধুনিক অসমীয় গদ্যের বিকাশে বুরঞ্জী সাহিত্যের ভূমিকা যথেষ্ট। 'বুরঞ্জী সাহিত্য'কে ভিত্তি করে আধুনিক যুগে বহু নাটক, উপন্যাস, জীবনচরিত ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হয় ১৮২৬ সালে। এবং এই বছরকেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের জন্মকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের গোড়ার দিকে অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য সরকারী অনুগ্রহ লাভ দূরে থাকুক, রীতিমত উপেক্ষিতই হয়েছিল। এর কারণ বহুবিধ। তবে প্রধানতম কারণ, মনে হয়, সরকারী শাসনযন্ত্রে বাঙালি-প্রাধান্য। ১৮৩৬ সালে আসামের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হয়। শুধু অফিস-আদালতে নয়, শিক্ষারও মাধ্যম হয়ে ওঠে বাংলা।

বিদেশী সরকার নিজেদের স্বার্থের খাতিরে অসমীয়া ভাষাকে বাতিল করলেও বিদেশী মিশনারীরা কিন্তু নিজেদের গরজেই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে হলে তাদের মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই মিশনারীদের উদ্যোগে প্রাক-ইংরেজ ১৮১৯ সালে 'নিউ টেষ্টামেন্ট' এবং ১৮৩৩ সালে বাইবেলের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যের জন্যে এই অনুবাদের আসল উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে। বই দুটি মোটেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

মিশনারীরা তবু হাল ছাড়লেন না, বাংলা সরকারী ভাষা হওয়া সত্ত্বেও না। অসমীয়া ভাষার প্রতি তাঁদের এই মমতার মূল কারণ যাই হোক, এর অকৃত্রিমতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যের মত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যেরও জন্ম বিদেশী মিশনরীদের হাতে। ১৮৪৬ সালে শিবসাগর থেকে একদল মার্কিন মিশনারী 'অরুণোদয় সংবাদপত্র' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল পত্রিকাটির বিঘোষিত উদ্দেশ্য। এই 'অরুণোদয়'ই অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা। অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় 'অরুণোদয়'কে কেন্দ্র করে মাতৃভাষার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন আসামের রাজা রামমোহন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তারই ফলে ১৮৭২ সালে সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলা বাতিল হয়ে যায়।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বড়ুয়া ও হেমচন্দ্র বড়ুয়া—এ যুগের তিন প্রতিভাধর পুরুষ, শক্তিশালী লেখক। তিনজনেই নতুন শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত, সামাজিক-ধর্মীয় সর্ববিধ কুসংস্কারের তীব্র বিরোধী। স্বল্পায়ু আনন্দরাম প্রধানতঃ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে এঁর দান যথেষ্ট রয়েছে। হেমচন্দ্র সব্যসাচী লেখক, বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক নাটক-প্রহসন ও টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে এঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। হেমচন্দ্রের 'কানিয়ার কীর্ত্তন' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক—এতে আফিঙ সেবনের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন নাটক ও প্রহসনের মধ্যে দিয়ে ইনি সামাজিক দুর্নীতি ও ভণ্ডামীকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। 'হেমকোষ' অভিধান এঁর আর এক অক্ষয় কীর্ত্তি। গুণাভিরাম হেমচন্দ্রের বন্ধু, কিন্তু এঁর মেজাজ আলাদা। ইনি ছিলেন মানবতাবাদী দরদী লেখক। গুণাভিরাম-রচিত আনন্দরামের জীবনী সাহিত্যরসসমৃদ্ধ একটি হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে গুণাভিরামই পাশ্চাত্য রীতিতে ইতিহাস ও জীবনী রচনার সূত্রপাত করেন। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে লিখিত এঁর 'রামনবমী' নাটকটির আদর আজও হ্রাস পায়নি। 'আসামবন্ধু' নামে ইনি একটি মাসিক পত্রিকাও বার করেছিলেন। সমসাময়িক তরুণ লেখকদের অগ্রজস্থানীয় ছিলেন গুণাভিরাম।

বাংলা ভাষার প্রতি অসমীয়াদের বিরাগ ছিল প্রথম থেকেই। এ বিরাগ অভিমানপ্রসূত। কারণ, মাতৃভাষার অবিসংবাদী মর্য্যাদা ব্যাহত করে জোরজবরদস্তি তাদের উপর বাংলা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই দেখি বাংলা-বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের আত্মবিকাশের আন্দোলন সুরু। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা দূরে যাক, বাংলা সাহিত্যই ছিল তাদের প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলার এই ঋণ অসমীয়ারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন: "পশ্চিমীয়া লিখা আমার দেশলৈ নিজব্বি আছে যাই কৈ ইংরাজী ভাষায় জরিয়তে। কাজেই নতুন ধরণর এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙালী লিখক সকলকো উদ্বুদ্ধ করিলে। আমার দেশত প্রভাব আছে বংলারো, ইংরাজীরো।" (১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)।

॥ 'জোনাকি'র যুগ ॥

বাংলা সাহিত্যের দ্বারা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য কি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল, 'জোনাকি'র যুগ সম্পর্কে আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে। 'অরুণোদয়'-পরবর্ত্তী যুগে যে সব পত্রিকা অসমীয়া সাহিত্যে নতুন যুগের নির্ম্মাণে সহায়তা করে তার মধ্যে 'আসাম-মিহির', 'আসাম-বিলাসিনী', 'আসাম-দীপক', 'আসাম-দর্পণ', 'আসাম-বন্ধু' ও 'জোনাকি'র নাম উল্লেখযোগ্য। আবার এদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আসন 'জোনাকি'র। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, বাংলা সাহিত্যের সে-এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কলকাতা তখন সারা ভারতের সংস্কৃতিকেন্দ্র। কলকাতার কলেজে পড়তে এসে কয়েকজন অসমীয়া যুবক নতুন বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন—কলকাতা থেকে তাঁরা বার করলেন অসমীয়া

পত্রিকা 'জোনাকি'। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে নবজাগৃতির স্রষ্টা এই 'জোনাকি'। প্রচলিত ধ্যানধারণার স্থানে নতুন জীবনদর্শন ও নতুন মূল্যবোধের রূপায়ণে 'জোনাকি' সাহিত্যজগতে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে। এতদিন সাহিত্য যেন বিপরীতমুখী দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ছিল—প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য ও নতুন খৃস্টান সাহিত্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে 'জোনাকি' আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও আসামের তরুণ সম্প্রদায় পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে এক নতুন সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই প্রথম সাহিত্যকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করার প্রয়াস দেখা যায়, সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তির বাণী ঘোষিত হয়। দেশে নতুন করে একটি সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক শ্রেণী গড়ে ওঠে।

'জোনাকি'র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনজনের নাম স্মরণীয়: লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামী। সাহিত্যের হেন শাখা নেই যাতে লক্ষ্মীনাথের প্রতিভার স্বাক্ষর অনুপস্থিত। ইনি আসামের সাহিত্যসম্রাট নামে পরিচিত। দর্পণের মত আসামজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। সনেট, গীতিকবিতা, গাথাকাব্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক-প্রহসন, রসরচনা, প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনা—এককথায় সাহিত্যের সর্বশাখায় লক্ষ্মীনাথ ছিলেন অবাধগতি। জীবনের অধিকাংশ সময় হাওড়া ও সম্বলপুরে অতিবাহিত করেও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ইনি মাতৃভূমির সেবা করে গিয়েছেন আজীবন। 'চিত্রাহরণের সংসার চিত্র', 'দণ্ডিনাথের ফুল', 'সাধনা', 'সুরভি', 'কৃপাবর বড়ুয়ার ওভতনি', 'কদমকলি' ও 'পদ্মকুমারী' লক্ষ্মীনাথের বিশিষ্ট গ্রন্থ। এঁর 'অ মোর আপোনার দেশ' আসামের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে আজও পরিগণিত। ছন্দমধুর মনোরম গীতি-কবিতা রচনাতেও ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত:

"াক কাম দীঘল মেঘ বরণীয়া সাগরর টউ চুলি
প্রেম পগলার হৃদয় তরণী বুরি পায় গই তলি
মৃণাল দুবাহু কি কাম সাধিব মত্ত প্রণয়ীর ডোল
হিহি মউমাত বিম্বাধর বাঁহী বান্ধি করি মুঠভেঙ্গ।"

ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে লক্ষ্মীনাথের 'অসমীয়া জাতি ডাঙর জাতি'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

"আমার নাই কি? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে...... অসমীয়া শেক্সপিয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব রম আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে।...বিলাতত টেমচ্ আমাত দিখৌ, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও।...সেইবাবে পাহরে যে অসমত ভূঁইকপ আছে। আরো কয় অসমীয়ার টকা নাই—অসমীয়া মানুহ মৌন মূর্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্তচর্চা বরাই অনর্থর গুটি সিঁচিব। কারণ অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।" লক্ষ্মীনাথ প্রমুখ 'জোনাকি'-গোষ্ঠীর লেখকরা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের সাহিত্যিক মানস গঠন করেছিলেন সত্যি, কিন্তু বলে বিদেশের ব্যর্থ অনুকরণের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেননি। প্রাচীনের কুসংস্কার ও আধুনিকের মুখোস-আঁটা ভণ্ড দিকে তাঁরা সমভাবেই আক্রমণ করেছেন। নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় এঁরা উদ্বুদ্ধ। ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্স'-এর অনুসরণে লিখিত লক্ষ্মীনাথের 'কৃপাবর বড়ুয়ার ওভতনি'র নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ছিলেন মূলত রোমান্টিক কবি। এঁর কবিতাবলী ভাবসম্পদে যেমন সমৃদ্ধ, তার প্রকাশভঙ্গি তেমনই সাবলীল। শব্দ-যোজনার নিপুণতায় ও ছন্দমাধুর্যে একে বৈষ্ণব গীতিকবিদের সমকক্ষ বলা হয়ে থাকে:

গলত হীরক খোপাত মাণিক হাঁহিত মুকুতাপান্তি
নীলোৎপল হাতে, চরণর পাশে শঙ্কর ধরল শান্তি।
('জলকুঁবরী'—কাব্য)

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতির মধ্যেও তিনি এক প্রাণময় সত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন। শুধু চন্দ্রকুমার নয়, এই গোষ্ঠীর সব কবিরই এ একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য কারণ, ইংলণ্ডের রোমান্টিক কাব্য পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের অনুসারী ছিলেন এঁরা। দেবতার স্তুতির বদলে চন্দ্রকুমার

মানুষকে বসিয়েছিলেন দেবতার আসনে। এঁর 'তেজিমলা' কাব্যে মানুষেরই জয়গান ঘোষিত। আর মানুষকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবেসেছেন মাতৃভূমিকে, মাতৃভূমির দুর্দশায় মন তাঁর আর্তনাদ করে উঠেছিল :

কি আছে তোমার অসমীয়া ভাই
ধন মান জ্ঞান পেলালা কত
কি দি পুজিবা জগতীচরণ
মিচিন্তা উপায় শ্রী হল গত।

চন্দ্রকুমারের রচনার পরিমাণ খুব বেশি নয়, প্রাচুর্যের চেয়ে গভীরতার দিকেই এঁর দৃষ্টি ছিল সমধিক। 'জোনাকি'র ইনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ।

হেমচন্দ্র গোস্বামী আমৃত্যু-মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। অসমীয়া সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য—সার্থক গীতিকবিতা ও সনেট রচয়িতা, অনুপম গদ্যের স্রষ্টা। রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে এঁর আবির্ভাব ঘটলেও পরবর্তীকালে সাহিত্য-সংক্রান্ত গবেষণাতেই ইনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 'অসমীয়া সাহিত্যর চানেকী'র প্রণেতা এবং হেমবড়ুয়ার বিরাট কীর্তি 'হেমকোষ'-এর সুযোগ্য সম্পাদক হিসাবে এঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটী কয়েক খণ্ডে বিভক্ত ও কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত। লেখকের বিপুল পাণ্ডিত্য, নিপুণ সমালোচনা প্রতিভা, অসীম ধৈর্য্য ও অপরিসীম পরিশ্রমের স্বাক্ষর এই বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়। প্রাচীন পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কেও ইনি প্রচুর গবেষণা করেন। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে হেমচন্দ্র-সংগৃহীত বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

॥ আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ॥

'জোনাকি' যে নতুন সাহিত্যাদর্শ তুলে ধরে, পরবর্তী যুগের লেখকরা তারই অনুগামী। 'জোনাকি'র পরে যে সব পত্রিকা নতুন সাহিত্য-আন্দোলনে সহায়তা করেছিল তাদের মধ্যে 'বহ্নি', 'আলোচনী', 'অসমীয়া', 'আহ্বান', 'জয়ন্তী' ইত্যাদির নাম করা যায়। ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ লেখকই 'জোনাকি'র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

ভোলানাথ দাস এই সময়কার এক শক্তিশালী কবি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রভাবে ইনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। মধুসূদনের মত দৈববাদের বিরোধিতায় ও ব্যক্তি-মহিমার সোচ্চার ঘোষণায় এবং হেমচন্দ্রের মত অকৃত্রিম দেশ প্রেমের বেদনার্ত প্রকাশে এঁর কবিতা কালজয়ী। মধুসূদনের কাব্যরীতিও ইনি গ্রহণ করেছিলেন :

সে হি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় অকিঞ্চন
অমিত্র অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগদেবি
যে ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে—অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি।

('সীতাহরণ কাব্য')

হেমচন্দ্রের 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'এর প্রেরণায় ইনি লিখলেন :

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত

* * *

নাই বিদ্যাগুণ	শিল্পে অনিপুণ
নামমাত্র কৃষি	বাণিজ্য নাই
নাই উদারতা	নাই সহিষ্ণুতা
নাহিক মমতা	পরোপকারিতা
আছে অহিফেন	চিরদরিদ্রতা
ছি ছি অসমীয়া,	উঠা উঠা উঠা
চির নিদ্রা এড়ি	মেলা চক্ষু দুটা।

'জোনাকি'র নতুন সাহিত্যাদর্শ যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনেও সহায়তা করেছিল তাতে সন্দেহ কি।

এ-যুগের আরেকজন শক্তিধর কবি রঘুনাথ চৌধুরী। ইনি মূলতঃ প্রকৃতির কবি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মন্ত্রশিষ্য। 'কেতেকী', 'সাদরী', 'দহিকতারা' ইত্যাদির স্রষ্টা হিসেবে ইনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'কেতেকী' লীরিকধর্মী একটি দীর্ঘ কবিতা—ইংরেজি 'নাইটএঞ্জেল'-এর সার্থক অসমীয়া সংস্করণ। 'জয়ন্তী' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও রঘুনাথ বার করেন। অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী এ সময়কার শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কবি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অম্বিকা-

গিরি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উত্তেজনাময়ী দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে সারা দেশে ইনি একটা প্রবল আলোড়নের সঞ্চার করেন। দুর্গেশ্বর শর্মার কবিতাবলী অতিরিক্ত দার্শনিক ভাবাপন্ন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখে হিতেশ্বর বারবড়ুয়া ও চন্দ্রধর বড়ুয়াও এযুগে খ্যাতি অর্জন করেন। তবে প্রথমোক্ত জন অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সার্থক সনেট শিল্পী হিসেবে।

তিরিশ দশকে অসমীয়া সাহিত্যে কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটে। কাব্যক্ষেত্রে নতুন সুর নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আভাব পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা। 'ওমর খৈয়াম'-এর অনুবাদকার। ইনি 'ওমর খৈয়ামে'র কবি নামে পরিচিত হন। কিন্তু, শুধু কৃতি অনুবাদক ইনি নন, মৌলিক কবিপ্রভারও অধিকারী। অসমীয়া সাহিত্যে প্রথম সার্থক গদ্যকবিতার স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ। এঁর গীতিকবিতাও অনুপম। 'আপোন সুর' 'কথাকবিতা' এঁর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ। রহস্যবাদী কবি হিসেবে নলিনীবালা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীবালা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এঁর 'খপোনর সুর' ও 'সন্ধিয়ার সুর'-এ অতীন্দ্রিয়-আকুতির আবেগাকুল বেদনার ধ্বনি অনুরণিত। একটি বিখ্যাত দেশপ্রেমমূলক কবিতার জন্তেও ইনি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রেমের কবিতা লিখে এ সময় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন গণেশচন্দ্র গগৈ। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি ছিলেন গগৈ, অকালে মারা না গেলে হয়ত শ্রেষ্ঠতমের সম্মানলাভ করতেন। এঁর 'পাপরী' কাব্যগ্রন্থে যে নতুন ও অভিনব রূপকল্পের সন্ধান মেলে অন্যত্র তা দুর্লভ। এ সময়কার কবিতার আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেশপ্রেম। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রভাবে একদল কবি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন, আর তাঁদের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে সারা দেশ। এই দলের কবিদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শৈলধর রাজখোয়া ও বিনন্দচন্দ্র বড়ুয়া।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসামের সমাজজীবনে মহা সংকটের সৃষ্টি করে। সেই সংকটের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও অর্থনৈতিক কারণে বইপত্রের প্রকাশ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ থেকে লেখকরা বঞ্চিত হন; তাই তেমন উল্লেখযোগ্য নতুন কোন কবি প্রতিভার সন্ধান অতি আধুনিক অসমীয়া কাব্যে মিলবে না। তবু এঁদের ভিতর অমূল্য বড়ুয়ার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পরম পরিতাপের বিষয় কলকাতায় যোলই আগস্টের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার অবসানে এই তরুণ প্রতিভার শোচনীয় জীবনাবসান ঘটে 'বেদুইন'-এর কবি আবদুল মালিকের ওপর প্রথমে অনেক আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং তিনি কাব্যরসিকদের নিরাশ করেছেন। 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'য় বহু আধুনিক রুচির সাক্ষাৎ মেলে সত্যি, পুঁজিবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদি মোগসম্ভব সমস্যাবলী নিয়ে রচিত কবিতাও তাতে প্রচুর রয়েছে, নতুন নতুন কাব্য আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও অন্ত নেই—কিন্তু রসোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গি যাই হক, কবিতা লিখতে হলে যে কাব্যের কতকগুলি প্রাথমিক দাবি মেটাতে হয়, মেটাতেই হয়—অতি আধুনিক কবিরা আজো সে সম্পর্কে পুরোপুরী ওকীবহাল হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয় না। কিংবা হয়ত ওকীবহাল, কিন্তু সার্থক সম্ভব করার সাধ্য নেই।

॥ আধুনিক কথাসাহিত্য ॥

আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রথম উপন্যাস লেখেন লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এঁর উপন্যাসের নাম 'পদ্মকুমারী'। উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মকুমারী' সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। রূপশিল্পী লক্ষ্মীনাথের চেয়ে কবি লক্ষ্মীনাথের প্রকাশই 'পদ্মকুমারী'তে অধিকতর স্পষ্ট।

এ সময়কার খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া। এঁর 'ভানুমতী' গত শতাব্দীতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতার কাছে বইটির দাম থাকলেও আজকের পাঠকের কাছে

এর তেমন কোন আবেদন নেই। পদ্মনাথেরই প্রায় সমসাময়িক লেখক রজনীকান্ত বরদলৈ। এঁকেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা যায়। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে ইনি প্রভাবিত হন। 'মিরি-ঝিয়রী' (মিরিকুমারী) 'মনোমতী' এঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে বিখ্যাত। অর্থহীন ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ইনিই প্রথমে রক্তমাংসের সজীব চরিত্র সৃষ্টি করেন। 'মিরি-ঝিয়রী'তে প্রকৃতির পটভূমিকায় দুটি উপজাতীয় তরুণ তরুণীর প্রেমের যে বিষাদান্ত কাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন, তা সার্থক রোমান্সের পর্য্যায়ে উন্নীত। 'মনোমতী' বর্মী অভিযানের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যর্থ প্রতিরোধের কাহিনী। অবশ্য মূলত 'মনোমতী'ও রোমান্সের পর্য্যায়ভুক্ত। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন ঐতিহাসিক ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলার দুরূহ ক্ষমতা ছিল রজনীকান্তের।

পরবর্ত্তীকালে যাঁরা ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে দৈবচন্দ্র তালুকদার ও দণ্ডীনাথ কলিতার আসন সকলের আগে। সমসাময়িক সমাজ-জীবন এঁদের উপন্যাসের উপজীব্য। বিশেষ করে, স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টিতে এঁরা দুজনেই পারদর্শী। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পই এ যুগে অধিকতর সমৃদ্ধি অর্জ্জন করে। শরৎচন্দ্র গোস্বামী, লক্ষীধর শর্ম্মা, রমা দাস, বীণা বড়ুয়া প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বেণুধর রাজখোয়া কয়েকটি সামাজিক ও অতুলচন্দ্র হাজারিকা অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক লিখেছেন। তবে এক্ষেত্রে অতুলচন্দ্রের চেয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন 'শোণিত কুঁয়রী'র লেখক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। প্রগতিশীল কবি, নাট্যকার সাংবাদিক, চিত্রকর ও সুরকার জ্যোতিপ্রসাদের অকাল বিয়োগ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করেছে। লোক-সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন করে সঙ্গীতক্ষেত্রে ইনি এক নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে মিত্রদেব মহান্ত ও রোমান্টিক নাটক-রচনায় কীর্ত্তিনাথ বরদলৈর নাম করা যায়। সংস্কৃত ও কয়েকটি ইংরেজী নাটকের অনুবাদেও আধুনিক অসমীয়া নাট্য সাহিত্য সমৃদ্ধ।

কিন্তু রজনীকান্তর উপন্যাস এবং হেমবড়ুয়া ও গুণাভি রামের নাটকের মধ্যে একদা যে সম্ভাবনার আভাষ দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত তা পুরোপুরী সফল হয়ে উঠতে পারেনি—আধুনিক কথাসাহিত্যে উপরি উক্ত লেখক-লেখিকাদের দান স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতেই হবে। এঁরা মোটামুটি ভাবে গল্প বলে গেছেন, জীবন্ত চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু যুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গী, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং আঙ্গিকগত কলানৈপুণ্যের সার্থক পরিচয় কেউ দিতে পারেন নি। তাই বিদগ্ধজনের মনের ক্ষুধা মেটেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কথাসাহিত্যে এক নতুন যুগের উন্মেষ দেখা যায়। মোহাম্মদ পীয়ারের 'সংগ্রাম' ও 'হেরোয়া স্বর্গ', রাধিকামোহন গোস্বামীর 'চকনাইয়া' ও নবকান্ত বড়ুয়ার 'কপিলিপারিয়া সাধু'-কে সত্যিকারের আধুনিক উপন্যাসের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা চলে। আজকের সমাজজীবন ও সমস্যাবলী এই লেখকরা নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকসমাজের বাস্তবধর্ম্মী জীবনচিত্র হিসেবে শেষোক্ত বইটি উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পে আধুনিক কালে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন আবদুল মালিক, যোগেশ দাস ও বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। গভীর মানবতাবোধ এঁদের রচনার প্রাণ-প্রেরণা। সৌরভ চালিহার গল্পে একটি রুচি মার্জ্জিত সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় স্পষ্ট। তবে, আঙ্গিক সম্পর্কে সেই পুরণো অভিযোগ আজও প্রযোজ্য। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে নজর যত তীক্ষ্ণ, তার শিল্পায়নের প্রতি ততখানি যত্নবান কথাশিল্পীরা নন।

গল্প-উপন্যাসের মত নাটকের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে আগেকার পৌরাণিক নাটকগুলির কদর আর নেই। দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী সমস্যামূলক সামাজিক নাটক লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন প্রবীণ বড়ুয়া ও সারদা বরদলৈ। প্রবীণ ফুকনের ঐতিহাসিক নাটক 'মনিরাম দেওয়ান'

আধুনিক অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের এক স্মরণীয় অবদান বলে গণ্য। হাস্যরসাত্মক নাটকের অভাব কথঞ্চিৎ মিটিয়েছেন কুমুদ বড়ুয়া।

॥ অন্যান্য ॥

অসমীয়া গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, ভট্টদেবের 'কথাগীতা' ষোড়শ শতাব্দীর অসমীয়া গদ্যের নিদর্শন। অবশ্য অসমীয়া গদ্যের জন্ম ষোড়শ শতাব্দীরও আগে, তবে, সাহিত্যিক গদ্য তাকে বলা যায় না। আধুনিক কালে প্রবন্ধসাহিত্যে সাহিত্যরসাশ্রিত গদ্যের প্রবর্তক সত্যনাথ বরা। তারপর অনেক লেখকই সত্যনাথের গদ্যরীতির অনুসরণ করেছেন। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট গদ্যলেখকদের মধ্যে ডাঃ বাণীকণ্ঠ কাকতি, উপেন্দ্রনাথ লেখারু ও ডিম্বেশ্বর নিওগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসামের ইতিহাস এবং অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন ডাঃ সূর্য্যকুমার ভূঞা ও ডাঃ বাণীকণ্ঠ কাকতি। এ যুগের অন্যান্য কৃতি গদ্য-লেখক হরমোহন দাস, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, রাজমোহন নাথ, কেশব নারায়ণ দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রৈলোক্য গোস্বামী, তীর্থনাথ শর্মা, বেণুধর শর্মা, কালীরাম মেধী ইত্যাদি। বহু মুসলমান লেখকের দানেও আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মওলবী মফিজুদ্দীন হাজারিকা, খান বাহাদুর আতোয়ার রহমান, খান বাহাদুর সৈয়দুদ্দিন আহমদ, ডাঃ মহিচুল ইসলাম বরার নাম করা যায়। অসমীয়া সাহিত্যের ফার্সীর প্রভাব সম্পর্কে ডাঃ বরার গবেষণা অতিশয় মূল্যবান।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কারণে সুবিপুল প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিককালে অসমীয়া সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ ঘটেনি। পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় পুস্তক প্রকাশনও লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গড়ে ওঠেনি। কিছুদিন আগেও তাই অনেক লেখককে নিজেদের খরচে বই প্রকাশ করতে হত। দরিদ্র লেখকদের বই অপ্রকাশিত থেকে যেত। রাজনীতির প্রতি জনসাধারণের যে পরিমাণ আগ্রহ ফুটে উঠেছিল সাহিত্যের প্রতি সে পরিমাণ নয়। কিন্তু অধুনা পটপরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে আজ আবার এক নতুন যুগের সূচনা দেখা যাচ্ছে।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় নীলমণি ফুকন, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিম্বেশ্বর নিওগ ও দি গোস্বামীর গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। —শ. র. দ

★

এখনো সময়

শংকর চট্টোপাধ্যায়

তারপর শিশিরের কঠিন সকালে
তোমার চোখের মত আকাশের বন্ধ কপাট
খুলে যাবে, ঘাসের রঙের মত কোন পাখি
আশ্চর্য্য ছাতিমের ডালে, গান গেয়ে, শীষ ছুঁড়ে
সকালের সফেন শিশির ঠোঁটে তুলে উড়ে যাবে
দুপুরের রিক্ততার মাঠে, যেখানে সময়
বিবর্ণ মলিন এক রুক্ষ তার হাতে তালি দেয়।

কখনও নবীন ছিল, এই সব পাখির শরীর
যখন কেবল, বিকেলের চায়ে ঝিঁঝিঁ আর কোন
দুরন্ত ডাক
ঘুরে ফিরে ডেকে গেছে, আমাকেও তাদের কাছে।
এখন বুঝিবা মৃত, সেই সব তাদের শরীর
গাছ আর পাখির হৃদয়, সময়ের ধুলো দিয়ে
ঢাকা পড়ে, জীর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু তবুও
মনে হয়, এখনও সময়
ফিরে পেতে পারে সেই জীবনের অলীক অন্বয়।

ধর্ম্মঘট

শ্রীমন্মথ রায়

তৃতীয় দৃশ্য

কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রমিক-কলোনীর মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত গোলঘর। গোলঘরের উপরে চালা ও চারিধারে কেন্দ্রাকারে বাঁধানো বেদী। এখানে কথকতা, লোক-সঙ্গীত, ছোটখাটো সভাসমিতি, গল্প-গুজব প্রভৃতি হয়। এক কথায়, সর্ব্ব শ্রেণীর শ্রমিকরা এখানে আসিয়া মেলামেশা করে।

রবিবার বৈকালে জনার্দ্দন বেদীতে বসিয়া চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে হুঁকা টানিতেছে ও মাঝে মাঝে কী যেন ভাবিয়া লইতেছে। পার্ব্বতী তাহার বাসা হইতে এখানে আসিল, কিন্তু জনার্দ্দন তাহার উপস্থিতি লক্ষ্য করিল না। তখন পার্ব্বতী বিরক্ত হইয়া জনার্দ্দনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পার্ব্বতী ॥ বেহুঁস হয়ে এখানে বসে বসে হুঁকো টানলেই চলবে? মেয়ে হারিয়েছে শুক্রবার রাত্রে। আজ রোববারের রাত এসে গেল—মেয়ের কোনো পাত্তা নেই। কোন্ আক্কেলে তুমি এখনও বসে আছো! মজা দেখছো—না?

জনার্দ্দন ॥ খুঁজতে কেউ বাকী রাখেনি। ইব্রাহিম দল-বল নিয়ে—শুধু আমাদের কলোনী নয়, আশে পাশে সব জায়গায় খুঁজেছে। না পাওয়া গেলে কপালের দোষ বল।

পার্ব্বতী ॥ রাখো তোমার ইব্রাহিম। আব্দুলকে বেত-মারো, জুতো মারো—ওর টুটি চেপে ধরো। ওর মুখ থেকেই বেরুবে কোথায় আমার মেয়ে। কতো বড়ো শয়তান! আমার হয়েছে শূলবেদনা! ওকে ধর—ওকেই শূলে দাও।

জনার্দ্দন ॥ আব্দুল এর মধ্যে থাকতেই পারে না। একেবারে বাজে কথা। কতোবার তোমাদের বলবো যে, আব্দুল তখন আমার পাশেই বসে ছিল আমাদের মাঠের মিটিং-এ। তাছাড়া আব্দুলকে আমরা এতোকাল দেখে আসছি,—তার স্বভাব-চরিত্তির আমরা না জানি তা' নয়। ও সব কথা রাখো। আমার এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা নিজেই পালিয়েছে। কিন্তু কেন পালালো বুঝছি না। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার। এ নির্ব্বুদ্ধির কাজ কেন করলো?

পার্ব্বতী ॥ তা যদি পালিয়ে থাকে, তাহ'লে বলবো সে জন্যে দায়ী তুমি। মেয়েকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছিলে। দুপাতা লেখাপড়া শিখেছে বলে মেয়ে ঘর-গেরস্থালীর কাজ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় লেকচার দিয়ে বেড়ায় কার আস্কারায়? তোমার। ধাড়ী ধাড়ী ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে গান বাজনা করে, থ্যাটার করে। বাধা তো দাওনিই,—বরং তারিফ করেছো। মেয়েছেলের মাথা এতে ঠিক থাকে—ওই সোমত্ত মেয়ের? এখন হ'লো তো। মুখে চুণকালী পড়লো তো?

জনার্দ্দন ॥ বুঝছি না কোত্থেকে কী হয়ে গেলো। আমাদের ছেলে নেই সে জন্যে দুঃখ করিনি কোনো দিন। মেয়েটাই আমার ছেলের অভাব পূরণ করেছিল। কেন যে হঠাৎ তার এ দুর্বুদ্ধি হল!

পার্ব্বতী ॥ যতো ছুবু দ্ধিই থাক, আমি বলবো মেয়ে আমার পালায়নি। দোষ তার ছিল অনেক কিন্তু বাপ-মা বলতে সে ছিল অজ্ঞান। আমার মন বলছে, মেয়েকে কেউ চুরি করেছে—জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি ওঠো। বসে থাকলে আর চলবে না। থানায় যাও, পুলিশে খবর দাও। আব্দুলের পিঠে চাবুক পড়ুক। ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী হোক্। মেয়ে আবার যাবে কোথায়?

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)।

ইব্রাহিম ॥ এই যে বৌদি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আবদুল কি পরশুদিন কোনো সময়ে তোমাদের বাড়ীতে এসেছিল?

(পার্ব্বতী ইব্রাহিমের দিকে ঘৃণায় তাকাইল না, তাহার কথার উত্তরও দিল না। সে সোজা জনার্দ্দনকে বলিল,)—

পার্ব্বতী ॥ আমার যা বলার তোমায় বলেছি। ত্তে-রাত্তিরের মধ্যে আমি আমার মেয়ে চাই। নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান]

ইব্রাহিম ॥ একথা বললে বৌদিকে আমরা দোষ দিতে পারি না দাদা। দোষ আমাদেরই। একশো-বার বলবো দোষ আমাদের। আমাদের মেয়ে—আমাদের চোখের ওপর থেকে হারিয়ে যাবে? এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজ। তুমি আবার ভেবে বল দাদা, আব্দুলকে কি তুমি সেদিন ওই মিটিং-এ আগাগোড়া দেখতে পেয়েছিলে? আমি যতদূর মনে করতে পারছি, আমি তাকে প্রথমে দেখেছিলাম, কিন্তু শেষে দেখিনি।

জনার্দ্দন ॥ শেষে? (একটু চিন্তা করিয়া) শেষের কথা আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু প্রথমটায়—হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আব্দুল আমার কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল মিটিং-এর যখন একটা গোলমাল সুরু হলো, তখন তা' থামাতে আমি এগিয়ে গেলাম, তুমিও আমার সঙ্গে গেলে—হ্যাঁ,—না, তারপর তো আর দেখিনি।

ইব্রাহিম ॥ আরো কয়েকজনকে জেরা করে আমি এটা বের করেছি, শেষের দিকে মিটিং-এ ওকে কেউ দেখেনি। ওকে আমি এখানে ধরে আনতে বলেছি। ওই এসেছে—

(হারাণ, আকবর, আশু, বিশু প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক আব্দুলকে ধরিয়া লইয়া আসিল)।

আকবর ॥ কিছুতে আসতে চায় না, ধরে এনেছি।

ইব্রাহিম ॥ বটে!

আব্দুল ॥ খোদার কশম নিয়ে আমি বলছি, আমি কিছু জানি না। লণ্ঠন হলফ্ করে তোমাদের কাছে বলেছে, যে লোক সেদিন তার কাছে গিয়ে কালকের কথা বলেছিল, সে লোক আমি নই। তবু বারবার আমার ওপর এ জুলুম কেন বলতে পারো?

ইব্রাহিম ॥ রেখে দে তোর লণ্ঠন। তাকে তুই ঘুষ দিয়েছিস, তাই সে মিথ্যে কথা বলেছে।

আব্দুল ॥ এতো বড় কথা তুমি বলছো মিঞা?

ইব্রাহিম ॥ হ্যাঁ, বলছি এইজন্যে যে, আমি প্রমাণ পেয়েছি, সেদিনকার মিটিং-এ তুই প্রথমটায় ছিলি, শেষটায় ছিলি না।

হারাণ ॥ না, না, একথা সত্যি নয়। আমরা ওকে মিটিং-এ বরাবরই দেখেছি, ভাঙবার সময়েও দেখেছি। কীহে, তোমরা ভাখোনি?

আকবর ॥ না সর্দ্দার, তোমার ওকথা সত্যি নয়। মিটিং-এ আব্দুল আগাগোড়াই ছিল।

জনার্দ্দন ॥ না বাবা আব্দুল, এরা অনর্থক

তোমাকে হয়রানী করেছে। তোমাকে তো আমি জানি বাবা। তোমরা সকলে আমার মেয়েকে বোনের মতো দেখতে। কিছু মনে করো না বাবা। মায়াকে হারিয়ে আমাদের কারুর মাথার ঠিক নেই। যাও বাবা, যাও—কাজে যাও।

আব্দুল ॥ কাজ আর কী করবো সর্দ্দার। কে যে কেন আমার নামে এই কেচ্ছা রটালো, আমি তো ভেবে পাই না। তুমি বলছো, মায়া আমার বোন। আমি বলছি মায়া আমার মা। সেবার যখন আমার বসন্ত হয়েছিল, তখন কে আমার সেবাশুশ্রূষা করেছিল? তোমারই ওই একরত্তি মেয়ে। আজও আমি তা' ভুলতে পারি না।

(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবদুল চলিয়া গেল। সমবেদনায় কয়েকজন তাহার সহিত গেল। ইব্রাহিম ও কয়েকজন রহিল)।

ইব্রাহিম ॥ তোমরা এখানে বসলে কেন? যাও—খুঁজে ছাখ।

আশু ॥ আর কোথায় দেখবো? খুঁজে দেখার কি বাকী আছে?

ইব্রাহিম ॥ একটা কিছু কর। মেয়েটাকে তো খুঁজে বার করতেই হবে।

আশু ॥ বলছো যখন—দেখি আবার।

[অন্যান্য সকলেই চলিয়া গেল। রহিল শুধু জনার্দ্দন, ইব্রাহিম ও হারাণ]।

ইব্রাহিম ॥ সত্যিই আজ আমাদের মাথার ঠিক নেই। কী যে করবো, কিছুই বুঝছি না।

জনার্দ্দন ॥ আমি ভেবে দেখছি, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

ইব্রাহিম ॥ সে কথা তো আমি আগেই বলে-ছিলাম দাদা, তখন তুমি শুনলে না।

জনার্দ্দন ॥ মায়াকে আব্দুল সরিয়েছে, একথা আমার কোন সময়েই বিশ্বাস হয়নি। আমি তাই বাধা দিয়েছিলাম। আজ বুঝছি, মায়াকে কেউ সরায় নি। মায়া পালিয়েছে। আমাদের সবার মুখে এমন করে চুণকালী দিয়ে সে পালিয়ে যাবে? চল ইব্রাহিম, থানায় চল।

ইব্রাহিম ॥ না দাদা, তা' হবে না। পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। যদি সে পালিয়েই থাকে, কোথায় যাবে? দুদিনেই আমাদের কাছে ধরা পড়বে। পুলিশে খবর দিয়ে মিছে কেলেঙ্কারী করে লাভ নেই। মনে রেখো দাদা, মায়াকে তোমার বিয়ে দিতে হবে। লালমিঞা বলে গেছে, যেখান থেকেই হোক্ সে মায়াকে খুঁজে বের করবে। আমিও তোমায় বলে যাচ্ছি, মায়াকে বের না করা পর্য্যন্ত দানা-পানি আমি মুখে নেবো না। মায়া শুধু তোমার নয়,—আমাদেরও।

(ইব্রাহিম চলিয়া গেল)

হারাণ ॥ তোমাদের তো বটেই, সেই জন্যেই তো পুলিশে খবর দিতে এতো আপত্তি।

জনার্দ্দন ॥ কী বললে হারাণ?

হারাণ ॥ বলছিলাম—মানে—অনেকেই বলছে ব্যাপারটা নিয়ে একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় খেলা চলছে। মানে—অনেক কিছু ঘটছে, যা' আমাদের মতো সোজা লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আর তাতেই ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জনার্দ্দন ॥ তোমার ওই বাঁকা বাঁকা কথা ছেড়ে দাও হারাণ। কী বলতে চাইছো, সোজা কথায় বল।

হারাণ ॥ আমি কিছুই বলতে চাই না। তবে যারা এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তাদের অনেকেই বলছে,—হ্যাঁ, সে একটা বেশ গল্পের মতো।

জনার্দ্দন ॥ কী বলছে?

হারাণ ॥ লালমিঞা নাকি মায়াকে সাদী করতে চেয়েছিল—

জনার্দ্দন ॥ কথাটা আজ এই তিনদিন ধরে শুনছি বটে, কিন্তু আমিতো বলেছি, আমি বা মায়ার মা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

হারাণ ॥ তোমরা জানলে তো আর সাদীটা হয় না, তাই তোমাদের জানবার কথাও নয়।

জনার্দ্দন ॥ জানলেই যে সাদী হতো না, তারও কোন মানে নেই হারাণ। মেয়ে যদি নাবালিকা হতো, তবে অবশ্য এ বিয়েতে আমরা কখনো রাজী হতাম না। কিন্তু মেয়ে এখন সাবালিকা। তার মত হলে—এ বিয়েতে অন্ততঃ আমি কোন বাধা দিতাম না।

হারাণ ॥ গল্পটা হচ্ছে এই,—মায়ারও এতে মত ছিল না। কাজেই নাকি মায়াকে সরানো হয়েছে।

জনার্দ্দন ॥ কে সরিয়েছে ? লালমিঞা ?

হারাণ ॥ গল্পটা এখন সেই রকমই দাঁড়িয়েছে। লালমিঞা যে শুধু মায়াকে সরিয়েছে তা নয়, নিজেও এখন সরে পড়েছে।

জনার্দ্দন ॥ তুমি বলছো কী ?

হারাণ ॥ এ যা' বলছি, এ কিন্তু গল্প নয়। খোঁজ নিয়ে ছাখো, কাল সন্ধ্যে থেকে লালমিঞা হাওয়া। আর লালমিঞা হাওয়া হয়েছে বলেই পুলিশে খবর দিতে আমাদের এতো আপত্তি,—বুঝলে সর্দ্দার ?

জনার্দ্দন ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) হারাণ !

হারাণ ॥ চোখ রাঙালে আমি না হয় চুপ করে থাকবো সর্দ্দার, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এ ব্যাপারে এতো ক্ষেপে উঠেছে যে, তারা থামবে না। আমরা শ্রমিক—আমরা সব একজোট, কিন্তু তাই বলে মুসলমানের ছেলের সঙ্গেতো আর হিন্দুর মেয়ের গাঁটছড়া বাঁধা যায় না। এই কথাই তারা বলছে।

জনার্দ্দন ॥ লালমিঞা কলোনীতে নেই ?

হারাণ ॥ আশ্চর্য্য যে, এ কথা ইব্রাহিম সর্দ্দার তোমার কাছে চেপে গেছে। না গেলে তুমিও একথা এতক্ষণ জানতে। কিন্তু একী ! স্বয়ং মালিক আসছেন এখানে।

(দু'জনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দীনবন্ধু, লোহারাম আরো কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত। জনার্দ্দন ও হারাণ তাঁহাদিগকে নীরব অভ্যর্থনা জানাইল)।

হারাণ ॥ কেউ নেইও এখানে। খান কয়েক চেয়ার—আচ্ছা, আমি—

দীনবন্ধু ॥ না না, ও সব থাক। জনার্দ্দন, তোমার মেয়ে নাকি চুরি হয়েছে ?

(জনার্দ্দন নীরব রহিল)

দীনবন্ধু ॥ আমি আজ এসেছিলাম পালাগান শুনতে, ওরা সব এতো করে বলেছিল। এসেই শুনি পালা-টালা সব বন্ধ। হিরোইন নেই, হিরোও নেই। পালাগান চুলোয় যাক্। কিন্তু আমাদের কলোনীতে এ সব কী কাণ্ড।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, কী সাংঘাতিক ব্যাপার।

সুমঙ্গল ॥ এই জন্যই আমি কলোনীতে একটা ছোটখাটো মন্দির আর মসজিদ তৈরী করার স্কীম দিয়েছিলাম স্যার। মানে,—ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানটা এ যুগে একেবারে চলে গেছে।

নটবর ॥ না স্যার, আমি নিবেদন করবো, ওই মন্দির-মসজিদ নিয়ে মাতামাতি করলেই রক্তারক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

হারাণ। মন্দির-মসজিদ না গড়েই যা দাঁড়িয়েছে; সেও বড়ো কম ব্যাপার নয়। মেয়ে-ছেলে নিয়ে টানাটানি—এ সব কী ব্যাপার মশাই ?

দীনবন্ধু ॥ পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে ?

হারাণ ॥ না স্যার। ইব্রাহিম মিঞা সে পথ

বন্ধ করে গেছে। সর্দ্দারকে বুঝিয়েছে, ব্যাপারটা পুলিশে গেলে যে কেচ্ছা বেরুবে, ওর মেয়ের আর বিয়ে হবে না।

লোহারাম্। বিবেচনা করুন, ব্যাপারটা পুলিশে না দিলেই বুঝি সব কেচ্ছা চাপা পড়বে।

সুমঙ্গল॥ শ্রমিক মঙ্গলের দিক থেকে আমি বলছি, মালিকেরই এ ব্যাপারটা হাতে নেওয়া উচিত—এখনই।

নটবর॥ নিশ্চয় স্যার। দেখছি তো, মেয়ে-ছেলের গায়ে হাত দিতেই riot বেধে গেছে! এ তো গায়ে হাতের বাবা। একেবারেই লোপাট। riot যে এখনো বাধেনি, এই আশ্চর্য্য।

লোহারাম॥ বিবেচনা করুন, সে হবে খুব সাংঘাতিক স্যার। ব্যাপারটা আপনি এখনই হাতে নিন্।

সুমঙ্গল॥ শ্রমিক কল্যাণের দিক থেকে আমি বলছি, বিষাক্ত অঙ্গটা এখনি ছেটে না ফেললে শ্রমিক-সমাজের গোটা দেহটাই বিষাক্ত হয়ে যাবে।

দীনবন্ধু॥ কিন্তু আশ্চর্য্য, যার মেয়ে এ ব্যাপারে সে কোন কথা কইছে না। তবে কি বুঝবো এ ব্যাপারে তার কোন অভিযোগ নেই?

জনার্দ্দন॥ প্রতিকার পাবো জানলে অভিযোগ আমার আছে বৈকি।

দীনবন্ধু॥ প্রতিকার নেই মানে? তুমি কি ভাবছো, এই দুর্নীতি আমি সইবো? আমার ফ্যাক্টরী, আমার কলোনী—প্রতিকার করতে আমি বাধ্য এবং আমি তা করবো। ভেবেছিলাম, আগামীকাল আমাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের জানানো হবে। কিন্তু দাস, এ যা ব্যাপার, তাতে আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। শোনো জনার্দ্দন, তোমাদের কোনো প্রস্তাবেই বোর্ড সম্মত হয়নি। বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি মজুরী বোর্ড দেবে না। কাজেই ছাঁটাই অনিবার্য্য। কাদের ছাঁটাই করতে হবে, সেইটেই ছিল আমার সমস্যা। আমি—আমি বিষাক্ত অঙ্গটাই ছাঁটাই করবো।

হারাণ॥ তবেই আমরা বাঁচি—তবেই আমরা বাঁচি।

দীনবন্ধু॥ শুধু তোমারাই বাঁচবে না, আমরা সবাই বাঁচবো। বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করবো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি Home Ministerএর সঙ্গে দেখা করবো। স্পষ্ট বলবো, এই মেয়ে চুরির বিহিত না হ'লে এখানে শান্তিভঙ্গ হ'তে বাধ্য।

জনার্দ্দন॥ হ্যাঁ, শান্তিভঙ্গ হতে বাধ্য। আমি আমার মেয়ে ফিরে চাই।

দীনবন্ধু॥ মেয়েকে যখন চুরি করেছে, তখন তার জীবন সম্পর্কে আমি কোন আশংকা করিনা। আশংকা শুধু বেইজ্জতের।

জনার্দ্দন॥ মৃত্যুর চেয়েও সেটা বেশী। ওই ইব্রাহিম,—তারই ছেলে—ওদের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারতাম। কিন্তু এখন যদি ওদের আমি পাই, আমি ওদের প্রাণ নেবো।

দীনবন্ধু॥ না না, কোনো Violence নয়।... দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলেছেন, হিংসার পথ—পথ নয়। অহিংসা পরমো ধর্ম্ম—এটা তোমরা ভুলো না। এসো দাস, ছাঁটাইয়ের অর্ডারটা এখনি বের করতে হবে। কিন্তু তার আগে—জনার্দ্দন, আমি জানতে চাই, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই যদি বিষাক্ত অঙ্গ ছেঁটে ফেলে দিই, তোমরা কোনো আপত্তি করবে না—তোমরা ধর্ম্মঘট করবে না।

জনার্দ্দন॥ না, করবো না। যাদের নিয়ে ধর্ম্মঘট করতাম, তারা আজ আমাদের সঙ্গে অধর্ম্ম করেছে। ধর্ম্মঘট আমরা করবো না।

নটবর ॥ আমি জানি, আমি দেখেছি,—তেলে জলে কখনো মিশ খায় না।

দীনবন্ধু ॥ এসো দাস—

(দীনবন্ধু তাহার দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন)।

হারাণ ॥ লোকটা ঠিকই বলেছে। সব রকমই দেখেছে কিনা। আমরাও তো দেখলাম, এতো করেও মিশ খেলো না। নইলে ওই লালমিঞা—মুসলমানের ছেলে বলে তফাৎ ভাবিনি কোনোদিন। সেই কিনা শেষে কালসাপ হ'য়ে এমন করে ছোবল মারলে। তোমার সোণার ঘরে আগুন জেলে দিলে সর্দ্দার।

জনার্দ্দন ॥ তা দিয়েছে—তা দিয়েছে।

হারাণ ॥ তবে আমরাই বা ছেড়ে দেব কেন? আমাদের ছেলেরা তো সব রুখে রয়েছে। কী কষ্টে যে আমি তাদের ঠেকিয়ে রেখে এসেছি, সে শুধু হরিই জানেন। আমি শুধু তোমাকে একবার বলতে এসেছি। আগুন জ্বালতে আমরাও জানি—আমরাও জানি।

জনার্দ্দন ॥ না, না, শোনো, শোনো।

হারাণ ॥ কী আবার শুনবো? তোমার মেয়ে ওদের ঘরেই আছে। ইব্রাহিমের ঘরে না থাকে আর কারুর ঘরে আছে।

জনার্দ্দন ॥ এদ্দুরে সাহস হবে ওদের? এদ্দুর?

হারাণ ॥ তাইতো দেখছি। মেয়ে উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা' জানা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলে গরু খোঁজা খুঁজেছি। কোন হদিশ মেলেনি। খুঁজে দেখা হয়নি শুধু ওই ইব্রাহিমের বাড়ী, তল্লাসী হয়নি শুধু ওদের পাড়া। আবার বলছি, মেয়েটাকে ওদের ঘরেই গুম করে রেখেছে। ছোঁড়াটা দুদিন ভাল মানুষ সেজে লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজি করেছে। আর ওই খোঁজাখুঁজির অছিলাতেই এখন গা-ঢাকা দিয়ে মেয়ের কাছে গিয়ে জুটেছে।

জনার্দ্দন ॥ আর ইব্রাহিম তা' জেনেও আমার কাছে গোপন করে গেল।

হারাণ ॥ এ ব্রতের এই নিয়ম সর্দ্দার—এ ব্যাপারে এই হয়ে থাকে।

(ইব্রাহিম ও আকবরের প্রবেশ)।

ইব্রাহিম ॥ লোহারাম ম্যানেজারের মুখে শুনলাম, আমরা নাকি ছাটাই হয়েছি, আর তোমরা নাকি তবু কাজ করবে বলেছো?

জনার্দ্দন ॥ কোন কথার আগে আমি জানতে চাই, তোমার ছেলে কোথায়? লালমিঞা?

ইব্রাহিম ॥ লালমিঞার খোঁজ আমিও পাচ্ছি না।

জনার্দ্দন ॥ লালমিঞা কোথায় তুমি জান না?

হারাণ ॥ শুধু লালমিঞা কেন, মায়া কোথায় তা-ও তুমি জান।

ইব্রাহিম ॥ চোপরাও কুত্তা।

আকবর ॥ (ইব্রাহিমকে) সর্দ্দার হুকুম দাও,—আমি ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলছি।

জনার্দ্দন ॥ খবরদার! চোরের মার বড় গলা।

ইব্রাহিম ॥ চোর!

জনার্দ্দন ॥ হ্যাঁ, চোর। তোমরাই আমার মেয়ে চুরি করেছো। বেইমান্।

ইব্রাহিম ॥ চোর! বেইমান! আমরা!

আকবর ॥ স্ট্রাইকের হলফ নিয়ে তলে তলে আমাদের ছাটাইয়ের ব্যবস্থা করে বেইমানী করেছিস তোরা!

হারাণ ॥ করে থাকি, বেশ করেছি।

ইব্রাহিম ॥ বেশ করেছ! জান কবুল, কী করে তোমরা কাজে যাও, আমরা দেখে নেবো।

(আকবরকে লইয়া ইব্রাহিম প্রস্থানোদ্যত)।

জনার্দ্দন ॥ ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—(ইব্রাহিম ফিরিল) আকবর, তুমি চলে যাও। হারাণ তুইও চলে যা।

(আকবর ও হারাণ পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল)।

ইব্রাহিম, আমরা ভুল করছিনাতো? নিজের অজান্তে অন্য কারোর হাতে পুতুল হয়ে নাচছিনা তো?

ইব্রাহিম ॥ নাটকতো ভালই কর দেখা যায়। চোর-বেইমান বলে গাল দিয়ে এ আবার কী সুর ধরলে?

জনার্দ্দন ॥ কি করি, কি বলি—কিছুই ঠিক নেই। আমার মুখের কথা ধরিসনে ভাই। আমি ভাবছি, তোর আর আমার এতো দিনের এই যে—বলতে গেলে আত্মীয়তা—এ অমনি আজ একটা তুচ্ছ কারণে ভেঙে যাবে?

ইব্রাহিম ॥ কেন যাবে? তুমি রাখলেই থাকবে। আর তুমি যদি পরের কথায় নাচো, তাহ'লে—তুমি জেনে রেখো—তোমার ওই হারাণ লোক সুবিধের নয়।

জনার্দ্দন ॥ না, না, হারাণ—অবিশ্যি হারাণ লোক যে ভালো নয়, তা আমি জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমিতো তার কোন দোষ দেখি না। বরং আমি বলছি, তোমার ওই আকবর—ও আকবরও খুব—

(ছুটিয়া আকবরের প্রবেশ)।

আকবর ॥ (ইব্রাহিমকে) সর্দ্দার, তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? ওরা যে তোমার ঘরে আগুন দিলে।

ইব্রাহিম ॥ আগুন! আমার ঘরে আগুন! কে দিলে?

আকবর ॥ ওই ওরা—ওরা। আগুন—আগুন—

(ছুটিয়া আকবরের প্রস্থান)।

ইব্রাহিম ॥ (জনার্দ্দনের প্রতি) বাঃ—!

(ইব্রাহিমের প্রস্থান)।

জনার্দ্দন। আগুন—ইব্রাহিমের ঘরে—

(দৌড়াইয়া হারাণের প্রবেশ)।

হারাণ ॥ সর্দ্দার, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো? ওরা যে সব আগুন দিয়ে দিলে।

জনার্দ্দন ॥ ইব্রাহিমের ঘরে আগুন কে দিলে?

হারাণ ॥ ইব্রাহিমের ঘরে? ইব্রাহিম না—ইব্রাহিম না—ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের ঘরে আগুন দিলে।

জনার্দ্দন ॥ তবে যে আকবর বললে—

হারাণ ॥ আকবর বললে আর তুমি বিশ্বাস করলে সর্দ্দার। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম,—ইন্দ্রনাথের ঘরে আগুন দিলে আকবরের ভাই তাহের মিঞা।...দাউ দাউ করে আগুন···হায়, হায়, সর্দ্দার সব পুড়ে গেল—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব সর্দ্দার—সব সাফ হয়ে গেল। পাড়াকে পাড়া সব এতোক্ষণে সাফ হয়ে গেল।

জনার্দ্দন ॥ সাফ হয়ে গেল—সাফ হয়ে গেল। তবে সাফই করে ফ্যাল্—সব—সব জঞ্জাল আজ সাফ করে ফ্যাল্।

হারাণ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো আমি চাইছিলাম।

জনার্দ্দন ॥ য়্যাঁ?

হারাণ ॥ ঐ তোমার হুকুমটাইতো চাইছিলাম। সব সাফ করে ফেলবো আজ। হিন্দু ভাই সব—

(হারাণের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে একটি বোমা ফাটিল)।

জনার্দ্দন ॥ য়্যাঁ! এ আমি কি করলাম! হারাণ—হারাণ—পার্ব্বতী—

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

নাট্যকার ইউজীন ও'নীল

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক মার্কিণ নাট্যসাহিত্য বা নাট্যমঞ্চ বলতে প্রথমেই মনে আসে নাট্যকার ইউজীন ও'নীলের নাম। কিন্তু তাঁর প্রতিভা তাঁর খ্যাতিকে শুধুমাত্র স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, দিকে-দিগন্তরে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ও'নীলের মৃত্যুতে শুধু মার্কিণ নাট্য-সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যেরও নিঃসন্দেহে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই নাট্যশাখাটি অল্পবিস্তর অবহেলিত বলা চলে। পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুষ্টিমেয় জনকয়েক মাত্র নাট্যকারই আপন বৈশিষ্ট্যে বহুর মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়াবার মত অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাজির হয়েছেন। সেই অল্পসংখ্যকের মধ্যেও যদি আবার একজনেরও অভাব ঘটে, সেটা সাহিত্যরসিক ও নাট্যরসপিপাসুর মনে দাগা দিয়ে যাওয়ার মত ঘটনাই হয়ে দাঁড়ায়। ইউজীন ও'নীলের, মৃত্যু এমনি একটা আঘাতই দিয়ে গেছে বিদগ্ধজনের মনে।

ইতিহাসের দিক থেকে যেমন মার্কিণ নাট্যসাহিত্য খুব বেশী প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না, তেমনি শক্তিশালী নাট্যকার বা উচ্চ শ্রেণীর নাটকও মার্কিণ সাহিত্যে খুব অল্পই দেখা যায়। অবশ্য আমেরিকায় জাতীয় নাটকের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ১৭৮৭ সালেই। ঐ সময় জাতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনেই লেখা "The Contrast" নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটির লেখক Royall Tyler. কিন্তু এরপর আমেরিকাবাসীদের প্রায় শতাব্দীকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় ভাল নাটকের প্রত্যাশায়। এই প্রতীক্ষার পরও নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিভার আবির্ভাব হ'ল না। যে কয়েকজন এলেন, যেমন, James Herne, Fitch; Moody, Thomas, Walter প্রভৃতি, এঁদেরও

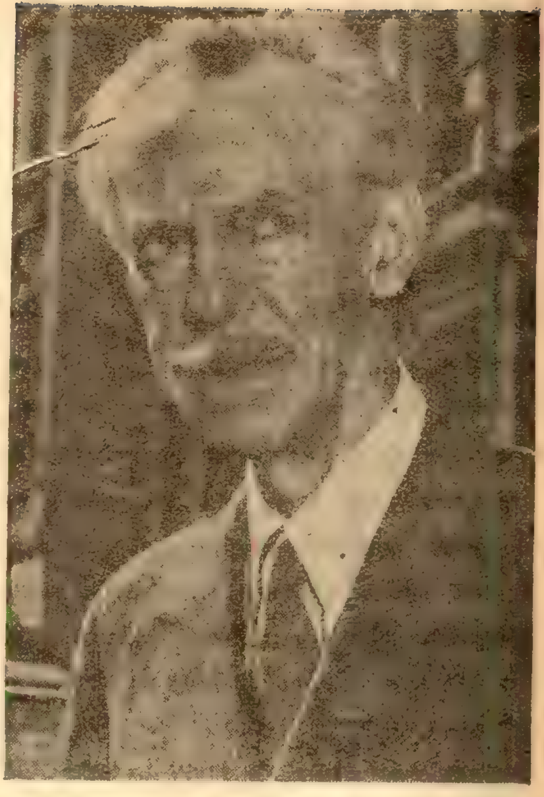

ইউজীন ও'নীল

নাম সমসাময়িক ইউরোপীয় নাট্যকারদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করার যোগ্য নয়।

বলতে গেলে ইউজীন ও'নীলই মার্কিণ নাট্য-সাহিত্যকে জাতে তুললেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কয়েকটি নাট্যমঞ্চের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ফলে মার্কিণ নাট্যজগতে কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসাহে ভাঁটা প'ড়ে যায়। ১৯২০ সালে ও'নীলের "বিয়ণ্ড দি হরাইজন" নাটকটি অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। আমেরিকার নাট্যসাহিত্যও যেন অকস্মাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ল। জনগণ আশান্বিত হ'য়ে উঠল, তারা অনুভব করল তাদের একটা বড় রকমের অভাব মিটতে চলেছে। তাদের সে আশা অপূর্ণ থাকেনি। ও'নীলের বিচিত্র,

বিপুল সৃষ্ট মার্কিণ নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আসন লাভের যোগ্য ক'রে তুলেছে। ও'নীলের খ্যাতি নিজের দেশের সীমা ছাড়িয়ে এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, আধুনিক সভ্যতার আলোক যে দেশে পৌছুতে পারে নি, সেখানেও তাঁর নাটকের চাহিদা দেখা গেছে। তাঁর "দি হেয়ারী এপ" নাটকটি দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুরা অভিনয় ক'রে আনন্দ লাভ করেছে।

ইউজীন ও'নীল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর নিউ ইয়র্ক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জেমস ও'নীল একজন খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো' নাটকে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। ইউজীনের জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটে পিতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে। কাজেই প্রথম জীবনে শিক্ষা লাভের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে এবং কানেক্টিকাটের অন্তর্গত ষ্ট্যাম্পফোর্ডে বেট্‌স্ একাডেমীতে ইউজীন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য রচনার পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রিন্সটনে প্রবেশ করেন, কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে বিতাড়িত হ'ন। ১৯১০ সালে জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে তিনি বুয়েনস্ আয়ারসের দিকে পাড়ি দেন। এক বৎসরকাল সমুদ্র যাত্রার ফলে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তাঁর অনেকগুলি নাটকে। ১৯১২ সালে তিনি কিছুকালের জন্য সাংবাদিকতাও করেন। নিউ লণ্ডনের "টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় তিনি রিপোর্টারের কাজ করেন। এই সময় ও'নীলকে যক্ষ্মাক্রান্ত ব'লে সন্দেহ করা হয়। কানেটিকাট স্যানাটোরিয়ামে তাঁকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরই অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময়ই ও'নীলের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কতকগুলি জিজ্ঞাসা দেখা দিল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, হিসেব-নিকেশ করতে সুরু করলেন, জীবনের কাছ থেকে তিনি কি পেয়েছেন আর কি পেতে চান। ক্রমে নাটক রচনার দিকেই তাঁর প্রবণতা দেখা গেল। অবশেষে তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন, নাট্যকার হওয়াই তাঁর জীবনের ব্রত হ'বে। ইউজীন খ্যাতনামা অভিনেতার সন্তান, কাজেই যে পরিবেশের মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল, তাতে নাট্যপ্রীতি জাগা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে তাঁর পিতা যে এদিকে তাঁকে উৎসাহ দিতেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউজীনের প্রথম একাঙ্ক নাটিকা সংগ্রহ প্রকাশিত হয় তাঁর পিতারই ব্যয়ে। ২৬ বৎসর বয়সে "Thirst and other one-act " নাম দিয়ে এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

ইউজীনের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য নাটক "Beyond the Horizon" প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এর একমাস পরে "Auna Christie" এবং আরও কয়েক মাস পরে "Emperor Jones" প্রকাশিত হ'ল। প্রথমোক্ত নাটক দু'খানির জন্য তিনি দু'বার পুলিট্‌জার পুরস্কার পেয়েছিলেন; এ ছাড়া আরও একবার ঐ পুরস্কার পেয়েছিলেন "Strange Intelude" নাটকখানির জন্য। দেখতে দেখতে ও'নীলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ও'নীলের প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি পুলিট্‌জার পুরস্কার। দ্বিতীয় স্বীকৃতি এল ১৯২৬ সালে। ঐ বৎসর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে লিট্, ডি বা ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর প্রতিভার চরম স্বীকৃতি এল ১৯৩৬ সালে। সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ও'নীল "আমেরিকান স্পেক্টেটার" নামক একখানি পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ কাজে ছিলেন শেরউড অ্যাণ্ডারসন, থিওডোর ড্রাইজার প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ। তবে পত্রিকাখানি খুব বেশীদিন টি'কে থাকতে পারে নি।

ও'নীল কয়েকটি শিল্পকলা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব আর্টস এণ্ড লেটার্স, আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস এণ্ড লেটার্স এবং আইরিশ একাডেমী অব আর্টস এণ্ড লেটার্স। গত ২৭শে নভেম্বর বোষ্টনে তাঁর মৃত্যু হয়।

জীবন-বেদের একজন শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক ও হোতা হলেন ইউজীন ও'নীল। মানুষের জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে মূল সত্য নিহিত আছে, তাঁর রসস্রষ্টা মন সেই

সত্যেরই সন্ধান করেছে। জীবনেরই জয়গান তিনি গেয়ে গেছেন তাঁর প্রায় অর্দ্ধশত নাটকের মধ্য দিয়ে। সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে, প্রলোভনে ও পদস্খলনে জীবনের স্বীকৃতিই হ'ল ও'নীলের নাট্যসাহিত্যের মূলমন্ত্র।

পরিণত বয়সের রচনা "The Iceman Cometh" নাটকে ও'নীল বিবিধ চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মার রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই আত্মার উপলব্ধিই হ'ল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। নাটকটির উদ্বোধন রজনীতে তিনি পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নতুন নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "If the human race is so damned, stupid that in two thousand years it hasn't had brains enough to appreciate that the secret of happiness is contained in one simple sentence. That simple sentence is 'For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul'." এই হল ও'নীলের জীবন-দর্শন।

এই আত্মার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি মূলতঃ বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রথম যুগের নাটকগুলি বস্তুতান্ত্রিক। বহু বিচিত্র চরিত্রই তিনি সৃষ্টি করেছেন। যে কোন প্রকার চরিত্রই হোক না কেন, তারা খাঁটি মানুষ। মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতা যেমন এই সব চরিত্রের নিত্যসঙ্গী, তেমনি প্রকৃত মানুষের মতই বিপরীত বৃত্তির সংঘাত চলেছে এদের মানসরাজ্যে অহরহ। অবশ্য প্রথম যুগের কাঁচা হাতের রচনায় কিছুটা অতিনাটকীয়তা হয়ত মিশে গেছে, কিন্তু তা ক্ষমার্হ। প্রথম প্রকাশিত পাঁচখানি নাটক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। "Thirst" নাটকে নাচের পোষাকে মেয়েটি, ভদ্রলোকটি আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোটি যেভাবে পরস্পরকে হত্যা করল, তাতে এদের চরিত্রগুলি রোমান্টিক ও অতি-নাটকীয়তার পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। নিয়তির অলক্ষ্য ক্রিয়াও যে নাট্যকার স্বীকার ক'রে না নিয়েছেন এমন মনে হয় না। The Web, Fog, Recklessness—এই তিনটি নাটক বৈশিষ্ট্যহীন, তবে এগুলি প্রথম জীবনের প্রচেষ্টা হিসাবে স্মরণীয়। প্রত্যেকটি নাটকই অতি নাটকীয়, এগুলির পরিণতিও বিয়োগান্ত। প্রথম যুগের এই নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল "Warning" নাটকটি। অনেক বেতার অপারেটরের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দর ফুটে উঠেছে নাটকটিতে। সে বধির হ'তে চলেছে, অথচ তার স্ত্রী তাকে জাহাজের কাজ বজায় রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। একদিকে সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য, অন্যদিকে বধিরত্বের আশঙ্কা—এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বেতার অপারেটরের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিণ নাটকে দেখা দেয় বিপ্লবের সূচনা। বস্তুতান্ত্রিকতার পথে শুরু হয় নাটকের অগ্রগতি। এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় মঞ্চ-সজ্জা ও দৃশ্যরচনার নির্দ্দেশের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ ও'নী-লের Beyond the Horizon নাটকের ২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যের উল্লেখ করা যায়। এই দৃশ্যে মেয়ার ঘরের খুঁটি-নাটি পুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কোন কিছুই নাট্যকারের দৃষ্টি এড়ায় নি। নাটকের কোন বিশেষ চরিত্রে ও পরিস্থিতিতে কি পরিবর্ত্তন এসেছে, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এই বর্ণনার মধ্যে। ও'নীলের পর্য্যবেক্ষণশক্তি শুধুমাত্র বাহ্যিক বর্ণনার মধ্যেই শেষ হয় নি, এই বর্ণনার মধ্যে একটা অন্তর বিরোধের লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

নাটকের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও দেখা দিল এই বিপ্লব ইতিহাস ও রূপকথার রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা অথবা উচ্চবংশজাত, অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের আসন নাটক থেকে ক্রমেই সরে যেতে লাগল। প্রধানতঃ কৃষক নাবিক ও সাধারণস্তরের ব্যক্তি নিয়েই নাটকের কারবার শুরু হ'ল, ও'নীলের নাটকের যা বৈশিষ্ট্য। এই সকল চরিত্রের সৃষ্টি হয় নাটকের প্রয়োজনেই—রঙ্গমঞ্চ বা অভি-নেতৃদের প্রয়োজনে নয়। চরিত্রের বিকাশও হয় আপনা থেকেই ঘটনা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

চরিত্রসৃষ্টিতে ও পরিবেশ সৃষ্টিতে এই বিপ্লবীজনের দিকে ঝোঁক নাটকের ঘটনার গতির মধ্যেও সুপরিস্ফুট শেষ দৃশ্যে আকস্মিক একটা কিছু ঘটে গিয়ে নব দিক থেকে নাটকের একটা সুখকর পরিসমাপ্তি হবে এমন কথা আর জোর ক'রে বলা চলে না ও'নীলের Anna Christie নাটকে যবনিকা পতনেই নাটকের পরিসমাপ্তি হয়

না। অ্যানা পতিতাবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে নবজন্ম লাভ করেছে। ম্যাট ওকে ভালবাসে, কিন্তু অ্যানার অতীত জীবনের পরিচয় পেয়ে সে ভুলে থাকবার জন্ম পানাসক্ত হ'য়ে ওঠে। এদের চরিত্রগত প্রকৃতিই এদের চিরস্থায়ী সুখলাভের পথে অন্তরায় হয়।

ও'নীলের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেরই মধ্যে একটা বেদনা, অতৃপ্তি ও ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর জীবন-দর্শন ও বস্তুতান্ত্রিকতাই এই সুরসৃষ্টির জন্ম দায়ী।

কিন্তু এখানে ও'নীলকে ভুল বোঝবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। শুধুমাত্র বস্তুতান্ত্রিকতার খাতিরে তিনি কোনদিন কলম ধরেন নি। কোন প্রকৃত শিল্পীই তা করেন না। ও'নীলের কবি-হৃদয় তাঁকে শুধুমাত্র রিয়ালিজমের প্রতিই একনিষ্ঠ থাকতে দেয় নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর মধ্যে রিয়ালিজম ও রোমান্সের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় "বিয়ণ্ড দি হরাইজন" নাটকে। দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার সমন্বয় হয়েছে এই নাটকে। নাটকের চরিত্র দুই ভাই এই দুই ধারার প্রতীক। রবার্ট যেন কবিপ্রকৃতির লোক। তার অশান্ত হৃদয় আবিষ্কার করতে চায় দিকচক্রবালের অন্তরালে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু তার ভাই অ্যান্ড্রু পার্থিব সুখ-দুঃখ নিয়েই খুসী থাকতে চায়। কবিত্বের লেশমাত্র নেই তার প্রকৃতিতে।

ক্রমে ও'নীলের নাটকগুলি রূপকধর্মী হয়ে উঠতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা অস্পষ্টতার ছায়া এসে গিয়েছে, তিনি হয়ে উঠেছেন মিষ্টিক। "Emperor Jones" নাটক থেকেই এর সূচনা। শুধুমাত্র আঙ্গিকের দিক থেকেই নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তাঁর নাটক-গুলিতে রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

মার্কিন নাট্য সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে রিয়ালিজমের দিকে ঝোঁক দেখা গেলেও ১৯১০ সাল থেকে রূপক নাটক রচনার দিকে নাট্যকারদের প্রবণতা দেখা গেল। ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্কের প্রভাব হয়ে উঠল সুস্পষ্ট। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ও তার পরে জার্ম্মাণীতে রূপক নাটকের যথেষ্ট প্রসার হয়। এই সময়ে নাট্য-কাররা দেখলেন, ধ্বংসোন্মুখ সমাজের পক্ষে এই রিয়ালি-ষ্টিক নাটক নিরর্থক। রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, পোষাক-পরি-চ্ছদ, সমস্ত দিক দিয়েই একটা বিরাটত্ব, অসাধারণত্ব আনয়নের চেষ্টা। কিন্তু নয়নাভিরাম দৃশ্য দিয়ে দর্শককে সৌন্দর্য্যমুগ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য নয়। নাটকের মূল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইগুলিই রূপক নাটকের উপাদান।

"এম্পারার জোন্‌স" নাটকে এই রূপকের আশ্রয় নেওয়ার জন্যই জঙ্গলের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকে না মানলেও ব্রুটাস জোন্‌স্ রাজ্যের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। প্রজারা অপরের উস্কানীতে তার বিরুদ্ধাচরণ করলে জোন্‌স্ এক সুপরিকল্পিত পথে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, সঙ্গে থাকে পিস্তল—তার দুঃসময়ের বন্ধু। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যতই সে এগিয়ে যেতে থাকে, ততই সে ক্রমে পথ হারিয়ে ফেলতে থাকে। অতীতকে সে চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখে। শুধু নিজের জীবনেরই ঘটনা নয়, মানব জাতির অতীত ইতিহাস, আদিম পূর্ব্বপুরুষের রূপ প্রত্যক্ষ করতে থাকে সে। অতীতকে সে সরিয়ে দিতে পারে না। অবশেষে এক উন্মত্ত আতঙ্কে সে পিস্তলের ঘোড়াটি টিপে ধরে। প্রাণহীন দেহটি তার লুটিয়ে পড়ে। সমগ্র ঘটনার মধ্যে রূপক মারফৎ বলা হয়েছে যে, মানুষ অতীতকে অতিক্রম করতে অক্ষম। আদিম প্রেরণা থেকে মানুষ মুক্ত নয়, যে প্রেরণা সঙ্কটের মুখে সমস্ত যুক্তি সভ্যতা, সংস্কারকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

ও'নীলের নাট্যসাহিত্য তুমুল আলোড়ন এনেছিল, তাঁর নাটক সমালোচকদের প্রবল বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ও'নীল সবদিক থেকেই নাট্যসাহিত্যে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। সমাজের অখ্যাত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা তাঁর নাটকের চরিত্র। সমালোচকেরা বলেন, তাঁর গদ্য নাকি বলার উপযুক্তই নয়। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে যে রোমান্টিকতার ঢেউ চলছিল, তিনি তার মূলে আঘাত হেনে তার গতি ফিরিয়ে দিলেন রিয়ালি-জমের দিকে। নাটকের আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি অনেক নতুনের পরীক্ষা সুরু করলেন। মুখোসের

সাহায্যে চরিত্রসমূহের প্রকৃতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "The Great God Brown" নাটকের উল্লেখ করা যায়। চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশের জন্য স্বগতোক্তির পুনঃপ্রবর্ত্তন করলেন। Strange Interlude" নাটক এর দৃষ্টান্তস্থল।

ও'নীল নাটকে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন, এই অভিযোগ করে অনেক তথাকথিত নীতিবাগীশই সে-যুগে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাটক এ সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে এসেছে। শুধু যে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য হিসেবেই তাঁর নাটক সারা বিশ্বে খ্যাত হয়ে উঠেছে তা নয়, এগুলি মঞ্চেও বেশ সাফল্য অর্জ্জন করেছে। আজ আর নাট্যকাররূপে ও'নীলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। তিনি তথাকথিত নাট্যকার ন'ন, তিনি প্রকৃত সৃজনী শক্তিসম্পন্ন শিল্পী, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। তাই মনীষী বার্ণার্ড শ'র প্রশংসাও তিনি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ'য়ের উক্তি উদ্ধৃত করেই এ প্রবন্ধের উপসংহার টানা যাক। যাঁর তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার সমালোচনা জগতের কোন কিছুকেই অক্ষত রাখে নি, সেই বার্ণার্ড শ' বলেছেন ইউজীন ও'নীল সম্পর্কে: "He is indubitably the most distinguished dramatis of the age, a master craftsman, imagrative, original and profound. He is, with the sole exception of Shakespeare, the most widely read playwright in the history of the theatre."

★

কোনো এক মেয়ে

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

অনেক গভীর ঘুমে তখনো কি মনে হ'বে
আকাশের তারা
তোমার চোখের থেকে সমুদ্রের মতো কোনো
পেয়েছে ইসারা ?
হয়তো-বা ছুঁয়ে যাবে নিরিবিলি নির্জ্জনে
এই সব রাত
চাঁদের মিনতি মাখা নিথর ঘুমের মতো
তোমার দু'হাত।
তারপর দিশাহারা হৃদয়ের ভাষা নিয়ে
মাঠের তিতির
তোমার স্বপ্নে এসে বনের সুরভি নিয়ে
করে যাবে ভীড়।
তবু তো জেনেছি আমি মহুয়া-রঙের ওই
আকাশের আলো

ঘুমহারা হৃদয়ের প্রেমের কল্পনাটুকু
তোমারে জানালো।
সেই প্রেম যদি কোনো মেরুর বুকের ঘুমে
নিয়ে আসে মেঘ,
তখনো কি ভুলে যাবে চাঁদের করুণা ঝরা
রাতের আবেগ ?
তখনো কি এই সব পাখি-বন-অরণ্যের
শোনা যাবে গান ?
সেই মেয়ে তখনো কি এনে দেবে পৃথিবীর
রূপের উজান ?
দু'হাতে কুড়াবে নাকি অন্ধে গভীর ঘুমে
আকাশের তারা
পেয়েছিলো যার চোখে সেই মেয়ে কোনোদিন
মনের ইশারা ?

কুম্ভকার্ণের মৃত্যু

শ্রীগৌতম সেন

কুম্ভকর্ণ ও লম্বকর্ণ দুই ভাই।

পিতৃদত্ত নাম নয়। কার্টুন-চিত্র হিসাবে প্রতিবেশি-দত্ত এ নাম।

কুম্ভকর্ণ মেদবহুল মাংসপিণ্ড আর লম্বকর্ণ ব্যাসহীন উর্দ্ধরেখা। শুভ্র হাড়ের ওপর কৃষ্ণচর্ম্মের প্রলেপ। মুখের মধ্যে নাক আর চোখ—দুই-ই ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

বিপদ দুজনকে নিয়েই। একজন চিররুগ্ন—যা খায় হজম হয় না, আর একজন সুস্থ হয়েও শয্যাশায়ী। বিপুল দেহ নিয়ে নড়া-চড়া করতেই হাঁফ ধরে।

দলে দলে ডাক্তার আসে, মূল্যের বিনিময়ে উপদেশ দিয়ে যায়।

প্রচুর অর্থের মালিক। ভোগ করবার লোক নেই—বিয়ে-থাও কেউ করেনি। লম্বকর্ণ ডিসপেপ্‌টিক—বিয়ে করবার সাহস নেই। আর কুম্ভকর্ণ? যাকে পরের ওপর নির্ভর ক'রে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করতে হয়, তার বিয়ে করবার এনার্জ্জি কোথায়?

সুখ নেই দুজনেরই। না আহারে, না বিহারে। একজন অম্বলের রোগী—কোনো কিছুই সয় না আর অপর জনকে সবকিছুই ইচ্ছে করেই বর্জ্জন করতে হয়েছে। কৃশ হবার দুরূহ সাধনা!—হায় অভিশপ্ত অর্থ।

এমনি ক'রেই চলছিলো। কিন্তু গোল বাধলো যাজ্ঞসেনীকে নিয়ে। যাজ্ঞসেনী এলো ভায়ের বাড়িতে—মাঝে মাঝেই আসে। বছরের ছ'মাস প্রায় ভায়ের বাড়িতেই তার কাটে। ভগ্নীপতিও আপত্তি করেন না. ধনী শ্যালক।

বাড়াবাড়িটা হ'লো সেদিন অসহ্য গরম পড়ায়। যাজ্ঞসেনীর হাঁক-ডাকে এবং বড় বড় ডাক্তারদের সমাগমে নিস্তব্ধ পুরী আবার মুখরিত হয়ে উঠলো।

ডাক্তাররা সবাই বলে গেলেন, সময়ে চিকিৎসা না হলে হার্টফেল করার সম্ভাবনা।

সুতরাং ঘটা ক'রেই চিকিৎসা শুরু হ'লো, যাজ্ঞসেনীর পরিচালনায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে মেদ কমাবার যতরকম প্রক্রিয়া আছে, তারও প্রয়োগ চললো যথারীতি। পথ্যের মধ্যে ঘি-দুধের সম্পর্ক অনেকদিনই রহিত করা হয়েছে। এবার বন্ধ হলো যাবতীয় প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য।

কিন্তু এতসব ক'রেও দেহের অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত কমানো গেলো না। যাজ্ঞসেনীর পরিচালনায় এলো শহর থেকে বড় বড় ডাক্তার। যন্ত্র এবং উপসর্গে গেল ঘর ভ'রে।

কুম্ভকর্ণ অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, এরাই আমাকে মেরে ফেলবে। আরে, মেদ আপনি না কমলে, কমায় কার সাধ্য! বলি ডাক্তার, মেদ গলাতে জানো? এমন যন্ত্র যদি থাকে, দেখো চেষ্টা ক'রে। সেই গলিত মেদ যদি ঝরিয়ে দিতে পারো খানিকটা—দেখবে, আবার আমি উঠে বসেছি। চাই কি, ঐ লম্বুর মতো ছুটেও বেড়াতে পারি।

একজন এসে বললে, ওসবে কিছু হবে না···কবরেজি করো। প্রাচীন শাস্ত্র—দিতেও পারে একটা হদিস্।

সত্যিই ডাক্তারীতে কিছু হ'লো না। কবিরাজ মশায় এলেন। বৃদ্ধ চিকিৎসক—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। এসে বললেন রোগী কে?

রোগী বিব্রত হয়ে বলে, আজ্ঞে আমি কুম্ভকর্ণ।

কবিরাজ মশায় গম্ভীর হয়ে বললেন, হু। মেদ কমাতে হবে? কিন্তু এমন ক'রে তো চিকিৎসা চলবে না বাপু! আমাকে দিন সাতেক তোমার কাছে থাকতে হবে—দেখতে হবে, গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে কোথায় তোমার গোলযোগ আছে।

কথাটা সকলের মনে লাগলো। ব্যবস্থাও সেইরকমই হলো। যাজ্ঞসেনীর ব্যবস্থা। বৃদ্ধ কবিরাজ পিতৃ-আদরে সেখানে রয়ে গেলেন।

কবিরাজ মশায় প্রথমেই কোষ্ঠী নিয়ে বিচার করতে বসলেন। একবার দেখেন, দুবার দেখেন—বার বার দেখেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেন, দেখছি, ঐ ব্যাটাই তোমাকে মারবে।

কুম্ভকর্ণ চমকে ওঠে।

—শনির দৃষ্টি পড়েছে, ঐ মারবে তোমাকে। দেখি তোমার মুখখানা। ভালো ক'রে চাও আমার দিকে।

কুম্ভকর্ণ চায়।

কবিরাজ মশায় গম্ভীর হয়ে বললেন, সবগুলো অরিষ্ট লক্ষণই ফুটে উঠেছে দেখছি। কি হবে বাপু, তোমার চিকিৎসা ক'রে। তোমার আর মাত্র একমাস পরমায়ু আছে।

খবর শুনে যাজ্ঞসেনী ছুটে আসে। বলে, কি হবে বাবা?

—চিকিৎসায় কিছু হবে না মা। গ্রহ-শান্তি করাও যদি দেবতা সন্তুষ্ট হন। আগামী অমাবস্যা, রাত্রি, বারটার ওর মৃত্যুযোগ। এ কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। বরং চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে মা, ওকে ঈশ্বর-চিন্তা করতে বলো।

কবিরাজ মশায় 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে গাত্রোত্থান করলেন।

যাজ্ঞসেনী চীৎকার ক'রে খানিকটা কাঁদলো। লম্বকর্ণ বিছানা নিলো।

আর কুম্ভকর্ণ? প্রথমটা সে বিশ্বাস করতে পারলো না। আজ থেকে একমাস পরে—ঠিক অমাবস্যা তিথি, সময় পর্য্যন্ত দেওয়া আছে, এমন অসম্ভব সম্ভাবনাকে সে বিশ্বাসই বা করে কি ক'রে? কিংবা হতেও পারে··· কোষ্ঠীর অংক, খণ্ডন করবে কে?

আয়োজন হ'লো। চতুর্দ্দিক থেকে এলেন জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত। কেউ চণ্ডীপাঠ করেন, কেউ পাঠ করেন গীতা। হোম-যাগ, দান-ধ্যান যা কিছু করবার সবই একে একে হলো সমাধা। যাজ্ঞসেনী কোনো কিছুরই ত্রুটি রাখলো না। মার পেটের ভাই কুম্ভকর্ণ।

দেশ-বিদেশ থেকে কীর্ত্তনের দল এসে নাম শোনায় কুম্ভকর্ণ সব আয়োজনই চোখ চেয়ে দেখে।

কীর্ত্তনওয়ালা প্রাণপণ চীৎকার ক'রেও রোগীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না।

রোগী চেয়ে আছে শূন্য দেয়ালের দিকে। দিন এগিয়ে আসছে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় অনেকগুলো সংখ্যা ছেঁড়া হয়ে গিয়েছে। যাজ্ঞসেনীকে ডেকে বলে, এগুলো ছেঁড়ে কে? মনে হচ্ছে যেন ভুল ক'রে বেশী ছেঁড়া হয়েছে।

যাজ্ঞসেনী চোখের জল মুছে বলে, না ভাই, ঠিকই ছেঁড়া হয়েছে।

কুম্ভকর্ণ একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলে বলে, তবে আর মাত্র কুড়িটা দিন বাকি?

যাজ্ঞসেনী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কুম্ভকর্ণের চোখে অন্ধকার নামে। মাত্র আর কুড়িটি দিন। কুম্ভকর্ণ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলো। খেতে ব'সেও খেতে পারে না।

যাজ্ঞসেনী আব্দার ক'রে ভাল-ভালো খাবার এনে মুখের কাছে তুলে ধরে, কুম্ভকর্ণ কোনো স্বাদই পায় না।

কুম্ভকর্ণ কাঁদে। বলে, আমি যে কোনো স্বাদ পাচ্ছি না দিদি। তবে কি দিন ঘনিয়ে এলো?

যাজ্ঞসেনীর আহ্বানে আবার কবিরাজ মশাই এলেন। বললেন, কিছু না খেতে চায়, শুধু গঙ্গাজল দাও।

সেই কথা শুনে যাজ্ঞসেনী আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

গঙ্গাজল মুখে আর গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম নাম কানে। নাম শুনতে শুনতে কুম্ভকর্ণ এক একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে।—এরা এমনি ক'রেই আমাকে মেরে ফেলবে। সরে যাও, সরে যাও তোমরা আমার কাছ থেকে। আমি মরবো না—আমাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র, তোমরাই করেছো ষড়যন্ত্র।

যাজ্ঞসেনী কাঁদে, লম্বকর্ণ তার দাদার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

এমনি ক'রে পঁচিশ দিন গেলো কেটে। আর হাতে আছে মাত্র পাঁচটি দিন। এই পাঁচদিন যেন পাঁচ ঘণ্টা। যতটুকু বা চেঁচামেচি বাড়িতে ছিলো তাও গেলো শেষ হয়ে। ঝড়ের পূর্ব্বাবস্থা। সকলের মুখে আতঙ্ক।

নিঃশব্দে আনাগোনা—ফিসফাস কথা, যেন অশরীরি-আত্মা ঘুরে বেড়ায় ঘরের চতুর্দ্দিকে। কুম্ভকর্ণও নেতিয়ে পড়েছে। আর সে আস্ফালন নেই—নেই প্রতিবাদ। যেন নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে অনেকটা।

লম্বকর্ণ দাদার মুখের দিকে চাইতে পারে না। সে বিপুল দেহ শুকিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। শুধু প্রাণটুকুই ধুক ধুক করছে। আর দিন কয়েক পরে ঐ ধুকধুকুনিও যাবে থেমে। সবাই মিলে যেন তারই প্রতীক্ষা করছে সশঙ্কিত চিত্তে।

যাজ্ঞসেনীও যেন আর এক মানুষ হয়ে গিয়েছে। হাত-পা আর উঠতে চায় না—সব সময়েই ভাবের কাছটিতে থাকে ব'সে।

আর মাত্র একটি দিন বাকি।

কুম্ভকর্ণ একবার ভাল ক'রে সকলের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করে। ঝাপসা হ'য়ে আসে দৃষ্টি। মনে হয় সবই যেন তার চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে।

ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে, দিদি!

—কি ভাই?

—আজ সব জানলা-দরজাগুলো খুলে দাও দিদি, একবার ভালো ক'রে এ পৃথিবীটাকে দেখে নি। আর তো সময় নেই। কীর্ত্তনওয়ালাদের ডাকো···সেদিন রাগ ক'রে ওদের বিদায় দিয়েছিলাম, কিন্তু আর কেনো—ইহ-কালের খেলা তো ফুরিয়ে গেলো, সবাই মিলে আমায় নাম শোনাও।

লম্বকর্ণ কানের কাছে মুখ এনে বলে, দাদা, তোমার যদি কোনো ইচ্ছা থাকে···

ভালো ক'রে সবটুকু বলা হয় না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে আসে। শেষে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

কুম্ভকর্ণ তার মাথায় হাত রাখে।

আজ অমাবস্যা।

সকাল থেকেই নাম-গান শুরু হয়েছে।

পাড়ার লোক ভীড় ক'রে দেখতে আসছে কুম্ভকর্ণকে। মৃত্যুপথযাত্রীকে যেন তীরস্থ করা হয়েছে।

কুম্ভকর্ণের চোখ বড় ক্লক-ঘড়িটার পেণ্ডুলামের গতির সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘুরছে। টক্ টক্ টক্ টক্···

দেখতে দেখতে চীৎকার ক'রে ওঠে, ও কি থামবে না দিদি?

সূর্য্য অস্ত গেলো। কুম্ভকর্ণের চোখ থেকে চিরদিনের মতো সূর্য্য অস্ত গেলো। এ রাত্রিও আবার প্রভাত হবে ···কিন্তু কাল আর কুম্ভকর্ণ দেখতে আসবে না। তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

যাজ্ঞসেনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, দিদি, মরে একদিন সবাই, কিন্তু আমার মতো বুঝি কেউ মরে না। ঘড়ির কাঁটা ধ'রে এমন বিন্দু বিন্দু প্রাণরস নিংড়ে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হওয়া—এ যে বড় দুর্ভাগ্য। কেন কব-রেজকে ডেকেছিলে দিদি। মৃত্যু হতো আকস্মিক—জানবার আগেই হতো মৃত্যু। সেই তো বেশ হতো। কিন্তু একি ভয়াবহ মৃত্যু! আজ একমাস ধ'রে তার পদ-ধ্বনি শুনছি!

যাজ্ঞসেনী বধির—তার কানে আর কোনো কথাই প্রবেশ করছে না, যেন পাথর হয়ে গিয়েছে সে।

আর একটি ঘণ্টা বাকি আছে। কুম্ভকর্ণের পরমায়ুর আর একটি ঘণ্টা বাকি আছে।

কুম্ভকর্ণ চোখ বুজেছে। আর চাইতে পারছে না সাহস ক'রে ঘড়ির পেণ্ডুলামটার দিকে। আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে। মৃত্যু আসছে, না জানি সে কি!

কুম্ভকর্ণের চেতনাও বুঝি স্তিমিত হয়ে আসছে। অর্দ্ধ-চেতন কুম্ভকর্ণের কানে অস্ফুট-গুঞ্জনের মতো চারিদিককার কোলাহল প্রবেশ করছে। ওরা কি বলছে কুম্ভকর্ণ বুঝতে পারছে না!—হয়তো কিছু বলছে—হয়তো এমনি করেই সব অস্পষ্ট হয়ে আসবে ধীরে ধীরে।

একজন চীৎকার ক'রে বললো, আর পাঁচ মিনিট। কুম্ভকর্ণের বুকে যেন কে ঘা মারলো।

পাঁচ মিনিট। বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট।

বন্ধু-বান্ধবে বাড়ির প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছে। সবাই ফিস-ফাস ক'রে কথা বলে। আয়োজনও হয় নিঃশব্দে।

খাট বিছানা ফুলের কথা উঠতেই যাজ্ঞসেনী চীৎকার

ক'রে 'ওঠে—'ও সর্ব্বনেশে-আয়োজন আমি কিছুতেই করতে দেবো না। যাঁরা এই পাঁচ মিনিট ধৈর্য্য ধরে সবুর করতে পারছেন না, তাঁরা যেতে পারেন।

টং-টং-টং… … …

সেই সর্ব্বনাশা ধ্বনি,

সকলেই চেয়ে আছে বড় বড় চোখ নিয়ে ঐ ঘড়ির কাঁটাটার দিকে।

ঘড়ির বাজনা বন্ধ হলো। দৃষ্টি পড়লো কুম্ভকর্ণের মুখের দিকে। সে-চোখ নিমীলিত—মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সবাই দেখতে চেষ্টা করে কোনো স্পন্দন আছে কি না।

হঠাৎ কুম্ভকর্ণ কথা বলে, বারোটা কি বেজে গেলো দিদি?

কুম্ভকর্ণ কথা বলছে, এ বিশ্বাস তখনও যাজ্ঞসেনীর ছিলো না।

স্বকর্ণে শুনেছে বড় ক্লক-ঘড়িটার টং টং ক'রে বারোটা বেজেছে। নিজের চোখ কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না যাজ্ঞসেনী। হয়তো ঘড়িটাতেই কোনো গলতি আছে।

ঘড়ি মিথ্যা, কি কোষ্ঠী মিথ্যা— সংশয় জাগে মনে।

বিছানা ছেড়ে তড়াক ক'রে লম্বকর্ণ উঠে পড়ে। বলে, তোমরা কেউ কিছু ব'লো না, আমি একবার ঐ বুড়ো কবরেজটার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসবো।

গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রেও বাড়ীতে কবিরাজের সাড়া পাওয়া গেলো না।

* * *

পরদিন সকালে কবিরাজ মশায় হাসতে হাসতে এসে দর্শন দিলেন।

কেউ কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, কই মা, এবার আমার ঋণ শোধ করো!—কেমন চিকিৎসা? এ ডাক্তারি-বিদ্যায় কুলোতো না। ঠিক একটি মাসের চিকিৎসায়…বাবাজি, কেমন হালকা হয়েছো বলো দেখি? ইচ্ছা করলে ও এখন লম্বুর সঙ্গে দৌড়তেও পারে—কেমন না কুম্ভ?

কুম্ভ হাসে। ম্লান হাসি। বলে, বড় নির্ম্মম চিকিৎসা কিন্তু আপনার।

★

ধারা

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

বহু ব্যর্থ স্বপ্নগুলো
রেণু রেণু হয়ে
ধুলোর সাগরে বুঝি ওই মিশে গেল।
ভাসা ভাসা চোখের নজরে
একাকার হয়ে গেল
চেহারা তাদের।
দেখি আর,
হা-হুতাশ করি।
নোতুন-শিশুর মত ভেঙে ভেঙে পড়ে,
দুবার বিদ্রোহী আয়ু;
পুরনো সে পরিবেশ
হঠাৎ বদলে।
তবুও পড়ে না থেমে চলমান দিন;
বলে নাক এতটুকু সান্ত্বনার কথা।
ঝড়ে ঝড়ে তোলপাড় বুক :—
খুঁজে পায়
ভাঙনের যথাযথ মানে।
মনের জঠরে ভ্রূণ আগামীর ঘোষণা জানিয়ে
পথের প্রবাহ রাখে কেবলি বন্যায়।
রেণু রেণু স্বপ্নগুলো
বাষ্পাকারে
ওপরে উঠেই
ফিরে আসে ফের মেঘ হয়ে।
যুগে যুগে নিরন্তর পরিক্রমা চলে।

পেশেণ্ট

সত্যেন্দ্র আচার্য

ঠিক এম্নি সময়টা, অর্থাৎ এই বরাদ্দ সময়টায় রোজ ভাবতুম বসে মিস্ সুজাতা দত্তর কথা। আশ্চর্য্য, ঠিক এই সময়টা, যে সময়টায়, সময়ের ছোট হাতটা আটের ঘরে আর বড় হাতটা আলতো যখন দু'এর ঘরকে ছুঁই ছুঁই করত।

আর ঠিক এম্নি সময়টা পার করে সেদিন যখন চোখাচোখি হল ৭নং টিকেট ইস্যুর পেশেণ্টের সংগে—হঠাৎ একটু কাশল প্রথমে, তারপর, আমার প্রশ্নের কোন অবকাশ না রেখেই বলে ফেল্ল তড়বড়িয়ে,—ভাখত ডাক্তার, আমার হুপিং কাশি কিনা?

ইসারায় আরো একটু কাছে সরে আসতে বল্লুম। উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে সরাসরি কাছঘেঁষে সরে দাঁড়াল, সেণ্টার সেকেণ্ড কাঁটার মত সরু আর লিক্‌লিকে হাতটা আমার নাকের প্রায় কাছ পর্য্যন্ত বিলম্বিত করল, একবার কাশল, একটু দম নিল থেমে,—আবার বল্ল, হুপিং কাশি?

স্থির আর গোলাকার চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করলুম। অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশ বর্ষার আকাশকে পেছনে ফেলে আসা জীর্ণ জীবনটা এক কৌটা অবসরের অবকাশ চায়, তবু যেন ছুটী পাওবার মত জীবনের ক্যালেণ্ডারের কোথাও একটা লাল টিপ নেই। এম্নি উপায়হীন আর অবসন্ন চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে বিনম্র বল্লুম, আপনি বলুন।

এবারে মাথাটা আমার মুখের প্রায় কাছে এনে একহাতে ঝুলিপড়া কোটটাকে সামলাতে সামলাতে বল্ল, কি বল্লে, হুপিং?

অনুমানে বুঝলাম ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কানে কম শোনেন। হাতটা ধরে আস্তে আস্তে চেয়ারটার দিকে ঠেলে দিতে দিতে বল্লুম,—আজ্ঞে বসুন। বসলেন ভদ্রলোক। অদ্ভূত দীপ্তি তবু চোখে-মুখে। কাশতে কাশতে টান দিয়ে রুমালটা বের করলেন। কাশলেন। রুমালটা চাপলেন মুখে। থামলে আবার বল্লেন তেম্নি,—তাহলে হুপিং বল্লে ডাক্তার?

ডাক্তারী জীবনের সংগে খুব বেশী দিনের পরিচয় নয় যদিও, তবু এ্যাপ্রেণ্টিস কোর্স শেষ করে যেদিন হতে চাকরী নিলাম এই 'আরোগ্য সদনে' সেদিন হতে পুরো এক বছরের টানা পোড়েনে বহু ধরণের পেশেণ্টের সংগে পরিচয় হয়ে গেছে। তবু এ ধরণের সংগে একদিনও মুখোমুখি হবার কল্পনাও করিনি কোনদিন। প্রেসক্রিপসন্ স্লিপটা টেনে নিতে নিতে বল্লুম—আপনার নামটা কি বলুন ত?

কথাটা স্পষ্টতই একটু অস্পষ্ট হয়েছিল, মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিয়ে আবার জানতে চাইলেন, স্পষ্ট করে বল্লুম—আপনার নাম?

বোধ হয় ওটা স্বভাবসিদ্ধ, তাই মৃদু একটু হাসলেন, হেসে বল্লেন, নাম? আগে না বল্লেও চিনত, আর এখনো সেটাই আছে অবিশ্যি, দুখ্ খু বা কেউ চেনেনা। বললেও চেনেনা এখন।

কিছুদিন আগে অর্থাৎ সুজাতা দত্ত'র হপ্তাতিনেক আগে বোধ হয়, একজন এসেছিল পান চিবোতে চিবোতে। অত্যন্ত 'নিউরোটিক'। অসুখের ফিরিস্তি দিতে দিতে কেঁদে ফেলেছিল ঠিক শিশুদের মতই। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়টা ঘোড়ার গাড়ী গোনার সময় পার হচ্ছে বলে ছুটে পালিয়েছিল এক গাল হেসে ফেলে। ইনি যেন আরো জটীল।—একটু ইতস্ততঃ করে আবার বল্লুম, নামটা প্লীজ—

নিজের মনেই কী একটু বিবেচনা করলেন। করে বললেন, আজ কেউ চেনেনা, ভুজংগ সামন্তকে আজ কেউ চেনেনা।

ভুজংগ সামন্ত! নামটার সংগে অবিশ্যি বহুকাল আগেই পরিচয় ছিল আমার। পরিচয় সুত্রে নামটাকে

অতি সহজে আজো মনে করতে পারি। নামীয় লোকটাকে অতিকষ্টে যদি বা মনে আনলাম, না, প্রত্যক্ষমান লোকটার সংগে মৌলমিল পেলামনা কোথাও। তবু একটু চুপ করে থেকে ইতস্ততঃ বল্লুম, আচ্ছা, আপনি স্কুল মাষ্টার ছিলেন কখনো?

মাষ্টারীর কথায় ব্যাগ্রাকুল দৃষ্টি তুলে তাকালেন আমার দিকে, নিরুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে স্থির চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর অনুমত আর বিস্ময়ান্বিত উচ্চারণ করলেন,—স্বরঞ্জন না?

আর ভুল হল না চিনতে। পায়ের ধুলো মাথায় তুলে মৃদু বল্লুম স্মিত হাসতে হাসতে,—আপনি স্তার?

একগাল হেসে ফেল্লেন। সে হাসি পরিচয় করিয়ে দিলে দশ বছরের দীর্ঘ ব্যবধানটাকে। আরো যা দিলে, সামনের দাঁতগুলোর সংগে। দীর্ঘ দশবছর পরে এক মুহূর্তে আরো অনেককিছুর সংগেই—কান, চোখ, অসুখ, সর্বোপরি ভুজংগ সামন্তর জীবনটার সংগেও।

আমিও হাসলুম। হাসতে হাসতে বল্লুম, সম্পূর্ণ বদলে গেছেন স্তার, কোন উপায়-ই নেই চেনবার।

বিনিময়ে আরো একবার স্মিত হাসলেন ভুজংগ সামন্ত।

অথচ, অথচ একদিন কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে চিনতুম সত্যিই সব্বাই। গাঁয়ের স্কুলের ইতিহাসের মাষ্টার বলে নয়,—অগাধ পাণ্ডিত্য আর দক্ষতাকে বাদ দিলেও আরো কিছু ছিল চেনবার,—তার দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি অপরিসীম হিতৈষিতা তাঁর।

কবে এলেন স্তার? সব্বাই ভাল ত? সব্বাই ত কলকাতায়? একসংগে এতগুলো প্রশ্ন করে বসলুম।

একটু হাসলেন। হেসে একসংগে সবগুলো প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ—তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস তুলে বল্লেন, শুধু কেয়া ছাড়া।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ক্ষণিক সমাহিত হলেন, তারপর বল্লেন, এসেছিল আবার চলে গেল।

ঠিক বুঝতে পারলুম না। তাকিয়ে রইলুম ফ্যালফ্যালিয়ে।

বুঝলে না স্বরঞ্জন? কেয়া নেই। বল্লেন তেমি আমার চোখের ভাষাটাকে ধরে নিয়ে।

সান্ত্বনা দিলুম সাধ্যমত। বল্লুম, আপনি আর কী করবেন স্তার, ও সব ওপর-অলার হাত। ডাক্তার, পয়সা, মানুষ, যাই বলুন, উপলক্ষ মাত্র।

ঠিক, ঠিক বলেছ স্বরঞ্জন। নাটকীয় উচ্চারণ করলেন স্তার। সবই ওপর-অলার হাত, না?

একদিন দৃষ্টি তাঁর পড়বেই। সুখ আর দুঃখ এই দুটো খাঁটি সত্তা নিয়েই ত দুনিয়া স্তার।

ঠিক, ঠিক বলেছ স্বরঞ্জন। সেই এক-ই আর এক-ই তেম্নি অদ্ভুত শোনাল কণ্ঠস্বরটা।—কিন্তু দৃষ্টি তাঁর পড়বে? শুনেছি অ-অনেক ওপরে যে তিনি?—কেশে উঠলেন স্তার। বোধ হয় আরো কিছু বলবার ছিল। দশ বছরের সঞ্চিত আর বহমান কথাগুলো গলার কার্নেস দিয়ে হাল্কা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, বল্লুম, উত্তেজিত হবেন না স্তার, একটুখানি শুয়ে পড়ুন, একটু বিশ্রাম নিন।

না, বিশ্রাম আমি নেব না স্বরঞ্জন,—শোব না, শুতে বল না। দৃঢ়তার সংগে বাধা দিয়ে কথাগুলো যেন বলে ফেললেন। ভয় করে, বড্ড ভয় করে, ভাবি আর যদি উঠতে না পারি?

বেশ ত, না শোন, একটু বসুন না স্থির হয়ে। ভাবলে আপনিই কষ্ট পাবেন। যা হয়ে গেছে অনর্থক তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কি স্তার?

নির্ব্বাক বসে রইলেন পা দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে মনে হ'ল ইজেলের ওপর একটুকরো 'ষ্টাডি' যেন।

নির্ব্বাক বসে রইলেন।—মনে হল দশ বছর পরে আজকে আবার যেন ক্লাস নিচ্ছেন সেই ইতিহাসের। বাহমনী আর বিজয়নগর পার হয়ে কখন যেন চলে এসেছেন আরেক দেশের ইতিহাসে—

বুঝলে, আজ ভয় করে, লজ্জা করে দুশো বছরের ফেলে আসা পুঁথির পাতায় চোখ বুলতে।—যে বাংলার জলে-স্থলে শৌর্য্য-বীর্য্যের দুর্জ্জয় জাগরণ,—শক্তির পূজারী বলদৃপ্ত সন্তানের দল ভীরুতার যূপকাষ্ঠে কণ্ঠ এঁটে দিতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হল না। রক্তক্ষয়ে ক্ষত বিক্ষত মন্ত্রের

যাকে মুহূর্তে দস্যুর হাতে তুলে দিয়ে দাসত্বের দাসখত লিখে দিলে পলাশীর প্রান্তরে।

—সব গেল, বুঝলে সব গেল।

রুদ্ধবাক হতেন ক্ষণায়ু এখানে।

কিন্তু আমি জানি তোমরা প্রস্তুত। অই ত আমি দেখতে পাচ্ছি বিলেতী কুঠিয়ালের দুরন্ত ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

—হঠাৎ থেমে যেতেন এখানে। ব্যাগ্রাকুল কণ্ঠটা দেবদারু গাছের মাথা ছাড়িয়ে ঐ পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে দিতেন।

নিস্তব্ধ ক'টা মুহূর্ত কাটিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠটা আবার বেজে উঠত একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে—

এ সন্ধ্যার অবশ্যম্ভাবী অবসানে ঘুম-পাখীদের বদ্ধ ডানায় আবার স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রের আভা ছিটকিয়ে পড়বেই। 'দিন আগত ঐ'—ওই ত সেদিনের মংগল শংখ। আজ তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে, দায়িত্ব আজ অনেক। মূক প্রাণ আর বদ্ধ ডানা নিয়ে যারা দিনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব—তাদের সে—

মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

যারা কিছু পেল না, লাভ-ক্ষতির অংক নিয়ে মাথা ঘামাল না, অথচ যারা—

"যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে
জীবনে মরণে"
যারা— টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল ;
যারা— মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে,
তাদের ডাকো, ডেকে শোনাও, ঐ শোনো—
"অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে,
গুরু গুরু গর্জ্জন, গুণ গুণ স্বর
দিন রাত্রে গাঁথা পড়ি দিন যাত্রা করিছে মুখর।"

তোমরা আগামী কালের ধারক। নতুনের বাহক। ঐ ত সেদিন, আমি দেখতে পাচ্ছি, সব ঝঞ্ঝার অবসান। নতুন দিনের আলো মেখে নতুন জীবন তোমরা পাবেই, পাবেই তোমরা—

ইজেলের টুকরোটা নড়ে উঠল, বললেন, কী পেলে বলত সুরঞ্জন ?

—"তার"—

"কী পেলে ? কিছু পেলে ?

বুঝলাম কী বলতে চাচ্ছেন। তারপর আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন।—বিস্ময়ভরা ছুটো চোখ। সবিনয়ে বললেন, একদিন যেও না সুরঞ্জন ?

কথা দিলুম, বললুম, নিশ্চই তার সময়মত নিশ্চয়ই যাব একদিন।

একবার কাশলেন, তারপর ঝুলে পড়া কোটটাকে সামলাতে সামলাতে, কুব্জ দেহটাকে টানতে টানতে নিষ্ক্রান্ত হলেন টলতে টলতে।

ঠিক এম্নি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল সুজাতা দত্ত।—"কী পেলুম বলুন ত ডক্টর ?" প্রথমে বিস্মিত হয়নি, তারপর কখন যে হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম, টেরও পায়নি।

আর, হঠাৎ-ই এম্নি ভুজংগ সামন্তর মত নাটকীয় প্রবেশ করেছিল সুজাতা। সরাসরি কোন ভূমিকা না রেখেই একবার চাইল চারিদিক, তারপর অনেক সন্তর্পণে বলেছিল, একটু কম্প্র গলায়,—আমি মা হতে চলেছি বোধ হয়।

যথাযথ পরীক্ষা করলুম, করে বললুম, আপনার অনুমান মিথ্যে নয়।

জানি, দ্বিধা সংকোচ জড়তায় জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিল সুজাতা।—আর সেই জন্যেই ত এলাম ছুটে—

কিন্তু ক্ষমা করবেন। ওটা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ।

"নীতি বিরুদ্ধ ?" আমারি শব্দ ছুটোকে বেছে নিয়ে উচ্চারণ করল গুণগুণিয়ে। কিন্তু নীতিতে আপনার বাধতে পারত তখনিই, যদি ইচ্ছার প্রেরণায় নৈতিক অবনতির নিরঙ্কুশ মনোবৃত্তি থাকত।—সান গাগলসটা নামিয়ে রেখে কটাক্ষটা তুলে ধরল। মাথা নীচু করলুম। বেশ উঁচু গলাতেই বললুম, আপনি যা বলতে চাচ্ছেন, না, সে অসুধের কোন ব্যবস্থা পয়সা নিয়েও এখানে করা হয় না।

সে দুর্ভাগ্য আপনার নয়, আমার। সরাসরি উত্তর দিলে। উঠে দাঁড়াল তারপর। গাগলস্‌টা চোখে লাগিয়ে একটু ইতস্ততঃ করল। আবার বসল, বসে তারপর দৃঢ় আর দৃপ্তকণ্ঠে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিল, কী পেলুম বলুন ত ডক্টর, কী পেলুম?

কী পেলেন না পেলেন মনুমেণ্টের নীচে গিয়ে করুন। রাগে ফেটে পড়ে বললুম। —আরো ত অনেক রোগী আছে, এটা ত আর প্রাইভেট চেম্বার নয়।

উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্যে ফুটো হওয়া বেলুনের মত মুখটা যেন চুপসে গেল। পরক্ষণেই বিবর্ণ মুখটা বলিষ্ঠ জবাব দিলে, যাচ্ছি, কিন্তু নামটা যখন লিখলেন, তখন দয়া করে জবানবন্দীটুকু যদি লিখে রাখেন পাশে।

ওসব অন্য কোথাও লেখানগে, তেম্নি রাগেহেই বললুম। সেই একই কথা-ই ত বলবেন,—বাবার ইন্‌স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম আর ছোট ভাই বোনদের মানুষ করা।

গাগলস্‌টা চোখে লাগিয়ে বলল, অস্বীকার ক'রিনে, হ্যাঁ, সেই একই। গোত্র বিভিন্ন হলেও বর্ণ সেই এক। আর সেই জন্যেই ত সাধ্যানুসারে যা দিতে পারলুম, সবটুকু আদায় করে নিলে।

চুপ করল সুজাতা। নির্ব্বাক, নিশ্চল একটা মুহূর্ত। নিস্তব্ধতার পর্দা সরিয়ে আবার বলল, চাকরীটা অবিশ্যি সেই জন্যেই রয়ে গেল সেযাত্রা। যা শুধু নেই, ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল থির থির করে—বাকীটুকু বলতে গিনে। কণ্ঠটা কে যেন চেপে ধরল। কেঁপে একটু থেমে গেল। একটা ধাক্কা খেল উঠতে গিয়ে, তারপর টাল সামলিয়ে বের হয়ে গেল টলতে টলতে।

সত্যিই চলে গেল সুজাতা। তবু যাবার আগে একটা যেন দাগ রেখে গেল কোথায়। যেটা খচখচ করত ঠিক এই সময়টায়। যার জন্যে ঠিক এম্নি সময়টা অর্থাৎ এই বরাদ্দ সময়টা রোজ ভাবতুম বসে মিস্ সুজাতা দত্তর কথা। আশ্চর্য্য, ঠিক এই সময়টা, যে সময়টায় যন্ত্রের ছোট হাতটা আটের ঘরে, আর বড় হাতটা আসত যখন ছ'এর ঘরকে ছুঁই ছুঁই করতে।

আর ঠিক এম্নি সময়টা পার করে, ইতিহাসের মাষ্টার ভুজংগ সামন্তকে বিদায় দিলুম, শুধু সে বিদায় নিল না,—সরষে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটে আসা, আঁচলে চোর-কাঁটা গেঁথে যাওয়া একটা মেয়ে সে। অনেক সন্তর্পণে ডেকে উঠতুম, কেয়া।

চুপটি করে চোর কাঁটাগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে বলত, বলো।

যদি এম্নি করে অন্ততঃ একটা চোর-কাঁটার মত তোমার হৃদয়ের কোথাও গেঁথে থাকতে পারতুম,—

আঁচলে চোখ ঢাকত কেয়া। চোখ থেকে আঁচলটা আলতো খুলে দিতে যেতুম। বাধা দিত, আবার দিত না। ছোট্ট একটা ওজর আপত্তি তুলে ধরত হয়ত, নয়ত না।

শোন, আঁচল হাতে চেপে ধরে বলতুম।

না, আবার একটা আলতো আপত্তি ছুড়ে দিত।

দুটো চোখ। দুজোড়া চোখ। আবেগে কম্প্রমাণ। অনুভূতিতে আবেগময়। দূরে নীল। নীচে জল। পাশে ধান ক্ষেত। মাঠে গান।

আজো আছে মধুমতী। স্বচ্ছসলীলা। চৈতের খরা রোদ। ধান, হয়ত আছে। গান, নেই বা আছে। দূরে নীল আছে বা নেই। কিন্তু নেই, কেয়া নেই।

কাজের চাপে আর রুজী-রোজগারের তাগিদে ভুলেই গিছলাম সে কথা। টুকরো চিঠি একটা যাওয়ার কথাটা হঠাৎ সেদিন মনে পড়িয়ে দিলে।

ঠিকানা অনুসারে জায়গাটা শহরের উপকণ্ঠ। বাস থেকে নামলে সংকীর্ণ বস্তীবহুল পথ। ক্ষীয়মান ক্ষোয়াদের দাঁতখিঁচুনি সহ্য করতে হবে মিনিট আষ্টেক। বর্ষার মুখেই যা অবস্থা, ভাদরে অবশ্যই কাপড় ওঠে হাঁটুর ওপর। টিমটিমে গ্যাসের আলোগুলো গাঁজাখোরের মত নেশায় যেন ঝিমোচ্ছে। যারা ক্ষীণায়ু, বে-জলা তারা।

রবারকলের অনতিদূরে কতকগুলো মুরগী চরছিল। ফার্ণেসের বাঁদিকে যারা রাতের মহড়া দিচ্ছিল সিয়ারামের মাধ্যমে, জল ছপছপ করে সেদিকে যে লোকটা এগিয়ে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করলুম তাকে, ১১নং কলোনী-টায় কোন দিক দিয়ে ঢুকতে হবে বলতে পার?

অবশেষে ঢুকলুম ঘরে। টিমটিমে আলো আর আবছা ছায়া। দুটোই অদ্ভুত। ছায়া আর আলো, আলো আর ছায়া। ছেঁড়া পর্দার শার্সি দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখলে অদ্ভুত লাগে। দেখলে আরো লাগে স্যারের চেহারাটা। আরো অদ্ভুত সব মিলিয়ে অখণ্ড দৃশ্যটা।—একটু ইতস্ততঃ করে ডাকলুম, স্যার,—

সুরঞ্জন ? বিস্ময়ে একরাশ হাসতে গিয়ে এক ঝলক কেশে ফেললেন, থামলে বললেন, বোসো—

সরাসরি বিছানায় বসতে যাচ্ছিলুম। বাধা দিলেন, না, না, বড় ছোঁয়াচে সুরঞ্জন, সরে বোসো, ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বোসো। জানো ত হুপিং কাশি। হুপিং ত না সুরঞ্জন।

কি করে বলি, না, বল্লুম হ্যাঁ, স্যার।

কথাবার্ত্তা চলছিল টুকরো টুকরো। পা ছড়িয়ে বসে বছর চারেকের একটা বাচ্চা মুড়ি মুড়কি চিবোচ্ছিল,—বছর আটেকের বেটা, সাইজ করা কাগজগুলোয় আঠা লাগিয়ে ঠোঙা বানাচ্ছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকে আরো কয়েকটার কিচিরমিচির শুনছিলাম বাইরে।

কত কথাই হল। দেশের, দশের, সাময়িক পরিস্থিতির। আমার ডাক্তারীকে ব্যঙ্গ করে বললেন, যা বললেন, সারগর্ভ হল,—তোমাদের মত নগণ্য জনকয়েক এম, বি, ক'জনকে সারাবে সুরঞ্জন ? সারা সমাজটা আজ পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্থ। নিরসনের জন্যে যে ওষুধের প্রয়োজন, তা কিন্তু আজো কোন ল্যাবরেটরীতে রীসার্চ্চ হল না।—কেশে উঠলেন আবার। থামলেই হ্রস্বতর করে আনলুম আলোচনাটাকে। কিছু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা আর ডায়েটের একটা চার্ট তৈরী করে দিয়ে বললুম, আজ উঠি স্যার, সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। ন'টা বাজল প্রায়।

উঠবে ? রবির সংগে দেখা করে যাবে না ? যখন এলে, হাজার হোক রবি কাকা ত ?

রবিকাকা ? এখানে ? সবিস্ময়ে বললুম।

হ্যাঁ, ১৭ নম্বরে। উত্তর দিলেন স্যার।

বললুম নিশ্চয়ই যাব। বেশ আনন্দ হল কথাটা শুনে। যাব না ? অগ্নিযুগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার রবি কাকা যে—

সেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে দুটো চোখ বিসর্জ্জন দিয়ে যেদিন ছাড়া পেলেন, গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার নোটীশ এলো পরের দিনেই। অন্ধ চোখ দুটো অন্ধ রাজত্বের বদ্ধ্যাত্বকে ব্যঙ্গ করে শুধু ম্লান হেসে একটু বের হয়েছিল পথে।—আর পথেই যখন ঘর, তখন যাব না আবার ? বললুম, চলি স্যার,—

১৭ নম্বরে ঢুকলুম। আবক্ষ শ্মশ্রুমণ্ডিত গৌর চেহারা সরাসরি ঘরে ঢুকে ধ্যানমগ্ন রবিকাকার ধ্যানভংগ করে ডাকলুম, রবিকাকা।

প্রথমে বুঝতে পারলেন না। তারপর বুকে জড়িয়ে নিয়ে সোৎসাহে ডেকে উঠলেন, বিলি, বিলি, বোলতা, ভাখ, কে এসেছে, তারপর আত্মগর্ব্বে নিজে নিজে উচ্চারণ করলেন, হ্যাঁ, বলেছিলাম না একদিন আসতেই হবে সবাইকে ? সবাই এলো একে একে, আর তুই আসবিনা মানে ?

ঢুকল বিলি। স্বতঃস্ফুর্ত্ত অন্তরে তখনো আমাকে চেপে রেখে বললেন, আমাদের সুরঞ্জন, রঞ্জনরে, তোর রনিদা—

বিস্ময়ভরা চোখ দুটো বিলির চোখে তুলে ধরে বললুম, সুজাতা দত্ত ?

সেকি সুরঞ্জন, আমাদের বিলি, বোলতাকে চেন না ? পুতুল বিয়েতে কত ত নেমতন্ন খেয়েছ হে। তারপর একটু দম নিলেন থেমে। নিষ্প্রভ চোখ দুটো আন্দাজে বিলির চোখে তুলে ধরে বললেন, চিনিস না বিলি ? আমাদের রঞ্জন রে, সুরঞ্জন ? তোর রণিদা—

হলই বা দশ বছর। তবু আমি ত চিনি সেই জামফুলের ঝুমকো পরা ফুটফুটে ফুলের মত ছোট মেয়েটাকে। বোলতার মত ঘুর ঘুর করা বেণী দুলিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছোট বোলতাকে। কতদিন ত বাতাবী লেবুর ফুল ছিঁড়ে দিয়েছি। না দিলে কাঁদত, নিরুদ্ধ অভিমানে তোতা পাখীর মত রিনরিনে গলায় বলত, বারে মেয়ের বয়েস হচ্ছে না বুঝি ?

হাসলুম, বললুম, কার মেয়ে ?

বারে, আমার মেয়ে ত? পরীদির ছেলের সংগে সম্বন্ধ হচ্ছে শোনেননি বুঝি? পাকাগিন্নীর মত আবার অনুযোগ শুনতুম, আপনি হাসছেন, অথচ আমার কান্না পাচ্ছে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখছেন না, কিরকম বেড়ে উঠছে দিন দিন? ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা না?

ওদের পাঁজীতে একই মাসে একই মেয়ের একশ বার হয়ত বিয়ের দিন আসত। ফুল ছিঁড়ে হাত ভর্তি করে দিতুম, ভর্তি হলে বলত, নেমন্তন্ন রইল, যাবেন রণিদা। বোলতার মত ফুড়ুত করে ছুটে পালাত বলে ছুটে যাওয়া বিলির দিকে চেয়ে থাকতুম ফ্যালফেলিয়ে।

একগাল হাসতে হাসতে বললুম, কিগো পুতুলের মা, চিনতে পার?

ও তবু হাসল না, কোন কথা বলল না।

চিনলে না বিলি? আমি স্বরঞ্জন, রঞ্জন, তোমার রণিদা—তবুও না। হয়ত পারত, কিন্তু না। হয়ত আমার কথা ছুঁয়ে ওর হাসিখুশীর শিরাটা কারেণ্ট-ছোঁয়া লোকের মতই অসাড় হয়ে গেছে।

★

অসময়ের গান

সুশীলকুমার গুপ্ত

বড়ো অসময়ে যদি এইখানে এলে হায়।
বসো তবে, আহা, বসো কাছে এসে নিরালায়।
সব ধন দিয়ে মিটিয়ে দিয়েছি
সময়ের বাকী রাজস্ব,
শুনো বায়ু আর শীর্ণ শাখায়
খাজনা ও গান নিজস্ব।

বিরহের প্রেম-কাব্য শোনাবে
শুকনো পাতার মর্মর,
গেরুয়া রোদের আঁচলের নীচে
কাঁপবে হৃদয় থরথর।

চুপি চুপি ডেকে আনবো উধাও নিলীমায়।
বসো তবে, আহা, বসো কাছে এসে নিরালায়।

ছায়ায় আঙুল দিয়ে আঁকা হবে
স্বপ্নের মায়া-আলপনা,
পাখীদের ডেকে করবো না হয়
নূতন দিনের জল্পনা।

শাখার শিশিরে ঝরাবো সকালে
পুরাণো প্রেমের কণগুলি,
ফোটাবে হারাণো মুখের ছবিকে
জ্যোৎস্নার মায়া রঙতুলি।

বলবো তোমার কানে কানে: মন কারে চায়।
বসো তবে, আহা, বসো কাছে এসে নিরালায়।

তুমি শুধু বসে ভেবো আর গড়ো
পুরাণো দিনের ফুলঝুরি,
যেদিন দিয়েছি প্রেম ফুল-হার
করেছি তোমার মন চুরি;
সাজিয়ে দিয়েছি পল্লব-সাজে,
জেলেছি রূপের গৌরব;
কালো কেশপাশে এনেছে ভ্রমর
মুগ্ধ প্রেমের সৌরভ;
তোমার প্রেমকে লিখেছি সবুজ কবিতায়।
বসো তবে, আহা, বসো কাছে এসে নিরালায়।

বান্ধবী

সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সেই রাত্রিতে যাবার আগে দাদা বলেছিলেন, আমরা সবাই যেন পথের মাঝে তোকে একা ছেড়ে গেলাম। সত্যিই, বাড়ি ফিরে সমস্তই এত নির্জ্জন আর নিস্তব্ধ মনে হতে লাগল যেন উৎসব শেষে সবাই গেছে চলে, কেবল একলা পড়ে আছি আমি। রাতে চমকে ঘুম ভেঙে যায়। বিক্ষিপ্ত চিন্তায় ছেয়ে ফেলে মন।

এমনি করে কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। লক্ষ্মীর আসা-যাওয়া হয়ে উঠল বিরল। যখন আসে, আমার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে, ঘর পরিষ্কার করে চলে যায়। যেন এই ওর কাজ, এর বেশী দরকার নেই। আমি যে জল-জ্যান্ত একটা মানুষ ঘরে বসে থাকি তা যেন খেয়ালই করে না সে। মাঝে মাঝে কেবল যাবার সময় দিয়ে যায় পড়াশোনা সম্বন্ধে অতি সতর্ক চুল-চেরা উপদেশ। একবার বলে না, যেও কিন্তু সন্ধ্যায়। প্রতিদিন তাই কলেজ থেকে ফিরে অন্ধকার ব্যালকনিতে ওর আশায় পথ চেয়ে বসে থাকি।

সেদিনও এমনি করে পথ চেয়ে বসে আছি। নবীন এসে বলল, আজ আর খাবার আসবে না। বাঈ আপনাকে যেতে বলে দিলেন। ছোট বাঈ-এর সঙ্গে তাঁর কি যেন হয়েছে, ছোট বাঈ ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে আছে।

বললাম, হাঁটতে পারবো না, পায়ে ব্যথা। একটা টাঙ্গা ডেকে দে।

নবীন তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে দেখতে গেলে বললাম, নারে, তেমন কিছু হয়নি।

বাঈ নিজের ঘরে বসে মালা জপছিলেন, আমায় দেখে কপালে মালা ঠেকিয়ে একপাশে রেখে বললেন, এ ক'দিন তোমায় খবর পাঠালাম, এলে না যে?

দরজার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, কী করে আসব বলুন? আপনার মেয়ের হুকুম—পড়াশোনা না করে বাড়ি থেকে এক-পাও বেরোতে পারব না আমি।

—আর বলো না বাবা। ষ্টেসন থেকে সেদিন ফিরে এসে বললাম, এবার নিজেরটা দেখে-শুনে নে। এই বয়সে এ সব ঝঞ্ঝাট কি ভাল লাগে। তুমিই বলতো বাবা, এখন তো আমার কাশীবাসী হবার কথা? সেইদিন থেকে যে কথা কাটাকাটি চলেছে, তার আর বিরাম নেই। সেই সকাল থেকে যে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে আছে, কেউ তাকে ওঠাতে পারল না। আমার যাবার কথা শুনলেই চটে যায়। তুমিই বল? এ সবের মায়ায় আটকে থেকে, শেষে কি কাশীর গঙ্গায় গতি হবে না আমার? তুমি ছাড়া কেউ ওকে শান্ত করতে পারবে না, কারও কথা শুনবে না ও।

—আমি এসেছি জানলেই না ক্ষেপে যায়। তার ওপর কিছু বলতে গেলে আর রক্ষে নেই।

—তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরে এসে বসো।

হঠাৎ আমার পায়ের দিকে লক্ষ্য পড়তে বললেন, এ কি? কি হয়েছে? —ও কিছু নয়। পড়ে গিয়ে ব্যথা লেগেছে একটু। কিন্তু ভাবছি লক্ষ্মীর কথা, সেই সকাল থেকে না খেয়ে আছে, রাগ বটে।

বাঈ আমার কথার রেশ টেনে বললেন, রাগ বলে রাগ। এই যে আজ সকালে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, হোটেল শুদ্ধ সবাই ঝুঁকে পড়ল দেখবার জন্যে, ও উঠে একবার দেখলে না পর্য্যন্ত। বললাম, দেখে যা, সোয়ার ফেলে জিন শুধু নিয়ে ঘোড়া ছুটেছে হাটের দিনে। আহা, কে বুঝি মরে গেল। মরুক্ গে, এই হল তার উত্তর।

শোন কথা। তুমি একবার যাও বাবা। ও না খেলে আমার মুখে কি খাওয়া রোচে?

বুঝতে আর বাকী রইল না, এ হচ্ছে আসল কথার ভূমিকা। তাই যখন ঘর ছেড়ে যাচ্ছি, আবার বসতে বলে বললেন, রাত্তে একলা থাকতে তোমার ভয় করে না? দাদা তো চলে গেলেন, এবার এখানে এলেই তো হয় তোমার। কেউতো চাই তোমাকে দেখবার জন্তে। পাশে কী সুন্দর ঘর রয়েছে, সেখানেই তো থাকতে পার? আমিতো বুড়ো হয়েছি, আমাদের কথাটাও তো তোমাদের একটু ভাবতে হয়? লক্ষ্মীরও তো আর কেউ নেই এক আমি আর তুমি ছাড়া। সে হতচ্ছারা এ জীবনে আর ফিরবে না, হয়তো এতদিনে মদ খেয়ে খেয়ে শেষই হয়ে গেছে। কথা শেষ হলে উনি আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন উত্তরের অপেক্ষায়। আমিও ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকালাম এই নারীর দিকে, সব থেকেও আর কিছু নেই, কী দৈন্ত আর আকুতি তাঁর।

আর একটু এগিয়ে এসে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে স্বর নিচু করে বললেন, তোমার দাদার কাছে সবই তো শুনেছ? নতুন করে আর কী বলব?

ওঁর কথার গাম্ভীর্য্য আর গুরুত্ব প্রকাশ করবার প্রয়াস দেখে না হেসে পারলাম না, উনি একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে আবার সামলে নিয়ে বললেন, দেখ বাবা বয়সও তো কম হয়নি, কতকাল আর বসে বসে রুটি বেচবে। সারা জীবন যে রুটি বেচেছি, তা যদি আবার বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ফেরত দিতে পারি তবেই যদি পাপ মোচন হয়। কাশীবাসী না হলেতো আর তা সম্ভব নয়।

—বলছেন বটে কিন্তু লক্ষ্মীকে ছেড়ে আর আপনি যেতে পারবেন?

—ছেড়ে কি আর যাচ্ছি? ওকে যার হাতে দিয়ে যাচ্ছি সে কি আর ওকে ঠেলবে? বাবা, তুমি ছাড়া লক্ষ্মীর আর কেউ নেই। কম লোক তো এখানে আসে যায় না, কারুর সঙ্গে কোনদিন একটা কথা বলতেও দেখিনি। কী ক্ষণে যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভগবানই জানেন। তাই তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে চাই।

—আচ্ছা মা, বলতে পারেন, এই ত্রিবেণী সংগম কি করে সম্ভব হল? এই প্রথম ওঁকে মা বলে ডাকলাম সামনাসামনি।

উচ্ছসিত হয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, ত্রিবেণীর কথা বলছ বাবা? যাবই তো। তোমার ইচ্ছা হলে সব হতে পারে তোমরাই যে আমার কাশী, কাঞ্চী, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী। বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

এই প্রসঙ্গকে এড়িয়ে যেতে গিয়ে জড়িয়ে পড়লাম বেশী করে। উনি ভাবলেন আমি প্রয়াগে, ত্রিবেণী সংগমে যাবার কথাই বলেছি। আমার কথায় সম্মতির আভাস পেয়ে আশার আলোকে মুহূর্ত্তে তিনি দিশেহারা হয়ে উচ্ছসিত আবেগে কেঁদে উঠলেন। যে সমস্যা অহর্নিশ তাঁর মনকে দোলা দিচ্ছিল তার সমাধান পেয়েছেন মনে করে। হাত ধরে কৌচের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম স্থির হোন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হ'লে বল দিচ্ছ কিন্তু বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমায় ছুঁয়ে বললে কিন্তু।

তারপরেই উঠে গিয়ে আমাকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে আলমারী খুলে একটা বাক্স বার করে সামনে ধরলেন—তাতে একরাশ কাগজ-পত্র।

টাকা খাটাবার যত রকম উপায় আছে, এ যেন তার একটা এনসাইক্লোপিডিয়া—কোম্পানীর কাগজ সেভিংস সারটিফিকেট, শেয়ারের কাগজ। কতগুলো জমির কবলা কতগুলি বাজে ভুঁইফোঁড় কোম্পানীর। কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। তবু মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, আজে-বাজে কাগজ-পত্র বাদ দিলেও যা থাকে তার দামই হবে লাখ টাকা।

বললাম, এ সব আপনাকে কে করিয়ে দিল? এ সব এত বুঝলেন কি করে?

—কত সাহেব, কত বাঙ্গালী এসেছে আমার কাছে

কাগজপত্র দেখিয়েছে আমিও টাকা দিয়ে এক একটা হিসেব খুলেছি। কেন, কি হয়েছে?

—না কিছু হয়নিতো। এগুলি এখন রেখে দিন, আর একসময় এসে ভাল করে দেখবো।

একটু যেন মনক্ষুণ্ণ হলেন আমার কথায়, তারপরেই আবার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, আজই দেখে নাওনা বাবা। যা—আছে। গয়না—পাঁটি, সোনা-দানা।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, রাত্রে নয়। যখন কেউ না থাকে তখন এসে দেখবো। রাত্রিতে কে কোথায় দেখে ফেলবে।

কথাটা হয়তো মনে লাগল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সব গুছিয়ে গাছিয়ে আলমারীতে তুলতে তুলতে বললেন, যত শিগগির হয় তোমরা আমায় মুক্তি দাও। বাবা বিশ্বনাথ যে আমায় ডাকছেন। তিনি যে আদেশ দিয়েছেন তাকি লঙ্ঘন করতে পারি। একটু থেমে আবার বললেন, ও যদি আজ রাগ করে না থাকত, সব ঠিক হয়ে যেত।

যাও বাবা দেখ কিছু করতে পার কিনা।

এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হচ্ছিল লক্ষ্মী যেন সব দেখছে, সব শুনছে। জানতে পেরেছে আমি তার ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেয়েছি। করছি তাই নিয়ে চুল-চেরা হিসেব-নিকেশ। ছিঃ ছিঃ, কী হয়তো ভাবছে লক্ষ্মী। যাই ভাবুক, যেতেও মন সরছেনা। এ জেনেও চলে যেতে পারছিনে।

মা আপন মনেই আবার বলে চললেন, ওর উপোষ করবার অভ্যেস আছে, আমার হাড় জ্বালিয়ে খেল। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম—হতে পাবে মা উন্মাদ, হয়েছেন কাশী বাবার জন্যে। ধর্ম্মোন্মাদ হয়ে মানুষ এমন কিছু কাজ নেই যা না করতে পারে—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এত মায়া-দয়া, স্নেহ-প্রেম, এ ত কথার কথা নয়। যাকে ভালবাসে, তাকে সারা জীবনের উপার্জ্জন দিয়ে যাওয়া। তাই বলেছিলাম ত্রিবেণী সংগম। মা বুঝতে পারেন নি। আমি বাঙ্গালী, মা গুজরাটী, লক্ষ্মী মারাঠি। আচার ব্যবহার কৃষ্টি পৃথক হলেও এ সেই সনাতন বিশ্বব্যাপী প্রাণরস, যা সঞ্জীবিত করে রাখে সারা বিশ্বের স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালবাসাকে একই স্তনবৃন্তের সুধায়, দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে।

খোলা ছাদ সুমুখে করে এক কোনে লক্ষ্মীর ঘর। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম, লক্ষ্মী! আমি। দরজা খোল।—শুনছো? খোল। কি জ্বালা। খুলবে না? আরে আমি। বেশ মজাতো। চিনতে পারছোনা না কি?

ভেতর থেকে জবাব এল, অসভ্যের মত দরজায় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলোনা বলছি।

—তুমিও তা হলে পাগলের মত উপোষ করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেকোনা বলছি। ছেলেমীর একটা সীমা আছে।

দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে ও বললে, এখান থেকে সরে যাও, নইলে রক্ষে নেই কিন্তু।

মা ছিলেন দূরে দাঁড়িয়ে, বললেন, দেখলে তো বাবা। দেখ মেয়ের তেজ।

ইসারায় তাঁকে সরে যেতে বললাম। নগীন দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এসে বলল, ঐ দিকের জানালা খোলা আছে।

লক্ষ্মী শুনতে পেয়ে জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, আমি গিয়ে হাত দিয়ে জানলা ঠেলে দাঁড়ালাম। ও প্রাণপণ শক্তি দিয়ে ভেতর থেকে ঠেলছে আর আমি বাইরে থেকে।

অনন্যোপায় হয়ে হাত গলিয়ে দিলাম দু'টো কবাটের মধ্যে দিয়ে, তবুও চাপছে দেখে বললাম, লাগছে দেখছোনা? হাত ভেঙ্গে গেলে ঠুঁটো জগন্নাথ নিয়ে করবে কি? আচ্ছা পাগলতো! ক্ষেপে গেলে নাকি? মরে যাব যে। উঃ লাগছে যে!

—তুমি মরবে কেন? মরণ যদি হয়তো আমারই হোক, বলে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পরল। এখানে এলে কেন? তোমাকে না বাড়ি থেকে বেরোতে মানা করেছিলেম?

—তবু যে এসেছি সে তোমার কপাল জোর। আমায় আর দেখতে হ'ত না।

এবার বিস্মিত হয়ে বিছানা থেকে মাথা উঁচিয়ে বলে উঠল, তার মানে ?

—মানে আর কি ? বেঁচে আছি বলেই এসেছি।

—হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথা বল, বলে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল, সন্দেহ-সংকুল হয়ে উঠল দৃষ্টি।

—বেশ, বলছি সব। আগে দরজা খুলে দাও।

এবার অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, থাক্, থাক্ আর বলতে হবে না। বুঝেছি, দরজা খোলাবার ফন্দি।

—কাছে এসো, তোমার ছুঁয়ে বলছি—বলে হাত বাড়িয়ে দিলাম। লক্ষ্মী দরজা খুলে দিয়ে আবার খাটের ওপর এসে শুয়ে পড়ল, আমি ওর পাশে এসে বসলে বলল, সত্যি, বলতো কি হয়েছিল ?

কথাটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওকে এড়ান দায়। বার বার জেদ করতে লাগল। বলতে সুরু করলাম, আমাদের ঐ বাড়ির বালা সাহেব একটা ওয়েলি-যর ঘোড়া এনেছেন, আজ সকালে সেটায় চেপেছিলাম। এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করলাম খানিকক্ষণ, বেশ বেলা হয়ে উঠল। বুঝতে পারি নি, ঘোড়ার দানা খাবার সময় হয়েছে। ক্ষিধের জ্বালায় ঘোড়া পাগলের মত ছুটতে লাগল, তারপরেই সামনে এক বাড়ির দেয়ালে বাধা পেয়ে মুখ গুঁজে গেল পড়ে, আমি এতক্ষণ কোনমতে ঝুলে ছিলাম, এবার মাটিতে গেলাম পড়ে, কেবল রেকাবে বেঁধে রইল একখানা পা। সে এক অভিনব দৃশ্য। অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে রেকাব থেকে পা'টা ছাড়িয়ে নেওয়া মাত্রই ঘোড়া ছুটে চলল সদর রাস্তা পার হয়ে, হাটের মধ্যে দিয়ে। মনে কর তেমনি অবস্থাতে আমাকে নিয়েই যদি ছুটতো, তাহ'লে অবস্থাটা কি হোত ? নেহাতই কপালজোর বলতে হবে তোমার।

লক্ষ্মী রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল। হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে মুখ ঢেকে ফেলল। বিব্রত হয়ে জবাবদিহি করতে লাগলাম, এইবারটি ক্ষমা কর। আমার কী দোষ বল ? হঠাৎ ক্ষেপে গেল। যত চেপে ধরি তত স্পার লাগে গায়ে আর ক্ষেপে যায়।

তবুও চুপ করে আছে দেখে হাত ধরে মিনতি করলাম, তবু একটা কথারও জবাব দিলনা, হাতও টেনে নিলনা।

—বাপু, বলছি তো অন্যায় হয়েছে। এবার খেয়ে নাও, ছিলে মা'র ওপর রাগ করে, এখন আবার রাগটা ডবল হল। নগীনকে বললাম, যাতো, খাবার আনতে বল্।

—বাড়াবাড়ি করো না বলছি, সব ছুঁড়ে ফেলে দেব কিন্তু। যাও ঘোড়ায় চাপ গে—এখন এসেছেন আমার রাগ থামাতে। কে তোমাকে ডেকেছিল ?

—এসেছি এই যথেষ্ট। বাংলোতে কত লোক জড় হয়েছিল ভাবছিলাম প্রথম গিয়েই তোমায় দেখবো ? একবার খোঁজও নিলে না কে সেই হতভাগা ?

এবার লক্ষ্মীর সুর নরম হয়ে এল, বারে, আমি কি গুণতে জানি ? কি করে জানব সেই গুণধর তুমি ? জানলে যে যেতাম সে তুমি ভাল করেই জান। বাঙ্গালী গদি এঁটে সাহেব-সুবোর কাজ করে তারা যে ঘোড়ায় চড়ে, এদেশে অন্তত সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না

—এসেছ কখন ?

—সে অনেকক্ষণ। মা খবর পাঠিয়েছিলেন।

—ও এতক্ষণ মার ঘরে ছিলে বুঝি ?

—তাতো বুঝতেই পারছ, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর এমন কী হোল, না খেয়ে-দেয়ে রাত্রি পর্য্যন্ত শুয়ে রইলে ?

লক্ষ্মী মুখ গম্ভীর করে বলল, আগে বল কে সেই লোকটি যে তোমায় আবার নামিয়ে তুলে ঘোড়ায় চাপালে ?

—সে শুনে তোমার লাভ হবে না। সে তোমার আওতায় আসবে না। এবার আমার কথার জবাব দাও।

ওর কিন্তু জেদ বেড়েই চলল, আগে আমায় বল কে সে ? আগে বল। আমার কথা কানেও তুললো না।

—বড্ড পাগল তুমি। আমি কি খোকা, আমায় কোলে করে ঘোড়ায় তুলে দিয়েছে ? আমি নিজে চাপতে জানি নে ? বিশ্বাস কর আমি নিজেই চেপেছি।

তবু জেদ করেই রইল, আচ্ছা না বললে, তবে আমার গা ছুঁয়ে বল, আর কখনও ঘোড়ায় চাপবে না ?

—নাগো না। যতগুলি না আছে সবগুলো একবারে বলে দাও।

—আচ্ছা, বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তোমার এ সব দৌরাত্ম্যির কি শেষ নেই? একটা না একটা ত লেগেই আছে। যাক্, এবার বল কী কথা হল মার সঙ্গে?

—সে অনেক কথা। অত কথা বলতে পারিনে, ভালও লাগে না। দেখালেন একরাশ কাগজপত্র, কতগুলো সেয়ারের কাগজ, কতকগুলো কাজের, অকাজেরও কম নয়। লাখ টাকার ওপর হবে হিসেব করলে। আরও যা কিছু আছে সব দেখাতে চেয়েছিলেন পালিয়ে এসেছি। বুঝিও না অত।

অধৈর্য্য হয়ে কথায় বাধা দিয়ে ও বলল, তা হ'লে তুমিই বা ভাল করে বোঝ না, আমি কি করে বুঝব বল? তা ছাড়া তো রয়েছে সোনা-দানা, গয়না-গাঁটি আরও কত কি? নগদ টাকাও তো কম নয়। এ সব সামাল দেওয়া কি আমার কাজ? এ কি তুমি বুঝতে পার না?

হেসে বললাম, তাহ'লে এই ক'টা বছর ধরে কী করে জলজ্যান্ত ছ' ছটো মানুষকে সামাল দিলে? আর এখানকার যা কিছু তাও তো চলেছে তোমারই অঙ্গুলিহেলনে।

—ঐ এক কথা পেয়ে বসেছ।

লক্ষ্মীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার কাছে অস্পষ্ট রইল না। কিছুদিন আগেও বিষয়-আশয়ে আমার অনাসক্ত মনের কথা জেনে কত না গর্ব্ব অনুভব করেছে। আজ তার ইঙ্গিত কেবল বিস্ময়ই আনলোনা, আমার মনে মহাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল। বেশ বুঝতে পারলাম ও আমার কথাই বলছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে কত কথা যে আমার মনে উদিত হয়ে আবার বিলীন হয়ে গেল, তার আর ইয়ত্তা রইল না।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, চুপ করে আছ যে? কি ভাবছো?

—ভাবছি, তোমার জিনিষ তুমি সামাল দেবে না তো দেবে কে?

কে যেন দরজার বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল, আমার কথার জবাব না দিয়ে তাকে উদ্দেশ করে বলল, এই, সাহেবের খাবারটা এখানে দিয়ে যা। বল, সব গরম গরম নিয়ে আসতে। মিষ্টি আচারটাও দিয়ে যেতে বলিস।

কথা শেষ হলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসলো একটু, চেয়ে দেখ কেমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে! বেটা উজবুক কোথাকার! যা যা, নগীনকে পাঠিয়ে দে। এইসা নীরেট এই লোকটা! দরজা বন্ধ করে এসে আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করবার জন্যেই বোধ হয় জিজ্ঞেস করল, কী যেন কথা হচ্ছিল?

—ঐ সেই কথা। এ সবের ভার কে নেবে। সত্যিই ত তোমার জিনিষ, তুমি না দেখলে কে দেখবে?

এবার ও অভিমানে ফেটে পড়ল, এতদিনে এই বুঝি জ্ঞান হোল? আমি কার? আমি কি তোমার নই?

—ছাই আমার? প্রচ্ছন্ন অভিমানের রেশ টেনে বললাম। উত্তরে কী যেন বলতে গিয়ে বিস্ময় বিমিশ্রিত সুরে হাসতে হাসতে বলল, বাপরে বাপ, কী জিলিপীর প্যাঁচ তোমার পেটে! কখন কি কথা বলেছিলাম, সে কতদিন আগে! তাই মনে মনে জিইয়ে রেখে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নিলে বুঝি?

—আমার তো মনে আসছে না কিছু! কবে আবার কি বলেছিলে?

লক্ষ্মী এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমার হাত ধরে, চিবুকে নাড়া দিয়ে বলতে লাগল, বল, তোমার পেটে পেটে এত দুষ্ট বুদ্ধি কেন?

—আমার ঘাট হয়েছে বাপু, আর বলব না।

—তোমার কথা তুলে নাও তা হ'লে। বল তুমি দুষ্টুমি করে বলেছ ও কথা, ইচ্ছে করে বলোনি, বলে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলল।

বললাম, তুমি বলেছিলে ঠিক ঠিক, আর আমি বলেছি, ও আমার মুখ চেয়ে ধরে বলল, ঠাট্টা করে। বেশ তাই মেনে নিলাম। এ কথা যেন কোনদিন সত্য না হয়। আরও কত কি হয়তো বলতে যাচ্ছিল কিন্তু খাবার এসে পড়ায় আর বলা হল না। তাই দরজা খুলে দিয়ে বেয়ারাকে খাবার রাখতে বলে আচার আনতে মার ঘরে চলে গেল। তক্ষুণি আবার দৌড়ে ফিরে এল হাসতে হাসতে—ঘরের মধ্যে ঢুকে হাসিতে ফেটে পরে আমার হাত ধরে বলল, দেখবে এস মার কাণ্ড। সারা ঘরময় টুকটুক করে সব গুছিয়ে বেড়াচ্ছেন। মনে হচ্ছে

আজকের গাড়িতেই যেন রওনা হচ্ছেন আর কি। রগড় দেখে হাসিতে আমার দম ফেটে যাচ্ছিল।

ওর টানাটানিতে উঠে যেতেই হল দেখতে। আমাদের দুজনকেই হঠাৎ দরজার সামনে দেখে মার ভ্রু হয়ে উঠল কুঞ্চিত। লক্ষ্মী দু'চোখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে উদ্দেশ করে মা বললেন, আজতো অনেক রাত হয়েছে, কাল বিকেলের দিকে একটু বেলা থাকতে এসো। ঐ সব যা বাকী রয়েছে, বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে তো?

—এত তাড়া কেন? কবে যাবেন ঠিক করেছেন? লক্ষ্মীর ওই আপনি সম্বোধন মার লক্ষ্য এড়াল না। তবুও ক্রোধ দমন করে মুখ গোমরা করে বললেন, পাঁজী দেখে পুরুত ঠাকুর বললেন, পরশু ভাল দিন রয়েছে। তীর্থযাত্রায় ঐ দিনই খুব প্রশস্ত।

—যাবার দিনতো ঠিক হোল? ফিরছেন কবে?

—ফেরবার কথা বলছ? সে আমি কি জানি? জানেন বাবা বিশ্বনাথ।

লক্ষ্মী এবার আমার দিকে চেয়ে বলল, যাবার কথা জানেন উনি আর ফেরবার কথা জানেন বাবা বিশ্বনাথ!

—তুই তার কি বুঝবি? তাঁর ইচ্ছে ছাড়া কি কিছু হয়? এই যে মাণিককে পেয়েছি এও তো তাঁরই দয়া।

—হয়েছে, হয়েছে, আর পায়া বাড়িও না। মাথা গুলিয়ে যাবে।

মা বেশ উষ্ণ হয়ে বললেন, এর সামনেই তুই যা-তা বলিসনে। এ সে ছেলে নয়। বললাম আমার জিনিষ-পত্র একটু গুছিয়ে দে, রাগ করে গিয়ে শুয়ে রইলেন। চাকর-বাকরগুলোকে ডাকাডাকি করছি, তারা পর্য্যন্ত একাজ, ওকাজ করে এড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই ওগুলের মাথা খেয়েছে। এই করে কি তুই আমার যাওয়া বন্ধ করতে পারবি?

মা একটা ভারী বাক্স ওঠাতে যাচ্ছিলেন, লক্ষ্মী এগিয়ে এসে বাধা দিয়ে কৌচের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, নাও। এবার হাড়-গোড় ভেঙে এইখানেই পড়ে থাক। যাব বললেই হল!

—তা নয়তো কি? যার মত পাবার তার তো পেয়েই গেছি, বলে আমার দিকে একটা গর্ব্বের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

লক্ষ্মীও মার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার দিকে তাকাল দু'চোখে ভৎর্সনার দৃষ্টি নিয়ে—যেন যত দোষ আমার। তারপর একটুখানি গুম হয়ে থেকে বলে উঠল, বেশ, যাবেই যখন, যাও, কিন্তু লক্ষ্মণ ঝি আর সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

মা যেন একেবারে ছিটুকে পড়লেন, অত ঠাট্ করে তীর্থদর্শন হয় না। আমি একলাই যেতে পারব।

লক্ষ্মী একটুও চেঁচাল না, দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি কিন্তু আগে থেকেই বলছি, তাহ'লে কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না।

ওর কথার ওপর কথা বলবার সাহস এ বাড়িতে কারুর নেই, মা'রও না। নিরুপায় মুখে মুখ ভার করে মা গিয়ে একটা কৌচে বসলেন।

আমি প্রবোধ দিয়ে বললাম, ও তো মন্দ কথা বলেনি। রাস্তায় বের হওয়া'তো আপনার অভ্যাস নেই, বিপদ-আপদ হলে একটা লোকও তো চাই খবর পাঠাতে। অসুখ-বিসুখও তো হতে পারে!

—তাই যেন হয়। তা'হলে তো গঙ্গাতীরে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে স্থান পেতে পারি।

লক্ষ্মী ছুটে এসে মা'র মুখ চেপে ধরে বলে উঠল, মাপ কর বাবা। কাল আমি নিজের হাতে তোমার সব গুছিয়ে দেব।

এ প্রসঙ্গকে এখানেই শেষ করে দেবার জন্যে আমি বলে উঠলাম, মা আমাদের তো কারুর খাওয়া হয়নি। আজ ও সব থাক। কালতো আমি আসছিই।

মা মুহূর্ত্তে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন, মাকে থামিয়ে দিয়ে ও আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চলতে চলতে নিজের মনেই বলতে লাগল, মনে হচ্ছে আজকের গাড়িতেই যেন রওনা হ'য়ে যাচ্ছেন। আজ আর সারারাত বোধ হয় ঘুমোবেন না। বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে অনুযোগ ভরা গলায় বলে উঠল, তুমি কি ওঁকে সত্যিই যেতে বলেছ?

অপরাধীর মত অপ্রতিভ হয়ে উঠলাম, আমার বলা না বলার কি কোন মানে হয়? যিনি যেতেই চান তাঁকে ধরে রাখবে কি করে? তিনিই বলছেন, তিনিই করছেন, শুধু নিমিত্তের ভাগী হচ্ছি আমি, তোমার কথা শুনতে।

—বারে আমি আবার কি বললাম? পাসপোর্ট তো দিয়েই দিয়েছ? ব্যাস। এসো, এবার খেয়ে নেওয়া যাক্।

—শোন লক্ষ্মী! মন যখন একবার বাইরে চলে যায় তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায়না। ওঁর মন চলে গেছে কাশী, কাঞ্চী। ওঁকে যেতে দাও। লক্ষ্মণ লোকটা বোকা হলেও ইউ, পির লোক, পথ-ঘাট ভালই জানে।

—বেশ তা যেন হোল। কিন্তু এখানকার কি বন্দোবস্ত হল? আবার সেই অনুযোগের সুর নেমে এল ওর গলায়। সহজ গলায় বললাম, যেমন চলছে, তেমনি চলবে। লোকজনতো রয়েছে।

—কে কে শুনতে পাই!

—খেয়ে নাও তবে বলব।

—শুনিই না?

—কারা আর থাকবে? যারা আছে। দারোয়ান, চাকর-বাকর, ম্যানেজার, অভাব কি?

—কেন তোমার গুণতিতে আর লোক নেই? আরো দু'চার হাজার নিয়ে এসোনা তোমার লক্ষ্মীকে পাহাড়া দিতে? কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমি একাই একহাজার। কাউকে আর লাগবে না।

দেখলাম লক্ষ্মীর চোখদু'টো একবার জ্বলে উঠে নিমেষেই নিষ্প্রভ হয়ে গেল। খাওয়া হয়ে গেলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আবার এসে বসলে মশলার প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, কেন মিছিমিছি ব্যথা দাও? যা হবার নয় সে আশা করে কী লাভ? তাল-তমাল যেখানে হার মেনে যায় সেখানে আমি বামন হয়ে দেব চাঁদে হাত! তোমায় পাওয়া, সে যে কী পাওয়া, তা তুমি বুঝবে না। ভাবছো তবুও কেন আকাঙ্ক্ষা! মাঝে মাঝে আমিও তাই ভাবি। দাদা আমাকে সবই বলেছেন। বাইরেটাই তোমরা আমার দেখ, হাসি-খুসি, খাচ্ছি-দাচ্ছি দিব্যি। কিন্তু ভেতরটা আমার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে এই সব চিন্তায়। একদিন তোমায় বলেছিলাম না, জ্বলে জ্বলে এ দেহ একদিন ছাই হয়ে যাবে?

—তুমিও পাগল হলে দেখছি?

—আমায় তুমি প্রবোধ দিতে গিয়েছিলে কিন্তু অতি সত্যি কথা তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। তুমি বুঝবে না গো, তুমি বুঝবে না। কী যে অন্তর্দাহ, কী যে ভয়! তার ওপর তোমার ফাইনাল পরীক্ষাতো আসছেনা, আসছে আমার শেষ রায়ের দিন।

—রায় দেওয়া কি এখনও বাকি আছে!

—দেখা যাবে। জান, তুলসী দাসের একটা কথা আছে—'তীর পরে মন মসকরা তীরে কিনো ভাগ যায়'—মন হচ্ছে ক্লাউনের মত। সারকাসে সে আজে-বাজে খেলা দেখায়। আসল খেলা দেখাবার বেলায় সে ভেগে যায়।

—আমি বুঝি সেই ক্লাউন?

—ঠিক এই কথাই যে বলবে তুমি, এ আমি জানতাম। জান, মেয়েরা একটু বয়স হলেই ছেলেদের চেয়ে বেশী বোঝে। কিন্তু যতই বয়স হোকনা কেন, তোমরা সংসারের ঘোর-প্যাঁচ কিছু বোঝনা। মা'রও তোমাদের অবস্থা হয়েছে। সেই একচক্ষু হরিণের মত। প্রায় সব মায়েদেরই যা হয়। বিরূপ দিকটা মোটেই ভাবতে পারে না। একটা পর্ব্ব শেষ করে এসেছি বলেই হয়তো মাথায় এত বুদ্ধি এসেছে। একটু থেমে আবার বলল, কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা পড়ছিলাম। যাকে আমরা একটা অবতার বলে ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছি তার কথা একবার ভেবে দেখ। রাধিকার কি কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ছিল? তিনি কিন্তু আজ বিশাখা, কাল চন্দ্রাবলী এই করে গোপীনীদের ঘরে ঘরে মধু খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন আর এদিকে শ্রীমতি যে কৃষ্ণ বিরহে দিন দিন গুমরে গুমরে মরছিল...এ কথা কতটুকু প্রাধান্য পেয়েছে? যদিও সে কথা বলা হয়ে থাকে তা কিন্তু কৃষ্ণের অপার মহিমা কীর্ত্তনকে ছাপিয়ে ওঠেনি।

—আজ হঠাৎ এ সব কথা বলছ কেন? এ তুলনা—?

—ইচ্ছে করেই বলছি। সেদিন ষ্টেশন থেকে ফিরবার পথে আনমনে তোমার মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে পড়েছে। ঐ একটা কথাই আমার বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট, ফাইনাল পরীক্ষার পর তুমি কলকাতা চলে যাচ্ছ। মার কি সে জ্ঞান আছে, তোমাকে ধরে রাখা যাবে না। হঠাৎ এমন একটা রূঢ় কথায় আমার সমস্ত মন ব্যথায় ছেয়ে গেল, তবু মনকে দৃঢ় করে বললাম, এই জন্যেই কি আমার ওখানে যাওয়া বন্ধ করেছ?

—বন্ধ করিনি। কিন্তু যেতেও পা উঠতো না। না ছিল মনের বল, না ছিল দেহের শক্তি। তুমি মনে করো না এত ঠুনকো আমার মন। কিন্তু আঘাত কি আমাকে পেতে নেই? রাত দিন শুয়ে শুয়ে কত যে চিন্তা মনে এসেছে, খতিয়ান নিয়েছি এই ক'টি বছরের। তন-ভাবনা লেশহীন মন ছুটে চলেছে তোমার পিছু পিছু। কিছুই গ্রাহ্য করিনি—লোকভয়, লোকনিন্দা—

বাধা দিয়ে বললাম. লোকনিন্দাও তুমি গ্রাহ্য কর না?

দৃঢ় কণ্ঠে ও বলল, নিশ্চয়ই না। আমি কেবল ভয় করি আমার নিজেকে। যেন ভুলেও কখনও নিজের রাশ ছেড়ে না দিই। মনকে ভুলে গিয়ে দেহকে লাঞ্ছিত না করি। তুমিতো জান. তুমি ছাড়া জীবনে আর কারুর মনের পরশ পাইনি। সেদিনের কথায় যখন বুঝলাম, তুমিও একদিন চলে যাবে আমি যেন কাঠ হয়ে গেলাম। বল তুমি, আমার অনুমান সত্যি কিনা?

—তুমি আগে বল কেন রাগ করে শুয়েছিলে?

—তুমি প্রশ্ন করে আমার বলবার পথ সহজ করে দিলে, এতক্ষণ বলি বলি করেও বলতে পারিনি। তোমার কথা নিয়েই মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হ'চ্ছিল। ষ্টেশনের পথে তুমি আমায় যা বলছিলে সে কথা মাকে বললে, মা দপ্ করে জলে উঠে যা-তা বলতে লাগলেন। বললাম, আমার অনুমান না হয় মিথ্যেই হল, কিন্তু সেই মহাপুরুষটি যদি এসে স্বামিত্বের দাবীতে আমায় টান দেয়? এবার যেন বারুদে আগুন জলে উঠল। তার নাম শুনেই মা যেন, ঘৃণায়, রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন, বলে লক্ষ্মী একটু থামলো।

আমারও মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন। সরিসৃপের খোলসের মত সে তো গা থেকে ঝড়েই গেছে। বললাম, যে তোমায় চিরজীবনের মত বিদায় দিয়েছে, তাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন?

—কেন? তুমি তাকে কি করে চিনবে? হাড়ে হাড়ে পাজী বুদ্ধি তার। যোগসূত্র কেটে দিয়ে সে যায়নি। আমার তো মনে হয় এইখানেই সে আছে।

আমি অবাক হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে বললাম, বলো কী? তারপর হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা আমার হাতঘড়িটায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, অত রাত হয়েছে দেখ। এবার যাই? লক্ষ্মী টেবিলের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, এর পরেও তুমি বসে থাকবে, এই কি আমি আশা করেছিলাম? আমার বুকটা শির-শির করে কেঁপে উঠল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও বলে কি: এতো অভিমান নয়, নয় ব্যথা দেওয়া-নেওয়া। এ যে একেবারে দূর করে দেওয়া। ঘাড়ের বোঝাকে ফেলে দিয়ে রেশহীন নিষ্কৃতি।

—বসে বসে ভাবছো—কই গেলে না?

—না—না—না। আমি যাব না, তোমার তাতে কি? যত মিথ্যে অপবাদ দিয়ে মায়ের কানে লাগাও। আমি কি মাকে যেতে বলেছি? না আমি নিজের কোলকাতা যাবার কথাই বলেছি?

—বলোনি তুমি? তুমি বলোনি? আমি যে কবে কোলকাতা যাব তার ঠিক নেই এ আক্ষেপ তুমি করোনি? জুতোটা পরতে পরতে বললাম, এখনও তুমি কথ্য বাংলা ভালো করে রপ্ত করতে পারোনি, কী শুনতে কী শুনেছ। যাই অনেক রাত হয়েছে। এত রাতে তোমার সঙ্গে বসে বসে তর্ক করা অবান্তর।

লক্ষ্মী ছুটে যেয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, বড্ড রাগ বেড়েছে দেখছি। থাক্ এত রাতে আর রাগ করে বাড়ি যেতে হবে না। [ক্রমশঃ

বৈদিক কর্ম্মবাদ

ডক্টর মতিলাল দাশ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

যজুর্ব্বেদ মন্ত্র বলছেন :—

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।
প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম।
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্
শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্
যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্।
প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম
স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম ॥ ৯।২১

আমাদের জীবন যজ্ঞে প্রবৃদ্ধ হোক, আয়ু যজ্ঞনিবেদিত হয়ে দীর্ঘ হোক, প্রাণ যজ্ঞের উৎস্থজিত হোক, আমাদের দৃষ্টি যজ্ঞের দ্বারা প্রসারিত হোক—প্রাণ হোক বহুগামী, আমরা সমর্থ ও সবল হয়ে উঠি—আমাদের পৃষ্ঠ হোক ভারসহ ও সহিষ্ণু।

জীবন এক বৃহৎ যজ্ঞ। সে যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হোক। যজ্ঞের দ্বারাই কর্ম্ম বরীয়াম্ ও গরীয়ান্ হোক, আমরা হব প্রজাপতির প্রজা, পরমাত্মার প্রিয় সন্তান। হে জ্যোতির্ম্ময় দেবদল! আমরা যজ্ঞকর্ম্মের ফলে স্বর্লোকের অধিবাসী হয়েছি—আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

আসল কথাটি অমৃত লাভ। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে কর্ম্মযোগী পরমানন্দময় অমৃত লাভ করেন।

পৃথিবী আজ অর্থনৈতিক মতবাদে পরিপূর্ণ। সেখানে মানুষ অর্থদাস হয়ে পড়ছে—অর্থ মানুষের দাস, মানুষ অর্থের নয়, একথা একেবারে ভুলে গিয়ে বিশ্বব্যাপী আমরা দাহ জেলে দিয়েছি। তাই বিজ্ঞান ও কলা প্রাচুর্য্য এনে দিলেও জগৎজোড়া হাহাকারে দিক্‌দিগন্ত বিদীর্ণ হচ্ছে। এই ত্রাস, এই বিভীষিকা বণিকবুদ্ধিজাত। প্রতিদিন গ্রাস করব—এই কল্পনায় আমরা পাগল হয়ে উঠছি—শুধু নেব—কিছু দেব না—এই মনোভাবই পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার দুঃখের তামসীরাত্রি নিয়ে আসছে—কুরুক্ষেত্রের দানবীয় বটিকার প্রবর্ত্তন করছে—এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার শেষ চাই—এই দুরন্ত দুর্ম্মদ লোভের অবসান চাই। অর্থনৈতিক মূল্যে জীবনকে যাচাই করা ছেড়ে, আধ্যাত্মিক মূল্যে জীবনকে বেচতে হবে—সেই আধ্যাত্মিক মূল্য যজ্ঞ।

আবার ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে হবে—

যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ
স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা।
এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ
সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা ॥ ৮।২২ যজুর্ব্বেদ।

হে মহৎ কর্ম্ম! হে যজ্ঞ! তোমার পরম প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি পরমেশ্বর-চরণে আত্ম সমর্পণ কর—সেই পরম বিষ্ণুতে গমন কর। যিনি শান্ত ও উপরত হয়ে প্রতিনিয়ত যজ্ঞরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করছেন সেই যজ্ঞপতি কর্ম্মযোগীকে তুমি সিদ্ধি ও সার্থকতা দাও। হে বিরাট শক্তি, তোমার যে মহৎ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ কর—তোমার যে মহৎ যোনি সেই সর্ব্বশক্তিময় কেন্দ্রে প্রবেশ কর—হে যজ্ঞ, মানুষের জীবনে তোমার পূর্ণাহুতি হোক।

হে মানব! তোমার শরীরভূত এই যে যজ্ঞ, তাহা মন্ত্রে সুসংস্কৃত হোক—তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তুমি যজ্ঞাচরণ কর। যে যজ্ঞপতি! তুমি যজ্ঞ সেবন কর—স্তোত্রে ও মন্ত্রে বন্দিত, সবণীয় দ্রব্যে ভূষিত এই যজ্ঞের ফল তুমি ভোগ কর।

আমি যে কথাটি আপনাদের বলতে চাই—সে এই যজ্ঞের যে মৌলিক উপপাদ্য—আপনাকে অকর্ত্তা জেনে ভগবদুদ্দেশে সমস্ত কাজ করতে হবে—গীতায় যাকে বলা হয়েছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭

হে কৌন্তেয়! তুমি যা কিছু কর, যা খাও, যা পান কর, যা দান কর, যে তপস্যা কর—সবই আমাকে দাও।

তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তদ্গতচিত্তে কর্ম্ম করতে হবে—কর্ম্ম তখন তার আসক্তির মরীচিকায় নয়ন ধাঁধাবে না—তখন সমস্ত কর্ম্ম এক পরম প্রেমরসে আপ্লুত হবে—এক আনন্দের উদ্বেলতায় উদ্বেল হবে। তখন সবই মধুময় হয়ে উঠবে।

তখনই ভরদ্বাজের প্রার্থনার মর্ম্ম আমরা বুঝব—

মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাম্
মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিনং চ দেবতা
মহিশ্রবতার বাজমস্মে সুবীর্য্যম্।

ঋগ্বেদ ৬।৭০।৫

দ্যৌ ও পৃথিবী মধু বর্ষণ করুন—মধুধারায় আমাদিগকে সিক্ত করুন—কারণ তারা দুজন যে মধুদাতা, দ্যাবা পৃথিবী মধুদুঘা আর মধুব্রতা, তারা যজ্ঞের পালক হয়ে আপন দেব মহিমায় আমাদিগকে দিন অমূল্য ধন, দিন যজ্ঞ জীবন মহৎ যশ ও কীর্ত্তি, তারা সুবীর্য্য ও স্বাদু অন্ন দান করুন।

ফলভোগহীন যজ্ঞকর্ম্ম সুকৌশল কর্ম্ম—তার পালন ও অনুসরণে জীবনের ছন্দ বাজতে থাকে—চারিদিকে মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বৈদিক কর্ম্মবোধ আমিত্বের প্রসার করে—মানুষের ছোট আমি ভূমাকে সহসা ছুঁতে পারে না, তাই ধীরে ধীরে তার আত্মপ্রসার প্রয়োজন। তাইত যজুর্ব্বেদ বলেন—সর্ব্বভূতকে দেখতে হবে আপন আত্মায়—আর সর্ব্ব ভূতের মাঝে দেখতে হবে নিজের আত্মাকে—এই আত্মপ্রীতির প্রসারণে বিজ্ঞানঘনানন্দ জাগে—এই একত্বের উপলব্ধি হলে কোথায় থাকবে মোহ? কোথায় থাকবে শোক? এই যজ্ঞ কর্ম্মের পরিণতি তাই সর্ব্বাত্মানুভূতিতে—হৃদয়ের মহৎ ব্যাপ্তিতে আত্মার সর্ব্বব্যাপক উপলব্ধিতে।

এই আমিত্বের প্রসারে যারা যাত্রী তাদের কর্ম্মের আর একটি নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। ঋগ্বেদ বলেছেন—কেবলাদো কেবলাঘো ভবতি। যে একা খায় সে পাপই ভক্ষণ করে—মনুও এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন—

অঘং স কেবলং ভুংক্তে য পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞ শিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে॥

যে মানুষ নিজে খাব বলে পাক করে সে কেবল পাপই ভক্ষণ করে। যজ্ঞের পর যাহা অবশিষ্ট তাকে অমৃত বলে, অপরের ভোজনের শেষে যাহা অবশেষ থাকে তাকে 'বিঘস' বলে—সজ্জন ব্যক্তি এই অন্নই গ্রহণ করবেন।

গীতাতেও এই কথারই পুনরুক্তি—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ॥ ৩।১৩

যজ্ঞাবশেষ অমৃত—সকলকে খাইয়ে যে সাধু অবশিষ্ট পান করে তার সকল পাপ দূর হয়, যে পাপী কেবল নিজের অন্নই মাপে, সে শুধু পাপই করে।

আজ আত্মসর্ব্বস্ব অনুদারচিত্ত আমরা—মানুষকে অন্ন দিতে চাই না—ভোগের লেলিহান শিখায় নিজেকে প্রতিনিয়ত প্রলুব্ধ করে চির অশান্তি অনুভব করি—আজ কর্ম্মবাদের এই মৈত্রী ভাবনা বিস্তৃত হোক।

পৃথিবীতে আজ অন্তরের দৈন্যই পীড়াকর হয়েছে—অর্থ ও অন্নের দৈন্য হয়নি। মানুষের হৃদয়ের এই দারিদ্র্য দূর করতে পারবে—প্রাচীন ঋষির একটী মাত্র মন্ত্র—কেবলাদো কেবলাঘো ভবতি।—একা খাব না—একা খাব না—এই কথা আজ তারস্বরে সবাইকে জেনে বলতে হবে। ভোজন ভোজন নয়, যখন সে দশের তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত নয়। তাই আজ নব চেতনা জাগুক।

সমস্ত ভূতের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে নিবিড় আত্মীয়তা জাগুক। আমরা যেন বুঝি—জগতে যদি কেহ ক্ষুধার্ত্ত থাকে—যদি কেহ বঞ্চিত থাকে, তার ক্ষুধা তার বঞ্চনা সে ত আমারই ক্ষুধা আমারই বঞ্চনা। নিখিল জীবলোকের সাথে এই প্রেম যখন সত্য হয়ে উঠবে—তখন দেখা যাবে অনাহারেও জ্বালা হয় না—দরিদ্র্য অন্নের একমুঠিও পরম পরিতৃপ্তি এনে দেয়—আর বুক ভরে নিয়ে আসে এক পরম নিঃস্তব্ধ সুগভীর প্রশান্তি। তখনই কবির লেখা সার্থক হয়—

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে
মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব,
বহিছে একটি চির গৌরব, একথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে, প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

নিখিলের সাথে এই নিবিড় আত্মীয়তা আনবে বৈদিক কর্ম্মবাদ। যে কর্ম্মযোগী, প্রতিকর্ম্মের অন্তরালে পরমেশ্বরের সঞ্চার অনুভব করেন তিনিই সত্যকর্ম্মা ও সত্যধর্ম্মা।

অধ্যাপক নলিনীকান্ত ব্রহ্ম তার 'Philosophy of Hindu Sadhana নামক গ্রন্থে যজ্ঞের এই মর্ম্মকথাটি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার অনবদ্য অনুচ্ছেদ নীচে তুলছি :—

Yajna, in the wide sense of *tyaga*, seems to be the essence of all *dhrama* (morality and religion) and forms the soul of karma-yoga. This universe is, according to the *Rigveda*, the result of a *mahayajna* (great sacrifice) on the part of the Supreme person. The world is a *visristi* which literally means 'a throwing out', a giving out, a sacrifice on the part of the Lord. What formed his own being, got expressed and manifested externally in the shape of the universe and thus the whole affair of creation is regarded as a sacrifice. This *visarga*, this sacrificing of one's self form which others develop and multiply is the real nature of Karma, as applied to the universe as a whole and its Lord. The individual joins himself with the world process, this act of renunciation through which and by which the universe lives or has its being, when he performs a *'tyagatmaka Karma'* i.e. an action involving a denial of his bodily self but ultimately leading to the expansion of his higher self. Such Karma or action is really action for the sake of *yajna* (*yanartha karma*), action serving the purpose of the creator. The word *yajna* also means the Lord, the *Iswara* of all sacrifices or *visnu*. Enjoyment of worlder objects (bhoga) interfere with the plan of this universe, and disturbs the world-balance and harmony by creation an excess of attachment for some particular thing. It is renunciation (*tyaga*) a sacrifice that restores the equilibrium and re-establishes the lost harmony. The world-cause and the purpose of God are thus served by *tyaga* i.e. *yajna* but are baffled exclusive *bhogà* (enjoyment). Renunciation expands the self of the individual and free him from limitation and bondage, because it is through renunciation alone that he can join himself to the cosmic law. It is to be noted, however, that acts of renunciation, here means only those actions which are performed without any desire, selfish or self-less."

কর্ম্মযোগী অনুভব করেন তাহার যাহা কিছু করণীয় সবই পূর্ণের পদস্পর্শে সুন্দর, তাই অবহেলায় কিছুই তুচ্ছ হয়ে ওঠে না, তাহার সকল কর্ম্মই পরম সুন্দরের সঙ্গ লাভে ধন্য ও পুণ্য হয়ে ওঠে—জীবনের আনন্দ যজ্ঞে তাহার নিত্য নিমন্ত্রণ, তাই তাহার যাত্রা চির অম্লান, দীনতা তাকে মলিন করে না, ক্লান্তি তাকে ব্যাকুল করে না, পৃথিবীর নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর রৌদ্রতাপের জ্বালা সে অক্লেশে বহন করে—কারণ তিনি জানেন তাহার জীবনেই ভগবৎ গৌরবের পরিচয় মিলবে—তাহার ত্যাগে বিশ্বনাথেরই জয়, তাহার বীর্য্য বিশ্বদেবতার জয়রথ। তাই কর্ম্মযোগীর চিত্ত বিধাতার অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, ধূলির ধরণীর জন্মেই তিনি নব নব কর্ম্মের সৌরভে জন্মান্তর লাভ করে দিব্য ও সুন্দর হয়ে ওঠেন।

তখন কর্ম্ম হয়ে ওঠে—পূজার অঞ্জলি। ভক্তের পূজা নিবেদন—কর্ম্মী ভক্ত জানেন তার সবই দিতে হবে। তাহার যত কিছু আশা, যত কিছু আকাজ্ক্ষা বিধাতার চলার ছন্দে, তাঁহারই কল্যাণময় রাগিণীতে বাজিয়ে তুলতে হবে। এই অনুভূতিতে তিনি সমগ্র হৃদয়খানি পরম দেবতার সম্মুখে দেবালয়ের প্রদীপের মত তুলে ধরেন। বিশ্বজনের কল্যাণ বোধ তখন তাকে আনন্দের সমুদ্রে স্নান করিয়ে ধন্য করে তোলে—তার প্রাণের আরাধনা সার্থক ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভক্তির ও কর্ম্মের এই মিলনই কর্ম্মযোগের গভীরতম রহস্য। তখন সামঝঙ্কার জাগে—

সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো
য এক ইদ্ ভূরতির্থিজনানাম্।

স পূর্ব্যো নূতনমজিগীষন্তম্
বর্ত্তনোরস্থ বাবৃত এক ইৎ ॥

এস, এস সবাই—আত্ম শক্তির বিমল প্রভায়, অন্তরের ওজস্বিতায় তাঁর কাছে যিনি স্বর্লোকের স্বামী—যিনি দিব্যলোকের অধীশ্বর—পরম জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। তিনি যে এক ও অদ্বিতীয়—মানুষের ঘরে ঘরে তিনি অতিথি—তিনি চিরপুরাতন অথচ নূতনকে নিত্যই বরণ করেন, সমস্ত পথই তার মাঝে মিলেছে—তিনি যে এক ও গণদেবতা। গণসেবায় কৃতসংকল্প যোগী তাই গণের সেবাতেই গণদেবতার পূজা করেন। তাই তার কর্ম্ম বিশ্বকর্ম্ম—বিশ্বের ছন্দের সুষমা ও সামঞ্জস্য তাতে অভিব্যক্ত হয়—তাইত সে কর্ম্ম পূজা ও যজ্ঞ।

বৈদিক ঋষিদের এই মানসী শক্তি যে ভাবে কাজ করেছে, আজ আমাদের জাগ্রত চিত্তে তার সজীব নিদর্শন চাই—তবেই আমরা অনুভব করব পরম্পরা—তবেই আমরা বুঝব অতীতের সঙ্গে আমাদের সচেতন যোগসূত্র। প্রাচীনদের এই মহৎ স্মৃতি ও বৃহৎভাব আমাদিগকে আদ্যোপান্ত সজীব ও সচেষ্ট করে তুললেই আমরা সার্থকতা পাব।

যে ভক্তি কর্ম্মবিমুখ, তাহা শুধু ভাববিলাস। যাকে আমরা পরমপ্রিয় মনে করি—তার আত্মবিসর্জ্জনের প্রস্ফুট ছবি প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে—সে ত্যাগশিক্ষাকে যদি আমরা আদৌ আমল না দেই—তবে আমাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস একান্তই বৃথা।

কর্ম্মযোগ কঠিন ব্রত। জীবনের দুরূহ সংকটের মাঝে যখন যে ভক্তির সহায়তা পায়, তখনই সে সাফল্য লাভ করে। সুখে দুঃখে তাই ভক্তিকে আশ্রয় করতে হবে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন সেই বাণী স্মরণ করতে হবে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সব কিছু ফেলে তাঁকেই শরণ করতে হবে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ত্রিত ঋষি এই ভক্তিরসোদ্বেগ আত্মসমর্পণের কথাই বলেছেন :—

প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্ম্মি মন্ম ভুবো যথা বন্দ্যো নো হবেষু।
ধন্বনিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে প্রত্ন রাজন্ ॥ ১০।৪।১ ॥
যং ত্বা জনাসো অভিসঞ্চরন্তি গাব উষ্ণমিব ব্রজং যবিষ্ঠ।
দূতো দেবানামসি মর্ত্ত্যানামন্তর্মহাংশ্চরসি রোচনেন ॥১০।৪।২

হে পরমাত্মা—আমার আত্মাহুতি তোমার উদ্দেশে, তোমার পানেই আমার ধ্যান ও উপাসনা, আমাদের আহ্বানে তুমি প্রকাশিত হবে—বন্দনীয় ও বরণীয় হয়ে, হে অগ্নি, হে রাজা, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মরুভূমিতে প্রস্রবণের মত তোমারই শরণ নেয়।

হে জ্যোতির দেবতা, মানুষ তোমার দিকেই চলে. গোরুর পাল ব্রজে যেমন উষ্ণ খাদ্যপাত্রের দিকে ধাবমান হয়, মানুষও তেমনই তোমার দিকে ছোটে। তুমি যে দেবতাদের দূত—মর্ত্ত্য মানুষের তুমিই গোপ্তা—দেবতা ও মানুষের মাঝে তুমি মহামহিমায় আপনাকে প্রকাশ কর—তোমাকে প্রণতি জানাই।

পরমাত্মাই মানুষের নির্ভর আশ্রয়। মরুভূমিতে তৃষাতুর পান্থ যেমন নির্ঝরায় স্বাদুজল পানে তৃপ্ত ও কৃতকৃতার্থ হয়, তেমনই মানুষ যখন মঙ্গলময়ের করুণার বৃষ্টিতে সিক্ত হয় তখনই সে মুক্তি পায়।

ভক্তি ও কর্ম্মের এই গঙ্গাযমুনা একদিন জ্ঞান-সরস্বতীর সঙ্গমে আনন্দ-ত্রিবেণী সৃজন করে—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—তাঁকে জানলেই তাঁকে চিনলেই আসে অতিমৃত্যু, আসে মুক্তি ও অমৃতত্ব—অন্য পথ নেই—একথার অর্থ জ্ঞানবাদীরা ভুল করে বলেন—একমাত্র জ্ঞানের পথই কৈবল্যের পথ—এর মূল কথা ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোকশিখায় একমাত্র তাঁকেই জেনে আমরা পরম শান্তি পাই। তাঁর সাথে মানুষের মিলন হলে সকলই জানা যায়, সব রহস্য খুলে যায় আনন্দসাগর তখন দুলে ওঠে। সীমার ও অসীমের এই চিরন্তন লীলাভিসার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গমে আপন প্রকাশ অভিব্যক্ত করে, কিন্তু এই তিন পৃথক পন্থা নয়—তিনে এক, একে তিন এবং তিনের মধ্যে সহজতম পন্থা কর্ম্ম। কর্ম্মই আপন গতিবেগে ভক্তি জ্ঞানের সমন্বয় করে।

এই জ্ঞান আপন মহিমার অনুভূতি। আপন অমৃতত্বের বোধ। হিবস্বান্ আদিত্য ঋষি এই পরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন :—

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥
১০।১৩।১

পূর্ব্ব কবিপ্রেরণায় মহৎ এই নূতন প্রার্থনা দিলাম অর্ঘ্য জগৎপতির চরণে—এই শ্লোক—এই স্তুতি রাজপথের মত বিস্তৃতি লাভ করুক—হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ—তোমরা শোনো—তোমাদের রয়েছে দিব্য স্বভাব—দিব্যধামেই তোমাদের শাশ্বত অধিষ্ঠান।

বেদের এই সর্ব্বোচ্চ অবদান—মর মানুষের অমর বলে ঘোষণা। অথর্ব্ববেদ বলেছেন যিনি জানেন জীবই ব্রহ্ম, বিদ্বান্ পুরুষকে ব্রহ্ম বলেই মনে করেন, গোষ্ঠে যেমন গোরু বাস করে, সমস্ত দেবতাই তেমনই মানুষের মাঝে অধিষ্ঠিত। প্রথমে যখন মানুষের সৃষ্টি হল, তখন সমস্ত সিঞ্চন করে দেবতারা পুরুষের মাঝে প্রবিষ্ট হলেন। মানুষ দেবতা—অজ্ঞানের অন্ধকার, অবিদ্যার যবনিকা—তার সেই ভাগবতী সত্তাকে বিলুপ্ত করে রাখে—জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকশিখায় দেবতার সঙ্গে আপন ভ্রাতৃত্ব উপলব্ধি করে।

প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা।
মাতুর্গর্ভে ভরামহে ॥ ৮৮৩৮

কাণ্ব ঋষি বলছেন :—হে মহান্ দাতৃগণ, মাতৃগর্ভেই আমরা তোমাদের সহিত আমাদের চিরভ্রাতৃত্ব, আমাদের ঐক্য ও সাম্য স্থাপন করেছি।

মানুষ মূলতঃ ভগবৎ শক্তি। আমাদের বলিষ্ঠ পিতামহেরা মানুষের এই ভগবতী সত্তাকে তাঁদের সুগভীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—মানুষের এই অমৃতের অধিকারের কথা তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, ভগবানকে পাওয়া তাই নিজেকেই পাওয়া—সীমার মধ্যে অসীমকে চেনা; রূপের মধ্যে অরূপের দর্শন। আমাদের মন ও প্রাণ যখন বিশ্ববৃত্তকে পরিদর্শন করে না—করে বিশ্বের কেন্দ্র শক্তিকে, যখন বিশ্বকারণ ও বিশ্বকর্ত্তাকে চাহে, তাহার বিরাট জ্যোতিশ্ছটায় মুগ্ধ হয় না—যখন ক্ষুদ্রকে ও তুচ্ছকে ভুলে অসীম ও অনন্তকে চায় তখনই সে জ্ঞানের পথে চলে—তখনই সে আত্মোপলব্ধি করে। এই ভূমার অনুভূতি, বৃহতের এই আকর্ষণ যখন সত্য হয় ও সার্থক হয়, তখনই আমাদের ব্রহ্মবিহার—তখনই মানুষের ব্রাহ্মী স্থিতি। মহিমার আলোকে তখন সত্তা জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে—সমস্ত বন্ধন, সমস্ত শৃঙ্খল খুলে যায়, এক অপরিমেয় অপরিমাণ আনন্দের প্লাবনে মানুষ মগ্ন হয়ে যায়।

খৃষ্টধর্ম্মের পাপবোধ আমাদের প্রত্ন সংস্কৃতিকে কখনও কলুষিত করেনি—আমাদের সাধকেরা তপস্যায় অনুভব করেছেন—জগৎ আনন্দময়, আনন্দ তার উৎস, আনন্দ তার স্থিতি, আনন্দ তার পরিণতি। এই আনন্দ দর্শন ঋগ্বেদের ঋষিদের মন্ত্রে মন্ত্রে মহৎ দ্যোতনায় ঝংকৃত হয়েছে। বিরূপ আঙ্গিরস গাইছেন—

অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবকশোচিষম্।
হৃদ্ভির্মন্দ্রেভি রীমহে ॥ ৮।৪৩।৩১

হে সুন্দর, হে পাবক, হে শুচিসৌম্য অগ্নি, আমরা আনন্দে তোমার জয়গান গাইব, কারণ তুমি যে আনন্দময়, গাইব সকল হৃদয় দিয়ে—তুমি যে সকলের প্রিয়, আমাদের যা কিছু বাঞ্ছিত, সকলই আছে তোমার মাঝে, হে চির দীপ্যমান তোমার দীপ্তির উল্লাস আমাদিগকে উল্লসিত করুক।

আনন্দ, হাসি ও গান এইত জীবনের পরিচয়। তিনি যে মধুময়, মধুময় তার সৃষ্টি। মধুময় দৃষ্টি দিয়ে আমরা তাঁর মধুরতাকে আস্বাদন করব—সম্ভোগ করব তাঁর অনন্তরূপ, ভোগ করব তার অশেষ রস—স্পর্শ করব তার প্রেমের প্রকাশকে, ঘ্রাণ করব তার বিশ্ববিস্তৃত মধু সৌরভকে, আর ধ্যানগম্ভীর বিস্ময়ে শুনব তার মহামহিমার আরাধ্যকে।

এই জ্ঞান গুহাহিত রহস্যের উপলব্ধি। অথর্ব্ববেদের একটী মন্ত্রে এই কথাটি অতিসুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত দেখি।

বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং
ভবত্যেকরূপম্।
ইদং পৃশ্নিরদুহজ্জায়মানাঃ স্বর্ব্বিদো অভ্যনূষত ব্রাঃ ॥
২।১।১ অথর্ব্ববেদ

প্রতদ্ বোচেদ্ অমৃতস্য বিদ্বান্ গন্ধর্ব্বো ধাম পরমং
গুহা যৎ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুষ্পিতা
সঃ ॥ ২।১।২

শুক্লযজুর্ব্বেদেও মন্ত্রগুলি একটু বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়।

বেদান্ত রহস্য যিনি জানেন সেই ধীমান্ সেই পরম গুহাকে দেখতে পান—যে ব্রহ্মহৃদয়ে সমস্ত বিশ্ব একরূপ হয়ে যায়, একনীড় হয়ে যায়। সেই পরম রহস্যের গুহা বেদবিদ্ পণ্ডিতের বোধে জাগ্রত হয়—সেখানে জগতের

সমস্ত বৈচিত্র্য একরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়—সেই একই সর্ব্ব জগতের পরম আশ্রয়। সেখানে বিশ্ব একেরই নৃত্যছন্দ বলে অনুভূত হয়।

সেই অব্যাকৃত পরমব্রহ্মের অব্যক্ত তত্ত্ব হতে ভূত-ভৌতিক প্রপঞ্চজাত এই বিশ্ব দোহন করেন আদিত্য—জ্ঞানীরা তাই আদিত্যের সংবর্দ্ধনা করেন। বিদ্বান সেই অমৃতকে জেনে গুহাহিত সেই পরম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করুন—সেই ব্রহ্মের ত্রিপাদ রয়েছে রহস্যের আড়ালে—গোপনতম গুহায় যিনি এই গভীর অধ্যাত্ম বিদ্যা জানেন—তিনি আমাদের পিতার পিতা—তিনি আমাদের নমস্য তিনি আমাদের পরমপূজ্য।

বেদবাণী অমৃতের বাণী—মানুষের চেতনায় সে জাগাতে চেয়েছে লোকোত্তর বীর্য্য, মানুষের প্রাণে জাগাতে চেয়েছে স্বাধিকারের স্বপ্ন—তার কৃতিকে ধরতে চেয়েছে দিব্য ক্রতুর জ্যোতিতে, দীপ্ত দ্যুলোক হতে আনতে চেয়েছে অমৃতের স্পন্দন।

জীবন্মৃত ভারতবর্ষ আজ এই বেদের পতাকা বহন করুক—উচ্চে তুলুক বৈদিক কেতন, আজ আমরা যে স্বরাজ্য চেয়েছি তা সত্য হয়নি, সত্য স্বরাজ্য চেয়েছিলেন গোতম রাহুগণ—তারই কথা আজ স্মরণ করব—

প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি সংসতে
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া
অপোঽর্চন্নন্থ স্বরাজ্যম্। ঋগ্বেদ ১।৮০।৩

অগ্রসর হও—হে অগ্রণী, অভ্যুদয়ের পথে হোক তোমার প্রস্থিতি—তুমি সাহসী হও, নির্ভীক হও, যুদ্ধ কর, অবিরাম সংগ্রামে বিজয়ী হও। তোমার বজ্র অজেয়, হে ইন্দ্র, পৌরুষ তোমার বৈশিষ্ট্য, অন্যায় ও পাপের বিনাশ কর, অসুর দলন কর—শ্রেয় লাভ কর, এবং সংসারে আপন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কর।

অভিযাত্রী ইন্দ্র আমাদের সমর-নেতা—প্রতি বীর ভারতবাসী আজ এই বিজয়বার্ত্তা উচ্চারণ করবে—তারা কর্ম্মে ও ধর্ম্মে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। বিশ্বে আজ তারা আর্য্য সত্য আর্য্য কৃষ্টি, আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করবে।

যে অকর্ম্মা, যে দস্যু, যে ব্রতহীন, সে অমানুষ। মানুষ যারা তারা ব্রত পালন করে, ব্রত পালনের পথে তারা ঋদ্ধি ও শান্তি লাভ করে। আজ আবার আসুক সেই ব্রত দীক্ষা।

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি
দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি
শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে। শুক্ল যজুর্ব্বেদ ১৯।৩০

ব্রতচারিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য্য ভাগবত-পথ যাত্রা। ব্রতের পথে আসে দীক্ষা—অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ। স্তর পর স্তরে স্তরে ক্রমারোহণ—দীক্ষা চেয়ে দক্ষিণা—অধ্যাত্ম সুষমা ও মাধুর্য্য দক্ষিণায় জাগে আস্তিক্য বুদ্ধি, জাগে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা পরিণত হয় সত্যভাবে—সত্যই জ্ঞান, সত্যই পরম ব্রহ্ম। কর্ম্মব্রতের পথে দেশ আজ সেই মহত্তম সত্য লাভ করুন।

আমাদের এই অচলায়তনে পুনরায় কর্ম্মযোগ আরম্ভ হোক—আবার সামধ্বনি মুখর যজ্ঞ শালায় বাহির বিশ্বের লীলাচঞ্চল কর্ম্মপ্রবাদ সমাদর লাভ করুক—আবার অভি-যৌবন কণ্টকর জিগীষু হয়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হোক।

মানুষের প্রাপ্তির অন্ত সীমা নেই, এখনও রয়েছে অপরাজেয় গিরিশিখর—এখনও রয়েছে দুস্তর নেত্রলোক—এখনও রয়েছে মাথার উপরে নিঃসীম জ্যোতির্লোক—নব যাজ্ঞিক কর্ম্মী দল অনলস বীর্য্যে লাভ করুক নব নব ঋদ্ধি।

আর সেই কর্ম্মের চিরচঞ্চল গতিপথে প্রার্থনা করি—

দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজুয়তাম্
দেবানাং রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ম্
দেবা ন আয়ুঃ প্র তিরন্তু জীবসে। ঋগ্বেদ ১।৮৯।২

আসুক প্রিয় দেবগণের কল্যাণস্পর্শ, শুভ তারা আমাদের মতিকে ঋজু ও সরল করুন। আমাদের চারিদিকে দেবজীবনের সুষমা ও সৌন্দর্য্য ব্যাপ্ত রহুক, আমরা পাব দেবগণের সখ্য—দেব-জীবনে উন্নীত হয়ে আমরা দেবসম হবো, দেবতারা আমাদের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করুন—আমরা জীবনের পরিপূর্ণতায়, প্রাচুর্য্যে ও সম্পদে বরীয়ান হয়ে, গরীয়ান হয়ে সুখ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করব।

এই পরিপূর্ণতার আস্পৃহা আজ ভারতবর্ষে সফল হোক। পিতৃপুরুষের তপস্যার উত্তরাধিকারী আমরা তাদের স্বপ্ন সামনে করে এই ভারতে মহাভাবময় মহা-গৌরবময় মহাভারত গড়ে তুলি। [সমাপ্ত]

বাস্তব

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ভয়াল ভৈরব রূপ হেরিনু তোমার
হে বাস্তব! মনে হ'ল এ সংসার হ'তে
সৌন্দর্য, সঙ্গীত, স্বপ্ন নিয়েছে বিদায়
চিরতরে; মনে হ'ল সুন্দর ভুবন
রসহীন ধূ ধূ মরু! লতাপুষ্পদল
অর্থহীন।— এ কেবল নিষ্ফল প্রয়াস;—
ব্যর্থ করাঘাত এ যে দিবসরজনী
মানুষের অবরুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে
নিয়ে শব্দ-রূপ-রস-গন্ধ ও পরশ!
দেখিনু সম্মুখে চাহি'—জলস্রোতসম
অন্তহীন জনশ্রেণী চলিয়াছে ছুটে
উর্ধ্বশ্বাসে—তপ্তভালে স্বেদবিন্দু বহি'।
শান্তি, তৃপ্তি, স্থৈর্য আর বিশ্বাসবিহীন
প্রাণহীন যন্ত্র ওরা! আরাধ্য ওদের—
দয়াহীন সর্বগ্রাসী জঠর-দেবতা
বলি চাহে জীবনের যা কিছু সুন্দর,—
যা' কিছু মহান্! সদা ছাড়ে সে হুঙ্কার
'অন্ন চাই' 'অন্ন চাই'। সে বজ্র-নির্ঘোষে
গৃহস্থালী হ'য়ে উঠে বীভৎস শ্মশান!—
কবিকরধৃত বীণা ধূলায় লুটায়
অনাদরে উপেক্ষায়; শিল্পীর স্বপন
টুটে যায় বার বার লূতাতন্তুসম।
হে বাস্তব! হে দুঃসহ! ক্ষমাহীন তুমি
মানুষেরে করিয়াছ পশুর মতন
ঘৃণ্য দেহধর্মসার! আত্মার আসনে
জড়েরে বসায়ে পূজা ক'রেছ যতনে।
অর্থ তব পরমার্থ।—ভূত-ভগবান
তব চক্ষে একাকার। যে মায়াকাজল
সৃষ্টিরে করিয়া তোলে রহস্যমধুর—
মুছিয়া দিয়েছ তারে চিরদিন তরে
নেত্র হ'তে। হৃদয়ের যে মুগ্ধ বিস্ময়
স্তবরূপে একদিন উঠেছিল ফুটে
ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে—গেল সে কোথায়?
হে কদর্য! হে ভীষণ! হে রূঢ় বাস্তব,
তুমি কিগো জীবনের যাহা কিছু সার?
আর কিছু নাই তবে?—রঙিন্ কল্পনা?
দূর হ'তে লহ ভীত কম্পিত প্রণাম,—
রক্ষা কর হে কুরূপ, আসিও না কাছে;
এ মধুর মোহঘোর করিও না দূর!
আমার সুন্দরে তুমি আনিও না টানি'
ঐ তব কলুষিত পঙ্কিল পল্বলে!

★

কালের যাত্রা

সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সময়ের বালুচরে পদচিহ্ন এঁকে
কত স্বপ্ন ভেসে যায় স্মৃতিটুকু রেখে
সময়ের অস্থিরতায়;—
শুধু এই কালের যাত্রায়—।
আকাশ তারার মত মিলায়েছে সবে
উষার উদয় সাথে কখন নীরবে।
তবু এই দেহ ঘিরে এ-মাটির পরে
জীবনের স্বাদ তরে কাড়াকাড়ি করে
বৃথাই কেটেছে সময়,—
তবুও মরেনি বিস্ময়।
চলেছে জীবন নদী বাধা-বন্ধ-হীন
অশান্ত দুর্বার গতি আশা-সীমাহীন
কামনার আগুণ জেলে,
পরিশেষে কিবা তারা পেলে!
অন্তহীন জীবনের অন্তিম যাত্রায়
স্মৃতিচিহ্নটুকু রেখে নেয় সে বিদায়—
ধীরে ধীরে তাও মুছে যায়
চিরন্তন কালের যাত্রায়।—

চিতোর গড়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমারে হেরিনু আজি!
শৈল শৃঙ্গ ঘিরে
বহু ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী দুর্ভেদ্য প্রাচীরে
সুদৃঢ় প্রাকার মাঝে।
ডাকে আত্মা তব
ধ্বংসস্তূপে। যায় চলে যুগ নব নব,
বেদনায় পৃথ্বীতলে দীর্ঘশ্বাস বয়!
এ ভারতে চিরদিন পরম বিস্ময়
তুমি!
ভক্তি প্রেমে শৌর্য্যে বীর্য্যে ত্যাগে আর
সতীত্বের পুণ্যতেজে মহামহিমার
যজ্ঞভূমি।
আজো তব অগ্নির অক্ষরে
লেখা আছে বজ্রলিপি নিখিল অন্তরে।
কালের নিয়তি চক্রে
কত মহাদেশ
সভ্যতার ইতিহাসে হয়েছে নিঃশেষ!

কত যন্ত্র অভিযান বুদ্ধির বিজ্ঞানে
ক্ষাত্র যুগ শেষ হোলো আজি।
প্রাণে প্রাণে
শূদ্রশক্তি হয়েছে জাগ্রত।
রাজ্যেশ্বর
সিংহাসন ছত্রছায়া তলে নিরন্তর
রহেনাক ঐশ্বর্য্যের সম্ভোগ বিলাসে
স্বার্থ লয়ে সুখ-তারা
নাহি পরকাশে
মণি মাণিক্যের স্তূপে।
শত স্বেচ্ছাচারে
কাঁদেনাক পরাজিত
বন্দী কারাগারে।

ছিল যে নগর ক্ষুদ্র!
সেকি চিহ্নহীন?
পরিখা বেষ্টিত হয়ে তুমি আছ,—ভাবি-
একদিন
তোমারে পাবে না কেহ মর্ত্যলোকে।
হে বিরাট!
হে চিতোর! বহ্নিদগ্ধ তোমার ললাট,
তবু তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
এ মহা শ্মশান
করিতেছে কার আজি নিত্য স্তুতি গান?

সপ্ত তোরণের দ্বারে
দাঁড়ায়ে বিজনে
প্রতিটি প্রস্তর পানে
চেয়ে ভগ্ন মনে,
ভাবি কত দিগ্বিজয়ী এলো ঝড়ঝড়
তোমারে বধিতে হেথা
হে চিত্তের গড়!
কত রক্তপাত আর
কত অশ্রুপাত
কত যুদ্ধ দ্বন্দ্ব দ্বেষে
ঘাত প্রতিঘাত
তোমার ঊষর বক্ষে হোলো নারম্বার,
পাষাণপুরীতে তব কত হাহাকার
ধ্বনিয়া উঠেছে আর
তুমি ত্রস্ত হয়ে
সাজায়েছ চক্রব্যূহ জয় পরাজয়ে।

দম্ভোদ্ধত নৃপতির
গৃহযুদ্ধ মাঝে
তব পুরবাসীদের
মৃত্যুডঙ্কা বাজে
বেদনায় কহে ইতিহাস।
ক্ষীণালোকে
প্রতীকারহীন পথে বিচ্ছেদের শোকে
বিষপাত্র ওষ্ঠপুটে তুলি নরনারী
কেঁদেছে নীরবে আপনারে দিতে ডারি।

বাপ্পার জীবন কাব্য
রচেছিলে তুমি,
প্রকম্পিত করেছ যে
বোগদাদ ভূমি।
খোমানের কীর্ত্তিধ্বজা উড়ালে হেথায়
হামীর বাদল কুম্ভ ভীম
সঁপেছে তোমায়
আপন জীবন।
অমর কাহিনী তারা
রেখে গেছে ইতিহাসে।
আজো নাজবারা
অর্ঘ্য দেয় তাদের উদ্দেশে
পদ্মিনীর
আত্মত্যাগে সতীত্বের তেজে তব শির
হয়েছে উন্নত। জহরের

বহ্নিশিখা
তব ভালে এ'কে গেছে মৃত্যুঞ্জয়ী টীকা।

কত কৃষ্ণ কুমারীর
করুণার তীর
তুমি রচিয়াছ হেথা সমাধি মন্দির!
গোমুখী-গঙ্গায় মীরা
আজো গায় বুঝি.

আজো গিরিধারী তার
অশ্রু দেয় মুছি!
সন্তানের বলি পেয়ে চিত্ত পুষ্পে ভরি
বরাভয় দিয়েছে কি চিতোর ঈশ্বরী?
প্রতাপের রাজসিংহের
আরাধ্য-দেবতা
তুমি কি ঘুমায়ে রবে
কহিবে না কথা?

★

একটি কথা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থিল সময় কাটে সংক্রান্তির ডাক এসে যায়,
প্রত্যহের অবকাশ উত্তাপে উধাও,
বিষদগ্ধ আকাশের শেষ সীমানায়
নিঃশেষে মিলিয়ে যাক্ এই সন্ধ্যাও।

তারপর লুপ্তছন্দ নর্ত্তকীর মত
পরিত্যক্ত আসরের এক কিনারায়
আশাহত ম্লানমুখ সৌন্দর্য লুণ্ঠিত
রাত্রির অভিসার ঘুমন্ত তারায়।

তখনও একটি কথা শুধু বাকী থাকে
অবসন্ন জোছনায় অচেনার মত,
পান্ডুর সর্পিল ছায়া রেখা যায় এ'কেঃ
প্রাণহীন নৈঃশব্দের অন্তঃপুরগত।

তোমার মনের নিশা ভোর হোলো নাকি!
এখনও চল্‌ছি আমি—; এখনও একাকী।

কোন বন্ধুকে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমাকেই ভালোবেসে মনে হ'লো সতেরো ফাল্গুন
হৃদয়ে এ'কেছে তৃষ্ণা। তোমাকেই ভালোবেসে-বেসে
মনে হয় যেন কতো দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে এসে
পেয়েছি শ্যামল ছায়া অবশেষে। অনেক দুপুর
বৈশাখের অগ্নিঢালা গান শুনে কেটেছে, শ্রাবণ
কখন শোনালো শ্লোক, অথবা আশ্বিন দিলো সুর
মুক্তমেঘ হৃদয়ের, তারপর হেমন্তের আলো
আকাশে নিভিয়ে শীত হিমছায়া দু-হাতে ছড়ালো.
ধূসর যন্ত্রণা-মোছা এ-হৃদয়ে চৈত্রের আগুন
তবুও তো বারবার রেখে গেছে তৃষ্ণার প্লাবনঃ
কিংশুকের বহ্নি-সুখ, সমুদ্রের অতৃপ্ত কামনা।
তোমাকেই ঘিরে কতো কান্না হ'লো রোদ্দুরের সোনা!

তোমাকেই ভালোবেসে এতো পথ পার হ'য়ে এলেম!
এবার নিবিড় হও! জেহলে দিয়ে দেহ, মন! প্রেম!!

ক্যালেণ্ডার

শৈলেন্দ্র বসু

—আজকে মাসের কত তারিখ অমিয়া? ঘুম ভাঙ্গতেই সুবোধ বিছানার ওপর বসে তাকাল ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে।

—কত তারিখ আজ আর!

অমিয়া তখন রান্না ঘরে খুট খুট শব্দে ভোর বেলার কাজ সারতে ব্যস্ত। উনুনে কয়লার আঁচ্ তোলা, এঁটো বাসন-কোষণ মাজা—জল তোলা বাইরের কল থেকে।

ভাড়াটে বাড়ির জলের কল। সর্ব-সাকুল্যে দশ ঘর ভাড়াটেদের জন্য একটা মাত্র জলের কল। তাই প্রতিদিন ভোর হয় কী না হয় বৌগুলো এসে ভীড় করে কলতলায়। ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনি-গৃধিনীরা এসে জড়ো হয় তেমনি কলতলায় জলের জন্য বৌগুলো ঝগড়া করে পরস্পরে। ঝি নেই যে কাজের সাহায্য হবে। অমিয়া নিজেই এসে দু'বালতি জল তুলে নিল।

—শুনছ, আজকের তারিখটা?

এর পরেও নিঃশব্দতা। শুনতে পেয়েছে কী পায়নি বুঝতে না পেরে সুবোধ ভাবে—কথার উত্তরটা যখন দিল না অমিয়া তখন নির্ঘাত ধরে নেওয়া যায়, গত রাত্রির সেই ব্যাপারটা। মানে, কথায় কথায় তর্ক—তর্ক থেকে বিতর্ক, কলহ এবং রাগে মেশা সেই জেরটা বুঝি এখনও কাটেনি তার মন থেকে। তাই এখনও সে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট, এক-রোখা।

—কত তারিখ বললে না যে?

—ক্যালেন্ডার তো তোমারই চোখের সামনে! রান্না-ঘরে সদ্য আঁচ ওঠা গনগনে আগুনের উনুনটার সামনে বসে অমিয়া বললে। সুবোধ মাথার বালিশটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ঝুঁকে বসে রান্না-ঘরের দিকে তাকাল।

—বেশ একটু চটেছো যা হোক আজ!

—চটাও কেন সব সময়?

—এখন চট্‌বার কারণ!

—এখন চটিনি।

—চটেছো। রীতিমত চটেছো তারিখটা জিজ্ঞাসা করাতে।

—দ্যাখো, সকাল বেলা উঠেই তুমি বক্ বক্ কোর না। আমার কাজ সারতে দাও।

এরপর কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই, বেশ বোঝা যায়। কথায় শুধু কথাই বাড়ে, তর্কে তর্কে বিতর্ক। এক-ঘরে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলে সংসারের শৃঙ্খলা ছিন্ন হবার সম্ভাবনা।

সুতরাং এখানেই চুপ করে যাওয়া ভালো। না হয় কখন কী হয় অনিশ্চিত। অতএব চুপ করে যায় সুবোধ, রান্না ঘরের থেকে মুখটা ঘুরিয়ে দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে তাকায়।

কত দিন কাটল মাসের আর কতদিনই বা বাকী জানা দরকার।...কত তারিখ আজ...আজকের বারটাই বা কী?...রবিবার? হ্যাঁ নিশ্চয়ই রবিবার, অফিস্ ছুটির দিন। ক্যালেন্ডারের গায়ে লাল অক্ষরে লেখা সাত্, অর্থাৎ সাতুই তারিখ। সাতদিন? মাত্র ছটা দিন অতিবাহিত হয়েছে গত কালকের নভেম্বরের রাতে। কী ভীষণ শীত আর কলহ হয়েছে পরস্পরে মধ্যে। মাসের প্রথম তারিখের অফিসে পাওয়া মাইনের টাকাটা ফুরিয়ে গেলেই এমনি ঝগড়া হয় পরস্পরে। মাঝে মাঝে লোকাচার সামাজিকতার এটা ওটার ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুযোগ দেবেই অমিয়া। প্রথম প্রথম হাল্কা হাল্কা কথা, কথার কাটাকাটি, তর্ক তারপর বিরাট একটা অশান্তি পর্ব। হায়রে এমন কেরানী ভাগ্য—মানে দুর্ভাগ্য! না হলে এমন হয়।

সুবোধ সেই থেকে ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে ভাবছে। ভাববে আর কী, সাতুই প্রথম সপ্তাহ।...দেয়ালের গায়ে হাওয়ায় ফর্ ফর্ করে উড়ছিল ক্যালেন্ডারটা।

—হাত মুখ ধোবে না? কখন যেন রান্না ঘর থেকে উঠে এসে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছে অমিয়া।

—হাত মুখ ধুয়ে আর কী হবে

—চা খাবে না?

—চা? মানে তুমি বলছিলে না চিনি নেই ঘরে।

—ও ঘরের রাণুর মার কাছ থেকে এক ডিবে ধার এনেছি—কাল শোধ দেব বলে।

—তা দিও।

—দেবেই তো ভাবছি এনে দিলে। টাকার অভাবে এ

সপ্তাহের রেশন আনা না হোলে কাল থেকে হাঁড়িটিও চড়বে না বলে রাখছি!

কথাটা শেষ করে অমিয়া চলে যায় তড়িৎ পদে। ও হাঁটে বেশ সুন্দর আর শান্ত পায়ে, ছোট ছোট জায়গা নিয়ে। অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকানোর কী যে আরাম! কিন্তু ভাবলে মনের মধ্যে গত রাত্রির সেই জেরটা যেন আবার তীব্র হয়ে ওঠে সুবোধের অনুভূতিতে—বিরহের পর যা তাদের ছোট ছোট সংসারের এটা ওটার সংকটের। অভাব আর অনটনের তীব্র দহনের।

—সাতুই...সাতুই নভেম্বর! এখনও মাসটা শেষ হতে ঢের ঢের দিন পড়ে রয়েছে সামনে। আর একটা কী না পয়সা নেই তার হাতে। বিছানা ছেড়ে সুবোধ নিঃশব্দে কলতলার দিকে এগিয়ে যায় ভাবতে ভাবতে।

কয়েকটা দিন পর।

আকাশটা বেশ মেঘলা হয়ে আছে। পুরু মেঘ, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি নেই এই যা। শুধু ঠান্ডা হাওয়া বইছে জোড়। আশে পাশে সবাই বলাবলি করে—এবার সহরে খুব শীত নামবে। শীত নামার আগে নাকি এমনি মেঘ আর ঠান্ডা হাওয়া দেয়।

এই শীতের মধ্যে সকাল বেলা উঠেই ছেলেটা ঘুর ঘুর করে ছোট্ট বারান্দাটায়। পাত্‌লা একটা জামা গায়ে, ছোট্ট কোমল পা দুখানায় জুতো নেই, মোজা নেই। অতটুকু ছেলে এই শীতে বাইরের হিমে ঘুরলে ঠান্ডা না লেগে যায়! একটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়লে! অমিয়া রাগ করে।

—পিন্টু!

—এই যে মা!

তোমাকে বলিনি ঠান্ডার মধ্যে বিছানা থেকে উঠে এসো না। তোমার বাবুর লেপের তলে চুপটি করে শুয়ে থাক!

—লেপ ভালি গলম মা!

পিন্টু ছুটতে ছুটতে পালায়। পালাবে আর কোথায়, বাইরের কলতলায় বৌগুলো যেখানে জল তুলতে এসে কল নিয়ে ঝগড়া করে সেখানে এসে পিন্টু দাঁড়ায়। কলের নিচে বসানো বালতিতে জল পড়ার শব্দ শোনে। অমিয়া রাগে রাগে তার কান দুটো ধরে নিয়ে আসে। সে তার কানটা মলে, ডান হাত দিয়ে আল্‌গা একটা থাপ্পর মারে গালে।

—বলিনি ঠান্ডায় উঠে এসো না পিন্টু। বলিনি তোমায় দুষ্টু ছেলে?

—বলেছ। আল হবে না মা, আল উত্‌বো না। পিন্টু এবার কাঁদল হাই তুলে।

...কলতলায় জলের শব্দ, বৌগুলোর ঝগড়া, কাপড়-কাচার শব্দ আর পিন্টুর কান্না সব মিশে ভাড়াটে বাড়ীটার মধ্যে যেন একটা ঐক্যতান। সুবোধের অমন সুন্দর ঘুমটা ভাঙ্গল সেই শব্দে।

ঘুম ভাঙ্গতেই চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে প্রথম তার মনে হয়েছিল বেহালার শব্দ। তারপর ভাবল বেহালা নয় সেতার বাজে পাশের বাড়ীর রেডিয়োতে। সর্ব শেষে সে উঠে দেখতে পায় ঘরের এক কোণে পিন্টুকে কাঁদতে। আর অদূরে অমিয়া পিছন ফিরে দাঁড়ানো—তার চুলের খোপাটা শুধু দেখা যায়।

—কী ওকে মারলে কেন? অমিয়াকে লক্ষ্য করে সুবোধ বলে।

—মারবোই তো কথার অবাধ্য হোলে!

—কী আবার অবাধ্য হোল।

—সকাল বেলা ঠান্ডার মধ্যে বিছানা থেকে নেমে আসা।

—ছোট্ট ছেলেদের সকালে ওঠার অভ্যাসটা ভালো।

—এই ঠান্ডায়! ঠান্ডা লেগে যদি জ্বর হয়, যদি হয় নিমুনিয়া! উলের অভাবে সোয়েটার একটা বুনে দিতে পারলুম না এতদিন ধরে—দিয়েছ কিনে?

—উল হোলেই যদি সোয়েটার হয় তো দেব কিনে উল।

—কবে দেবে?

—আজকে মাসের কত তারিখ বলো?

—চব্বিশ।

—তবে পয়লা তারিখ সন্ধ্যা বেলা পেয়ে যাবে।

—ঠিক?

—হ্যাঁ।

এবার অমিয়া একেবারে ওর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ায়—

—কথা দিলে।

সুবোধ মাথা ঝাঁকায়।

তারপর দিনগুলো খুব মন্থরই কাটছে।

মুহূর্ত থেকে সেকেন্ড—সেকেন্ড থেকে মিনিট, ঘন্টা—এমনি বড় একটা দিন যেন শেষ হতে চায় না। মাসটা তো কিছুতেই না। সুবোধ এবং অমিয়া দুজনেই লক্ষ্য করেছে যে, মাইনে পাওয়ার পর থেকে বড় বড় দিনগুলো যেন পৃথিবীর আহ্নিক গতিতেই চলতে থাকে আর এক মাইনে না

আসা পর্যন্ত। তাই মুহূর্ত থেকে দিনগুলো গোনা যেন একটা নেশার মত অর্থাৎ স্বভাবও বলা যায়।

—দ্যাখো, শুনছ!

—কী না বললে শুনব কী করে?

—আজকে তোমায় একটা নতুন খবর দেব।

—কী খবর বলো।

—এই দ্যাখো বালীগঞ্জ থেকে বাবা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

—কী লিখেছেন?

—বেলার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বাবা বড় বিপদে পড়েছিলেন ওকে নিয়ে। কতগুলো সম্বন্ধ এসে ফিরে গেছে; এবার ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

—এখন আমার দিকে চাইলে হয়।

—তার মানে?

—তোমার বোনের বিয়েতে উপহার পাঠাতে হবে তো! সে টাকা?

এতক্ষণ অমিয়ার কথা বলার সাথে মুখখানাও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল নতুন খবর শোনাতে। খুসীর আমেজে মনটা হয়েছিল আগের চেয়ে অনেক হাল্কা। হঠাৎ যেন সে অন্তরের রূপ পরিগ্রহ করল বিশেষ একটা ইঙ্গিতে। দুটো মাত্র অক্ষরের সে শব্দটা, থাকলে ভাল না থাকলে কেবল হাহাকার। অল্প সময়ের মধ্যেই অমিয়ার প্রশস্ত কপালটা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে ওঠে, চোখের চাহনিতে নামে অবসাদ। আর মুখখানা তার গোলাপের মত রক্তাভ হয়। এ রকম মুখই সুবোধের কাছে ভাল লাগে—মুখোমুখি হয়ে বসতে।

—কী হবে তবে বলো?

—তাই তো ভাবছি।

—ভাবলেই চলবে না। উপহার না দিতে পারলে আমি মুখ দেখাব কী করে?

—আর আমি!

—একই তো কথা!

সুতরাং এ একেবারে অসম্ভব—উপহার না পাঠানোটা। একান্তভাবেই পাঠানো উচিত, কর্তব্যও। তাছাড়া ওর বাপের প্রথম জামাই, নতুনও বটে। মাত্র ছয় বছর হোল ওদের বিয়ে হয়েছে। তারপর এটা ওটা আদর যত্ন কম পায়নি, পিণ্টুর অন্নপ্রাশনে গলার চিকন সোনার হার উপহার দিয়েছে ওর দাদু।

আর বিয়ে যখন দূর দেশে নয়, এখানের বালীগঞ্জের বাসায়, যেতে তো হবেই অমিয়াকে। খালি হাতে বোনের বিয়েতে যাওয়াটাই বা কেমন দেখায়! সবাই যখন উপহার এনে ঢালবে তার পাশে তখন অমিয়ার দিকে সবারই লক্ষ্য থাকবে কী দেয় কী না দেয়। সেই সূত্রে সুবোধও বাদ যাবে না, একটা দুর্নাম হয়ে পড়লে। অতএব দিতেই হবে।

কয়েকদিন পর সুবোধ যথারীতি নটার মধ্যে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ে অফিসের পথে। বেলা তখন বেড়েছে, ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড়। নয়টার থেকে এই রকমই ভীড় হয়। সুবোধ ট্রামের ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। দু তিনখানা গাড়ীতে উঠবার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হয় না তখন ডালহাউসীতে হেঁটে যাওয়াই ভাল মনে করে। আর যায়ও। ঠিক দশটায় এসে অফিসে ঢুকে পড়ে সুবোধ। প্রথম পিরিয়ডে তো সবাই কাজে ব্যস্ত। একটিও কথার আওয়াজ নেই, কাগজের ওপর কলমের দ্রুত একটা খস্‌খস্‌ শব্দ ছাড়া। তারপর তিনটের পর কাজের চাপ কমলে সুবোধ তার হাতের কলমটা রেখে পাশের টেবিলটার দিকে এগিয়ে যায়—তারিণীবাবুর টেবিলটা পর্যন্ত। তারপর সে বলে—তারিণীবাবু!

—কাকে বলছেন? টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকালেন তারিণীবাবু। বৃদ্ধ বয়েস, প্রায় ষাটের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, যৌবনের দৃষ্টির সে স্বচ্ছতা আর নেই তারিণীবাবুর।

—বলুন।

সুবোধ এবার ইতস্ততঃ করে। একটু লজ্জাও বোধ করে নিজের এই দীনতায়।

—বিশেষ প্রয়োজনে বলছি। গোটা দশেক টাকা ধার দিতে হবে।

—টাকা?

—হ্যাঁ গোটা দশেক টাকা।

—আমি ভাবছিলাম আপনার কাছে পাঁচটা টাকা ধার চাইবো। নাতিটার অসুখ, কী যে করি ভাই!

—আপনারও আমার দশা! এ মাইনেতে একেবারে পোষায় না তারিণীবাবু।

—তাই তো ওই রকমই সব, এক অবস্থা। তিরিশ বছর এখানে চাকরী করছি সুবোধবাবু, তবু এতটুকু দুঃখ ঘুচলো না। ঘুচবে না, পোষাবে না।

—না, না, পোষাবে না! সুবোধ মাথাটা ঝাঁকালো তারিণীবাবুর কথায় সায় দিয়ে।

—কিন্তু উপায়?

—উপায়? উপায় আছে। ভাবো আপনাকে।..আর কিছু না বলে তারিণীবাবু উঠে গেলেন।

তারপর আর কী বলবার থাকে, মনে মনে শুধু অনুভব করা ছাড়া। কি করে কোথা দিয়ে যে কাটবে দিন, ভাত, কাপড়, কয়লা প্রভৃতির অভাব অভিযোগগুলোকে ডিঙিয়ে —মনের মধ্যে তেমন একটা কথা উঁকি মারে। তীব্র ঘন ঘোর স্পন্দনে চন্‌চন্‌ করে বুকটা। বিকেলে সে অফিস থেকে নামে, কী ভয়ংকর উঁচু উঁচু সিঁড়িগুলো ভেঙে। পথে এসে অন্তত পাঁচ মিনিট দম নিতে হয়। তারপর ম্লান সন্ধ্যার আলোয় ডালহৌসীর অফিস ভাঙা অসংখ্য জনতার সাথে সে মিশে যায়।...না পোষাবে না...কিন্তু উপায়...উপায় আছে...বলবো আপনাকে,...।

পাতা উল্টালো।

দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতাটা ঘুরিয়ে দিল অমিয়া। তারপর প্রতিদিনের মত সকালবেলার কাজে যায় ও। তখনও বিছানার মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে সুবোধ, নাক ডাকার একঘেয়ে বিশ্রী শব্দ নেই। এই ভাল হাই-হুই তাড়াহুড়া কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বন্ধ, শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশে একাগ্র মনে সকাল-বেলার কাজগুলো নির্বিঘ্নে এগিয়ে নেওয়া যাবে। আর কাজেও যেন আজ প্রাণবন্ত মন ওর।

সাততাড়াতাড়ি উঠে উনুনটায় আঁচ তুলে চায়ের কেট্‌লিটা বসিয়ে দিয়ে অন্য রকম দু একটা কাজ সারা। না হোলে চোখের নিমেষে যেন সময়গুলো কাটবে—ঘুরবে ঘড়ির কাঁটা আর বেলা বাড়তে সুরু হবে শীতের। এক মুহূর্তের জন্য ক্যালেন্ডারের পাতাটা দেখবে, কয়টা লাল-চিহ্নিত তারিখ ছুটীর দিন পড়েছে—এতটুকু সময়ও নেই। কর্ম-ব্যস্ত তাকে দেখে বোঝা যায়।

—ওঠো দেখি। এক কাপ চা হাতে করে কাছেই এসে দাঁড়াল অমিয়া। সুবোধের ঘুমন্ত দেহে আল্‌গা একটু ঝাকানি দিয়ে সে ডাকে। ঘুমুলে আর হুঁসই থাকে না ওর। পৃথিবী রসাতলে গেল কী রইল—এমন ঘুম।

—ওঠো বেলা হোল যে।

—কটা বেজেছে?

—আটটা।

—তবে দশটা বাজুক।

—বাজুক আমার কী? অফিসে সাহেবের বকা খাবে তুমি।

—না।

অতঃপর অন্য পাশ ফিরতে যাচ্ছে সুবোধ, কোলের বালিশটা পায়ের দিকে ঠেলে আর একটু ঘুমের মস্করা। অমিয়া তাকে লক্ষ্য করে বলে—আজকের কথা মনে আছে তো।

—কী কথা।

—সোয়েটার বুনবার উল। বলছিলে না পয়লা তারিখ পেয়ে যাবে—আজই তো পয়লা।

—জানি। আজ থেকেই ধর্মঘট আরম্ভ।

—কোথায়?

—আমাদের অফিসে।

—ধর্মঘট!

কথাটা কানে গেল তার। যেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, ঠিক তেমনি নিস্পলক চেয়ে রইল ছবির মত।

আলোচনা

সাহিত্যে নীতিবোধ

শ্রীরামদুলাল ভট্টাচার্য

কয়েকদিন আগে যুগান্তরের চলচ্চিত্রের টুকরো খবরে পড়ছিলাম 'ছবিতে দুর্নীতি পরায়ণতা নিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পর পর যে-সব উক্তি করেছেন এবং কিছুদিন পূর্বে বেতার ও তথ্যসচিব ডাঃ কেশকার চলচ্চিত্রে দুর্নীতি দমন বিষয়ে বোম্বাইয়ে যে খোলাখুলি মত প্রকাশ করেন, সম্প্রতি তার ফল ফলতে সুরু করেছে।...সেন্সর বোর্ডের মর্জির আর একটি নজির পাওয়া যাবে, 'বিন্দুর ছেলে' ছবিখানির ব্যাপার নিয়ে। এতে ছয় বছরের ছেলে অমূল্যকে তার মা বিন্দু চুমু খাচ্ছেন—এমন দুটি দৃশ্য ছিল—দৃশ্য দুটি সশব্দ। এর একটি দৃশ্য কেটে দিতে হয়েছে সেন্সরের নির্দেশ মত। 'শালা' শব্দের ব্যবহারেও ঠিক একই নির্দেশ মানতে হয়েছে। ছেলেকে চুমু খাওয়া এবং সাধারণভাবে 'শালা' শব্দের ব্যবহার এর কোনটাই দুবার করতে দেওয়া হয় নি যাতে না কোন নজির দাঁড়িয়ে যায় এবং তাই খাড়া করে অপর কোনও প্রযোজক তাঁর ছবিতে চুমুর ব্যাপারটা বজায় রাখতে দাবী জানান। হায়রে নীতিবাগীশ চুমু খাওয়াটাই দেখলে মায়ের স্নেহটা তোমার চোখে পড়ল না। কই ইংরেজী ছবির বেলায় তো এ নীতিবোধ তোমার থাকে না। আর বক্ষ বিজ্ঞাপন-গুলিও বোধ হয় তোমার দুর্নীতিদমনের আওতায় পড়ে না।'

তাহলে সত্যই কি এটা দুর্নীতি দমন? না এরা দুর্নীতির শুচিবাইগ্রস্ত? এদের কথাই ভাবছিলাম।

এমন সময় কানে আসিল কে যেন পড়িতেছে:

"ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান,
দেহ তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।

ফিরে যায় রাজা ফিরে যায় শেঠ
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোন ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট
আননে।

রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হোলো শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।

দীন নারী এক ভূতল-শয়ন,
না ছিল তাহার অশন-ভূষণ,
সে আসি' নমিল সাধুর চরণ
কমলে।

অরণ্য-আড়ালে রহি' কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়-নাদ,
কহে—'ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"

চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর
আলোকে॥

(শ্রেষ্ঠভিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের কথা।

"যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কি দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই: আমি কবিতায় একটা বৌদ্ধ কাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই: একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিল ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিল রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে পড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না, বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণচীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়েটি সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, "অনেকে অনেক দিয়েছে কিন্তু সব তো কেউ দেয়নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড় লজ্জা পেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "এত ছেলে-মেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি অনেকের ভাগ্য,

আমার খোঁড়া কলমখানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড় হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায়রে কবি, একে তো ভিখারিণীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তারপরে নিতান্ত নিতেই যদি হয়, তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে একথা নতশিরে মানতেই হবে।" (তথ্য ও সত্য)

মেঘদূতের একখানি ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত ব্যাখ্যা আর এক নূতন সৃষ্টি—এক অদ্ভুত সৃষ্টি, বাঙ্গালা সাহিত্যে এক প্রকাণ্ড দান। 'রুচি দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী বদলায়—সৌন্দর্য বদলায় না। কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল।' 'কিন্তু অনেক জিনিস এখনকার রুচিসঙ্গত হইবে না বেশ বোধ হইল।' প্রথমে ইচ্ছা ছিল না পুস্তক ছাপাইবেন, পরে বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রগণের অনুরোধে ছাপাইয়াছিলেন। পুস্তক ছাপাইবার পূর্বে তিনি দুইজন সুপণ্ডিত ও সুরসিক বিচক্ষণ লোকের হাতে রুচি পরীক্ষার ভার দিয়াছিলেন। একজন এফ, ই, পার্জিটার, আর একজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইঁহাদের উপদেশ মত অনেক স্থান উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও অনেক স্থান বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু সুরুচির অনুরোধে তাহা শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি রুচিবাগীশদের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। মেঘদূত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে। কাব্যরস পিপাসুগণ তন্ময় চিত্তে মেঘদূতের রস পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু একদল উৎকট রুচিবাগীশ—যাঁহাদের নিকট নীতিবোধ, বোধোদয়, জ্ঞানাঙ্কুর বা ঐরূপ গ্রন্থ ভিন্ন সকল গ্রন্থই অশ্লীল মেঘদূত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, অযথা কর্কশ সমালোচনা করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন যেন ঐ বই-এর বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। স্যার এণ্ড্রুফ্রেজার তখন বাংলার ছোটলাট। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে বড় খাতির করিতেন। একদিন শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকাইয়া তিনি নালিশের কাগজপত্র সব দেখাইলেন। সেদিন শাস্ত্রী মহাশয় লাটসাহেবকে ছাত্ররূপে কল্পনা করিয়া বুঝাইলেন কালিদাস কিরূপ কবি, মেঘদূত কিরূপ কাব্য এবং তাঁহার নিজের ব্যাখ্যায় বিশেষত্ব কি। লাটসাহেব মহা খুশী। বই বিক্রয়ের আবেদনের কি দশা হইল তাহা অনুমেয়। লাটসাহেব নাকি বলিয়াছিলেন, আপনি দেখিবেন যেন ছোট ছেলেপিলের হাতে বইটা না পড়ে অর্থাৎ দাম (ছিল দশ আনা) কিছু বাড়াইয়া দিবেন। লাটপ্রাসাদ হইতে ফিরিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বই-এর বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন। এই পর্যন্ত শুনিয়া আমি সাহস করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম—অভিমানে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'হাঁ, বাংলাদেশে এরূপ বই না চলাই ভাল, এরা নীতি বোধ আর বোধোদয় পড়ুক।"

"যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ওই এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত।"—'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের এই উক্তি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

ঘরে বাইরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা চলিয়াছিল। ১৩২৬ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য বলেন। "ঘরে বাইরে উপন্যাসখানা লইয়া বাংলার পাঠকমহলে এখনো কথা চলিতেছে। হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে সেই জন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না। ভর্তৃহরির অনেক পূর্ব হইতেই কবিরা এ সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন।...

ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রসবোধ লইয়া যদি কথা উঠিত তবে সে-কথা যতই কটু হউক নীরব থাকিতাম। কিন্তু যে-কথা উঠিয়াছে তাহা সাহিত্যের সীমানার বাহিরের জিনিস। তাহা যুক্তির অধিকারের মধ্যে সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক চলে এবং তর্ক না চালাইলে কর্তব্য পালন করা হয় না। কারণ যাহা অন্যায় তাহাকে সহ্য করিয়া গেলে সাধারণের প্রতি অন্যায় করা হয়।

ঘরে-বাইরে বাহির হইবার পরেই আমার বিরুদ্ধে একটা

নালিশ শোনা গেল যে, আমি এই উপন্যাসে সীতার প্রতি অসম্মান করিয়াছি। কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন কি আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম, লোকে উৎসাহের সঙ্গে ইহা গ্রহণ করিয়াছে; এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্বাসিতা হইয়াছিলেন, এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি ঘরের টেবিল হইতে নির্বাসিত হইতে থাকিল।"

এঁদেরই সম্বন্ধে শরৎবাবু লিখেছিলেন, "তাঁরা কিন্তু জানেন না যে সংসারে অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি তো জানি কি কোরে আমার চরিত্রগুলি গোড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হোয়ে ফোটে সে আর কেউ না জানে তা আমি তো জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার যায়গা এদের নেই, এ-বস্তু এদের অনেক উচ্চস্তরের। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে কাল তাকে ক্ষমা করবে না। নীতিপুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয়, এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

আমার মনে আছে ছেলেবেলায় কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী আর কিছুই রইল না। ভালই হল। হিন্দুসমাজের নীতি-পুস্তকের প্রতিছত্র পাপীর শাস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক্? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন; নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ় প্রেম? আমার আজও যেন মনে হয় দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমবাবুর দুই চোখ অশ্রু-পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনে হয় তার কবিচিত্ত যেন তাহার সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।

"উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানীতে তার মরা চলে না।"

"সামাজিক ধিক্কার আর্ট-এর রাজ্যে কতখানি মহামারী উপস্থিত করিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের একটি ছোটগল্প আছে, তার প্লট-টা অত্যন্ত সংক্ষেপে এইরূপ —নায়ক একজন বড়লোক জমিদার। Hero, অতএব, হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উচ্চ, নৈতিক বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম। কলকাতায় তার একটা মস্ত বাড়ী আছে, ভাড়া খাটে, দাম প্রায় লাখে-টাকা। এক তারিখে বাড়ীটা মাসখানেকের জন্যে একজন ভাড়া নিলে। বাড়ীআলা জমিদার তো পাশের বাড়ীতেই থাকেন, হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি ওই বাড়ীটার ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। দিন দুই পরে অনুসন্ধানে জানা গেল বাড়ীটার মধ্যে ভ্রূণ হত্যা হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়ী ভাড়া না দিয়েই পালিয়েছে। তাদের ঠিকানা জানা নেই, পাপের দণ্ড দেওয়া অসম্ভব, তিনি আর কি করেন; কিন্তু তাঁর নায়ক-হৃদয় দুঃখে মনস্তাপে পুড়ে যেতে লাগলো। তখন তিনি হুকুম দিলেন বাড়ীটা ভেঙে-চুরে মাঠ করে দাও। ৫।৭ দিনের মধ্যে অতবড় লাখো টাকার বাড়ী ভেঙে মাঠ হয়ে গেল। গল্প এইখানেই শেষ হল। প্রেসিডেন্সী কলেজের English-এর একজন প্রবীণ অধ্যাপক এই গল্প পাঠ করে সাশ্রুনেত্রে বলতে লাগলেন—জীবনে এমন শিক্ষাপ্রদ সুন্দর গল্প আর পড়েন নাই। এবং এমন গল্প বাঙলা সাহিত্যে যত বাড়ে ততই দেশের মঙ্গল। এমন গল্প আমিও যে বেশী পড়িনি সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই, এবং বাড়ী যখন আমারও নয়, অধ্যাপকেরও নয়। তখন যত ইচ্ছে ভেঙেচুরে মাঠ করে দিলেও আপত্তি নেই, কিন্তু art ও সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁর মনে যে কি ভাব উদয় হয়েছে, সে শুধু তিনিই জানেন।"

(সাহিত্য ও নীতি, শরৎচন্দ্র)

আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ইহা শেষ করিব। ইহা "কল্লোল যুগে" প্রকাশিত হইয়াছে। "কিন্তু কে জানত ভারতীয় দলের একজন প্রবীণ লেখকের উপন্যাসকে লক্ষ্য করে কালি-কলম আপিসে পুলিশ হানা দেবে। শুধু হানা নয় একেবারে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। কার বিরুদ্ধে? সম্পাদক মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগীর বিরুদ্ধে। অপরাধ? অপরাধ অশ্লীল সাহিত্য প্রচার।

আমরা সার্চ করব আপিস। সার্চ ওয়ারেন্ট আছে বললে লালপাগড়ি।

দুষ্য লেখাটা কি? লেখা কি একটা? দুটো। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিত্রবহা' আর নিরুপম গুপ্তের গল্প 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে'। নিন, বার করুন সংখ্যাগুলো—

মনে মনে হাসলেন মুরলীদা। নিরুপম গুপ্ত সে আবার কে? নিরুপম গুপ্ত ছদ্মবেশী। চট করে তাঁকে চিনে ফেলতে সকলেরই একটু দেরী হবে।

লেখরাজ সামন্ত শৈলজার ছদ্মনাম। 'কালিকলমে' প্রকাশিত তার গল্প 'দিদিমণি' আর প্রেমেনের গল্প 'পোনা-ঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে কাশীর মহেন্দ্র রায় আপত্তি জানান। তাঁর আপত্তি নজরুলের "মাধবী প্রলাপ ও "মোহিতলালের 'নাগার্জুনের' বিরুদ্ধে। এই নিয়ে মুরলীদার সঙ্গে পত্রে দীর্ঘকাল তাঁর তর্ক বিতর্ক হয়। মুরলীদা বলেন, আপনার বক্তব্য গুছিয়ে প্রবন্ধ লিখুন একটা। মহেন্দ্র রায় আধুনিক সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লেখেন। তার পাল্টা জবাব দেন সত্যসন্ধ সিংহ। সত্যসন্ধ সিংহ ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর ছদ্মনাম। শুধু প্রবন্ধ লিখেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না মহেন্দ্র বাবু। তিনি একটা গল্পও লিখলেন। আর সেই গল্পই 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে'।

একি ভাগ্যের রসিকতা! যিনি নিজে অশ্লীলতার বিরোধী তাঁরই লেখা অশ্লীলতার দায়ে আইনের কবলে পড়বে।

ভাগ্যের রসিকতা আরো তৈরী হচ্ছে নেপথ্যে। নিন্ আপনাদের দুজনকে—মুরলীধর বসু ও শিশিরকুমার নিয়োগীকে—গ্রেপ্তার করলাম। ভয় নেই, নিয়ে যাব না দড়ি বেঁধে। আমার নিজের দায়িত্বে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আপনাদের 'বেল' দিয়ে যাচ্ছি। কাল বেলা এগারোটার মধ্যে আপনারা হাজির হবেন লালবাজারে। ইতিমধ্যে শৈলজা-বাবুকেও খবর দিন, তিনিও যেন কাল সঙ্গে থাকেন। ঠিক সময় হাজির হবেন কিন্তু, নইলে—বুঝছেনই তো—আচ্ছা, এখন তবে আসি।

পরদিন সকালে মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লালবাজারে গিয়ে উপস্থিত হলেন, ভীতভঞ্জন-সূদন শূলপাণির নাম স্মরণ করতে করতে।

প্রথমেই এক হোমরা চোমরার সঙ্গে দেখা। বাঙালী, কিন্তু বাংলাতে যে কথা কইছেন এ নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে। দেখতে তো সুধী সজ্জনের মতই মনে হচ্ছে।

আপনাদের এ কাজ?

পড়েছেন আপনি?

Damn it—আমি পড়ব ও-সব ন্যাষ্টি শ্ল্যাং? কোনো রেসপেক্টেবল্ লোক বাংলা পড়ে?

তাতো ঠিকই। তবে আমাদেরটাও যদি না পড়তেন—

আমরা পড়েছি নাকি গায়ে পড়ে? আমাদেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পড়িয়ে ছেড়েছে। আপনাদেরই বন্ধু মশাই। আপনাদেরই এক গোত্র।

'কে কারা?'

সাহিত্য জগতের সব শূর-ধীর, ধনরত্ন—এক কথায় সব কেষ্ট-বিষ্টু। তাদের কথা কি ফেলতে পারি? নইলে এ-সব দিকে নজর দেবার আমাদের ফুরসৎ কই? বোমা-বারুদ ধরব, না, ধরব এ-সব কাগজের ঠোঙা?

পুলিশ-পুঙ্গব ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। পরে মনে করলেন এ ভঙ্গিটা যথার্থ হচ্ছে না। পরমুহূর্তেই মেঘ-গম্ভীর হলেন। বললেন, 'রবি ঠাকুর। শরৎ চাটুজ্জে, নরেশ সেন, চারু বাঁড়ুয্যে—কাউকে ছাড়ব না মশাই। আপনাদের কেসটার নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই ও-সব বড় দিকে ধাওয়া করব। তখন দেখবেন—বিনয়ে বিগলিত হবার মতন কথা। গদগদ ভাবে বললেন মুরলীধরঃ 'এ তো অতি উত্তম কথা। পিছুতে পিছুতে একেবারে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত। তবে দয়া করে ঐ বড় দিক্ থেকে সুরু করলেই কি ঠিক হত না? 'না' প্রবল প্রবর হুঙ্কার ছাড়লেন। গোড়াতে এই এটা একটা টেষ্ট কেস হয়ে যাক।"

রাঘববোয়াল ছেড়ে দিয়ে চিরকালই কি চুনোপুঁটিদের দিকে নজর? গদির অধিপতিদের ছেড়ে সামান্য মুদি-মণিহারি?

চালান হয়ে গেলেন পুলিশ কোর্টে।

সতীপ্রসাদ সেন—আমাদের গোরাবাবু—পুলিশকোর্টের উদীয়মান উকিল—জামিনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মোকদ্দমা জোড়াবাগান কোর্টে স্থানান্তরিত হল। তারিখ পড়ল শুনানির।"

"...মুরলীধর অবিচলিত রইলেন। বললেন, 'সাহিত্যকে ভালবাসি, পূজা করি সেবা করি সাহিত্যের। জীবন নিয়েই সাহিত্য—সমগ্র, অখণ্ড জীবন। তাকে বাদ দিয়ে জীবনবাদী হই কি করে? সু আর কু দুই-ই বাস করে পাশাপাশি। কে যে কী এই নিয়ে তর্ক। সত্য কতদূর পর্যন্ত সুন্দর, আর সুন্দর কতক্ষণ পর্যন্ত সত্য এই নিয়ে ঝগড়া। প্রুডারি আর পর্ণোগ্রাফি দুটোকেই ঘৃণা করি। সত্যের থেকে নিই সাহস আর সুন্দরের থেকে নিই সীমা বোধ—আমরা দ্রষ্টা, আমরা সমাধি সিদ্ধ।'

ঠিক হল লড়া হবে না মামলা। না কোনো তদ্বির—তালাস নয়, নয় ছুটোছুটি হয়রাণি। শুধু একটা ষ্টেটমেণ্ট দাখিল করে দিয়ে চুপ করে থাকা। ফল যা হবার তা হোক। ...যতদূর মনে পড়ে, 'চিত্রবহার' দুটি পরিচ্ছেদ নিয়ে নালিশ হয়েছিল। এক 'যৌবন বেদনা', দুই 'নরকের দ্বার'। আর 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহের' গোটাটাই।

সবচেয়ে আশ্চর্য, 'চিত্রবহাকে' প্রশংসা করেছিল 'শনি-বারের চিঠি'। এমন কি, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের

বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিল। শনিবারের চিঠিতে—'চিত্রবহা' সম্বন্ধে লেখা হয়,—"লেখক মানব জীবনের ভালো-মন্দ-সুন্দর-কুৎসিত সকল দিকের মধ্য দিয়া একটা চরিত্রের বিকাশ ও জীবনের পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন। জীবনকে যদি কেহ সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করেন তবে কিছুই বাদ দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহা হইলে তাহার সর্বাংশের একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে। কু ও সু দুই মিলিয়া একটি অখণ্ড রাগিণীর সৃষ্টি করে। তাহা moral ও নয় immoral ও নয়—আরও বড়, আরও রহস্যময়।

...ভিড় ঠেলে আদালতঘরে ঢুকলেন তিনজনে। সার্জেন্ট আর লালপাগড়ি, গাঁটকাটা, আর পকেটমার, চোর আর জুয়াড়ী, বেশ্যা আর গুণ্ডা, বাউণ্ডুলে আর ভবঘুরে। তারই পাশে প্রকাশক আর সম্পাদক, আর সাহিত্যিক। ঢুকলেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। কটা ছেঁড়া মামলার পর ডাক পড়ল 'কালি-কলমের'। কে জানে কেন, কাঠগড়ায় পাঠালেন না আসামীদের। চেয়ারে বসতে সংকেত করলেন।

এলেন মহামান্য পি-পি, হাতে একখণ্ড বাঁধানো 'কালি-কলম'। অভিযুক্ত অংশবিশেষ নীল পেন্সিলে মোটা করে দাগানো। বইখানা যে তাকে সরবরাহ করেছে সে যে ভিতরের লোক তাতে সন্দেহ কি।...

পি-পি বক্তৃতার পিপে খুললেন। এরা সমাজের কলঙ্ক, দেশের শত্রু, রাষ্ট্রের আবর্জনা। এদেরকে আর এখন নুন খাইয়ে মারা যাবে না, যদি আইনে থাকত, লৌহশলাকায় বিদ্ধ করতে হত সর্বাঙ্গ।...তারিখ পাল্টে তারিখ পড়তে লাগল। শেষে এল রায় প্রকাশের দিন।

আদালতের বারান্দায় দুই বন্ধু প্রতীক্ষা করে আছে। শৈলজানন্দ আর মুরলীধর। সাহিত্য-বিচারে কি দণ্ড নির্ধারিত হয় তাদের।...দুপুরের পর রায় বেরুল। পি-পির সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের আখ্যান ব্যাখ্যান বিশেষ কাজে লাগে নি ম্যাজিস্ট্রেটের। আসামীদের তিনি benefit of doubt দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।"

এই জন্যই বোধ হয় গুণীরা প্রার্থনা করিয়াছেন—

"ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ।"

★

বই পড়া

কুমুদরঞ্জন সিংহ

আধুনিক কালে শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে বই পড়ার আগ্রহ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সুস্পষ্ট ভাবে একথা বলা চলে যে মানুষের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেবার প্রয়োজনে—বিশেষ করে মানসিক বিকাশের দিক লক্ষ্য রেখে আজকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বই পড়ার অভ্যাস নেই। এ সত্যটি একটু বিশ্লেষণ সাপেক্ষ হলেও, গভীরভাবে চিন্তা করলেই সহজেই তা বুঝতে পারা যাবে। অবশ্য অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে 'বই পড়া' এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা নিয়ে গভীর চিন্তা করার প্রয়োজন পড়েছে?

প্রত্যেক জিনিসেরই ভালোমন্দ দুটো দিক রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যে এ দুটো দিকেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানুষকে প্রভাবিত করে তাঁর উত্তরজীবন নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করে তা অনস্বীকার্য।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অঙ্কের সংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ট না হলেও গ্রামে ও সহরে সাধারণ নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি পড়বার মতো মোটামুটি লেখাপড়া জানা লোক আজকাল যথেষ্ট রয়েছেন। এবং তাঁরা যে বই পড়েন একথাও সত্য। কিন্তু তাঁদের চাহিদা নাটক, উপন্যাস, যৌন-উত্তেজক কাহিনী, ডিটেক্টিভ ইত্যাদি ধরনের বই-ই বেশী। অবশ্য আমাদের সাহিত্যের বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই এ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারা যায়।

যাই হোক বই পড়া নেশাও নয়, দোষনীয়ও নয় কিন্তু পাঠকের রুচি চিন্তা সমস্তই সুসংবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়

বই পড়ায়, সেই জন্যে পাঠ্য বিষয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও আমাদের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। পাঠকের চাহিদা বাড়ানো হবে নিশ্চয়ই। অবশ্য এখানে ভাববার কথাও রয়েছে; কত বেশী সংখ্যক বই পড়লেই যথেষ্ট হয় না; পাঠক কি বই পড়ছেন কি উদ্দেশ্যে পড়ছেন তার গুরুত্ব পঠিত বই-এর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। খাদ্যের ক্ষেত্রে যেমন ব্যালেন্সড্ ডায়েট গ্রহণ করা আবশ্যক, তেমনি ব্যালেন্সড্ রিডিং প্রয়োজন, কিন্তু আজকে আমরা দেখি পাঠকদের বেশীর ভাগ সংখ্যাই সস্তা নাটক, নভেল, ইত্যাদি বই পড়ে থাকেন। ছেলে-বুড়ো-শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত সবাই এই অপাঠ্য বই পড়েন দেখে খুবই আশ্চর্য হতে হয়। অবশ্য এদিক দিয়ে আমরা নির্মমভাবে বলতে পারি যে বয়সের অনুপাতে পর্যায়-পর্যায়ে বিকাশের সংগে মানসিক পুষ্টি আমাদের ছেলে-বুড়ো প্রায় সকলেরই একরূপ। এর কারণ সম্পর্কে দুটো দিকে দু'চার কথা আলোচনা করবো। কারণ দুটো 'বই পড়ার' সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত।

প্রথম 'বই পড়া' আমরা সুরু করি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক দিয়ে—শিক্ষার প্রয়োজনে, তার মানে জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের প্রেরণায়। ডিগ্রি লাভের প্রয়োজন আছে একথাও অনস্বীকার্য তবে জীবনে ডিগ্রিই মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এ কথাও মানতেই হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। মানুষ তার প্রত্যেক কাজকে জ্ঞানের দ্বারা বিচার করে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। শিল্প-সাহিত্য-কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য এ সকলের মধ্যেও জ্ঞান লাভের প্রয়োজন রয়েছে। যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তাঁর মননশক্তিকে ক্রমে ব্যাপ্ত করতে পারে—একই সংগে অন্তরে ও বাইরে সুন্দর ও সৎ হতে পারে,—সেইটেই হলো প্রকৃত জ্ঞান। এই উদ্দেশ্যের প্রতি মানুষকে অনুরাগী করে তোলাতে হলে 'শিক্ষার ধারার' পরিবর্তন অপরিহার্য। শৈশব থেকেই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 'বই পড়বার' অভ্যাস করাতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্য তালিকার নির্দেশকসূত্র হিসাবে শ্রেণীগত ভাবে পড়াবার জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হবে। অবশ্য এখানে আমরা 'বাংলা বই' তথা বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবো।

শিক্ষায় পদ্ধতি ও ব্যবহার যান্ত্রিক হলে চলবে না; কারণ শিক্ষা মানুষের জীবন বিকাশের পটভূমি,—আপন প্রাণের সংগে এতো বেশী যোগ যে তার স্ব-প্রকাশে মানুষ সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে, সুতরাং শিক্ষার বাহন সাহিত্য—বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞান সম্পদ—গ্রন্থ। সাহিত্য প্রাণ-ধর্মেরই সতেজ প্রবাহ। সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সাহিত্যচর্চাই একমাত্র পথ যেখানে মানুষ গ্লানি, ভয়, বিরোধ হতে মুক্ত হয়ে মহত্তর আদর্শে চলতে সক্ষম হবে।

এইখানেই বই পড়ার সার্থকতা। কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মন সাপেক্ষ। মানুষের মনকে সুন্দর, সতেজ—সরাগ ও সমৃদ্ধ করে তোলবার ভারও আজকের দিনের শিল্প-সাহিত্যের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের মনন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি ও অনুরাগ-বিরাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। আমরা অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করলে মনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব দেখতে পাই না, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে তার সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করি। "দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা-জল", তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভেতরেই সোল্লাসে—সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই বেগমান স্রোতস্বতীতেই অবগাহণ করে আমরা সমৃদ্ধ হবো।

সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বই পড়া ছাড়া সাহিত্যের রসে রসাপ্লুত হওয়া সম্ভব নয়।

বই পড়ার আগ্রহ জন্মাবে প্রাণের তাগিদে। 'বইপড়ার' মূলে থাকা চাই জীবন-জিজ্ঞাসা—যেন জানবার দুরন্ত কামনা। জীবন-জিজ্ঞাসাকে উদ্বেলিত করাই বই পড়ার সার্থকতা।

মহৎ লেখকের বই-এ আমরা তাঁদের আত্মার স্পর্শ অনুভব করি, এইরূপ লেখকেরা তাঁদের নিজেদের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ঘিরেই সৃষ্টি করেন সাহিত্য। তাঁদের লিখিত বই পড়লে আমাদের প্রাণের মূলে রস-সেচন হয়। মহৎ লেখকের বই-পড়ায় মুক্তির আস্বাদন দিতে পারে—এই মুক্তি আনন্দময় হয়ে ওঠে তখনই যখন 'জীবন-জিজ্ঞাসার' সন্ধান পাই। মানুষ যুগ যুগ ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করে আসছে 'জীবন-জিজ্ঞাসার' সন্ধানে।

দুর্নিরীক্ষ্য

আর্থার স্নিজলার

[আর্থার স্নিজ্‌লার (Arthur Schnitzler) ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি জাতিতে অষ্ট্রিয়ান। সমসাময়িক অষ্ট্রিয় সাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। নাটক এবং উপন্যাস রচনায় তিনি অধিক প্রসিদ্ধ হইলেও ছোটগল্পে তিনি সিদ্ধহস্ত। অভিনব-নিপুণ কল্পনাশক্তি ও অতিসূক্ষ্ম লিপিকুশলতা তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে বিশ্বের সুধী-সমাজের সমাদর প্রদান করিয়াছে। বক্ষ্যমান কাহিনীতে তাঁহার মৌলিক দার্শনিকতা এবং গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটি একটি নীতিগর্ভ উপকথা বলিয়া মনে হইলেও লেখকের সরস বিন্যাস এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ইহাকে একটি সার্থক ছোটগল্পে মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছে। অর্থাৎ লেখক সহজ সুরে গভীর কথা বলিয়াছেন এবং তাহাতে গল্পের সৌষ্ঠব এবং সৌসম্য বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

আকাশের নীলিমাকে স্পর্শ করে ছড়িয়ে পড়া ভোরের কুয়াশায় একটি যুবক তার সম্মুখের হাতছানি দিয়ে ডাকা পর্বতমালার দিকে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত পৃথিবীর তাল-লয়স্পন্দনের সঙ্গে তার হৃদয়ও স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। কোনরকম দুর্ভাবনা বা উদ্বেগ না থাকায় সমতল ভূমির ওপর চার ঘন্টা সে হাঁটল, পরে একটা বনভূমির প্রান্তদেশে পৌঁছান মাত্র একই সঙ্গে খুবই নিকটে অথচ বহু দূরে একটা অতি রহস্যময় গলার আওয়াজ কানে গেলঃ "হে যুবক! খুনী হবার সাধ যদি না হয়ে থাকে তাহলে এই বনের ভেতর দিয়ে যেও না।"

বিস্ময়াবিষ্ট যুবক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার চারিদিকে তাকাল এবং কোথাও কোনও জীবিত প্রাণীর চিহ্নমাত্র দেখতে না পেয়ে স্থির করল যে নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মা তার সঙ্গে কথা কইছে। তার অন্তর্নিহিত সাহস এই অদ্ভুত সাবধান বাণীকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না এবং সেই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিয়ে অতিশয় সচেতনভাবে এবং তার পদক্ষেপকে সামান্য সঙ্কুচিত করে, কিন্তু কোনরকম দুর্ভাবনা না নিয়ে সে অগ্রসর হতে থাকল। কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পেল না কিম্বা কোনও সন্দেহজনক শব্দ শোনা গেল না। সে একেবারে অবাধে গাছের ঘনছায়ার বাইরে এসে উপস্থিত হল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে শেষ গাছটির প্রশস্ত শাখার নীচে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পারে পর্বতমালার চারিদিকে চেয়ে দেখল একটি চূড়া তার নগ্ন এবং রুক্ষ আকৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐটিই তার শেষ লক্ষ্য। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই দ্বিতীয়বার সেই রহস্যময়ী বাণী একই সঙ্গে নিকটে এবং অতি দূরে, কিন্তু আগের থেকে আরও আন্তরিক সুরে ধ্বনিত হলঃ "হে যুবক! তোমার পিতৃভূমির সর্বনাশ করার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে এই প্রান্তরের ভেতর দিয়ে যেও না।"

গর্বিত যুবক এবার কথাগুলিতে কানই দিল না আসল জিনিসটিকে গোপনে রাখা এই সব অসার বাক্য শ্রবণ করে তার হাসি পর্যন্ত পেল, এবং অধৈর্য বা অস্থিরতা কোনটা তার পদক্ষেপকে বাড়িয়ে তুলছে তা বুঝতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। অবশেষে যখন সে তার লক্ষ্যস্থলের নীচেকার প্রস্তরময় প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল তখন সায়াহ্নের শিশু কুয়াশা সমতলভূমির ওপরে নেমে এসেছে। প্রান্তরের নগ্ন পৃষ্ঠে পদার্পণ করার পূর্বেই পুনরায় সেই বাণী নিকটে এবং দূরে রহস্যময় সুরে, কিন্তু আগের চেয়ে আরও ভীষণভাবে ধ্বনিত হলঃ "হে যুবক! ক্ষান্ত হও, আর অধিক অগ্রসর হলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।"

যুবক উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল এবং বিনা ব্যস্ততায় অথবা সঙ্কোচে আপনার পথ অতিবাহন করে চলল। চড়াইয়ের পথ যতই অস্পষ্ট হয়, তার বক্ষ ততই প্রসার লাভ করে এবং অবশেষে বিজয় সাহসে সে চূড়ার ওপর পৌঁছালে দিনের শেষ আলোকে তার ললাট প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

বিজয়গর্বে সে বলে উঠল, "এই তো এসে গেলাম। হে সৎ অথবা অসৎশক্তি! এটা যদি পরীক্ষা হয়, তাহলে বল আমি জিতেছি কি না! কোনও হত্যাকাণ্ড আমার বিবেককে ভারাক্রান্ত করেনি, নিম্নে আমার পিতৃভূমি অক্ষত অবস্থায় নিদ্রিত, আর আমি এখনও জীবিত তুমি যে-ই হও না

কেন, আমি তোমার চেয়ে শক্তিশালী, তাই তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিনি, আর না করে ঠিকই করেছি।"

এর পরই পাহাড়ের চারপাশ থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কাছাকাছি একটা বজ্র গম্ভীর শব্দ হলঃ "হে যুবক! তুমি ভুল করেছ!" কথার অনিবার্য গুরুত্বে পথিক ধরাশায়ী হল। বিশ্রামের আশায় সে একটি পাহাড়ের ধার ঘেঁসে নিজেকে এলিয়ে দিল এবং ওষ্ঠদ্বয়ের শ্লেষজড়িত কুঞ্চন নিয়ে আত্মগতভাবে বললঃ "তাহলে বোঝা গেল যে আমি না জেনেই খুন করেছি।" অশনিনাদে প্রত্যুত্তর এলঃ "তোমার অসাবধানী চরণ একটি পোকাকে থেঁতলে দিয়েছে।"

যুবক উদাসীনভাবে উত্তর দিলঃ "বুঝেছিঃ ভাল কিম্বা মন্দ কোন শক্তিই আমার সঙ্গে কথা বলেনি, যে বলেছে সে হল পরিহাস-রসিকশক্তি। এরা যে আমাদের মত নশ্বর প্রাণীর আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় তা আমার ধারণা ছিল না।"

পর্বতশৃঙ্গের অপসৃয়মান গোধূলি আলোকে আবার সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হলঃ "তুমি কি আর সেই যুবক নয় যার হৃদয় আজ সকালে পৃথিবীর ছন্দস্পন্দনের সঙ্গে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল? তোমার অন্তরাত্মা কি এমনই জড়ত্ব লাভ করেছে যে একটি কীটেরও সুখদুঃখে তুমি বিচলিত হও না? কপাল কুঞ্চিত করে যুবক উত্তর দিলঃ "এই তোমার অভিযোগ? তাহলে আমি ত অন্যান্য নশ্বর প্রাণীদের মত, যাদের অসাবধানী পদক্ষেপে অসংখ্য ক্ষুদ্রজীব নিরীহভাবে বিনষ্ট হয়, একশত—এক হাজার গুণ দোষী।" "এই বিশেষ বিষয়টির সম্বন্ধে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। জান কি তুমি সৃষ্টির অনন্ত পরিকল্পনার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পোকাটির জন্ম হয়েছিল? মাথা নত করে যুবকটি জবাব দিল ঃ "যে হেতু ব্যাপারটি আমার জানা ছিল না বা জানতে পারিনি অতএব এটা তোমাকে বিনীতভাবে স্বীকার করতেই হবে যে এই বনে পরিভ্রমণ কালে, তোমার প্রতিরোধ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি নিশ্চিতরূপে অনেকগুলি সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটি সংঘটিত করে ফেলেছি। কিন্তু সুকৌশলে প্রান্তরটি পার হয়ে আসায় কেমন করে আমার পিতৃভূমির সর্বনাশ ডেকে আনলাম তা জানবার জন্যে সত্যিই খুব কৌতূহল হচ্ছে।" অতিশয় মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর এলঃ "হে যুবক! তোমার ডানদিকে একটি উজ্জ্বল বর্ণের প্রজাপতিকে একবার উড়ে যেতে দেখেছিলে তো?"

"তুমি যেটির উল্লেখ করলে সেটি ছাড়া আরও অনেক প্রজাপতি দেখেছি।"

"অনেক প্রজাপতি! হাঁ, তোমার মুখনিঃসৃত ফুৎকার অনেকগুলিকে আপনাদের পথ থেকে দূরে হটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমি যেটির কথা বলছি, সেটি পূর্বদিকে সরে গিয়ে এত বেশী দূরে উড়ে গিয়েছিল যে রাজার বাগানের সোনার বেড়া পর্যন্ত ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। ওই প্রজাপতিটি থেকে আসছে বছরে যে শুঁয়াপোকা জন্মাবে সেটি গ্রীষ্মকালের এক অপরাহ্নে যুবতী রাণীর ফর্সা গলার ওপর দিয়ে চলে গিয়ে অতর্কিতে তাঁকে নিদ্রাবস্থা থেকে জাগিয়ে দেবে এবং তাঁর অন্তঃকরণকে হৃদয়পঞ্জরে নিশ্চল করে দেবে যার ফলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানও নিস্তেজ হয়ে গিয়ে মারা যাবে। এই ভাবে রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী, যাকে তুমি জীবন থেকে প্রতারিত করলে, তার পরিবর্তে রাজার ভাই অধিকারী হবে, এই দুরাচার, ঈর্ষাপরায়ণ এবং নির্দয় ব্যক্তি এমনভাবে রাজ্য শাসন করবে যে জনসাধারণ উত্যক্ত ও উন্মত্ত হয়ে যাবে, অবশেষে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে সে দেশকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মুখে নিক্ষেপ করে তোমার পিতৃভূমির সর্বনাশ ডেকে আনবে। এসবের জন্যে অপরাধ আর কারও নয় একমাত্র তোমার কারণ তুমিই ফুৎকারে রঙ্গীন প্রজাপতিটিকে পূর্বদিকে এমন তাড়া দিলে যে সেটি রাজার বাগানের সোনার বেড়া অবধি ডিঙ্গিয়ে উড়ে গেল।"

যুবকটি তার স্কন্ধযুগল নেড়ে বললঃ "হে অদৃশ্য শক্তি! তুমি যে সব ভবিষ্যৎবাণী করলে তা যে বাস্তবিকই ঘটবে সেকথা কেমন করে বিশ্বাস করব, কেননা পৃথিবীতে একটি ঘটনা থেকেই আর একটি ঘটনার উদ্ভব হয় এবং প্রায়শঃ তুচ্ছ ব্যাপারের পরিণামে ভয়ঙ্কর ব্যাপার বা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পরিণামে তুচ্ছ ব্যাপার ঘটে থাকে? আর যেহেতু আমার পাহাড়ে পদার্পণ করার দরুণ মৃত্যুভীতির ভবিষ্যৎ বাণীটি সত্য হয়নি সুতরাং কেন আমি সেটিকে বিশ্বাস করব?"

সেই ভয়ঙ্কর স্বর এবার বলে উঠলঃ "যে কেউ পাহাড়ের ওপরে উঠুক না কেন, তাঁকে আবার মানুষের মুখ দেখতে হলে ফিরে যাবার জন্যে নীচে নামতে হবে তো। একথা কি ভেবে দেখেছ?" যুবকটি থমকে দাঁড়াল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মনে করল সে নিরাপদেই অবতরণ করতে পারবে, কিন্তু আসন্ন দুর্ভেদ্য রাত্রিতে আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কায় স্পষ্টই বুঝতে পারল যে এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের জন্যে তার দিনের আলোর প্রয়োজন এবং পরদিন যে তার কোনরকম বুদ্ধিভ্রম হবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত জেনে সে শক্তি প্রদায়িনী নিদ্রার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পাহাড়ের একটি উন্নত প্রস্তরখণ্ডের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিল।

স্থির হয়ে শুয়ে থাকলেও উদ্বেগ তাকে জাগিয়ে রাখল,

ক্লান্ত চোখের পাতা খোলামাত্রই তার হৃদয়ে এবং শিরায় শিরায় দুশ্চিন্তার শিহরণ খেলে গেল। চোখের সামনে সব সময়ই পাহাড়ের চূড়াটি তার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেঃ ঐ পথই জীবনের মাঝে প্রত্যাবর্তনের একমাত্র পথ। এ পর্যন্ত সে এই পথ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকলেও এবার প্রাণে একটা অভূতপূর্ব সংশয় অনুভব করল যেটা গাঢ়তর হয়ে অসহ্য না হয়ে ওঠা অবধি তার মনে অধিকতর অস্বস্তির কারণ হল। তখন সে সংশয়ের একটা পীড়নে পীড়িত হয়ে আলোর প্রতীক্ষা করার চেয়ে বরং সঙ্গে সঙ্গেই অপরিহার্য কর্মটির সম্পাদন চেষ্টায় মনস্থ করল। দিনের আলোর সৌভাগ্য ব্যতিরেকেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা পদক্ষেপে বিপদসঙ্কুল পথকে অতিক্রম করার বিজয় অভিযানে প্রস্তুত হয়ে পুনরায় সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু অন্ধকারে পদার্পণ করার আগেই যেন এক অখণ্ডনীয় বিধানের শাস্তিস্বরূপ সে বুঝতে পারল যে অল্পকালেই তার নিয়তি পূর্ণ হবে। ক্রোধে এবং দুঃখে সেই শূন্যেই সে চীৎকার করে উঠলঃ "হে অদৃশ্য শক্তি! তুমি আমাকে তিন তিনবার সাবধান করেছ, কিন্তু তিনবারই আমি বিশ্বাস না করে অগ্রাহ্য করেছি, এখন আমি তোমাকে আমার চেয়ে শক্তিমান জেনে তোমারই কাছে মাথা নত করছি, এখন আমাকে বিনষ্ট করার পূর্বে বলে দাও তুমি কে?" আবার তার কাছ ঘেঁসে এবং বহুদূর সীমানা থেকে স্বর শোনা গেলঃ "কোন নশ্বর প্রাণী এখনও পর্যন্ত আমাকে জানতে পারেনি। আমার নাম অনেকঃ কুসংস্কারাচ্ছন্নরা আমাকে বলে নিয়তি, নির্বোধেরা বলে সৌভাগ্য, আর ধার্মিকেরা বলে ভগবান। যারা নিজেদের জ্ঞানী মনে করে তাদের কাছে আমি হলাম সেই আদ্যা শক্তি যা অনন্ত কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজ করছে।"

হৃদয়ে মৃত্যুর তিক্ততা নিয়ে যুবক সজোরে বলে উঠলঃ "তাহলে আমার এই অন্তিম মুহূর্তে তোমাকে আমি অভিশাপ দিয়ে যাই। বাস্তবিকই তুমি যদি সেই আদ্যাশক্তি হও যা অনন্তকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছে, তাহলে বল যে তোমার সাবধান বাণী সত্ত্বেও কি এই সব ভবিতব্যের যা কিছু ঘটেছে তার সব কটিই আগে থাকতে স্থির করা ছিল—যে আমি বনের মধ্যে প্রবেশ করে হত্যা সংসাধন করব, প্রান্তর পার হয়ে পিতৃভূমির সর্বনাশ ডেকে আনব এবং এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হব। তোমার সতর্কবাণী যদি আমাকে সাহায্য করতেই না পারল তাহলে কেবলমাত্র কানে শুনিয়ে দণ্ডাদেশ দিলে কেন? তা কেনই বা আমি শুধু একটা পরিহাসের মত এই অন্তিম কালে নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে তোমার কাছে এই অপৌরুষেয় প্রশ্ন উত্থাপন করব?"

মহাশূন্যের দূরতম প্রান্তকে অদ্ভুত এক অট্টহাসের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করে কর্কশ স্বরে এবং ভয়ঙ্করভাবে যুবককে উত্তর দেওয়া হল। ঐ কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই মাটি কেঁপে উঠল এবং তার পায়ের তলা থেকে খসে খসে পড়ল। আর সেই যুবক সৃষ্টির আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের গুহাহিত রাত্রির মাঝে অদ্ভুত অতল গহ্বরের চেয়ে গভীরতম প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হল।

অনুবাদক : সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

পল্লীকাব্য পরিক্রমা

নগেন দত্ত

বাঙলার বারমাসী*

বাঙ্গালার পল্লীকাব্যে বারমাসী সাহিত্যের পরিচয় মূলতঃ বহিঃপ্রকৃতি ও মনের পরিচয়,—তাহার অর্থ এ নয় যে তাহা সমসাময়িক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যযুগের সমাজে রাজপুত্র সদাগরের পুত্র, মন্ত্রিপুত্র ইত্যাদি সবাই উপাখ্যানের নায়ক হইতেন। তাহাদের কাহিনী রসের জোগান দিত। ইহাদের ঐশ্বর্যময় জীবনযাত্রার মাঝে কত সাধারণ মানুষের জীবন-কাহিনী ডুবিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৃহত্তর মানব সমাজ তাহাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস শুধু গাথার মাঝে গাথিয়া রাখিয়াছে। বৃহত্তর মানব সমাজ যদি ব্যক্তি-মানস গঠনে কিছু সহায়তা করিয়া থাকে তবে তাহাই সমাজের দান বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এই ব্যক্তি মানস ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার ছাপ রহিয়াছে, ব্যক্তি মানসকে এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়া খণ্ডরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা চলে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাঝে একটি মন স্পষ্ট হইয়া ওঠে তাহা হইতেছে বিশ্বমন। সে সবার সম-লক্ষণযুক্ত হইয়াও বিশেষ লক্ষণ বিশিষ্ট। এই বিশ্ব-মন কালে-কালে পরিবর্তনের পথে চলিয়াছে সত্য কিন্তু ইহার রূপ, বৈচিত্র্য, সুর এক ও অভিন্ন। উত্তর মেরু দেশের হিম তুষার পরিবৃত্ত যে পারিপার্শ্বিক, যে সমাজের মানুষ শীতের সঙ্গে লড়াই করিয়া ধন, জন, জীবন, যৌবন, সব ভোগ করিতেছে—সে দেশের নারীও বিরহে যে সুরে কথা কহিয়া থাকে, ঠিক সেই সুরেই সজল শ্যামল বাঙ্গালার পল্লীবধূও কথা কহিয়া থাকে। ইহার বিভিন্নতা হয়ত ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্যই ঘটিয়াছে। কিন্তু আসল সুর অকৃত্রিম রহিয়াছে। বনের পাখীই হোক আর পোষা পাখীই হোক—সে চিরকালই গান গাহিয়া কাহারো-বা-কাহারো মনের গুপ্ত তন্ত্রীতে ঘা দিয়াছে। এই কথাটি শাশ্বত সত্য, অবশ্য কেহ কেহ বলিবেন সত্য বস্তু বা সমাজ নিরপেক্ষ নহে। অতএব তাহা চিরন্তন বা শ্বাশত নহে। বস্তুত এই তর্ক সত্য যে শাশ্বত ও চিরন্তন তাহাই প্রমাণিত করে। কেন না বস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই সত্যের আবির্ভাব হয়। দেহকে কেন্দ্র করিয়া রূপ, রূপকে কেন্দ্র করিয়া ভাবাবেশ—আর সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই দেহীর মন। সমাজ মন সমষ্টির ব্যাপক পরিধি রচনা করিতেছে মাত্র। অতএব বিরহী যক্ষের মানসিক আবেগ যে অবস্থায় সত্য—ঠিক সেই অবস্থাতেই বাঙ্গালার অচেনা পল্লীর প্রেমিকার 'বারমাসী' সত্য। সেই প্রতীক্ষ্যমান দীর্ঘদিন, সেই অন্তরনিষিক্ত দুঃখের গুঞ্জরণ—ধীরে ধীরে সমগ্র মনের সচেতন সত্তায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই মনের আবেদন-নিবেদন যাহার কাছে—সেই মানুষটি একটি অ-দৃষ্ট জগতে বাস করিতেছে। তাহার রূপ, রস, স্পর্শ হইতে সে বঞ্চিত। এই বঞ্চিত বিরহী সত্তাই বারে-বারে বিভিন্ন ভাষার অন্তরালে, বাহ্য প্রকৃতির মাঝে বিভিন্ন রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রেমিকজন আজ আর কাছে নাই—তাহারই রূপ ও রসের অনুভূতি মানস চেতনায় অনুভব করিয়া সে স্পর্শের জন্য কাতর হইয়াছে, আশার সারক বাঁধিয়া কোন অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে। তাহার পথের যেমন সন্ধান নাই, তেমন নাই মনের সন্ধান। মন সেখানে ঠিক উদ্‌ভ্রান্ত নহে, প্রেমসন্ধানী। বন্ধুর বিরহে সে সেই সন্ধানে চলিয়াছে—তবে অনন্যমনা হইয়া।

এই হৃদয়াবেগ, ব্যাকুল প্রতীক্ষা চিরদিন বিরহীর জন্য প্রকৃতির মাঝে রূপ লইয়াছে। বৃক্ষ শাখায়, পল্লবে, পাখীর গানে, বর্ষার প্লাবনে, নদীর গর্জনে, রাত্রির আঁধারে—অনন্তকাল ধরিয়া রূপসমষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই রূপের নির্ঝর ব্যথিত সুরে পর্যবসিত হইয়া গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিয়াছে। এই কান্নার বিরতি শুধু সেদিন হইয়াছে যেদিন মাধুরীপূর্ণ দেহ নিস্পন্দ হইয়াছে। প্রকৃতিদত্ত দেহের অবসান হইলেও সেই বিরহিনীর কান্নার সুর বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, কেননা, যে জীবন এমন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে—সে সমাজ-জীবনে আর দশটা বিরহিণীকে কাঁদাইয়াছে। বস্তুত মানব মন হইতে কোন ভাবই কোনদিন তিরোহিত হয় না, এ যেন এক চেতনার শৃঙ্খলে বাঁধা যাহা এখন আছে, তাহা ইতিপূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবেই না সমস্ত ভাবধারার কল্পনা মানব জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সেই অনন্ত মন বিরহ-বিধুর হইতেও পারে, রাগ দ্বেষে কঠিন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত হইতেও পারে। ইহাই হইল মানব মনের বৈচিত্র্য যাহা আছে তাহাকে নূতন রসে,

* ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত পূর্ববঙ্গগীতিকা—পত্রপঙ্ক ২০৯।

রূপে ভোগ করিয়া লও। যে ভোগ করিবে সে কিন্তু সেই স্থান-কাল-নির্দিষ্ট জীবটি রহিয়াছে। তাহা হইতে পারে, কিন্তু যখন স্থান কালের বৈষম্য ঘটে তখন পাত্রের, অর্থাৎ জীবের রস-রূপেরও বৈচিত্র্য ঘটে, বাঙ্গালীর নারী-মনের পটে বারমাসীর প্রভাব এই স্থান-কাল-প্রকৃতির বৈষম্য হেতুই ঘটিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার বারমাসীর কথা বাদ দিলেও ইহার মূল সুরে-গাথা আরও বিরহ-তপ্ত হৃদয়ের পরিচয় মেলে। ইহা যেমন প্রেমের অতি আদিম সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত তেমনি রসাশ্রিত মধুময়। এই মধুর রস যেমন শান্ত মৃদু তেমন নির্মমও বটে, প্রতিটি ভঙ্গীতে যেন রসবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মলয়ার বারমাসী'তে যে-সুর বিরহের কান্নায় গুমরিয়া-গুমরিয়া উঠিয়াছে "বগুলার বারমাসী"তে সে সুর ঠিক তেমন নহে। বিরহ-প্রবণ মন বুদ্ধিদীপ্ত কলা-কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে—তাহার অর্থ এ নয় যে বিরহ-বিধুর মন পরিপূর্ণ বেদনার অনুভূতিতে সাড়া দেয় নাই অথবা প্রিয়-জনের জন্য নির্মম ত্যাগ-বৈরাগ্য গ্রহণ করে নাই। এখানে বিরহিণীর মন সজাগ থাকিয়া পতির মঙ্গল কামনা করিয়াছে আবার রাজপুত্রের প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার চাতুর্যপূর্ণ কৌশলও কল্পনা করিয়াছে। রাজপুত্র প্রেমের পিপাসায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া দূতী অথবা কবুতরের মাধ্যমে তাহার প্রেম নিবেদন করিয়াছে। রাজপুত্রের তরফ হইতে অনুরোধের কোন বিরতি নাই। যে-ভাবে নারীর মন হরণ করিবার পদ্ধতি আছে সেই ভাবেই সে তাহা করিয়াছে। রাজপুত্র শেষে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া দিয়া বগুলার মন নিরাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই প্রেমোপাখ্যানের একটি সামাজিক দিক রহিয়াছে। রাজপুত্র সাধুর (সদাগরের) কন্যার প্রেমাভিলাষী। ইহা সাধুর সমাজ-জীবনে এক মহাসুযোগ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এবং বগুলার পিতা এই সুযোগ গ্রহণে অসম্মত ছিলেন না। কিন্তু সাধুর কন্যার মন অন্যত্র রহিয়াছে। সে রাজপুত্রের রূপে বা ঐশ্বর্যে মুগ্ধ নহে বরং নিজ প্রেমিকের প্রতি অন্তরের প্রবল আকর্ষণে আগাইয়া গিয়াছে। যে-সমাজ ব্যবস্থায় এই রূপ সম্ভব হইতে পারে সে সমাজে নিশ্চয়ই সাধারণের স্থান নাই। সর্ব যুগেই বণিক সমাজ ধন-দৌলতের অধিকারী, রাজা রাষ্ট্রের কারণেই ধনবানদের হাতে রাখিয়া থাকেন ও সামাজিক জীবনযাত্রায় যথাযথ ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে কল্পনা করিতে বাধা নাই যে, এইরূপ সামাজিক জীবনের সংস্পর্শ হইতেই রাজপুত্র বগুলার প্রেমের প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, আর প্রেমিক রূপে আবির্ভাব হইয়াছে সদাগরের পুত্র। সমগ্র প্রেমোপাখ্যানটিকে তৎকালীন বাণিজ্যিক সমুদ্রযাত্রার উপর এক অংশ দাঁড় করানো হইয়াছে। আর বাকিটার পরিণতি ব্রত উদ্‌যাপন ও রাজপুত্রের ষড়যন্ত্র চক্রের উপর নির্ভর করিতেছে। বগুলার পিতা কন্যাকে রাজমহিষীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যা প্রেমে মহীয়সী হইতে চাহিয়াছে। এখানে পিতা-পুত্রীর বিরোধ তেমনভাবে প্রবল আকার ধারণ করে নাই। পালা রচনাকারী অদ্ভুত কৌশলে পালাটি রচনা করিয়াছেন। এবং পালার পরিসমাপ্তিকে বুদ্ধিদীপ্ত মনস্তাত্ত্বিক রহস্যপূর্ণ জগতের মাঝে টানিয়া আনিয়াছেন। এই হেতুই পল্লী কাব্যের অন্যান্য প্রেমোপাখ্যানের সহিত ইহার একটু প্রভেদ রহিয়াছে।

এই কাহিনীর নায়িকা বুদ্ধিমতী, সে বুদ্ধির উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছে। যখনই প্রীতির বিরহে মন কাতর হইয়াছে তখনই রাজপুত্রের কবুতর আসিয়া হাজির মনকে দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া ভাগ করিয়াছে এক ভাগ তাহার বিরহের আগুনে জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—আর এক ভাগ বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে আত্ম-মর্যাদা রক্ষার সন্ধান করিয়াছে। বুদ্ধি আশ্রিত কলা-কৌশল বারমাসে কূট যুক্তি লইয়া দেখা দিয়াছে। অবশ্য এই যুক্তি প্রথমে তাহাকে রক্ষা করে নাই। তাহার যুক্তি-রক্ষাকবচ অবশেষে তাহার বিপদের কারণ হইয়াছে। কেন না, ননদিনী কবুতর আটক করিয়া বগুলার সব চাতুরীর আসল উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিয়াছে।

> "লিখন লইয়া কৈতরারে শূন্যে দিলা উড়া।
> জালেতে হইল বন্দী ননদিনী খাড়া॥"

ইহার অনিবার্য ফল ভোগ বগুলা এড়াইতে পারে নাই।

> "ঘরের ছিকল বন্ধ বন্দী হইল নারী।
> পিঞ্জরায় বন্দী হইল উড়ন্ত কৈতরী॥"

প্রেমিক-জীবনে যে ট্র্যাজিডি থাকুক না—এই দুইটি ঘটনা সামাজিক জীবনে অতিশয় গুরুতর বলিতে হইবে। ঘরের কুলবধূ যদি এইরূপ আচরণ করে এবং কাহাকেও বলে,

> "চৌদল পাঠাইও কুমার নিশি দু পহরে।
> কালুকা যাইব কুমার তোমার মন্দিরে॥"

বগুলার পারিবারিক জীবনে যাহারা অভিভাবক ছিলেন তাহারা এ-জাতীয় অপরাধ ক্ষমা করেন নাই। সমস্ত উপাখ্যানটির ইহা একটি অতি গূঢ় ষড়যন্ত্রের অংশ মত কেননা রাজপুত্র বগুলাকে পাইবার নিমিত্ত বিবিধ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। প্রসঙ্গত এমন ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাতে এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। এক বছর পূর্ণ হইবার

পর সাধুর পুত্র দেশে ফিরিয়াছে, ভরা ডিঙ্গা হইতে উঠিয়া সাধুর পুত্র শীতল মন্দিরে ছুটিয়া চলিল। তার সমস্ত দুস্ত ষড়যন্ত্রের কথা বগুলার কাছে নিবেদন করিল,

"কেমনে পরাণ ধরি বৈদেশেতে বাসা।
দারুন রাজার পুত্র করিল নিরাশা॥
তাড়াইয়া তাড়াইয়া মোরে পাঠায় বৈদেশে।
আর না থাকিম এমুন রাজার দেশে॥"

রাজপুত্রের সফল ষড়যন্ত্র। বগুলার ব্রত উদ্‌যাপন আত্ম-মর্যাদা রক্ষার কৌশল,—এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সেকালের কুলবধূর এই ব্রত উদ্‌যাপন হয়ত উদ্ধত রাজ-পুত্রও মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এবং ধৈর্য সহকারে সেই বিশেষ শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে। বহু যুগের ধর্ম সংস্কার রাজপুত্রের মনেও ভয়মিশ্রিত প্রভাব ছড়াইয়াছে। নচেৎ রাজপুত্রের পক্ষে এমন প্রেমের অভিনয় করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ক্ষমতাশালীর চিরদিন কাড়িয়া লইতে অভ্যস্ত। এখানে ধর্ম সংস্কার একদিকে ধর্মের ন্যায় কাজ করিয়াছে, অন্যদিকে সমাজের শৃংখলা রক্ষা করিয়াছে। এই দ্বিবিধ ধারাও শেষ পর্যন্ত কোন দুঃখকর পরিণতি এড়াইতে পারে নাই। মানবীয় কুচক্র ননদিনীতে ঠাঁই লইয়াছে। সেই ভাইকে কাছে পাইয়া লিখিত পত্রখানি দেখাইল। সদাগর পুত্র রাগে-ক্ষোভে জ্বলিয়া আগুন। বগুলা নির্বাসনে গেল। বগুলার নির্বাসনকালে গীতিকার আর একটি খণ্ডগল্পের সৃষ্টি করিয়া অপূর্ব উপাখ্যানভঙ্গী দেখাইলেন। যে উপাখ্যান নিতান্তই বিয়োগান্তক হইবার কথা তাহা কৌশলে মোড় ফিরাইয়া দিয়া তিনি মিলনের সুরে বাঁধিয়া দিলেন। এই খণ্ড উপাখ্যানটিকে হৃদয়াবেগের চাইতে বুদ্ধিদীপ্ত মনস্তাত্বিক খেলারই প্রাধান্য পূর্বের তুলনায় আরো বেশী পাইয়াছে। ফলে রসের দিক কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাছাড়া মলয়ার বারমাসীতে যে কবিত্বের ভাবাবেগের পরিচয় মেলে—এখানে তাহার কিছু অসম্ভাব ঘটিয়াছে। এখানে মন দুঃখবাদী বটে, কিন্তু বুদ্ধির সুদীপ্ত ফলকে তাহাকে কাটিয়া বিভিন্ন রূপে দেখানো হইয়াছে। রসের ক্ষেত্রে এইরূপ বুদ্ধির আবির্ভাব হয়ত অনেক রসপিপাসু মনকে আঘাত দিয়া থাকিবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বগুলা একটি অতি দুরূহ ষড়যন্ত্রের চাপে পড়িয়া আবেগমুখী মনকে বুদ্ধি-বৃত্তির কাছে সমর্পণ করিয়াছে। যদি তার অন্তরে শুধু প্রিয়জনকে পাইবার আবেগ ও বিরহ-বেদনা তীব্র হইয়া উঠিত তবে হয়ত রসের ভাণ্ডার অন্য রূপে সাজানো সম্ভব হইত। কিন্তু যে বুদ্ধি চাতুরী তাহাকে একদিন বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহাই আবার শুভ পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া নিয়া চলিল। স্বামীর সহিত মিলনের পথে যত কাঁটা ছিল তাহা আস্তে আস্তে তুলিয়া সেই বুদ্ধিই একদিন তাহাকে স্বামী সঙ্গ লাভে সহায়তা করিল। বনে যাইয়াও বগুলার নিষ্কৃতি নাই—হতভাগিনী আবার এক রাজপুত্রের কবলে পড়িল। বগুলা বলিল,

"রাজার পুত্র রাখ আমার মান॥
বার মাস গেছে ব্রত প্রতিষ্ঠার কাল।
নাই সে ভাইঙ্গ ব্রত মোর না ঘটাও জঞ্জাল॥"

এই রাজপুত্রও ব্রতের সব দ্রব্য আনাইয়া দিতে প্রস্তুত। ব্যবধান শুধু এই যে তখন বগুলা কুলবধু ছিল, আর এখন সে বনবাসিনী, তথাকথিত পাপ-ফল ভোগ করিবার নির্বা-সন দণ্ড প্রথা কাহিনীকার হয়ত রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বাঙ্গালী নারীকে ব্রতপ্রথার মাধ্যমে এক অতি শক্তিময়ীরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। এবং সমাজের যত বড় অভিজাতই হোন না কেন তিনি, তাহাকেও—অর্থাৎ রাজ-পুত্রকেও—এই ব্রতপ্রথার পবিত্রতা মানিয়া লইতে হইয়াছে। ইহা মধ্যযুগীয় অতি পবিত্র মাহাত্ম্য—অন্যের সদানুষ্ঠানের প্রতি এই নিষ্ঠার ভাব এবারের রাজপুত্রকেও খানিকটা মহত্ব দান করিয়াছে। বগুলা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সবই বলিল। আর বলিল সর্বসুলক্ষণযুক্ত এক সাধুর পুত্রকে আনিয়া দিতে। বগুলার মানসপটে অতি সম্ভাবিত মিলন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, স্বামীর সন্ধান এইরূপে সম্ভব হইতে পারে। কেন না সে ত বাণিজ্যগামী হইবেই। বস্তুত তাহাই হইল, সাধু বাণিজ্যে বাহির হইয়া রাজার পুত্রের নিকট বন্দী হইলেন। রাজপুত্র যখন বগুলার প্রেমের আশায় ঘর বাঁধিতেছেন, তখন সাধুর পুত্র বগুলাকে লইয়া দেশে যাত্রা করিল। এই জাতীয় পলায়নে নিশ্চয়ই রোম্যান্স আছে, কিন্তু গীতিকার পাঠকের কল্পনায় ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত।

বিপ্রলব্ধা

অনুপম সেন

চিঠিটা আপন মনেই ভেতরের উঠোনে পড়েছিলো। কখন যে পিয়ন এসে দরজা গলিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে খেয়াল করেনি কেউ। খেয়াল করেনি না অবজ্ঞায় তুলে নেয়নি সেই কথাই চিঠিটা তুলে নিতে নিতে ভাবলো সুনন্দা। খামটা উঠিয়ে নিয়েই অতি পরিচিত দিদির হাতের লেখা চিনতে পারলো ও। ক্লান্তি ছড়ানো সারা মুখে ওর একটা ম্লান হাসির রেখা যেন বিদ্যুতের মত উঠেই আবার মিলিয়ে গেল তখন। ভাবলো, যাক, এতদিনে তবে মনে পড়লো দিদির!

অফিস থেকে ফিরে এসে রোজই হাতমুখ ধুয়ে একটু গড়িয়ে নেয় সুনন্দা। কিন্তু আজ আর তা হোল না। টেবিলের কাছে মোড়াটা টেনে নিয়ে ঝুপ্ করে বসে পড়লো ও আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই চিঠির খামটা ছিঁড়ে ফেলে বের করলো চিঠিটা।

অনেক কথাই লিখেছে দিদি। তার সুখ-দুঃখময় জীবন-ইতিহাসের অনেক কথাই শোনাতে চেয়েছে সে। শুনতে চায়নি কেবল এ'দের কথাই। নিজেদের সমস্ত কথা লেখার শেষে ও লিখেছে, মা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জানি কিন্তু তুই আমায় ক্ষমা করিস নন্দা। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক অন্তত তুই আমায় বুঝবি এই ভরসা নিয়েই আজ আমি তোকে চিঠি দিলাম।

আচ্ছা নন্দা, ভালবাসাটা কি অপরাধ? আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি, তোদের সবাইকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি এটাই যদি তোদের চোখে ঘৃণ্য করে থাকে আমাকে তবে আমি বলবো, বলবো, আমি অন্যায় করিনি। মনোমত পাত্র খুঁজে নিয়ে ঘর বেঁধেছি তাতে দোষের কি আছে? সেকালে সীতা সাবিত্রীদের যুগে যদি স্বয়ম্বরা প্রথায় নিন্দার কিছু না থাকতো তবে এ যুগেই বা কেন থাকবে? আজ না হোক অন্তত আর ক'বছর পরেই পাড়ার ছেলেদের উপদ্রবে তোদেরই তো আমার স্বামী খুঁজে মরতে হোত। বিধবা মায়ের উপরে সেটা কি আমাদের খুব বেশি একটা জুলুম করা হোত না? আসলে তোদের রাগ সে জন্যে নয়। আসলে তোরা আমাকে কোনদিনও চাসনি—চেয়েছিলি আমার রোজগার করা টাকা আর সেটাই তোদের হারাতে হোল হঠাৎ—রাগ সেজন্যেই—নয়?...

চিঠিটা অনেকক্ষণই শেষ হয়ে গেছে পড়া তবু সুনন্দা সেই চিঠিটার কথাই বার বার ভাবতে লাগলো। চুপ করে জানলার ফ্রেমে আঁটা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন্থন করতে লাগলো অতীতকে। এক সময় এই সব ভাবতে ভাবতেই কি যেন কেন ওর মনে হোল—মনে হোল, সত্যিই তো দিদি কিছু অন্যায় করেনি এমন বরং এতদিন তার প্রতি এরূপ অনমনীয় বিরূপ মনোভাব পোষণ করে অপরাধ তারাই করেছে।

সত্যিই যদি বয়েসকালেই দিদির বিয়ে হোত তবে তা কবেই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। হয়নি নয়, সংসারের অভাব অনটন তা হতে দেয়নি। শ্বশুরবাড়ি যাবার চেয়ে দশটা-পাঁচটা অফিসে যাবার প্রয়োজনই বড় বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো দিদির সেই বয়েসে। তার সেই প্রতিটি বসন্তের অপচয়ে এতদিন পরম শান্তিতে নির্ভর করে এসেছে ওরা। তাই দিদি বিদেয় হওয়াতে সংগে সংগে যে তার প্রতি মাসের মোটা অঙ্কটাও বিদেয় হয়েছিলো সেই ভাবনাই সেদিন বেশি করে ভেবেছিলো মা—ভেবেছিলো ওরা সবাই। দিদির উপর সেদিন সুনন্দার রাগ হয়েছিলো খুব কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হোল দিদি তার ত্রিশটা বসন্ত ধরে একটি সংসারকে দাঁড় করাবার জন্যে যে কৃচ্ছ্রতা যে সংযম দেখিয়েছিলো তা যদিও ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে না কোনদিন—তবু তা লেখা হবার মতই আশ্চর্য ঘটনা কিছু তাতে সন্দেহ নেই। ইতিহাস যদি সে কথা নাই মনে করে তাই বলে তারা ভুলে গেল কি করে? দিদির উপর বিরূপ মনোভাবের স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে থাকতে পারলো কি করে? আজ তাই বিস্তৃত আকাশের মতই মনের ভাবনাগুলোকেও বিস্তৃত করে সুনন্দা কিছুতেই ভাব হদিশ পেলো না।

সুরবালা যখন চা' নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সুনন্দা তখনো ঠিক তেমনি করেই ভাবনার আচ্ছন্নতায় অবশ হয়ে বসেছিলো। টেবিলের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিলো মধুচ্ছন্দার গোলাপী চিঠির কাগজগুলো। সেখানে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে সুরবালা আশ্চর্য হলেন। বললেন, কিরে, এখনো যে চুপচাপ বসে আছিস? চান

করবিনে? আমি ওদিকে কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি।

সুনন্দা শুধু বললো, আজ আর খেতে ইচ্ছে করছে না মা।

কেন? শরীর টরির আবার খারাপ হোল নাকি বাপু! —বলতে বলতেই সুরবালা ভালো করে বার কয়েক গায়ের উষ্ণতা পরখ করে দেখলেন সুনন্দার। তারপর আবার বললেন, না, তা খাবে কেন? দিনকে দিন শরীরটা কি হয়ে যাচ্ছে দেখেছিস কখনো?

কানের কাছে আজ এখন এই মুহূর্তে কেউ এসে বক্-বক্ করুক তা যেন মোটেই ভালো লাগছিলো না সুনন্দার। তাই সে সুরবালাকে পাশ কাটাতে চাইলো। বললো, তুমি যাও মা, আমি এখুনি যাচ্ছি।

সুরবালা চলে গেলে সুনন্দা আবার ভুলে গেল চায়ের কাপে চুমুক দিতে। ভুলে গেল তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে দেয়ে মাকে অপ্‌সর করে দিতে। কিন্তু, ভুললো না কেবল একটি কথাই—সে কথা মধুছন্দার। মনে মনে ভাবলো সুনন্দা। ভাবলো, একদিন দিদিও তো তারই মত চাক্‌রী করে সকলের মুখের গ্রাস জুগিয়েছে। তার সাধ্যমত সকলকে খাইয়ে পরিয়ে ভালো ভাবে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু। কিন্তু সেদিন তো কৈ তার জন্যে মার কোনদিন দুঃশ্চিন্তা হয়নি। ভাবনা হয়নি তার শরীর খারাপের জন্যে। সুনন্দা ভাবলো, সুনন্দার জন্যেও হয়ত হোত না যদি তার পরে আর কোন উপার্জনক্ষম কেউ থাকতো। নেই বলেই তাই এত ভাবনা। শেষ অবলম্বনটুকু হারাবার তাই এত দুঃশ্চিন্তা। নইলে তার প্রতি যে সুরবালার সত্যি সত্যি কতটুকু মায়া আছে তা আর জানতে বাকী নেই ওর। জেনেছে দিদির দিকে তাকিয়েই।

কিন্তু হঠাৎ সুনন্দার সেই ভাবনায় যতি পড়লো। খুক্ খুক্ করে আবার কাশলো যেন বিলু। উঠে গেল সুনন্দা পাশের ঘরে। না, বিলু নয়—পাশের বাড়ির কেউ হবে হয়ত। বিলুতো তখনো পরমনির্ভয়ে ঘুমুচ্ছিলো। সুনন্দা আর দাঁড়ালো না সেখানে। কাপড় চোপড় নিয়ে সোজা চলে গেলো বাথরুমে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সুনন্দা জেগে জেগে চিঠি লিখলো। চিঠি লিখলো ওর দিদিকে। লিখলোঃ

দিদি, তুই পালিয়ে গিয়ে জীবন বেঁধেছিস সেইজন্যে আর যে যাই ভাবুক না কেন আমি কিন্তু কিছু মনে করিনি। যদিও একটা সাময়িক তোকে হারাণোর ব্যথা পেয়েছিলাম তখন—সে এমন কিছু নয়।

তোর 'পুরে রাগ করবো কেন ভাই। তুই যা সংসারের জন্যে করে গেছিস তার এক কণা করতে পেলেও বর্তে যেতাম আমি। তবু দেখ এ সংসার তোর সেই দানের কথা ভুলে গেছে—ভুলে গেছে তোকে। এমন কি তোর ছিটেফোঁটা স্মৃতি পর্যন্ত এ বাড়ির আনাচে-কানাচে কোত্থাও নেই—এমনি অকৃতজ্ঞ এরা। অকৃতজ্ঞ এই সংসার।

দুঃখ করিস না দিদি। এরা সবাই ভুললেও আমি তোকে কোনদিনই ভুলিনি—কোনদিন ভুলবোও না।

এটুকু লিখেই সুনন্দা আবার বসলো। ভাবলো পাশের বাড়ির একটি মুখের কথা। যে মুখের সাথে ওর আলাপ অনেক দিনের। মনে মনে ভাবলো সে মুখের কথা দেবে নাকি দিদিকে জানিয়ে? আবার কি ভাবলো, মনে মনে মন কথা কইলো ওর, বললো, না, থাক। এত তাড়াতাড়ি জানিয়ে লাভ কি! যখন হবে তখন দেখা যাবে।

পাশের ঘরের স্তিমিত লণ্ঠনের আলোটা আবার জ্বলে উঠলো কেন? তাকালো ও। দেখলো, সুরবালা উঠেছেন। তাড়াতাড়ি তাই চিঠির কাগজগুলো চাপা দিয়ে উঠে এলো ও। বললে, বিলুকে অষুধ খাওয়াবার সময় হয়ে গেছে বুঝি। দাও, আমি দিচ্ছি।

সুরবালা বললেন, থাক না। উঠেছি যখন আমিই দিচ্ছি। কিন্তু তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কি করছিসরে নন্দা? এখনো ঘুমুস নি যে।

সুনন্দা সত্যি উত্তরটুকু এড়িয়ে যেতে চাইলো। বললো, বললো একটু আন্ধারের সুরেই, ঘুম যে আসছে না মা!

কেন? একটু অবাক হলেন সুরবালা। বললেন, শরীর টরির খারাপ হয়নি তো রে!

হাসলো ও। বললো, তোমার মা সেই এক কথা। শরীর আমার খারাপ হতে যাবে কোন দুঃখে? দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি আর মোটাচ্ছি। তুমি এর মধ্যে শরীর খারাপের আবার কি দেখলে মা?

সুরবালা বললেন, তবে তোর ঘুম আসছে না কেন? হয়েছে কি?

সুনন্দা আবার হাসলো। বললো, ও কিছু না। ও এমনিই।

সুরবালা তারপর যতক্ষণ জেগে ছিলেন সুনন্দা ততটুকু সময় বিছানায় গড়াগড়ি করে কাটিয়ে দিলো। ও জানে যে এখনি যদি কিছু লেখালেখি করতে বসে ও তবে অনেক কথা

উঠবে—অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে মাকে। তার থেকে কিছু সময় চুপচাপ কাটিয়ে দেওয়াই ভাল।

ও ঘর থেকে সুরবালার সমস্ত অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত যখন নীরব হয়ে গেল তখুনি সুনন্দা বিছানা ছাড়লো। পা টিপে টিপে একবার মার ঘর দেখে নিশ্চিন্ত মনে আবার ভাবতে বসলো দিদির কথা। ভাবলো, এইবেলা চিঠিটা শেষ করে ফেলি নইলে তাড়াহুড়োতে কাল আর ডাকে দেওয়া হয়ে উঠবে না।

সুনন্দা লণ্ঠনের শিখাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে দিদিকে লিখলোঃ

দিদি, আমারও এক এক সময় মনে হয় এ সংসার হতে তোর মত পালিয়ে কোথাও চলে যাই। নতুবা শান্তি নেই—সান্ত্বন ও নেই। এ পৃথিবীতে জন্মে এ জীবনে অবহেলা, অনাদর আর পদাঘাত ছাড়া আর কি পেয়েছি বল তুই। এই পৃথিবীর জন্যেই সারাটা জীবন আমাদের তুচ্ছ হয়ে গেল। অভাবের আগুনে সমস্ত সম্ভাবনা সমস্ত মুকুলিত বসন্ত পুড়ে খাক হয়ে গেল আমাদের, তবু—তবুত আমরা একটুও প্রতিবাদ করিনি কোনদিন। আর তা করিনি বলেই পৃথিবীটা এত মন্দ হয়ে গেছে।

সোজা কথাগুলি সুনন্দা বেশ সোজা করেই লিখতে পেরেছে বলে মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করলো। মনে মনে ভাবলো, এবার অন্তত দিদি বিশ্বাস করতে পারবে ওকে—আরো বেশি সহজ হতে পারবে ওর কাছে।

শেষ পর্যন্ত সে রাতে চিঠিটা আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি সুনন্দার। হঠাৎ বিলুর খুক্‌খুকে কাশি আর কাতর কাৎরানীতে সচকিত হয়েছিলো ও। চিঠি ফেলে তাড়াতাড়ি ও ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলো ও। ততক্ষণে সুরবালাও উঠে বসেছেন বিছানায়।

বেশ তো ছিলো বিলু হঠাৎ তার আবার এই পরিণতি কেন হোল! ডাক্তারের আশ্বাসে এতদিন তবু নিশ্চিন্ত ছিলো সুনন্দা—নিশ্চিন্ত ছিলেন সুরবালা। আজ তাদের সমস্ত প্রত্যয় সমস্ত বিশ্বাসকে ভাসিয়ে দিয়ে আবার গলগল করে রক্ত উঠলো বিলুর গলা দিয়ে। আবার সুরু হোল তিনমাস আগেকার পুর্বানুবৃত্তি। ঠিক একই নিয়মে আবার এলেন ডাক্তার। এলো নানান লেবেল আঁটা সমস্ত দামী দামী অষুধ। এলো পথ্য, এলো ফল, সুরু হোল রাজসিক ক্রিয়া কান্ড। আর যা হোল তাহোল শেষ সম্বল শাশুড়ীর দেওয়া রুলি দু'গাছা বেরিয়ে গেল সুরবালার আর বাজারে অনেক টাকা দেনা হোল সুনন্দার।

সেদিন বিকেলে অফিস ফেরৎ পাশের বাড়ির সেই অতি-চেনা মুখের সাথে সুনন্দার একটু নূটুকে ভাবেই দেখা হয়ে গেল। অরুণ জিগ্যেস করলো, কয়দিন অফিস খুঁজে করেছিলাম। যাওনি যে।

সুনন্দা কি যেন ভাবলো। ভেবে সমস্ত ব্যাপারটা লুকিয়ে গেল। বললো, এমনি। শরীরটা বিশেষ ভালো ছিলো না তাই।

তারপর। কার্জন পার্কের ঘাস-ভেলভেটে বসে বসে অনেক কথা বলেছিলো অরুণ। সবশেষে বলেছিলো, নন্দা, কবে তোমায় সম্পূর্ণ আমার করে পাবো বলতো!

কোনদিনই না। উঠে দাঁড়ালো সুনন্দা। বললো, অনর্থক আমার আসার আশায় কাল গুণে গুণে তোমার মহা-মূল্য সময়গুলি এভাবে নষ্ট করো না অরুণ! আমি তোমার কেন, কারো কোন কেউ কোনদিনই হতে পারবো না। সেজন্য ক্ষমা কোর।

তারপর কোনমতে চোখে রুমাল দিয়ে কান্নার জল শুষতে পেরেছিলো সুনন্দা আর পেরেছিলো কোনমতে ট্রামে চেপে

বিদেশীর ওপর টেক্কা দিচ্ছে…

কাজল কালি

কালি দিয়েও যে দেশের কালিমা ঘোচে, বিদেশী যুগে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছে কজল-কালি। আজ স্বদেশীর যুগে সেই কালি-ই যে বিদেশীর ওপর টেক্কা দিচ্ছে, এইটিই বিশেষ আনন্দের কথা।

স্বাঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র
২৮।২।৫৪

প্রস্তুতকারক—
কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা)
অন্যতম বিক্রেতা—কলেজ ষ্টোর্স ৫৫, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

বাড়ি পর্যন্ত আসতে। আর ওদিকে অরুণ অনেকখানি আশ্চর্যে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো সেই মুহূর্তেই।

দিদির কাছে লেখা অসমাপ্ত পুরনো চিঠিটা সেই রাতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো সুনন্দা। আবার নোতুন করে লিখতে বসলো নতুন দিনের কাহিনী।

দিদি, সেদিন তোর চিঠিটা পেয়ে অনেকখানি আশ্চর্য হয়েছিলাম এবং সেই হওয়াটাই বুঝি স্বাভাবিক ছিলো। আমি ভেবে পাইনে এতদিন যদি তুই নিজের মনে নিজে থাকতে পারলি তবে আজ কেন পারলিনে। আজ কেন তোর জীবনের ভাঙাচোরা উত্থান পতনের ইতিহাস আমায় শোনানোর প্রয়োজন হোল তোর?

তোর উপর রাগের বা তোকে ভুলে যাবার কোন কথা নয়। তোকে আমরা কেউই আজো একেবারেই ভুলে যাইনি। ভুলে গেছিস তুই বরং—ভুলে যেতে চেয়েছিস তুই। নইলে, এমন একটা সংসারের সকল দায়িত্ব মাথায় নিয়ে হঠাৎ একদিন তাকেই ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারতিস না তুই।

দিদি, অপ্রিয় হলেও সত্যকথা বলেই একটা কথা আজ তোকে বলছি। কিছু মনে করিসনে আবার। আমার কাছে তুই আর কোনদিন চিঠি লিখিসনে। তুই যা হয়েছিস তা একান্ত তুই বলেই হতে পেরেছিস, আমি তা কোনদিনই পারবো না। কাজে কাজেই তোর চিঠির আদিম প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি জাগানো কথাগুলো আমি বাঁচিয়ে চলতে চাই। তুই নিজে যে পথে নেমে গেছিস সে পথে আমায় আর টান্‌তে চাস না দিদি—দোহাই তোর, আমায় রেহাই দে।

এই পর্যন্ত লিখে সুনন্দা আবার ভাবতে বসলো। ভাবলো কিন্তু কি ভাবলো তা ও নিজেই জানলো না। আর সেই না জানা না বোঝা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ও লক্ষ্য করলো সদ্য সদ্য দিদিকে লেখা চিঠিখানাও সে কখন যেন ছিঁড়ে ফেলেছে।

ছিঁড়ে ফেলেছে! সুনন্দা ভাবলো ভালোই হয়েছে তবে। কথার পিঠে কথা জোগালেই কথা বাড়ে। তার চেয়ে কিছু না লেখাই ভালো। দিদিকে দিদির মনেই থাকতে দেওয়া ভালো। সে মন তার মনে ছড়িয়ে ছড়িয়ে কোন লাভ নেই।

লণ্ঠনের আলোটা তাড়াতাড়িতে নিভিয়ে দিলো ও। বিছানার বুকে গড়াগড়ি করেও পোড়া চোখে ঘুম এলোনা একটুও। আবার উঠে বসলো ও। জানলার ফ্রেমে আঁটা রাতের আকাশ দেখতে বসলো সুনন্দা।

সুনন্দা ভাবলো ঐ খণ্ড খণ্ড মেঘের মত তাকেও ভেসে চলতে হবে। কোথায় কত দূরে তার ঠিক ঠিকানা থাকবেনা কোন। থাকবে শুধু জীবনভোর ছুটে চলার আনন্দটুকুই।

★

শ্যাওলা

আনন্দ বাগ্‌চী

তারপরে একদিন চুপিচুপি ঘরে ফিরে এলো
ঘরেতে তখন রাত-মাকড়সার মশারি টাঙিয়ে
সময় বিবর্ণ মুখে, অন্ধকার ক'রে এলোমেলো
কি যে খোঁজে, কার নাম? এ জীবনে যে নাম ভাঙিয়ে

স্মরিতব্য ইতিহাস লেখা হয় জলে আর রোদে:
বুঝলো না মানে তা'র, পেলোনাক সঠিক উত্তর।
তরল কান্নার ঢেউ উঠে এলো কণ্ঠের সরোদে
উন্মাদ আর্তির ঘোরে পাক খেলো, এ-ঘর ও-ঘর—

হতোষ্ম নিশ্বাস ছুঁড়ে দিল তার মুখের ওপর,
একবার মুখ তুলে তাকাল সে, জ্বাললো না আলো
ডাকলো না কারো নাম, হায় এই পুতুলের ঘর
তেপান্তর আকাশের মত ঠিক নির্জন শোনালো।

ধূসর শরীর তার তন্দ্রামৃত দোরে জানালায়,
বোবামী এমন জানো,—রোদে জলে রোজ ভিজে যায়॥

তেরো শ' ষাট সালের উপর সমাপ্তির সীমাচিহ্ন আঁকিয়া দিল চৈত্র মাস। বসন্তপ্লাবিত এই বর্ষশেষের মাসটিতে দিকে দিকে আগামী বৎসরের জন্য বন্দনা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ বৎসরের পুঞ্জিত গ্লানিবেদনার, জীবনের নির্মম সংঘাতের আর অত্যাচারিত মানবতার উপর দিয়া বৈশাখের গর্বিত রথঘর্ঘর শোনা যাইতেছে। নূতন বৎসরের তরঙ্গমন্দ্রিত উদ্বেল আবির্ভাবকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি।

একটি বৎসরের আনন্দিত হৃৎস্পন্দন কি বিষণ্ণ কান্নার বেদনা সাহিত্যের মুকুরে বিম্বিত হয়। তেরো শ' ষাট সালের সাহিত্য সার্থক জীবন-রূপায়নে কখনও আশা-সঞ্চারী, কখনও পঙ্গুপদ। সুমিত শ্রদ্ধায় আগামী বৎসরের সাহিত্যে অগ্রগামী মানুষের জয়যাত্রার উত্তরণ কামনা করিতেছি।

রম্যরচনা কয়েক বৎসরের বাঙ্‌লাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য রচনা করিয়াছে। সাহিত্য পরিবারের এই অনুজ-তম শরিকটি আধুনিকতার অত্যন্ত স্মার্ট, পরিশীলনে অত্যধিক দুরন্তরুচি।

এই প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় সংযোজন অমল দাশগুপ্তের 'কারা নগরী'। ভারতের এঞ্জিন-সহর চিত্তরঞ্জনের নিভৃত গভীরতার ক্রূরনিষ্ঠুর সংবাদ অপরূপ শিল্পসংবেদনায় পরি-বেশিত হইয়াছে। আর এই ক্রূরকলুষিত সীমিত পটভূমিতে প্রতিবাদের আকাশ-প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াছে যে দুর্জয় গণ-দেবতা—তাহারই উদ্দেশে এই শ্রদ্ধা-উজ্জ্বল বন্দন নিবেদিত হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য নূতন উপন্যাস অসীম রায়ের 'এ কালের কথা'। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস জীবন ও জীবিকার আঘাতে বিক্ষত, রাজনীতির নিষ্ঠুর পদসঞ্চারে বিধ্বস্ত আর হৃদয়ের অমিতাচারে কলুষিত। কবি-ঔপন্যাসিক অসীম রায় 'এ কালের কথা'য় বর্তমান কালের সমস্ত স্রোতাবেগগুলিকেই আশ্চর্য নৈপুণ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

আর একটি নূতন উপন্যাস খ্যাতনামা কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একতলা'। এ্যাডোনিসের পায়ের কাছে আজ আর পূর্ণিমা-মূর্চ্ছিত ঈজীয়ানের তরঙ্গমন্দ্রিত উল্লাস নাই, নাই সমুদ্রের অতল নীলিমা হইতে উঠিয়া আসা সেই কিরণবর্ণা এ্যাট্‌লান্টা। পারসিউসের সেই লিজেন্ডারী বীরত্ব স্বপ্নকল্পনার মায়ালোকের সেই রাজকন্যা অন্দ্রোমিদা—তাহাদের সকলের উপর নিকষ মেঘের যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। বিংশ শতকের এই বিধ্বস্ত দশকে একটি যুবক ছাত্রের শতাব্দী আবিষ্কারের প্রেরণায় 'একতলা' প্রতিজ্ঞা-ছন্দিত।

স্বরেন বসুর নূতন উপন্যাস 'মহানায়ক'। একটি নিরীহ কেরাণীর ভঙ্গুর কাচের বাসনের মত মোহমোচন ছবিবার পর রাজনৈতিক বিদ্যাজ্ঞানের স্বচ্ছতায় পৃথিবী দেখার ঐকান্তিক প্রয়াসে 'মহানায়ক' স্বাক্ষরিত।

অনুবাদ। গোর্কীর অমর নাটিকা 'লোয়ার ড্রেপ্থ্‌সে'র তর্জমা। অনুবাদক অশোক গুহ। বিশ্বের আধুনিক প্রগতি-সাহিত্যে গোর্কীর প্রভাব অভ্রবিলেহী।

ছোটগল্প। সুশীল জানার 'ঘরের ঠিকানা'। মেদিনী-পুরের গ্রাম-জীবনকে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় বিচিত্রিত করা হইয়াছে। চাষী-কৃষাণের, সাঁওতাল-গাড়োয়ানের শোভা-যাত্রায় অমিতপ্রাণ জীবনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে 'ঘরের ঠিকানা' অনুপ্রাণিত।

সন্তোষ ঘোষের 'পারাবত'। মধ্যবিত্ত জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের প্রতিসরণে গল্পগুলি মনোজ্ঞ-সুন্দর। তীক্ষ্ণ জ্বালায়, অভিনব ব্যঙ্গে, তিক্ত-কটু-কষায়, সমস্ত রসের সমন্বয়ে, বলিষ্ঠ ভঙ্গির সরসতায় গল্পগুলি উপভোগ্য।

ছড়া। 'বর্গী এলো দেশে'। ছড়াকার—বরেন গঙ্গো-পাধ্যায়। বাঙ্‌লাদেশ ছড়ার দেশ আকাশ-গঙ্গার ঘন নীলিমায়, দূরবিসারী মাঠের হরিৎ-হিরণ্যে এদেশে ছড়া আপনি হইতেই মঞ্জরিত। বরেনবাবুর ছড়াগুলি হতাশা বিক্ষিপ্ত জীবনে হাসিকান্নার বিচিত্র স্বাদ আনিবে।

স্টিফান জাইগের বাংলা অনুবাদ-কার্যে হাত দিয়া শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদগ্ধ বাঙালী সমাজের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। জাইগের দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Burning Secret' এবং 'Amoke'-এর বঙ্গানুবাদ 'অন্তর্জ্বালা' এবং 'গোধূলির গান'। দুইখানি গ্রন্থেরই

অনুবাদক শান্তিবাবু। পৃথিবীর যে কয়জন স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যিক সর্বদেশে সমান খ্যাতি অর্জনের অধিকারী হইয়াছেন, স্টিফান জাইগ তাঁহাদের বিশেষতম একজন। 'Amok'-এর ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় রলাঁ বলিয়াছিলেনঃ The characteristic trait in (Zweig's) artistic make-up is the passionate desire to recognise, the unflagging, insatiable curiosity, the demonic urge to see, to know, to live every life himself. It has made of him a veritable 'Flying Dutchman', a passionate pilgrim. He is the impudent yet devout admirer of genius, whose mystery he has plucked out only to love it more deeply, the poet who has made Freud's dangerous key his own—the soul-snatcher. সেই একই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া শান্তিবাবু একদিকে যেমন শিক্ষিত বাঙালীর পাঠ-তৃষ্ণা মিটাইলেন, অন্যদিকে বাঙালী সমাজের সঙ্গে জাইগকে পরিচিত করিয়া দিয়া সংস্কৃতির আর-একটি নতুন 'সেতু রচনা করিলেন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেনঃ ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলিকাতা-১৪, দাম—দুই টাকা মাত্র।

বাংলার প্রাণ কবিপ্রাণ। কবিরা একাধারে দ্রষ্টা, ঋষি দার্শনিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশে বাংলা কাব্যগ্রন্থের বিক্রি নাই। সম্প্রতি কবিসম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে কবিতা সম্পর্কে উৎসাহী করিয়া তুলিবার একটা মহৎ প্রয়াস দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে এদেশের জনসাধারণ কতদিনে সচেতন হইয়া উঠিবেন, তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। তাহা না থাকিলেও মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বিদগ্ধ পাঠক কবিতা পড়িতে ভালবাসেন, তাহাদের জন্যও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। অনুরূপ প্রয়োজনীয়তার বশবর্তী হইয়াই অনেক কবি নিজেদের ব্যয়ে বা কখনও-কখনও কোনো সহৃদয় প্রকাশকের মাধ্যমে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার পিছনে আর্থিক কৃতিত্ব না থাকিলেও কবি-কৃতি থাকে। সাহিত্য বিচারে ইহার মূল্য অনেকখানি। সেই মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কবির বিভিন্ন দান স্ব স্ব কৃতিত্বে স্বীকৃত। অনুরূপ স্বীকৃতির স্বাক্ষর সমকালীন বাংলার বহু কাব্যগ্রন্থে রহিয়াছে। সেইগুলি হইতে এখানে আমরা কয়েকখানি মাত্র উল্লেখ করিতেছি ঃ (১) **স্বর ও অন্যান্য কবিতা'**—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, (মডার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা); (২) **'অবন্তী'**—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, (ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা); (৩) **'সীমা'**—দেবাচার্য, (সুমিত্রা প্রকাশক, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা); (৪) **'মঞ্জরী'**—ধীরানন্দ ঠাকুর, (পশারী, আসানসোল। মূল্য দুই টাকা)। (৫) **ভাব-রূপা**—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, (সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা)।

'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'র কবিতাগুলি প্রধানতঃ অন্তর্ধর্মী হইলেও যুগচেতনা সেখানে অনুপস্থিত নয়। যে পৃথিবীর দিকে দিকে ছলনার ইন্দ্রজাল বিস্তারিত, সেখানে 'কী প্রত্যাশা পৃথিবীর কাছে?' তথাপি প্রাণধর্মী কবির গগণচুম্বী আত্মার ঘোষণা শোনা যায় ঃ 'উন্মোচিত হৃদয়কে মেলে দিতে চাই তৃণদলে, মৃত্তিকার কাছে।' এ আকুতি স্বভাব কবির আকুতি। 'অবন্তী'র কবিতাগুলি নানা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও কবি-হৃদয়ের আবেগ ও মানুষকে ভালোবাসিবার ব্যাকুল আগ্রহে তাহা প্রাণবন্ত। কোনো কোনো কবিতা লিরিকধর্মী। অনেকক্ষেত্রে ভাব ছন্দের বন্ধনে স্বচ্ছতার পথ না পাইলেও কবির স্বভাব-সরল মনটিকে ধরিতে কষ্ট হয় না। কবি-হৃদয়ের যেখানে পরম জয়, কবিতারও জয়ের সূচনা সেইখানে।—'সীমা' কাহিনীধর্মী কাব্যগ্রন্থ। অঙ্গযুবরাজ বীরবাহু আর বঙ্গরাজদুহিতা সীমাকে কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনীর সূত্রপাত। প্রকাশ-ভঙ্গী রবীন্দ্রধর্মী হইলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কবি বীরবাহু ও সীমার আত্মিক দ্বন্দ্বের নাটকীয় কাহিনীর যেভাবে পরিসমাপ্তি টানিয়াছেন, তাহা শক্তিমত্তার পরিচায়ক। এই বিভ্রান্তকর যুগেও যে গাথাকাব্য রচনা সম্ভব, সীমা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।—মনের সঙ্গত অসঙ্গত নানা ভাবের উপাদান লইয়া গদ্যছন্দে মঞ্জরীর কবিতাগুলি রচিত। কোনো কোনো কবিতায় হতাশ্বাস জাগ্রত হইলেও অধিকাংশ কবিতাতেই কাব্যের মূলগত বাণী রূপ পাইয়াছে, যেমন—'আমার সুন্দর হ'য়ে ওঠার আনন্দে খুসী থাকে অনন্ত-যৌবনা প্রকৃতি উর্বশী।'—'ভাবরূপা'র কবি স্বভাবধর্মী আত্ম-নিমগ্ন কবি। ভারতের প্রাণরস যেখানে চিরকাল ফল্গু-ধারায় প্রবাহিত, ভাব-রূপার কবির মন সেইখানেই সঞ্চরণ-শীল। ভাবময় ভারতের যেখানে দক্ষিণা মূর্তি, নটরাজ, বিরহিনী রাধা, উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া ও মীরা-বাঈ, যেখানে করমেতি বাঈ ও যশোধরা, কবির মন সেখানে গিয়া তাহাদের জীবন হইতে আহরণ করিয়াছে সুরলোকের বাণী। ভাব-রূপার প্রধান দুইটি কবিতা মীরা-বাঈ ও যশোধরা। শ্রীমৎ স্বামি ভাস্করানন্দ সরস্বতী কর্তৃক মীরা-বাঈয়ের একটি সংস্কৃত অনুবাদ গ্রন্থারম্ভে সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থের ভাবের ক্ষেত্রটি আরও প্রসারিত হইয়াছে।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে রাজ্য-সরকারের আগামী ১৯৫৪-৫৫ সালের যে বাজেট পেশ করেন, তাহাতে দেখা যায়—১৯৫৪-৫৫ সালে রাজ্যসরকারের রাজস্বখাতে মোট আয় ৩৯,৯৩,২২০০০৲ এবং মোট ব্যয় ৫৩,৩০,৭৬০০০৲ টাকা হইবে বলিয়া ধার্য হইয়াছে। ফলে উক্ত বৎসর রাজস্বখাতে মোট ঘাট্‌তি দাঁড়াইবে ১২,৩৭,৫৪০০০৲ টাকা। আমরা নিম্নে ১৯৫২-৫৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব, ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত হিসাব এবং ১৯৫৪-৫৫ সালের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম:

(হাজার টাকার সমষ্টিতে)

আয়	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫
হস্তে স্থিত	৭২৭৬৩৲	৭৫৯২৫৲	১১৪৮৲
রেভিনিউ	৩৭৪৫৮৮৲	৩৮৮১৯৬৲	৩৯৯৩২২৲
ঋণ প্রভৃতি	১১১১৫০১৲	১৪২৪৭৫৮৲	১২১৪০৭৯৲
মোট	১৫৫৮৮৫২৲	১৮৮৮৮৭৯৲	১৬১৪৫৪৯৲
ব্যয়			
রেভিনিউ	৩৮৯৪১২৲	৫০৫৭১৩৲	৫৩৩০৭৬৲
মূলধন খাতে	১৩০৪২১৲	১৮৬৬৩০৲	২০৮২১১৲
ঋণ প্রভৃতি	৯৬৩০৯৪৲	১১৯৫৩৮৮৲	৯৯৬৩৯৯৲
বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত	৭৫৯২৫৲	১১৪৮৲	—১২৩১৩৭৲
মোট	১৫৫৮৮৫২৲	১৮৮৮৮৭৯৲	১৬১৪৫৪৯৲

১৯৫৪-৫৫ সালের আলোচ্য বাজেটে বিভিন্ন খাতে বিবিধ কার্যের জন্য যে সকল ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বরাদ্দ এইরূপ, যথা:

ভূমিরাজস্বখাতে জমিদারী দখল সম্পর্কে পুনরায় জমি জরীপ কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ১,১৭৭৭০০০৲ টাকা। (চল্‌তি বৎসরে উক্ত কার্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৩৭১০০০৲ টাকা)। আবগারী বিভাগে চল্‌তি বৎসরে গাঁজার চোরাই চালান ও বেশী মদ চোলাই নিরোধের জন্য অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ বাবদ প্রায় দুই লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। বন-বিভাগে চল্‌তি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় আগামী বৎসরের বাজেটে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা কম বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। সেচ খাতে কলিকাতার নিকটে উত্তর ও দক্ষিণ লোনা হ্রদ এলাকা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আগামী বৎসর ৪৮৮০০০৲ টাকা এবং ফরাক্কায় গঙ্গা সেতু বাঁধ সম্পর্কে তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য ১ লক্ষ টাকা; এতদ্ব্যতীত পুলিশ খাতে চল্‌তি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় আগামী বৎসরের বাজেটে ১২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাঁচরাপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে পুলিশদের জন্য অতিরিক্ত ১০০টি বেড সংরক্ষিত করার জন্য ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং কলিকাতা পুলিশের কতকগুলি অকেজো গাড়ীর পরিবর্তে নূতন গাড়ী ক্রয়ের জন্য ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নূতন বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

শিক্ষাখাতে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে এককালীন বরাদ্দ হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকাদের ট্রেনিংপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণকল্পে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণকল্পে ৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; শিক্ষিতদের বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে সমাজসেবী শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা সম্পর্কে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন দফায় ২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; তন্মধ্যে ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতছাড়া হইবার জন্য বার্ষিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সাহায্য এই বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত।

মেডিকেল খাতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ২৫৬টি অতিরিক্ত বেড খুলিবার জন্য ৪,৯৫,৯৬৫৲ টাকা, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে অতিরিক্ত সাহায্য হিসাবে ১৫০০০০৲, আর. জি. কর হাসপাতালের জন্য

৩ লক্ষ টাকা, ন্যাশ্‌নাল মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটকে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ৫০ হাজার টাকা, ট্রপিক্যাল ডিজিজেজ্ হাসপাতালে অতিরিক্ত কতকগুলি বেড খুলিবার জন্য ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা এবং আয়ুর্বেদ কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য। জনস্বাস্থ্য বিভাগে ম্যালেরিয়া নিরোধ পরিকল্পনার জন্য ৩০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরে ঐ বাবদ সংশোধিত বাজেটে ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। কলিকাতার পূর্বে লবণ হ্রদ অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় ম্যালেরিয়া নিরোধ কার্যাদির জন্য চলতি বৎসরে ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, আগামী বৎসরের জন্য নতুন কোনো বরাদ্দ নাই। কৃষিখাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য আগামী বৎসর ২০ লক্ষ টাকা (চলতি বৎসরে ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার), হাজামজা পুষ্করিণী উদ্ধারের জন্য ২০ লক্ষ টাকা (চলতি বৎসরে ৩০ লক্ষ) এবং পতিত জমি উদ্ধারের জন্য ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা (চলতি বৎসরে ১২ লক্ষ ৪১ হাজার) বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে খাটাল অপসারণ সম্পর্কে আগামী বৎসর মাত্র ৪১ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে (চলতি বৎসর ঐ জন্য ১৭ লক্ষ টাকা ধার্য আছে)। আগামী বৎসর কৃষিকলেজ স্থাপনের জন্য ৩,১৭,০০০ টাকা এবং কোচবিহারে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরেও ঐ দুই দফায় অর্থ বরাদ্দ করা আছে। মৎসখাতে ধরা হইয়াছে ৬ লক্ষ ১৯. হাজার টাকা, (চলতি বৎসর বরাদ্দ ছিল ৪ লক্ষ ২৩. হাজার টাকা)। কুটীরশিল্পজাত, খেলাধূলার সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং তালাপ্রস্তুত শিল্পের উন্নতির জন্য ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। খাদিশিল্পের উন্নয়নের জন্য চলতি বৎসরের ন্যায় আগামী বৎসরেও ১॥ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেকার সমস্যার তদন্ত কার্যের জন্য ৩ লক্ষ ৭ হাজার এবং রাষ্ট্রিয় কর্মচারী বীমা পরিকল্পনার জন্য ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা; এবং তপশীলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত জাতির কল্যাণে ২৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। মহাজাতি সদনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করার জন্য ধরা হইয়াছে ৩ লক্ষ টাকা। দুর্ভিক্ষখাতে চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসর ১ কোটিরও অধিক অর্থ কম বরাদ্দ করিয়া ৮২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। মাগ্‌গীভাতা প্রদানে কলিকাতা কর্পোরেশনকে সাহায্য বাবদ আগামী বৎসর ৭৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। গ্রামপঞ্চায়েতসমূহ প্রতিষ্ঠানকল্পে ৭০ হাজার এবং উদ্বাস্তু শিবিরসমূহ হইতে অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে ১৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে এবং লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আগামী বৎসর ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

উপরোক্ত এই উভয় বৎসরের বরাদ্দ ও আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চূড়ান্তরূপ আর্থিক দুরবস্থাই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই দুরবস্থা আজ নতুন নয়। বৃটিশভারতেও বাংলাদেশ ছিল 'Problem Province.' স্বাধীনতার পর বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সেই 'Problem' আরও নানাভাবে বাড়িয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত এই সমস্যাকে জাগ্রত রাখিয়া এবং কথায় কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাতিয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কতকাল আত্মবৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব? জনসাধারণের উপর নূতন নূতন কর ধার্য করিয়া সরকারী ঘাটতি পূরণের একটা পথ অবশ্য খোলা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের যে পরিমাণ আয় ও জীবনের মান উন্নীত হইলে অনুরূপ ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করা সম্ভব, পশ্চিমবঙ্গে তাহার পুরোপুরি অভাব। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিন্তা করিতে হইবে কিভাবে এবং কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে এই ঘাটতি নিরোধ করা সম্ভব। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্যা—তাহাও অবিলম্বে মিটাইবার প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ডাঃ রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কাগজের পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইরূপ বহুতর সমস্যা এবং তাহার সমাধানগত স্কীম তৈরী থাকা সত্ত্বেও তাহার বস্তু-রূপায়ণ অনিশ্চিত কালের জন্য অসম্ভব বলিয়া চাপা থাকিয়া গিয়াছে। সেইগুলি রূপায়িত করিয়া তুলিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সংগ্রহ করিতে হইবে বৈকি! অথচ উক্ত অর্থ কোথা হইতে আসিবে, তাহাই এক বিরাট সমস্যা। এ সম্পর্কে গত ২রা মার্চ নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অসুবিধার মুখ্য কারণ হইল দেশবিভাগ এবং নূতনভাবে কর আরোপের কোনো উপায় না থাকায় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের বিষয়ে বর্তমানে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহাই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের কৃষিব্যবস্থার উন্নতিবিধানও এখন একটি নির্দিষ্ট সীমায় আসিয়া পৌঁছানোয় আরও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজস্ব

আদায়ের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ তাহাদের সর্বশেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অথচ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য অধিক অর্থ প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেই প্রয়োজন অবশ্যই মিটাইতে হইবে। তাহার জন্য তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

ভারত-সরকারের ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট

সম্প্রতি ভারত সরকারের ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বর্তমান কর-হারের ভিত্তিতে বৎসর শেষে রাজস্বখাতে ২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয় ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ৪৪১ কোটি ৩ লক্ষ ও ৪৬৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। ঘাটতির এই অর্থ আংশিকভাবে পূরণের জন্য অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ কেন্দ্রায়ত্ত কতকগুলি শুল্কের হার বৃদ্ধিরও প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত বৃদ্ধি তহার নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইবে ঃ

সুপারির আমদানী শুল্ক প্রতি-পাউণ্ডে সাড়ে ছয় আনা বৃদ্ধি পাইবে। এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ৩ কোটি টাকা হাতে আসিবে। প্লাষ্টিক ও রবারের ইন্সুলেটেড ক্যাবল, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির শুল্কবৃদ্ধির ফলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মতো রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে। কাঁচা তুলাজাতীয় কাঁচা মালের উপর আমদানী শুল্কের পরিবর্তে আবগারী শুল্ক স্থাপনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই-ভাবে তুলা ও ইস্পাত হইতে যে রাজস্ব হ্রাস হইবে, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ৪ কোটি টাকা ও ২৫ লক্ষ টাকা। অতি মিহি সুতী বস্ত্রের উপর গজপ্রতি ৬ পাই এবং অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্রের উপর গজপ্রতি ৩ পাই শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে। ইহার ফলে ৬।। কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। কাঁচা তুলা আমদানীর শুল্ক রদ করিয়া দেওয়ায় যে টাকা হারাইতে হইবে, অর্থসচিবের মতে তাহা পূরণ করিবার জন্য এবং উৎপাদন শুল্কের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম রেশম-বস্ত্রের উপর গজপ্রতি ১ আনা ৬ পাই উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কৃত্রিম রেশমবস্ত্রের উপর গজ-প্রতি অতিরিক্ত ৩ পাই কর ধার্য করায় ইহার অবস্থা সুতী-বস্ত্রের সমপর্যায়ে আসিবে। ইহাতে তাঁত শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা হইবে এবং ইহা হইতে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। ইহা ছাড়াও সিমেণ্টের উপর টনপ্রতি ৫ টাকা, এক পাউণ্ড ও আরও বেশী ওজনের কাপড়কাচা বার সাবানের উপর হন্দর প্রতি ৫ টাকা ৪ আনা অন্যান্য কাপড়কাচা সাবানের উপর হন্দরপ্রতি ৬ টাকা ২ আনা এবং গায়েমাখা ও অন্যান্য শ্রেণীর সাবানের উপর হন্দর প্রতি ১৪ টাকা হারে কর ধার্য করা হইবে। জুতার উপর করের হার হইবে মূল্যের শতকরা ১০ টাকা। এই সকল নূতন করের ফলে মোট ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

শুল্কহারের এই পরিবর্তন দ্বারা ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাজেটের অনুমিত ঘাটতি হ্রাস পাইয়া ১৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। শ্রীদেশমুখ বলেন যে, আগামী বৎসরে রাজস্বের ও মূলধনীখাতে মিলাইয়া সর্ব-সাকুল্যে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে এবং ট্রেজারি-বিল ছাড়িয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

শুল্কহারে এই পরিবর্তনের দ্বারা আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব দাঁড়ায় এইরূপ ঃ

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৫৩-৫৪ সংশোধিত হিসাব	১৯৫৪-৫৫ বাজেট
আয়	৪১৩·৬৯	৪৫২·৮৮
ব্যয়	৪৩০·৬৫	৪৬৭·০৯
ঘাটতি	১৬·৯৬	১৪·২১

এই সঙ্গে অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে আয়-করের হারে কোনও পরিবর্তন হইবে না। শুল্কহারের এই সকল পরিবর্তনের পরও রাজস্বখাতে যে ১৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইবে, তাহা পূরণের জন্য বর্ত-মানে কোনও প্রস্তাব নাই। আগামী বৎসরের বাজেটে দেশ-রক্ষাখাতে ব্যয় ধরা হইয়াছে ২০৫ কোটি টাকা অর্থাৎ চলতি বৎসরের ব্যয় অপেক্ষা ৬ কোটি টাকা বেশী। শ্রীদেশ-মুখ এই প্রসঙ্গে বলেন যে, অস্ত্রবৃদ্ধির পাল্লায় যোগ দিয়া দেশের বৈষয়িক প্রগতিকে ব্যহত বা মন্থর করা ভারত সরকারের নীতি নয়। এই সঙ্গে অর্থসচিব চলতি ১৯৫৩-৫৪ সালের যে সংশোধিত হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ বৎসর রাজস্বখাতে ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা যায়। একমাত্র পাকিস্থানের নিকট প্রাপ্য অর্থের কিস্তির টাকা না পাওয়ার দরুণই এই ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের সংশোধিত হিসাবে আয় ও ব্যয় দেখানো হইয়াছে যথাক্রমে ৪১৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ও ৪৩০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

চলতি বৎসরে রাজস্ব ও মূলধনীখাতে মিলাইয়া মোট

ঘাটতি দাঁড়াইবে ১২৮ কোটি টাকা। মূল বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৩৮ কোটি টাকা। শ্রীদেশমুখ দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ আশা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ক্রমোন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে; আগামী বৎসরের খাদ্যাবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ বিপুল অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন বিধায় যত বেশী সম্ভব সম্পদ আহরণের প্রয়োজন হইবে। এই জন্য তিনি রাজ্যসমূহকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের অনুরোধ জানান এবং জনসাধারণকে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিয়া সরকারকে অধিক সাহায্য দিতে আবেদন জানান।

সেই আবেদনে তিনি কতখানি সাড়া পাইবেন, তাহা পরের কথা, কিন্তু আলোচ্য বাজেটে যেভাবে দরিদ্র জনসাধারণের উপর কতকগুলি বাহুল্য ট্যাক্স চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে,তাহা কেহই অনুমোদন করিতে পারে না। সুপারির উপর আমদানী শুল্কের বর্দ্ধিত হারের ফলে সুপারির দর সেরপ্রতি চৌদ্দ আনা বৃদ্ধি পাইবে। ইতিপূর্বে সুপারির উপর যে আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল, তাহাতেই খুচরা বাজারে সুপারির সের ৩৷৷৹ টাকায় উঠিয়াছিল, বর্তমানের শুল্ক বৃদ্ধির ফলে উহা ৪৷৵৹ আনায় দাঁড়াইবে। এই শুল্ক বৃদ্ধির জন্য যে যুক্তিই দর্শানো হউক না কেন, তাহা জনসাধারণের কাছে নিতান্তই অর্থহীন। আমদানীকৃত তুলার উপর শুল্ক তুলিয়া দিয়া ভারতে উৎপন্ন সকলশ্রেণীর কাপড়ের উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াও ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ একইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতে উৎপাদিত কাপড়ের যাহা সাধারণ বিক্রয়হার ছিল, তাহাই জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, তদুপরি নতুন শুল্ক ধার্য করায় জনসাধারণের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত প্রতিটন সিমেণ্টের উপর ৫৲ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণ যে বসস্থানের কিছু-একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া লইবে, এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে তাহাও বন্ধ হইল। ভারত বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু জনসাধারণের জীবনে বাসস্থান নির্মাণের যে গুরু সমস্যা বড় হইয়া দাঁড়ায়, গত সাত বৎসরেও ভারত গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। তদুপরি নতুন করিয়া এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে পরোক্ষে তাঁহারা জনসাধারণের গৃহনির্মাণ সমস্যাটিকে আরও ভারবাহী করিয়া তুলিলেন। তদনুরূপ কাপড়কাচা সাবান ও গায়েমাখা সাবানও দরিদ্র জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। উহার উপরেও প্রতি হন্দরে ৫৷৹ আনা হইতে ১৪৲ টাকা পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইতেছে; এতদ্ব্যতীত জুতার মূল্যের উপরেও শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে উৎপাদন শুল্ক বসানো হইতেছে। এইভাবে দেখানো হইয়াছে ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের আয় হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে এই আয়ও তো জনসাধারণের দারিদ্র্যকে শোষণ করিয়াই করা হইবে। শ্রীদেশমুখ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের নিকট প্রাপ্য ১৮ কোটি টাকা না পাওয়ার ফলেই শুল্ক বৃদ্ধির এই অত্যাবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু উক্ত টাকা জমা-খরচের হিসাবে প্রাপ্য না দেখাইয়া আয়-ব্যয়ের হিসাবে প্রাপ্য বলিয়া কেন বাজেটে দেখানো হইল, ইহা জনসাধারণের একটি বড় প্রশ্ন। বাজেটে আগামী বৎসরে অনুমিত ঘাট্‌তির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে নতুন শুল্কবরাদ্দ দ্বারা পূরণ হইবে ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। ফলে বাকী ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসর যদি পাকিস্থানের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা হাতে আসে, তবে আশা করা যায়—ঘাটতি পূরণ হইয়া আয় উদ্বৃত্তে গিয়া দাঁড়াইবে। এতদ্ব্যতীত দেখানো হইয়াছে—চলতি বৎসরে মূলধনের হিসাবে ঘাট্‌তি লইয়া মোট ১২৮ কোটি টাকা ঘাট্‌তির কতকাংশ মজুদ তহবিল হইতে সঙ্কুলান করা হইবে, এবং বাকী ৮০ কোটি টাকা ট্রেজারি বিলের মারফতে সংগ্রহ করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই দুই বৎসরের ঘাট্‌তির জন্য মোট ৩৩০ কোটি টাকার ট্রেজারিবিল বিক্রয় করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। উহা নূতন নোট মুদ্রণেরই নামান্তর। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে—ঘাট্‌তি পূরণের এই ব্যবস্থাই যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিলেন, তবে অযথা দরিদ্র জনসাধারণের উপর এত গুরুভার শুল্ক চাপাইয়া দিয়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জাতীয়-জীবনকে পঙ্গু করিয়া তুলিলেন কেন?

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক-ধর্মঘটের দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক ধর্মঘট লইয়া আমরা গত সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার পর বিষয়টি আরও অধিকদূর সম্প্রসারিত হয়। অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা ও সেগুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতির সভাপতিত্বে ও দুই-

জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে লইয়া একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার পূর্ববিবৃতির উল্লেখ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, বিদ্যালয়গুলি সমপরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিলে সরকার বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে মাসিক সাড়ে সতের টাকা মহার্ঘভাতা দিবেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের এই বিবৃতিতে শিক্ষকগণের আশু দাবীগুলির সম্পর্কে সরকারপক্ষের কোনো নূতন বক্তব্যই উত্থাপন করা হয় নাই বলিয়া নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি মন্তব্য করেন।

তাঁহাদের এই মন্তব্যের ভিত্তিতে সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কর্মবিরত মাধ্যমিক শিক্ষকদের 'ন্যায়সঙ্গত' দাবীর সমর্থনে গণআন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জনসাধারণকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধানসভা ভবন অভিযানে যোগদান করিতে আহ্বান জানান; এবং কার্যতঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়দান হইতে এক গণ-শোভাযাত্রা বিধানসভা ভবনকে চারিদিক হইতে ঘেরাও করার জন্য অগ্রসর হয়, কিন্তু পুলিশ বাধা দেওয়ায় এবং কাঁদুনে-গ্যাস ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ায় জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু ছত্রভঙ্গ হইলেও শিক্ষকগণ যে যে রাজনৈতিক দলের দ্বারা চালিত হন, তাঁহাদের প্রভাব ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণের উপর বর্তাইবার ফলে একশ্রেণীর দুষ্ট প্রকৃতির লোক (যাহারা সর্বদাই কিছু-একটা হুজুগের প্রত্যাশায় থাকে এবং হুজুগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া নানারূপ অনিষ্টসাধন ও লুটতরাজে মত্ত হয়) পুলিশের প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করে, পুলিসের গাড়ী পোড়াইয়া দেয়, এবং তাহাতেও যখন গাত্রদাহ নিবৃত্ত হইবার নয়, তখন ট্রাম ও স্টেট্ বাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া কোনো কোনো বাড়ীঘরের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসবাবপত্র ধ্বংস করে।

আমরা গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি যে, শিক্ষকদের ধর্মঘট আমরা অনুমোদন করিতে পারি না এবং তৎপরবর্তীকালে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, তাহা কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিই অনুমোদন করিবেন না। ইহার ফলে জনসাধারণের চোখে শিক্ষকেরা যে-রূপে প্রতিভাত হইলেন, তাহা আর যাহা হউক নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। ইতিপূর্বে ধর্মঘটকারী ছাত্রদিগকে শিক্ষকেরা ঠেঙাইয়াছেন, এবারে শিক্ষকেরা ধর্মঘট করিয়া ছাত্রদের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করিয়া দিলেন। ভবিষ্যতে ইহা লইয়া নিশ্চয়ই আর তাঁহাদের আপশোষের কারণ থাকিবে না। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহা দ্বারা দেশ কোন্ দিকে যাইবে—তাহা দেখিবার প্রয়োজন। খুব সম্ভবতঃ এদিক সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া মূল বিষয় সম্পর্কে দ্রুত সমাধানের পথে আসিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। শিক্ষকরা তাঁহাদের এই ধর্মঘট রাজনৈতিক দলগুলির আওতার বাহিরে থাকিয়াও করিতে পারিতেন। খুব সম্ভব স্কুল কমিটিগুলির তরফ হইতে বাধা আসিবে বলিয়াই সে-পথ তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অবশেষে যেপথ তাঁহারা গ্রহণ করিলেন, তাহা শিক্ষকজীবনের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাঁহারা নিজেরাই হয়ত কল্পনা করিতে পারেন নাই যে—অবস্থা শেষপর্যন্ত এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিবে। বিধানসভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন—যে শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে আইনভঙ্গ করার জন্য উৎসাহ দেন, তিনি প্রকৃত শিক্ষক কিনা, সে-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। তাঁহারা কি ধরনের শিক্ষক, বিদ্যালয়গুলিতে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তদন্ত করা আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কমিশন বসাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এ সম্পর্কে গভর্নমেন্টকেও আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত পূর্ব ঘটনাবলীর উদাহরণ হইতে পূর্বাহ্নেই তাঁহাদিগকে একটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল এবং শিক্ষক ধর্মঘটের বিষয়টির যথাযথ-কালেই সমাধান করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে-পন্থা অবলম্বন করেন নাই। ফলে একদিকে ধর্মঘট শক্তিশালী হইয়াছে অন্যদিকে সুযোগ প্রত্যাশী বিভ্রান্তকারীর দল নানাভাবে জাতীয় সম্পদসমূহের অপচয় সাধন করিয়াছে; অপরপক্ষে পুলিশের গুলিচালনার ফলে ছয় ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অথচ সরকারকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাতাবৃদ্ধি স্বীকার করিয়া আদেশ জারী করিতে হইল। বিধানসভা হইতে ডাঃ রায় ঘোষণা করেন যে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সমপরিমাণ মাগ্‌গীভাতা দানের সর্ত পূরণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া গভর্নমেন্ট এই বৎসরের (১৯৫৪) জানুয়ারী মাস হইতেই প্রত্যেক শিক্ষককে ১৭৷৷০ টাকা করিয়া মাগ্‌গীভাতা দিবেন। ফলে এখন হইতেই প্রত্যেক শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির দেয় ১০৲ টাকা ও সরকারী দেয় ১৭৷৷০ টাকা মোট ২৭৷৷০ টাকা করিয়া মাগ্‌গীভাতা পাইবেন। স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবশ্য আগামী জানুয়ারী মাস (১৯৫৫) হইতে তাহাদের দেয় সম্পূর্ণ ১৭৷৷০ টাকা করিয়াই মাগ্‌গীভাতা দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ট্রেনিংবিহীন নন্-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের প্রস্তাবিত তিন বৎসরের ট্রেনিংলাভের

সময় গভর্নমেন্ট হইতে অন্তবর্তীকালীন সাহায্য হিসাবে পূর্ব-প্রস্তাবিত ৫৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া এক্ষণে ১০৲ টাকা করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ডাঃ রায় উল্লেখ করেন যে, শিক্ষকদের সাহায্যদানের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট তাঁহাদের সামর্থের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহারা ছাড়াও শিক্ষক আন্দোলনের সহিত সংশিলষ্ট আরও কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এ সম্ভাবনার পূর্বেই তিনশতাধিক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আটক করে। প্রেসিডেন্সী জেলে সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে শিক্ষকদের কর্মবিরতি আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের এক সভায় সমিতির সভাপতি উল্লিখিত সংবাদ ঘোষণা করিয়া দাবী জানান যে—(ক) ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে রাজভবনের সম্মুখবর্তী রাজপথে এবং তাহারপর ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে ধৃতব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে, (খ) সত্যাগ্রহী কোনো শিক্ষক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার শাস্তি গ্রহণ করা চলিবে না, এবং (গ) বেতন ও মাগ্গীভাতার দাবী সম্বন্ধে সর্বপ্রকার আলাপ-আলোচনার পথ উন্মুক্ত থাকিবে; এই সর্তে কার্যনির্বাহক সমিতি 'কর্মবিরতি' প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইয়াছেন।

এ সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক বিবৃতিতে বলেনঃ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী যে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল, শিক্ষকগণ তাহা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া আমি আনন্দিত। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট অথবা এস্‌প্ল্যানেড ইষ্টে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করিয়া যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির অভিযোগে যাঁহারা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের কিম্বা অনধিক বারোজন লইয়া গঠিত যে সকল ছোট ছোট দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রাইটার্স বিল্ডিং অথবা এসেম্‌ব্লি এলাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য আমি নির্দেশ দিয়াছি। শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব হইতেছে তাঁহাদের অধীনস্থ ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে এই সকল ছাত্র আগামী কাল সুনাগরিক হইতে পারেন। শিক্ষকগণ নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যে কোনো 'কর্মবিরতি' আন্দোলন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং কোনো সমস্যার সমাধান অপেক্ষা ইহা অধিকতর জটিল সমস্যাসমূহের সৃষ্টি করে। এই সকল আন্দোলন হাল্কাভাবে গ্রহণ না করার জন্য গত ১৬ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা আমাদের সকলের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।...

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতির মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়, উহা সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রচার করা হয় এবং ধর্মঘট সংক্রান্ত আন্দোলনের এইখানেই অবসান ঘটে। এ সম্পর্কে নতুন কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস চ্যান্সেলার

নূতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে চ্যান্সেলার ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় খড়্গপুরস্থিত ভারতীয় টেক্‌নলজি ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ জে, সি, ঘোষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত পদের জন্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামও প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ডাঃ ঘোষকেই উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে ভারতীয় টেক্‌নলজি ইন্‌ষ্টিটিউটের নূতন ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এস, আর, সেনগুপ্ত। ডাঃ ঘোষ অতিশয় কর্মঠ ও যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হইয়া নতুন প্রাণচেতনার উদ্বোধন হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ ঘোষের এই নতুন পদলাভে তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

১৯৫৪-৫৫ সালের রেল বাজেট

রেলমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতীয় লোকসভায় ১৯৫৪-৫৫ সালের যে রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন, তাহাতে দেখা যায়—রেলের আয় হইতে সাধারণ রাজস্ব খাতে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিবার পরও বাজেটে ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। আগামী ১৯৫৪-৫৫ সালে আয়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৭৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত বাজেটে ইহা ছিল ২৭২ কোটি টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সালে ব্যয়ের পরিইহা ছিল ২৭২ কোটি টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ২৬৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে, ফলে উদ্বৃত্ত হইবে ৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এই উদ্বৃত্ত নিম্নাভিমুখী হইলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের জন্য রেলকর্তৃপক্ষের উদ্যম প্রশংসনীয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলওয়ের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, রেলওয়ের

জন্য বরাদ্দ মোট ৪০০ কোটি টাকা যাহাতে যথাযথভাবে ব্যয় হয়, তদুদ্দেশ্যে আগামী দুই বৎসরের উন্নয়ন কাজের দরুণ ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে অধিক পরিমাণ ওয়াগণ ও বগি গাড়ি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাত্রী সাধারণের সুখসুবিধার জন্য আলোচ্য বৎসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টেশনগুলির উন্নয়নের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইবে। গ্যাড্গীল কমিটি মহার্ঘভাতা শতকরা ৫০ ভাগ মূল বেতন বলিয়া গণ্য করিবার যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করায় বৎসরে অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম রেলওয়ের জন্য অধিক পরিমাণে কয়লা সমুদ্রপথে প্রেরণ করার ফলেও ব্যয় বাড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত রেলভ্রমণে যাত্রীদিগকে নিম্নরূপ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যথাঃ (১) দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা মোট ভাড়ার ⅓ অংশ দিয়া ১৫০০ কিম্বা ততোধিক মাইল ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিবেন; (২) চার বা ততোধিক ছাত্রের দল সুলভ ভাড়ায় ৪৫ দিনের মেয়াদী টিকিটে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবেন; (বর্তমানে ছাত্রদলের ন্যূনতম সংখ্যা ১০ জন নির্ধারিত আছে)। শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও কমপক্ষে ৪ জন ছাত্রের দল এই সুবিধা পাইবেন; (৩) সহর ও সহরতলীর বাহির হইতে যে সকল ছাত্র প্রত্যহ সহরের স্কুল-কলেজে পড়িতে আসেন, তাহাদের জন্য সুলভ মাসিক টিকিটের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ৩০ মাইল পর্যন্ত দূরবর্তী স্থান হইতে আগত ছাত্রেরা এক পিঠের ১২ গুণ ভাড়ায় মাসিক টিকিট পাইবেন; (৪) এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত কয়েকটি বিশেষ শৈলবাসে ভ্রমণের জন্য ১৫০ মাইল কিম্বা তদূর্ধ দূরবর্তী স্থানের দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে দেড়গুণ ভাড়ায় তিনমাসের মেয়াদী রিটার্ণ টিকিট দেওয়া হইবে।

এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে মন্ত্রী অবিলম্বে যে কয়েকটি বিশেষ উন্নয়নমূলক কার্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা হইতেছেঃ (ক) কলিকাতা ও সহরতলীর রেলপথগুলিকে বিদ্যুচ্চালিত রেলে পরিণত করা, এবং এখন হইতেই হাওড়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত প্রসারিত রেল লাইনকে বিদ্যুচ্চালিত রেলে পরিণত করিবার কাজ আরম্ভ করা; (খ) চল্‌তি বৎসরে খাজুরিয়া হইতে মালদহ পর্যন্ত একটি নূতন রেলপথ স্থাপনের জন্য জরীপকার্য আরম্ভ করা; (গ) আসাম লিঙ্ক্ রেলপথের উপর দিয়া প্রত্যহ যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় মালগাড়ী যাতায়াত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা, এবং (ঘ) যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে নানাস্থানে রেলের প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েটিং রুমের উন্নতি এবং রেল স্টেশনের বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা করা। রেলওয়ে মন্ত্রী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী-গাড়ীতে উন্নততর আসন, বৈদ্যুতিক পাখা, অধিকতর সংখ্যক আলো এবং উন্নততর পায়খানার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং রেলে যাত্রীর ভিড় কমাইবার জন্য চল্‌তি বৎসরে যাত্রীগাড়ীর সংখ্যাও বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতের রেলপথসমূহের আর্থিক অবস্থার অবনতি সত্ত্বেও রেলকর্তৃপক্ষের এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবে, সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্স কর্পোরেশনের ডিরেক্টরপদে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে ফিনান্স্ কর্পোরেশন সংগঠিত হইয়া গত ১লা মার্চ হইতে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা-কার্য আরম্ভ হইয়াছে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাহার অন্যতম ডিরেক্টর মনোনীত হওয়ায় তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অন্যতম পরিচালক, মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর, বঙ্গশ্রী পত্রিকার অন্যতম সত্ত্বাধিকারী এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বাঙালীর ব্যবসা-ক্ষেত্রে যে অসাধারণ যোগ্যতা, মনীষা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙালীমাত্রেরই গৌরবের বিষয়। তাঁহার ন্যায় কৃতি-পুরুষকে ফিনান্স্ কর্পোরেশনের ডিরেক্টর পদে মনোনীত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যোগ্য ব্যক্তির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের অটুট স্বাস্থ্য ও গৌরবময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ভারতের বেকার সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা কমিশন

ভারতের বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে ইতিপূর্বে ভারত গভর্নমেন্ট যে পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি উক্ত কমিশন এই বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করিয়া ইহাতে আরও ৩১৩টি নূতন বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই বাবদ ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৭৪ কোটি টাকা। পরিকল্পনাসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দ জানান যে, সেচ, বিদ্যুৎ, পথঘাট, কুটিরশিল্প প্রভৃতির প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমেই হস্ত সংখ্যক

সম্ভব লোকের কর্মের সংস্থান করাই এই নূতন প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য। এজন্য প্রথমদফার কয়েকটি বিষয়ের ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৩৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। এই দফায় মোট ১১৩টি প্রস্তাব স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় প্রস্তাবের সংখ্যা ১৮০ এবং ইহার ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৪০ কোটি টাকা। নূতন প্রস্তাবগুলির ব্যয়বরাদ্দ এইভাবে ধরা হইয়াছে, যথাঃ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন—৬৬ লক্ষ, সেচ—৫ কোটি ৭৩ লক্ষ, বিদ্যুৎ—১০ কোটি ৮৮ লক্ষ, শিল্প—১ কোটি ৭৫ লক্ষ, রাস্তা ও যানবাহন—৮ কোটি ১৯ লক্ষ, শিক্ষা—১ কোটি ৩৬ লক্ষ, স্বাস্থ্য—২ কোটি ২০ লক্ষ, গৃহনির্মাণ—১ কোটি ৮৫ লক্ষ, শ্রমিক ও শ্রমিককল্যাণ—৩৯ লক্ষ, অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ—১ কোটি ৮ লক্ষ এবং বিবিধ—১৯ লক্ষ টাকা। এই নূতন প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য রাজ্যের জন্য যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহা এইরূপ, যথাঃ উত্তর প্রদেশ—৬ কোটি ৭৩ লক্ষ, অন্ধ্র—৩ কোটি ৯ লক্ষ, আসাম—৭২ লক্ষ ৬ হাজার, বিহার—৬ কোটি ৭৫ লক্ষ, বোম্বাই—১ কোটি, মধ্যপ্রদেশ—১ কোটি ৩৩ লক্ষ। উড়িষ্যা—৬৫ লক্ষ, পাঞ্জাব—৯২ লক্ষ ২ হাজার, হায়দ্রাবাদ—১ কোটি ২ লক্ষ, মধ্যভারত—১ কোটি ৪ লক্ষ, মহীশূর—৭৪ লক্ষ ৮ হাজার, পেপসু—১ কোটি, রাজস্থান—৩ কোটি ৭৬ লক্ষ, সৌরাষ্ট্র—২৮ লক্ষ ৫ হাজার, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—৩ কোটি ৪৪ লক্ষ, ভূপাল—৯৩ লক্ষ, কুর্গ—৪৩ লক্ষ ৯ হাজার, দিল্লী ৩৬ লক্ষ, হিমাচল প্রদেশ—৫২ লক্ষ ৭ হাজার, এবং কচ্ছ—২০ লক্ষ। এতদ্ব্যতীত স্থায়ী পরিকল্পনা বাবদ বিভিন্ন রাজ্যকে যে সাহায্য দেওয়া হইবে, তাহা এইরূপ, যথাঃ অন্ধ্র—৫ কোটি, আসাম—১ কোটি, বিহার—৩ কোটি ৫ লক্ষ, বোম্বাই—৪ কোটি ৮৮ লক্ষ, মাদ্রাজ—৬ কোটি ২ লক্ষ, হায়দ্রাবাদ—৩ কোটি, মহীশূর—৩ কোটি ৫ লক্ষ, রাজস্থান—২ কোটি ৫ লক্ষ, সৌরাষ্ট্র—২ কোটি ৫ লক্ষ এবং আজমীঢ়—২৫ লক্ষ টাকা।

এই বরাদ্দ যে সর্বত্রই সুখকর হইয়াছে, তাহা নয়। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় বেকারসমস্যাপীড়িত রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। এই রাজ্যের জন্য ইহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নয়। অন্যান্য প্রদেশগুলির সমপর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গকেও যদি উন্নীত করিয়া তুলিতে হয়, তবে এখানকার বেকারসমস্যা অবিলম্বে দূরীকরণের জন্য আলোচ্য বরাদ্দাপেক্ষা অধিক সাহায্য দান করা কর্তব্য হইবে। সেইদিকে আমরা পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভারতের তাঁতশিল্প

ভারতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের গুরুত্ব কতখানি, জনগণকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবার জন্য বিগত ৭ই মার্চ হইতে ভারতের সর্বত্র তাঁতশিল্প সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে তাঁত সংক্রান্ত শিল্পী, প্রস্তুতকারী ও নক্সাশিল্পী প্রভৃতির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের তাঁতশিল্প অন্যূন ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এইরূপঃ (১) ভারতে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জীবিকা সংস্থান করে এবং দেশের কাপড়ের চাহিদার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ পূরণ করে। (২) ১৯৪১ সালে ২০ লক্ষ তাঁত ছিল, বর্তমান সময়ে ঐগুলির সংখ্যা ২৮ লক্ষ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। (৩) হস্তচালিত তাঁতসমূহ প্রধানতঃ সূতীবস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত; তবে বেশ কিছু সংখ্যক তাঁত রেশম, কৃত্রিম রেশম ও পশমের কাজ করে। (৪) ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর তাঁত ব্যবহার করা হয়, যথা—থ্রো সাট্‌ল তাঁত, ফ্লাই সাট্‌ল তাঁত, টেপ তাঁত, সেমি অটোমেটিক ও অটোমেটিক তাঁত। অধিকাংশই থ্রো সাট্‌ল তাঁত, ঐ সমুদয়ের উৎপাদন ক্ষমতা অতি কম। (৫) একটি হস্তচালিত তাঁত গড়ে মাসে ২০ পাউন্ড সুতা ব্যবহার করিয়া ৬০ হইতে ১০০ গজ কাপড় তৈয়ার করিতে পারে। সুতা মোটা হইলে উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ কম এবং মিহি হইলে বেশী হয়। (৬) হস্তচালিত তাঁতসমূহ দেশে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার বস্ত্র বয়ন করিতে পারে। ঐ সমুদয় কর্তৃক উৎপাদিত বস্ত্রের মধ্যে ধুতী ও সাড়ীই প্রধান। এতদ্ব্যতীত উহারা ফার্‌নিসিং কাপড়, চাদর, অঙ্গবস্ত্র, দুপাট্টা, পাগড়ীর কাপড় ও তোয়ালে প্রস্তুত করিয়া থাকে। (৭) হস্তচালিত তাঁতসমূহ একচেটিয়া ভাবে দেশের রঙ্গীণ সাড়ীর সমগ্র চাহিদা মিটায়। (৮) হস্তচালিত তাঁতসমূহ দেশের ধুতীর চাহিদা অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ মিটায়। (৯) হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে ১০ লক্ষ টাকা লইয়া একটি হস্তচালিত তাঁতশিল্প উন্নয়ন ভাণ্ডার গঠন করেন। ১৯৫২ সালে উহাতে আরও ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। ইহা হইতে ১৪ লক্ষ টাকা রাজ্যসমূহকে সাহায্য দান বাবদ মঞ্জুর করা হইয়াছে। (১০) হস্তচালিত তাঁতসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য মিলে প্রস্তুত কাপড়ের প্রতি গজে এক পয়সা হারে কর আদায় করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হইতে লব্ধ চারি কোটি টাকা হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যের জন্য পৃথক রাখা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে

পারে। (১১) ঐ করলব্ধ তহবিল হইতে প্রায় ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়সাধ্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মঞ্জুর করা হইয়াছে। (১২) ভারত হইতে প্রতি বৎসর হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত ৪ হইতে ৬ কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়। উহার মূল্য ৫ কোটি হইতে ১১৷৷ কোটি টাকা। (১৩) ভারতীয় হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সিংহল ভারতের হস্তচালিত তাঁতজাত বস্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় আমদানীকারী। (১৪) হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য কাইলি, লুঙ্গী, সারঙ্গ ও মাদ্রাজী রুমাল। (১৫) হস্তচালিত তাঁতজাত বস্ত্রের রপ্তানি প্রসারের জন্য সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলম্বো ও বাগদাদে মার্কেটিং অফিসার বহাল করা হইতেছে। এডেন, করাচী, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, কলম্বো ও সিঙ্গাপুরে পণ্যশালা খোলা হবে। (১৬) ভারত সরকার অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের সুপারিশক্রমে সমবায় সমিতিসমূহের জন্য বিভিন্ন রাজ্যকে বিনা সুদে শেয়ার মূলধন হিসাবে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং কার্যকর মূলধন হিসাবে ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা ঋণ দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য সমবায় সমিতিসমূহে তাঁতীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। (১৭) ভারত সরকার কয়েকটি কঠোর সর্ত সাপেক্ষ ব্যতীত শক্তি-চালিত নূতন তাঁত বসানো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করিতেছেন। (১৮) ভারত সরকার নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মিলকে উহার উৎপন্ন একটা ন্যূনতম পরিমাণ সূতা হস্তচালিত তাঁতসমূহে ব্যবহারের জন্য দিতে হইবে। (১৯) ১৯৪৮ সালে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ও অন্যান্য কুটীরশিল্পকে ৬৫ হাজার গাঁইট সূতা সরবরাহ করা হইয়াছিল। ১৯৫৩ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭২ হাজার গাঁইট হয়। (২০) সূতা সরবরাহের ভিত্তিতে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ১৯৫৩ সালে ১২০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৭০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। (২১) ১৯৪১ সালে মোট হস্তচালিত তাঁতসমূহের শতকরা ৭২ ভাগ সূতীবস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত ছিল। ঐ অনুপাতে ১৯৫১ সালে সূতী বস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত তাঁতসমূহের সংখ্যা ২০ লক্ষ ছিল। (২২) যদি এই সমস্ত হস্তচালিত তাঁতকে যথেষ্ট পরিমাণ সূতা সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে উহারা অক্লেশে বৎসরে ২২০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিবে। এবং (২৩) পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের সমস্ত মিলে মোট ১৬৪ কোটি পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইবে। মিলসমূহ ইহা হইতে নিজেদের শিল্পকে প্রতিবৎসর ৩৮ কোটি পাউণ্ড সূতা সরবরাহ করিতে পারিবে। প্রতি পাউণ্ডে ৪৷৷ গজ কাপড় হিসাবে ঐ সূতা দ্বারা ১৮১ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারিবে।

Small Scale Business হিসাবেও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের প্রধান্য কম নয়। ভারতে এবং বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইহার আরও প্রসার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেদিক হইতে গভর্নমেন্ট যদি জনসাধারণকে সাহায্য করেন তবে দেশের বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের শিক্ষা

সম্প্রতি ডায়মণ্ডহারবার, পেপস এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নির্বাচন-প্রতিযোগিতা শেষ হইয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম দুইটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস একক শক্তিতে জয়ী হইয়াছে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ফলাফল অন্যরূপ। এখানে মোট আসন সংখ্যা ১১৭, তন্মধ্যে কোন্ দল কত সংখ্যক আসন পাইয়াছে, তাহা এইরূপঃ

কংগ্রেস—৪৫, কমিউনিস্ট—২৩, প্রজা-সোস্যালিস্ট—১৯, আর-এস-পি—৯, ত্রিবাঙ্কুর-তামিলনাদ কংগ্রেস—১২ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী—৯। ইহার মধ্যে তিনজন কেরালা সোস্যালিস্ট ও পাঁচজন যুক্ত ফ্রন্ট সমর্থিত।

এখন যে-দলের উদ্যোগেই মন্ত্রীসভা গঠিত হউক না কেন, তাহাই একমাত্র বিচার্য নয়, প্রশ্ন হইতেছে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ন্যায় অঞ্চলে কংগ্রেসের এই ব্যাপক পরাজয় কেন? ১১৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪৫টি আসনের একক জয় পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ন্যায় সমস্যাবহুল ঘাটতি অঞ্চলে এ পর্যন্ত কংগ্রেস বা কংগ্রেস সরকার তাঁহাদের কার্যনীতির দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারেন নাই, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল এই পরাজয়। এই পরাজয়ের হয়ত প্রয়োজন ছিল, কারণ কংগ্রেসের ইহা একটা বড় পরীক্ষাও বটে। শুভকার্যের অভাবে জনপ্রিয়তার দিক হইতে এইভাবে যদি কংগ্রেস পিছাইয়া পড়ে, তবে ভবিষ্যৎ তাঁহাদের কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন অতএব ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের শিক্ষা হইতে কংগ্রেসকে তাঁহাদের গঠনমূলক কার্যের মাধ্যমে জনগণের অধিকতর আস্থাভাজন হওয়া কর্তব্য হইবে।

পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির তাৎপর্য্য

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েকবারই আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সমস্যাটি ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। যদিও পাক-প্রধানমন্ত্রী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ইহা ভারত-আক্রমণের প্রস্তুতি পর্ব নয়, বরং তাঁহাদের নিজেদের শক্তি সঞ্চয়েরই উদ্যোগ মাত্র, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যে কাশ্মীর—তাহা বৈদেশিকদের চোখেও ধরা পড়িয়াছে। পি, টি, আই-এর বিশেষ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, করাচী হইতে হাওয়ার্ড সংবাদপত্র-শৃংখলের প্রতিনিধি মিঃ জন্ রবিন্‌স্ কর্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থানীরা ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করিয়া তুলিতে যতটা আগ্রহশীল, সোভিয়েট-আক্রমণের বিরুদ্ধে ততটা নয়। পাকিস্থানীদের যুক্তির ধারা এই—পাকিস্থান দুর্বল, কিন্তু ভারত শক্তিশালী। শক্তিসঞ্চয় না করা পর্যন্ত কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের সঙ্গে আমরা দর কষাকষি করিতে পারিতেছি না; আমেরিকার সামরিক সাহায্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভারতের শক্তির কাছাকাছি যাইবে।'

পাকিস্থানের এই উদ্দেশ্যটি আজ আর বিশ্ববাসীর কাছে চাপা নাই। কিন্তু ভারত তাঁহার মূল নীতি সম্পর্কে আগাগোড়াই অবিচলিত। কাশ্মীরের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্সী গোলাম মহম্মদ ইতিপূর্বে বহুবার ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর ভারত-ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই কাজ করিয়া যাইবে।—বিষয়টি সম্পর্কে পাকিস্থান সরকারকে আর একবার অবহিত হইতে বলি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেনঃ 'প্রতিরক্ষার দিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে—ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের উৎপাদন শক্তি, শিল্প শক্তি এবং সংহতির উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া এ সম্পর্কে কিছু করা গভর্নমেন্ট সমীচীন মনে করেন না। কারণ ইহা একটি জাতীয় সমস্যা, কোনো দলগত ব্যাপার নয়, সে দল যত বড়ই হউক না কেন।'

ভারতকে একথা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড,
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

তীর্থ-বরদ বঙ্গ

ফটো—অন্নদাস নাগ

একবিংশ বর্ষ — বৈশাখ—১৩৬১ — ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

নববর্ষের প্রথম ঊষায়

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী॥
হে দেব-দুহিতা ঊষা, কর আমাদের সুপ্রভাত,
কর আমাদের ধনদান।
অয়ি বিভাবরি, হয়ে দানশীলা, প্রভাতের সাথে
কর ধন, অন্নের সংস্থান॥

উষ আ ভাহি ভানুনা চং দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহংতী ভূর্য্য-স্মভ্যং সৌভাগ্যং ব্যুচ্ছংতী দিবিষ্টিষু॥
হে স্বর্গ-দুহিতা ঊষা, তব দিব্য আনন্দ-আকর
জ্যোতিঃ সহ হও সুপ্রকাশ।
আনো সাথে নিত্য নব সুপ্রচুর সৌভাগ্য-সম্পদ
অন্ধকার করহ বিনাশ॥

উষো যদদ্য ভানুনাবি দ্বারা বৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ॥
হে ঊষা জ্যোতিঃতে তব খুলিয়া দিয়াছ আজি
আকাশের দুইটি তোরণ।
হিংসক-বিহীন কর, দাও সুপ্রশান্ত গৃহ,
দাও অন্ন, প্রচুর গো-ধন॥

[ঋগ্বেদ হইতে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত]

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নারায়ণ চৌধুরী

দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত পরিবেশে বাংলা দেশে যখন নানাদিকে নব জাগরণের সূত্রপাত হল তখন বাঙালী আত্ম-উপলব্ধির একটি বড়ো উৎস খুঁজে পেল তার দেশপ্রেমে, জাতীয়তার চেতনায়। পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যের মূল ঝোঁকটি ছিল ধর্ম্মের ভিতর; বস্তুতঃ, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্য সর্ব্বাংশে ধর্ম্মানুভূতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটল, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটল। এককালে যেখানে ধর্ম্ম আসর জাঁকিয়ে বসে ছিল, সেস্থলে এক্ষণে দেশপ্রীতি সাহিত্যের মূল ভাববিগ্রহরূপে জাতির হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল। বৈদেশিক শাসনের হীনতা ও গ্লানি বাঙালী জাতিকে এমন মর্ম্মান্তিক পীড়নে আর কখনও পীড়িত করে নাই। এই সুতীব্র মর্ম্মপীড়ার নিরুদ্ধ বেদনা বাঙালীকে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পথের সন্ধান দিল, আর এই আত্মানুসন্ধানের ফলেই জন্ম নিল জাতীয় চিত্তে সুগভীর দেশপ্রেম। সমগ্র বাংলাদেশ যেন একটা নূতন ভাবের জোয়ারে উন্মথিত ও প্লাবিত হল। সাহিত্যক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নিত্য নূতন অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শ্রীমধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কতিপয় সেবক পর পর আবির্ভূত হয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিলেন। সমগ্র উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য ও বিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশকের বাংলাসাহিত্য দেশপ্রেমের উজ্জ্বল ছটায় ভাস্বর। বস্তুতঃ, পূর্ব্বাচার্য্যদের প্রতিষ্ঠিত দেশহিতৈষণার এই ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে এখন পর্য্যন্ত বলবৎ আছে এবং তা বহু লেখকের প্রেরণার মূলে কাজ করে যাচ্ছে। দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসাদে বাংলা সাহিত্য নানা-ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনায় দেশ-প্রেমের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। বাস্তবিক, দ্বিজেন্দ্র-লালের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্যটিকে যদি দু'এক কথায় বোঝাতে হয় তা হলে তার দেশপ্রেমের প্রতিই প্রথমে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতে হয়। দেশপ্রেমমূলক ভাব ও আবেগ দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। কি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক, কি তাঁর সমাজ সমস্যা বিষয়ক নাটক, কি তাঁর হাসির গান ও প্যারডি, কি তাঁর আর্য-গাথা—সর্ব্বত্র দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা দেশপ্রেমের সুগন্ধে ভরপুর। পরাধীনতার নিদারুণ অপমান ও বেদনা তাঁকে অতি মর্ম্মান্তিক ভাবে বেজেছিল। আর সেই সঙ্গে, সর্ব্ববিধ জাতীয় অধোগতি ও অনাচারের দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড। তুচ্ছ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের লোভে আত্ম-বিক্রয়ের হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরনির্ভরতা, কাপুরুষতা ও বীর্য্যহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, বিজাতীয় রীতিনীতির মোহ প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজ দেহের অযুত ক্ষতের উপর তিনি তাঁর অভ্রান্ত হস্ত রক্ষা করেছিলেন এবং বলাই বাহুল্য, এ সকল অধোগামী প্রবৃত্তির কবল থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যা-কিছু অন্যায়, হীন ও নীচ, তার উপর তাঁর রোষের খড়্গ নির্ম্মমভাবে পতিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্র-লাল শুধুমাত্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নেশায় বিভোর কবি ছিলেন না—তিনি আরও কিছু ছিলেন। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পাশে পাশে তিনি জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস করেছিলেন। কবিত্ব ও জাতিসংগঠন কুশলতা দ্বিজেন্দ্র-লালের ব্যক্তিত্বের ভিতর এক আধারে বিধৃত হয়েছিল। দেশপ্রেমকে রচনার মূল বিষয়ীভূত করে শিল্পসৃষ্টির দাবী পূরণ সহজ নয়; দ্বিজেন্দ্রলাল সে দাবী নিপুণভাবে পূরণ করেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, 'বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি।' বাঙালীর সকল অধোগতির মূলে রয়েছে তার এই আত্ম-বিস্মৃতি এবং সেই কারণে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার সাধনাটাই তার সব-সেরা সাধনা হওয়া উচিত। সাহিত্যের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির এই আত্ম-সম্বিৎ পুনরুদ্ধারের সাধনায় শক্তিশালী যে কজন সাহিত্যিক বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। রাজপুত জাতির অতীত বীরত্বগাথার মধ্যে জাতীয় গৌরবের একটি বড়ো উপাদান নিহিত আছে। পরাধীন ভারতবাসীর মনে রাজপুত জাতির স্বাধীনতা প্রিয়তা, ক্ষাত্রতেজ, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ যদি কিছু পরিমাণেও সঞ্চারিত করা যায় তা হলে বৈদেশিক আধি-পত্যের শৃঙ্খলতাপাশ মোচনের কাজ অনেকখানি সরল হয়ে যায়—এ কথা দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবেই বুঝেছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি একক ছিলেন না। তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র তাঁদের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উপাদানসংগ্রহে বিশেষ ভাবেই এ পথের অনুসরণ করে-ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'র কবিতার মধ্য দিয়ে রাজপুত-মারাঠার গৌরবান্বিত বীরত্বের স্মৃতি বাঙালী পাঠকেরচিত্তে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব এখানে যে, এতকাল যা ছিল উপন্যাস ও কাব্যের পাতায় সীমাবদ্ধ, সে-প্রয়াসকে তিনি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিধির ভিতর টেনে আনলেন। দেখা দিল 'প্রতাপসিংহ' 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস', 'তারাবাঈ' প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক প্রসিদ্ধ নাটক। এ বাদে বিশুদ্ধ মুঘল ইতিহাসের পাতা থেকেও তিনি নাটকের বিষয় আহরণ করেছেন। যেমন 'সাজাহান', 'নুরজাহান'। পৌরাণিক নাট্য রচনার উদাহরণ—'ভীষ্ম', 'সীতা' ও 'পাষাণী'। দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটী প্রসিদ্ধ নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'। কিন্তু যে উপাদানের সাহায্যে যে জাতীয় নাটকই তিনি লিখুন না কেন, দেশপ্রেম তাদের ভিতর একটি মূল প্রবহমান আদর্শরূপে বিরাজমান। জাতীয় শৌর্য-বীর্য্যের আদর্শকে তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকে বড়ো করে তুলে ধরেছেন।

তাই বলে তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পরিপোষক

ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে জাতীয়তা ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সমন্বিত হয়েছিল। একদিকে তেজ, সাহস ও শক্তির তিনি পূজারী ছিলেন, অন্যদিকে প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলির মহিমা তিনি উচ্চ নাদে কীর্ত্তন করেছেন। 'মেবার পতন' নাটকে রাণা অমরসিংহের কন্যা মানসীর চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই মহীয়সী নারী-চরিত্রের মুখে নাট্যকার যে সকল গভীর ভাবোদ্দীপক কথার অবতারণা করেছেন তা দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চ আদর্শ-বাদ মনটিকে সুচিহ্নিত করেছে। মোটকথা, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের ভিতর কোন খাদ ছিল না। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বাদের আদর্শের মধ্যে যে ধরণের একদেশদর্শিতা ও উগ্রতা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। যদিও তিনি মুখ্যতঃ হিন্দুর অতীত গৌরব নিয়ে নাটক রচনা করেছেন, তা বলে তাঁর রচনায় মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রয়োজনবোধে তিনি মুসলমান চরিত্রকে যথেষ্ট মহত্ত্ব দান

করেছেন। যেমন 'দুর্গাদাস' নাটকের দিলীর খাঁ চরিত্র, কাসেম চরিত্র; 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান, দারা, সোলেমান, জাহানারা চরিত্র, 'মেবার পতন' নাটকে আংশিক ভাবে মহাবৎ খাঁর চরিত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের ভিতর যে সমদর্শিতার মোটেই অভাব ছিল না এ থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

এবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝতে চেষ্টা করব।

'দুর্গাদাস' নাটকে ঔরংজীবের চক্রান্তে নিহত মাড়বার-অধিপতি যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী মহারাণী মহামায়া সম্ভাবিত মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে যে ভাষায় ও যে ভাবাবেগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন তা উচ্চ দেশপ্রেমের স্মারক। "শোন গ্রামবাসিগণ, সম্রাট (ঔরংজীব) লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ করতে আসছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তামরা কি নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমি পরপদদলিত, নিষ্পেষিত, বিধ্বস্ত হতে দেখবে? তোমাদের দূর করে' দলিত করে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার কর্বে, তাই তোমরা নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখবে? হা ধিক! এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত করতে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে?"

তার পরেই গ্রামবাসীদের নারীবিনিন্দিত বজ্রগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানাচ্ছেন, "শুনবে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে এসো। তরবারি লও। ওঠ, এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। এবার দৃঢ়পণ করে ওঠো। ওঠো, যেমন তূরীশব্দে সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে ওঠে; ওঠো—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতি-ধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল ওঠে। ওঠো! রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে, তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।"

যাদের উদ্দেশে রাণী মহামায়া কম্বুকণ্ঠে এই আহ্বান জানাচ্ছেন তারা এতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, বিরাট মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মাড়বার বাহিনীর প্রতি-রোধের যৌক্তিকতায় সংশয়াপন্ন ছিল, কিন্তু মহারাণীর এই তেজোদৃপ্ত ভাষণের পর তাদের আপত্তি শিথিল হল, তারা একবাক্যে জানাল, তারা মহারাণীর নির্দ্দেশ পালন করতে প্রস্তুত। তখন মহারাণী বলছেন, "এই তো তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না। যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকো—সে এসো! সে একাই একশ'। ক্ষীণ সঙ্কল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না। একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে, বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ; আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য;—বেছে নাও।"

'মেবার পতন' নাটকে আর একটি গরীয়সী নারীর সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁর অন্তর একই রকম বলদৃপ্ত স্বদেশপ্রেমে ভরপুর—তিনি সগর সিংহের কন্যা চারণী সত্যবতী। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর বিরাট বাহিনী নিয়ে মেবার আক্রমণ করতে উদ্যত; যুদ্ধের পর যুদ্ধে ক্ষয়িতশক্তি, হীনবল মেবার এই আক্রমণভীতি সম্মুখে নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাণা অমর সিংহ অযথা রক্তক্ষয়ে অনিচ্ছুক; তিনি তাঁর সোনার মেবারকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে সামন্ত সর্দ্দারদের নিষেধ সত্ত্বেও মোগলের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব মনের ভিতর নাড়াচাড়া করে দেখছেন, এমন সময় কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন চারণী সত্যবতী। তিনি দেশপ্রেমের অমিত উদ্দীপনায় রাণার চিত্ত ভরে তুললেন, দেখতে দেখতে রাণার দ্বিধাগ্রস্ত মন সঙ্কল্পের কঠিনতায় দুর্জ্জয় হয়ে উঠল। সত্যবতী বললেন—"কিছু দুঃখ নেই রাণা। বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।" রাণা অমর সিংহের যুক্তি ছিল যে, 'মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ববিজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অবিমিশ্র উন্মত্ততা', তার উত্তরে সত্যবতী বলছেন

—"উন্মত্ততা রাণা? তাই যদি হয়—তবে এ উন্মত্তার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্ধ্বে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হতে একটি গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। —উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হলে কেউ কোন কালে মহৎ কাজ করতে পেয়েছে?"

রাণী মহামায়া বা চারণী সত্যবতীর মুখে এই যে সব তেজোদৃপ্ত কথা বসানো হয়েছে, নাটকের প্রয়োজনে এগুলিকে চরিত্রোচিত কথার আকার দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু লেখকেরও যে এ-সব মনের কথা তা দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র নাট্য সাহিত্য একটু অবধান করলেই ধরা পড়ে। দেশপ্রেমের আগুন মনের ভিতর পোরা না থাকলে কারও লেখনীমুখে এমন অনলবর্ষী বাক্যস্রোত উদ্গীরিত হতে পারত কি না সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার ভিতর সর্বত্র একটা আদর্শবাদের সুর অন্তর্লীন দেখতে পাই। এই আদর্শবাদের বহু তন্ত্রী, তবে প্রধান তন্ত্রীটি দেশ-প্রেমের। দেশপ্রেম একটি মৌলিক প্রেরণারূপে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে সতত প্রবহমান। হয়তো এই দেশপ্রেমের ভিতর কিছু পরিমাণে ভাবালুতা আছে, আছে বাচনের আতিশয্য বা বাহুল্য, তবু জিনিষটি যে অত্যন্ত খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। রাণী মহামায়ার কিম্বা চারণী সত্যবতীর মুখের কথা প্রকারান্তরে দ্বিজেন্দ্রলালেরই মুখের কথা, এবং তা থেকেই বোঝা যাবে কী উচ্চ ও মহান্ ভাব দেশপ্রেমের আকারে নাট্যকারের লেখনীকে অনুপ্রাণিত করছে। বর্ণিত চরিত্রের মুখের কথা আর লেখকের নিজের কথায় ঐক্য থাকা প্রায়ই সম্ভব নয়, কেননা প্রথমটির সৃষ্টি শিল্পের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়টির মূল লেখকের জীবনবোধ। জীবনবোধের সঙ্গে শিল্পাদর্শ মিলবে এমন কোন কথা নেই, বরং খতিয়ে দেখলে, প্রায়ই মেলে না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের এই একটি মহা সদ্গুণ দেখতে পাই যে, এখানে লেখকের জীবন-বোধ আর নাটকাশ্রিত মূল তারের ভিতর বিরোধ ঘটে নি, পক্ষান্তরে দুটি তার এক মহান সামঞ্জস্যের ভিতর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলি মুখ্যত রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে, তা থেকে এমন ধারণা হতে পারে লেখকের কল্পনায় হিন্দু-ঘেঁষা জাতীয়তাবাদের আদর্শটিই সমধিক বলবৎ ছিল। মুসল-মান শক্তির প্রতিরোধের নামে তিনি বুঝি 'হিন্দুর নিরই' জয়জয়কার কামনা করেছিলেন। মোটেই তা নয়, বরং উল্টো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের একদেশদর্শিতা ও উগ্রতা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। কবির দেশপ্রেমের ভিতর কোন খাদ ছিল না। ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসল-মান এতদুভয়কে আশ্রয় করেই তাঁর দেশপ্রেম বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল। এ কথার বড়ো প্রমাণ 'দুর্গাদাস' নাটকের দিলীর চরিত্র। দিল্লীশ্বর ঔরংজীবের প্রধান সেনাপতি দিলীর খাঁ চরিত্রটিকে তিনি যেভাবে অঙ্কন করেছেন তাতে লেখকের পরম ঔদার্য প্রকটিত হয়েছে। দিলীর খাঁর নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা সত্যানুরাগ, বীরত্ব প্রকৃতই অনুকরণযোগ্য। এই চরিত্রটিতে অনেকগুলি সদ্গুণের আরোপ করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন এই কথা যে, মহৎ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির দেখা সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়, ভালোমন্দ সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই আছে, দেশপ্রেম কিছু হিন্দুর একচেটিয়া নয়। ইতিহাসের দিলীর খাঁ চরিত্র নাটকে বর্ণিত চরিত্রের ঠিক অনুরূপ কি না বলতে পারব না, তবে এ কথা নিশ্চিত, দ্বিজেন্দ্রলাল এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সর্বজনসমক্ষে এমন একটি আদর্শ চরিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন যা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন অবস্তর, উচ্চ মনুষ্যত্বের নমুনা হিসাবেই যা গ্রহণীয় ও বিচারণীয়। দু একটি সংলাপের টুকরো উদ্ধার করে দেখালেই এ মন্তব্যের যাথার্থ্য ধরা পড়বে বলে মনে করি।

দিলীর। ...কিন্তু সম্রাট, বাহুবলে কি ধর্মপ্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদাঘাতে রাজভক্তি তৈয়ের হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি, শেষবার বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মসজিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মার নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক।

হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করুক, দেখি সম্রাট। সে দিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা' সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরংজীব। হিন্দুমুসলমান এক হবে, দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না সম্রাট? তারা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন ক'রে, একই জল পান করে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয় নি? তারা একবার ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তিবাষ্প গদগদ স্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণ ভরে মা বলে ডাকুক দেখি, সম্রাট।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখছো।

দিলীর। আমায় মাফ কর্ব্বেন জাঁহাপনা।—আমি স্বপ্নই দেখছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন।—ভেঙ্গে গেল।

বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালেরও এই স্বপ্ন ছিল। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের আন্তরিক ঐক্যকে আশ্রয় করেই রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতের পরম দুর্ভাগ্য, পরবর্ত্তী ইতিহাস এ স্বপ্নের সফলতা বিধান করতে পারে নি, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও হানাহানির ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে পড়ে ঘটনাবলী অন্য পথে বাঁক নিয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ এক ও অখণ্ড ভারত শেষ পর্য্যন্ত আদর্শবাদীর স্বপ্নকল্পনাই থেকে গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক কোরাস গানগুলি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য যোজনা। এ সব গান এতই পরিচিত যে সংকলন করে আর এ গুলির জনপ্রিয়তার অমর্য্যাদা ঘটাতে চাই নে। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ', 'বঙ্গ আমার, জননি আমার, ধাত্রি আমার, আমার দেশ', 'ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র', 'আজি গো তোমার চরণে জননি! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান', 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর' ইত্যাদি কোরাস গান গুন গুন করেও অন্ততঃ গায়নি এমন সঙ্গীতামোদী বাঙালী খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া, উদ্ধৃতি অনাবশ্যক আরও এই কারণে যে মাত্র তিন মাস আগে এই বঙ্গশ্রীরই পাতায় দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক লেখক উক্ত কোরাস গানগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।* কাজেই শুধু উদ্ধৃতির খাতিরে উদ্ধৃতির বিশেষ সার্থকতা দেখি না।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সুপ্রসিদ্ধ। রঙ্গ ও ব্যঙ্গের আশ্রয়ে তিনি এই গানগুলিতে বাঙালীর ক্রটীবিচ্যুতিসমূহের সমালোচনা করেছেন। দেশপ্রেমের গভীরেই যে এই সমালোচনার উৎস নিহিত তা গানগুলির বাণী পর্য্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে। আমরা দেখতে পাই বাঙালীর অভ্যস্ত ক্রটীবিচ্যুতিগুলির মধ্যে তিনি বিজাতীয় মনোভাবকে এক বড়ো স্থান দিয়েছেন। বিজাতীয় রীতিনীতি, বেশভূষা, বাগ্‌ভঙ্গি, চলনবলন—বিজাতীয়তার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই লেখকের নির্ম্মম বিদ্রূপের কষায় জর্জ্জরিত হয়েছে। স্বয়ং বিলাতফেরত হওয়া সত্ত্বে তিনি বাঙালীর বিলাতীয়ানাকে বরদাস্ত করেননি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বিভিন্ন গানে (যথা, 'আমরা বিলেতফের্ত্তা ক' ভাই।' 'চম্পটি চম্পটি চম্পটি চম্পটির দল আমরা সবে', 'নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো' ইত্যাদি) কিম্বা 'অন্যান্য হাসির গানে তিনি এই নকল বিদেশিয়ানাকে ব্যঙ্গবাণে ছিন্নভিন্ন করেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, নিগূঢ় দেশপ্রেমই এই সকল বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের উৎস।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথার' উল্লেখ করেছি। এই 'আর্যগাথায়' অন্যান্য ভাবের কবিতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাও অনেক আছে। এই সব স্বদেশস্তোত্রের ভাব যেমন গম্ভীর তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণ। দুই একটি স্তোত্রাংশ তুলে দিলেই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হবে।

* দ্বিজেন্দ্র-গীতি। শ্রীজয়দেব রায়। বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬০।

"কেন রে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন !
দেখ আঁখি মেলি, গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন ।

ভারত গৌরব-সুখ-দিনমণি
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত, সে দুঃখ-যামিনী
হইবে ভারত আবার তেমন ।"

কিম্বা, "আজ আয় আয় ভাই সব মিলে ।
সাধিতে স্বদেশ-হিত আয়রে সকলে ।
চিরদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে ;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখনিশি দূরে যাবে চলে ।"

★

শূন্য দিগন্ত

সন্তোষকুমার অধিকারী

দিগন্তের রক্তরাগ একদিন যখন ফুরোবে
নিরানন্দ শূন্যতায়, জীবনের অসহায় ক্ষোভে
তখনও কি অনন্তের হে হৃদয়,
রহিবে প্রত্যাশা ?

প্রত্যূষের উত্তেজনা আর নেই, অপরাহ্নকাল
রাত্রির নৈরাশ্যে কাঁপে ভয়ে ভয়ে ; আকাশ মৃত্তিকা
এক হ'য়ে আসে মগ্ন অন্ধকার জটিল রাত্রিতে ;
—এখনও কি আশা ?

আকাশপ্রদীপ বলে ভেবেছিলে যে আলোর প্রাণে
সেও যদি মুছে যায় শূন্য তারা আকাশতিমিরে,
যদি দিগন্তের মেঘে জীবনের অমেয় ব্যর্থতা
ঝড় হ'য়ে জেগে ওঠে,—তবে ?

আলো যদি মুছে যায় দিগন্তের শেষ সীমা হ'তে
তখনও কি আশা তব রবে ?

অগ্নিহোত্রী

শ্রীসুবোধ রায়

সভ্য জীবনে প্রথম সোপান—অগ্নি-আবিষ্কার,
নব জীবনের, নব ধরমের, নব করমের আলো ।
তরুণ প্রাণের তপস্যা দিয়ে সে আগুন সবে জ্বালো,
নব প্রভাতের অরুণিমা আসি' নাশুক অন্ধকার ।

সূর্য্যরশ্মি আগুন ছড়ায়,—সেই তো প্রাণের শিখা,
গ্রহতারকারা সেই তেজে জ্বলে, সেই তেজে তারা চলে ;
গগনচুম্বী আশার অনলে মানুষের প্রাণ জ্বলে,
আপনি জ্বলিয়া জেলে যায় আলো—জীবনের জয়টিকা ।

দৈত্য নাশিতে অগ্নিগর্ভ বজ্রের প্রয়োজন,
হও সুকঠোর ব্রতের সাধক ঋষি দধীচির সম ।
নব সৃষ্টির মাঝারে আবার জাগুক নরোত্তম
যার আগমন লাগিয়া ধরায় চলিয়াছে আয়োজন ।

কর্ম্মের পূত যজ্ঞ-অনলে দাও সাত্বিকসম
মিথ্যা, স্বার্থ, দৈন্য, ক্লৈব্য—আহুতি সে নিরুপম ।

অন্ধ দেবতা

গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়

কঠিন অসুখ থেকে সেরে উঠে অন্নপথ্য করল ভুবন। তারপর কোনোরকমে এসে বসল বাইরের দাওয়ায়। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আকাশমুখো হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। আকাশের অসীম শূণ্যতার সংগে ওর হৃদয়ের শূণ্যতাটুকু মিশে গিয়ে সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন শূণ্যময় হয়ে উঠল কয়েকমুহূর্ত্ত। মনটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল বারবার।

গোলাপ বৌ এসে সামনে দাঁড়াল, 'আবার এখানে এসে বসলে কেন? একে চোখে দেখ না তার ওপর আবার এই দুর্ব্বল শরীর। পড়ে টড়ে গিয়ে একটা অঘটন বাধাও আর কী। যাও, যাও, ভেতরে যাও।'

ভুবন বলল, 'এই যাই।'

গোলাপ বৌ বলল, 'ধরব নাকি, না নিজেই পারবে?'

ভুবন হাসল, বেদনাম্লান হাসি। গোলাপ বৌর সাহায্য ছাড়া কবেই বা উঠে দাঁড়াতে পেরেছে ভুবন। আজো তো জীবনের চলার পথে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে ওরই হাত ধরে ধরে। তা না হলে কী যে হত ভুবনের অবস্থা কে জানে। ভাবতে গেলে কেঁপে ওঠে বুকের ভেতরটা। শরীরটা অবশ মনে হয়।

মুখে বলল, 'না-না, পারব পারব। ধরতে হবে না তোকে।'

গোলাপ বৌ চলে যেতে যেতে বলে গেল, 'আজ আর ঘুমিও না যেন। ভাতমুখে ফের জ্বর আসবে তা হলে।'

ঘুম? ফের একটু হাসল ভুবন। ঘুম কী আছে ও চোখে। যেদিন থেকে চোখ গেছে ঘুমও গেছে সেদিন থেকেই। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে ভুবন, দু'জনে যেন চক্রান্ত করেই ছেড়ে পালিয়েছে ওকে। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ওর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। তাই এক এক সময় সমস্ত পৃথিবীটাকে অভিশাপ দেয় ও মনে মনে। পরক্ষণেই ভেঙে পড়ে হতাশার নিদারুণ অপমানে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভুবন ঘরে বিছানার ওপর এসে বসল।

সত্যি কথাই বলেছে গোলাপ বৌ। চোখ নেই, তার ওপরে দেহও দুর্ব্বল। শুধু কী দেহই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে নি? দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ছিল যতদিন সবল ছিল দেহের কাঠামোটা। সেদিন ওর সেই দৈত্যের মত চেহারাটার সামনে ভয়ে এগোতে সাহস পেত না কেউ। সম্ভ্রমে না হোক সসংকোচে সরে দাঁড়াত। কিন্তু তারপর? আস্তে আস্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল দৃষ্টিশক্তি, ভেঙে পড়ল দেহমন। আজো অবিশ্যি পথ ছেড়ে দেয় কেউ কেউ, তবে সে সংকোচে নয়—করুণায়।

বলে, 'আহা! অন্ধ মানুষ, পথ ছেড়ে দাও ওকে।'

মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মন, ঠিক যেন মণিহারা ফণী। যাকে সামনে পায় তাকেই ছোবল মারতে উদ্যত হয়। গোলাপ বৌ ধমক দিয়ে ওঠে, কী, হল কী তোমার?'

ভুবন আস্তে জবাব দেয়, 'না, কিছু না।' গলাটা যেন ভেজা ভেজা মনে হয় ওর। জল চিকচিক করে চোখের কোণে।

গোলাপ বৌ হাত ধরে ধরে নিয়ে যায় ভুবনকে, নরমসুরে বলে, 'সে দিনকাল কী আর আছে এখন তোমার যে লোকে ভয় করে চলবে। চোখ রাঙাতে যাও কাকে?'

ভুবন বলে, 'ঠিক বলেছিস গোলাপ বৌ, চোখ নেই যার চোখ রাঙাবে সে কী করে?'

চুপ করে বসে ছিল ভুবন খাটের ওপরে। বসে বসে রোমন্থন করছিল পুরণো দিনের সব স্মৃতি। ওর জীবনের উত্থানপতনের যে বিচিত্র ইতিহাস।

হঠাৎই ঘোমটায় মুখ ঢেকে গোলাপ বৌ তাড়াতাড়ি ছুটে এল ঘরের মধ্যে। ভুবনের কাছে এসে বলল, 'ওগো শুনছ, তোমাকে ডাকতে লোক এসেছে মুখুয্যেবাড়ি থেকে। যাও, কথা বল গিয়ে।'

সংগে সংগেই গলা শোনা গেল বাইরে থেকে, 'কৈ হে, ভুবন আছ নাকি বাড়িতে?'

ভুবন দেয়াল ধরে ধরে বেরিয়ে এল বাইরের দাওয়ায়, 'কার গলা? চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

আগন্তুক একটু হেসে বলল, 'তা চেনা লোকের গলা চেনা মনে হবে না তো কার গলা চেনা মনে হবে। আমি মুকুন্দ।'

ভুবন বলল, 'ও, মুকুন্দ? তাই বল। এস এস বস এসে। বসতে আসন দে গোলাপ বৌ। তারপর কী খবর বল?'

মুকুন্দ বলল, 'খবর পরে হবে, তোমার শরীর কেমন আছে আগে তাই বল।'

ভুবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: 'খবর আর কী ভাই, ওপারের চিঠির আশায় বসে আছি। ডাক এলেই যেতে পারি। মুকুন্দ বলল, 'ওপারের চিঠি যখন আসবে আসবে, কিন্তু ছেলের কোন চিঠি পেলে?

ভুবন বলল, 'না ভাই, সে একেবারেই সম্পর্ক তুলে দিয়েছে, বাবা বলে একটু খোঁজখবরও নেয় না।' সবই আমার অদৃষ্ট মুকুন্দ, সবই অদৃষ্ট। দেবতাই ফিরে চাইল না ছেলে ফিরে চাইবে কেন!'

মুকুন্দ আর কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎই মুখ তুলে বলল, 'না, আজ আর বসব না বেশীক্ষণ, কাজ আছে অনেক। তোমাকে একবার ডেকেছেন কর্তা। কাল একটু সকাল সকাল যেও।'

ভুবন বলল, 'কেন জান?'

মুকুন্দ বলল, 'কেন আবার, পূজো তো এসে গেল। আর তো বেশি দেরী নেই। কাজে হাত দিতে হবে না?'

আর কিছু বুঝতে বাকী রইল না ভুবনের। বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কাল যাব 'খন।'

মুখুয্যেরা এ গ্রামের জমিদার। এককালে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে ভয়ে কাঁপত এ গ্রামের ছোট-বড় সবাই। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার প্রবচনটার গুরুত্ব অনুভব করত মনে মনে। কিন্তু আজ আর সে জাঁকজমক আড়ম্বর নেই। যেটুকু বা ছিল পাকিস্তান হওয়ার পর তা ও নষ্ট হয়ে গেছে। আজকের এই হৃতগৌরব, হৃতশ্রী জমিদার বাড়ীর চেহারা দেখে এর প্রাচীন ঐশ্বর্য-গরিমা কল্পনা করাও অসম্ভব।

ছেলেরা সব বিদেশে চাকরী করে। বাড়ীতে একা পড়ে আছেন বুড়ো দয়ালমুখুয্যে। বাপ-পিতামহের ভিটেটুকু কামড়ে পড়ে আছেন তিনি। ছেলেরা মাঝে মাঝে চিঠি লেখে সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবার জন্যে কিন্তু তিনি হাসেন মনে মনে। এ কালের ছেলেদের ভিটে-মাটির প্রতি সে টান আর নেই। তাই ভিটেমাটিহারা ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। কিন্তু তিনি তো একালের মানুষ নন, তাঁর শরীরের শিরায় শিরায় সেকালের রক্তস্রোত। তিনি সজাগ প্রহরায় আগলে রয়েছেন জমিদার বংশের জমাজমি বস্তবাটি। রেখে হয় তার লুপ্তাবশেষ ঐশ্বর্যের গর্বটুকুও। যতদিন বেঁচে থাকবেন তিনি এমনি করেই আগলে যাবেন। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা যা ভাল বিবেচনা করে তাই করবে। সেকথা ভবিষ্যতের গর্ভেই লুপ্ত থাক। তখন তো আর তিনি দেখতে আসছেন না।

মুকুন্দ এবাড়িতে বহুদিনের চাকর। কবে কোন সুবাদে এবাড়িতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছিল যে সে তা আজ আর মনে নেই। এ বিশ্বসংসারে তার কোনো আত্মীয়স্বজন আছে কিনা তা-ও জানে না সে। শুধু এটাই জানে যে এই পরিবারের সংগে তার ছোট-বেলা থেকে পরিচয় এবং পরিবারভুক্ত আর দশজনের মত তারও কৈশোর যৌবন এবাড়ির আবহাওয়ায় অতিক্রান্ত। বহুদিনের সেবার ফলে সকলের বিশ্বাস অর্জন করেছে সে। দয়াল মুখুয্যেও স্নেহ করেন খুব তাকে। তাঁর অতিবিশ্বস্ত সেবকই নয় শুধু সে, একান্তবাধ্য সহচরও।

দয়াল মুখুয্যের কাছ থেকেই এসেছিল মুকুন্দ ভুবনকে ডাকতে।

এ আহ্বানের অর্থটুকু ভুবন সবই বুঝল। মনে মনে গর্বও হল যেন একটু।

পরদিন সকাল সকালই এসে হাজির হল দয়াল মুখুয্যের সামনে। দয়াল মুখুয্যে উঠোনে পায়চারী

করছিলেন। ভুবনকে দেখে বলে উঠলেন, 'কী খবর ভুবন, আছ ভাল ?'

ভুবন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল, 'বেঁচে আছি কোনো রকমে কর্ত্তা।'

দয়াল মুখুয্যে বললেন, 'বেঁচে থাকাটাই তো বিচিত্র। এই অনিত্য জগতে এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কী আছে।'

ভুবন বলল, 'সে জ্ঞান আর হল কৈ কর্ত্তা। সারা জীবন ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি গড়েই কাটিয়ে দিলাম, আমার মূর্ত্তিটা যে গড়েছিল তার কথা ভাববার আর সময় পেলাম না। কুমোরের ছেলে কুমোরগিরিই করে গেলাম কেবল।'

দয়াল মুখুয্যে একটু হাসলেন এবার, 'বস বস, ভুবন, বস। চোখের অসুখটা কলকাতায় গিয়ে ছেলের কাছে থেকে সারিয়ে এলে না কেন ? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছে। সবাই তো আর আমাদের বিনোদ ডাক্তার নয়।'

বিনোদ ডাক্তারের নাম উল্লেখ করার মধ্যে কারণ ছিল একটু। কী একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল ভুবনের, বাঁচবার আশা ছিল না। অসুখের গোড়াতেই ভুবন ডেকেছিল বিনোদ ডাক্তারকে। সে-ই চিকিৎসা করছিল তাকে। পাশ করা নয় যদিও তবু হাতযশ ছিল খুব বিনোদ ডাক্তারের। ভুবন সেযাত্রা রক্ষা পেলে কিন্তু চোখছটো নষ্ট হয়ে গেল চিরদিনের মত। লোকে বলে, 'বিনোদ ডাক্তারের ওষুধ খেয়েই ভুবনের এ অবস্থা হয়েছে।' ভুবন কিন্তু তা স্বীকার করে না। এ কথার প্রতিবাদ করে বলে, 'সবই দেবতার ইচ্ছে। মানুষে কী করতে পারে ? আমার কপালে লেখা ছিল তাই এ দশা ঘটল। বিনোদ ডাক্তারের আর দোষ কী ?'

দয়াল মুখুয্যের কথার উত্তরে ভুবন ম্লান একটুখানি হেসে বলল, 'সে কী আর কপালে লেখা ছিল কর্ত্তা, তাহলে তো কবেই চলে যেতাম। কপালে সে লেখা নেই।'

আর কিছু বললেন না দয়াল মুখুয্যে। মুকুন্দকে ডেকে তামাক সাজতে হুকুম দিলেন।

দক্ষিণের ভিটেয় বৈঠকখানা ঘর। ঠিক তার মুখোমুখি উত্তরের ভিটেয় চণ্ডীমণ্ডপ। আর দু'দিকে সমান মাপের লম্বামত দুটো ঘর। একটাতে মুখুয্যেবাড়ির পাঠশালা বসত আগে; আর একটাতে থাকত কতকগুলো ছাগল-ভেড়া। মুকুন্দর ওপর ভার ছিল তাদের দেখাশোনা করার। মুকুন্দ মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে পড়ত তাদের নিয়ে। তা লক্ষ্য করে পড়াতে পড়াতে গুরুমশাই হেসে বলতেন, 'ওদিকে মুকুন্দ পড়েছে একপাল ছাগলভেড়া নিয়ে আর আমি পড়েছি কতকগুলো গরু নিয়ে। যা না, এখন থেকে ওই ঘরে গিয়েই থাক। মুকুন্দই তোদের দেখাশোনা করবে।'

মুকুন্দ শুনে ও ঘরে হাসত মুখ টিপে টিপে।

বৈঠকখানা ঘরের একপাশে পুরাণো আমলের একটা পালংক রয়েছে। পাশে গোল একটা টেবিল। কর্ত্তাদের আমলের সৌখীন জিনিষ এ সব। দয়ালমুখুয্যে বহু যত্নে রক্ষা করে চলেছেন।

এ ছাড়া সারা ঘর জুড়ে পাতা আছে তক্তপোষ। খান ছুই টিনের চেয়ার আর ছোট ছোট জলচৌকী। তারই একটাতে বসল গিয়ে ভুবন। দয়াল মুখুয্যে তক্তপোষের ওপরে বসে পড়ে বললেন, 'তারপর ভুবন, পূজো তো এসে গেল। আর যে দেরী নেই।'

ভুবন বলল, 'তা এসে গেল বৈকি। চোখে তো দেখতে পাই না। মনে মনে শুধু দেখি।'

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা ছিল। ফুলে, ফলে, গাছের পাতায়, প্রকৃতিতে শরতের শ্যামলসুন্দর রূপ আজ চোখে পড়ে না ভুবনের। কিন্তু চোখ যখন ভাল ছিল তখন তো দেখেছে সে রূপ। মনে মনে তাই কল্পনা করে ভুবন।

দয়াল মুখুয্যে সে কথা বুঝে চুপ করে বসে রইলেন। একটু বাদে ফের বললেন, 'প্রতিমা গড়তে সুরু করে দাও ভুবন। কেমন পারবে তো গড়তে ?'

ভুবন বলল, 'কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে এখনো সে ক্ষমতা রাখে ভুবন।'

দয়াল মুখুয্যে বললেন, 'খুব ভাল করে গড়তে হবে কিন্তু।'

ভুবন এবার হাসল একটু, 'তা কর্ত্তা চোখ তো আমার

গেছে অনেকদিনই, কিন্তু আমার প্রতিমার চোখের নিন্দা কেউ কী করেছে কখনো। অমন কাজ করে না ভুবন।'

দয়ালমুখুয্যে বললেন, 'বেশ, বেশ। সে আমি জানি ভুবন। তা হলে সুরু করে দাও কাজ।'

ভুবন বলল, 'কর্ত্তার যে রকম আদেশ।'

এরপর খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন চিন্তা করলেন দয়াল মুখুয্যে। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, আর একটা খবর আছে ভুবন।'

ভুবন বলল, 'কী কর্ত্তা?'

দয়াল মুখুয্যে বললেন, 'বীরুর চিঠি পেয়েছি আজ বৌমাকে নিয়ে এবার পূজোর ছুটিতে ও বাড়ীতেই আসবে। হাজার হোক বাড়ির জন্যে একটু মন কেমন করে তো! বৌমা শহুরে মেয়ে, বাড়ির পূজো কখনো দেখেনি। তাই বলছি, মন দিয়ে সুরু করে দাও ভুবন শহরের চোখ যেন দেখে ভুলে যায়।'

দয়াল মুখুয্যের ছোট ছেলে বীরেশ্বর। কলকাতায় সরকারী চাকরি করে। কচিৎ কখনো গ্রামে আসে এবার কী খেয়াল হয়েছে পূজোর ছুটিটা সপরিবারে দেশের বাড়ীতে কাটিয়ে যাবে স্থির করেছে। বুড়ো বাপকে চিঠি লিখে জানিয়েওছে সে সিদ্ধান্তের কথা।

ভুবল বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না কর্ত্তা। ভুবন কুমোর মূর্ত্তিতে প্রাণ দিতে পারে না কিন্তু আর সব দিতে পারে। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।'

মিথ্যে গর্ব্ব করেনি ভুবন। আশপাশের দশবিশটা গ্রামে একদিন খ্যাতি ছিল ভুবনের মূর্ত্তি গড়ায়। আজো তা অম্লান রয়েছে। এ রকম মূর্ত্তি নাকি কেউ গড়তে পারে না। কল্পনা করতে পারে না এ রকম অপরূপ সৌন্দর্য্যসুষমা। নিখুঁত নিটোল রূপ লাবণ্য।

যে দেখে সে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

খুব ছোটবেলা থেকেই ভুবনের এ প্রতিভা ধরা পড়েছিল। সারাদিন মাঠে মাঠে বেড়াত দলবল নিয়ে, পালিয়ে বেড়াত এপাড়া ওপাড়া। কিন্তু যখন ভুবনের, বাবা জীবনকুমোর মূর্ত্তি গড়ত তখন ভুবন স্তব্ধ হয়ে বসে দেখত তার কাজ। এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির গূঢ় রহস্যটুকু আবিষ্কার করতে চেষ্টা করত মনে মনে। স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন ভুবনের দিকে তাকিয়ে বহুদিন অবাক হয়ে গেছে জীবনকুমার। মনে মনে ভেবেছে, এ তো শুধুই কৌতূহল নয়। এ ধ্যানমগ্নতার মধ্যে রয়েছে জাতশিল্পীর অদ্ভুত জীবনসাধনার পরিচয়। ভুবনের মাকে ডেকে বলেছে 'তোর ছেলে মস্ত বড় কুমোর হবে দেখিস, ভুবনজোড়া খ্যাতি হবে।'

ভুবনের মা হেসে বলত, 'ছেলেকে এখন থেকে তোমার সংগে কাজে নিতে চাও এই তো? না-না তা হবে না, ওইটুকু কচি ছেলেকে আমি এখন থেকেই কাজে যেতে দেবো না।'

জীবন হাসত মনে মনে, 'এ ছেলেকে কারো সংগে নিতে হবে না। ওর সংগ নেবে সবাই।'

ভুবনের মা এরপর ডেকে নিয়ে যেত ছেলেকে ভেতরে। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে চুমু খেত চিবুকে। বলত, 'তোকে কাজ করতে হবে না খোকা তুই আমার ঘর আলো করে থাকবি চিরকাল।'

তারপর কাণে কাণে ফিসফিস স্বরে বলত, 'কর্ত্তাদের কাজের ঘরে গিয়ে বসিস কেন? খেলে বেড়াতে পারিস না?'

ভুবন কিন্তু শুনত না সে কথা। কী একটা অপ্রতি-রোধ আকর্ষণ অনুভব করত মনে মনে।

একদিন জীবন ছেলেকে বললো, 'খোকা, এ রকম মূর্ত্তি তুই গড়তে পারবি?'

ভুবন বলল, 'হ্যাঁ, পারব।'

জীবন দেখে চমকে উঠলো, অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ভুবনের মুখে চোখে। শিল্পীর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দৃষ্টিতে।

বুঝলো এবার সময় হয়েছে। ভুবনের দীক্ষালগ্ন সমাসন্নপ্রায়। আর দেরী করা চলে না।

এরপর একদিন শুভমুহূর্ত্তে জীবন সৃষ্টিরহস্যের মূল-সূত্রগুলো ধরিয়ে দিলো ভুবনকে। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিল কী করে সৃষ্টির মধ্যে জীবনসত্য মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। রূপ কখন অপরূপ হয়। বলল, 'এই দেখ খোকা, মানুষের শরীরে যেমন হাড়ের কাঠামোটা আগে, তারপর মাংসমেদমজ্জা, মূর্ত্তির গঠনেও তেমন কাঠখড়ের ওপরে

মাটির রঙএর মায়া। কিন্তু মেদমাংস দিয়ে রূপ খাড়া হয় বটে কিন্তু তা অপরূপ হয় না, তারজন্তে চাই সুষমা। সেই সুষমাটুকু ঢেলে দিতে পারলে মূর্ত্তির মধ্যে তবেই সৃষ্টি সার্থক হয়। ধন্য হয় স্রষ্টার জন্ম।'

ভুবন স্তব্ধ হয়ে শুনল বাবার কথা। সেদিন এক আনন্দলোকের দ্বার উন্মুক্ত হল ভুবনের চোখের সামনে। নবজীবন লাভ করল ভুবন।

জীবনেরও খুশীর সীমা ছিল না। ভুবনের মাকে ডেকে বলল, 'খোকা আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে দেখিস। ওকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।'

ভুবনের মা কেঁদে বলল, 'কেন, সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে যাবে নাকি খোকা?'

জীবন বলল, 'তা যেতে পারে বৈকি। ঘরের মাকে ছেড়ে জগতের মাকে খুঁজে নিতে হবে। সৃষ্টিরূপিণী সৌন্দর্য্যরূপিণী যে মা।'

ভুবনের মা তেমনি কেঁদে কেঁদেই বলল, 'না—না, অমন কথা বলো না। আমি বেঁচে থাকতে খোকা কোথাও যেতে পারবে না। তাহলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরব আমি।'

জীবন আর কিছু বলল না। হুঁকো হাতে চলে গেল নিজের ঘরে। আজ তার আনন্দের দিন। আরাম করে তামাক খেতে হবে বৈকি।

ভুবন কিন্তু বেশিদিন বাড়িতে রইল না। কিছুদিন পরেই জীবন মারা গেল, ভুবনও বেরিয়ে পড়ল বাইরে। মা ছাড়তে রাজী হয়নি, ভুবন অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে রাজি করিয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি কিছু ভেবো না মা। আমি দিনকতক বিদেশ ঘুরেই তোমার কাছে ফিরে আসব।'

মা কেঁদে কেটে বলল, 'দেরী করবি না কিন্তু।'

ভুবন বলল, 'না মা, দেরী করব না।'

মা তবুও ভুবনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে যাবি না।'

ভুবন হেসে বলল, 'না মা, যাব না।'

মা বলল, 'চিঠিপত্র দিবি।'

ভুবন বলল, 'আচ্ছা দেবো।'

চোখদুটো ভুবনেরও ছলছল করছিল মাকে ছেড়ে যেতে। মনটা খারাপ লাগছিল খুব। তবু বাইরের আকর্ষণটাই প্রবল হয়ে টানতে লাগল ভুবনকে। ঘর ছেড়ে ভুবন বেরিয়ে পড়ল পথে। অজানা অচেনা নতুন জগতে।

এদেশ সেদেশ করে কত দেশ ঘুরল ভুবন, কত তীর্থ দেখে বেড়াল। কাশী গয়া বৃন্দাবন মথুরা। তবু মনের অতৃপ্তি মিটলনা, দিন দিন অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়েই যেতে লাগল। কী যেন খুঁজে বেড়াল ভুবন অথচ সেই দুর্লভ বস্তুটা মিলল না।

হঠাৎই একদিন তা-ই পেয়ে গেল ভুবন।

পুরীর সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। দীর্ঘকায় গৌরকান্তি এক ভাস্কর। বয়স হয়েছে, লম্বা ছ'ফুট শক্ত সমর্থ চেহারা, মাথার চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। বার্দ্ধক্যজর্জ্জর মুখের রেখায় প্রতিভার বিদ্যুৎপ্রকাশ। চোখের তারায় সৃষ্টির প্রেরণা।

ভুবন মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

ভাস্কর বলল, 'কে তুমি?'

ভুবন বলল, 'আমি একজন হতভাগ্য শিল্পী।'

ভাস্কর বলল, 'কী চাই?'

ভুবন বলল, 'শিক্ষা। আপনার কাছে কিছু শিখতে চাই আমি।'

ভাস্কর খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল ভুবনের দিকে। তারপর খুশী হয়ে বলল, 'আচ্ছা, শেখাব আমি তোমাকে।'

ভুবন কিছুদিন রইল সেখানে। ভাস্করের মেয়ে রাধার সংগে হল পরিচয়। রাধা ভালবাসল ভুবনকে। ভুবন রাধাকে। নতুন আরেকটা স্বর্গলোকের দ্বার খুলে গেল ভুবনের চোখের সামনে। জীবনের নতুন আরেকটা স্বাদ অনুভব করল ভুবন। অতুলনীয় অবর্ণনীয় সে স্বাদ।

ভাস্কর ডেকে বলল ভুবনকে, 'তুমি রাধাকে ভালবাস?'

ভুবন মুখ নীচু করল, 'হ্যাঁ।'

ভাস্কর বলল, 'তবে বিয়ে কর রাধাকে।'

ভুবন চমকে উঠে বলল, 'না। তা আমি পারব না।'

ভাস্কর বলল, 'কেন?'

ভুবন জবাব দিল, 'মা দুঃখ পাবে তাতে।'

ভাস্কর বলল, 'রাধাকে না পেলে তোমার দুঃখ হবে না ?'

ভুবন বলল, 'আমার দুঃখ আমার থাক কিন্তু তাকে দুঃখ দিতে পারব না আমি।'

এরপর ভুবন আর থাকল না সেখানে। এক অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়ল গোপনে।

ফের কিছুদিন ঘুরে বেড়াল ভবঘুরের মত। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, কোথাও স্বস্তি নেই ভুবনের। একটা অতৃপ্তির বোঝা বয়ে বয়ে বেড়ানো।

বহুদিন দেশছাড়া ভুবন। মায়ের মৃত্যুসংবাদ আগেই পেয়েছিল। এমনি করে বছর দশেক কাটবার পর হঠাৎই একদিন দেশে ফিরে এল ভুবন। ঘরবাড়ির চেহারা দেখে প্রথমে চোখে জল এল ওর। মায়ের স্মৃতির বেদনাটাও কম ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির শ্রী ফিরিয়ে আনল নিজের জীবনে।

কিন্তু জীবিকার সংস্থান চাই। ভুবন তাই পৈতৃক ব্যবসা সুরু করল। পৈতৃক আমলের যে সব বাঁশ খড় ছিল ভুবন সেসব জোগাড় করে নিল ফের। নতুনও জোগাড় হল কিছু। কিছুদিনের মধ্যেই ভুবনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ভুবনকুমোরের মূর্ত্তি নাকি সবচেয়ে সুন্দর হয়, সবচেয়ে প্রাণবন্ত। আর সে প্রাণবন্ততার সবটুকু মোহ যেন দুই চোখেই।

এতদিন অবিবাহিত ছিল ভুবন। এবার স্বজাতিরই একজনের মেয়ে গোলাপকে বিয়ে করে সংসারধর্ম্ম সুরু করে দিল ও।

কতদিন কেটে গেছে এরপর। দিন নয় বছর। পুরো দুটো যুগ।

জীবনে ভুবন পেয়েছে সবই। খ্যাতি। অর্থ। প্রতিপত্তি এ ছাড়া মানুষের আর কী কাম্য থাকতে পারে। দু'হাতে রোজগার করছে খরচ করেছে চার হাতে। বর্ত্তমানটাকেই বেশি সত্য মনে করেছে ভবিষ্যতের চেয়ে। শুধু কী তাই ? কার অসুখে চিকিৎসা হয়নি, ভুবন তক্ষুনি ছুটেছে সেখানে। কে কোথায় অনাহারে আছে ভুবন অন্ন নিয়ে হাজির তার কাছে। কন্যাদায়ে দায়গ্রস্ত কে বিপন্ন, ভুবন তার উদ্ধারকর্ত্তা। ভুবন ছাড়া কারো গতি নেই। ভুবনই হচ্ছে সকলের আশ্রয়। সকলের আশ-ভরসা।

মাঝে মাঝে গোলাপ বৌ বলত 'এ তুমি করছ কী ?'

ভুবন বলত, 'কী ?'

গোলাপ বৌ বলত, 'এভাবে টাকা নষ্ট করলে পরে আসবে কোথা থেকে ?'

ভুবন কাজ করতে করতে জবাব দিত, 'মা দেবে। কেমন সুন্দর মূর্ত্তি গড়েছি দেখ্ তো। একটু দাঁড়া। মায়ের আমি চোখ দিয়ে দি, তারপর ঐ চোখ আমার কষ্ট দেখে মা কেমন না দিয়ে পারে দেখব ?'

বলেই তুলি নিয়ে প্রতিমার ভ্রূ আঁকতে সুরু করে দিত ভুবন।

গোলাপ বৌ একটু চুপ করে থেকে ফের বলত, 'পরকেই যদি খাওয়াবে আমরা খাব কী ?'

ভুবন জিব্ কেটে বলত, 'ছি-ছি-ছি, ওকথা বলিস না, গোলাপ বৌ। আমি খাওয়াবার কে ? যিনি মালিক তিনি খাওয়ান। আমি তো বয়ে বেড়াই শুধু।'

গোলাপ বৌ আর কিছু বলত না। স্বামী প্রতি ভালবাসাই শুধু ছিল না তার কেমন একটা শ্রদ্ধাও ছিল। দেবতা জ্ঞানে তাকে পূজো করত মনে মনে।

ভুবনের জীবনে সুখ ছিল কিন্তু শান্তি ছিল না। সর্ব্বদাই মনের মধ্যে কিসের একটা আগুন ধিকি ধিকি জলত। এত জ্বালা এত অশান্তি ভুবনের ভাগে আছে একথা ভাবতেই পারে নি ও। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনটাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কাজ করতে করতে এক এক সময় চমকে উঠত ভুবন। এ কার মূর্ত্তি গড়েছে ও ? এ দুটো চোখের সংগে যে তার চোখের মিল রয়েছে। সম্পূর্ণ মুখাবয়বটাই যে তার। সংগে সংগে মনের মধ্যে ভেসে উঠত তার মুখ। বেদনাম্লান অশ্রু টলমল দুটি চোখ। ভুবন কাজে মন দিতে পারে না আর। অন্যমনস্ক হয়ে যেত কিছুক্ষণ।

ভুবনের ছেলে নরেন ইতিমধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল। ভুবনের ইচ্ছে ছিল সেও পূর্ব্বপুরুষের পেশাটা গ্রহণ করে।

কিন্তু মানুষ হল না ছেলেটা। ভুবনের সংগে ঝগড়া করে কলকাতায় গিয়ে কারখানার কাজ নিল। বাড়ির

সংগেও কোনো সম্পর্ক রাখল না আর। পৈতৃক পেশাটাই মুছে দিল না সে পিতৃপরিচয়টাও মুছে ফেলল একেবারে।

তবু ভেঙে পড়েনি ভুবন। ভেঙে পড়ল চোখদুটো নষ্ট হয়ে যেতে। দেহ ভাঙল, মন ভাঙল। ভাঙল মনের সব শক্তিটুকু। শুধু যে চোখেই অন্ধকার দেখল তা নয়, মনের মধ্যেও আলোর কোনো রেখা খুঁজে পেল না। আশা-হীন উৎসাহহীন অন্ধকার জীবন। এ সুযোগ ছাড়ল না আত্মীয়স্বজনেরা। জমিজমা বাড়িঘর ভুবনের যা কিছু ছিল কিছু বেদখল হয়ে গেল। কিছু বা ভোগে এল না দেখাশোনার অভাবে।

এদিকে দেশের ওপর দিয়েও ঝড় বয়ে গেল বিরাট। সে ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব। দেশ ভাগ হয়ে গেল, হিন্দুরা সব ঘরবাড়ি ফেলে চলে গেল দেশ ছেড়ে। সমস্ত গ্রামগুলোয় যেন নিঝঝুম হয়ে পড়ল, পরিত্যক্ত বাড়ি-গুলো সব খাঁ খাঁ করতে লাগল প্রেতপুরীর মত। যেন ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের এক একটা কবরচিহ্ন।

গোলাপ বৌ এসে খবর দেয়, 'দত্তরাও আজ চলে গেল। বাড়িতে কেউ রইল না। শুধু বিধবা পিসীটা রইল।'

মণি দত্তের বিধবা পিসী বিলাসিনীর কথা বলে গোলাপ বৌ। বিধবা হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বাপের আমল থেকেই আছে দত্তদের সংসারে। লতা-পাতার সম্পর্ক নয়। মণি দত্ত পরিবার নিয়ে চলে গেল বিদেশে। বুড়ীটাকে রেখে গেল বাড়ি পাহারায়।

ভুবন হেসে উত্তর দেয়, 'ও বুড়ীটার বোঝা বইতে বুঝি সাহস হল না ওদের।'

গোলাপ বৌ উত্তর দেয় না এ কথার। যে দিনকাল পড়েছে তাতে এ নিয়মটাই তো স্বাভাবিক। ভুবনের কথাটাই হয়তো অস্বাভাবিক। নিজের পেটের ছেলে দিয়েই কী টের পায়নি সেটা?

একটুকাল চুপ করে থেকে গোলাপ বৌ বলে, 'কিন্তু আমাদের কী উপায় হবে এখন?

ভুবন জবাব দেয়, 'ভাবিসনি গোলাপ বৌ, যার ভাবনা তাকে ভাবতে দে, তুই কেন ভেবে মরিস?'

গোলাপ বৌ ফের একটুকাল চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'চল না, আমরাও চলে যাই।'

ভুবন বলে, 'কোথায়?'

গোলাপ বৌ বলে, 'যেখানে সবাই যাচ্ছে।'

ভুবন গম্ভীর হয়ে ওঠে, না, তা হয় না।'

গোলাপ বৌ বলে, 'এখানে থাকলে যে না খেয়ে মরতে হবে।'

ভুবন বলে, 'মরি মরব। কিন্তু ভিটেমাটি ছাড়ব না, কখনো। এ যে আমার সাধনার স্থান গোলাপ বৌ।'

জল দেখা দেয় ভুবনের দু' চোখে।

মুখুয্যেবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরে এল ভুবন। দয়াল মুখুয্যে তাঁর মুসলমান চাকরটাকে দিয়েছিলেন সংগে। সে-ই খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর ও নিজেই চলে আসতে পেরেছে। চেনা জানা পথে বিশেষ অসুবিধা হয় না তেমন।

দত্তদের বাগানের সীমাটুকু পার করে দিতে দিতে গফুর হেসে বলেছিল রসিকতা করে, 'নিজে তো চোখে দেখতে পাওনা তুমি প্রতিমার চোখ দেবে কেমন করে?

ভুবন হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'মায়ের চোখ কী আমরা দিতে পারি রে বাপু, মা নিজেই তাঁর চোখ দিয়ে নেন!'

একথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারেনি গফুর। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দও করে নি আর। হিন্দু লোকদের কথাই আলাদা, তাদের কথাবার্তার ধরণধারণই অন্যরকম। কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ভুবনকে দেখে গোলাপ বৌ ছুটে এল তাড়াতাড়ি, 'ইস্, এই দুপুরের রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে যে। এস, এস, ছায়ায় এস তাড়াতাড়ি।'

ভুবন বাধা দিয়ে বলল, 'না রে গোলাপ বৌ, রোদে মুখ লাল হয়নি। মুখ লাল হয়েছে আনন্দে।'

গোলাপ বৌ বলল, 'কিসের আনন্দ?'

ভুবন বলল, 'মা আসছে দেখছিস না?'

গোলাপ বৌ বলল, 'ঐজন্যে ডেকেছিলেন বুঝি কর্তা?'

ভুবন বলল, 'হ্যাঁ।'

'মূর্তি গড়তে হবে না?'

ভুবন হাসল এবার একটু, 'হবে না তো কী!'

খবরটা সুখবরই বটে, কিন্তু সে সুসময় আজ আর ভুবনের নেই। যখন শক্তি সামর্থ্য ছিল, ছিল চোখছুটো, আর মূর্তিকে জীবন্ত করে গড়বার অপূর্ব দক্ষতা। আজ আছে শুধু অক্ষম শিল্পীর ক্ষমতার দম্ভ।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গোলাপ বৌ। তারপর চিন্তিত সুরে বলল, 'কিন্তু এই শরীর নিয়ে পারবে কেমন করে তুমি?'

'পারব, পারব। আমি পারব। তুই আমাকে বসতে একটা পিড়ি দে গোলাপ বৌ।'

ভুবনের যেন আনন্দ ধরে না আজ। উচ্ছ্বাসের আর শেষ নেই। সৃষ্টির আনন্দ যে কী আনন্দ সে স্রষ্টা ছাড়া আর কে বুঝবে?

দিন ছয়েক বাদেই কাজ সুরু করে দিল ভুবন। সংগে নিল একটা ছেলে। কাছে কাছে থাকবে সবসময়। আর দরকার হলে দেখেশুনে দেবে একটু।

কাজ করতে করতে হঠাৎই একদিন চমকে উঠল ভুবন।

'কী খবর ভুবনদা? ভাল আছ?'

ভুবন বলল, 'কে ছোড়দার গলা না?' বলেই তাড়াতাড়ি মাটিতে উবু হয়ে প্রণাম করল ও। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাল আছ ছোড়দা? এতদিন বাদে মনে পড়ল?'

বীরেশ্বর বলল, 'আর ভুবনদা, বিদেশে বিদেশেই ঘুরে মরছি। দেশে আসা আর হয়ে ওঠে না। তারপর তোমরা সব আছ ভাল?'

ভুবন বলল, 'বেঁচে আছি কোনো রকমে ছোড়দা।'

বীরেশ্বরের স্ত্রী লতিকা বলল, 'এই বুঝি তোমাদের ভুবনদা।' বীরেশ্বর হেসে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

লতিকা বলল, 'ভাল করে মূর্তি গড়বে। ফাঁকি দিও না কিন্তু।'

কথাটায় একটু আহত হল ভুবন। তারপর মনে মনে ভাবল, শহরের মানুষ শহরের ভাষায় কথা বলে। সে ভাষার অর্থ ভুবন কী বুঝবে? হেসে বলল, 'গড়ব, ভাল করেই গড়ব ছোটবৌদি। বয়েসকালে তো আর এলে না। আজ আর সে শরীরও নেই শক্তিও নেই।'

লতিকা ব্যংগচাপা স্বরে বলল 'কাজেই দেখা যাবে সেটা।'

ভুবন কিছু না বলে ফের কাজে মন দিল। দিনের পর দিন এমনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলল মূর্তি। শুধু কী উদয়াস্ত পরিশ্রম? কত বিনিদ্র রাত্রিও কাটাতে হল ওকে। তবু যেন পূর্বপুরুষের গর্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। তাঁদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। শহরের চোখ যেন গ্রামের মূর্তি দেখে ঘৃণায় বিষিয়ে না ওঠে। তাহলে সে লজ্জা, সে অপমান তো ভুবনের।

সপ্তমীর দিন পূজো সুরু হল যথারীতি। উঠোনে একদল মেয়েপুরুষের ভিড়। ভক্তিনম্র শিরে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে। লতিকাও ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে।

ঢাকে বাজছে আগমনী বাজনা।

হঠাৎই একটা চাপা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে। পুরোহিতও মন্ত্র আওড়ানো বন্ধ রেখে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রতিমার দিকে।

না ভুল হয়নি তো একটুও। স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে এখন।

মূর্তির গড়ন নিখুঁত হয়েছে, ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। কিন্তু তার চোখ নেই। চোখের রেখা টানা হয়েছে। ভ্রূও আছে। শুধু তারা ফুটে নেই।

দয়ালমুখুয্যে বললেন, 'ভুবন? ভুবন কোথায়?'

লতিকা পাশ থেকে বলল 'ঐ তো আপনাদের ভুবন দাঁড়িয়ে আছে। তখনই বলেছিলাম এসব অন্ধ মানুষের কাজ নয়। ঢঙ দেখুন না লোকটার।'

সবাই তাকিয়ে দেখল এবার, ভুবন অবিচল মূর্তির মত হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে মুখ করে। জলের ধারা বয়ে চলেছে ওর দু' গাল বেয়ে।

চরক-সংহিতায় সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে তিনখানা মৌলিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়: ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা, সাংখ্য-প্রবচন সূত্র ও তত্ত্ব-সমাস। সাংখ্য-প্রবচনসূত্র কাপিলসূত্র নামে পরিচিত হইলেও উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার দুইটি ভাষ্য আছে। একটি অনিরুদ্ধ রচিত, অন্যটি বিজ্ঞান ভিক্ষুকৃত। বিজ্ঞান ভিক্ষুর আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী। অনিরুদ্ধের সাংখ্য সূত্রবৃত্তি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অনিরুদ্ধের পূর্ব্বের কোনও গ্রন্থে সাংখ্য সূত্রের উল্লেখ নাই। সাংখ্যকারিকা কাহারও কাহারও মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, কাহারও মতে প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক মোক্ষমুলার তত্ত্ব-সমাসকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াছেন।

সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে যে দার্শনিক মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অধুনা তাহাই সাংখ্যদর্শন নামে পরিচিত। কিন্তু অন্যবিধ মতও পূর্ব্বে যে সাংখ্যদর্শন নামে প্রচলিত ছিল, চরকসংহিতায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিভদ্রের "ষড়দর্শন সমুচ্চয়ে"র টীকাকার গুণরত্ন সূরি সাংখ্যদর্শনের টীকায় দ্বিবিধ সাংখ্যমতের উল্লেখ করিয়াছেন—মৌলিক্য সাংখ্য ও উত্তর সাংখ্য। তিনি লিখিয়াছেন মৌলিক্য সাংখ্য দার্শনিকদিগের মতে প্রত্যেক পুরুষের সহিত সংযুক্ত স্বতন্ত্র "প্রধান" আছে, কিন্তু উত্তর সাংখ্যদর্শনের মতে সকল পুরুষের সহিত এক নিত্য প্রধান সংযুত। (মৌলিক্য সাংখ্যা হি আত্মানম্ আত্মানম্ প্রতি পৃথক্ প্রধানং বদন্তি। উত্তরে তু সর্ব্বাত্মস্বপি একং নিত্যং প্রধানম্ ইতি প্রপন্নাঃ।) যদি প্রতি পুরুষের সহিত স্বতন্ত্র প্রধানের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই সকল বিভিন্ন প্রধানের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। এই মত যে প্রচলিত সাংখ্য মত হইতে ভিন্ন তাহা সুস্পষ্ট। চরক সংহিতায় যে দর্শন বিবৃত আছে, তাহা সাংখ্যদর্শন বলিয়া বর্ণিত না হইলেও, তাহাও যে তৎকালে প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অথবা তাহার এক শাখা তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গুণরত্ন সূরি তাঁহার গ্রন্থে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের একখানির নাম আত্রেয়সংহিতা। এই আত্রেয়সংহিতাই যে চরক-সংহিতা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা চরক-সংহিতায় মহর্ষি আত্রেয়ই প্রবক্তা। আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই চরক-দর্শন বিবৃত হইয়াছে।

অগ্নিবেশের প্রথম প্রশ্ন ছিল, "কতিধা পুরুষঃ ধীমন্ ধাতুভেদেন ভিদ্যতে হ"—উপাদান ভেদে পুরুষের কত প্রকার ভেদ হয়? এই প্রশ্ন ও অন্য ২২টি প্রশ্নের উত্তরে আত্রেয় চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে তত্ত্ব সংখ্যা ২৪টি, ২৫টি নহে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আত্রেয় বলিয়াছিলেন, "খাদয়ঃ চেতনা-ধাতু ষষ্ঠাস্ত পুরুষঃ স্মৃতঃ"—চেতনা-ধাতু ষষ্ঠ খাদিগণই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। খ (আকাশ), বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ মহাভূতের প্রথমেই "খ" উল্লিখিত হয় বলিয়া খাদি (খ+আদি) শব্দে পঞ্চ মহাভূত বুঝায়। পঞ্চ মহাভূত এবং ষষ্ঠতঃ চেতনা এই ছয় ধাতুর সমবায়ই পুরুষ, আবার "চেতনা-ধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষ-সংজ্ঞকঃ—কেবল চেতনা-ধাতুকেও কেহ কেহ পুরুষ বলিয়া থাকেন। এই পুরুষ আবার ধাতু-ভেদে "চতুর্ব্বিংশতিকঃ" বলিয়াও কথিত হয়—"পুনশ্চ ধাতু ভেদেন চতুর্ব্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ"। মনঃ দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয় এবং "অষ্টধাতুকী প্রকৃতি" ইহারাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। "মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিঃ অষ্টধাতুকী"। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমবায়ই পুরুষ। পুরুষ এতদতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। "খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহংকারস্তথাষ্টমঃ"—পঞ্চ মহাভূত, বুদ্ধি, অব্যক্ত

ও অহংকার; এই আটটি লইয়া "অষ্টধাতুকী প্রকৃতি"। অব্যক্ত এই অষ্টধাতুকী প্রকৃতির অন্তর্গত। ইহা সাংখ্যকারিকার মূল প্রকৃতির স্থানে অবস্থিত। মূল প্রকৃতি হইতে যেমন বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি যথাক্রমে উদ্ভূত হয়, এই অব্যক্ত হইতেও তেমনি। কিন্তু সাংখ্যকারিকার মূল প্রকৃতি অচেতন, চরকের অব্যক্ত চেতন।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।
ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্বমব্যক্তবর্জ্জিতম্।
অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ॥

পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ—এই ষোলটির নাম "বিকার" আর পঞ্চমহাভূত, বুদ্ধি অব্যক্ত ও অহংকার—এই আটটি ভূত-প্রকৃতি নামে অভিহিত। এই চতুর্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্ব হইতে অব্যক্তকে বর্জ্জন করিয়া যে ত্রয়োবিংশ তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে, তাঁহারা "ক্ষেত্র" বলিয়া কথিত, এবং অব্যক্ত এই ক্ষেত্রের "ক্ষেত্রজ্ঞ"। এই অব্যক্ত-নামা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা; তিনি শাশ্বত, বিভু ও অব্যয়। অন্য যাহা কিছু আছে, তাহা ব্যক্ত—এই অব্যক্ত হইতেই ব্যক্ত হয়। "অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ। তস্মাৎ যৎ অন্যৎ, তদ্ ব্যক্তং বক্ষ্যতে চাপরং দ্বয়ং।" এই ক্ষেত্রজ্ঞ অব্যক্ত হইতে প্রথমে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চমহাভূতের উদ্ভব হয়। ইহার পরে পঞ্চমহাভূত হইতে "সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ পুরুষ" (বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত পুরুষ) আবির্ভূত হয়। (ততঃ সম্পূর্ণ-সর্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে)। এই পুরুষ প্রলয়কালে (মৃত্যুকালে) স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হয়। (পুরুষঃ প্রলয়ে চেষ্টৈঃ পুনর্ভাবৈ বিযুজ্যতে)। পুরুষ রজঃ ও তমোগুণাবিষ্ট হইয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, আবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, এবং চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়।

অব্যক্তাৎ ব্যক্ততাং যাতি, ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥

এই পুরুষ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও ইন্দ্রিয়ার্থদিগের মধ্যে যোগসাধন করে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমবায় এই "চতুর্বিংশতিক রাশি"র নামই পুরুষ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনোর্থানাং বিদ্যাৎ যোগধরং পরং।
চতুর্বিংশতিকো হ্যেষ রাশিঃ পুরুষ-সংজ্ঞকঃ॥

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত দর্শন হইতে চরকসংহিতায় বর্ণিত দর্শনের ভেদ সহজেই উপলব্ধ হইবে। পূর্বোক্ত মতে যে অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহা অচেতন এবং চেতন পুরুষ হইতে একান্ত ভিন্নপদার্থ তথাপি প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিরূপে সংযোগ এবং সেই সংযোগ হইতে পুরুষের রক্ষা হইতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নাই। সাংখ্যকারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগকে অবাস্তব বলা হইয়াছে, এবং পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বাস্তবিক হয় না, এবং বদ্ধ হয় প্রকৃতির, পুরুষের বন্ধও নাই, মুক্তিও নাই, ইহাও বলা হইয়াছে চরকের মতে অব্যক্ত চেতন, এবং তাহা হইতে যাহা যাহা ক্রমানুসারে উদ্ভূত হয়, তাহাদের সহিত তাহার আত্যন্তিক বিপর্য্যাস বা বৈসাদৃশ্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তথাকথিত প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ চরকদর্শনে কোন দুঃসমাধেয় সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। গুটিপোকা যেমন স্ব-সৃষ্ট তন্তুগৃহে আবদ্ধ হয়, অব্যক্তও তেমনি স্বসৃষ্ট তেইশটি তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যকারিকায় ইন্দ্রিয়দিগকে অহংকারিক বা অহংকার হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। চরকদর্শন মতে তাহারা ভৌতিক—পঞ্চমহাভূত হইতে উদ্ভূত। তৃতীয়তঃ চরক দর্শনে "তন্মাত্র" নামটির উল্লেখ নাই। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শকে ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হইয়াছে। চরক মতে ইহারা পঞ্চ মহাভূতের গুণ। (শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্ গুণাঃ)। ইহাদিগকে গুণ বলিলেও ইহাদিগকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং তন্মাত্র নামে অভিহিত না হইলেও, এখানে গুরুতর ভেদ নাই। এই মাত্র ভেদ যে চরক মতে ইহারা উদ্ভূত হয় পঞ্চমহাভূত হইতে, অহংকার হইতে নহে।

চতুর্থতঃ—সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যকারিকায় যেমন অষ্ট-

প্রকৃতির কথা আছে, চরকসংহিতায়ও তেমনি অষ্টধাতুকী প্রকৃতির কথা থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে প্রচুর ভেদ বর্ত্তমান। সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য সূত্রের অষ্ট প্রকৃতির নাম মূল প্রকৃতি, মহৎ অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র চরকের অষ্ট ধাতুকী প্রকৃতি হইতেছে অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চ মহাভূত। মূল প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও অচেতন; চরকের অব্যক্ত চেতন ও ক্ষেত্রজ্ঞ।

পঞ্চমতঃ—সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যকারিকামতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়-প্রকৃতির ক্রিয়াই পুরুষে আরোপিত হয়। চরক মতে মনের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষ ক্রিয়াবান হয়।

অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দ্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ।
চেতনাবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্ত্তা নিরুচ্যতে।
অচেতনাত্বাচ্চ ক্রিয়াবদপি নো চ্যতে॥

মনঃ অচেতন ও ক্রিয়াবৎ হইলেও আত্মাই তাহার চেতয়িতা। মনের সহিত যুক্ত বিভু আত্মারই ক্রিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মনঃ অচেতন বলিয়া ক্রিয়াবান্ হইলেও, মনকে ক্রিয়াবান্ বলা হয় না।

ষষ্ঠতঃ—সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য-সূত্রে কোনও পরম পুরুষ বা পরমাত্মার কথা নাই। চরকে দ্বিবিধ পুরুষের কথা আছে; অনাদি ও হেতুজ আদি পুরুষ। অনাদি-পুরুষ সৎ, কারণ হীন ও নিত্য। আদি পুরুষ কারণ হইতে উৎপন্ন।

অনাদিঃ পুরুষো নিত্যো বিপরীতস্তু হেতুজঃ।
সদকারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুজমন্যথা॥

পূর্ব্বে যে রাশি-স্বরূপ পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই হেতুজ পুরুষ। অনাদি-পুরুষকে পরমাত্মাও বলা হইয়াছে, এবং রাশি-সংজ্ঞক পুরুষ মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, উক্ত হইয়াছে।

প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্ বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।
পুরুষো রাশি-সংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছা দ্বেষ কর্ম্মজঃ॥

রাশি-সংজ্ঞক পুরুষই জীবাত্মা বা ভূতাত্মা। ইন্দ্রিয়-দিগের সহিত এই পুরুষের যখন সংযোগ হয় তখন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মনঃ, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহারাই কারণ বা ইন্দ্রিয়। এই কারণদিগের সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে কর্ম্ম, বেদনা ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ইহাদের সংযোগ বিযুক্ত পুরুষ কোনও কর্ম্মও করে না, অথবা তাহার ফলভোগও করে না।

রাশি-সংজ্ঞক পুরুষ বা ভূতাত্মারই বন্ধন ও মুক্তি হয়। পরমাত্মা নিত্য মুক্ত। ভূতাত্মা রজঃ ও তমো গুণাবিষ্ট হইয়া অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত হয়। যাহাদের রজঃ ও তমোগুণে প্রবল অনুরাগ তাহাদেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়। যাহারা এই দুই গুণের প্রভাব অতিক্রম করে, তাহাদের জন্মমৃত্যু হয় না। চরকের মতে বন্ধ ও মোক্ষ সত্য।

পূর্ব্বে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র উভয়ই অনাদি। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কে পূর্ব্বোক্ত ভূত, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

আদি র্নাস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্রপারম্পর্য্যমনাদিকং।
অতস্তয়োরনাদিত্বাৎ কিংপূর্ব্বমিতি নোচ্যতে॥

সাংখ্যকারিকা এবং চরকসংহিতা উভয়েই অষ্ট প্রকৃতির উল্লেখ আছে। উভয়ের মধ্যে ভেদ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অষ্টপ্রকৃতির উল্লেখ আছে। তাহার সহিত সাংখ্যকারিকা এবং চরকসংহিতার অষ্টপ্রকৃতির মিল না থাকিলেও চরক-সংহিতার বর্ণনার সহিত তাহা অধিকতর সামঞ্জস্যযুক্ত।

ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
(ভ-গী-৭।৪)

এই শ্লোক পঞ্চ মহাভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও অহংকারকে অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি বলা হইয়াছে। পঞ্চ তন্মাত্রের কথা ইহার মধ্যে নাই এবং মনকে ইহার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকের ভাষ্যে কষ্টকল্পতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর "ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং" অর্থে পঞ্চতন্মাত্র, এবং 'মনঃ' অর্থে 'অহংকার' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া অর্থান্তরেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "ভূমিরাপোনলোবায়ুঃ খং" অর্থে পঞ্চভূত ও তাহাদের সহিত সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্র) একত্রে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়াছেন। স্পষ্টতঃ সাংখ্য-কারিকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই যে এই কষ্টকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে পঞ্চ

মহাভূত গ্রহণ যে প্রাচীন সাংখ্য মতের অনুগামী, গীতার এই শ্লোক হইতে তাহা প্রতীত হয়। মনঃকে ইহার মধ্যে গ্রহণ যে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চরকের পূর্ব্বে মনঃ যে অষ্টপ্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের নানাবিধ বিবরণ আছে। তাহার মধ্যে এক বিবরণে পঞ্চশিখাচার্য্য অব্যক্তকে "পুরুষাবস্থং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন সাংখ্যে পরমাত্মাই যে অব্যক্ত বলিয়া গৃহীত হইতেন, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না।

চরকে পরমাত্মাকে অনাদি বলা হইয়াছে, কিন্তু রাশি-সংজ্ঞ পুরুষ বা জীবাত্মাকে "মোহ-ইচ্ছা-দ্বেষ-কর্ম্মজ" বলা হইয়াছে। অব্যক্তই পরমাত্মা, তাহা হইতে রাশি-পুরুষের উদ্ভব হয়; অনাদি পুরুষ বা পরমাত্মা নিত্য, কিন্তু "হেতুজ"—মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজ—পুরুষ তাহার বিপরীত অর্থাৎ অনিত্য। এই অনাদি পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ; তিনি শাশ্বত, বিভু ও অব্যয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য—অব্যক্ত। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও তিনি লিঙ্গগ্রাহ্য—অর্থাৎ লিঙ্গ (নিদর্শন) দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। প্রাণাপান (শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া), নিমেষাদি দৈহিক ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ান্তর-সঞ্চার (এক ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক জ্ঞাতবিষয়ে অন্ত ইন্দ্রিয়েরও সংযোগ এবং তাহা হইতে দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উদ্ভব), বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিয়দিগের প্রেরণ এবং তাহা হইতে বিষয়-জ্ঞান, স্বপ্নে দেশান্তরগতি ও মরণ, দক্ষিণ চক্ষু দৃষ্ট বস্তুর বাম চক্ষু দ্বারা বোধ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার, ইহারাই পরমাত্মার লিঙ্গ। এই সকল লিঙ্গ মৃত জীবে দেখা যায় না, জীবিত প্রাণীতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্ম ইহাদিগকে "আত্ম-লিঙ্গ" বলে। ইহারা লিঙ্গমাত্র হইলেও আত্মা ব্যতিরেকে তাহাদের সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের উৎপাদনে আত্মার কর্তৃত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

পুরুষ বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক ও বিভু। এই পরমাত্মার সহিত পুরুষদিগের সম্বন্ধ কি? চরক সংহিতায় স্পষ্টভাবে তাহার বর্ণনা নাই। উপরে পরমাত্মার যে সকল লিঙ্গ-বিবৃত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা সর্ব্বক্ষেত্রেই বিরাজমান; ইহা চরকের মত বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাতে ভগবান আপনাকে সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন অব্যক্ত হইতে যাহা ব্যক্ত হয়, ব্যক্ত হইয়া তাহা অব্যক্ত হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে না। তাহা আদি ও অন্তবান হইলেও সর্ব্বদাই সেই অসীমের মধ্যেই অবস্থিত। এবং অসীমও তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। গীতায় উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধে উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখানে তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। রাশি পুরুষ হেতুজ হইলেও, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, সুতরাং তাহারাও অনাদি। পরমাত্মার মধ্যে তাহারাও চিরবর্ত্তমান কখনও মায়াচ্ছন্ন, কখনও মায়াতীত ব্রহ্মে—ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মোক্ষে তাহাও পরমাত্মার স্থিরপ্রাপ্ত হইবে, ইহা চরকের কোনও উক্তি হইতেই অনুমান করা যায় না। রাশি-সংজ্ঞ পুরুষ চিন্ময় অব্যক্তের অংশ—চিৎকণ, তাহারা অনাদি, কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন। যতদিন অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকিবে, ততদিন জন্মমৃত্যু-স্রোতে তাহারা ভাসিতে থাকিবে। অবিদ্যা হইতে যে জীবাত্মা মুক্ত হইবে, অবিদ্যার ফল দুঃখ হইতে সে মুক্ত হইবে, এবং বিশুদ্ধ চিৎকণা-রূপে পরমনিবৃত্তিতে অবস্থান করিবে; ইহাই চরকের মত বলিয়া অনুমিত হয়।

সাংখ্যকারিকার পুরুষের জন্ম-মৃত্যু নাই; জন্ম-মৃত্যু হয় জীবের—পুরুষ-প্রতিবিম্বিত সূক্ষ্মশরীরের। পুরুষ-প্রতিবিম্ব যখন অপসারিত হয়, তখন সূক্ষ্মশরীরের বিলোপ হয়, এবং দুঃখেরও আত্যন্তিক ঐকান্তিক বিনাশ হয়। চরক মতে জীব চিৎকণা, তাহার অবিদ্যার বিনাশ হয়, কিন্তু তাহার নাশ নাই। অবিদ্যা হইতে মুক্তিই রাশিসংজ্ঞ পুরুষের মোক্ষ। এই রাশি-সংজ্ঞ পুরুষ অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত, এবং অব্যক্ত হইতেছে চেতন আত্মা। চরকের এই মতের সঙ্গে "নারদ-পঞ্চরাত্রে" মতের মিল আছে। "যৎ তটস্থং তু চিদ্রূপং স্ব সংবেদ্যাৎ বিনির্গতং। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে।" সুতরাং চরকের মতকে বৈষ্ণব মত বলা যায়।

অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় কপিলের ধ্বনি "বৈষ্ণব সংকল্প" নামে অভিহিত হইয়াছে (১১।২৮।৬)। মহর্ষি কপিলকে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া থাকেন। এই সকল আলোচনা করিলে প্রাচীন সাংখ্য নিরীশ্বর ছিল না বলিয়া অনুমান করা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর ঈশ্বর-বর্জ্জিত সাংখ্যমত প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা বলিলে অসংগত হয় না।

কবিতা

সকাল দুপুর সন্ধ্যা

শঙ্খ ঘোষ

বুঝতে পারি এ-শহরে সমস্ত ধুলোরই মানে আছে।
দীর্ঘ দীর্ঘ সূর্য-রেখা ছিটকে গেলে ভাঙা টুকরো কাঁচে
যে-আশ্চর্য মনে হয় প্রাণের সোনালী সরু সুতো
মনে হয় সে-আনন্দে আমি কিছু নই অনাহূত।
আঁকি-বুকি গলি, পথ, দোকান-পসার, ছোটো সিঁড়ি,
অন্ধকার ভিজে ঘর কুঁকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি—
তারই মাঝখানে যদি আনন্দের আশার আবেগে
চমকে ওঠে হাওয়া তবে তারই মুখে হাত রেখে রেখে
জানতে পারি জীবনের অমেয় প্রেমের অভিমান,
গান শুনে প্রাণ পায় কান্নার ক্ষুধায় ভরা কান।

বুঝতে পারি যে-আল্পনা ভ'রে দেয় রাত্রের ভোরের
দুখানি আকাশ আর অকস্মাৎ কোনোদিন ফের
তুলে নেয় রঙে-বোনা স্বপ্নগুলি, নিদ্রিত দুখানি
সুন্দর চোখের ছবি আঁকে সেই ছবি জানি আমি।
জানি আমি কী-প্রত্যাশা দুপুরের রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে
খুঁজেছি দু'চোখ ভ'রে শুনেছি সে স্বর্গের নূপুরে
কী ভাষা। পিপাসা তার মেটেনি মেটেনি কোনোদিন
সমস্ত দুহাত ভ'রে এ-শহর ফিরে চায় ঋণ—
হাওয়ার আঘাত এসে বুকে লেগে স্নেহে ভরে মন
কঠিন-কোমল ভরা উদ্বেলিত স্তনের মতন।

বুঝতে পারি সন্ধ্যা তার রিণিকি-ঝিনিকি কোলাহলে
কাঁকণ বাজিয়ে গেলে অন্ধকার বিকীর্ণ আঁচলে
শুদ্ধ ক'রে প্রাণ, ফিরে চলে গেলে দূরের বাসায়।
অস্ফুট প্রণয় পেলে যে-সঙ্কেতে মেলে তার সায়
দু'চোখে খুঁজেছি তাকে ছুটে ছুটে, পথের কাকলি
না শুনে না শুনে; কিন্তু তার শুধু কথা-বলি-বলি
আভাস, বলে না কথা, তার কোনো ভাষা নেই মোটে।
জ্যোৎস্না এসে নামে ধীরে ইঁটের সিঁড়ির দুটি ঠোঁটে
ঠিক রাত্রি বারোটায়, ঝিকিমিকি গোলদীঘির জল—
প্রাণের দীঘিতে প্রাণ শুনে যায় প্রাণের মঙ্গল।

দেখি, দেখি। অন্তহীন চোখে তাকে জীবনের পাশে
বুঝতে পারি এ-শহরে আমারও বাঁচার মানে আছে ॥

তিন পাহাড়ের স্বপ্ন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চলো যাই চলো ঝর্ণাধারে
যেখানে কৃষ্ণচূড়ার খোঁপায়
লাল টুকটুকে জোনাকী জ্বলে
চলো যাই চলো সেই নিরালায়।

আহা, ডেকোনাকো এই অবেলায়
শোন, কানাকানি চ'লছে পাড়ায় ॥

*

মাদল বাজে দাদারিয়া গানের সুরে
মাদল বাজে তিনপাহাড়ের তিনটি চূড়ায়
মাদল বাজে কালো দেহের ঝর্ণা ঘুরে:
আয় কাছে আয় ॥

*

ছেড়ে দাও মিতে,
বাবা ব'সে আছে ও'পাশের আঙিনায়
দাদা বসে ত্যাখো রাত জেগে পাহাড়ায়।

মেয়ে গো,
মাদল বাজে…

আহা, বাবা ব'সে কী যে করে আঙিনায়
ওহো, ভাই ব'সে রাত জাগে পাহাড়ায় ॥

ধর্ম্মঘট

শ্রীমন্মথ রায়

চতুর্থ দৃশ্য

কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রমিক কলোনীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোলাঘর। নেপথ্য হইতে "মার-মার কাট-কাট" শব্দ, "আগুন—আগুন" চীৎকার, "গেলাম-গেলাম" আর্ত্তনাদ ও মাঝে মাঝে বোমা ফাটার শব্দ শোনা যাইতেছে। জনার্দ্দন দাঁড়াইয়া হুঁকা টানিতেছে ও উত্তেজিত হারাণ তাহার নিকট দাঙ্গার বর্ণনা দিতেছে।

হারাণ ॥ কেষ্টদাসের ছেলে নীলু ওই অতোটুকু ছেলে,—দোকানে যাচ্ছিল। একা পেয়ে তাকে ছোরা মেরেছে। ছেলেটাকে ডাক্তারখানায় দিয়ে এলাম। দিয়ে এলাম বটে, কিন্তু এতোক্ষণে বোধ হয় হয়ে গেছে।

জনার্দ্দন ॥ ওরা সব পারে—সব পারে।

হারাণ ॥ আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে গিয়ে কসায়ের দোকানটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দোকানটা বোধ হয় এতোক্ষণে শেষ। জোর লড়াই চলছে। ভয়ের কথা এই, আমাদের বোমাগুলোর চেয়ে ওদের বোমাগুলো ফাটছে বেশী জোরে আর আওয়াজও বেশী।

জনার্দ্দন ॥ কিন্তু দলে ভারী আমরা। কতোক্ষণ দাঁড়াবে?

হারাণ ॥ আজ তাহ'লে সর্দ্দার আমরা কাজে যাবো না?

জনার্দ্দন ॥ না ওরা ছাঁটাই হয়েছে। আমরা সব কাজে গেলে সেই ফাঁকে ওরা আমাদের ঘর লুঠ করবে,...মেয়েছেলেগুলো যাবে।

হারাণ ॥ শুনলাম, চেয়ারম্যান সাহেব এই জন্যেই পুলিশে খবর পাঠিয়েছে আজ সকালে,—যাতে পুলিশ এসে ওদের শায়েস্তা করে, ফ্যাক্টরীর কাজ চলে।

জনার্দ্দন ॥ চুলোয় যাক্ ফ্যাক্টরী। সব চেয়ে বড়ো কথা,—আমি আমার মেয়ে ফিরে চাই। আমার ইজ্জৎ গেছে হারাণ,—আমার ইজ্জৎ গেছে।

হারাণ ॥ পুলিশ এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের ঘর খানা-তল্লাস হলেই আমাদের মেয়ে আমরা ফিরে পাবো। ওদের হাতে দড়ি পড়লেই আমাদের ফ্যাক্টরীর কাজ চলবে—লাঠিগুলো এমাসেই ডেলিভারী হবে—কোম্পানী বাঁচবে, আমরাও বাঁচবো।

জনার্দ্দন ॥ ফ্যাক্টরীর কথা ভুলে যাও হারাণ। এখন ইজ্জতের কথা ভাবো। ওই শোনো গালমাল বাড়ছে।

হারাণ ॥ আমি যাচ্ছি। চেয়ারম্যান তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছিলেন সর্দ্দার। বলেছিলেন, ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ করো না, যতো বেশী লাঠি যতো তাড়াতাড়ি তৈরী হবে, ততোই মঙ্গল। বলেছেন, কন্ট্রাক্টের বাড়তি লাঠি আমাদেরই হাতে তুলে দেবেন—দুষমনদের শায়েস্তা করতে। আর তোমাকে গোপনে বলে যাচ্ছি সর্দ্দার, অর্ডারটা পুলিশের। কাজেই পুলিশ আসবে, আর নিশ্চয়ই দেখবে যাতে ফ্যাক্টরীর কাজ চালু থাকে। মানে—ওরা গেছে।

[ছুটিয়া পার্ব্বতীর প্রবেশ]

পার্ব্বতী ॥ ওগো কী সর্ব্বনাশ! ওরা মেথর পাড়ায় আগুন দিয়েছে।

জনার্দ্দন ॥ কী! শেষে মেথরদের ওপর অত্যেচার? ওরাতো শুধু আমাদের নয়, ওদেরও। ইব্রাহিম এতো নীচে নেমে গেছে। হারাণ, আগুন লাগাও ইব্রাহিমের বাড়ী।

হারাণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! সর্দ্দার, এই আমি চেয়েছিলাম—এই আমি চেয়েছিলাম।

[হারাণের প্রস্থান]

পার্ব্বতী ॥ না, না, না, এ আমরা চাই না। আর আগুন জ্বালাতে চাই না। এ আগুনে সব যাবে,—ওদেরও, আমাদেরও। এ আগুন নিভিয়ে দাও সর্দ্দার, এ আগুন নিভিয়ে দাও।

জনার্দ্দন ॥ আমার মেয়ে যখন ফিরে পেলাম না, আর তা' হয় না। এ আগুন নিভবে না।

পার্ব্বতী ॥ চাইনা আমার মেয়ে। আমার এক মেয়ের জন্য আর দশজনের ছেলে মেয়ে মরবে, এ আমি চাই না।

জনার্দ্দন ॥ তেরাত্রির মধ্যে তুমি তোমার মেয়ে ফিরে চেয়েছিলে—আমি তা পারিনি বলেই জ্বেলেছি এই আগুন। যাক্—সব যাক্।

পার্ব্বতী ॥ বুঝিনি—আমি তখন বুঝিনি। এখন বুঝছি,—মারামারিতে মারামারিটাই বেড়ে যায়। হারাণ ধন ঘরে আসে না। মাঝ থেকে ঘরের ধন হারিয়ে যায়।

[নেপথ্যে রাইফেলের শব্দ। মুহূর্ত্তে নেপথ্যের সকল গোলমাল স্তব্ধ হইয়া যায়।]

জনার্দ্দন ॥ বন্দুকের গুলি—তবে পুলিশ এসেছে।

[এমন সময়ে রুদ্ধশ্বাসে কণকের প্রবেশ]

কণক ॥ সর্দ্দার, সর্দ্দার, তোমার এখানে পুলিশ আসছে। আর একদল ওদিকে গুলি চালাচ্ছে। সামনে যাকে পাচ্ছে, তাকেই ধরছে। জ্যাঠাইমা, তুমি ঘরে যাও।

জনার্দ্দন ॥ (উভয়কে লক্ষ্য করিয়া) আমাদের কলোনীতে যারা বাইরে আছে, ছুটে গিয়ে তাদের ঘরে যেতে বল। কখন কী হয়, বলা যায় না।

[কণক ও পার্ব্বতীর প্রস্থান। জনার্দ্দন বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। এমন সময়ে অনেক পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার ইব্রাহিম ও কয়েকজন কনষ্টেবলসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল হিন্দু-মুসলমানের কতিপয় মাতব্বর। তাহাদের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া হারাণও আছে। ইহাদের আসিতে দেখিয়া জনার্দ্দন হুঁকাটি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

ইন্‌স্‌পেক্টার ॥ চারদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। মাঝখানে নির্ব্বিকার হয়ে হুঁকো টানছেন—এ মহাত্মাটি কে?

ইব্রাহিম ॥ এই সেই জনার্দ্দন সর্দ্দার হুজুর—পালের গোদা।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ থামো। (জনার্দ্দনকে) তুমি জনার্দ্দন সর্দ্দার?

জনার্দ্দন ॥ হ্যাঁ হুজুর।

ইন্‌স্‌ ॥ তোমারই মেয়ে চুরি গেছে?

জনার্দ্দন ॥ হ্যাঁ হুজুর। (ইব্রাহিমকে দেখাইয়া) ওই ইব্রাহিমের ছেলে—লালমিঞা চুরি করেছে। আর তাদের দুজনকেই লুকিয়ে রেখেছে ওই ইব্রাহিম। ওর বাড়ী খানাতল্লাসী করুন হুজুর, এখনই বেরিয়ে পড়বে সব।

ইন্‌স্‌ ॥ তোমাদের মালিকের অভিযোগ—মেয়ে চুরির জন্যই এই দাঙ্গা। আমি এসে শুধু দাঙ্গা থামাইনি। ইব্রাহিমের এলেকা তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করেছি। কিন্তু কই, পেলামনাতো। তোমাদের মালিক মিষ্টার চৌধুরী সদল বলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মেয়ে ওদের কাছে নেই।

ইব্রাহিম ॥ নেই,—তাও আমার ছেলেকে ওই জনার্দ্দন সর্দ্দার ধরে আটকে রেখেছে। আজ তিনদিন আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না হুজুর।

জনার্দ্দন ॥ মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে কথা। হুজুর, আসুন, আমার ঘর-বাড়ী, আমার এলেকা খানাতল্লাসি করুন।

ইন্‌স্‌ ॥ (হাসিয়া) ইব্রাহিম যতোটা চালাক, তুমি তার চেয়েও বেশী এ তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যায় সর্দ্দার সাহেব। তোমরা কেউ কম নও; এতবড় দাঙ্গা হলো, হাতে নাতে কাউকেই ধরা গেল না। অনর্থক খানা-তল্লাসী করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে লাভ নাই। ওর ঘরে তোমার ছেলেও যে পাওয়া যাবে না সে আমি ভালই জানি। কিন্তু তোমাদের দুজনকেই একটা কথা বলবো,—মন দিয়ে শোনো।

কয়েকজন ॥ বলুন স্যার, বলুন।

ইন্‌স্‌ ॥ ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে দেখছি—ওই "মহুয়া" পালাগানটাই সত্য আর সব মিথ্যে।

কয়েকজন ॥ সে কী স্যার?

ইন্‌স্‌ ॥ মানে,—বিয়েতে বাধা ছিল দেখে 'মহুয়া আর নদেরচাঁদ পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। এ যুগের জঙ্গল হচ্ছে কলকাতা। খোঁজ কর তাদের সেখানে—কোনো হোটেলে। তোমরা না কর, আমরা করবো এবং এও জানি, যখন তাদের ধরবো, তখন দেখবো, তারা

গলাগলি হয়ে সিনেমার গান গাইছে, আর তোমরা কিনা এখানে এ ওর গলাকাটবার জন্যে ছুরি শাণ দিচ্ছো। পুলিশের চাকরী করে চুল পাকিয়েছি। আমার কথাটা মিথ্যে নয়। ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে দাও। ফের ঝগড়াঝাঁটি করেছো খবর পেয়েছি কি তোমরা গেছো। লাঠিপেটা করবো সব।

ইব্রাহিম॥ জানি হুজুর। সে লাঠি ওরাই তৈরী করে দিচ্ছে।

ইনুস্॥ সে জন্যে তোমার আফশোষ করার কিছু নেই। যদি দরকার হয়, সে লাঠি ওদের পিঠেও পড়বে।

[জনার্দ্দন ও হারাণ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল।]

হারাণ॥ সর্দ্দার বুঝছো না—ডান হাতবাঁহাতের ব্যাপার হয়ে গেছে। নাঃ, ওই দুষমণটাকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। তোমার হুকুম পেয়ে মরিয়া হয়ে আমরা দল বল নিয়ে যখন ইব্রাহিমের ঘরে আগুন ধরাতে যাবো, ঠিক সেই সময় পুলিশ এসে গেল—পালাতে পথ পাইনা সর্দ্দার। (এমন সময় পুলিশভ্যান চলিয়া যাওয়ার শব্দ শোনা গেল) কিন্তু এই তো পুলিশ চলে গেল, এখন ওদের কে বাঁচায় দেখি?

জনার্দ্দন॥ না, না, দাঁড়াও। শোনো।

হারাণ॥ কী বলবে বল।

জনার্দ্দন॥ আচ্ছা, পুলিশ সাহেব যা' বলে গেল,—মানে, মায়া আর লালমিঞা আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। তোমার কী মনে হয়, এ সত্যি?

হারাণ॥ তা' হতে পারে। কিন্তু মায়া ইচ্ছে করে গেছে, এ কখনও সত্যি নয়। মায়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে লালমিঞা। দস্তুরমতো নারীহরণ সর্দ্দার, দস্তুরমতো নারীহরণ।

কণক॥ হারাণখুড়ো, তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পুলিশ যেতে না যেতেই তোমার ঘরে ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—খোলা জানালা দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে।

হারাণ॥ বলিস্ কী কণক! সর্ব্বনাশ!!

[হারাণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল]।

কণক॥ সর্দ্দার; তৈরী হও। আজ এস্পার কি ওস্পার—

[কণকও ছুটিয়া চলিয়া গেল। নেপথ্যে পুনরায় আগের ন্যায় কোলাহলধ্বনি উঠিল]

জনার্দ্দন॥ সত্যিই আজ এস্পার কি ওস্পার। (পার্ব্বতীর উদ্দেশ্যে) পার্ব্বতী—পার্ব্বতী—আমি চল্লাম—

[জনার্দ্দন উত্তেজিতভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে বিপরীত দিক হইতে ছুটিয়া আসিল লালমিঞা। ব্যাকুলকণ্ঠে স ডাকিল]।

লালমিঞা॥ সর্দ্দার! সর্দ্দার!!

[জনার্দ্দন ঘুরিয়া লালমিঞাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে সেখানে পার্ব্বতীও আসিয়া দাঁড়াইল]

লালমিঞা॥ জ্যাঠাইমা!

জনার্দ্দন॥ মায়া কোথায়?

পার্ব্বতী॥ বল, আমার মেয়ে কোথায়?

লালমিঞা॥ তার খোঁজেই গিয়েছিলাম—মেদিনীপুরে নন্দীগ্রামে।

জনার্দ্দন॥ (রুদ্রমূর্ত্তিতে লালমিঞার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া) কোথায় সে?

লালমিঞা॥ সেখানেও যায়নি সে।

জনার্দ্দন॥ কেন যাবে সে সেখানে? সে আছে সেখানে—যেখানে তুমি তাকে ধরে নিয়ে গেছো। যদি বাঁচতে চাও, সত্য বল কোথায় সে?

লালমিঞা॥ জীবন বিপন্ন করে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে আসিনি জ্যাঠামশাই। যখন কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না আমরা, তখন আমার মনে হলো, জ্যাঠাইমার বকুনী খেয়ে অভিমান করে মায়া একবার পালিয়ে গিয়েছিল তারই মাসীর বাড়ী মেদিনীপুরে ওই নন্দীগ্রামে। যায়নি জ্যাঠাইমা?

পার্ব্বতী॥ গিয়েছিল। তোমাকে আর নন্টুকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাকে নিয়ে আসতে।

লালমিঞা॥ তাই এবারও মনে হলো, হয়তো কারুর ওপর কোন অভিমানে এবারও সে পালিয়েছে সেখানে।

জনার্দ্দন॥ মিথ্যা কথা। আমরা তাকে বকিনি।

পার্ব্বতী॥ না। আমি বকেছিলাম। ওর এখন বয়েস হয়েছে। তোমার সঙ্গে ওর এতো বেশী মেলামেশা

পাঁচজনে পাঁচকথা বলে। পালাগানের আগের দিন আমি ওকে বকেছিলাম।

জনার্দ্দন ॥ তুমি কোন অন্যায় করোনি। (লালমিঞাকে) আর তুমি যদি নন্দীগ্রাম গিয়েই থাকো, তার কারণ না ছিল তাও নয়। কিন্তু তুমি সেখানে গেছো, এও আমি বিশ্বাস করি না।

লালমিঞা ॥ শুনুন জ্যাঠামশাই, আমি জানি আপনাদের সকল ক্রোধ আজ আমার ওপর। ফিরে এসে দেখি আমারি জন্ম কলোনীতে দাঙ্গা লেগেছে। শুনলাম মায়াকে নিয়ে আমি পালিয়েছি সন্দেহে শ্রমিকদের একতা গেছে ভেঙে—একদল হয়েছে ছাটাই, তবু আর একদল যাচ্ছে কাজে। ভাইএ ভাইএ সুরু হয়েছে দাঙ্গা। জীবন যাচ্ছে—ঘরবাড়ী পুড়ছে। আমার মাথা চাইছেন আপনারা। জেনে শুনেও আমি এসেছি—মিথ্যা বলতে নয়।

পার্ব্বতী ॥ আমি বিশ্বাস করছি বাবা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। তুমি শুধু একটিবার বল,—মায়াকে যে আমরা পাচ্ছি না, তাতে তোমার কোন হাত নেই।

লালমিঞা ॥ শুধু ও কথাটুকু—ওই কথাটুকু বলতেই আমি এসেছি জ্যাঠামশাই। যদি বিশ্বাস করো, আবার আমি বেরুবো মায়াকে খুঁজতে। এ জন্ম পৃথিবীর ওপারে—জীবনের ওপারেও যদি যেতে হয়, তাও যাবো। আর যদি বিশ্বাস না কর, আমি এখানে আছি, আমি এখানে থাকবো—থাকবো তোমাদের সামনে—জীবিত অথবা মৃত, শুধু এই আশায় যে, একদিন তোমরা বলতে বাধ্য হবে যে আমি মিথ্যা বলিনি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

লালমিঞা ॥ জ্যাঠামশাই !—আমি যাবো, না থাকবো ?

জনার্দ্দন ॥ থাকবে।

লালমিঞা ॥ আমাকে তবে তুমি বিশ্বাস করলে না জ্যাঠামশাই।

জনার্দ্দন ॥ তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি, লাল। কিন্তু আমার দলবলকে আমার বিশ্বাস নেই। (পার্ব্বতীর প্রতি) পার্ব্বতী, ওর চোখ-মুখ দেখে তুমি বুঝছো না, না খেয়ে আছে।

পার্ব্বতীর ॥ এসো বাবা এসো—(লালমিঞা যায় না, পার্ব্বতী কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া আবার ডাকে)।

লালমিঞা ॥ আমাকে এক গেলাস জল দাও।

[নেপথ্যে কণকের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল—"সর্দ্দার! সর্দ্দার!!" পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া লালমিঞাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।]

কণক ॥ লাল! তুমি!

লালমিঞা ॥ বলছি।

কণক ॥ কী আর বলবে! বাঘের গুহায় এসেও যখন তুমি বেঁচে আছো, তাতেই সব বলা হয়েছে। (জনার্দ্দনের প্রতি) এইবার আমি যা বলতে এসেছি, শোনো। লালমিঞা তোমার এখানে—ওরা কী করে জানতে পেরেছে। তোমার হাত থেকে ওকে উদ্ধারের জন্যে ইব্রাহিম দলবল নিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে। পথের দুধারের ব্যারাকে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন লাগাচ্ছে—দেখে এলাম, হারাণ খুড়োর বাড়ী দাউ দাউ জলছে।

পার্ব্বতী ॥ হারাণের বাড়ী! দাউ দাউ জলছে !!

জনার্দ্দন ॥ জলুক। হারাণ একা থাকতো; সে নিশ্চয়ই এতোক্ষণ সরে পড়েছে। আগুনের ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। আমার মেয়েকে ফিরে না পেলে আমি যে আগুন জ্বালাবো, ইব্রাহিম তা' সইতে পারবে না। সে আগুন—ওই লালমিঞা।

[ইব্রাহিমের প্রবেশ। সে একা…হাতেও কোন অস্ত্র নাই।]

ইব্রাহিম ॥ সর্দ্দার! না, না, চমকাবার কিছু নেই। আমি এসেছি একা—কোন হাতিয়ার নিয়েও আসিনি আমি।

জনার্দ্দন ॥ শয়তানীটা তোমার কোথায়, ঠিক ধরতে পারছি না, ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম ॥ আমি আমার ছেলে চাই।

জনার্দ্দন ॥ আমি আমার মেয়ে এখনও ফিরে পাইনি, ইব্রাহিম। শুধু তাই নয়, আমার ডান হাত হারাণ—তার বাড়ীতে তুমি আগুন দিয়েছো।

ইব্রাহিম ॥ তোমার ডান হাত! য়্যাদ্দিন আমিই

ছিলাম সর্দার। যাক্ সে কথা। আজ তোমার ডান হাত হারাণ—তার বাড়ী আমি আগুন দিয়ে জালিয়ে দিয়েছি···তার বাড়ী আমি লুঠ করে এসেছি। লুঠ করে সেখানে যে ধন পেয়েছি, আমি তা' তোমাকে দিচ্ছি। বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।

জনার্দ্দন ॥ হাসালে ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম ॥ হাসো। আমার হাসার সময়ও আসছে। হ্যাঁ ওই এসেছে।

[কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান আগুনে ঝলসানো মায়াকে কোলপাঁজা করিয়া এখানে আনিয়া গোলঘরের বেদীর উপর রাখিল]

জনার্দ্দন ॥ একী।

পার্ব্বতী ॥ মায়া। তুই।

[পার্ব্বতী ছুটিয়া মায়ার কাছে গেল। লালমিয়াও]।

মায়া ॥ মা, একটু জল। আমায় একটু জল দাও মা।

কণক ॥ আনছি—আমি আনছি।

[কণক জল আনিতে ছুটিয়া গেল]

পার্ব্বতী ॥ (জনার্দ্দনের প্রতি) ওগো, দ্যাখো এসে। আমার মেয়ের সারা শরীর আগুনে ঝলসে গেছে। (মায়ার প্রতি) এ দশা তোর কে করলো মা?

[জনার্দ্দন রুদ্রমূর্ত্তিতে চকিতে ইব্রাহিমের নিকট ছুটিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—]

জনার্দ্দন ॥ তুমি।

[লালমিঞা মায়ার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিতার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকাইল]

লালমিঞা ॥ তুমি?

মায়া ॥ (মরিয়া হইয়া চীৎকার করিয়া) না, না, ও নয়। ওর দলেরও কেউ নয়।

জনার্দ্দন ॥ (ইব্রাহিমের হাত ছাড়িয়া দিয়া) কে? তবে কে?

[কণক জল লইয়া আসিয়া মায়াকে জল পান করিতে দিল]

মায়া ॥ বলছি।

[মায়া জল পান করিতে লাগিল। নিস্তব্ধতা]

মায়া ॥ আরো দাও—আরো—

[কণক পুনরায় জল দিল। মায়া তা' পান করিতে লাগিল। সকলে চঞ্চল কিন্তু নিস্তব্ধ]

মায়া ॥ জলে গেল। আমার গোটা শরীর জলে গেল।

জনার্দ্দন ॥ তুই আমায় বল, কার জন্যে তোর এই দশা।

মায়া ॥ হারাণ—হারাণ—তোমাদেরই হারাণ···

জনার্দ্দন ॥ হারাণ। কী বলছিস্ তুই মায়া,—হারাণ।

মায়া ॥ হারাণ—শয়তান—কিন্তু আমি আর পারছি না—। মা। আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।

কণক ॥ লাল, তুমি আর জ্যাঠাইমা ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

[কণক ছুটিয়া চলিয়া গেল। পার্ব্বতীর সাহায্যে লালমিঞা মায়াকে কোলপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল পার্ব্বতী। সকলের দৃষ্টি যখন সেদিকে নিবদ্ধ, সেই সময়ে দেখা গেল, হারাণকে ধরিয়া লইয়া কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, ইব্রাহিম তাহা দেখিল]

জনার্দ্দন ॥ (গম্যমানা মায়ার উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া) হারাণ। হারাণের জন্যে তোর এই দশা। কিন্তু কী করে তা' সম্ভব হয়?

ইব্রাহিম ॥ কী করে তা' হলো, সেটা হারাণ নিজেই বলুক।

[হারাণের সম্মুখে গিয়া ইব্রাহিম দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বস্থ এক যুবকের কটিদেশে রক্ষিত একটি ছোরা চট করিয়া তুলিয়া লইয়া তাহা নাচাইতে নাচাইতে ইব্রাহিম বলিল,—]

ইব্রাহিম ॥ তোমার বাড়ি যখন আমরা আক্রমণ করি, তুমি ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। কিন্তু ঘরে তখন আগুন ধরেছে। আগুনের তাপ সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে তুমি দরজা

খুলে দাও ? আমরা লুঠের জন্যে তোমার ঘরে ঢুকে দেখি, তুমি একা নও, হাত-পা-মুখ বাঁধা একটি মেয়ে—মেঝেতে পড়ে আগুনের তাপে ছট্‌ফট্ করছে। মুখের বাঁধন খুলে দিতেই দেখি, সে আমাদের মায়া। তোমার সর্দ্দার জানতে চাইছেন, কী করে তা' সম্ভব হয়। বল।

হারাণ ॥ তুমি ওই ছুরিটা অমন করে আমার চোখের সামনে নাচিও না। ওটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আর এক গেলাস জল আমাকেও খেতে দাও আমি সব বলছি—সব বলবো।

ইব্রাহিম ॥ দাও—এক গ্লাস জল দাও।

[একজন ছুটিয়া গিয়া জল আনিয়া দিল। হারাণ তাহা পান করিল]।

ইব্রাহিম ॥ (ছুরিটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) বল। হাত বাঁধা, পা বাঁধা, মুখ বাঁধা মায়া—তোমার ঘরে কী করে তা' সম্ভব হয় ?

হারাণ ॥ টাকায় সবই সম্ভব হয়। আমি টাকা খেয়েছিলাম।

ইব্রাহিম ॥ কার টাকা ?

হারাণ ॥ দুনিয়ার বন্ধু দীনবন্ধু চৌধুরীর।

ইব্রাহিম ॥ আশ্চর্য্য হচ্ছি না। কিন্তু মতলবটা জানতে চাই। মায়াকে সে চেয়েছিল ?

হারাণ ॥ না।

ইব্রাহিম ॥ তবে ?

হারাণ ॥ কেন, জানো না ? একগোছা কঞ্চি—অতো বড়ো জোয়ান তুমি,—একসঙ্গে ভাঙতে পারো ? পারো না। গোছাটা দু'ভাগ করে ফ্যালো। আমার মতো কমজোরী মানুষও তা' টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। ওঁরা বুঝেছিলেন, তোমাদের ষ্ট্রাইক বন্ধ করতে আর কোন পথ ছিল না। ছিল এই একটি মাত্র পথ। মায়াকে সরিয়ে ফেলে দুই দলে একটা দাঙ্গা বাধানো। তাই আমাদের কয়েকজনকে টাকা খাইয়ে হাত করে—মায়ের কলিক্ হয়েছে বলে মেয়েকে থিয়েটার থেকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন নিজের মোটরে, যে মোটরে রুমালে ক্লোরোফর্ম্ম মাখিয়ে লুকিয়ে বসেছিলাম আমি।

[এমন সময়ে দূরে ফ্যাক্টরীর ভোঁ বাজিয়া উঠিল]

ইব্রাহিম ॥ (জনার্দ্দনকে) সর্দ্দার। কারখানার ভোঁ বাজছে। তোমাদের কাজে যাবার সময় হলো।

[জনার্দ্দন ধীরে ধীরে ইব্রাহিমের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হঠাৎ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,]—

জনার্দ্দন ॥ ইব্রাহিম! ভাই আমার! আমাকে ক্ষমা কর্। চল্—আমরা গিয়ে বলি, দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান্ নয়, বৌদ্ধ নয়—দুনিয়া শুধু দুটো জাত—ধনিক আর শ্রমিক। আমরা সেই শ্রমিক। এ দু'জাতই পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বেশ বেঁচে থাকতে পারে,—যদি অন্যায় না হয়,—যদি জুলুম না হয়। বাড়তি কাজের জন্যে মজুরী চাই। না পেলে কাজে আমরা যাবো না।

ইব্রাহিম ॥ তুমি আমাদের সর্দ্দার,—যা বলতে হয়, গিয়ে তুমি বল। আমি চললাম—মায়াকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তারও আগে আর একটা কাজ আছে। (হারাণের উদ্দেশ্যে) তুই দালাল,—তুই কুত্তা—তোর গায়ে হাত দোব না—তোকে ছোঁব না। তোর মুখে থুতু দোব।

[ইব্রাহিম হারণের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল]।

॥ যবনিকা ॥

চির নূতনেরে দিল ডাক : পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ

পুরুষ আকাশ আর বণিতা পৃথিবী
জন্ম দিল কি আশ্চর্য সূর্যদিন—পঁচিশে বৈশাখ!
সব আলো, সব প্রেম, সব সুর হয়ে যায় কবি—
হৃদয়ের সব গান, সব কথা বাজায় তো এষণার শাঁখ।

পঁচিশে বৈশাখ যেন কলকণ্ঠ পাখী—
নিরুদ্ধ বুকের বার্তা নিয়ে যায় দূরের ক্লান্তিতে।
সূর্যের পৌরুষ থেকে রূপ নিয়ে সে প্রেমিক পাখী
স্রোতবতী প্রেম দিল উজ্জীবন্ত সোনালী শান্তিতে।

পঁচিশে বৈশাখ যেন বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রে বন্দর—
যে নৌকা হারালো পাল, যে জাহাজে ভেঙে গেছে হাল।
সে বন্দরে তারা পেল বাঁচার মন্তর—
প্রথম শপথ পেল পার হতে ঝঞ্ঝামন্দ্র সমুদ্র উত্তাল।

পঁচিশে বৈশাখ যেন শান্তবীথি আশ্রয়ের নীড়।
যে চড়াই ডানা ভাঙে শ্রাবণের বৃষ্টির বল্লমে,
শিকারী রোদের তীরে যে পাখীর পরমায়ু কমে—
মায়ের কোলের মত সে নীড়েতে সব পাখী করে আসে ভীড়।

পঁচিশে বৈশাখ যেন কলস্বনা নদী—
দিকে দিকে, দেশে দেশে নিয়ে যায় রাখীর ঘোষণা,
দিগন্তে ছড়িয়ে যায় বাউল বাসনা—
শুধু শূণ্য উচ্ছ্বাসের বার্তা নয়, সে নদী যে আবেগের
শান্ত রোধবতী।

পঁচিশে বৈশাখ এক প্রেমিক কৃষক,
বুকে বুকে বুনে যায় মুঠো মুঠো প্রাণেদের বীজ,
প্রাণে প্রাণে বুনে যায় মুঠো মুঠো মিলনের বীজ,
মিলনে মিলনে বোনে মুঠো মুঠো শপথের বীজ,
শপথে শপথে বোনে মুঠো মুঠো মঙ্গলের বীজ,
শষ্য যার ভাগ করে নিয়ে যাবে অনাগত মাস-বর্ষ-শক।
পঁচিশে বৈশাখ এক প্রেমিক কৃষক॥

ইন্দিরা গুহ

তোমার আসন শূণ্য আজি
হে বীর পূর্ণ করো।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'

অধ্যাপক হরনাথ পাল

'রাজা' নাটককে কেহ কেহ তত্ত্বরসের নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সকল নাটক, উপন্যাস, কাব্যেই লেখকের বিশেষ একটি বলিবার কথা থাকে। উহাকেই সাধারণ অর্থে তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। এ অবস্থায় রাজাকে তত্ত্বরসের নাটক বলায় ইহার প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ কোন বিশেষত্বের কথা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে না। এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বহু সমস্যামথিত জীবনের যে কোন একটি সাধারণ তত্ত্ব মাত্রই নয়। একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ব্যাপারকেই এই রূপের আধারে তিনি পরিবেশন করিয়াছেন। সেই আধ্যাত্মিক প্রকাশকে ইংরেজীর religious doctrine, religious theory প্রভৃতি কথার দৃষ্টান্তে তত্ত্বের সামিল মনে করা যুক্তিসংগত কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। যে অর্থে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব পদাবলী এক নয়, সেই অর্থেই কোন বিশিষ্ট ধর্মীয় তত্ত্ব এবং 'রাজা' নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা এক নয়। অর্থাৎ, ভগবান সম্বন্ধীয় হইলেও ধর্ম-তত্ত্বই ইহার মূল নয়। এই নাটকের যে প্রেরণা, উহা কখনই শুধু তত্ত্বের আকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। উহার মধ্যে তত্ত্বাতিরিক্ত এক গভীর সত্যের ছায়ামূর্তি জাগিয়া উঠিতে বাধ্য। ছায়াময় হইলেও সেই সত্যটুকু চিন্তাসিদ্ধ যে-কোন তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি[১] 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'র যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক পিপাসা জাগিয়াছিল। কবির কাব্য-বীণার তন্ত্রীতে এইকালে যে-সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্ববর্তী মননধর্মী আধ্যাত্মিকতার সংগে উহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। কবির দৃষ্টিতে এখন কেবল মনের অনুশাসন নয়, হৃদয়ের সৌম্য শান্ত মধুরতাও এক নবীন পরমার্থ মহিমা দান করিয়াছে। কবির দৃষ্টি এখন অন্তঃচারী, হৃদয়-পারাবারের তটে উপলখণ্ড আহরণে উহা ব্যাপৃত। সেই তন্ময় বিভোর ক্ষণের পরম স্ফূর্তি ঘটিয়াছে 'ডাকঘর' ও 'রাজা' নাটক দুটিতেও। বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ পরিবেশের মধ্যে জন্ম বলিয়াই তত্ত্বরসাশ্রিত নাটক বলিলে ইহাদের আসল লক্ষ্যই যেন অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের মতে এই ধরণের সৃষ্টিকে যে কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করিতে যাওয়াতেই বিপদ আছে। তবু শ্রেণীগত নামকরণ যদি কিছু করিতেই হয় তাহা হইলে, ইহাদিগকে অরূপ-রসের নাটক বলাই নিরাপদ। তাহাতে আর কিছু না হউক, অন্তত পক্ষে কবি-দৃষ্টির অতীন্দ্রিয় প্রীতি-বিভোরতার লক্ষণটি সূচিত হইতে পারিবে এবং ইহারা রবীন্দ্রনাথের অপর সকল নাটক অপেক্ষা যে বৈলক্ষণ্য-যুক্ত তাহাও বুঝা যাইবে। অবশ্য সাধারণভাবে এই শ্রেণীর নাটককে প্রতীকী বা সাংকেতিক নাটক বলাই সংগত।

এখানে প্রসংগক্রমে আর একটি কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয় সাধনার ইংগিত করিয়াছেন বলিয়া বহু সমালোচকই এই কবি-দৃষ্টিকে মিষ্টিক আখ্যা দান করিয়াছেন। এমন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় অভিনবই বটে। শুধু এই নাটকে বলিয়াই নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিকে আধ্যাত্মিক আকুলতা ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়াছে এবং তাহাতে করিয়া তিনি আপন সৃষ্টির মধ্যে পরপারের আলোর আভাস দান করিতে প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছেন, এ কথা খুবই সত্য। তথাপি ধর্মীয় চেতনার আবেশে যে একক পথে অভিসার করিয়া পরম সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হয় এবং তাঁহারই ধ্যানে বিভোর হইয়া সকল চিন্তা, সকল যুক্তি, সর্ব সংস্কার ত্যাগ করিয়া এক তুরীয় আনন্দের বশে শিশুর ন্যায় আত্মভোলা হইতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক পিপাসায় তেমন অবশে আত্মত্যাগ বাসনা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার অতি-জাগ্রত আত্ম-চেতনা, তীক্ষ্ণ মননশীলতা কোন বস্তুর কাছেই অতি নিবিড়ভাবে আত্মদানে তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারে নাই,—এমন কি সেই ধর্মীয় উৎকণ্ঠার কাছেও নয়। বাস্তবকে অবাস্তব সুষমামণ্ডিত করায় বা সীমার মধ্যে অসীমের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিবার ভিতরেই কিছু মিষ্টিকতা থাকে না। সকল সাহিত্যিকের নয়নেই যে মোহাঞ্জন থাকে তাহাতেই ঐ কার্য অতি সহজ এবং উহার প্রকাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু কবি তখনই মিষ্টিক হন, যখন বাস্তবকে কেবলমাত্র আদর্শায়িত করিয়াই সন্তুষ্টি না মানিয়া অন্তরের গহন গভীরে এক দিব্য চেতনার আবেশে বাস্তব ও আদর্শকে সমভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া সুনিবিড় প্রত্যয়ানন্দে তিনি বিভোর হইয়া পড়েন। অনুভূতির যে ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠার

১। দ্রষ্টব্য : 'রাজা' নাটকের কাহিনী-কথা; সোনারবাংলা, ঊনবিংশ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা।

তীব্রতা ও একাগ্রতা মরমী সাধকের প্রধান অবলম্বন,—যাহার ফলে শুধু মুখেই বলা নয়, অন্তরের অন্তস্তলেও অনুভব করিতে হয়। এক সুতীব্র বিরহ বেদনা,—'রাজা' নাটকের আধ্যাত্মিক কামনায় মর্ম-মথিত সেই বেদনার সুর বাজিয়া উঠে নাই। সাধক-প্রাণের প্রবল নিষ্ঠা ও গভীর আকুতির চাইতে মানস্ পরিচর্যার অনন্ত লীলাই রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রেরণার মূলেও আধিপত্য করিয়াছে। তাঁর অধিকাংশ কাব্যে এবং 'ডাকঘর' ও 'রাজা' নাটকে একটি মরমী ভঙ্গী আছে বটে, সত্যকারের মরমী কবির অন্তরের দরদ-মিশ্রিত ব্যাকুলতা নাই। ইহারও কারণ, আগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই। কোন অবস্থাতেই কবির অহংমুক্তি বা সাহিত্যিক সংস্কার-মুক্তি ঘটে নাই। আলোচ্য নাটকের রস ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, এখানেও দেখা যায় রস-নির্মাতা একমাত্র প্রাণই নহে, প্রাণের উপরে বুদ্ধির যুক্তিপন্থা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণের মর্ম-কোষ হইতে এ রস উৎসারিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত সরিৎ নির্মাণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ইচ্ছা করিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম না। তাঁহার মিষ্টিক ভাবনার পরিচয় ও প্রকাশ যাহা দেখি তাহা, ঐ গানগুলির মধ্যেই।

ধর্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিষ্ণুতা অসীম। কোন একটি মাত্র পথকে বাছিয়া লইয়া এ দেশে কখনও চূড়ান্ত বলিয়া রায় দেওয়া হয় নাই। এখানকার ধর্মীয় ইতিহাসের সীমানায় বিচিত্র মত ও পথেরই সমন্বয় হইয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম সম্বন্ধীয় এই উদারতার ভাবটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকে সেই 'যত মত তত পথ'এর সিদ্ধান্তটিকে, 'Soul's eternal quest for God'কে নাট্যরূপে দান করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাসের প্রকাশ থাকায়, ভাব ও রূপ, উভয় দিক হইতেই ইহার অনুপমতা শত গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

'রাজা' নাটকের কাহিনী সুদর্শনার দ্বন্দ্বময় জীবনের বিকাশ ও পরিণতির কথাতে পূর্ণ এবং সেই হিসাবে সুদর্শনাই ইহার প্রধান চরিত্র। কিন্তু, আর একটি চরিত্রের জীবন-পরিণতি অঙ্কিত করিবার দিকেও নাট্যকারের আগ্রহ কম নয়। উহা কাঞ্চীরাজের চরিত্র। এই কারণেই, নাটকীয় কাহিনীতে আমরা দুইটি প্রধান ধারার সাক্ষাৎ পাই। একটিতে আছে, রাজা ও সুদর্শনার অন্তর্জীবনের কথা; অপরটিতে রাজা ও সুদর্শনার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, উহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে কাঞ্চীরাজ, সুবর্ণ ও অন্যান্য বিদ্রোহী রাজাদের কথা। সুরু হইতেই রাণীর জীবন-বিকাশমূলক মূল ধারাটির পাশাপাশি কাঞ্চীরাজকে অবলম্বন করিয়া ঐ অপর ধারাটিও সমান বেগে ও শক্তিতে বহিয়া চলিয়া অবশেষে নাটকটি শেষ হইবার মুখে পুনরায় দুইটি ধারা একত্র মিলিত হইয়াছে। সুদর্শনার জীবনের ঘটনাপুঞ্জ যেমন নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কাঞ্চীরাজের জীবনবোধ ও উহার পরিণাম চিত্রটিও তেমনি অতি-কৌশলে সুনির্বাচিত কয়েকটি মাত্র দৃশ্য ও ঘটনার সাহায্যে নাট্যকার পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ঊনবিংশ দৃশ্যে রাণীর উক্তিতে আমাদের মন্তব্যের সমর্থন মিলিবে। কাঞ্চীরাজকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ,—আমরা দুজন তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভ যোগ হ'য়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।" এক কথায়, এই নাটক প্রধানত এই দুইটি চরিত্রেরই দুই ভিন্ন পথে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের দৃশ্যরূপ। তথাপি অপর চরিত্রগুলির গুরুত্বকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কোন একটি দিক হইতে মাত্র নয়, বিভিন্ন দিক হইতে জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক দেখানোই আলোচ্য নাটকের উদ্দেশ্য। রাজা ভগবান। তাঁহার সঙ্গে-নাটকস্থ সকল পাত্রপাত্রীর ব্যবহারের আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মিলন-বিরহের যোগাযোগ দেখাইয়া বিভিন্ন মত ও পথের, সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে।

সুদর্শনা রাজার বিবাহিতা পত্নী। উভয়ের মধ্যে প্রেমের মধুর সম্পর্ক। তবু মিলনের মাঝখানে গভীর অন্তরায়—'মাঝখানেতে প্রেমের নদী দুই পারেতে দুইজন'। বাহ্য-প্রকৃতির রূপরস-গন্ধ-গীতে রাজার স্পর্শ রাণী পান বটে, কিন্তু, কোন একটি বিশিষ্ট মূর্তিতে রাজাকে না পাইলে তাঁহার সঙ্গে নাটকস্থ সকল পাত্রপাত্রীর ব্যবহারের আদান-না। সেই কারণেই রাণীর ক্ষোভ। একদিন মানস-সুন্দরীকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বয়ং কবি যাহা বলিয়াছিলেন অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে ভিন্ন ভাষায় তিনিও যেন রাজার কাছে বার-বার তেমন প্রার্থনাই জানাইয়াছেন। রাণী ভাবের ভাবুক নহেন, তিনি রূপের পূজারী বাহিরে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতারই রূপ বিভূতি ছড়াইয়া রহিয়াছে। আনন্দ-রূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি,—যা কিছু প্রকাশ পাইতেছে সকলই বিশ্বদেবতার আনন্দ-রূপ, অমৃত-রূপ। যাহার দৃষ্টি আছে সে ঐ রূপ-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়াই রূপাতীতের আভাস পায়, সৎ-চিৎ-আনন্দকে দেখে। কিন্তু, সেই দৃষ্টি

হয় রীতিমত সাধনাসাপেক্ষ, নয়, সহজ প্রত্যয়নির্ভর। সাধনার দ্বারা সেই দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছে সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা। আর, শম্ভু, সুধন, জনার্দন, মাধব, কুম্ভ প্রভৃতি সহজ বিশ্বাসের বলেই উহা পাইয়াছিল। শম্ভু-সুধনরা বুঝিয়াছিল, 'জগতের বিচিত্র শক্তির মধ্যে যিনি নিয়মস্বরূপ তাহারই নাম শান্তম্', এবং কোন বিচার বিশ্লেষণের ধার না ধারিয়া ঐ শান্তম্‌কে গড় করিয়াই তাহাদের মত সাধারণ মানুষ সংসারের অতীতলোকে শিবম্ এবং অদ্বৈতমেরও সাক্ষাৎ পাইতে চাহে এবং পাইয়াও থাকে। জনার্দন বলিয়াছে,—"কিন্তু, এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।" আবার মাধবের মুখে শুনিতে পাই,—"আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব।" এই সকল কথাবার্তার ভিতর দিয়া সাধারণ লোকের ভগবান-বিশ্বাসের প্রকৃতিটি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাণীর রাজা সম্বন্ধীয় ধারণায় এমন সহজ সরলতাও যেমন নাই আবার তেমনি ঠাকুরদা সুরঙ্গমার ভাব-গভীরতাও নাই। তাঁহার যতটুকু যাহা উপলব্ধি তার মূলে রহিয়াছে তাঁহার খেয়ালি মন,—সেই মন পূর্বে কখনও কোন সাধন পথের অনুসরণ করে নাই। তাই মত ও পথের বিরোধ তাঁহার ঘোচে নাই। তিনি শুধু রূপকে দেখিয়াই চঞ্চল হইয়াছেন, আনন্দকে দেখিয়া আত্মহারা হইতে পারেন নাই। সেইজন্যই রূপ তাঁহার পায়ের বেড়ি হইয়াছে।

রাজাকে অন্ধকার কক্ষের রাজা রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কারণ, যে আলোক সকল জ্যোতির জ্যোতি তাহা অন্ধকারের স্তরে স্তরেই গুপ্তভাবে অবস্থান করে এবং একমাত্র অন্তরের নিভৃত সাধনার দ্বারাই সেই জ্যোতিষাং জ্যোতিকে লাভ করিতে হয়। হৃদয়ের ধন যাহা তাহাকে হৃদয়পুরীর অন্ধকার কক্ষকোণেই প্রথমে চিনিয়া লইবার প্রয়োজন। অতঃপর আসিবে বাহিরে, সকলের মাঝে তাহাকে দেখিবার পালা। পদাবলীর একটি প্রসিদ্ধ চরণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে,—"হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল, দেখিতে পাইনু সে"। ইহাতে ঐ ভাবটি চমৎকারভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কবিতাতেও এই ভাবেরই বিকাশ দেখি,—

"অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

কিন্তু, রাণী অন্তরের সাধনা পূর্ণ না হইতেই রূপ-পিপাসায় অধীর হইয়া বাহিরে রূপ-মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছেন। রাজাকে অন্তরে পান নাই, তাই বাহিরেও তিনি তাঁহার পক্ষে সত্য হইয়া উঠেন নাই। রাণীর প্রাণের দৃষ্টি ও চোখের দৃষ্টির বিরোধ ঘোচে নাই বলিয়াই সুবর্ণের দেওয়া মালা পরিয়া তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে হইল। রাজাকে তখন সান্ত্বনার ছলে বলিতে হয়,—"ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।" রাণীর দৃষ্টি কত সংকীর্ণ এই উক্তির মধ্যেই তার প্রমাণ রহিয়াছে। রূপ মোহই তাঁহাকে পদে পদে এমন করিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে; সাপের লেজে বিষের ন্যায় উহা কিছুতেই নিঃশেষ হইতেছে না। চতুর্দিক হইতেই বিপদ যখন ঘিরিয়া ধরিয়াছে, দেহ-আত্মার যখন অত্যন্ত বিচলিত বিমূঢ় অবস্থা, তখনও তাঁহার মুখে শুনি,—"রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন শুদ্ধ ঝলমল করছে।" এই রূপ-পরবশ্যতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া যখন তিনি বলেন,—"আমাকে বাহিরে লইয়া চলো, আলোয় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে"—তখন সেই প্রার্থনার মধ্যে কোন লুকাচুরির লেশ নাই। ইহা রাণীর রূপ-পিপাসু আত্মারই কামনা।

রাণীর এই অভিলাষকে রাজা দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। তাই তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া তিনি বলিলেন,—"আগে তোমার অন্ধকারের সাধনা সমাপ্ত হোক, নতুবা তুমি ভুল করিয়া বসিবে।" সে ভুল যে বড় সোজা ভুল নয়। জীবনসায়াহ্নে এই ভুলের জন্যই অনুতাপ করিতে হইতে পারে,—

শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা খসে যায় পড়ি,
নাহি বাজে আর হরিনাম গান বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণনীরে।

অন্তরের নিভৃত সাধনার শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহু স্থলে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া নিম্নে এরূপ দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশ পথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জ্বেলে তোল। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর

আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নিরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দ মূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। প্রেম যে আমি 'আমি' হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরছি সেদিন সেই বিরহ দুঃখের রহস্য এক মুহূর্তেই ফাঁস হয়ে যাবে।"

অপরটিতে আছে,—

"প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।...এই অনন্ত ঐশ্বর্য-সমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য কার আছে? ঐশ্বর্যের তো অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেই জন্য ও পথে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেই জন্যই মানুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে বলতে থাকে—ঈশ্বর নেই, কেবলি এই আছে, এবং এই আছে; আর আছে এবং আরো আছে।...এই জন্যই জগতের সমস্ত ধর্ম-সাধকেরা বারংবার বলেছেন ঐশ্বর্য পথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বর দর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলি ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।"

প্রথম দৃশ্যে রাজা ও সুরঙ্গমার কথোপকথনের মধ্যেও এই ভাব-সত্যটির প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে।—

রাজা। রাণী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে-লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে। সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁধা লাগবে না?

রাজা। রাণীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে। তুমি আমার তেমন রাজা নও। রাণী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

সুরঙ্গমার গানটির মধ্যেও এই একই ভাবের দ্যোতনা লক্ষ্য করা যাইবে। দ্বিতীয় দৃশ্যের বাউল দলের গানটির মূল ব্যঞ্জনা ইহাই,—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে।"

অথচ মজা এই, এত বুদ্ধ-প্রবোধ সত্ত্বেও, হতভাগিনী রাণী ঐশ্বর্য পথের যাত্রাকেই শ্রেয় মনে করিলেন। তাই তো তিনি প্রেমের প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে বিচ্যুত হইলেন। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে নকল রাজাকেই সুবর্ণ) আসল বলিয়া ভুল করিলেন। ফলে যে-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুকের মাঝখানটিতে কেবল তাঁহারই জন্য নির্মিত হইয়াছিল, অসার আত্মম্ভরিতা সেই নিজ বাসভূমি হইতে অপসারিত করিয়া বহুদূরে পিত্রালয়ের নির্বাসিত জীবনে তাঁহাকে উপনীত করিল। এই সংসারে জীবাত্মার জন্য ঐ দুইটি ঘরেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে। নিজের কামনা বাসনা, ইচ্ছার সঙ্গে যাহারা ভগবানের মহত্তর উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে তাহারা মাটির ঘরের অধিবাসী হইয়া ধূলির মাঝে স্বর্ণরেণু, বিশ্ব-সংসারকে দেখে অনুপম সুন্দর। আর, যাহাদের সেই সামঞ্জস্যবোধ নাই তাহাদের আশ্রয় পিত্রালয়ের নির্বাসন জীবনে। সেখানে মৃন্ময়ে চিন্ময় আভাস নাই, বস্তুতে বস্তুর অতীত কোন মহিমার আলোক-বিচ্ছুরণ হয় না। ঐ অবস্থায় লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি জীবনকে লইয়া টানা-হেঁচড়া সুরু করিয়া দেয়, জীবনের ভাগাড়ে দেখা দেয় যত শকুনির আনাগোনা। করভোদ্যানের অগ্নি-কাণ্ড দেখিবার পর রাণী রাজাকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই মর্যাদা হইতে স্খলিত তাঁহার দুঃখময় জীবনের গ্লানি অসীম বেদনাময় ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরিনে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা!" সুদর্শনার পিতার উক্তিতেও তাঁহার ভাবী জীবনের দুঃখ-দুর্দশার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে,—"নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে যে ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি (মন্ত্রী) জান না আমার এই কন্যাকে আমি কী ভয় করছি—সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।"

এই নিরাশার নিরন্ধ্র অন্ধকারেও আশার কথা এই যে,

রাণী রাজার "আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।" অতএব রাণীর জীবন নিপীড়ন নির্যাতনের মাধুর্যহীনতায় নিঃশেষিত হইতে পারে না। রাজার হৃদয়ে রাণী যে তাঁহার দ্বিতীয়! তাই শত ভুলে, শত অপরাধেও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকা তো রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। রাণীকে ছাড়া তাঁহার লীলাই যে অচল। সুতরাং নিজের প্রেম দিয়া তিনি নানা আভাসে ইঙ্গিতে রাণীর প্রেমকে, তাঁহার ইচ্ছাকে,—"সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া,"—জাগাইয়া তুলিলেন নিজেরই গরজে। তখন সেই একের প্রেমে রাণীর সর্ব প্রেমতৃষা নিবৃত্ত হইল, অরূপের অনুপম সৌন্দর্যধ্যানে সকল বিচ্ছিন্ন রূপ-লালসা বিলীন হইয়া গেল। সুদর্শনা বিচ্ছেদের চড়াই উতরাই অতিক্রম করিয়া প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছিলেন এবং সংশয়মুক্ত চিত্তে উপলব্ধি করিতে পারিলেন, —"তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধূলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন।" এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই হইয়াছে রাণীর যাত্রাশেষের মঙ্গলাচরণ। সুরঙ্গমা একটি গানের শেষ কয়টি কলিতে এই সুরেরই মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে—

হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি ঘুচিল রে অভিমান।

বিচ্ছেদ মিলনের পরপারে নির্বিরোধ আনন্দসত্তায় ডুবিয়া গিয়া সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের সুরে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া রাণী তখন বলিতে পারেন,—"আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।" রাণীর জীবনে এই উপলব্ধিটুকুরই প্রয়োজন ছিল। দুঃখের ভিতর দিয়া নানা ভুল ভ্রান্তির পথে সেইমাত্র সেই উপলব্ধি সম্পূর্ণ হইল অমনি অন্ধকার কক্ষের লীলার আর কোন আবশ্যকতা রহিল না। রাজা স্বয়ং রাণীর হাত ধরিয়া বাহিরের আলোর রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেমের মিলন সার্থক হইল। নাটকেরও যবনিকা পড়িল সেইখানটিতে।

জীবাত্মার জীবন-নাট্যের এই ক্রমবিকাশের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়া-লোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে কত আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে, কত বিস্তারের মধ্য দিয়ে, ছোট বড় কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী সমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলচে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহঙ্কারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায়, ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করচে।"

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বে এবং এই নাটকের রাজা-রাণী তত্ত্বে আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু সেই মিল যতখানি বহিরঙ্গের ততখানি অন্তরঙ্গ-ঘটিত নয়। আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা এবং রস-প্রমূর্ত্তির নিবিড়তার দিক হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে যাহা পাওয়া গিয়াছে, এখানে সে রস সেভাবে পাওয়া যায় না। পাইবার কথাও নয়। দুইটি কাহিনীর পার্থক্য হইতেই যে এরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মনে করিবারও কোন কারণ দেখি না। দুই ভিন্ন ভাবুকতার মধ্যেই এই পার্থক্যের মূল নিহিত রহিয়াছে। সাধক-কবির অন্তরের ধ্যান-কল্পিত ভগবৎ তত্ত্বই পদ-সাহিত্যে বাণী-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভাব-বিভোরতার এক তন্ময় মুহূর্ত্তে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মুকুরে সত্যের যে প্রতিভাস পড়িয়াছিল তাহাকে কলা-কুশলতার অপূর্ব বিন্যাসে তিনি রাজা-রাণীর প্রেম-চিত্রের রূপকে এই নাটকের আধারে ধরিয়া দিয়াছেন। ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যের উপজীব্য মধুর-রস হইতে এই নাট্য-কাব্যের রস আবেগের আকুলতা এবং অখণ্ডতার বিচারে অনেকখানি স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

সুরঙ্গমা রাজার দাসী। যুক্তি তর্ক, বিচার বিশ্লেষণ, মান অভিমানের বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নিঃশেষে রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতেই তাহার এই পরিচয় আমরা পাইতেছি। প্রথম যৌবনের উন্মাদনাময় মুহূর্তে উচ্ছৃঙ্খলতাকেই যখন অগ্রগতির অবধারিত লক্ষণ বলিয়া মনে হইয়া থাকে, মনের সেই সংশয়াচ্ছন্ন অবস্থায় সে-ও অবশ্য রাণীর মতই রাজাকে ভুল বুঝিয়াছিল। তাই নির্ভরতার শিক্ষা তাহার সহজেই হইল। এক দুঃখাগ্নির দহনে শ্যামিকা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়া-

ছিল। তাই নির্ভরতার শিক্ষা তাহার সহজেই হইল। এক ভয়াল দুর্যোগ দিনে রাজার অবিচলিত নিষ্ঠুরতার কাছে নির্বিরোধে সে আত্মসমর্পণ করিল। পূর্ব জীবনের সুকৃতি ছাড়া এমন হইবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার একটু আভাস দিলে পারিতেন। সেই হিসাবে সুরঙ্গমার জীবনের পট-পরিবর্তন অস্বাভাবিক ও আকস্মিকতা দোষ-দুষ্ট হইয়াছে। তাহার মনের ঋতু-বদলের কথা আমরা জানিতে পারি রাণীর সঙ্গে তাহার কথোপকথন হইতে।—

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কি মনে হত।

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর। কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা।

সুদর্শনা। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হোল কী করে?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

সুরঙ্গমার আর একটি উক্তিতে উহার পরের অবস্থার পরিচয় রহিয়াছে,—

"তারপরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকাল বেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয় এই আমার ঢের—আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।"

সুরঙ্গমা চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ইহার মধ্যে,—দাস্যভাবের চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এখানে। রাজার মুখের দিকে পর্যন্ত সে তাকায় না, তাঁহার পায়ের তলার মাটিই তাহার স্বর্গ, তাহার সকল কামনার বাড়া ধন। তাহার মনে অনুতাপ অনুশোচনার লেশমাত্রও নাই। স্থির, ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে অন্তরের ধ্রুব সত্যকে সে পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে। সুদর্শনার সঙ্গে এখানেই তাহার বৈসাদৃশ্য। দুইজন দুই ভিন্ন পথের পথিক। একজন মধুর ভাব সাধনায় ব্রতী হইয়া পতিরূপে ভগবানকে কামনা করিয়াছেন এবং মান অভিমান আশা নিরাশার নাগর-দোলায় দুলিতে দুলিতে শেষে পথের দিশা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অন্যজন সর্ব সংস্কার-মুক্ত হইয়া অনাথের নাথকেই পরম নির্ভর জানিয়া তাঁহারই শরণ লইয়াছে। সুরঙ্গমার দুইটি গানে তাহার নিজ মনোভাব ভক্তজনসুলভ আকুলতায় মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এখানে উহাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালবাসি।
গুণ যদি মোর থাকত তবে,
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যে কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।

দ্বিতীয় গানটিতে শুনিতে পাই,—

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ।
কঠিন করে চরণ 'পরে
প্রণতি করো মন।

ভগবানের প্রতি এইরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা লইয়া সুরঙ্গমা শুধু আপন আত্মার মুক্তি কামনায়ই অধীর হইয়া উঠে নাই। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, জীবের চরম দুঃখের দিনে, তাহার ভুলে-ভরা পথ চলার অশুভ ক্ষণে করুণাময় ভগবানই তাহাকে নীরব সঙ্গ দান করিয়া থাকেন এবং পতনের পঙ্কিল আবর্ত হইতে উদ্ধার করিতে যাইয়া তাহার কাদা-ধূলি পরম স্নেহে আপনার গায়ে মাখিয়া লন। এই জ্ঞান সুরঙ্গমার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও উদার করিয়া তুলিয়াছিল। রাণী যেদিন ঝড়ের বেগে বিপদের পথে একাকী বাহির হইয়া গেলেন সেদিন কোন্ আশায় সুরঙ্গমা তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে উহার কারণ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।—

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কী বলিস তুই? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা?

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন।

ইহার সঙ্গের যে গানটি উহার মধ্যেও এই ভাবের সুর অনুরণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা পরে আর এক স্থলেও করা হইয়াছে।—

সুদর্শনা। আমার জন্যে সেখান (অন্ধকারের আনন্দ-লোক) থেকে তুই কেন এলি।

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্যে।

সুরঙ্গমার প্রাণের আনন্দ তি সহজ প্রত্যয় ও অসীম পরিতৃপ্তির ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছায়ায় লালিত মানবতাবাদকে ভারতীয় উপনিষদ্ তত্ত্বের সাহায্যে সংশোধন করিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ উহার নবরূপ দান করিয়াছিলেন। ইহাকেই আমরা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জগৎ-ব্রহ্মবাদ নাম দিয়াছি। ঐ তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কবি-মানস শত বিচিত্র ভঙ্গিমায় সৌরভ ও সৌন্দর্য বিকীরণ করিয়াছে। সুরঙ্গমার যে প্রজ্ঞা-দৃষ্টির কথা এইমাত্র বলা হইল, উহার মধ্যেও রবীন্দ্র কবি-মানসের সেই বিশিষ্ট চেতনারই সাক্ষ্য পাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই দৃষ্টিরই অপর নাম মুক্তি। সুরঙ্গমা রাণীর অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া দিতে কম সাহায্য করে নাই। তাঁহার প্রিয়-মিলন সাধনায় সে-ই প্রথম হইতে শেষ অবধি পার্শ্বচারিণী রহিয়াছে। সুদর্শনা চরিত্রের যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় উহার হেতু নির্দেশও এখানে পাওয়া যাইবে। মধুর ভাবের সাধনা দিয়া সুদর্শনার জীবনের প্রথম পর্বের সূচনা। কিন্তু, সমাপ্তিতে মধুর ভাব ও দাস্য ভাবের ভেদ-রেখা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। প্রেম-ভক্তির দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। প্রেমের স্বভাব বিরহ-কল্পনা,—মিলন বিরহের বিচিত্র আবেগে অনুভূতিতে ধ্যানে কল্পনায় মুহুর্মুহু প্রাণ পুলকবিহ্বল ও শঙ্কিতত্রাস্ত হইয়া পড়ে। তাই প্রেমের রস গভীর ও চির নবীন। রাজার একটি কথার মধ্যে প্রেমের স্বরূপ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে,—"প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হাল্কা হয়ে যায়।" ভক্তির মধ্যে নিত্য নবীন সম্ভাবনার অবকাশ নাই। উহা যতটুকু জানা হইয়াছে, পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেই স্থির, অচঞ্চল,—পরিচয়ের মধ্যেও অপরিচয়ের রহস্যজনিত নূতনত্ব ইহাতে নাই। সেই কারণে, যুগে যুগে ভক্তি অপেক্ষা প্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। সুদর্শনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত ভক্তির সেই প্রাধান্য দেখানো হয় নাই। প্রিয়-মিলন সমাগমে যাইবার কালে ঠাকুরদা তাঁহাকে রাণীর সজ্জা আনিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি উত্তরে বলিলেন,—

> না না না। সে রাণীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তার দাসী —যে-কেউ তার আছে আমি আজ সকলের নিচে।

শেষ দৃশ্যের গোড়াতেও রাজার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিতে শুনি,—

> প্রভু, যে-আদর কেড়ে নিয়েছ সে-আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

সুরঙ্গমার সাহচর্যেই যে সুদর্শনার এই পরিবর্তন,—সুরঙ্গমাই যে রাণীকে জীবনের উপল বন্ধুর পথে পতনের হাত হইতে বাঁচাইয়া ক্রমে একটা স্থিতির মোড়ে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল সে কথা বলিলে একেবারে মিথ্যা বলা হইবে না। এই প্রসঙ্গে সুরঙ্গমা-ঠাকুরদার কথোপকথনের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিলেই আমাদের মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝা সহজ হইবে।

> সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।
>
> ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন।
>
> সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।
>
> ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনবেন।

আত্মশুদ্ধ সুদর্শনাই যে সেই কাঁটাবনের পার হইতে তুলিয়া-আনা পারিজাত সে-কথা বাহুল্য।

ঠাকুরদা চরিত্রের অবতারণা 'রাজা' নাটকেই প্রথম ও শেষ নয়। পূর্বে শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত এবং পরে অচলায়তন, পরিত্রাণ, মুক্তধারা, ফাল্গুনী, ডাকঘর প্রভৃতি নাটকে আমরা ঠাকুরদা অথবা অনুরূপ একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। সাধারণ নাটকীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই চরিত্রের অবতারণা। উপরি উক্ত প্রতিটি নাটকেই এইরূপ একটি চরিত্রের সাহায্যেই নাট্যকারের মূল অভিলাষ ও অভিসন্ধিটি প্রকাশ পাইয়াছে। কবির নিজস্ব চিন্তা, ভাব, ভাবনা যাহা নাটকীয় ঘটনা ধারার বাহ্য আবরণ তলে গোপন থাকিয়াও অন্তর্নিহিত আবেদনের সুরটিকে প্রধান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, ঐ চরিত্রগুলি তাহারই উপায় করিয়া দিয়াছে; কবির আপন মনোভাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই যেন করিয়াছে। আলোচ্য নাটকে ঠাকুরদা চরিত্রের ভূমিকায় আমরা অনুরূপ উদ্দেশ্যেরই অধিকতর সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করিতে পারিব।

ঠাকুরদা রাজার সখা। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যেমন প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে রাজার প্রতি ঠাকুরদারও তেমনি। রাজার সঙ্গে এই স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক তাহার দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে, সংসারের ক্ষুদ্র লাভলোকসানের প্রতি তাহাকে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। কবিকেশরীর একটি গানেই মধ্যে ঠাকুরদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে। নিচে উহার কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি,—

"যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদা)
যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদা)
যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদা।"

এমন হাস্য-রসিক, খোলা-প্রাণ, শিশুর ন্যায় সহজ, সরল, উদার স্বভাবের লোকের পক্ষেই সাজে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। এ বন্ধুত্বে প্রার্থনা-পূরণের লুকোচুরি নাই, স্বার্থ-সংঘাতের অনাবশ্যক বিড়ম্বনা নাই, আছে অবুঝ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোন্মাদনা। রাজাকে তাহার সকল দিয়া একান্ত করিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে বলিয়া দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের শোক-দুঃখ তাহাকে আর পীড়া দিতে পারে না। সুদর্শনাকে সে বলিয়াছে,—"চিনে নিয়েছি যে —সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" 'আমার খুব লেগেছে—তাধিন তাধিন' এবং 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'—এই গান দুইটির মধ্যেও তাহার মনের প্রশান্ত ভাবটি, প্রীতি-মগ্ন বিভোরতার সুরটি অনুরণিত হইয়াছে।

সখ্য-বন্ধনের এমনই দায় যে ঠাকুরদা স্বয়ং রাজার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্তি মানিতে পারে নাই। রাজার গুণ, গৌরব, মহিমা কীর্তিত করাই তার প্রতি মুহূর্তের কর্ম হইয়া উঠিয়াছে,—গানে, কথায়, আচার আচরণে, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, সে বন্ধুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াই চলিয়াছে। এই কারণে, তাহার ভূমিকা ছোট হইলেও, প্রয়োজনীয়তায় সামান্য নহে। প্রীতিকেই পাথেয় করিয়া পথের মোড়ে মোড়ে সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কত বিচিত্র পরিবেশ, কত ভিন্ন রুচি ও ভাবের লোকের মধ্যে অহরহ হইয়াছে তাহার আনাগোনা। পথের পথিক, আর রাজরাজড়া, সকলের সঙ্গেই তাহার সমান আত্মীয়তা। সকলকেই রাজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিকে সীমা হইতে অসীমের সৌন্দর্যে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানেই সংশয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ—সেখানেই তাহার আবির্ভাব। ঠাকুরদা চরিত্রের এই বিশেষ গুণটির ইঙ্গিত তাহার নিজেরই একটি গানের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। প্রথমে উহার কয়েকটি কলি উদ্ধার করিয়া, পরে অষ্টাদশ দৃশ্য হইতে তাহার একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করিতেছি।

গানটি,—

"যারা সোনার চোরাবালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাই রে নাইরে নাইরে না।"

উক্তিটি,—

"এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানাক্ষেত্রে নানা রকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের (বালকদল) ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল—রণক্ষেত্রেও মন্দ জমেনি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি।"

পাঠককে সেনাপতিরূপী ঠাকুরদার বিদ্রোহী রাজাদের যুদ্ধে আহবান করার দৃশ্যটিও এই সঙ্গে স্মরণ করিতে বলি। এই সমুদয় লক্ষণ হইতে অনায়াসেই বুঝা যায় যে ঠাকুরদা উদার চারিত্রিক গুণে এই নাটকে এক দুর্লভ মহিমা দান করিয়াছে। তাহার জ্ঞানও অসাধারণ। উহা পুঁথিগত বিদ্যার কচকচি নয়,' অনুভূতিতে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে যত জ্ঞানের কথা উচ্চারিত হইয়াছে এমন আর কাহারো মুখে শুনি না। তাহার গান যেমন গূঢ় তত্ত্বের বাহন, তাহার মুখের প্রতিটি কথাও তেমনি জ্ঞানের দীপ্তিতে ঝলমল। দীর্ঘভাষণ তাহার নয়, তবু প্রাণমনের মিলিত ঐশ্বর্যের গুণে ঐ স্বল্পাক্ষর কথাই বিদগ্ধতার মণি-ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি উক্তি নিচে উদ্ধার করিতেছি।—

"প্রজার মধ্যে যে-রাজটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলেও সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।"

"ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে।"

"বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয়।"

"তাঁর (ভগবানের) বাঁশি কারও বাজনা ছাপিয়ে ওঠে

না, তা না হলে লজ্জায় আর সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।"

এইরূপ উদ্ধৃতি আরও মেলাই তোলা যাইতে পারে, কিন্তু, তালিকা অনাবশ্যক দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টিতে উহারা আপনা হইতেই পড়িবে। সমবেতভাবে বিচার করিয়া ইহাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এ কথাই বলা যাইতে পারে যে, ঠাকুরদার প্রতিটি কথায় জ্ঞানদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার অদ্ভুত মিলন ঘটিয়াছে। তবু একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করিবার এই যে, তাহার অমায়িক ব্যবহার যেমন শত্রুমিত্র সকলের কাছে তাহাকে আপন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার বুদ্ধির অত্যুগ্রচ্ছটা তেমন সকলের বোধগম্য হইতে পারে নাই। কুম্ভ বলিয়াছে,—"ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝিনে, কিন্তু তোমাকে বুঝি।" রাজবেশী সুবর্ণের মুখেও একবার শুনি,—"ওর কথা ভারি এলোমেলো—বোঝাই যায় না।" শম্ভু সুধনের দলও তাহার গান ও কথার মর্ম বুঝিতে পারে নাই। অতএব মনে প্রশ্ন জাগে, এই দুর্বোধ্যতার হেতু স্বরূপ কবি কি তবে ঠাকুরদা চরিত্রে মিষ্টিকতার ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছেন? ভারতবর্ষ বহু মিষ্টিক সাধকের জন্মভূমি। মিষ্টিক সাধক প্রাণের সত্যকে এমন সহজ কথায় প্রকাশ করেন যে, ঐ সহজতার গুণেই উহা আপামর সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লয়। দর্শন, শাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নিত্য নূতন তথ্য সমাবেশের দ্বারা যাহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, অন্তর্লোকের প্রজ্ঞাবলে ঐ সাধকগণ পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের কাছে সেই সত্যেরই মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ঠাকুরদা হৃদয় ও বুদ্ধির মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। অন্তরবাসী সত্যের কথাও প্রাণের ভাষায় প্রকাশ না করিয়া তিনি বুদ্ধি ও চাতুর্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই কারণেই, তাহার উপলব্ধি সকলের উপলব্ধির সীমায় আসিয়া আবেদন জানাইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিরোধ, ঠাকুরদাও সেই বিরোধ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের আপন স্বভাবের অনুরূপভাবেই ঠাকুরদার মধ্যেও আত্মার গভীর আকুতিকে, চিন্তার বলিষ্ঠতায়, যুক্তির পারম্পর্যে ও রুচিবোধের শালীনতায় মাখাইয়া, রূপ দিবার অভিনব প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে।

এতক্ষণ ঠাকুরদা চরিত্রের যে-পরিচয় লওয়া হইল তাহা হইতে গ্রীক নাটকের ব্যবহৃত কোরাসের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখানো কষ্টকল্পনার বিষয় হইবে না। 'রাজা' নাটকের মূল সুরটি বাহিরের রাজকীয় জাকজমকপূর্ণ ঘটনা ও কাহিনীর এক পাশে ইহার গানগুলিকে আশ্রয় করিয়াই অন্তঃশীলা ফল্গুর মত বহিয়া গিয়াছে। ঠাকুরদা সেই সুরটিতে শক্তি ও তাৎপর্য দান করিয়াছে। অথচ, সে অথবা তাহার দলবল নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে আপনাদের প্রভাবায়ত্ত করিয়া রাখে নাই। গ্রীক কোরাসে যেমন, এখানেও তেমনি, ঠাকুরদা নাটকের মূল প্রবাহের তীরে তীরে আপনার একতারাটি বাজাইয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার চরম অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথাই কেবল গাহিয়া ফিরিয়াছে। একটিমাত্র দৃশ্য,—যুদ্ধের দৃশ্যটি ছাড়া, ঠাকুরদা কোথায়ও এমন কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই যাহাতে করিয়া মূল ধারাটিতে তাহার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বিন্দুমাত্রও সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। সে সব কিছুই দেখিতেছে, বুঝিতেছে তাহারও বেশি; তবু ঘটনার আবর্তে জড়াইয়া পড়ে নাই। একটি নির্লিপ্ত নিরাসক্তির ভাব রক্ষা করিয়া মুক্ত প্রাণের আনন্দ উল্লাস লইয়া সকলের সঙ্গেই প্রীতির সম্পর্ক পাতাইয়াছে। তাহার হাসিতামাসা, রঙ্গরসিকতা, শিশুর মত সরল মিষ্ট ব্যবহার নাটকের গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে একটি স্নিগ্ধ মধুরতা জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার শালীনতা, তাহার রুচিবোধ, তাহার চিত্তাকাশের বিপুল বিস্তার পরোক্ষে হইলেও নাটকের সমগ্র পরিবেশটিকে উন্নততর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। হেইগ কোরাসের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, নিচে তাহার খানিকটা অংশ তুলিয়া দেওয়া গেল। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ঠাকুরদার খোদ ভূমিকার সহিত সেই পরিচয়ের যোগসূত্র কত নিবিড়। হেইগ লিখিয়াছেন,—

> "Its (chorus) position is that of a witness, sympathetic in temper, but undisturbed by anxiety for its own life. Its utterances are characterised by cool and sober reflexion, rather than by violent personal passion. It stands aloof from the storm and stress of the action, and assumes the office of an impartial mediator, holding the balance between the various contending forces."

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিটির মধ্যে কোরাসের ভূমিকার মুখ্য উদ্দেশ্য,—নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় নাটকীয় ঘটনা ধারার সমস্ত কিছু দেখা এবং উদার সার্বজনীন সত্যের পটভূমিতে উহার বিচার বিশ্লেষণের কথাই বলা হইয়াছে। ঠাকুরদার চরিত্রসৃষ্টিতে যে সেইরূপ কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টাই চলিয়াছে তাহা আমরা বলিব না। তবে ঠাকুরদা যাহা হইয়া

উঠিয়াছে, তাহাতে তাহার সহিত গ্রীক কোরাসের একটা দূর জাতিত্বের সম্পর্ক দেখা দিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গটি আরও একটু পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে শীলার হইতেও কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে। শীলারের মতে—

"The old tragedy, which at first only concerned itself with gods, heroes and kings, introduced the chorus as an essential accompaniment. The poet found it in nature, and for that reason employed it. It grew out of the poetical aspect of real life. In the new tragedy it becomes an organ of art which aids in making the poetry prominent. The modern poet no longer finds the chorus in nature. He must need create and introduce it poetically; that is, he must resolve on such an adaptation of his story as will admit of its retrocession to those primitive times, and to that simple form of life.... It is, in itself, not an individual but a general conception; yet it is represented by palpable body which apeals to the senses with an imposing grandeur. It forsakes the contracted sphere of the incidents....to deduce the grand results of life and pronounce the lessons of wisdom. But all this it does with the full power of fancy—with a bold lyrical freedom which ascends, as with godlike step, to the topmost height of wordly things; and it affects it in conjuction with the whole sensible influence of melody and rhythm, in tones and movements."

ইহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ঠাকুরদার গান, সেই গানের ভাব ও ভাষা, তাহার কথা বলার ভঙ্গী ও আচার আচরণের লক্ষণাদির সঙ্গে যাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে এই উদ্ধৃতির মধ্যে কোরাস সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত ঠাকুরদার কোথায় কি মিল তাহা আপনা হইতেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের উদ্দেশ্যকে কেহ ভুল বোঝেন সেই আশঙ্কায় এখানে পুনরায় বলিতেছি যে, ঠাকুরদা গ্রীক কোরাসের আদর্শেই যে কল্পিত এমন কথা বলিতে চাহি নাই। নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনার ক্ষেত্রই ছিল ঠাকুরদার লীলাভূমি। রবীন্দ্রনাথ যে স্বীয় আত্মার গভীরতর ভাবনা প্রকাশের ও আপন স্বভাবের প্রতিরূপ নির্মাণ করিবার বাসনা লইয়াই এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে-কথাও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তবু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হউক, গ্রীক কোরাসের কয়েকটি লক্ষণ যে ইহার মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রীক কোরাসের সহিত ঠাকুরদার প্রধান পার্থক্যও এই বেশে সে ঘটনা ধারা অন্বিত না করিলেও, প্রধান চরিত্রগুলিরই অন্যতম এবং এই নাটকের ভাবটি অন্যদের ভিতর দিয়া যেমন তাহার ভিতর দিয়াও তেমনি রূপ পাইয়াছে। নাটকের মূল প্রবাহের সঙ্গে কোরাসের কোন সম্পর্কই একরূপ থাকে না। এখানে ঠাকুরদার সহিত মূল নাটকীয় ব্যাপারের সম্পর্ক অতি নিবিড়।

কাঞ্চীরাজ প্রত্যক্ষবাদী। অদৃষ্টকে সে স্বীকার করে না, রহস্য বলিয়া কোন কিছুতে তাহার আস্থা নাই। তাহার মতে "অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে"। পূর্বাহ্নে জল্পনাকল্পনায় সময় হরণ ব্যর্থ। বুদ্ধি ও যুক্তির উপর তাহার পূর্ণ বিশ্বাস আর বিশ্বাস নিজের পৌরুষের উপর। বিরাটরাজ যথার্থই বলিয়াছে,—"নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয়নি।" বৈজ্ঞানিক যুক্তিপন্থাকেই সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিয়া অন্য সমস্ত কিছুকে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে দূরে সরাইয়া রাখিবার যে প্রবৃত্তি নব্য শিক্ষাভিমানীদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কাঞ্চীরাজের চরিত্রের মধ্যেও তাহারই বিকাশ দেখা যায়। রাজার সম্বন্ধে তাহার কোন কৌতূহল নাই। থাকিবার কথাও নয়। কারণ, রাজা অদৃশ্য। দৃশ্য বস্তু লইয়াই তাহার কারবার। অদৃশ্যলোকে অদৃশ্যবস্তু যদি কিছু থাকে, থাকুক। স্বল্পায়ু মানুষের পক্ষে সেই ভাবনায় জীবনের দুর্লভ ক্ষণগুলি অতিবাহিত করা কিছু কাজের কথা নয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোকবর্তিকার সম্মুখে ব্যবহারিক জগতের যে খণ্ডাংশ মাত্র প্রতিভাত হইয়া থাকে উহাকেই মূলধন করিয়া উহারই পরিমাপে জীবনে লাভ লোকসানের হিসাব কষিতে হইবে। যুক্তিবাদী বলিয়াই কাঞ্চীরাজ ভয়শূন্য, বা তাহারও অধিক, সর্বসংস্কারমুক্ত। বিশ্বাস না করিয়াও নিতান্ত ভয়ে ভয়ে বা পুরুষানুক্রমিক সংস্কারবশেও যে রাজাকে মান্য—যাহা সংসারের প্রায় চৌদ্দ আনি লোকই করিয়া থাকে, সে-সম্ভাবনাটুকুও তাহার মধ্যে ছিল না। কর্তাভাদ্যানের বিপদের উল্লেখ করিয়া সুবর্ণ তহবিলকে নূতন কানিয়া যুদ্ধ

লিপ্ত হইতে নিষেধ করিলে, সে বলিয়াছিল,—"ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।" প্রত্যক্ষবাদীরা অকস্মাৎকে মানে কিন্তু দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে স্বীকার করে না।

যুক্তিবিচারের পথে পার্থিব সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হইলেও, পরম সত্যের মুখ অবলোকন করিতে হয় ভক্তির আশ্রয় লইয়া,— 'ভক্তিতে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর'। বন্ধ্যা বুদ্ধিকেই নির্ভর করায় কাঞ্চীরাজ জাগতিক ক্ষেত্রে অসত্য হইতে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু, দুর্লভ সত্যের সন্ধান সে সহজে পায় নাই। রাণীর মত বিভ্রান্ত হইয়া তাহাকেও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ইহাদের দুইজনের একজনেরও সুরঙ্গমা বা ঠাকুরদার মত ভক্তি বিশ্বাসের নির্ভরতা ছিল না। তাই ইহারা বাহিরের সব কিছু বুঝিলেও সুরঙ্গমা এবং ঠাকুরদার হাবভাবের কথা বুঝিতে পারে না। সুরঙ্গমাকে লক্ষ্য করিয়া রাণী বলিয়াছেন,— "তোর সব কথা ওই এক রকম। কিছু বোঝা যায় না"। ঠাকুরদা সম্বন্ধে কাঞ্চীরাজকেও প্রায় সেই সুরেই বলিতে শুনি,—"কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝেরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে সে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি"। কাঞ্চীরাজের বাস্তব দৃষ্টির সার্থকতাও যেমন, তেমনি ইহার ব্যর্থতাও দুইটি ঘটনায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কোশল ও অবন্তীরাজের ন্যায় সেও বিশ্বাস করিয়াছিল রাজা ফাঁকি হইলেও, রাণী সুদর্শনা ফাঁকি নয়। তাই সুদর্শনা লাভের জন্য স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সকল রকম চেষ্টাই সে করিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টায়ই সুফল ফলিল না। জগৎপতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া জগৎকে নিঃশেষে উপভোগ কে কবে করিতে পারিয়াছে? এখানে যেমন তাহার জ্ঞানের গভীরতার অভাব দেখি, তেমনি ছদ্মবেশী রাজার আসল পরিচয় উদ্ঘাটনে তাহার প্রত্যক্ষদৃষ্টির সার্থকতাও দেখা যায় অদ্ভুত। সুবর্ণের ছদ্মরূপ দেখিয়া তাহাকে বলিতে শুনি,—"চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।" অতঃপর সে ঐ মেকী সাজের ভিতর হইতে খাঁটিকে বাহির করিল। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ব্যবহারিক সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু, পারমার্থিক সত্য আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর কাছেই প্রমাণসিদ্ধ নয়। কাঞ্চীরাজের চরিত্রের মূল ভিত্তি তাহার পৌরুষ, সে-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। নাস্তিকতা তাহার কাছে দুর্বলের স্বেচ্ছাচার নয়, শক্তিমানের সুদৃঢ় নীতির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। নাট্যকার একটি দৃশ্যে অতি কৌশলে সে কথাটি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। পঞ্চদশ দৃশ্যে যোদ্ধবেশী ঠাকুরদাকে দেখিয়া কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, বিরাট, বিদর্ভ, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজাদের মধ্যে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ঐ চাঞ্চল্যের মূলে ছিল ভয়। সুদর্শনা লাভের জন্য তাহারা সকলেই সমভাবে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু, বিপদের সম্মুখীন হইতে কেহই রাজি নয়। সকলেই চাহিতেছে ফাঁকি দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে। কিন্তু, কাঞ্চীরাজ উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন লুকাচুরির প্রশ্রয় দেয় নাই। শিক্ষা, রুচি ও প্রবৃত্তির প্রেরণা অনুযায়ী যে-পথটিকে সে বাছিয়া লইয়াছিল শেষ দিন পর্যন্ত উহাতেই আস্থা রাখিয়া সে জীবনের দায়মুক্ত হইতে চাহিয়াছে। ফলে তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল বীরসুলভ দৃঢ় মনোভাব এবং উচ্ছ্বাসহীন, ভয়শূন্য অদ্ভুত একাগ্রতা। যে সেনাপতির পাঁ ঠাকুরদাকে দেখিয়া অন্যান্য রাজারা বিপদ গণিতে সুরু করিল তাহারাই ধর চূড়ার পরীক্ষা করিয়া কাঞ্চীরাজকে বলিতে শুনি,—"সেনাপতি? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়েনি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি—তুমি আবার সেনাপতি?" কিন্তু ঠাকুরদা নাছোড়বান্দা। তাই বাধ্য হইয়াই রাজদূতের আহ্বান স্বীকার করিয়া তাহাকে বলিতে হইল—"আচ্ছা আমিও যাচ্ছি, রাজদূত,—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে"। তাহার সাধন এই বীরের সাধনা বলিয়াই বিপথে ঘুরাইয়াও শেষ পর্যন্ত তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া না দিয়া পারে নাই। পথের শেষে রাজার কৃপাপ্রসন্ন দৃষ্টি ও মিত্রতা লাভে সে সমর্থ হইয়াছিল। জনৈক নাগরিক বলিয়াছে,—"আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।" অথচ,—"অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ওই কাঞ্চীর রাজা। এরা (অন্য রাজারা) তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।" নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—এই বাক্যটির সার্থক রূপ দেওয়া হইয়াছে কাঞ্চীরাজের চরিত্রে।

কাঞ্চীরাজের আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে তাহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুরদার ভাষার ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, গূঢ় ইঙ্গিত ও ততখানি লালিত্য না থাকিলেও, তাহার ভাষাতেই বাংলা গদ্য ভাষার যে শ্রেষ্ঠ গুণ মিতাচারিতা তাহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মনের দৃঢ়তা তাহার ভাষাকেও শানিত ক্ষুরধার করিয়া তুলিয়াছে। নিচে সামান্য কয়েকটি

মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তাহা হইতেই এইকালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা প্রধানত কোন্ গুণটির অধিক আনুগত্য স্বীকার করিতে চলিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

'ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ।'

'অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে'।

'ওই যেন-একটার কথা বলবেন না—ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।'

'ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ না-ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।'

এই নাটকে রাজার পরিচয় তিনি হিন্দুর ভগবান। তাঁহার চরিত্রে ঐশ্বর্যভাবের সঙ্গে মাধুর্য ভাবেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মধুর প্রেমের সম্পর্ক। লীলা করিবার জন্যই প্রেমের আকর্ষণে এক বহু হন এবং সৃষ্টির বিচিত্র আধারে নিতুই নব রস আস্বাদন করিতে থাকেন। ভাগবতী রস-সাধনার এই অনুভূতিটি আলোচ্য নাটকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমরা এতক্ষণ ধরিয়া যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতেই জীবের রসাস্বাদন বাসনা এবং সেই বাসনা চরিতার্থতার জন্য বিচিত্র পন্থানুসরণ ও সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সংগে ভগবান তথা রাজার কথাই কেবল বিবৃত করিব।

'খোলো খোলো দ্বার...বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে'—প্রথম দৃশ্যের এই গানটির মধ্যে রাজার ভূমিকার যথার্থ তাৎপর্য ও গুরুত্ব ধরা পড়িয়াছে। ইহা ভক্তের জন্য ভগবানের, রাজার যিনি দ্বিতীয় তাঁহার জন্য রাজার মিনতি-ভরা ব্যাকুল প্রার্থনা। রাজাকে আসিয়া জোর করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিতে বলিয়াছে সুরঙ্গমা,—"আপনার ঘরে এসো বলভরে এসো এসো গৌরবে।" সুদর্শনারও এমন প্রার্থনায় অন্ত নাই। কিন্তু রাজার সঙ্কল্প, তিনি রুদ্রের মূর্তিতে ভক্তের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিবেন না। রাজার একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। প্রেমিক ভগবানের প্রেমের প্রসার ও মহিমার বিশদ পরিচয় এই গানটি বহন করিতেছে। গানটি—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ-ভারে
সাজাব না ফুলের হারে
সোহাগ আমার মালা করে
গলায় তোমার পরাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব॥"

যে গানের সাহায্যে রাজা ভক্তের হৃদয়-দ্বার খুলিবার কথা বলিয়াছেন উহাই বিশ্ববিধাতার বিশ্ব-সঙ্গীত। 'এই বিশ্ব-সঙ্গীতটি তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত, তাঁর নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠছে।' মানবের অহমিকার তালপাতার ভেঁপু যতক্ষণ প্রবল রবে বাজিতে থাকে ততক্ষণ ঐ সুর শোনা যায় না। কিন্তু একবার কোন প্রকারে ঐ রাগিণী কানে প্রবেশ করিলে চিত্ত বিবশ হইয়া পড়ে, মন আপনাআপনি বুঝিয়া লয়,—"যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।—ইচ্ছা করছে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই—হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহন পথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই।"

এই সঙ্গীতই ভগবানের প্রেমের অভিজ্ঞান। জীবের জন্য তাঁহার বীণা অবিরাম বাজিয়াই চলিয়াছে। সকলকেই আহ্বান করিতেছেন, সকলেরই সঙ্গ তিনি কামনা করিতেছেন। অথচ কোনরূপ জোরজবরদস্তি করিয়া মিলন সহজ করিবেন না। মিলন সার্থক হয়, আনন্দ পূর্ণ হয় যখন জীব আপনা হইতে তাহার অহঙ্কার বা ইচ্ছা ভগবানকে সমর্পণ করে। কবি-শেখরের একটি গানের মধ্যে এই ভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দীর্ঘ বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। গানটির প্রথম চরণ, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। কিন্তু জীবের সহজে এই জ্ঞান হয় না। তার প্রমাণ, সুদর্শনা ও বিদ্রোহী রাজারা। তাহাদিগকে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে, অনেক ঘুর-পথে সত্যের সান্নিধ্যে যাইতে হইয়াছে। কিন্তু রাজার কি অসীম ধৈর্য কি অবিচলিত প্রতীক্ষা। রাণী ব্যভিচারিণী, রাজার প্রতি বিরূপ জানিয়াও তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই—তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বীণা হাতে ফিরিয়াছেন। আর, সেই বীণার তারে সুর হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে তাঁহার প্রাণের অনুপম আকুলতা। রাজার প্রেমের এই বিরতিহীন প্রকাশের কথা সুদর্শনার মুখেই শুনিতে পাই। তিনি সুরঙ্গমাকে বলিয়াছেন,—"দেখ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে (পিত্রালয়ে) এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানালার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে" আর এক-

বারও তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি,—"সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে (অন্ধকার বাসর ঘরের বাতায়নে) দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার ধারার মুখের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত"। ঐ বীণার রবেই রাণীর বিরূপ মনও শেষ পর্যন্ত বশ মানিল। রাজাকে প্রিয় বলিয়া, স্বামী বলিয়া চিনিয়া আক্ষেপ অনুরাগে তিনিও গাহিয়া উঠিলেন,—

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে
আমার চিত্তে এসো নামি।
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে
ওহে-আমি বন্ধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী—
সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম
ওগো মরুক না এই আমি।

বাসনার বিকৃতিকে নির্মূল করিতেই হইবে—উহাই জীব ও ভগবানের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। ঐ 'আমি' মরে কখনও বীণার সুরে কখনও বা বজ্রনাদে। একবার উহা মরিলেই সকল বিপদ কাটিয়া যায়। তখন চিরসুন্দর প্রিয়ের হাত ধরিয়া ভক্তকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া নিখিল বিশ্বে যেখানে তাঁহার মঙ্গল রশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হইতেছে উহার মধ্য দিয়া যুগল যাত্রা করেন। এই মুহূর্তে সকল দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে। "তখন জয় নয় তখন আনন্দ—তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা—তখন ভেদ নয় তখন মিলন—তখন আমি নয় তখন সব—তখন বাহিরও নয় তখন ভিতরও নয়—তখন ব্রহ্ম তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যহীন ক্ষমা, অহঙ্কারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।"

★

একটি উজ্জ্বল দিন

ব্রজেন রায়

একটি উজ্জ্বল দিন ফিরেছে আবার
স্বপ্ন নিয়ে, শান্তি নিয়ে, প্রেমের পুলকে
স্মৃতিচিত্রের মত। সূর্য্য বন্দনার
এ-সকাল ফিরে আসে, এদিনটিকেই
উজ্জ্বল উজ্জ্বল করে রাখে।

বিংশ শতাব্দীর আরও তো অনেক দিন
সূর্য্যে সূর্য্যে ডেকেছে আমাকে—তারকা ভাস্বর
কত রাত এসেছে তো কতবার।
তবু তারা ক্ষীণ
থেকে ক্ষীণতর। তোমার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর

ভেসে ভেসে কতবার ডেকে গেছে এ সুন্দর প্রভাতে
পাখিদের কলকণ্ঠে, জোনাকির দীপ-জ্বলা রাতে।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

সুশীলকুমার গুপ্ত

॥ ১ ॥

'মহুয়া'র আত্মপ্রকাশ ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে। 'মহুয়া'র পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'। পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যে নূতন ঋতুর আবির্ভাব। এই সময়ে কবি গদ্যকবিতাকে ভাবপ্রকাশের বাহন করেছেন। এর পরে রবীন্দ্র কাব্যের প্রদোষকালে কবি 'আরোগ্য', 'রোগ-শয্যায়', 'জন্মদিনে' এবং 'শেষলেখা' কাব্যগ্রন্থগুলিতে মুক্তবন্ধ তানপ্রধান ছন্দকেই বাণীমূর্ত্তি রচনার জন্যে গ্রহণ করেছেন। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে শেষবারের মত বিচিত্র ছন্দের সাহায্যে কবির ভাবকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। 'পূরবী'র মধ্যে ছন্দ-সরস্বতীর নব নব মূর্ত্তিতে আবির্ভাব থাকলেও 'মহুয়া'র মধ্যে ছন্দ-সরস্বতীর প্রকাশ আরো অভিনব, অভূতপূর্ব্বও বটে।

এই তো গেল ছন্দের কথা। ভাবের দিক দিয়েও 'মহুয়া' অভিনব। 'মহুয়া'র জগতে সত্যই এক নূতন ঋতুর আবির্ভাব হয়েছে। কবি এই সময়ে 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রকৃত প্রেমের সমস্যা সমাধানের দিকে সচেষ্ট ছিলেন। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের একদিকে—

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর দিন ॥

আর অপর দিকে—

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো—
সূর্য্য অস্ত যায়নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি, সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে ॥

পূরবী রাগিণীতে কবি বীণা বেঁধেছেন, কিন্তু সেই

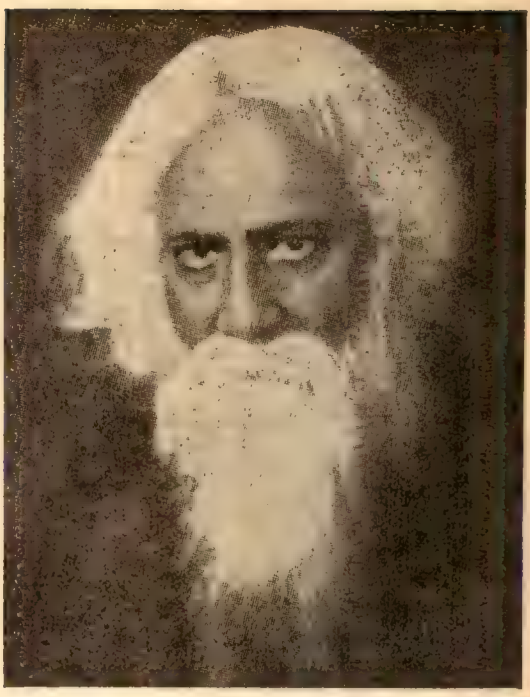

সঙ্গে প্রকৃত প্রেমের সম্ভোগের তৃষ্ণা কবিকে আকুল করেছে। 'গীতাঞ্জলী', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের পরে 'পূরবী' এবং 'মহুয়া'র মধ্যে পার্থিব প্রেমের আবির্ভাব স্মরণীয় এবং রবীন্দ্র কবি মানসের নূতন দিগন্তের নির্দ্দেশক।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যে নূতন ঋতু-আবির্ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন—"অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে—মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।" কিন্তু এ ছাড়াও এই নাম-করণের আরো একটু তাৎপর্য্য আছে বলে আমার মনে হয়। 'মহুয়া'র জন্মভূমি অভিজাত জীবন থেকে বহুদূরে প্রাকৃত জনজীবনের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কাব্য-গ্রন্থগুলিতে যে প্রাকৃত জীবন স্থান পেয়েছে এবং যার জন্যে আশ্চর্য্যভাবে গদ্যছন্দের আবির্ভাব, তার প্রথম উজ্জ্বল সূচনা এই 'মহুয়া'র প্রাকৃত প্রেম রসের পরিবেশন করার আকাঙ্ক্ষায়। রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'র তীব্র উন্মাদনাময় রস

পরিবেশনের মধ্যে বলিষ্ঠ অমিতবীর্য্যশালী প্রেমের উজ্জীবন চেয়েছেন।

॥ ২ ॥

'মহুয়া'র প্রধান রস প্রেমের রস। এর আরম্ভ এবং উপসংহারে বসন্তের অবস্থান। "দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা ব'লে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।" বসন্ত-সখা মদনের উজ্জীবন-আকাঙ্ক্ষায় গ্রন্থের সুরু।

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।

মদনের উজ্জীবনের মধ্যে কবি ভীরু শঙ্কিত প্রেমের উজ্জীবন চাইছেন না, তিনি চাইছেন বলিষ্ঠ, দুঃসাহসী, বীর্য্যশালী প্রেমের উদ্বোধন—

যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্যনব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

এই অমিতবীর্য্যশালী প্রেমের সাধনা 'মহুয়া'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের স্পর্শকাতর কোমলকান্ত প্রেমের জগতে রবীন্দ্রনাথের এই বলিষ্ঠ প্রেমের সুর অভিনব। রবীন্দ্রনাথ যুগধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রেরণায় প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিক প্রেমিকার স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেছেন। জীবনের বৃহৎ ও মহৎ ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারী পুরুষের ছায়ানুসারিণীই নয়, সে পুরুষের সহযাত্রিণী। প্রেমের মহত্ত্ব স্বাধীনতায়। নারীর প্রেম শক্তির সাধনা, ভীরুতার অর্চ্চনা নয়। 'সবলা' কবিতায় নারী বলছে—

যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী।

আবার—

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের পরে
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্ব্বারিত স্রোতে।

'প্রতীক্ষা' কবিতায় পুরুষ বলছে—

সেবাকক্ষে করিনা আহ্বান—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্ম্মম লাঞ্ছিত॥

আবার—

হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম কল্পনা যুগধর্ম্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলমান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

মুক্ত প্রেমের কবি Shelley এবং Browning-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কল্পনার আশ্চর্য্য মিল আছে। প্রেমের চলমান চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলির মধ্যে চিরন্তনের স্পর্শ আছে। তাই এই মুহূর্ত্তগুলি সত্য, পূর্ণ প্রেম-মালিকার বিচ্ছিন্ন কুসুম। The Last Ride Together এর মধ্যে Browning লিখেছেন—

What if we Still ride on, we two,
With life for ever old yet new,
Changed not in kind but in degree,
The instant made eternity,—

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল;

The instant made eternity এবং এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—একেবারে একসুরে বাঁধা।

Shelley'র Epispsychidion-এর মধ্যে একই সুরের গুঞ্জন।

বন্ধনহীন গ্রন্থি রবীন্দ্র প্রেমের পথ বেঁধে দেয় এবং রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি হাওয়ার পন্থী। হঠাৎ আলোর ঝল-কানিতে ঝলমল চিত্তের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী প্রেমের উদ্বোধনের মূল্য আছে। 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্যের কণ্ঠে শুনি—

তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' গ্রন্থে কমলের কণ্ঠে এই সুরের প্রতিধ্বনি—

····· হোক্ মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বারবার ফিরে আসে। মালতী ফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর ন্যায় দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে?

রবীন্দ্রনাথের প্রেম দাম্পত্যজীবনের গণ্ডীর মধ্যেই নিঃশেষ হয় নি। তাঁর প্রেম Swinburneএর মত কাম-জননী গ্রীকদেবী Aphroditeএর আরতি করা নয়, দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে তিনি উত্তরণ করতে চান। রবীন্দ্রনাথ বাসরঘরে মিথুন লীলাকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁর কাছে প্রেমের তীর্থযাত্রার পথ আরো দূর-বিস্তৃত। বাসরঘরের মধ্যে এসেও ভোলা যায় না—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্র রবে।

প্রেমের মুক্তিতেই প্রেমের পরিপূর্ণতা। ক্ষুদ্র ব্যক্তি-গত প্রেম বৃহত্তর মানব সাধারণের প্রেমের মধ্যে মুক্তি পেলেই প্রেম হয় মৃত্যুঞ্জয়ী। এই মুক্তির মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্বভাবে ধ্বনিত করেছেন। মুক্তি আছে বলেই বাসরঘর বৃহত্তর প্রেমের ভূমিকা রচনা করে, তাই বাসর-ঘরে চিরমিলনের উৎসব।

কে বলে, তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই
নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসরঘর
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর॥

রবীন্দ্রনাথের প্রেমে তাই কোন বিচ্ছেদ নেই। ব্যক্তি-গত সীমানার মধ্যে প্রেমের খণ্ডিত রূপের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা আমাদের পীড়া দেয়, কিন্তু বৃহত্তর মানব প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের পূর্ণবলয়রূপ ফোটে। সেখানে চিরপুরাতন প্রেম চিরনবীনতার ধারায় অভিষিক্ত। ব্যক্তি-গত প্রেম বৃহত্তর প্রেমসাধনার পাদপীঠ। তাই ব্যক্তিগত প্রেমেরও মূল্য অপরিসীম। কাল থেকে কালাতীত, সীমা থেকে অসীম, রূপ থেকে অরূপ, পাত্র থেকে পাত্রা-তীত, মরত্ব থেকে অমরত্বের দিকে প্রেমের অভিসার। দু'টি পাত্রপাত্রীর মিলন-বিরহের মধ্যে চিরন্তন প্রেমের স্পর্শ আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন—

চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা; তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

'মহুয়া'র 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।" 'মায়া' কবিতার মধ্যে দেখতে পাই—

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন-মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর॥

রূপের রেখা ও রসের রেখার যুগ্মস্রোতে মহুয়ার প্রেম অভিস্নাত।

'গ্রন্থাগার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান

কুমুদরঞ্জন সিংহ

চিন্তার যে সূত্র ধরেই অগ্রসর হই মনে হয় রবীন্দ্র-আবির্ভাবের মতো বিস্ময়কর সৌভাগ্য আমাদের জীবনে আর কিছুই নেই।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলার নবযুগের উদ্বোধন করে, তাঁর অবদানের অন্নে বাংলার প্রাণধর্ম্ম পুষ্ট হয়ে ওঠে; এবং দিকে দিকে অভিনব সৃষ্টির উন্মেষ হতে থাকে। তবু বাংগালী রবীন্দ্রনাথের জন্য সমগ্র ভারতভূমি এবং বিশ্বমানব সমাজের সমষ্টি মনকেও সুনিবিড় বেদনায় সাধনা করতে হয়েছে। কারণ বিশ্বোদ্দীপ্ত সর্ব্বতোময় অমৃতের উৎস হতে আনন্দ চিন্ময় রসের বিশ্বকবির আবির্ভাবের মতো প্রজ্ঞাময় প্রকাশ ঘটে। সে প্রকাশ বিশ্বের জন্য। সে প্রকাশ অনাহত, অনাময়। দেশ ও কালের ব্যবধান সে মানে না। অখণ্ড সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবনের উচ্ছল রসধারা চারিদিক ছড়িয়ে এবং প্রাণময় জ্যোতিতে বিশ্বকে দীপ্ত করে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

সহস্র কিরণ সূর্য্যের মতো সর্ব্বতোদীপ্ত এবং সর্ব্বতোমুখী রবীন্দ্রনাথের সাধনা, তাঁর অবদান। যেখানে অন্ধকার সেখানেই তা আলো ছড়ায়েছে। সে আলো জাতির পথ সতত উজ্জ্বল রেখেছে। অভয়ত্ব বিস্তার করেছে; মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের যত দিয়েছেন আর কাহারো নিকট হতে তত পাইনি। এত তেজ, এত বীর্য্য, প্রাণধর্ম্মের এরূপ অগ্নিময় প্রকাশ জগৎ বহুদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব তার বিশেষ প্রমাণ। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনও এই শুভ পরশ ও প্রভাব পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সার্থকতা উপলব্ধি করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার কি, শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কিভাবে হওয়া উচিত, গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্য কি, এই সকল সমস্যাগুলিকে নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন ও চিন্তাশীল লেখার মধ্য দিয়ে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য গ্রন্থাগার কর্ম্মী ও গ্রন্থাগারিকদের উৎসাহ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কার্য্যক্ষেত্রে তিনি তাঁর চিন্তার রূপ দিয়েছেন বাংলার অপূর্ব্ব সম্পদ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার,—রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার সাধারণতঃ প্রাণহীন গ্রন্থের ভাণ্ডার ক্ষেত্র। তার সৃজন ক্ষমতা রুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব কাব্যছন্দে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের রূপ বর্ণনা করেছেন—

"পাষাণ গাঁথা প্রাসাদ'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমার ইতিহাসে 'মহুয়া' একটি স্মরণীয় তীর্থ। আকাশের রামধনুর সঙ্গে ধরণীর বিচিত্রবর্ণের ফুলের রাখীবন্ধন হয়েছে। প্রাকৃত প্রেমের উষ্ণস্পর্শ, মর্ত্ত্যপ্রেমের স্বাদ ও সুরভি মহুয়ার কবিতাগুলির মধ্যে এক আশ্চর্য্য আবেদন এনেছে। সহৃদয় হৃদয়সংবাদী পাঠকের কাছে 'মহুয়া'র আবেদন অব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম পরিকল্পনা জানতে হলে, 'মহুয়া'র কবিতাগুলির রসাস্বাদন অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয়ের প্রেম এবং ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের এই রাখীবন্ধন পৃথিবীর কোন কবির মধ্যে ঠিক এইভাবে দেখা যায় না। অবশ্য এই খানে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তবে বিহারীলাল যেখানে ভাবে মুগ্ধ ও আত্মহারা', রবীন্দ্রনাথ সেখানে রূপে রসে পূর্ণ প্রকাশিত এবং সচেতন। খাঁটি love lyrics হিসেবে 'মহুয়া'র কতকগুলি কবিতা আশ্চর্য্যভাবে সার্থক।

'মহুয়া' ঋতু এবং রীতি বদলের জন্যে কাব্যজগতে এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

মেহেগিনীর মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না
খোলে না কেউ পাতা
আস্বাদিত মধু যেমন
যুগী অনাঘ্রাতা।"

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণকেই শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেন। যে অমূল্য সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ স্তরে স্তরে সংগৃহীত ও রক্ষিত, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারলে কতখানি কার্য্যকরী হয়—সেবিষয়ে কেউ চিন্তা করেন না। কিন্তু গুরুদেব গভীরভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং এই নির্জীব প্রতিষ্ঠানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে কিরূপ কার্য্যকরী হয়, তারও এক নিখুঁত ছবি তিনি মানসচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি তাই বলেছেন—"হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" এমনভাবে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন মনীষী গ্রন্থাগারের প্রকৃত সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারেন নি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান গ্রন্থাগার সমূহের দুরবস্থা দেখে তিনি লিখেছেন—"অধিকাংশ লাইব্রেরীই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। বারোআনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না। ব্যবহারযোগ্য চার আনা বই এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করিয়া রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়মানুষ বলে ; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরীর গর্ব্ব অনেক খানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপন অহংকার তৃপ্তির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়।"

পুস্তক সংগ্রহই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের চরম কাজ নয়। বিবিধ আকর্ষণীয় পন্থার মধ্য দিয়ে পাঠকচিত্ত ধীরে ধীরে জয় করা এবং সংগৃহীত পুস্তক ব্যবহারের সুবিধে দেওয়ার মধ্যেই পরম সার্থকতা। কবির ভাষায় "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে। প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবতার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।"

গ্রন্থাগারকে দেশের শিক্ষা বিস্তারের সহায়ক করতে হলে এই কাগজে বাঁধা পড়া অক্ষরগুলিকে মুক্ত করে সক্রিয় ও জনপ্রিয় করতে হবে। সে পথের সন্ধানও তিনি দিয়েছেন—"লাইব্রেরীকে ব্যবহার্য্য করতে হলে লাইব্রেরীর পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটি শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর—কিন্তু পথ ঘাট নেই।" আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের অধিকাংশেই পথ-ঘাট নেই ; কিন্তু বাড়ীঘর হয়তো কারুর কারুর অনেক। পথ-ঘাট করতে হলে প্রথমে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং এর জন্য চাই গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের উৎসাহ ও জীবন চাঞ্চল্য আর কর্তৃপক্ষের প্রেরণা। কিন্তু আজো কিছুই নেই।

রবীন্দ্রনাথ খাঁটি গ্রন্থাগারিকের সুক্ষ্ম দৃষ্টি-ভংগীতে গ্রন্থাগারের দোষগুণ লক্ষ্য করেছেন। সাধারণ লোক গ্রন্থাগার তো দূরের কথা গ্রন্থের ধার দিয়েও কেউই যান না। গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করবার জন্যে গ্রন্থাগারের পণ্ডিতী খটখটে আবহাওয়ার বদলে সহজ ঘরোয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। পাঠক যেন কোন ক্রমেই অসুবিধার মধ্যে না পাড়েন বা নিজেকে আড়ষ্ট করে না তোলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সাধারণ লাইব্রেরী বলে থাকে আমার গ্রন্থ তালিকা আছে স্বয়ং দেখে নাও, বেছে নাও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোন আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরীর মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় নেই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হলো বড় লাইব্রেরী—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরীও পাঠককে তৈরী করে তোলে।"

এই বদান্য মূলক আবহাওয়া সৃষ্টি দ্বারা ক্রমশঃ পাঠক সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রন্থাগারকে সার্থক কার্য্যকরী ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান করা যায়। দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগার নিছক অচল

প্রতিষ্ঠান নয়—তার কাজ সৃষ্টিমূলক…পাঠক সৃষ্টি করা তার অন্যতম প্রধান কাজ। এই সৃষ্টির কাজের দায়িত্ব অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের, রবীন্দ্রনাথের সুক্ষ্মতম দৃষ্টিতে কিছুই এড়িয়ে যায়নি। গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :—"লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্ল্লোভ সেলফভর্ত্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য আর লাইব্রেরীয়ানের থাকবে শুদাম রক্ষকদের যোগতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।" এছাড়া গ্রন্থাগারিকের সহজ সরলভাবে মিশতে হবে পাঠকদের সংগে এবং এইভাবে মেশার ফলে একটা ঘরোয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে।

দরদী কবি রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় পাঠকগণকে গ্রন্থাগারে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আজ আমরা আবার সেই ভাষাতেই সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি—"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুইভাইয়ের মতো এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে; এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।"

"কত নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠস্বর এখানে আসিয়াছে—কতশত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো—এখানে এসো—এখানে আলোকের জন্ম সংগীত গীত হইতেছে।"

★

রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ

[আলোচনী]

শ্রীবাসন্তী বসু

শিল্প-সঙ্গতিপূর্ণ, সুরুচি-সুন্দর, জ্ঞান-প্রদীপ্ত ও সংস্কৃতি-উজ্জ্বল বিশ্বকবির জন্মতিথি সমাসন্ন। এই পুণ্যতিথিতে তিনি তাঁর প্রজ্ঞান-মূর্ত্তিতে সবার মনোরাজ্যে প্রত্যক্ষ হন। শত বিস্মৃতির মধ্যেও বিশ্ববাসী এই তিথিতে কবিগুরুকে ভক্তিনতচিত্তে স্মরণ না করে থাকতে পারে না। এবং এই কারণেই তাঁর ভক্ত ও শিষ্যেরা ওই উৎসবটিকে নিয়ে এত মাতামাতি করেন।

উপরোক্ত কথা ক'টির সব মেনে নেবার যুক্তি নেই। কেন না রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতি শুধু একমাত্র তাঁর ভক্তেরাই করেন না এবং পঁচিশে বৈশাখ-তিথি উদ্‌যাপনই শুধু তুমুল উদ্যমে হ'য়ে থাকে না—তাঁকে নিয়ে উদ্যম সব সময়েই চলে। কারণ বাঙালী মাত্রই তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। 'বাংলার মাটি বাংলার জল রবীন্দ্রনাথ মাখা।' কবিগুরুকে যে দেশের সবাই স্বজন মনে করে তার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো "রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ" সম্পর্কে আলোচনা ক'রে।

বহু বিপর্য্যয় অতিক্রম ক'রে ভিটে মাটি খুইয়ে সম্বলহীন অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে আগত শরণার্থীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এদেশে বহু উদ্বাস্তু বসতি গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি সরকারের কাছ থেকে কোনরকম ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ না ক'রে আকড়া-সন্তোষপুর পল্লীর এক বিশাল পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ জমির উপরও এক উদ্বাস্তু বসতি গড়ে উঠেছে। এই বসতি বা পল্লীর নাম রাখা হয়েছে কবিগুরুর পবিত্র নামে "রবীন্দ্রনগর।" এঁদের প্রচেষ্টাতে স্থাপিত সেখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টির নামও বিশ্বকবির নামানুসারেই রাখা হ'য়েছে "রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ।" এই আত্মনির্ভরশীল শরণার্থীদের কোন স্বনামধন্য স্বজন বা বাংলা দেশের অপর কোন নেতার নাম যেখানে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারত, সেখানে তা না হ'য়ে কবির নাম হওয়ায় তিনি যে সবার হৃদয় জয় করেছিলেন, তাঁর চিন্ময় অবদান যে চিরকালের জন্যে স্বীকার্য্য এবং তিনি যে সত্যি যুগ-যুগান্তর অমর হ'য়ে থাকবেন, এতে সে কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

নতুন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে কিছু বলবার সুরুতেই কবিগুরুর কথা উদ্ধৃত করছি,—'আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা।' বাংলার মহীয়সী মহিলা কাত্যায়নী দেবীর কথা—'অগ্রগতির পথে পুরুষকে সাহায্য করিবার প্রয়োজনে নারীর আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার, সে শিক্ষা ডিগ্রীর মোহ বর্জ্জিত আত্মত্যাগের শিক্ষা, নারীর দাবী জানাইবার কিছু যদি থাকে তবে তাহা শিক্ষার। আমাদের অগণিত পল্লীর নারী কুশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, তাহারা শিক্ষা পাইলে দেশ আরও জাগ্রত হইবে, অগ্রগতি রুধিবার শক্তি সেদিন আর কাহারও থাকিবে না।'

উপরের মূল্যবান উদ্ধৃতি দু'টি আজ প্রত্যেক অভিভাবকের গভীর ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন। শরীরের সব ক'টি অংশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র প্রাণের অভাবে সেটি যেমন নিরর্থক, তেমনি সমাজ-জীবনেও অন্য কিছুর অভাব না থাকলেও একমাত্র শিক্ষার অভাবে সে জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য। বিদ্যামন্দিরেই জাতির ভাবি কর্ণধারগণের জীবন গঠন সুরু হয়। এখানে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে গুরু তাঁর শিক্ষার দ্বারা ছোট বড় উচুনীচু অসঙ্গত পার্থক্য দূর ক'রে শিষ্যদের বেঁধে দিতে সহায়তা করেন সমগ্র বিশ্বকে সৌভ্রাত্রের বন্ধনে।

শিক্ষকের জীবনই শিক্ষার প্রধান সহায়। শ্রদ্ধা, সম্মান কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উচ্চভাব ছাত্রের মনে স্বভাবতঃই জাগ্রত হয়, যদি শিক্ষক তার কাছে সর্ব্বতোভাবে আদর্শ স্থানীয় ব'লে গণ্য হন। বিদ্যা যদি বিনয় না দেয়, স্বভাবের মধ্যে নম্রতা ও মধুরতা না আসে, সত্যানুরাগ ও ন্যায়ের মর্য্যাদা করতে না শিখায়, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের কর্ত্তব্য ও আনন্দকে না মিলায়, পরিবার, সমাজ এবং বিশ্ব জগতের কল্যাণে প্রেরণা না দেয়, তবে শিক্ষা নিস্ফল ও অর্থহীন।

যে বাঙলা প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশকে পথ দেখালো, দেশমাতাকে চেনালো জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে, আজ সে দীনতম দীন। তাই আমরা যাতে আর আত্মঘাতি না হ'য়ে নিজেদের ক্লৈব্য দূর ক'রে মহত্ত্বের কর্ম্মধারা বহাতে পারি, একে অন্যকে পূর্ণ দরদ দিয়ে ভালোবাসতে পারি, হৃদয়ের সহজ ঔদার্য্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য না করি, সেদিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রেখে চ'লতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন আমাদের সেই আদর্শের পথ অনুসরণেরই অনুপ্রেরণাস্থল। রবীন্দ্র-বিদ্যাপীঠ সেই আদর্শের পথ ধ'রেই অগ্রসর হ'য়ে আজকের কিশোর ছাত্রকে কালকের রাষ্ট্রনায়কের পথ ক'রে দেবে। রবীন্দ্র-বিদ্যাপীঠের এই আদর্শকে যদি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুসরণ করে, তবে একদিকে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি যেমন জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হবে, তেমনি বাংলার নতুন শিক্ষাধারাকে রবীন্দ্র অনুসরী ক'রে দেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বহুদূরে সম্প্রসারিত ক'রে দেওয়া যাবে।

★

কবি-প্রণাম

অমিয়মোহন বসু

বিশ্বকবি! করিয়াছ সমুজ্জ্বল সবার সম্মুখে
অপরূপ মাতৃভাষা, মাতৃভূমি আপন ভারত।

মৃত্যুঞ্জয়ী, সর্ব্বাত্মীয় কভু তব হবে না বিনাশ
পবিত্র-প্রদীপ্ত স্মৃতি-রসিকের মর্ম্মলোক হ'তে।

কবিতা

নাগ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অরণ্য, প্রান্তর, শৈলে, মৃত্তিকা-গহ্বরে
পিপ্পল-শাল্মলীতরু-গুঁড়ির জঠরে
ব্যাপৃত প্রয়াসে—দৈর্ঘে মজবুত নীড়
এরা গড়ে, যেথা জন্তু শ্বাপদের ভিড়।
শুধু যবে তপ্তমাটি—অসহ্য নিদাঘ
সে মুহূর্ত্তে প্রতিমূর্ত্ত নানাখানে নানা
মানুষের বাস্তভিটে—দেয়ালে-চৌকাঠে
মুক্তপাখি-জানালায় কাছে, দূরমাঠে।
সর্ব্বদা অনিষ্টকামী, করে প্রতারণা,
মুহুর্মুহু উচ্চে তোলে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা-ফণা
বিষবহ্নি—দুষ্প্রবৃত্তি তার
অন্যায়ের পথ খোঁজে যে-প্রতিহিংসার।
চায় লুপ্তলোকালয়—ছিন্নভিন্ন সীমা।
প্রলম্বিত, ক্ষিপ্রপুচ্ছে যে-ক্রূর ভঙ্গিমা
অট্টরোল অস্ফালনে দম্ভে আর রোষে
যে-হিল্লোল টেনে আনে শরীরের কোষে,
সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ ভয়ঙ্কর।
প্রত্যঙ্গ বিচিত্র হিম, গতি নিরন্তর।
নীলচক্ষু—স্থির তবু জানে সম্মোহন।
মুক্তফণাশ্রয়ে করে নরে আকর্ষণ,
তারপর সব শেষ হয়।
এ-নাগ কি মানুষের পরিত্যাজ্য নয়?

এই নাগ তবু আসে মানুষের ঘরে।
ক্ষণিক নিস্তব্ধ থেকে ঝাঁপির ভিতরে
উদ্যত উদ্ধতফণা সমুৎকীর্ণ ক্রোধে
ব্যস্ত হুহুঙ্কার ছাড়ে আদিম বিরোধে,
কালকূট—ফুৎকারে গরল।
কুজ্ঝটি আকাশ ব্যাপে—ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল।
তাই কি দুর্দ্দম দোলা বৈরিতা, সংশয়ে
খণ্ডিত করেছে পৃথ্বী দুইটি বলয়ে?
প্রচণ্ড প্রস্তুতি নিয়ে স্ফুলিঙ্গ কি ফের
দিগন্তে বিস্তার চায় ধ্বংস, সংঘর্ষের?
এই বিষ—কীর্ণ অহিকুল
অবলুপ্ত হলে কভু, নিঃশেষে নির্মূল
জেহাদ, জিঘাংসাবৃত্তি থাকবে না আর
পাবে পৃথ্বী মুক্তরৌদ্রে সান্ত্বনা আবার।

জর্নাল থেকে

মানস রায় চৌধুরী

এক

অন্তত থাক, এইটুকু থাক—আমাদের জীবনের
কুয়াশায় ঢাকা, নেই-মেঘ-নেই, ধূসর মলিনাকাশে-
রামধনু হ'য়ে; সাতরঙা গান, এইখানে এ বনের
মুগ্ধ হরিণ কামনারা যাক, ভৈরবী বিশ্বাসে!

দুই

তবু ভীরু ভয়, মৃত্যুর ফণা কুটিল নাগিনী এসে
হানা দেবে বুঝি। সবুজ জীবনে আবার বেদনা এসে
কান্না ছড়াবে। ভুলে যাবো কোন পথ আমাদের লক্ষ্য
কই প্রত্যাশা সূর্য্য-প্রতিম, স্বপ্ন অযুত লক্ষ?

তিন

শীতের রাত্রি নামে এই প্রাণে, মরণ বিজয়ী ঈপ্সা
তীক্ষ্ণ তুহিনে ছিঁড়ে যায় যায়; তবু সন্ধানী আঁখি
মেলে রাখি ছায়া-হিম দিগন্তে—যদি সোনারঙা পাখী
সূর্য্যের ভাষা আনে রাত শেষে: দুরন্ত প্রত্যাশা।

স্বর্ণ-বিভূতি

রণজিৎ কুমার সেন

দীর্ঘ এক যুগ পরে হঠাৎ আবার প্রেম-দার সঙ্গে দেখা। প্রেমরঞ্জন বসাক। আপাতত কলকাতার উপকণ্ঠেই খুব কাছাকাছি আমরা বাস ক'রছি, কিন্তু কারুর সঙ্গে কারুর দেখাসাক্ষাতের বালাই ছিল না এতকাল। শুনলাম—সোনারপুরে কোন্ একটা রিফিউজি কলোনীতে একখণ্ড জমি নিয়ে সম্প্রতি অনেক কষ্টে খান দু'য়েক ঘর তুলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আছেন। প্রেম-দা বিয়ে করেছেন—তাও প্রায় বছর পনেরো হ'য়ে গেল। আমরাই কয়েকজন অনুরাগী সাগ্‌রেদ প্রেম-দার সঙ্গে বরযাত্রী হ'য়ে খুব স্ফূর্তি ক'রে এসেছিলাম কৃষ্ণনগরে গিয়ে। ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম, 'বিড়ালের ভাগে এবারে শিকে ছিঁড়লো প্রেম-দা; কিন্তু ভাবছি কি জানেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেশের মেয়ের সঙ্গে এরপর রাজা প্রতাপাদিত্যের দেশের ছেলের মিল খেলে হয়!'

অকস্মাৎ চিরকালের স্বভাবগত হাসিকে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের আবরণে ঢেকে নিয়ে কিছু-একটা জবাব দিতে উঠে প্রেম-দা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন, বাঙাল ব'লে কি ঠাট্টা করছো নাকি?'

ব'লেছিলাম, 'না, না, আপনি কেন বাঙাল হবেন, আপনি হ'লেন প্রেসিডেন্সী ডিভিসন; আপনাকে ঠাট্টা ক'রতে পারি, এমন ধৃষ্টতা আমাদের নেই প্রেমদা।'

—'ঠাট্টার বাকীই রাখলে বড়!' কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ ক'রে অলক্ষ্যেই আবার তাঁর স্বভাবগত হাসি ফেটে পড়েছিল।

চিরকালের অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তি প্রেমদার। প্রাণ খুলে এমন ভাবে কাউকে হাসতে দেখিনি জীবনে। থাকি তখন আমরা যশোহরে। যশোর-খুলনা তখন প্রেসিডেন্সী ডিভিসনেরই অন্তর্গত। প্রেমদাকে ঠাট্টা ক'রলেও অতসী বৌদিকে দেখেছি—প্রেমদাদের সংসারে এসে কেমন অপূর্ব্বভাবে সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। প্রেমদার সাগ্‌রেদ হিসেবে আমরাও বাদ যাইনি। কাছে এসে মিষ্টি হেসে কথা ব'লেছেন, সাদরে চায়ের কাপ এগিয়ে ধরেছেন সামনে, কখনও বা কোনোদিন প্রেমদার কথার অপেক্ষা না রেখেই খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে ব'সেছেন। আমরা লজ্জিত হ'য়েছি সন্দেহ নেই কিন্তু তা নিয়ে কখনও আমাদের অপ্রস্তুত হ'তে দেননি তিনি। বিরাট বনেদী বাড়ী; প্রেমদা যখন হাসতেন, অত বড় বাড়ীখানা সেই হাসির তরঙ্গে নেচে উঠতো। অতসী বৌদি বলতেন, 'তুমি দেখছি ভূমিকম্প সুরু করে দিলে, এরপর যে পেটে খিল্ ধরে দাঁত-কপাটি লাগবে গো।'

হাসির বেগ উচ্চগ্রামে রেখেই আমার দিকে তাকিয়ে প্রেমদা ব'লেছেন, 'শুনলে তো বেণু, বলি তোমাদের বৌদির কথাটা একবার শুনলে তো? আমি যে নকুল কিম্বা সহদেব নই, অর্জ্জুনাগ্রজ বৃকোদর, এ কথাটা ভাবতেই পারে না অতসী। শপথ রেখে যে-দাঁত দিয়ে এতদিন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান ক'রেছি, দাঁত-কপাটি লেগে সে-দাঁত ইচ্ছে ক'রলেই বিদ্রোহ ক'রতে পারে না, কি বলো বেণু?'

কথাটা ব'লবার পিছনে একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য ছিল। প্রেমদাকে নিয়ে আমরা একবার থিয়েটার ক'রেছিলাম: 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'। যাত্রার নাটককে থিয়েটারে রূপ দিয়ে খানিকটা অভিনবত্ব সৃষ্টি ক'রতে চেয়েছিলাম আমরা। গদাবাহী বৃকোদরের ভূমিকাটা নিজে থেকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রেমদা। শারীরিক স্থূলতার দিক থেকে প্রেমদাকে অদ্ভুত মানিয়েছিল। অতসী বৌদির সঙ্গে প্রেমদার তখনও আত্মীয়তা হয়নি, হ'লে দর্শকদের আসন থেকে মনে মনে হাততালী বাজাতেন অতসী বৌদি। দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্যের জন্য পর-পর সাতটা মেডেল পেয়েছিলেন প্রেমদা। পরদিন বাজারে টেনে নিয়ে শশধর ময়রার দোকানে

বসিয়ে আমাদের পেটপুরে রসগোল্লা খাইয়েছিলেন তিনি। মনে মনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম আমরা : এবারে শিগ্‌গীর একটা গতি হোক্ প্রেমদার। অর্থাৎ বিয়ে। সেই বিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হ'লো।

বিষয়টা অতসী বৌদিকে বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, 'আপনি এসে প্রেমদাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে নিয়েছেন, নইলে ইতিমধ্যে আবার কিছু-একটা বই ধ'রে রিহার্সাল স্বরু করে দিতে পারতাম।'

প্রেমদার হাসি এবারে অতসী বৌদির ঠোঁটে এসেও লাগলো ; ব'ললেন, 'থাক্, হ'য়েছে, অভিনয়টা এখনও কিছু কম হ'চ্ছে না। রিহার্সালের পাঠ কন্ঠস্থ-মুখস্ত হয়েছে, আপনাদের দাদাকে একবার সেই কথাটাই শুধু জিজ্ঞেস করুন।'

নিজে কখনও আমি সংসার-অভিজ্ঞ লোক নই। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাই জানিওনা কিছু। অতসী বৌদির কথা শুনে খানিকটা বিস্মিত হলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু দু'একটা দিন কেটে গেলো তার গূঢ় অর্থটা আপনি থেকেই প্রকাশ পেয়ে গেল। অর্থাৎ অতসী বৌদি অন্তঃসত্ত্বা ; প্রেমদার আসন্ন সংসার-বৃদ্ধির একটা আকস্মিক সংবাদ। তাই নিয়ে অতসী বৌদির স্বাস্থ্যের জন্ম ডাক্তার আর নানা কোম্পানীর পেটেণ্ট ফাইল নিয়ে ইতিমধ্যে হিমসিম খেয়ে উঠেছেন প্রেম-দা। অভিনয়ের দিক থেকে দারুন একটা রিহার্সালের ব্যাপার বই কি। স্বামীত্ব থেকে একেবারে পিতৃত্ব : রীতিমত একটা দ্বৈত ভূমিকা। সংসারক্ষেত্রকে যে-মহাকবি একদিন রঙ্গমঞ্চ ব'লে ঘোষণা ক'রে গিয়েছিলেন, মিথ্যে নয় তার একবর্ণও। ঠাট্টা ক'রেই ব'ললাম, 'ক'রেছেন কি প্রেমদা, ইতিমধ্যে বাপ হ'য়ে গিয়ে আপনি যে বুড়ো হ'তে চ'ললেন! একা বৌদির হাত থেকেই আপনাকে ছিনিয়ে নেওয়া কষ্ট, এরপর নন্দন!'

প্রেমদার মুখে এবারে বাচালতার বদলে কেমন একটা অদ্ভুত চিন্তার জড়তা। বললেন, 'ভাবচি, নন্দন না হ'য়ে নন্দিনী হ'লে কি করবো? বাংলাদেশে মেয়ে পার করতে হ'লেই যে কম পক্ষে পাঁচ-সাত হাজার নিয়ে টানাটানি।'

বললাম, 'ছোঃ, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। আপনাকে দেখচি কেষ্টনগরের বাঁসর রাত থেকেই উনপঞ্চাশে ধ'রেছে।'

—'উনপঞ্চাশ, মানে ফর্‌টি-নাইন? হাউ সিলি ইউ আর টকিং!' সহসা প্রেমদার সারা মুখখানিকে বিকশিত করে আবার তাঁর সেই চিরকালের স্বভাবগত হাসির ব্যঞ্জনা বেরিয়ে এলো। বললেন, 'আমার জীবনীশক্তিতে কি এরই মধ্যে ঘুণ ধরেছে বলে বিশ্বাস করো বেণু?'

প্রেমদার মুখে এমন কথা আজ এই প্রথম। সবিনয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করলেই কি আপনি তার প্রমাণ দিতে পারবেন? আপনি আমাদের চিরকালের গদারাহী, আপনি গেলে আমরা দাঁড়াই কোথায়?'

বোধ করি এবারে কিছু-একটা আশ্বস্ত সুখে মুখ বন্ধ করলেন প্রেমদা। মুখ বন্ধ করলেন মানে কথা বন্ধ করলেন না। একটুকাল থেমে পরে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'এবারে সত্যিই আর-একখানা বইটই ধরো বেণু, নইলে কেমন যেন সব ঝিমিয়ে যাচ্ছে। দেশের আবহাওয়াও ইদানিং অনেকখানি বদলে গেছে, এবারে সময়োপযোগী কিছু-একখানি ভাল বইয়ের ব্যবস্থা করতে পারো কি না, দেখ তো?'

আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'এ আর শক্ত কথা কি, কালই আমি কলকাতায় অর্ডার দিয়ে বই আনিয়ে নেবো। কিন্তু বৌদি পারমিট করবেন তো?'

—'বৌদির জন্যে তো আর চক্র ভেঙে যেতে পারে না, চক্রকে বাঁচাতে হবে।'—কথাটা শান্তস্বরে হলেও উত্তেজক সন্দেহ নেই। চিরকালের স্বভাবগত প্রশান্ত হাসির মধ্যে সেই উত্তেজনার একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের কাজে কোথায় একদিকে পা বাড়ালেন প্রেমদা।

এমন মশালের প্রয়োজন ছিল না—যদি না আমাদের সংস্কৃতি চক্রের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হয়ে তিনি আমাদের সাগরেদ করে নিতেন। সেবার কলকাতা থেকে খুব বড় একজন কথাসাহিত্যিক এলেন যশোরে। তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার সূত্র নিয়েই প্রথম আমাদের এই সংস্কৃতি-চক্রের জন্ম। বন্ধুদের মধ্যে কম-বেশী সাহিত্যপ্রীতি ছিল অনেকেরই। বয়স, বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে প্রেমদা ছিলেন আমাদের পুরোধা, সঙ্ঘ করে সঙ্ঘগুরুর আসনটা

তাই প্রেমদাকেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। নিয়মিত প্রতি সন্ধ্যায় সংস্কৃতি চক্রের আসর জ'মে উঠতো। এ জন্য প্রথম প্রথম প্রেমদা তাঁদের বৈঠকখানা ঘরখানিই ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের। গান-বাজনা, আবৃত্তি, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ থেকে সুরু ক'রে চা আর পানের খিলি অবধি কিছুই বাদ যেতো না। কিন্তু অভাব ছিল সত্যিকারের একজন কাহিনীকারের। বিশেষ ক'রে ক'লকাতার সেই খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিককে সম্বর্দ্ধনা জানাবার পর থেকে সে অভাবটা যেন আরও বেশী তীব্র হ'য়ে উঠলো। মাঝে মাঝে প্রেমদা নানা উপকথা বলে আসর খানিকটা জমিয়ে রাখতেন। জানতাম—প্রেমদার মধ্যে একজন বলিষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, খ্যাতিমান একজন কাহিনীকার হ'য়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের মতো প্রেমদারও কম নয়। কিন্তু মুখের কথা কলমে এসে কোথায় যে হারিয়ে যায়, তা প্রেমদার মতো প্রেমদার সাগরেদরও বুঝবার উপায় ছিলনা। প্রেমদা ব'লতেন, 'বার বার অকৃতকার্য্যতাই হচ্ছে নিশ্চিত ফলপ্রসূতার লক্ষণ। অতএব কলম কেউ বন্ধ কোরো না, একদিন এই আসরই হয়ত বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান হ'য়ে দাঁড়াবে।'

ব'লতে লজ্জা নেই যে, প্রেমদার কথাটা সেদিন খুব উৎসাহিত করেছিল আমাদের। সেই থেকে রাত্রির পর রাত্রি জেগে কলমের নিবকে ভোঁতা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু দেখলাম—কোনো একটি লেখাই কিছু-একটা কাহিনী হয়ে উঠলো না। প্রেমদার ইচ্ছে ছিল—নিজেরা গল্প লিখে সেই কাহিনী থেকে নিজেদের নাটক আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করে নেবো। কিন্তু আশা যত বড় ছিল, ক্ষমতা ছিল না তার এক-কড়িও। থাকবে কেমন ক'রে, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'—যেমন প্রেমদা, তেমনি তো তার সাগরেদ হবে।

তবু প্রেমদা ছিলেন আমাদের খাঁটি সোনা। তাতে খাদ ছিল না। অতসী বৌদিকেই তো কতবার ঠাট্টা ক'রে ব'লেছি, 'এমন খাঁটি সোনা যার জীবন-সর্ব্বস্ব, তার দেহে অলঙ্কারের আতিশয্য শোভা পায় না।'

অতসী বৌদি ব'লেছেন, 'আমি তো ছেড়ে রাখতেই চাই, আপনাদের দাদাটিকে সামলান না। কখনও যদি গলার হারটা খুলে রেখেছি, অমনি এসে বলবে—বড্ড শুকনো শুকনো লাগছে তোমাকে।' ব'লে নারীত্বের গৌরবে সলজ্জ-সস্নেহে হেসে ফেলেছেন অতসী বৌদি।

সেই হাসি থেকে প্রেমদার অফুরন্ত পত্নীপ্রেমকে খুঁজে নিয়েছি আমরা। বন্ধুরা মিলে তা নিয়ে কৌতুক ক'রেছি, সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেমদাকে একটা দিনের জন্যও অস্বীকার করতে পারিনি আমাদের জীবনে। তাঁর হাসি ছিল আমাদের সজ্যের প্রাণশক্তি। সেই শক্তিকে লতার মতো জড়িয়ে জড়িয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মুহূর্ত্তগুলি মঞ্জরিত হ'য়ে উঠতো।

কিন্তু এমন মানুষকেও একদিন ছেড়ে আসতে হ'লো। হঠাৎ একটা ব্যবসার সূত্রেই যশোর থেকে একদিন ছিটকে প'ড়লাম এসে ক'লকাতার এই সহরতলীতে। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে একটা যুগ কেটে গেল, লক্ষ্যই করিনি এতদিন। আসার সময় প্রেমদাকে কিছুটা সাংসারিক বিপর্য্যয়ে জড়িয়ে পড়তে দেখে এসেছিলাম। সংসারে তখন তাঁর সৎমা'র একাধিপত্য। আসার সময় ক্ষুণ্ণ মনে দুটো ভালো কথা ব'লেও আমাকে বিদায় দিতে পারেননি প্রেমদা। শুধু ব'লেছিলেন, 'সংস্কৃতিচক্রের ছাদের বড় ইটখানাই যখন খসে পড়লো, তখন এখানেই আমাদের ইতি।'

তারপর কি হয়েছিল, আদৌ সেই চক্র আর বেঁচে রইল কিনা, জানবার অবকাশ হয়নি। দেখতে দেখতে পুরো একটা যুগ কেটে গেছে। ইতিমধ্যে বাংলার উপর দিয়ে মন্বন্তর এসেছে, দাঙ্গার রক্তে সারা পথ ভেসে গেছে দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা এসেছে, কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুদের জীবন-সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জটিল হ'য়ে উঠেছে। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে যখনই অতীত দিন-গুলির দিকে তাকিয়েছি—বনপ্রকৃতির আচ্ছাদনে আবৃত আমার স্বর্ণময়ী জন্মভূমির মধ্যে দু'চোখ মেলে যাঁকে দেখেছি—তিনি প্রেমদা, পাশে তাঁর হরিদ্রাভ অতসী ফুলের মতই সালঙ্কারা অতসী বৌদি।

আজ দীর্ঘ একযুগ পরে প্রেমদাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে অতীত দিনগুলির মতই খুশীতে মনে মনে উফুল্ল হ'য়ে

উঠলাম। প্রথমটা কারুর মুখেই কোনো কথা নেই, তারপর কিছুটা স-রব হ'য়ে প্রেমদাই প্রথম বললেন, 'এতকাল পর আবার তা'হলে তোমার দেখা পেলাম বেণু।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম,'খবর কি, কোথায় আছেন প্রেমদা ?'

স্থানের নির্দ্দেশ দিয়ে প্রেমদা ব'ললেন, 'চলো, বাড়ীটা একেবারে চিনেই আসবে।'

হাতে জরুরী কাজ ছিল, তাই বাধা দিয়ে ব'ললাম, 'আজ থাক্, যায়গা যখন চেনা রইল; তখন ইতিমধ্যেই একদিন গিয়ে উপস্থিত হবো। বৌদিকে আমার নমস্কার জানাবেন।'

—'জানাবো।' একটুকাল থেমে প্রেমদা বললেন, 'তা হলে এক কাজ করো বেণু, কাল বাদে পরশু র'ববার আছে। সকালের দিকেই আমার ওখানে চ'লে এসো, খাওয়া দাওয়া ক'রে সারাদিন কাটিয়ে তবে আসবে।'

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটায় আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রেমদার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটুকু আর ব্যক্ত করতে পারলুম না। রাজি হ'য়ে ব'ললাম, 'বেশ, তা-ই যাবো।'

খুসী হ'য়ে বিদায় নিলেন প্রেমদা।

তাকিয়ে দেখলাম—হাটতে গিয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছেন। যে স্বাস্থ্য নিয়ে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় বৃকোদরের অভিনয় ক'রেছেন, সে স্বাস্থ্য আজ আর নেই। একটু আগে কথা ব'লতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম—চোখ দু'টো অনেকখানি ভিতরের দিকে ব'সে গেছে, সারা মুখ কেমন একটা ক্লান্তিতে বিষণ্ণ। তবু মুখের উপর কেন যেন জিজ্ঞেস করতে পারিনি, 'এ কি চেহারা হ'য়েছে আপনার প্রেমদা ?'

একটা দিন বাদ দিয়ে র'ববার বেশ ভোরে-ভোরেই শিয়ালদায় এসে ট্রেন ধ'রলাম। প্রেমদাদের কলোনীতে যেতে হ'লে ট্রেনেই সুবিধা। শিয়ালদার সাউথ ষ্টেশনে এসে টিকিট কাটলে আর কোনো হাঙ্গামা নেই। সোনারপুরে নেমে মিনিট পনেরো হাটলেই কলোনী। নানা লোকের কাছে জিজ্ঞেস ক'রতে ক'রতে এগোচ্ছি, কিন্তু প্রেমদার পরিচিত কাউকে পেলাম না। মনে মনে ক্ষোভ হ'লো : একদিন যাঁর সাগরেদি গ্রহণ ক'রে আমরা সংস্কৃতি-চক্র গ'ড়ে তুলেছি, এখানে তাঁকে চিনবার মতো একটি লোকও নেই। অবশেষে বছর বারো-তেরোর একটি ছেলে ইজ্জত বাঁচালো। সে-ই চিনিয়ে নিয়ে এলো প্রেমদার ঘরে। এতক্ষণে বুঝলাম—ছেলেটি প্রেমদারই প্রথম সন্তান : ঘুটু। যশোরে থাকতে এই ঘুটুকেই হ'তে দেখে এসেছিলাম। লিকলিকে স্বাস্থ্য, বাপের স্বাস্থ্যের এক কণাও তার গায়ে নেই। আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রেমদা বললেন, 'কাকাবাবুকে প্রণাম কর ঘুটু।'

এতক্ষণে ঘুটু একেবারে লজ্জায় ভেঙে প'ড়লো। মাথা নিচু ক'রে আমার পায়ের দিকেই তার হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'থাক্, প্রণাম আর তোমাকে ক'রতে হবে না। এই দিয়ে ইচ্ছে মতো কিছু কিনে খেয়ো, কেমন ?'

হাতে টাকা পেয়ে লজ্জা আর ভয় মেশানো কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার বাবার মুখের দিকে একবার তাকালো ঘুটু, তারপর একদৌড়ে একেবারে অন্দর-মহল।

অন্দরমহল ব'লতে অবশ্য বাড়ীটার তেমন কিছু একটা আব্রু ছিল না। ছোট ছোট দু'খানি চালাঘর কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছে; বাড়ীর চতুঃসীমানায় বাখারীর ভাঙা বেড়া নড়বড় ক'রছে। কোথায় সেই যশোরের চক্-মেলানো বনেদী বাড়ী, আর কোথায় এই রিফিউজী কলোনীর জীর্ণ কুটির। মনে মনে দুঃখ হ'লো। সেটুকু নিজের মধ্যে চেপে নিয়ে ব'ললাম, 'ঘুটুকে না পেলে আমাকে হয়ত আজ ফিরেই যেতে হ'তো প্রেমদা। ঘুটু যে এতবড় হ'য়েছে ভাবতেই পারিনি।'

প্রেমদা বললেন, 'তুমিও তো যশোর ছেড়েছ আজ বছর বারো। এর মধ্যে ঘুটুর কণিষ্ঠেরাও যে তরতর ক'রে কলাগাছ হ'য়ে উঠেছে।'

শুনে আশ্চর্য্য হ'লাম।—'বলেন কি, ঘুটুর তবে আরও ভাই-বোন আছে!'

—'এ আর নতুন কথা কি, তোমাদের বৌদি যখন আছেন, তখন এরাও আছে, সর্ব্বত্র প্রায় সব ঘরেই

থাকে।' ব'লে এতকাল বাদে প্রেমদা আজ এই প্রথম আবার তাঁর সেই স্বভাবগত হাসি হাসলেন। বড় মিষ্টি, বড় প্রাণখোলা। তবু লক্ষ্য ক'রলাম—হাসির আড়ালে আজ কোথায় যেন মস্তবড় একটা বেদনা লুকিয়ে রয়েছে।

ঘরের আড়াল থেকে কড়ার উপর খুন্তির আওয়াজ এসে কানে বাজ্‌ছিল। ব'ললাম, 'কই, বৌদিকে খবর দিন।'

—'খবরের কি বাকী আছে মনে ক'রেছ? বসো, এক্ষুণি এসে যাবে।' ব'লে খাঁকারি দিয়ে গলাটা একবার পরিষ্কার ক'রে নিলেন প্রেমদা।

ভাব্‌ছি—এবারে কি প্রসঙ্গ টানা যায়, ইতিমধ্যে স্বয়ং অতসী বৌদি এসে সাম্‌নে উপস্থিত। এতটুকুও সংকোচ নেই, এতটুকু ঢাকাঢাকি নেই কোথাও; সারা শাড়ীতে লঙ্কা আর হলুদের দাগ, শাড়ীখানিও সেই পরিমাণে মলিন। এসে দাঁড়াতেই দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার জানিয়ে বল্‌লাম, 'চিন্‌তে নিশ্চয়ই অসুবিধে হ'চ্ছে না বৌদি, তারপর—খবর কি বলুন?'

অতসী বৌদি ব'ললেন, 'আস্‌তে খুব কষ্ট হ'য়েছে, তাই না? বসুন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, চা খেয়ে কিছু-ক্ষণ বিশ্রাম করুন; ততক্ষণে রান্না নেমে যাবে।'

ব'ললাম, 'রান্না দু'দণ্ড দেরীতে হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি, রববারে সাধারণত দেরী ক'রে খাবারই অভ্যাস। এ জন্তে আপনাকে তাড়াহুড়ো ক'রতে হবে না।'

দরজার আড়ালে নজরে পড়ছিল গিনিপিগের মতো অনেকগুলো মুখ। তাদের সাড়া পেয়েই বোধ করি প্রেমদা বললেন, 'কই গো, তোমার রেজিমেন্টের সঙ্গে বেণুকে একবার পরিচয় করিয়ে দাও।'

মুখ টিপে হেসে অতসী বৌদি ব'ললেন, 'পরিচয় আর করিয়ে দিতে হবে না, এরপর বেণু ঠাকুরপো নিজেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবেন।'

প্রেমদা ব'ললেন, 'বুঝলে বেণু,—তের, নয়, সাত আর চার, আপাতত এই চারে এসে চতুর্ব্বর্গে দাঁড়িয়েছে।'

—'মানে?'

—'মানে—হুটু, রীণা, পিন্টু আর আন্না।' থেমে দরজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে প্রেমদা ব'ললেন, 'দেখ না, রেজিমেন্ট-পাওয়ার ইতিমধ্যেই এক্সারসাইজ্ ক'রতে সুরু ক'রেছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা দুপদাপ শব্দ। এতক্ষণ গিনি-পিগ ব'লে যাদের মনে হ'য়েছিল, এবারে অশ্বখুরের তীব্র ধ্বনিতে মেঝের উপর পদশব্দ রেখে ছুটছাট কোথায় যে কে স'রে প'ড়লো—বোঝা গেল না। অতসী বৌদিও আর অপেক্ষা ক'রলেন না। সম্ভবতঃ চায়ের জল উনুনে চাপাতেই আবার তিনি অন্দর মহলের দিকে পা বাড়ালেন।

হুটু, রীণা, পিন্টু আর আন্নার সঙ্গে পরিচয় হ'তে সত্যিই কিন্তু দেরী হ'লো না। বার কয়েক সাম্‌নে দিয়ে ঘোরাঘুরি ক'রলো, তারপর কে কাকে ডিঙিয়ে আগে আসতে পারে কাছে, তাই নিয়ে পাল্লা। সময় কাটাবার দিক দিয়ে মন্দ নয়।

ক্রমে খাওয়া দাওয়া চুকে গেল। যত্ন পরিপাটির অন্ত নেই অতসী বৌদির। মাছ-মাংস-পোলাও-এর ব্যবস্থা না হ'লেও পাঁচ পদ নিরামিষের সঙ্গে গরম ভাত বেশ লাগলো। এক সময় রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে সুস্থির মতো এসে দু'দণ্ড কাছে ব'সলেন অতসী বৌদি। এত-ক্ষণে একবার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম তাঁকে। একদিন যাঁর কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং ছিল, আজ তা প্রায় কালসে হ'য়ে গেছে। দেখে মনেই হয় না—প্রেমদার বরযাত্রী হ'য়ে এই মেয়েকে আমরা কোনোদিন কৃষ্ণনগর থেকে তুলে এনেছিলাম। প্রেমদাকে বল্‌তে যাচ্ছিলাম, 'বৌদির স্বাস্থ্যের দিকে আপনি কি একটুও নজর দিতে পারেন না?' কিন্তু মুখে এসেও কথাটা বেধে গেল। কাকে ব'লবো? যা স্বাস্থ্য হ'য়েছে, তাতে নজরটা যে প্রেমদার দিকে না দিলেও নয়। কতবড় বনেদী ঘরের ছেলে, আজ যেন শাপগ্রস্ত হ'য়ে জীবন থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়েছেন!

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে ব'ললাম, 'যশোর ছেড়ে আসার সময় আপনার যেন পারিবারিক কি একটা গণ্ড-গোলের কথা শুনে এসেছিলাম প্রেমদা, এখন তো আর কোনো ঝামেলা নেই?'

—'না, সব ঝামেলা কাটিয়েই তবে পথে বেরিয়েছি।'

থেমে প্রেমদা বলতে আরম্ভ করলেন, 'বাবার ইচ্ছে ছিল, নতুন মা-ই যাতে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বুঝে নেন। শেষ পর্য্যন্ত হ'লোও তাই। বাবা জীবিত থাকতে লজ্জায় কাজটা চুকিয়ে যেতে পারলেন না। বাবা সংসার থেকে চক্ষু বুজে গেলে নতুন মা'র হ'য়ে তাঁর ছেলে হেমই দু'কথা ব'লতে সুরু করলো। শুনলাম—আমার অংশ নাকি আমাকে লিখে দিয়ে তারা আলাদা হবে। বললাম, অত দিয়ে কাজ কি, স্টেজ বেঁধে অভিনয় করলেও ঘরে বসে কোনোদিনই অভিনয় করতে পারবো না, ও বিদ্যেটা কোনোকালে শিখিনি। তার চাইতে আর, আমার অংশটাও তোর নামেই লিখে দি। সঙ্গে সঙ্গে হেম দেখলাম রাজি হয়ে গেল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস টেনে বাঁচলাম। ছুটু তখন কোলে, অতসী আর ছুটুকে নিয়ে সেদিনই ভেসে পড়লাম পথে। সামান্য পুঁজি যা পকেটে ছিল, তাই দিয়েই কিছুকাল লড়লাম। ছুটুর মুখে একফোঁটা দুধ পর্য্যন্ত তখন দিতে পারিনি। ভাবলাম—গ্রামে গিয়ে কিছু জমি-জিরেত নিয়ে চাষবাস করি, নিলামও বটে, কিন্তু কপালে টিকলো না। রাষ্ট্রবিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। বাংলা ভাগ হয়ে গেল। প্রাণ নিয়ে সবার মতো আমরাও যশোরের মাটি ছেড়ে পালিয়ে এলাম। কিন্তু এ কোথায় এলাম ?...'

বলতে গিয়ে চোখ দুটো একবার চক্ চক্ করে উঠলো প্রেমদার। এমন সাধ্য রইল না যে সহজভাবে সেই চোখ দুটোর দিকে তাকাই। অতসী বৌদি তখনও ঠায় একই ভাবে বসে আছেন। বাচ্চাগুলো একএকবার কাছ দিয়ে এসে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু প্রেমদা বা অতসী বৌদির সেদিকে লক্ষ্য নেই। স্বল্পকাল থেমে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন প্রেমদা: 'চেষ্টা করে একটা কন্‌ট্রাক্‌টারীর কাজ ধরলাম। না ধরে উপায় কি! সংসারে দু'জনের যায়গায় হয়েছে দু'জন, খেয়ে পরে বাঁচতে তো হবে। সেই সঙ্গে মাথা গুঁজবারও একটা চালা চাই। কোনোদিন এসবে তো বড় একটা অভ্যাস ছিল না, বাঁশ জোগাড় করে কখনও নিজের হাতে স্টেজ বাঁধতেও শিখিনি, বাড়ী তো দূরের কথা। কিন্তু দেখলাম, সংসারে কারুর জন্যে কিছু আটকায় না। চেষ্টা করে দুটো চালাও দাঁড় করালাম। কিন্তু বাজারে মন্দা; কন্‌ট্রাক্‌টারিতেও এখন আর কিছু হচ্ছে না বেণু। আমাদের জীবনে এ যে কী স্বাধীনতা এলো, শুধু সেই কথাটাই ভাবি। দুঃখ হয়—যখন চোখের সামনে ছেলে-পিলেগুলোকে কাঁদতে দেখি; একটা ভালো জামা পর্য্যন্ত কিনে দিতে পারিনা ওদের।'

অলক্ষ্যে প্রেমদার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

বললাম, 'এ অভিশাপ তো শুধু আপনার জীবনেই নয় প্রেমদা, মধ্যবিত্ত বাঙালীমাত্রের জীবনই আজ এই দারুণ অভিশাপে জর্জ্জরিত। এ জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই; সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে, সংগ্রাম করেই নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। যে গদায় একদিন দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ হয়েছে, সে গদা কি উত্থিত হ'য়ে কখনও দেশের অন্যায় অব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে পারে না ?'

—'একদিন পারতো, কিন্তু আজ আর পারে না।' ব'লে আরও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন প্রেমদা, ইতিমধ্যে অতসী বৌদি বললেন, 'আপনাদের কার্য্যে কিম্বা অন্য কোনো যায়গায় কিছু-একটা বাঁধা মাইনের আপনাদের দাদাকে কি ঢুকিয়ে দিতে পারেন না? একবার দেখুন না ভাই চেষ্টা ক'রে? নইলে সংসার এখন আর আদৌ চলছে না।'

চলছে যে না, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। অথচ প্রেমদার এ অবস্থা দেখবার জন্য আদৌ কোনোকালে প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের উষর মরু-ভূমিতে একদিন প্রেমদা ছিলেন ওয়েসিস্, তাঁকে অবলম্বন করেই একদিন আমরা জয়যাত্রার পথে পা বাড়িয়েছিলাম। সে যাত্রা শুভ হয়নি জানি, কিন্তু তাই ব'লে প্রেমদার জীবনে যে এমন অশুভ গ্রহ এসে ভর করবে, এ কথা কল্পনাও করতে পারিনি কোনোদিন। প্রেমদার ঘরে নেমন্তন্ন খেয়ে এখন মনে হলো—এ বাজারে অনর্থক কতকগুলো বাজে খরচের বোঝা চাপিয়ে প্রেমদাকে শুধু বিব্রত করা হ'লো। সেই সঙ্গে অতসী বৌদির দুর্ভোগটাই বা কম কি!

বল্লাম, 'চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করবো, তবে বাজারের যা অবস্থা—তাতে কোথায় যে কি সুবিধে করে উঠতে পারি, বলতে পারছি না।'

বাড়ীর ভিতরের দিকে গিয়ে ইতিমধ্যে পিন্টুরা বোধ করি নিজেদের মধ্যে কি-একটা নিয়ে মারপিট সুরু ক'রে দিয়েছিল, জবাবে কিছু একটাও তাই না বলে ত্রস্তে সেইদিকেই উঠে গেলেন অতসী বৌদি।

নিজেও এবারে উঠে পড়তেই যাচ্ছিলাম। কথায় কথায় কখন যে সারা সোনারপুরের উপর দিয়ে গোধূলির ছায়া নেমে এসেছিল, এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। ছ'টা পাঁচের ট্রেন ধরতে না পারলে নিজেরই অসুবিধে। ব'ললাম, 'আজ তবে আসি প্রেমদা, চাকরীর কথা আমার মনে রইল, খোঁজ খবর ক'রে দেখি—কোথায় কি ক'রতে পারি।'

—মেঝের পাতা ফরাসের উপর থেকে উঠে এসে এবারে চৌকাঠের উপর পা রাখলাম।

সম্ভবতঃ টের পেয়েছিলেন অতসী বৌদি। তাই ছেলে-মেয়েদের যথাসম্ভব শাসন ক'রে একটুকালের মধ্যেই আবার তিনি ফিরে এলেন। ব'ললেন, 'এরই মধ্যে তা হ'লে উঠে প'ড়লেন বেণু ঠাকুরপো? চা খেয়ে যাবেন না?'

বললাম, 'দুপুরে যা খাওয়ালো—তা হজম হ'তেই আজ রাত কাবার হবে, এর উপর আবার চা!'

আঁচলের একটা পাশ দাঁতে কামড়ে নিবে অতসী বৌদি ব'ললেন, 'ঐ একটা খাওয়া তাই নিবে আবার ঠাট্টা! দুধ মাছ ভিন্ন আমরা কোনোদিন কিছু মুখে তুলেছি, ব'লতে পারেন বেণু ঠাকুরপো?'

কথাটার কিন্তু সত্যিই এবারে জবাব দিতে পারলুম না। শুধু অতসী বৌদির মুখের উপর দিয়ে নীরবে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সামনের পথে পা বাড়ালাম। তাকিয়ে দেখলাম—গোধূলির ছায়ার মতই প্রেমদার মুখখানি ম্লান। কোনোদিন উচ্ছ্বসিত হাসি ছাড়া মুখে কখনও মালিন্য দেখিনি। সোনার মতো উজ্জ্বল ছিলেন সেদিন প্রেমদা। আজ সোনারপুরে এসে ঘর বাঁধলেও প্রেমদার মধ্যে সে সোনা কবেই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

অভীপ্সা

শ্রীঅধীর মল্লিক

কোথায় রাখবো বলো উর্ম্মিল হৃদয়—
নাই যদি দিতে পারি এখনি তোমাকে,
কি করে শান্ত হ'বে উতলা এ প্রাণ—
রজনীগন্ধা ফুল দেবো বলো কাকে?

কত গান জেগে ওঠে ভোরের আলোয়,
প্রাণে কতো আশা জেগে ওঠে;
ফুলের মতোন তুলে থরে থরে ভরি—
হৃদয়ের ফুলদানী কোথায় যে জোটে?

তাই আজ যত ভোর নীল আকাশের,
কালো মেঘে কালো হ'য়ে গেছে;
এই কালো দেখব বা কার কালো চোখে,
কালো দিয়ে কালোকে ঢেকেছে!

বার বার দুর্ব্বার এই ক্লেষ্ট প্রাণ—
মৃগাক্ষী! তুমি নেবে নাকি?
এই প্রাণ সাগরের মতো উর্ম্মিল:
বসো তবে, বলো একে কোনখানে রাখি?

গঙ্গা মড়া আলেন না

সত্যপ্রিয় ঘোষ

পেটে না খেলেও পিঠে সয়। যার সয় না সে আর যাই হোক লেখক হ'তে পারে না। পারে না যে—তার ভুরিভুরি আত্ম-অভিজ্ঞতা আমার আছে। তার একটি শুনুন আপনারা।

এখন, নেশা লেখক হব ব'লেই বোধ হয়; কপালগুণে পেশা বরণ করতে হয়েছে আমার রাইটার্স বিল্ডিংএ কেরাণীগিরি। একদা অফিসে ব'সে সেই দিনগত পাপ-ক্ষয় ক'রে চলেছি কলুর বলদের মত, এমন সময়ঃ 'কী দাদা, বদ্ধ্‌টং তল্লিখিতং কচ্ছেন ব'সে ব'সে। দুন্দুর, বলি হবেটা কী ও ক'রে'—বলতে বলতে পাশে এসে, পাশে স্থিত টুলটায় বসলেন রেফারেন্স সেক্‌শনের বরেনবাবু এবং আমি কলম ফেলে দিয়ে নয়নে মধু ঢেলে দিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে।

'সকালে বিকেলে করেন কী'—বরেনবাবু, মনে হ'ল আমার, কোন সীরিয়স কথা বলবেন আমাকে। সুতরাং আমিও মধুর ভাবটা কাটিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, যদিও ব'লে ফেললামঃ 'কী আর করব বলুন, সকালে ইহকাল এবং বিকেলে পরকালের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি চটকাই।'

হেসে উঠলেন বরেনবাবু। নীরব পেট-উথলানো আকুল হাসি। তারপর বললেনঃ 'আপনারা মশাই সাহিত্যিক-আত্তিক মানুষ, বেশ রস দিয়ে কথা বলতে জানেন। আর সেইজন্যেই না আপনার কাছে আসা ভাই। তা রস ছাড়ুন মশাই—কাজের কথা, টিউশানি করবেন—অ্যাঁ?'

ট্যুইশনি। হাতে স্বর্গ। কিন্তু না, আগেই অত উৎসাহ না, না আঁচালে বিশ্বেস নেই, অতএব বললামঃ 'সে আর বলতে। দেবে কত?'

'কত চান? ম্যাট্রিক ক্যাণ্ডিডেট। চল্লিশ পাবেন। আপনার খচ্চা নেই কিছু, হাঁটাপথেই হবে।'

'এ তো চমৎকার অফার। ছেলে না মেয়ে? রেগুলার না প্রাইভেট?'

'রোকৃখে—এত প্রশ্ন একসংগে না, মেয়ে না, ছেলে। কিন্তু গ্যাঁড়াকল তো সেখানে নয় দাদা, অন্য কোথা অন্য কোনখানে। ছেলেটের পাঠ্যপুস্তকে একেবারে মন নেই মশাই। রবীন্দ্রনাথের মত আর কি—কাব্যের ব্যামো আছে কিনা। সেইজন্যে ইস্কুল-কিস্কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে বহুকাল। অ্যাই। ভাবছেন তো ছেলেটির বয়সের তবে নো-ট্রি নো-স্টোন। নট ছাট। সতেরো-আঠারো বড় জোর বয়স হবে ছেলেটির, সুতরাং দেয়ার ইজ ইয়েট টাইম। আমিই ওটাকে পড়াচ্ছিলুম মশাই—কিন্তু যার কর্ম তারে সাজে। গ্রামার ট্রানস্লেশন শেখাতে পারি দাদা, কিন্তু আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কবি-সাহিত্যিক ছিলো না মশাই, আমি কোন্ ছার—কেমন ক'রে পদ্য মেলাতে হয় আর নাটক লিখতে হয় সে তো জানিনি দাদা।'

যখন বুঝলাম বরেনবাবু সত্যিই থেমেছেন, তখন সভয়ে জিগেস করলামঃ 'আমাকে কি তাহ'লে কবিতা লেখা শেখাতে হবে ওকে?'

'নট নেসেসারিলি। যখন কবিতার তাল করবে, তালে তাল ঠুকে যাবেন একটু। আমি মশাই ঐটেই আর পেরে উঠলাম না। কালকে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল আপনার কথা—অ্যাঃ, আরো আগেই যে কেন এটা স্ট্রাইক করে নি আমার, তাই ভাবি। আপনার সংগে ভাই ছেলেটির একেবারে যোগ্যং যোগ্যেন হবে—আই থিঙ্ক সো। আর তাছাড়া স্টুডেন্ট ইরেগুলার হলে হবে কি, পেমেন্ট রেগুলার। ছেলের বাবা রেলের বিগ অফিসার। কিন্তু ছেলেটার এদিকে বিদ্‌ঘুটে নেচার, বলে 'চাকরি করব, সেল্‌ফ-সাপোর্টিং হব'—ব'লেই একটা অশ্রাব্য খিস্তি ক'রে ফের বলতে লাগলেন বরেনবাবুঃ

'কী আর করা, নন্দদুলাল বায়না ধরেছেন চাকরি করব, বাপে রেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে কী একটা কাজে। আপনার ছাত্র তাই তাহ'লে বুঝতেই পারছেন, ট্যাক্‌ল্‌ করা একটু ডিফিক'ল্ট হবে। তবে আপনারা তো হিউম্যান সাই-কোলজিতে ওস্তাদ, আপনি হয়ত ওর নেচারটা ষ্টাডি ক'রে নিয়ে ওকে ঠিক বাগে এনে ফেলবেন—আমি মশাই ঐটেই আর পেরে উঠলাম না'—ব'লে নস্যি নেবার জন্যে নীরব হলেন বরেনবাবু।

'আমি কি পারব'?—ক্ষীণস্বরে অভয় চাইলাম আমি।

'না না, না পারার তো কিছু নেই। আমার তো মনে হয় আপনার ভালোই লাগবে। পড়ানোও হবে, অ্যাট দি সেইম টাইম কাব্যচর্চাও হবে। ড্রাজারি লাগবে না। ওঃ আমার ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে না তিনটে মাস—পেট পেট দাদা, পেট! নয়ত শালার এমন ঝকমারি ভদ্দরলোকে করে। হাঃস্‌!'

বরেনবাবুর রকম দেখে আমার হাসি পায়। কিন্তু যত হাসি তত কান্না ভেবে আর হাসলাম না। হাসি চেপে গিয়ে বললাম: 'কোন ইয়ারে অ্যাপিয়ার হবে?'

'যে ইয়ারে পেরে ওঠেন মশাই। ওর বাপ খুব কনসিডারেট আর উদারনৈতিক বুঝলেন। তাঁর স্রেফ বলাই আছে ছেলে পড়ুক না পড়ুক, পাশ করুক ছাই ফেল করুক, এ ইয়ারে অ্যাপিয়ার হোক কি যে-ইয়ারে পারে অ্যাপিয়ার হোক—মোদ্দা টিউটর যদি লেগে থাকে ওর পেছনে তো তার মাইনেটি মাস পয়লা বাঁধা। ইয়েস আই স্যাটিস্ফাই। আমি পেরেছি যে, কিন্তু আর পেরে উঠলাম না দাদা'।—গভীর যন্ত্রণার থেকে কথাগুলো ব'লে বিমর্ষ এবং ব্যাজার মুখে বরেনবাবু একটু থু-থু করলেন এবং আরো বললেন: 'কিন্তু যাই বলুন আর তাই বলুন, ছেলেটির মধ্যে কিন্তু পার্টস্‌ আছে—এ কিন্তু নো ওয়ান ক্যান ডিনাই।' আর কথা বাড়ালাম না। ঠিক হ'ল ওঁর সংগে আমার, কাল সকালবেলা আমি যাব ওঁর বাড়ী, উনি নিয়ে যাবেন আমাকে যথাস্থানে এবং আমি লেগে যাব কাজে।

গেলাম তাই। একেবারে টাইম-মাফিক। সারাটা রাস্তা ভদ্রলোক আমার কানের পোকা খসালেন। তাঁর কথাবার্ত্তায় স্পষ্টই বুঝলাম এমন ট্যুইশনিটা এমনি স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করতে তাঁর প্রায় পুত্রশোকের যন্ত্রণা হচ্ছে। আর এও জানালেন তিনি আমাকে যে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব তাঁর জীবনে হবে জানলে তিনি আর্লি লাইফে সাহিত্যচর্চাও একটু ক'রে নিতেন, কেননা বললেন তিনি সাহিত্যচর্চা জিনিসটা আর্লি লাইফে শুরু না করলে পরে আর হয় না। পরে শুধু পস্তানোই সার। যেমন নাকি ন্যাজে-গোবরে হ'তে হ'ল তাকে শেষ পর্য্যন্ত একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরার কাছে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুললো দিব্যি ফিটফাট সুদর্শন একটি ছেলে, খুলেই ছেলেটি সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানালো বরেনবাবুকে: 'একি স্যর আসুন আসুন—আজ সকালেই যে?'

'তোমার বাবা বাড়ী আছেন দিব্যেন্দু?'

'বাবা?'—এবার আমাকে এক ঝলক পরীক্ষা ক'রে নেয় দিব্যেন্দু, তারপর বলে: 'ও, বাবার সংগে বুঝি? আমার সম্বন্ধে কনসাল্ট করবেন বুঝি?'—মুচকে হাসলো দিব্যেন্দু, বললো: 'বসুন না, বাঃ দাঁড়িয়ে কেন। ডেকে দিচ্ছি বাবাকে, বসুন'—ব'লে আমাদের চেয়ার দুটো একটু টেনে দিয়ে দিব্যেন্দু চলে গেলো ভেতরে।

এটা বৈঠকখানা। বললেন বরেনবাবু খাটো গলায়: 'এই-ই আপনার ছাত্র।'

বৈঠকখানাটি বেশ বড়োসড়ো। এককোণে দেখলাম দুটি আট-দশ বছরের ছেলে আর একটি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে পড়াচ্ছে আমারি মত এক রোগাপটকা মাষ্টার। বরেনবাবু মেয়েটির দিকে আঙুল না-দেখিয়ে বললেন আমাকে আস্তে: 'ঐ মেয়েটি খুব ইন্টেলিজেন্ট। ওর নাম হচ্ছে মীরা। ঐ টিউশনিটা যদি আমি পেতুম তো রাজের কাজ হত।'

জিগেস করি: 'কে ওরা?'

'অ্যাঁ? ওরা? সর্বই মিষ্টার লাহার ছেলেমেয়ে। চুপ, ওরা টের পাচ্ছে।'

এলেন মিঃ লাহা। বেশ লম্বা চওড়া দিব্যি বাস্থি নধর চেহারা। দিব্যেন্দু আসেনি পেছন-পেছন। বরেনবাবু খাটো গলায় আলাপ করলেন ওঁর সংগে, আমার পরিচয়

পেশ করলেন আর উনি আমাকে এইটুকু বললেন মাত্র : 'তা আপনার কি সকালে সুবিধে? বিকেলে আসতে পারেন না?'

'আমার বিকেলেই সুবিধে'—বললাম আমি।

'ওরে কে আছিস'—মিঃ লাহা ডাক দিতেই এক চাকর এসে উপস্থিত : 'দিব্যেন্দুকে ডেকে দে।'

এলো দিব্যেন্দু।

'দিব্যেন্দু, আজকে থেকে ইনি তোমাকে পড়াবেন। প্রণাম করো ওঁকে'—বললেন মিঃ লাহা।

সস্মিত মুখ দিব্যেন্দুর। এগিয়ে এসে পট ক'রে আমাকেই শুধু না, সংগে সংগে বরেনবাবু এবং মিঃ লাহাকেও ও প্রণাম ক'রে ফেললো।

যাক। সন্ধ্যের সময় গেলাম দিব্যেন্দুকে পড়াতে। কড়া নাড়তেই দিব্যেন্দুই দরজা খুললো। 'ও এসে গেছেন আপনি!'—যেন ঠাট্টা করলো আমাকে দিব্যেন্দু, কিন্তু তার পরেই ওর কণ্ঠস্বরে পুরোদস্তুর ভদ্রতা ফুটলো : 'আসুন স্যর আসুন। বসুন এই চেয়ারটায়। এইটেই আমার লেখাপড়ার টেবিল। তবে স্যর আপনারা যাকে বলেন লেখাপড়া, সে আমার হবে না। ইম্‌পসিব্‌ল! যাক, আপনি একটু বসুন স্যর, আমি আসচি এক্ষুনি। আমার ঠাকুমার খুব অসুখ কিনা সকাল থেকে। আমাকে বেশ একটু কেয়ার নিতে হচ্চে। বাড়ীর আর সবাই বুঝলেন স্যর, অসুখটাকে মোটেই ইন্ দি ট্রু সেন্স্ অব দি টার্ম নিচ্ছে না। হাজার হোক মেয়েছেলে তো, বুঝলেন কিনা স্যর। অথচ রোগটা কী জানেন? আমি কিন্তু স্যর লক্ষণগুলো দেখে ঠিক ডায়াগনাইজ ক'রে ফেলেছি। করোনারি থ্রম্বোসিস। আজকাল ঘরে ঘরে হচ্চে। পেপারে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। যাক, বসুন আপনি আসচি'—বলে দিব্যেন্দু পেছন ফিরতেই ধপাস ক'রে বসে পড়লাম আমি নির্দিষ্ট চেয়ারটায়।

কিন্তু চৌকাঠ থেকেই ফিরলো দিব্যেন্দু। 'আচ্ছা যাব স্যর, আপনি যখন এসচেন'—বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে তেরছাভাবে সে যেন আমার সংগে গাল-গল্প করতে বসলো। একটা পা আর একটা পায়ের ওপর রেখে সে সেকেণ্ড-কয়েক চোখ বুজে কী ভাবলো আর তারপর বললো : 'আচ্ছা স্যর একটা কথা জিগেশ করি যদি কিছু মাইণ্ড না করেন।'

বলা বাহুল্য আমি হাঁ-না কিছুই বললাম না। আমি তখন ভাবছি এখন এখান থেকে বেরুই কী ক'রে। একবার বেরুতে পারলে তারপরে হবে মোকাবেলা বরেনবাবুর সংগে। কী শত্রুতা আমি করেছিলাম ভদ্রলোকের যে—যাক পরের কথা পরে। এখন মানসম্মান বজায় রেখে বেরুনোর পথ খুঁজতে হয় এখান থেকে।

'কথাটা কি জানেন স্যর, আমি বুঝতে পাচ্ছিনে বরেনবাবু এটা কল্লেন কি! ওঁর সংগে আমার অনেকটা পড়তা হ'য়ে এসচিলো, তা হঠাৎ ছুট করে কেটে পড়লেন। অথচ স্যর উনি কিন্তু বেশ ইন্টেলিজেন্ট! অবশ্য সাহিত্য বিষয়ে একটু গোঁপখেজুরে আছেন—যাকে বলে একেবারে কুড়ের বাদশা। একটা নাটক পড়তে দিয়েছি তা দু-মাসের মধ্যে সেটা পড়েই উঠতে পারলেন না স্যর! তা ওতে তো আমি মাইণ্ড করিনি। পষ্টই বলেছিলাম, বুঝিছি স্যর নাটক জিনিসটা ঠিক আপনি ধাতস্থ করতে পারছেন না। নেভার মাইণ্ড, ফিরিয়ে দিন না। সব জিনিস সবাইকে বুঝতে হবে তার কী মানে আছে।'

প্রাণপণে আমি তখন আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব আমার দু-চোখে এনে জড়ো করবার চেষ্টা করছি—যদি ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে এই ডেঁপো ছেলেটাকে বশে আনা যায় (মাস-মাস চল্লিশ টাকার কথাটা আমি তখনো ভুলিনি), হঠাৎ আমি আমাকে বলতে শুনলাম অমোঘ কণ্ঠস্বরে : 'চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে এসে বোসো আর ইংরেজি বইটা খোলো।'

ঈষৎ রাগ করলো দিব্যেন্দু। কিন্তু আমার আদেশ পালন করলো সংগে সংগে। ক'রে বললো বইটা বন্ধ ক'রে ফেলে : 'আচ্ছা স্যর একটা কথা জিগেস করি যদি মাইণ্ড না করেন। কথাটা কি, আপনি কি পারবেন আমাকে পড়াতে? আজকাল কোর্স যা করছে না ডিপিআই—ওফ্ হরিব্‌ল্! আচ্ছা আপনি কি গ্র্যাজুয়েট?'

লুকোব না আমি আপনাদের কাছে যে এর উত্তরে আমি চড় কষিয়ে দিই নি ওর গালে, এমনকি কঠিন

চোখেমুখে তাকিয়েও থাকলাম না, বরং যেন বোকার মত ঘাড় নাড়লাম আমি সংগেসংগে।

'গ্রাজুয়েট আপনি? আই সি। তবে আর পারবেন না কেন। বরেনবাবুও গ্র্যাজুয়েট—তার ওপরে আবার সেকেন্ডে গ্র্যাজুয়েট, মানে ভেজালটি পাবেন না। যেটুকু শিখেছেন একেবারে খাঁটি। নোট মুখস্থ পাশ না। আর আজকাল যা হয়েছে না স্তর। আমার তো ইচ্ছে করে স্তর এই নিয়ে লিখতে।'

'তোমার কী লিখতে বেশি ভালো লাগে?'—আমি আমাকে ব'লে যেতে শুনলাম: 'প্রবন্ধ না নাটক? কবিতা না গল্প?'

বিতৃষ্ণার মুদ্রা ফুটলো দিব্যেন্দুর চোখেমুখে; বললে: 'এই সব কথা শুনলেই গা জ্ব'লে যায় স্তর আমার। প্রবন্ধ নাটক কবিতা গল্প অনেক কিছু ব'লে ফেললেন। অথচ এ কি ভেবেছেন কখনো ওসব ছেঁদো কথা মাত্র? লেখা লেখা—তার আবার অত সব নাম কেন। অ্যাজ ফর এক্জাম্পল্ শেষের কবিতা। লোকে বলে ওটা উপন্যাস, আমি বলি কাব্য, আগাপাস্তলা একখানা কাব্য, না করুন তো আপনি।'

এর পরেও আমি বললাম: 'তুমি অত্যন্ত বোকার মত কথাবার্তা বলছ। সামান্য বুদ্ধি থাকলেও এসব বলতে না। অথচ আমার মনে হচ্ছে যদি তুমি ম্যাট্রিকটা অন্ততঃ পাশ ক'রে নিতে পারতে, তাহ'লে তুমি সাহিত্য জিনিসটাও আরো ভালো বুঝতে পারতে। তখন তুমি যা কিছু লিখতে সেটা দেশের কাজে লাগত, তোমারও নাম যশ হত'—এক নিঃশ্বাসে আমি এর বেশি আর কিছু বলতে পারি নি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ও স্তব্ধ। এঃই! ওষুধ ধরেছে তাহ'লে। যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা-তেঁতুল চাই বাবা। মনে মনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করি। বললাম ইংরিজি বইটা টেনে নিয়ে: 'এই এইটেই পড়ো। পড়ো তো রীডিং?'

'পড়িয়ে ছাড়বেনই তাহ'লে! করুন আপনি আপনার কাজ'—ব'লে অত্যন্ত বিরক্ত চোখেমুখে ও বইটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলো।

পড়লো কিন্তু ও ভালোই। যেটা আশাই করিনি আমি। রীতিমত একটা ভংগী আছে পড়ার। আর তাইতে আবার মনে আশা জাগলো আমার চল্লিশ টাকার। ছেলেটি বেয়ারা কিন্তু সামলাতে পারলে এর পাশ করা আর কয়েকটা মাস অন্তত আমার মাস-মাস চল্লিশ টাকা মারে কে? সুতরাং শক্ত হ'য়ে কোমর বেঁধে লাগলাম। বললাম শক্ত গলায়: 'আচ্ছা মানে ব'লে যাও তো যা পড়লে তার।'

মানেও মোটামোটি ভালোই বললে ও। এমনি ক'রে মিনিট পনেরো আমি প্রাণপণে রাশ টেনে রাখলাম কিন্তু অতর্কিতে ও আবার কাৎ ক'রে ফেললে আমাকে। তক্ষণেই আমি জিগেস করেছিলাম ওকে: 'তুমি রবীন্দ্র-নাথের কোন কবিতা মুখস্থ বলতে পারো?'

'এক্কার স্তর এক্কার। ঐ একটিমাত্র পোয়েট স্তর যাকে আমি লাইক করি। কিন্তু হ'লে হবে কী, নাটকে হি ইজ এ ড্যাম কেইলিওর। ওকে কি নাটক বলে, ছোঃ! নাটক লিখতে অনেক ঝামেলা। কত কাঠ খড় পোড়াতে হয়। কত ষ্টাডি করতে হয়। কত খাটতে করতে হয়। চাট্টিখানি কথা! এই ধরুন না আমার ফার্ষ্ট নাটকটা—অফ, প্রাণ বেরিয়ে গেছে লিখতে।'

কৌতূহল হয় আমার মরতে। বলি: 'দেখি তো সেটা!'

'কী, নাটক দেখবেন? ও কী হবে দেখে। দেখার মত নয় কিছু।'

ছাড়ি না আমি। পীড়াপীড়ি করি। বল্লে ও: 'আমার হেনরাইটিংটা বড্ড ক্লামজি স্তর। বরেনবাবুর অবশ্য খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু অনেকেই অ্যাপ্রেশিয়েট করতে পারে না স্তর। বলে বড্ড বানান ভুল। বুঝুন স্তর পড়চিস নাটক, এদিকে লক্ষ্য বানানের দিকে এদেশের কী হবে বলতে পারেন স্তর? তা যাকগে, ওটা তো ফিলিম হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্সের সংগে কথাবার্তা হচ্ছে। ওরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছে। ওখানে বাব মুড়ি মিছরির একদর না। তা ওরাও একটু গোঁপ-খেজুরে আছে—ফেলে রেখেছে আজ দেড় মাস হ'ল। তা যাকগে, নিতান্তই দেখবেন স্তর?'

চ'লে গেলো ও আলমারীটায়। বহুৎ খুঁজতে হ'ল নাটকটা উদ্ধার করতে। তার কৈফিয়ৎও দিলে ও: 'আমার বাড়ীর লোকেরা বুঝলেন স্যর, বড্ড বাগড়া দেয় আমার লেখায়। ঐ জন্যে যা লিখি সব লুকিয়ে রাখতে হয় কিনা। আচ্ছা আপনি পড়তে পারবেন না, আমি পড়ছি শুনুন'—ব'লে নাটক পাঠ শুরু করলো সে।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, খাতার শেষ পৃষ্ঠা থেকে ও লিখতে শুরু করেছে। নাটক পড়লো ও চমৎকার। বেশ ভালো অভিনেতা হ'তে পারে ছেলেটা। নাটকের নায়ক একটি ছেলে, যে বখাটে হয়ে গেছে, বদ সংগে মিশেছে আর তাইতে পাড়ার একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ের বুক ফেটে যাচ্ছে দুঃখে, মেয়েটির ইচ্ছে ছেলেটি ভাল হ'ক, ছেলেটিরও ইচ্ছা তাই, কিন্তু বাড়ীর অভিভাবক আর ইস্কুলের মাষ্টারগুলোর অত্যাচারের জন্যে তা কিছুতেই সে হতে পারছে না। শুনতে মোট কথা আমার ভালোই লাগছিল। কিন্তু তবুও তিনটে দৃশ্য হবার পরে বাধা দিলাম আমি। বাধা দিয়ে ওকে খুব খানিকটা বাহবা দিলাম প্রথমে। তারপরে বললাম: 'তোমার এমন প্রতিভা, তুমি যদি একটু লেখাপড়াটাও করো সংগেসংগে তো—"

'আচ্ছা স্যর বলুন তো নায়িকার নাম আমি তপতী দিলাম কেন?···পারবেন না তো বলতে। আমার জানাশোনা একটি মেয়ে আছে তার নাম তপতী তাই। মেয়েটি চমৎকার স্যর। আমি অনেক ষ্টাডি করে দেখেছি স্যর, তপতীর যা সব লক্ষণ আছে না স্যর, ও ইজিলি ফিলিম ষ্টার হ'তে পারে। ওর পাশে কোথায় লাগবে সুমিত্রা আর কৈচকাঁদুনে সন্ধ্যা, ছোঃ। আচ্ছা স্যর বলুন তো, কী দেখে মেয়ে চেনা যায়?···জানেন না তো? আচ্ছা বলি শুনুন, ঘোড়া চিনি কানে, রাজা চিনি দানে, মেয়ে চিনি হাসে আর পুরুষ চিনি কাশে। এ সব আমাকে ষ্টাডি করতে হয় স্যর। অথচ অনেক মক্কেলকে আমি টেষ্ট করে দেখেছি—খেয়ালই নেই এসব বিষয়ে। এক যাত্রার অধিকারীকে আমি জিগেস করেছিলাম, আচ্ছা মশাই যাত্রাপার্টি তো খুলেছেন খুব, ধরুন একটা ধূর্ত লোক নায়িকাকে ভোলানোর চেষ্টা করছে—সেটা চোখে-মুখে দেখান তো কেমন হবে? হাঁ করে তাকিয়ে রইলো বাছাধন। আমি বললাম আরে বাবা ধূর্ত লোকটাকে তখন এক চোখে হাসি এক চোখে কান্না দেখাতে হবে। ডিফিকাল্ট খুব। কিন্তু অভিনয় করা তো আর ছেলেখেলা নয়। কিন্তু সে সেন্স কটা লোকের আছে। অথচ এক একজনের কাছাকোঁচায় বাহার কি। দেখলে গা জ্বলে যায় স্যর। ঐ যে আমার ঠাকুমা বলে, ঘরে ছুঁচোর কেত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন। খাঁটি কথা একেবারে। আমি খট করে দেখেছি স্যর, বাঙালী জাত বড়ো নেমকহারাম। শরৎবাবু তাঁর গল্পগুলোতে এই জিনিসটা এত ভালো ফুটিয়েছেন বলেই না তাঁকে আমি ক্রেডিট দেই। ঐ একটা লোক ছিল স্যর, কিন্তু লোকে বুঝলে না। সব উল্টো বুঝে ব'সে আছে। সেদিন আমার অফিসের নারায়ণবাবুকে বললাম, আচ্ছা দাদা আপনি তো একটা গ্র্যাজুয়েট শুনেছি, বলুন তো চরিত্রহীনের মধ্যে কে চরিত্রহীন? প্রথমে বলে সতীশ। তারপর উল্টোপাল্টা কত। আমি তো স্যর হেসেই বাঁচিনে। বোকারা এটা বুঝলে না যে চরিত্রহীনের মধ্যে চরিত্রহীন কেউ না—চরিত্রহীন হচ্ছে সমাজ। কী চাবুকটাই মেরেছে শরৎবাবু এই নভেলটায় আঃ। এই রকম চাবুক আবার দরকার স্যর—চারদিকে যা শুরু হয়েচে না, আর বলবেন না। কিন্তু কে মারবে চাবুক, আজকালকার রাইটারগুলো যা হয়েচে না এক-একটা, ধ'রে-ধ'রে চাবকালে তবে সুজুৎ হয়। সেদিন আলাপ এক রাইটারের সংগে, খুব নাকি কেম হয়েছে, শুনে ভাবলাম একটু টেষ্ট ক'রে দেখি তো। বললাম আমার ঠাকুমার একটা কথা গঙ্গা মড়া আলেন না, কী মানে তার। তা শুনে না—হাঁ ক'রে রইলো স্যর। তা'লেই বুঝুন কী পদের রাইটার। গঙ্গা হচ্চে সর্ব্বংসহা-পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, যত মড়া ক্যালো তাঁর বুকে কিছুতেই আপত্তি নেই তাঁর। আপনি জানেন না স্যর এটা?'

সংগেসংগে ঘাড় নাড়ি আমি: 'জানব না কেন। কিন্তু তুমি যদি অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ করতে না পারো তোমাকে তো কেউ মানতে চাইবে-না। তোমার লেখার কদর হবে না।

'কে বলেছে আপনাকে? ঘোড়া হ'লে চাবুক আটকায় না স্যার। এমন ঘোড়া ছোটাব না আমি আমার নেক্সট নাটকে, দেখব কার কত বড়ো বুকের পাটা কদর না করে। আমি স্তর, বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া। ঘোড়ার মত আমার কামড়, ছাড়তে জানে না। হ্যাঁ!'

সে কি আমি এতক্ষণেও বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন পালাই কী করে? উঠতে গেলে যদি ধরে ফেলে? যদি পেছন পেছন তাড়া করে? কিছুই অসম্ভব মনে হয় না আমার। অসম্ভব কি, সেইটেই ভীষণরকম সম্ভব বলে আমার মনে হ'তে লাগলো, সত্যি কথা বলতে কি, আমার হৃতকম্প হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই। এখন একবার যদি পালাতে পারি এই ফাঁড়া কাটিয়ে ত কোন্ শালা আর ট্যুইশনি করে বাপ্‌স্। আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার হৃৎপিণ্ডে এসে জমা হয়ে গেছে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললাম আমি কোন রকমে: 'ওঃ হো আমার তো আর একটা জায়গায় যেতে হবে আজ। চলি, আবার কালকে আসব'—বলতে বলতে আমি একেবারে বাইরে এসে গেলাম। দেখলাম ও বসে আছে অবাক হয়ে চেয়ারেই।

আমি সেই সুযোগে লম্বা লম্বা পা ফেলে পালিয়ে এলাম।

★

উৎসর্গ

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

আবার এসেছি ফিরে, যেথা হতে শুরু একদিন
পৃথ্বীর দুঃসহ দুখে করেছিনু কলঙ্ক-মলিন
চিত্ত মোর। সুগভীর সঙ্গীতের স্বপ্নময় মোহে,
ভুলের উত্তাল স্রোতে, কল-কৌতূহল সমারোহে—
আচ্ছন্ন চেতনাহারা—যেথা হতে গিয়েছিনু ভাসি,
নভোব্যাপী স্বর্ণ-বন্যা উঠেছিল সেদিনো উদ্ভাসি'
উষার সলজ্জ স্পর্শে। হে সুন্দরী শুভ্রতম তব
রূপের প্রদীপ ঘেরি সেইদিন লভিল গৌরব
রন্ধ্রহীন অন্ধকার। শব্দহীন আকুল কান্নায়
সেদিন ভিজিয়েছিনু নির্ব্বিকার স্তব্ধ মৃত্তিকায়।

কেটে গেছে বহুদিন। যৌবনের বিহ্বল উদ্বেগ
আজ আর জাগেনাকো, কৈশোরের স্তম্ভিত আবেগ
তাম্রের বর্ষণ-দৈন্যে হয়তো বা ফুটিছে ললাট—
মনের নির্জ্জন কোণে। বাহিরেতে শরতের হাট।
অসীম অনন্ত নভ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘেতে সুন্দর,
শ্যামল মেদুর ছায়া—মুগ্ধ পক্ষে বায়ুর নির্ভর।
সুদূরে কেকার কণ্ঠ, বনপুষ্পে সুরভি সঞ্চয়,
প্রকৃতি শ্যামায়মান, বিদ্যুতের বিচিত্র বলয়।
শিখায় শিঞ্জিনী শুনি, নাচে কোথা ময়ূর-ময়ূরী,
মিলনের স্বপ্নশেষে মনোহর আজ যক্ষপুরী।

মুছিয়া ফেলেছি আজ মন হতে সমস্ত আক্ষেপ,
জীবনের তরঙ্গেতে শুশ্রূষার কোমল প্রলেপ
কোথাও বন্ধন নাই, অন্তহীন মুক্তির নিশ্বাস
প্রবাহিত প্রাণধারা—স্রোতে তার বিপুল উল্লাস।
বিহঙ্গী উড়িয়া চলে—দুই পাখা বাধা বন্ধহীন,
একপারে অন্ধকার, অন্যদিকে জ্যোতির্ময় দিন।
আলোহীন স্নেহধারা একদিন না সহিতে পারি,
যুক্তকরে কয়েছিনু—কোথা দেব গগন-বিহারী
অগ্নিদীপ্ত অপরূপ। আজ তার হ'ল কি প্রকাশ—
সেদিন স্বপ্ন কি শুধু—নিদ্রাঘোরে কল্পনা-বিলাস?

রোমাঞ্চিত দেহ মোর, দুই চোখে উজ্জ্বল আলোক,
নিদ্রাহীন অন্তঃস্থল, মুখে জ্বলে প্রীতির পাবক
ভাস্বর ভাস্কর সম। ভাবাবেশে নিশ্চল নিষ্কম্প—
আপনারে কেন্দ্র করি গড়িয়াছি বেদনার স্তূপ।
জীবনের প্রান্তদেশে মরণের মলিন কাকুতি—
তাহারে করেছি তুচ্ছ, অবারিত আজ অনুভূতি।
হেসে ওঠে মহাকাল—বড়ো 'আমি' ভাবিবার আর
কোথাও কিছুই নাই, নিঃশেষিত ঐশ্বর্য্য সম্ভার।
কি দিব তোমায় তবে? আছে শুধু আনন্দ সম্ভার—
বেদনায় জন্ম তার। উপহার—আমার নিভার।

হিন্দী কাব্যসাহিত্যে বীরগাথা কাল

শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর, কোবিদ্

আমাদের ভাষাপরিবারের আদি জননী হ'চ্ছে সংস্কৃত। সংস্কৃত কমবেশী সুধীজনের ভাষা; জনসাধারণ একে আপন ক'রে নিতে পারলো না। তারা চাইছিলো এমন একটী সহজসরল ভাষা যার সাহায্যে তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের মূর্ত্তরূপ দিতে পারবে। এই প্রয়োজনের গতিপথে তাই সংস্কৃতের পরে এলো প্রাকৃত। প্রাকৃত মানে প্রকৃতি অর্থাৎ মূল সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষা অথবা প্রাকৃতজনের অর্থাৎ সাধারণের ভাষা। বৌদ্ধ এবং জৈনাচার্য্যগণের পরিপোষকতায় এই ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সমাজ যেমন পরিবর্ত্তনশীল ভাষাজগতেও তেমনি আসে পরিবর্ত্তনের জোয়ার; একভাষা বা ভাষার একটী বিশিষ্টরূপ অপরাপর ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের আসন ক'রে নেয় হয় আপন শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে বা গণদাবীতে নতুবা বিশিষ্ট সাহিত্যিকের দানে পরিপুষ্ট হ'য়ে।

এই পরিবর্ত্তনের গতিপথে প্রাকৃতের পরে এলো অপভ্রংশ এবং ক্রমে তা' বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়লো। এই শাখাগুলির মধ্যে সৌরসেনী অপভ্রংশ হিন্দী সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করেছিল।

হিন্দী সাহিত্যের যে সৌধ আজ গড়ে উঠেছে তার প্রথম বুনিয়াদ রচিত হ'য়েছিল আজ থেকে প্রায় নশো বছর আগে। এই নশো বছরের ইতিহাসকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১। বীরগাথাকাল বা আদিকাল (১০৫০ খৃঃ অঃ—১৩৭৫ খৃঃ অঃ),

২। ভক্তিকাল বা পূর্ব্বমধ্যকাল (১৩৭৬ খৃঃ অঃ—১৭০০ খৃঃ অঃ),

৩। রীতিকাল বা উত্তরমধ্যকাল (১৭০১ খৃঃ অঃ—১৯০০ খৃঃ অঃ);

৪। গদ্যকাল বা আধুনিককাল (১৯০১ খৃঃঅঃ—বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত)।

হিন্দী সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কাল ছিল যুদ্ধবিগ্রহের এবং বীরত্বের গৌরবগাথার কাল। এই সময় মুসলমানের আক্রমণে আমাদের দেশ বিধ্বস্ত হ'তে থাকে। সাহিত্য সমাজেরই প্রতিবিম্ব। তাই এ সময়কার কাব্যগ্রন্থে আমরা যুদ্ধবিগ্রহের ছবিই দেখতে পাই। এই সময়কার কবি এবং চারণেরা আশ্রয়দাতা রাজাদের বীরত্বের গুণগানের মধ্যেই নিজেদের কবিত্বশক্তি সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। বীররসপূর্ণ তাঁদের সে সব রচনা 'রাসো' নামে প্রসিদ্ধ। 'রাসো' শব্দটীর মানে রহস্য বা রসায়ণ। যুদ্ধ-প্রবণ রাজাদের রহস্যময়ী ভাষার ঝঙ্কারে যুদ্ধে উৎসাহিত করা হ'তো। তাই হয়তো এই সব বীরগাথার নাম দেওয়া হয়েছিল রাসো। আবার রসায়ণ যেমন শরীরের পুষ্টি এনে দেয় তেমনি এই কাব্য-রসায়ণ যুদ্ধক্লান্ত রাজাদের মনের অবসাদ দূর ক'রে তাদের আবার যুদ্ধের উৎসাহ জোগাতো বলেও হয়তো বা একে 'রাসো' বলা হতো। এও হতে পারে যে 'রাস' শব্দ থেকে 'রাসো' শব্দটী এসেছে। 'রাস' মানে আনন্দ। কাব্যরসিক মাত্রেই জানেন যে কাব্যামৃত রস অলৌকিক আনন্দ দান করে। এইভাবে বিচার ক'রলেও 'রাসো' নামটীর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

'রাসো' শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে পৃথ্বীরাজরাসো, 'বীসলদেব রাসো' এবং 'খুমানরাসো' প্রসিদ্ধ।

পৃথ্বীরাজরাসো হিন্দীসাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য বলে খ্যাত। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রমতে মহাকাব্যের যে সব লক্ষণ থাকা দরকার তার অনেক অভাব এতে আছে। প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার এই বিরাট কাব্যগ্রন্থ উনসত্তরটী অধ্যায়ে বিভক্ত। এর রচয়িতা হিসাবে কবি চাঁদ বরদায়ীর নাম প্রসিদ্ধ। ইনি ছিলেন দিল্লীর

শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের সামন্ত, মিত্র এবং সভাকবি। প্রবাদ আছে যে পৃথ্বীরাজের এবং চাঁদকবির জন্ম এবং মৃত্যু একই দিনে হয়েছিল; চাঁদ নাকি নিজের হাতে পৃথ্বীরাজকে হত্যা ক'রে আত্মহত্যা করেন।

পৃথ্বীরাজরাসোর মূল গল্পটা হচ্ছে সংযোগিতার (সংযুক্তার) স্বয়ংবরের গল্প। কিন্তু এতে বর্ণিত ঘটনা ইতিহাসের সঙ্গে অনেক জায়গায় মেলে না। তা'ছাড়া এর ভাষাও সব জায়গায় একরকম নয়। তাই পৃথ্বীরাজ রাসোর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন এবং মনে করেন যে এই কাব্যগ্রন্থখানা পরবর্তীকালের চারণ-কবিদের কল্পনার বিলাস মাত্র। অবশ্য চাঁদ কবির রচনা এতে কিছু কিছু আছে এবং তারই উপর ভিত্তি ক'রে এই বিশাল গ্রন্থ গড়ে উঠেছিল; কিন্তু চাঁদের দান বাস্তবিক এতে কতোখানি তা' আজ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। প্রকৃতই যদি এই গ্রন্থ সমসাময়িক কোন একজন কবির রচনা হতো তা' হলে ঐতিহাসিক ঘটনায় এবং ভাষায় মিল থাকাই ছিল স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে এমনও প্রসিদ্ধি আছে যে বাণভট্টের কাদম্বরীর মতো 'পৃথ্বীরাজ-রাসোর'ও শেষের কয়েকটা অধ্যায় লিখেছিলেন চাঁদের পুত্র জল্হন।

পৃথ্বীরাজের সভার কাশ্মীরী কবি জয়ানক সংস্কৃতে 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থখানা অত্যন্ত প্রামাণিক। এতে পৃথ্বীরাজের সভার প্রধান কবিরূপে পৃথ্বীভট্টের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু চাঁদ নামে কোন কবির উল্লেখই এতে নেই। অবশ্য চন্দ্ররাজ নামে একজন কবির নাম এতে আছে; কিন্তু সম্ভবতঃ ইনি হচ্ছেন কবি চন্দ্রক যাঁর প্রশংসা করে গেছেন কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র। কাজেই চাঁদ বরদায়ী হয় পৃথ্বীরাজের পরবর্তী যুগের কবি নয় তো 'পৃথ্বীরাজ বিজয়ের' রচনার পরে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমনও হতে পারে যে 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র সমস্তটাই তিনি লিখে যেতে পারেন নি এবং পরবর্তীকালের বহু চারণকবির রচনার সমাবেশে এই বিশাল গ্রন্থ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তবু তাঁর নামের সঙ্গে 'পৃথ্বীরাজরাসো'র নাম যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল এই গ্রন্থের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্য, যেহেতু মনে হয় তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন যশস্বী কবি ছিলেন।

বীসলদেব রাসোর রচনা করেন বিগ্রহরাজ চতুর্থের বা বীসলদেবের চরিত্র অবলম্বনে তাঁরই সভাকবি নরপতি নাল্হ। এই গীতিকাব্য চারখণ্ডে বিভক্ত এবং এতে প্রায় দু'হাজার চরণ আছে। ধার-এর পরমারবংশীয় রাজা ভোজের কন্যা রাজমতীর সঙ্গে আজমীরের রাজা বীসলদেবের বিবাহ হয়। কোনও কারণে বীসলদেব স্ত্রীর উপর রুষ্ট হয়ে উড়িষ্যায় গিয়ে একাকী বসবাস করতে থাকেন। এক বৎসর পরে রাজমতীর অনুরোধে উড়িষ্যার রাজার মধ্যস্থতায় এই বিরহের অবসান ঘটে এবং তাঁদের মিলন হয়।

যদিও নরপতি নাল্হ এবং বীসলদেব সমসাময়িক তথাপি বীসলদেব রাসোর কোন কোন অংশ কাল্পনিক বলে মনে হয়। বীসলদেবের সময় ধার-এ ভোজ নামে কোন রাজা ছিলেন না, তার অন্ততঃ একশো বছর আগে প্রসিদ্ধ রাজা ভোজের মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই তাঁর কন্যার সঙ্গে বীসলদেবের বিবাহ কাল্পনিক বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে যে, বীসলদেবের পরমার বংশীয় এক রাণী ছিলেন। 'পৃথ্বীরাজরাসো'তেও এর উল্লেখ আছে। সুতরাং এমনও হতে পারে যে পরমারবংশীয় রাজাদেরই উপাধি ছিল 'ভোজ' এবং কবি এই উপনামেরই ব্যবহার করেছেন তাঁর গ্রন্থে। এইভাবে বিচার করলে বীসলদেবের সঙ্গে রাজা ভোজের কন্যার বিবাহ অসঙ্গত বা যুক্তিহীন ব'লে মনে হয় না।

বীসলদেব রাসোতে হিন্দী ভিন্ন রাজস্থানী, আরবী, ফারসী এবং তুর্কী শব্দের প্রয়োগ আছে। এর ভাষা এবং শব্দ অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু এতে রাজস্থানীর সঙ্গে হিন্দীর মিলনের সার্থক চেষ্টা রয়েছে। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কথ্য ভাষার মিশ্রণে যে আর একটি সাহিত্যিক ভাষা—যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'পিঙ্গল'—ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল—তারও প্রমাণ পাওয়া যায় এই কাব্যগ্রন্থে।

খুমানরাসের মূল রচয়িতা ছিলেন দলপতবিজয়। চিতোরের খুমান থেকে শুরু করে মহারাণা প্রতাপসিংহ

পর্য্যন্ত—এই দীর্ঘ আটশো বছরের যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এর সম্পূর্ণ অংশ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। দলপতবিজয় আসল খুমানরাসোর না এর পরিশিষ্টের লেখক তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন আর এও বলা কঠিন যে এর আসল অংশই বা কতোখানি এবং প্রক্ষিপ্ত অংশই বা কতোখানি। এমনও প্রবাদ আছে যে কোন এক অজ্ঞাতনামা চারণকবি দ্বিতীয় খুমান পর্য্যন্ত যতো যুদ্ধ হয়েছিল তার বর্ণনা ক'রে গেছেন এই গ্রন্থে। ঐতিহাসিক পরম্পরা বিচার করলে অবশ্য বলা যেতে পারে যে প্রধানতঃ দ্বিতীয় খুমানকে নিয়েই খুমানরাসো লেখা হয়েছিল।

হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগের আরও কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থের নাম পাওয়া যায় যাদের সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে 'জয়চাঁদ প্রকাশ' এবং 'জয়চাঁদ যশচন্দ্রিকা'র নাম প্রসিদ্ধ। এই কাব্যগ্রন্থ দু'খানা লেখা হ'য়েছিল কনৌজের সম্রাট জয়চাঁদের কীর্ত্তিগাথা অবলম্বন করে। পরবর্ত্তী যুগের লেখায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ ছাড়া মহোবার রাজা পরমালের সভার চারণকবি জগনিক 'আল্হাখণ্ড' নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। এতে পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং পরমালের অগণিত যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। মূলতঃ, মহোবার 'আল্হা' এবং উদল (উদয়সিংহ)—পরমালের এই দুই প্রসিদ্ধ সামন্ত বীরের চরিত্র অবলম্বনে এই রসাত্মক কাব্য রচিত হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে এই বীরগাথা এমন জনপ্রিয় হয়েছিল যে সমস্ত উত্তরভারতে—বিশেষ ক'রে কনৌজ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র—এইগুলি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই অমূল্য গ্রন্থখানাও পাওয়া যায়নি। এই গাথাগুলির অনেক অংশ আজও হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে, বিশেষতঃ কনৌজ, অযোধ্যা এবং বুন্দেলখণ্ডে বর্ষাকালে গীত হয়। আল্হা নামে এই গানগুলি প্রসিদ্ধ। একথা অবশ্য ঠিক যে লোকমুখে প্রচলিত থাকার দরুণ এর ভাষায় এবং ভাবে অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

'আল্হাখণ্ড' নাম থেকে অনুমান হয় যে এই গ্রন্থ কবি জগনিকের কোন বড় একখানা কাব্যগ্রন্থের কিছু অংশের সংগ্রহমাত্র। বর্ত্তমানে এই গানগুলির একখানা সংগ্রহ আল্হাখণ্ড নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আজ এ কথা বলা কঠিন যে এর ভেতরে মূল কবির লেখাই বা কতখানি আর প্রক্ষিপ্ত অংশই বা কতখানি।

প্রসিদ্ধ কবি শার্ঙ্গধর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের গ্রন্থ এবং 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি'রই রচনা করে যাননি, বীরগাথাকাব্য 'হম্মীরদেব রাসো'ও তিনিই লিখেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। হম্মীরদেব ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহানের বংশধর। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় 'হম্মীরদেব রাসো'তে। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থখানাও পাওয়া যায়নি। এরই অনুকরণে অনেক পরে লেখা 'হম্মীররাসো' নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ অবশ্য পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া, কবি শ্রীধরের 'রণমল ছন্দ' নামে একখানা কাব্যগ্রন্থও পাওয়া যায়। রাঠোররাজ রণমল্ল পাটনের সুবেদার জাফরখাঁকে পরাজিত করেন। তাঁরই বিজয়ের চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বীরগাথা কাল যখন সমাপ্তির পথে তখন আমরা জনসাধারণের কথ্যভাষা এবং সাহিত্যের ভাষার আসল রূপের কিছুটা আভাস পাই। এর পূর্ব্বেকার রচনায় প্রাকৃতের প্রভাব কিছু পরিমাণে যে না আছে তা নয়। কারণ মনে হয়, অতীতে যে ভাষাকে গৌরবদান করা হয়েছিলো সেই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহার করবার মনোভাব তখনও বর্ত্তমান ছিল।

বীরগাথাকালের অন্তিম সময়ে দু'জন অমর কবির অভ্যুদয় হয়। এঁরা হচ্ছেন দিল্লীর খুসরো এবং তিরহুতের বিদ্যাপতি। খুসরোর রচনায় পশ্চিম ভারতের এবং বিদ্যাপতির রচনায় পূর্ব্ব ভারতের কথ্যভাষার প্রকৃত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথ্বীরাজের পরবর্ত্তী শতকে খুসরোর রচনার সূত্রপাত হয়। ইনি গিয়াসুদ্দীন বলবন থেকে সুরু করে আলাউদ্দীন এবং কুতুবুদ্দীন মুবারক-শা পর্য্যন্ত কয়েকজন পাঠান বাদশাহের রাজত্বকালের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন। ফারসী সাহিত্যিক এবং কবি হিসাবে এঁর সে সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি

ছিল। ইনি ছিলেন অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, মিশুক এবং সহৃদয়; কাজেই সাধারণের সুখদুঃখে অংশগ্রহণ করা এঁর কাছে অনেকটা সহজাত ধর্ম্মের মতো ছিল। সাধারণের মধ্যে যে জাতীয় দোহা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল ঠিক সেই জাতীয় রচনাতেই ইনি আনন্দ পেতেন। এঁর রচনা তখনকা'র দিনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এতে রসের সন্ধান তো পাওয়া যায়ই, আর পাওয়া যায় উক্তি বৈচিত্র্য। খুসরোর রচনাবলীর কিছু অংশ অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া গেছে, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে ইনি এঁর পূর্ব্বেকার কবিদের মতো প্রাকৃত প্রধান ভাষার ব্যবহার করেন নি। তিনি কথ্যভাষাতেই লিখেছেন বেশী, কারণ জনসাধারণের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

বিদ্যাপতি ছিলেন তিরহুতের রাজা শিবসিংহের সভাকবি। ইনি মৈথিলীভাষার ব্যবহার যথেষ্ট করেছেন এবং এর মৈথিলীভাষার পদাবলীর জন্য একে মৈথিল-কোকিল বলা হয়। কৃষ্ণ এবং রাধা এর পদাবলীর নায়ক এবং নায়িকা এবং শৃঙ্গাররসই এই সব রচনার প্রধান উপজীব্য। সম্ভবতঃ জয়দেবের 'গীত গোবিন্দের' অনুকরণেই এই মধুর পদাবলী রচিত হয়েছিল।

মোটামুটি হিসাবে মহারাজ হম্বীরের সময় পর্য্যন্তই বীরগাথাকালের বিস্তার ধরা যেতে পারে। এর পরে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকাপাকি ভাবে গড়ে ওঠে। ক্রমে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধের উৎসাহ কমে এলো। তাছাড়া জনসাধারণের মনোভাব বদলাতে সুরু করেছিল এবং বিচার ধারাও হয়েছিল ভিন্নমুখী। মুসলমান যতদিন না ভারতবর্ষ অধিকার করতে পেরেছিল ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী মুসলমানদের বিতাড়িত করে নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণবলি দিতে পিছিয়ে যায় নি। কিন্তু তৎসত্বেও যখন মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতের মাটিতে কায়েম হলো তখন ভারতবাসীর লক্ষ্য হলো নিজের ধর্ম্মকে এমন হৃদয়গ্রাহী ক'রে জনতার সামনে তুলে ধরা যাতে জনমন ভিন্নমুখী না হয়ে আপন ধর্ম্মেরই দিকে আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় ভাবধারায় এবং বিচার ধারায় স্বাভাবিক ভাবেই এলো পরিবর্ত্তন।

কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে মহারাজ হম্বীরের পরবর্ত্তীকালে বীরগাথা রচিত হয়নি। মুখ্যতঃ বীরগাথা-কাব্য রচনার গতি মন্দীভূত হয়ে গিয়েছিল—একথা বলা যেতে পারে।

কাব্যপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথে সময় বিশেষে কোন এক বিশিষ্ট ভাবাবেগের বন্যা আসে। কালক্রমে বন্যা চলে যায়, কিন্তু তাই বলে স্রোতের মুখ শুকিয়ে যায় না তাই বিশিষ্ট ভাবের এবং ভাষার প্রাধান্য বিশিষ্ট কালে দেখা যায়, কিন্তু অন্যান্য ভাবধারার উৎসমুখ তাই বলে রুদ্ধ হয়ে যায় না। হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাসেও একথা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

★

ইচ্ছা

চিত্ত ঘোষ

দুপুর মন্থর হল মেঘে :
ছুটির ছায়ায় শান্তি, আলস্যের ঘন উষ্ণ আবরণে ঢেকে
ধুলোজমা জীবনের বই খুলে দেখি
যত ছবি, যত লেখা, তাদের অনেকই
কীটদষ্ট, মলিন, করুণ। যা পেয়েছি সময়ের কাছে হাত পেতে
মোড় ঘুরে অন্য এক রাস্তায় যেতে
মনে হয় রক্ত দিয়ে শোধ দেব ঋণ

আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার সেদিন।

হাড়ের মানুষ

শেখ বাগবুল ইসলাম

একটা জিনিস ছাড়া সব দেখলাম দিনদুনে
ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর অলিগলি যেখানে যা আছে।
গাড়ী গাড়ী ভাষা শিখে তাড়ি তাড়ি বই পড়ে শুনে
দেখলেম ছোট বড়ো ছুটে গিয়ে সকলের কাছে।
সময়টা হারালেম অনর্থক ঘুরে ঘুরে হেঁটে
জীবন ভর থেকেছেম যা-তা খালি মেকীর ফানুস
শিখলেম কাহিনী ইতিহাসের পাতাগুলো ঘেঁটে,
কেবল দেখলেম না'ক একটা হাড়ের মানুষ।

বান্ধবী

সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

—মা লক্ষীর হাতে চাবি দিয়ে আর আমার হাতে লক্ষীকে দিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। যে আমার ভার বয়ে বেড়াল এ ক'বছর, তার ভারই বইতে দিয়ে গেলেন আমাকে।

এদিকে ফাইন্যাল পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে চেপে বসেছে। একটা মিনিট সময় নেই। লক্ষীও পরীক্ষার আগে ওখানে যেতে বারণ করে দিয়েছে। নগীনের মারফৎ চলছে কথা দেওয়া-নেওয়া।

রাত জেগে আর পড়ে পড়ে এত ক্লান্ত হয়েছিলাম, ঠিক করে ফেললাম, আর পড়ব না আজ। ওকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। নিষেধ উপেক্ষা করেই গেলাম দেখতে। ওর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আমায় বিস্মিত করে দিল। একেতো রাশভারী, তারপর হয়েছে আরও গম্ভীর। পরিহাস তো দূরের কথা, কথা পর্য্যন্ত বলতে ভয় হয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল—আমায় দেখে উঠে বসল, এসো। পড়ার সময়ে এলে যে?

—আজ আর পড়ব না ঠিক করেছি। রাত জেগে পড়ে পড়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নগীনের কাছেতো সবই শুনি, তাই আর যাইনে। শেষে একটা অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে না বস।

তারপর দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। বুঝতে পারি, কী যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছে না লক্ষী। আমিও কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিনে যা বলে গুমোট অন্ধকারকে হাল্কা করে নেওয়া যায়।

—এখান থেকে খেয়ে যেও। ছোট্ট একটি কথা বলল অনেকক্ষণ পরে, পরক্ষণেই আবার নিস্তব্ধ ঘর।

একবার উঠে গিয়ে খাবার ফরমাস করে এল, বললাম, তুমিও তো খাওনি?

—দুজনেরই বলে দিয়েছি।

খেতে খেতে অন্যমনা হয়ে আঙুল দিয়ে থালায় আঁচড় কাটছে দেখে বললাম, কী হয়েছে তোমার আমাকে খুলে বলতে পার না?

—কিছু হয়নি তো, বলে আবার খেতে লাগল।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলে পূর্ব্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললাম, তোমায় এমনি দেখে যদি চলে যাই তবে আর আমার পরীক্ষা দিয়ে কি হবে?

একটি কথারও জবাব পেলাম না কেবল থালার ওপর টস্ টস্ করে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল, আর আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

—এমনি করে আমায় শাস্তি দিয়ে কি লাভ পাও বলতে পার?

একটুখানি চুপ করে থেকে এবার বলল, আমিও কি কম কষ্ট পাই? আমি যে আর সইতে পারি নে। এ যে বলা-কওয়ার বাইরে।

—না বললে কী করে জানবো?

—আজ যাও, অনেক রাত হল। আর একদিন বলব।

—আবার স্মরণ করিয়ে দিলে। আবার দূর করে দিচ্ছ? বেয়ারা এসে টেবিল পরিষ্কার করে পরদা টেনে দিয়ে চলে গেল। ও উঠে এসে আমার হাতে জল দিয়ে, নিজে হাত ধুয়ে এসে বলল, রাগ কর না। তোমায় যেতে বলিনি। কথায় কথা বাড়িয়ে পরীক্ষার আগে তোমার মনকে বিক্ষিপ্ত করতে চাইনে। এমন কিছু নয়। রাত অনেক হয়েছে, সঙ্গে লোক নিয়ে যাও।

—লোক কি হবে?

—কথা কেটো না। আজ থেকে একটা লোক তোমার ওখানে থাকবে।

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাতেই জেদ করে বলল, যা বলি শোন। পরীক্ষার আগে তো আর এখানে এসে থাকা সম্ভব নয়, তা যদি হত তো নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু উপায় নেই।

নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছি, মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা ভাবনা ভীড় করে আছে। পেছনে শুধু দারোয়ানের জুতোর খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে। এ অভিনব ব্যবস্থার কোন কারণই খুঁজে পাইনে। কত করে তাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি তবু কূল-কিনারা পাইনে। রাস্তায় বেরিয়ে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল—তখন কেন প্রতিবাদ জানাইনি, কেন নাবালকের মত লক্ষ্মীর কথাই মেনে নিলাম।

বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে ওকে বললাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

ও হঠাৎ কারণ বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে বলল, বাঈকা হুকুম। ছোট বাবেসে নকরী নেহি রহেগা।

ওকে আর প্রশ্ন না করে বাড়ির হাতায় ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ পেছন থেকে শুনতে পেলাম রাস্তার কলের একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ। দারোয়ান সচকিত হয়ে উঠল। আবার শব্দ হল—আরো কয়েকটা, সর্ব্বশেষে কানে এলো কোন হতাশ পথিকের কাতোরোক্তি। তখন আর বুঝতে বাকী রইল না, কোন পথিক রাস্তার কলে জল না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরছে। এত রাতে আর কী করে জল পাবে বেচারা! অস্পষ্ট আলোকে দেখলাম, বিরাটকায় একটা লোক মস্ত বড় একটা পুঁটুলি কাঁধে ফেলে এগিয়ে চলেছে। পরনে তার গৈরিক বসন। এগিয়ে গিয়ে বললাম, কেয়া? আপ্‌কা বহুত পিয়াস লাগা হ্যায়?

হঠাৎ মানুষের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল প্রথমে, তারপর উত্তর দিল, হাঁ জি, বড়া পিয়াস লাগা হ্যায়।

ছুটে গিয়ে তাকে এক গ্লাস জল এনে দিলাম। সে বিরাট পুঁটুলিটার ওপর বসে বসে হাঁফাচ্ছিল, এ অবস্থাতেও দেখলাম—সংস্কার জ্ঞান কিছুই হারায়নি, গ্লাসে জল না খেয়ে অঞ্জলি ভরে জল পান করল।

বললাম, আউর মাংতা?

—হাঁ জি, পিয়াস না মিটা।

কুঁজোটা এনে তার সামনে ধরে দিতে সে ঢক্ ঢক্ করে এক কুঁজো জল খেয়ে আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বলল, আপ মেরে জান বাঁচায়া। আপ কাঁহাকা রহনে ওয়ালা হ্যায়?

বললাম, কলকাত্তেকা।

অমনি সে দাঁড়িয়ে উঠে সসম্ভ্রমে বার বার সেলাম দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, বাঙ্গালী বাবু হ্যায়?

সম্মতি জানালাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এতনে দূর কাহে?

যখন জানলো এখানে কলেজে পড়ি, সে দুহাত তুলে ভগবানের কাছে আমার মঙ্গল কামনা করে বলল, আপ যো মনসা করকে আয়া ও সফল হোগ।

আজ মনে হয় এই অচেনা পথিকের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ আমার সাফল্যের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

মনে হল রাস্তাঘাটে যে সব পাঞ্জাবী গণক ঘুরে বেড়ায়, এ তাদেরই একজন হবে বোধ হয়। নিজে থেকেই বলতে লাগল, সে ছিল মহারাজের পালোয়ান। বছর বছর একটা পেনসেন পায়, তাই নিতে এসেছে। তাতে তো পোষায় না, তাই হাত দেখে, গুনে-টুনে বেড়ায়।

দ্বিধা না করে বললাম, একঠো বাত মুঝে বলনে হোগা কিসকো মায় পিয়াশ করতা হ্যায় উসকো মুঝে মিলনা চাহিয়ে আপকা কেয়া সুঝা হ্যায়?

অনুনয় করে ও বলল, বাবুজী, আপ মেরা জান বাঁচায়। আপসে ঝুট না বলুঙ্গা। হামলোগ জাহিল আদমি হ্যায়, কুছ নেহি জানতা। দো-চার বাত আউর লব্জ ইয়াদ কর লিয়া হ্যায়। ব্যাস্। আমাকে প্রবোধ দিতে শুধু বলল, সব ঠিক হো যায়েগ।

পরীক্ষা সুরু হয়ে গেল। ললিত বিদ্যার আর মনের পরীক্ষা পাশাপাশি চলল। দিনে রাতে একটুকু বিশ্রাম নেই, শুধু পরীক্ষা আর পরীক্ষা। জীবনভর পরীক্ষার একটা বৃহৎ অংশ শেষ হতে চলল।

একদিন এমনি সময় নবীন বড় কুণ্ঠিত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল—কী যেন বলতে চায়।

—কি রে?

জবাব দেয় না। কেবল চোখ দুটো রগড়ে রগড়ে লাল করে ফেলছে। ভাবলাম লক্ষ্মী বুঝি বকুনি দিয়েছে তাই এসেছে আমার কাছে নালিশ জানাতে।

এত শুকনো দেখাচ্ছে কেনরে ? কিছু খাসনি ? তবু চুপ করে রইল দেখে মনিব্যাগ খুলে একটা টাকা দিতে গেলাম, এবার উচ্ছসিত হয়ে কেঁদে উঠে বলল, বাঈ আজ কদিন ধরে খেতে চাইছেনা, জোর করে খাওয়ান হচ্ছে। দিনরাত শুধু কাঁদছে আর শুয়ে আছে। আপনাকে একবার যেতেই হবে।

বললাম, তুই বাড়ি যা। আজ শেষ পরীক্ষা হয়ে যাবে, সন্ধ্যাতেই যাব।

ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীকে শুয়ে থাকতে দেখে বললাম, এ কি এই ভর সন্ধ্যায় শুয়ে আছ যে ?

সে কথার জবাব না দিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, বোস, হয়ে গেল পরীক্ষা ? কেমন দিলে ?

—ভালই হয়েছে। কিন্তু এখনও তো দেখছি অনেক বাকী আছে। জীবন ভর কত পরীক্ষাই যে দিতে হবে। কিন্তু তোমার একি ছিরি হয়েছে বল তো ?

ওর মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলোকে গুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, কিছু বলবেও না, কী করে আমি কি করব ভেবেও পাইনে। এও তো নয়, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারিনে। যখন করিডোর দিয়ে ঢুকছিলাম, চারদিকে দেখি উৎসুক দৃষ্টি। দাও দরজাটা বন্ধ করে আসি। এই দেখ, কী একটা থমথমে ভাব। সবারই মুখে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। নগীনটাকে দেখলে বড় দুঃখ হয়। বেচারা এক কোনে মুখ গুজে বসে আছে।

লক্ষ্মী চোখ বুজে শুয়ে রইল। ওর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বালিশ ভিজে যেতে লাগল। কাছে সরে এসে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি কি এমনি করে আমাকে শাস্তি দেবে ? জানতেও দেবেনা, কী আমি করেছি ?

লক্ষ্মী আমার মাথাটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলতে লাগল, কী করে বলব বল ? আমি যে ভেবেই কূল পাইনে। তোমায় যে ধরেও রাখতে পারছিনে, সেই তো আমার জ্বালা। আমি চোখ মুছিয়ে দিলে, বলল, কী যে মহাদ্বন্দ্ব চলছে আমার মাঝে। আমি তো কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আমায় বাঁচাও—বলে চোখ ঢেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, এমনি করে কি আমায় কষ্ট দিতে হয় ? কোথায় নতুন করে তোমার জীবন হবে শুরু, তা নয়, তুমি কিনা কেঁদে-কেটে-উপোষ করে যত সব অনাসৃষ্টি করছ ? কালইতো আমি এসে যাব।

—না গো না, এ হতভাগিনীর কাছে তুমি এসোনা। আমার কপালে সুখ নেই। সুখ আমার নেই। সুখ আমায় কেউ দিতে পারবে না। মা নিজের হাতে তোমার ঘর সাজিয়ে গেছেন। আমার এত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব বানচাল হয়ে গেল। এত থাকতেও আজ আমার কী অশান্তি !

আমার দিকে পাগলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি কি আমায় বাঁচাতে পারবে ?

—সত্যিই পাগল হলে নাকি তুমি ?

—না না তুমি জান না। তোমার পরীক্ষা ছিল বলে জানাই নি, সেই সয়তানকে কালও আবার দেখেছি, এই হোটেলের আশে-পাশেই সে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা তার দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করে ফিরছে।

বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে বললাম, বল কি ? তোমার স্বামী ?

—কিসের স্বামী ! যে আমায় লিখে-পড়ে জন্মের মত ত্যাগ করে গেছে, সে আবার স্বামী কিসের !

তারপর উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসে বলল, শুধু শুধুই কি আমি এমন চঞ্চল হয়েছি ? কাউকে বলিনি। নগীন প্রথম দেখে এসেই আমাকে বলেছে, আর কেউ জানে না। কী করে যেন ও আমাদের কথা জেনেছে। পেয়েছে আমার অর্থের সন্ধান। নগীনকে ও যা বলেছে, শুনে আমি কাঠ হয়ে গেছি। সেদিন গভীর রাত্রে তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে কি যে চিন্তা হল, কী দিয়ে যে তোমায় আড়াল করে রাখবো জানিনে। জান, বলেছে তোমায় খুন করবে। একে মাতাল, তার ওপর অর্থের লোভে হয়েছে দিশেহারা, ওর অসাধ্য কিছু নেই। এ ক'দিন শুয়ে শুয়ে শুধু আকাশ-পাতাল ভেবেছি। কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে পারিনি। তুমি আমায় বাঁচাও।

বলে লক্ষ্মী হাঁফাতে লাগল, তার নিঃশ্বাস দীর্ঘ হয়ে এল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম, ছিঃ,

এমনি করোনা, শান্ত হও। চমকে উঠলাম যখন সে আমার হাত ধরল, বরফের মত ঠাণ্ডা হিম। চোখের দৃষ্টিও কেমন ঘোলাটে। বুড়ো ম্যানেজার বাবুকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে খবর দিতে বললাম। পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে, হাতে-পায়ে গরম জলের সেঁক দিতে দিতে একটুখানি সুস্থ হল লক্ষ্মী। ডাক্তার প্রবীণ—পুরোন মানুষ। এদের এখানে কখনো সখনো আসেন। নাড়ি টিপে, বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে একটু চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ইনজেকসান বার করে দিয়ে দিলেন। লক্ষ্মী একটু প্রকৃতিস্থ হলে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

এতক্ষণ ডাক্তার বোধ হয় আমাকে খেয়াল করেননি, এবার চোখ পড়তেই সন্দিহান দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সেটা লক্ষ্য করে লক্ষ্মী একটুখানি বিব্রত মুখে তাকিয়ে চোখ বুজলো। আমি ডাক্তারকে ইসারা করে আস্তে আস্তে দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের দেখে ম্যানেজার বাবু এলেন। ডাক্তার বাবু আবার সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

এরই মধ্যে নগীন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, বাঈ আপনাকে ডাকছে।

ফিরে এসে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। আমার হাত-খানা ধরে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তারবাবু কী বলছিলেন? একটু হেসে বললাম, আমার পরিচয় চাইছিলেন।

ও আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম, একটি কথাও আর বলো না।

দুজনেই চুপ করে আছি, ডাক্তারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। লক্ষ্মীর মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাউকে পাঠিয়ে দিন ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই, দরকার হলেই আমায় ডাকবেন। আর একটি কথা, ওর কাছ ছেড়ে একেবারে যাবেন না। আজ এখানেই আপনাকে থাকতে হবে।

লক্ষ্মী অশ্রুসজল দু'টো কৃতজ্ঞ চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন।

নগীন ওষুধ নিয়ে ফিরে এলে বললাম, যা, তাড়াতাড়ি দু'টো খেয়ে আয়। আজ এ ঘরেই শুয়ে থাকবি। কখন কি দরকার হয়।

নগীন চলে গেলে উঠে শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে নিয়ে খাওয়াতে যাচ্ছিলাম, লক্ষ্মী আস্তে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, এই যে ডাক্তার সাহেব বলে গেলেন তুমি থাকবে।

—থাকবো না, বললে কে?

—তবে আবার নগীনকে থাকতে বললে কেন?

—ও এই! আচ্ছা আগে ওষুধটা খেয়ে নাও দেখি। আবার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে আমি চিনি। যাও—ঐ নগীন এসেই ওষুধ খাওয়াবে।

—তোমার কাছে 'এই' হোল। কাউকে থাকতে হবে না।

—আচ্ছা বাবা, না হয় বেকার মত একটা কথা বলেই ফেলেছি। এবার চুপ কর।

বকুনি খেয়ে চুপ করল, অনেক সাধ্য-সাধনার পর কোনমতে ওষুধটুকু ওর গলায় ঢেলে দিয়ে নিজেও কোন মতে খাওয়া পর্বটা সেরে এলাম। নগীন এসে বলল, ঐ ঘরে আপনার বিছানা হয়েছে।

সে কথা শুনতে পেয়ে রক্তিম চোখ দু'টো টেনে লক্ষ্মী প্রায় ধমক দিয়ে উঠল নগীনকে, যা তুই নীচে কার্পেটের বিছানা পেতে শুয়ে পড়গে। উনি যাবেন এখন।

পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে লক্ষ্মীর পাশে এসে বসে ওডি-কোলনের জল ওর কপালে দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগলাম। ও একখানা হাত আমার কোলের ওপর রেখে নিঝুম হয়ে পড়ে রইল।

আস্তে আস্তে রাত বেড়ে চলল, শুধু হোটেল নয়, বিশ্ব চরাচরও নিস্তব্ধ হয়ে এল। দারোয়ানরা সদর বন্ধ করে দিল, সে শব্দ শুনতে পেলাম। সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না, কচিৎ কোন পথচারীর চলার শব্দ থেকে থেকে কানে আসে। এ ঘরটা আশ্চর্য্যরকম নিস্তব্ধ, ঘরের ক্ষীণ মৃদু নীলাভ আলোয় নিস্তব্ধতা যেন আরও বেড়ে গেছে। শুধু দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটার টিক টিক শব্দ আর লক্ষ্মীর ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। [ক্রমশঃ

ঠিক হ্যায় হুজুর

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

ঠিক হ্যায় হুজুর। শুধুই ঠিক হ্যায়।

রাতের পাহারাদার ব্যারাকের ভেতর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছে, ঠিক হ্যায় হুজুর। প্রতিটী ধার ঘুরে ঘুরে একই সঙ্গীত, একই সুর—একটানা এক ঘেয়ে। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত। ঘরে আছে হয়তো নব্বুইটী লোক—লোহার গরাদে-দেওয়া দরজায় ডবল লক্। যার যার জায়গায় সবাই শুয়ে আছে। পাহারাওয়ালা ঘুরছে বুট বাজিয়ে বারান্দায়। তথাপি ভিতরের পাহারাকে অবিরাম গুণে দেখতে হচ্ছে, সবগুলি মানুষ ঠিক আছে কিনা।

ভেতরের পাহারা জানাচ্ছে বাইরের পাহারাকে, ঠিক হ্যায় হুজুর।

সে আবার জানাচ্ছে ওপরওয়ালাকে।

ওপরওয়ালারও উপরে আছেন কর্ত্তারা, ধাপে ধাপে। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠ্‌তে হবে।

নিত্য এমনি চলে—ঠিক হ্যায় হুজুর। তোরণদ্বারে লেখা হয়, অঙ্ক কষে ঠিক করে নেওয়া হয়। বড়কর্ত্তা সর্ব্বশেষ দেখে বলেন, ঠিক হ্যায়। দস্তখত করেন।

সেদিন সকালে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ব্যারাক ঘেরা দুর্ব্বাঘাসে ছাওয়া অঙ্গনটীতে। জোড়া জোড়া হয়ে গুণে গুণে বাইরে আনা হয়েছে, আবার গুনতি হবে। জমাদার সাহেব খাতা নিয়ে বসে আছেন প্রবেশ পথটী আগলে। পোষাক পরিচ্ছদে, গোঁফে আর হস্তদণ্ডে দোর্দ্দণ্ড অভিজাত তিনি; মহিমময়। দূরে থেকে আমরা চেয়ে থাকি, কাছে গেলে সমীহ করি, মনে মনে অভিসম্পাতও দিই। ওই জমাদার সাহেব রিপোর্ট নিয়ে হিসাব কষে দেখবেন, হ্যাঁ, আগের দিন সন্ধ্যায় যে এগারশ বত্রিশজনকে গুণে গুণে ব্যারাকগুলিতে বন্ধ করা হয়েছিল, সেই এগারশ ঠিক আছে কিনা।

কি যেন একটা গোল বেঁধেছে। আমরা অচল হয়ে আছি, সচলতা রুদ্ধ হয়ে আছে যেন কোন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। চারদিকে থমথমে ভাব। সবাই বিস্মিত, নির্ব্বাক,—সকলেরই মনে মনে আলোড়ন, কোথায় যে কি বেঠিক হয়ে গেল। বিরাট যন্ত্রদানবটীর দেহে কোথায় কোন কলটী বিগড়াল এমন আচমকা?

জমাদার স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন, হাতে খোলা খাতা আর পেন্সিল।

মেট হুকুম দেয়, "ষ্ট্যান টু টেনশন" (Stand to attention) স্বয়ং জমাদার শোনেন—এক, দো, তিন, চার—তারপর হুকুম হয়: "আজবর" (As you were)।

জমাদার যোগ দেয় খাতায়—তারপর গোঁফে চাড়া দিতে দিতে গম্ভীর মুখে এদিক ওদিক তাকায়, কি যেন খোঁজে মনে মনে। কিন্তু কি এমন কঠিন ব্যাপার—গোল কোথায় পরমুহুর্ত্তেই ধরা পড়ে। ন'নম্বর ব্যারাকে কাল রাতে ছিল ৮২ জন, সকালে বেরিয়েছে একাশি জন। শেষ পাহারার মেট কী ভুলই না করেছে?

রাতে ছিল এগারশ বত্রিশ, সকালে এগারশ একত্রিশ।

এলার্ম—পাগলাঘন্টি বাজতে লাগল তুমুল রবে। আবার সবাইকে ফিরে গিয়ে আবদ্ধ হতে হল ব্যারাকে। কে গেল, কোথায়, কি ভাবে?

ন'নম্বরের বিরাশির একজন ছিল হালিম উল্লা, তার অন্তর্ধানই বিরাশিকে একাশি করেছে।

জেল কারাগারেও কানে কানে ছড়িয়ে পড়ল হালিম উল্লা নেই। আমাদের জগতের পরম বিস্ময়। দু'পা এগিয়ে যেতেই পা'দুটী যার প্রবল প্রতিবাদে ভেঙ্গে পড়ে সেই গেল পালিয়ে অথবা হারিয়ে? তবে আমাদের পৃথিবীতে অঘটনও ঘটে, কল্পনাতীত অঘটনও।

১৯৩০ সালের এক প্রভাতে হালিমের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। প্রৌঢ় হালিম, চোখে মুখে নেহাৎ ভাল মানুষের ছাপ। পোষাকে এবং কথাবার্ত্তায়ও ভদ্র। কিন্তু এই হালিম একটী জঘন্য অপরাধের আসামী। শুনে মনে হয়, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে বোধ করি কিছু নেই।

মেঘুদা বলেন, অনেক কিছু শিখতে হবেরে ভাই, দেখ আর মানুষ চেন।

হাজি সাহেব দাঁড়িতে হাত বুলোতে থাকেন। তাঁর কাঁচা-পাকা ঘন দাড়ির দিকে চেয়ে ভাবতে থাকি, ওই দাড়ির মালিকটী যদি প্রথম রিপুর তাড়নায় একটা তরুণীর ওপর…? কিন্তু ভাবনায় যাতে রোমাঞ্চ হয়, বাস্তবে সমাজজীবনে সেটাও রোমাঞ্চ বই কি?

মেঘুদা আবার হুঙ্কার দেন, তাঁর জলজ্বল ডাগর চোখ দু'টী আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে: 'জেলখানা তো ওদের শাস্তির স্থান নয়!' তাঁর সাদাকালো দাঁতগুলি আক্রোশে ওপরে নীচে হানাহানি সুরু করে দেয়।

হাজি সাহেব দাড়ির ফাঁকে হাসেন, বলেন, 'খোদার দুনিয়ায় কতো ধান্দা যে চল্‌ছে!'

ধাঁধা কিনা জানিনা, কারণ এসব ব্যাপারে তো হেঁয়ালি কিছু নেই। এ তো স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং সর্ব্বজনবোধ্য। পুরুষ আর নারী, লোভ-লালসা আর আদিম কোনো সর্ব্বকালের প্রবৃত্তির তাড়না।

ব্যারাকের নালা পরিষ্কার করছিল একচক্ষু খেজমতী হবিব। সহকারী তার শ্রীদাম। খেজমতী বলে মেথরদের। ওরা জেলখানার স্বেচ্ছাসেবক। নিজেরা ইচ্ছা করে 'খেজমত' করে—খাবার পায় বেশী করে, আর পায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ এবং সহযাত্রীদের ঘৃণা।

হবিব শুনছিল আমাদের কথা, বল্‌ল, 'ওই বুড়োটার কথা বলছেন বাবু? শ্বশুর-জামায়ে মিলে একটী মেয়েকে নিয়ে যা' করল,—কি করেছিল রে শ্রীদাম? তুই বলনা ব্যাটা?'

শ্রীদাম বলল, 'কেত্তন—তারপর লুটের পেসাদ, শ্বশুর খেল, জামাই খেল, আরো কতোজন খেল।' হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল শ্রীদাম। তার কালো কুৎসিৎ মুখখানি ওই রসিকতায় যেন আরো হঠাৎ বীভৎ হয়ে উঠল।

ক'দিন পর হালিম মিয়া হাজত ওয়ার্ডের ভেতরে থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকলে আমাকে। ভুলেই গিয়েছিলাম ওই অধম লোকটার কথা। জেলে কত হালিম, জালিম, রহিম, করিম, রাম, শ্যাম, যদু, মধু আসা-যাওয়া করছে। আসছেন যাচ্ছেন কতো অভিজাত বংশের লোকেরাও, কেউবা খান্দানী কেউবা কুলীন। সকলকে সব সময়ের জন্য মনে রাখা চলে না। তাছাড়া অধুনা আমরা যে পৃথিবীতে অনধিকার প্রবেশ সুরু করেছি মাত্র। আমাদের দেখে দেখেই সময় কেটে যায় আমাদের। কতো সমস্যাও আছে,—স্বাধীনতালাভের সংগ্রামের চেয়েও আছে নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-ধারণের সংগ্রাম। মাঝে মধ্যে ইনকিলাব জিন্দাবাদও হাঁকতে হয়; নইলে সসম্মানে জিন্দা থাকা যায় না।

তাই হালিম দৃষ্টির সম্মুখে থেকেও হারিয়ে গিয়েছিল।

তার হাতছানিতে সাগ্রহে নয় নেহাৎ অনুকম্পাভরে এগিয়ে গেলাম। নিকটে থেকে শক্ত বাঁশের গরাদের ফাঁক দিয়ে তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু বিস্মিত হলাম। সর্ব্বত্র একটা সকরুণ বিষণ্ণতা। এ মানুষ কি পারে এমন অপরাধ করতে? অপরাধের যে ছায়া মানুষের চোখেমুখে অধুনা অহরহ দেখছি, কোথায় এখানে তা'?

সেলাম জানাল হালিম আমাকে। তারপর চেয়ে রইল কুণ্ঠিত নির্ব্বাকভাবে।

বললাম, 'কেন ডাকলে আমাকে? কিছু চাই?'

'না, না, বাবু না!' কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল হালিম: কিছু আমার চাই না, খাবার পর্য্যন্ত রোচে না। সাধারণ কয়েদীরা ভাবে বাবুদের কাছে অনেক কিছু আসে বাইরে থেকে, আইনকে ফাঁকি দিয়ে। আইন ভাঙতেই তো তাঁরা এসেছেন, জেলখানাও ভাঙবেন।'

প্রশ্ন করলাম, 'তবে কেন ডেকেছ?'

সে এবার বলল, আমাদের গাঁয়ের উকিল বাবুও জেলে আছেন। তাঁর কাছে আমার মামলার কথাটা—

হালিমের কথা বলা আর হল না। একটি টেকো মাথা গুটি গুটি করে এগিয়ে এলো আর-এক কোণ থেকে। মাথাটি যখন মুখ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তখন লোকটাকে চিনলাম—রতন সরকার। বাইরেও জানতাম। জজ-কাটির মাঠে বটগাছতলায় সতরঞ্চ বিছিয়ে দপ্তর মেলে বসতো সে। মামলা মোকদ্দমার ওস্তাদ তদ্বিরকারক। দালালিও ব্যবসা ছিল তার। সারাদিন চারপাশে লোকের

ভিড় জমে থাকত। হু'চারজন উকিল মোক্তারকেও মাঝে মাঝে তার সতরঞ্চে এসে আসন গাড়তে দেখা যেত।

রতন সরকার এসেছে ছেলেকে নিয়ে। সেও বাপকা বেটা।

রতন সরকার ক্ষীণকণ্ঠে অত্যন্ত অমায়িকভাবে বললে, 'ও হালিম মিয়া, রিপোর্ট হয়ে যাবে যে, চুপ করে বসে থাক।'

জেলেও রতনে রতন চিনে ফেলেছে। রতন সরকারের প্রতিপত্তি সাধারণ কয়েদীর মধ্যে অসীম। হাজতী প্যারেডে তিনি বেজোড় দাঁড়িয়ে থাকেন—সভয়ভাবে। জমাদার থেকে আরম্ভ করে কয়েদী মেট পর্য্যন্ত রতনের সমজদার।

হালিম মিয়া রতনকে সেলাম করে মিনতির কণ্ঠে বললে, 'আমার মামলার কথাটা বলছিলাম—'

রতন সরকার বললে, আমি তো বলেছিই মিয়া?

একটী যুবক এগিয়ে এল। ফর্সা ছিপছিপে লোকটি, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী,—বললে, 'কি যে অবুঝ, সরকার মশায় তো বলেছেন ব্যবস্থা করে দেবেন সব, কিছু হবে না এ মামলায়। আমিও দেখব—হুঁ।'

'তুমি দেখবে? একটা অতি করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল হালিমের মুখে। তারই জামাই ওই যুবক তমিজুদ্দিনের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চাইলে সে।

তমিজুদ্দিন কেউকেটা নয়, পুলিশ কনেষ্টবল। মাথায় লাল পাগড়ী বেঁধে, কোমড়ে চামড়ার চাপরাস্ এঁটে হাতে লাঠি নিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে সে। থানার দারোগার যতো না প্রতাপ, তার প্রতাপ তার চেয়ে অনেক বেশী। বালির তাত। তমিজ মিয়া ভাবে, মাধবপুর অঞ্চলে তার হাঁকে বুঝি বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। শ্বশুর হালিম মিঞা, তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সবাই 'দামাদ' বলতে অজ্ঞান। মুখ টিপে হাসে হালিমের মেয়ে জরিনা। এমন স্বামী ক'জনের হয়?

একদিন তমিজুদ্দিন এসে হাজির শ্বশুরবাড়িতে, সঙ্গে একটী মেয়েলোক। জরিনা নয়, তারই বয়েসী অন্য একটী মেয়ে, নাম খয়েরুন্নেসা—এমন খাপসুরতও কিছু নয়। তবে তার সর্ব্ব অবয়বে এসেছে যৌবনের জোয়ার—দু'কূল ভরে উঠেছে।

ওর দিকে তাকাবার অবসর কোথায় হালিমের, সে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'এ কে?'

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ তমিজুদ্দিন বললে বেশ ভারিক্কি কণ্ঠে, 'সবই জানবেন।'

সাহস নেই বেশী প্রশ্ন করবার তাকে।

কি যে সুরু হল তারপর। শুধু হিস্ হিস্ ফিস্ ফিস্। গৃহস্থবাড়ী, লোকজন, চাষবাস, দশজন লোক যায় আসে। দিনের বেলা একটী ঘরে মেয়েটীকে আবদ্ধ রেখে বেরিয়ে যায় তমিজ,—রাতে বসায় ভূতের মেলা। আরো কারা কারা যেন আসে। একদিন রাতে সদর থানার ছোট দারোগাও এসে হাজির। সম্বর্দ্ধনা জানাতেই হয় হালিমকে। তিনিও কখন গিয়ে ওই ঘরটীতে প্রবেশ করেন। হালিমের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়, আগে থেকেই দুরু দুরু কাঁপছিল। কি সর্ব্বনাশই যে ডেকে এনেছে তমিজ? আজ সে কিছু বল্‌তেও পারে না, সইতেও পারে কই?

তমিজ এসে মুচকী হেসে বলে, 'ভয় নেই। দারোগা সাহেব তদন্ত করছেন। বেরোতে দেরী হবে।'

রক্তচক্ষে তাকায় হালিম, 'কি নির্লজ্জ।'

সরকারী চাকুরে তমিজ, মাধবপুরে তাকে ফিরে যেতেই হবে। ছুটির আর দু'দিন বাকি।

হালিম বলে, খায়রুণকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

তমিজ উত্তর দেয়, 'সে এখন কি ক'রে হবে? ফিরে এসে ব্যবস্থা করব। ভয় কি, ছোট দারোগা সাহেব আছেন, বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হোসেন আলী, জজের আদালতের মুহুরী বাঞ্ছারাম বাবু—

হালিম রেগে উঠল, 'অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান সবাই আছেন, কিন্তু আমি যে এ ভূতের মেলায় থাকতে পারব না বাবা।'

তমিজ হাস্‌লে, যেন অবজ্ঞার হাসি। পুলিস সে।

সেদিনই গেল হালিম মুন্সী সাহেবের কাছে। গাঁয়ের মাতব্বর তিনি। সবাই তাঁর পরামর্শ নেয়, তাঁকে মান্য করে। তিনি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে শুনলেন সব কথা। শুনে বল্‌লেন, 'তাই তো। বাড়ী যাও, আমি ভেবে দেখি। উপায় বের করতে হবে, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।'

মুন্সি সাহেব গেলেন মোক্তারের মুহুরী কালাচাঁদবাবুর কাছে, গিয়ে বললেন, 'হালিমের বাড়ীতে কি হচ্ছে জেনেছ কালাচাঁদ?'

হালিম বাড়ীতে বসে ভাবছে, জরিণার কথা। তার কতো আদরের মেয়ে। তাকে সুখী করবার জন্যে সে সব করতে পারে। তাইতো প্রথম দিনেই তমিজ আর খায়রুণকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারেনি। কি দুরন্ত চেষ্টা তার ব্যাপারটা চেপে রাখায়। কিন্তু কতোদিন, কতোদিন এ হলাহলটা পান করে চলবে? অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার মন। মাঠ থেকে ফিরে আসে লোকজন হাল গরু নিয়ে, সে শুধায় না কতোখানি জমি আজ চাষ হয়েছে, নিত্য যেমন করে তেমনি বলদগুলির পিঠে গিয়ে হাত বুলিয়ে দেখে না তারা কি ক্লান্ত হয়েছে? ছেলেও এসেছে মাঠ থেকে, কাছে এসে দাঁড়ায়, কি যেন বলতে চায়—অনেক কথাই হয়তো। রমিজেরা বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে—আল কাটায়। তাদেরই পাশের জমিটা ওদের। ছেলের কথা বাপের কানে প্রবেশ করে না।

দেখা যায় মুন্সী সাহেবকে, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি আসছেন, হালিম মিয়া বাড়ী আছ নাকি?

হালিম মুন্সী সাহেবকে নিয়ে একটি ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে। অনেকক্ষণ পরামর্শ চলে তাদের। একশটা টাকা নিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন মুন্সী সাহেব। হালিমের মুখ দেখেও মনে হয়, সে যেন আশার আলো দেখতে পেয়েছে।

পরদিন তমিজ সহরে গেছে। মুন্সী সাহেবের লোক এসে উপস্থিত। হালিম তালা খুলে গিয়ে প্রবেশ করল খায়রুণের ঘরে। খায়রুণ তখন বিছানায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। ক'দিনে কি যে হয়ে গেছে সে। সে মানুষ নয় যেন, খেলার পুতুল। সেই খেলাঘরে বন্দিনী পুতুল। দুরন্ত... খেলায় দুমড়ে, চিপসে গেছে। সর্ব্বদেহে দামাল শিশুদের আদরের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত।

আস্তে আস্তে উঠে বসল খায়রুণ, তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমিও—এ দিনের বেলায়? মর্ম্মে মরে গেল হালিম। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল খায়রুণ, ঘাবড়ে গেলে মিয়া?

হালিম বল্ল, আমি তোমাকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করছি না।

খায়রুণ বল্ল, না আর কোথাও কারো বাড়ীতে যেতে হবে?

না, না, না, যেন চীৎকার করে উঠল হালিম, আমি তোমাকে বাড়ী পাঠাবই। উঠে এস।

কিন্তু ততক্ষণে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে সারা বাড়ী। ছোট দারোগাও বড়বাবুর সঙ্গে আছেন। তার দিকে চেয়ে উন্মাদিনীর মতো হেসে উঠলো খায়রুণ। খায়রুণকেই পুলিশ উদ্ধার করল না, হালিমকেও গ্রেপ্তার করল। তমিজ বাড়ীর বাইরে থেকেই চম্পট দিল। কিন্তু পালিয়ে থাকবে ক'দিন।

মুন্সী সাহেব আর কালাচাঁদ বাবুও উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সী সাহেব হালিমকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় কি মিয়া, কালাচাঁদ বাবু বলেছেন থানা থেকেই খালাস করে আনবেন। বিবিকে বলে যাও, টাকা পয়সা যা লাগে—

হালিম মিয়া কি করে যে দাঁড়িয়ে ছিল। বড়বাবু যখন খায়রুণকে হালিম মিয়া সম্বন্ধে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন, তখন সে সেই খিল্খিল হাসিতে ফেটে পড়ল, বলল, বুড়োর আপনাদের পুলিশদের মতো সাহস কোথায়? তবে জিভে জল আছে সকলেরই। কার নেই?

হালিমের অন্তর আর্ত্তকণ্ঠে তখন ডেকেছিল, হায় খোদা।

সেই হালিম মিয়া—কিন্তু আজ ৩০-সালের ইংরেজীর এপ্রিল মাসে কি করে যে হারিয়ে গেল

তাকে হাজতে রেখেই আমরা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে গিয়াছিলাম। নূতন লোক, নূতন পরিবেশ, তার মাঝে আর হালিম মিয়া কোথায়? শুধু হালিম মিয়াই বা কেন, কেউই আর রইল না আমাদের স্মৃতির পাতায়। যারাও বা ছিল—?

সব গেল, আমাদের যুদ্ধজয়ের উল্লাসের তলে। গান্ধী-আরুইন চুক্তি, উন্মুক্ত কারাগার, শোভাযাত্রা, ফুলের মালা, বিজয়োৎসব—বাইরের জগতে অগণিত জনতার আনন্দো-

ল্লাস। পাষাণপ্রাচীরের অভ্যন্তরের জগত হয়ে গেছে অপরিচিত।

ব্যক্তিগত জীবনে এসেছে নানাভাবে রোমান্স ও রোমাঞ্চ। জনতাই শুধু বিজয়ীর অভিনন্দনে আপ্যায়িত করল না, আর এক তরুণী তাঁর আখড়ার লাঠিছোরা ছেড়ে ফুলের মালা হাতে এসে করলেন বরণ। কিন্তু,—তারই পর আবার এল সংগ্রাম। রোমান্সের পর রোমাঞ্চ। লর্ড আরুইন বিদায় নিলেন, এলেন বান্ধু টোরি লর্ড ওয়েলিংডন। চুক্তি গেল ভেসে, আশু স্বাধীনতালাভের স্বপ্নও গেল উবে, ১৯৩২ এর জানুয়ারী···আবার আমাদের পাষাণ-পুরীর জগতে ঘটল প্রবেশলাভ।

হ্যাঁ, সেই পরিচিত জগত। তার ঘরবাড়ী, পথঘাট, গাছপালা, মাঠ সবই কতো জানা। হারিয়ে যাওয়া জগত আবার ফিরে পেয়েছি। কিন্তু সবগুলি অধিবাসীই পূর্ব্বপরিচিত নয়। এ পৃথিবীতেও কতো জন্মেছে, কতো মরেছে। বেশী করেই চোখে পড়লো তোরণদ্বারের পাশেই সতর্ক প্রহরীরূপে জেগে আছেন আমাদের জেইলার রায় সাহেব। সেই বাঁকা দৃষ্টি, পুরু দু'টী ঠোঁটে বিকৃত হাসির আভাষ, সর্ব্বাবয়বে একটা প্রতিহিংসার সুপরিকল্পিত শান্ত উল্লাস।

এবার বাস করছি আমতলায় একটী ছোট ঘরে। ঘরখানি দু'ভাগে ভাগ করা। একভাগে কামারশালা আর একভাগে আমরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কামারশালার হাফর চলে আর অবিশ্রান্ত হাতুড়ীর ঘা। বিচারে শাস্তি হবার আগেই দণ্ডদান সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু একি দণ্ড! আরো বেশীর জন্যই তো আমরা প্রস্তুত।

এবার হাজি সাহেব নেই, মেথুদাও অনুপস্থিত। তবে পূর্ব্ব সহযাত্রিদের মধ্যে আরো কয়েকজন আছেন—সবাই মিলে প্রচুর অবসরের মধ্যে চারদিকে শুধু খুঁজি আগের চেনা জানা কারা এখনও রয়েছে।

সেদিন আমতলার চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। দূরে তোরণদ্বারের দিকে দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ, কিন্তু মন ঘুরে মরছিল এ পৃথিবীর বাইরে। কিছু দূরে বসে কয়েকটী কয়েদী রাস্তার কাটকুটো কুড়োচ্ছিল, হাতে ঝাড়ু ও ঝুড়ি। একজন আমার দিকে চেয়ে সেলামের ভঙ্গীতে হাত তুলল—একবার, দুইবার। দ্বিতীয় বারে আমি ভাল করে চেয়ে দেখলাম। বৃদ্ধ জীর্ণদেহ একটী লোক, মাথায় হলুদে টুপি। হলুদেটা সহজ খাটুনির নিদর্শন, সাদা শক্ত আর নীল মধ্যম। চেয়ে দেখলাম, কিন্তু চিনলাম না তাকে। আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে সে কাছে এগিয়ে এল।

আবার সেলাম করে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমায় চিনলেন না বাবু?

এবার চিনলাম, সে হালিম মিয়া। কিন্তু এই অবস্থা হয়েছে? উন্নত দেহ প্রৌঢ় হয়েছে, ন্যুব্জ শীর্ণদেহ বৃদ্ধ। তখন ছিল হাজতী এখন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তোমারও শাস্তি হয়েছে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল হালিম, হবে না বাবু? আমিও তো পাপকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম? পাঁচ বছরের জেল হল। সব গেছে বাবু, জমি যায়গা, হাল গরু—

জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার শীর্ণ কুঞ্চিত দু'টী গাল বেয়ে।

ওয়ার্ডার রুল উচিয়ে তাড়া করে এল, এই বুড়ো, কাজ কর, নইলে—দেখছিস্ তো?

করুণ নয়নে আমার দিকে একবার চেয়ে দূরে সরে গেল হালিম মিয়া।

তমিজকে দেখেছিলাম একদিন সন্ধ্যায় সাদা টুপি মাথায় ক্লান্তদেহে ঘানিঘর থেকে ফিরছে। সাত বছরের জেল হয়েছে তার।

একদিন সুযোগ পেয়েছিলাম কথা বলবার।

তমিজ রেগে আছে শ্বশুরের উপর। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছায় অনেক কথা বলে ফেলল—অথচ আসামীর কেসে কথা বলতে নেই। আর শুধু বলাই নয়, ছোট দারোগা, ভাইস্ চেয়ারম্যান কারো কথা বাদ দেয়নি। নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারল। সে সনে খায়রুন হলপ করে হালিমকেও কুৎসিৎ ভাবে জড়িয়ে দিল। সে এখন ভাইস চেয়ারম্যানের অন্দর মহলে আশ্রয় পেয়েছে। কি বোকামী হালিমের!

হালিম একদিন শুধু প্রশ্ন করল; সত্যি কথা বললাম

বলেই কি আমার এমন শাস্তি হল বাবু? জুরিরা তো ভদ্রলোক ছিলেন?

উত্তর খুঁজে পাইনি তখন—যখন পেয়েছি, তখন হালিমকে জানাবার আর উপায় নেই।

হালিম আরো জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কি এখান থেকে ফিরে যেতে পারব? আপনারা কি কোন পথ করে দিতে পারেন? আমার সব গেল।

আজ অতীতের সব কিছু আসছে মনের দোরে ভিড় করে। কারণ হালিম হারিয়ে গেছে।

ব্যারাকে সবাই বন্ধ হয়ে আছি। প্রচণ্ড নীরবতা। এতোগুলো মানুষ আমাদের পৃথিবীতে, অথচ কোন সাড়া নেই।

বাইরে ভারী বুটের ধীর মন্থর আনাগোনা। জেলার, জমাদার, ওয়ার্ডার সবাই ছুটোছুটি করছে। অঙ্কে একের গরমিল। খুঁজে বের করতেই হবে।

পাশেই ফিস ফিস গবেষণা হচ্ছে কি হতে পারে। কতো যে জল্পনা। কতো কাহিনী। কবে নাকি দুরন্ত ডাকাত একজন মাছির রূপ ধরে সেল থেকে উড়ে গিয়েছিল। পরদিন দরজা খুলে দেখা গেল পড়ে আছে শুধু ক'খানা কম্বল। এমন গুণীনও নাকি আছে, মন্ত্র পড়ে ধুলো ছিটিয়ে দিলে এত উচু শক্ত দেয়ালও ধ্বসে পড়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, হালিম কি তেমন একজন গুণীন?

একজন দ্বীপান্তরের কয়েদী বল্ল, বাহির দেখে মানুষ চেনা যায় না। মেট শ্রীরাম ওকে ছিরিরাম ধমক দিয়ে উঠল, চুপ। বাইরে আবার ভারী বুটের শব্দ। জমাদারের ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং করে। চারিদিকে কল-গুঞ্জন—পাওয়া গেছে···পাওয়া গেছে। সত্যি হালিম মিয়াকে পাওয়া গেছে? কোথায়। কোথায়!! হ্যাঁ পাওয়া গেছে, সে পালিয়ে যায় নি কোথাও, ব্যারাকেই ছিল। ব্যারাকের পায়খানাগুলি থাকে তালাবন্ধ। দু ঘণ্টা পর পাহারা বদলের সময় একবার বাইরের পাহারাদার চাবি পাঠায় ভেতরে—সে-ই দরজা খুলে চেঁচায় "পেসাব, পেসাব বলে। ঘুম ভেঙে সবাই উঠে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার দরজায় তালা পড়ে। সেদিনও তিনটার পাহারা বদলের আগেই বুঝিবা হালিমও গিয়েছিল। আর সে বেরিয়ে আসে নি। কিন্তু ঘুমচোখে আছে ঘরের সবাই, মেট-পাহারাও। কেউ লক্ষ্য করেনি। তাড়াতাড়ি জোরে তালা বন্ধ করে মেট অবসর নিয়েছে। ভোরবেলা থেকেই গোলযোগ বেধেছে, তাই মেজমতীও পায়খানা পরিষ্কারের সুযোগ পায় নি। পায়খানায়ই ছিল হালিম মিয়া।

জেলার জমাদার সকলের মুখেই হাসি। অঙ্ক মিলেছে, যোগফল ঠিক হয়ে গেছে এগারশ বত্রিশ। গেটের টিকিটে লেখা আছে এগারশ বত্রিশ ভেতরেও তাই। মার্কা কাটা-ছেঁড়া হবার পর যখন হালিম মিয়াকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন লেখা হবে—এগারশ একত্রিশ।

আগামীকালের মানুষের জন্য

ভিলিয়ার্স দে লাইল অ্যাদাম

ভিলিয়ার্স দে লাইল অ্যাদাম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে সাধারণত ফরাসী সাহিত্যখ্যাত 'সিম্বলিষ্ট মুভমেণ্ট'-এর পথিকৃৎ বলা হয়। 'এক্সেল' নামক তাঁর বিখ্যাত নাটকটি সার্থকতম রূপকনাট্য রূপে পরিগণিত এবং রূপকনাট্য সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়। অনেকে মনে করেন ইবসেন তাঁর বিখ্যাত 'ডলস হাউস' নাটকটি লেখার প্রেরণা ভিলিয়াস দে লাইল অ্যাদামেরই 'লা রিভোল্ট' থেকে পেয়েছিলেন। গল্প লিখিয়ে এবং কবি হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। 'কন্টে ক্রুয়েলস' নামক তাঁর গল্প-সংকলনটি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের অল্পদিন পরেই তা' অসামান্য প্রশংসা অর্জন করে। কথিত আছে গল্প লেখার আগে তিনি গল্প শুনিয়ে নিতেন এবং অনেক সময় গল্প আদৌ লিখতেন-ই না। ফলে আমরা হয়ত অনেক ভাল গল্পের রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যতদিন 'কন্টে ক্রুয়েলস' আছে ততদিন ভিলিয়ার্স রসিক হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকবেন। পরবর্তী লেখকদের ওপর তাঁর প্রভাব অপরিসীম। মোটের ওপর নাট্যকার, কবি, গল্পলিখিয়ে, ব্যঙ্গনিপুণ লেখক এবং সর্বোপরি 'সিম্বলিষ্ট মুভমেণ্টে'র পথিকৃৎ হিসেবে ফরাসী ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মর্তব্য। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তিনি পরলোকগমন করেন।

লণ্ডনের আদালতে ডাক্তার হ্যালিডনহিলের অসাধারণ মামলাটি শীগ্‌গীরই উঠবে। ব্যাপারটি হচ্ছে এই :

গত বিশে মে ফুসফুস-সংক্রান্ত রোগবিশেষজ্ঞ বিখ্যাত ডাঃ হ্যালিডন হিলের প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ত্বু'টিতে প্রতিদিনের মত গাদা-গাদা রোগী অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের হাতে একটি করে টিকিট। শত শত রোগী আরোগ্য করে থাকেন বলে ডাক্তার হ্যালিডনের প্রভূত পসার।

প্রবেশপথে লম্বা কালো চাপকান পরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাশিয়ার। প্রত্যেকের কাছথেকে দেয় গিনি ছুটি নিয়ে সে তাদের পরীক্ষা করবার জন্যে একটি সুন্দর নেহাইয়ের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে দেখছে সেগুলি ঠিক আছে কিনা এবং পরীক্ষা হয়ে গেলে রোগীদের বলছে 'ঠিক আছে।'

কাঁচের জানালা দেওয়া কনসালটিং রুম। ভেতরে দেয়ালের চারধারে বড় বড় জাপানী পাত্রে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বড় বড় ফুলগাছ দিয়ে পাড়ের মত সাজানো। সবেমাত্র খুদে ডাক্তার হ্যালিডন হিল এসে বসেছেন তাঁর টেবিলের সামনে সোজা হয়ে। তাঁর পাশে একটি গোল টেবিলের ধারে বসে তাঁর সহকারী বা সেক্রেটারি সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাপত্রগুলি 'শর্টহ্যাণ্ড'-এ লিখে নিচ্ছেন। সিঁড়ির ওপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লাল ভেলভেটের পোষাক-পরা ও ত্বু'টি সোনার আংটা আটা এক লম্বা-চওড়া কাঁধ-উঁচু চাকর। এর কাজ হচ্ছে ডাক্তারের বলবার সংগে সংগে তুর্বল ক্ষয়রোগীদের যাদের দেখা হয়ে গেছে, তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে বিশেষ চেয়ারে বসিয়ে লিফটের সাহায্যে তাদের নীচে নামিয়ে দেওয়া।

রোগীরা প্রবেশ করছে। নিষ্প্রভ তাদের দৃষ্টি, বুক-খোলা, হাতে তাদের পোষাক, সংগে সংগে 'প্রেস্ক্রিপ্টার' ও নল দিয়ে তাদের পিঠ ও বুক পরীক্ষা করা হচ্ছে।

'টিক! টিক! কট! নিঃশ্বাস নিন, জোরে নিঃশ্বাস নিন...কট...ঠিক আছে।'

তারপরই সুরু ব্যবস্থাপত্র লেখা এবং ত্বু'চার সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার ডাক্তারের হাঁক 'এরপর কে আছেন?'

গত তিনবছর যাবৎ এইভাবে রোজ ন'টা থেকে বেলা

বারোটা পর্য্যন্ত রোগীদের মিছিল চলে আসছিল ডাক্তারের এই ঘরটিতে।

এমন সময় একদিন মানে গত বিশে মে ঠিক ন'টার সময় এক রোগী এসে হাজির। হাড়গোড় বার-করা, লম্বা দেখতে, যেন একটা জীবন্ত কঙ্কাল। চোখের তারাদুটি কপালে উঠে ঘুরছে যেন, গাল দু'টি চোয়ালের ভেতর ঢুকে গেছে, খোলা বুকটা যেন শিথিল চামড়া-মোড়া হাড়ের খাঁচা বিশেষ, হাঁপানি আর কাশির ঝোঁকে তা' ওঠা-নামা করছে। মোটকথা লোকটাকে দেখলে বোঝা যায় না সে জীবিত না মৃত—মাংসহীন একটি বাহুর চামড়া নীল হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা থরো থরো পদক্ষেপে সে ঢুকল ঘরের ভেতর। ঘরের গাছগাছড়াগুলি সে ধরে রইল যাতে পড়ে না যায়।

'টিক। টিক। কট। নাঃ, কোন আশা নেই', নৈরাশ্যের সুরে বলে উঠলেন ডাক্তার হ্যালিডন হিল। 'আমি কি করোণার যে মরা লোকের সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করব? এক হপ্তার মধ্যেই আপনার বাঁ ধারের ফুসফুস একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে, আর ডান পাশেরটা তো ঝাঝরা হয়েই গেছে···এর পর কেআছেন?'

চাকরটি ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ দুই ভ্রূরেখার মাঝখানে আঙ্গুলের আঘাত করে অদ্ভুত এক তির্যক হাসি হেসে বললেন, 'আপনি কি বড়লোক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কোটীপতি আমি', অশ্রুসজল চোখে থরথরে গলায় বলে উঠল হতভাগ্য লোকটি, যাকে কি না ডাক্তার এক মুহূর্ত্ত আগেই আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিদায় দিচ্ছিলেন।

'তা'হলে আপনার এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীটি সোজা আপনাকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নিয়ে যাক। সেখান থেকে এগারোটার এক্সপ্রেসে চলে যান ডোভার। তারপর জাহাজে·· তারপর ক্যালে থেকে মার্সাই গরম 'স্লিপিং কারে'···তারপর যাবেন নাইসে। বাস। সেখানে ছ'মাস দিনরাত্তির 'ওয়াটার-ক্রেশ' খাবেন। রুটি, মদ, ফল, মাছ, মাংস আর কিচ্ছু স্পর্শ করবেন না। একদিন অন্তর দু'চার ফোঁটা আয়োডিন মেশানো এক চামচ বৃষ্টির জল আর ওয়াটার-ক্রেশ, শুদ্ধু ওয়াটার-ক্রেশ, অন্য কিছু না, মনে থাকে যেন। ভাল করে নিঙড়ে রসটুকু খাবেন আপনার এই একটি চান্স···আপনাকে খুব বেশি আশা দিতে পাচ্ছি না তা' বলে। এই আন্দাজী ওষুধটির কথা অনেক শুনেছি আমি, কিন্তু ওটা আমার কাছে অসম্ভব বোধ হয়, তবে যার সারবার কোন আশা নেই ভাবেই আমি এটা দিচ্ছি, ক্ষণিকের জন্যেও এর ওপর বিশ্বাস না রেখে। তবে কি, কেউ বলতে পারে না ত' কি সে কি হয়, সবই সম্ভব···যাক্, কে আছেন এরপর?'

ক্ষয়-রোগগ্রস্ত ধন-কুবেরটিকে চাঁদোয়া দেওয়া লিফ্‌টে সন্তর্পণে বসিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসা হল নীচে, এবং তারপর যথারীতি আবার যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিশ ও হাঁপানি রোগীদের মিছিল সুরু হল।

ছ'মাস পরে, ৩রা নভেম্বর, ঠিক ন'টার সময়েই দামী 'ফারের' পোষাক পরা দৈত্যাকৃতি এক লোক টিকিট ছাড়া সটান গিয়ে হাজির চিকিৎসকপ্রবরের পবিত্র ঘরটিতে। ঘরভর্ত্তি অসহায় করুণ শীর্ণ দুর্ব্বল ক্ষয়রোগীদের মধ্যে তার আবির্ভাব মানুষ-বোমার মত মনে হ'ল। বাজখাঁই তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু আনন্দ-মধুর। সেই স্বরধ্বনিতে ঘরের শার্সি-গাছ-গাছড়া সব কেঁপে উঠল যেন।

ডাক্তার হ্যালিডনহিল অন্য দিনের মতই তখন সবে তাঁর টেবিলের সামনে এসে বসেছেন, গায়ে তাঁর লম্বা কালো চাপকান। একটু শীত শীত বোধ হচ্ছে তাঁর।

দৈত্যটি দু'হাতে জড়িয়ে পালকের মত তাঁকে তুলে ফেলল এবং নীরবে তাঁর শ্মশ্রুহীন শুকনো গাল দু'টি চোখের জলে ভিজিয়ে বারবার তার ওপর সশব্দ চুম্বন দিতে লাগল, তারপর তাঁকে সবুজ আরাম-কেদারায় বসিয়ে দিল। ডাক্তার হ্যালিডনহিলের অবস্থা তখন নির্জ্জীবের মত শ্বাস প্রায় বন্ধ হয় আর কি।

—'বিশ লক্ষ? কত চান? ত্রিশ লক্ষ? স্থূল উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল দৈত্যটি। ভয়াল ও জীবন্ত বিজ্ঞাপন যেন সে।

—'জানেন আপনার জন্যেই আমি আজ নিঃশ্বাস নিতে পারছি, পৃথিবীর জল-হাওয়া সূর্য্যের আলো সবই পাচ্ছি আপনার জন্যে, আনন্দ-সম্ভোগ-সৌন্দর্য্য-অস্তিত্ব এইসবের জন্যে আপনার কাছেই আমি ঋণী। বলুন কত চান আপনি? দাবি করুন এমন পারিশ্রমিক যা কেউ কখনো

শোনে নি! কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তর আমার তা পরিশোধ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বলুন ডাক্তার বাবু…'

ক্ষণিকের স্তব্ধতার শেষে ক্ষীণকণ্ঠে ডাক্তার বললেন—'এই পাগলটা কে? বার করে দাও তো একে।'

'আরে না-না' বলে উঠল লোকটি এবং মুষ্টিযোদ্ধার মত এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করে বলল যে চাকরটি ভয়ে পিছিয়ে গেল।

'…বাস্তবিক আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি, এমন কি আপনি যিনি আমায় মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি সেই 'ওয়াটার-ক্রেশ-নেওয়া লোক। সেই হতভাগ্য মৃত্যুপথযাত্রী নরকংকাল। নাইস…ওয়াটার-ক্রেশ, ওয়াটার-ক্রেশ, শুদ্ধ ওয়াটার-ক্রেশ। আপনার কথামত ছ'মাস ছিলাম সেখানে আর আপনার সেই চিকিৎসার ফল দেখুন আজ। আর শুনুন তবে…'

বলে সে নিজের বুকের ওপর এত জোর ঘুঁষি মারতে লাগল যে, তাতে প্রতিযোগিতায় প্রথম-হওয়া একটি ষাঁড়েরও মাথার খুলি ভেঙে যায়।

'অ্যাঁ!' বলে ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'আপনি আপনি কি সেই, মানে সেই মুমূর্ষু যে—?'

'হ্যাঁ, আমি, আমিই সেই' উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল দৈত্যটি। কাল জাহাজ থেকে নেমেই আমি আপনার জন্যে একটি ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি গড়বার অর্ডার দিয়েছি। আর আপনার জন্যে 'ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারে' একটা সমাধিরও ব্যবস্থা আমি করছি।'

এই বলে সে একটি বড় সোফায় বসে পড়ল। সোফার স্প্রীংগুলি বিচিত্র আওয়াজে বেজে উঠল। শান্ত সুন্দর পরিতৃপ্তির হাসি হেসে দীর্ঘশ্বাসে সে বলল 'আহা, জীবন কি সুখের!'

ডাক্তার বিড়বিড় করে কি বলতেই সেক্রেটারী ও চাকরটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে রইল শুধু জীবনগ্রাহী ও জীবনদাতা—লোকটি ও ডাক্তার। ডাক্তারের মুখ উদাস গম্ভীর পাণ্ডুর কঠিন, কয়েক মিনিটের নীরবতায় চকিত চঞ্চল দৃষ্টি বুলিয়ে ডাক্তার দেখে নিলেন লোকটিকে, তারপর অদ্ভুত স্বরে অস্ফুটভাবে বললেন—'দাঁড়ান, আপনার রগের উপর ঐ মাছিটা তাড়িয়ে দিই।'

বলেই সামনের দিকে ঝুঁকে ডাক্তার তাঁর পকেট থেকে ছোট একটি 'বুলডগ' রিভলবার বার করে লোকটির বাঁ-রগের ধমনীতে ছ'বার খুব তাড়াতাড়ি গুলি করলেন।

দৈত্যটি পড়ে গেল, কৃতজ্ঞতা-ভরা মাথার খুলি চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। আর সে মিনিট-খানেকের জন্যে হাতের বিরাট চেটো দিয়ে তার ওপর সজোরে আঘাত করে স্থির নিঃস্পন্দ হয়ে গেল।

কাঁচির দশটি আঘাতেই ফার-কোট ভেতরের লিনেনের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কেটে ফেললেন ডাক্তার হ্যালিডনহিল এবং তারপর অস্ত্র-চিকিৎসার প্রকাণ্ড ধারালো ছুরি দিয়ে আগাগোড়া চিরে ফেললেন তার খোলা বুক।

মিনিট পনের পরে দারোগা বাবু যখন ডাক্তারকে তার সংগে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে ঘরে ঢুকল তখন তিনি টেবিলের সামনে বসে জোরালো লেন্স হাতে শান্তভাবে পরীক্ষা করছেন রক্তাপ্লুত টেবিলে-বিছানো প্রকাণ্ড একজোড়া ফুসফুস। ওয়াটার-ক্রেশের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়ার কারণ তখন অনুসন্ধানে মগ্ন এই প্রতিভাধর বিজ্ঞান-মনীষী ডাক্তার হ্যালিডনহিল।

'দারোগাবাবু' বলতে বলতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন 'এই লোকটিকে হত্যা করা আমি উচিত মনে করলাম এই কারণে যে মানুষের নষ্ট-হয়ে-যাওয়া ফুসফুস কেমন করে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলা যায়, তার উপায় এর দেহ-ব্যবচ্ছেদের ফলে জানা সম্ভব। সেই জন্যেই আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করছি কর্তব্যের কাছে আমি আমার বিবেককে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করলাম না।'

বলা অনাবশ্যক যে, এই বিখ্যাত ডাক্তার এখন ব্যক্তিগত জামিনে মুক্ত আছেন, কারণ তাঁর হাজতবাসের চাইতে তাঁর মুক্তি আমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ। এই বিচিত্র ঘটনাটি এখন ব্রিটিশ আদালতে উপস্থাপিত হবে। সমগ্র ইউরোপ কি বিস্ময়কর মামলাই না শুনবে শীগ্গীর।

আমাদের যতদূর মনে হয় এই মহান অপরাধের জন্যে ডাক্তারকে নিউগেটের ফাঁসীর মঞ্চে যেতে হবে না। আগামী দিনের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং তার জন্যে আজকের একটি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে হত্যা—এই আপাত অপরাধে অপরাধী মহাপ্রাণ বিজ্ঞানীরা দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি যেমন করে হোক পাবেনই।

নারী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। অবনীবাবুর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় একতলা হইতে নারী-কণ্ঠে সকরুণ চাপা ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। তাহার পরই ঘা কতক প্রহারের শব্দ কানে আসিতেই অবনীবাবু তাঁহার পরিবার কৃষ্ণভামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার বুঝি নীচে বৌটাকে ঠেঙাচ্ছে।

কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, ও লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটেটাকে তুলে দাও না, ছাই। আপদের শান্তি হয়। তিরিশ দিন রাতে এই সব নোঙরাপানা আর আমার সহ্য হয় না।

পরক্ষণেই নীচের তলা হইতে কুঞ্জলালের স্ত্রী একেবারে ডুকরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমায় একেবারে মেরে ফেল—মেরে ফেল। আমার মরণ হ'লে বাঁচি—আর জ্বালা সয় না—আর জ্বালা সয় না।

পুনরায় প্রহারের শব্দ।

—ও বাবাগো—মাগো—

অবনীবাবু শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। আপন মনে বলিলেন, নাঃ—হতভাগাকে রোজ বল্‌ছি ঘর ছেড়ে দিতে—তা আর হচ্ছে না।

কৃষ্ণভামিনী কহিলেন, ঘর ভাড়াও তো তিন মাস বাকি পড়ে আছে।

এমন সময় কুঞ্জলালের মেয়ে সুষমা উপরে আসিয়া অবনীবাবুর রুদ্ধ ঘরের সম্মুখে বাহিরে দাঁড়াইয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে ডাকিল, জেঠাবাবু—

অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

সুষমা বলিল; আমি সুষমা।

কুঞ্জলাল মদ্যপায়ী। একটা মটর ফ্যাক্টরীতে মিস্ত্রীর কাজ করিত। প্রায় রাত্রে মদ্যপান করিয়া টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিত এবং ঘরে ঢুকিয়া সুষমার মা মনোরমার উপর অভদ্রোচিত অত্যাচার সুরু করিয়া দিত।

সুষমার ডাকে অবনীবাবু দরজা খুলিয়া দিলেন।

সুষমা ঘরের মধ্যে না ঢুকিয়াই বলিল, জেঠাবাবু, আপনি একবার নীচে গিয়ে না দাঁড়ালে—

বাধা দিয়া অবনীবাবু কহিলেন, ওসব মাতালের কাণ্ড—আমি গিয়ে সেখানে কি করবো?

কৃষ্ণভামিনী একটা সক্রোধ ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার ঘর ছেড়ে দাও বাপু। আমরা তোমাদের মত ইতর লোককে আর ঘর ভাড়া দোব না।

সুষমা সবিনয়ে বলিল, জেঠাইমা, বাবা ঘর দেখছে—এই মাসের মধ্যেই আমরা উঠে যাবো।

কৃষ্ণভামিনী কহিলেন, আর মাস দেখাতে হবে না। তোমার বাবা-মাকে ব'লে কালই ঘর ছেড়ে দাও।

সুষমার বেশ বয়স হইয়াছে, বালিকা নয়। ষোলো সতেরো বছরের উপযুক্ত অবিবাহিতা মেয়ের সম্মুখে বাপ-মায়ের এ বেলেল্লাপনা কেহই সমর্থন করিবে না। নীচের তলায় দুইখানি ঘর—ও একটু রাঁধিবার জায়গা মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় কুঞ্জলাল ভাড়া লইয়াছে। অল্প প্রায় দুই বৎসর সে তাহার পরিবার ও একমাত্র মেয়ে সুষমাকে লইয়া অবনীবাবুর বাড়ীর একতলায় বাস করিয়া আসিতেছে। প্রথম প্রথম মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়া কুঞ্জলাল ঠিক মাস শেষ হইলে অবনীবাবুর হাতে দিয়া দিত। কুঞ্জলালের যে এত গুণ আছে, তাহা অবনীবাবু পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। পরে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল।

সুষমার রূপসৌন্দর্য্য দারিদ্র্য নিষ্পেষিত অপুষ্ট দেহে যতটুকু থাকা সম্ভব তাহা ছিল। সুষমার গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল না। ঈষৎ শ্যামবর্ণা, সুষমার মুখশ্রীটুকু বেশ ভালোই ছিল। শিক্ষা তাহার উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও সে বাঙ্‌লা বই পড়িতে পারিত এবং অমন দশবারোখান বই সে ইতিমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়াও ফেলিয়াছে। একই বাড়ীতে

উপরের তলায় অবনীবাবু সস্ত্রীক থাকেন। অবনীবাবুর সন্তানাদি হয় নাই। সুষমা এ বাড়ীতে আসিয়াই অবনীবাবুর সহিত 'জ্যেঠামহাশয়' সম্পর্কটা প্রথমেই পাতাইয়া রাখিয়াছিল—ইহা তাহাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই।

কুঞ্জলাল আবার খা কতক প্রহার করিতেই মনোরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। থামিতে না পারিয়া অবনীবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। কুঞ্জলালের ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেশ পরুষকণ্ঠে কহিলেন, কি হচ্ছে এ সব ভদ্রলোকের বাড়ীতে? মাতলামো করবার আর জায়গা পাওনি?

কুঞ্জলালের তখন নেশার ঘোর খুব। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। হাতে একটা খালি জলের গেলাশ লইয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, এক গেলাশ জল চাইলুম—তা শালী বলে কিনা—'পারবো না দিতে—গড়িয়ে খাওগে'। এত বড় তেজ।

অবনীবাবুর কথাটা কুঞ্জলালের কানেই ঢুকে নাই।

মনোরমা আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়া কুঞ্জলালের মুখের উপর অবনীবাবুর সম্মুখেই বলিয়া উঠিল, বেশ করবো—আমি পারবো না।

কুঞ্জলাল বাঙালী পুরুষ মানুষ। তাহার ধারণা বরাবরই—স্ত্রী দাসী বাঁদী ছাড়া আর কিছুই নহে। মনোরমার এই ঝাঁঝালো উত্তরে তাহার পুরুষত্ব কেমন গর্জ্জিয়া উঠিল। মদের নেশায় স্বামীর স্বামিত্ব ফলাইতে গিয়া কুঞ্জলাল 'তবে রে শালী—আবার কথা'—এই বলিয়া সেই হাতের গেলাশটা সজোরে ছুঁড়িয়া মনোরমাকে মারিয়া বসিল। আত্মরক্ষার বাঁ হাতখানা তুলিতেই গেলাশটা মনোরমার হাতে একটা তীব্র আঘাত দিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের উপর গড়াইতে গড়াইতে এক কোণে একটা ঠেকা খাইয়া অচল হইয়া থামিয়া পড়িল। গেলাশের আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। কাঁসার গেলাসটা তো আর মাতাল হয় নাই, যাক্ রক্তারক্তি কাণ্ডটা সে যাত্রায় আর গড়াইল না।

অবনীবাবু সজোরে দরজার কপাটে হাত ঠুকিয়া কুঞ্জলালকে ধমক দিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে এ সব মাতলামী!

কুঞ্জলাল তখন অবনীবাবুর দিকে মুখ ঘুরাইয়া কহিল, কে বলে—কোন্ শালা বলে, মাতলামো করছি?

কৃষ্ণভামিনী অবনীবাবুর পিছন পিছন নামিয়া আসিয়াছিলেন। ব্যাপার গতিক দেখিয়া বলিলেন, তুমি চলে এস বাপু, ওপরে। ওসব মাতাল দাঁতালের কাণ্ড—এখুনি আবার তোমায় একটা না একটা কিছু ছুঁড়ে মেরে বসবে।

অবনীবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কুঞ্জলালকে বলিলেন, এটা কি বস্তির বাসা—ছোটলোকের তাড়িখানা পেয়েছ? ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দোব তা জানো? মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘরের মধ্যে রাতদুপুরে বৌকে ধরে ঠেঙ্গানো আরম্ভ করেছ—

বাধা দিয়া কুঞ্জলাল দাঁত মুখ ভেঙ্‌চাইয়া বলিয়া উঠিল, আমার বৌকে রাতদুপুরে আমি ঠেঙাবো না তো কি তুমি ঠেঙাবে? কোথাকার মদের চাঁদ এলে গো!

অবনীবাবুর গায়ে ক্ষমতা ছিল। ছেলেবেলায় এবং বেশ অধিক বয়স পর্য্যন্ত তিনি রীতিমত শরীরচর্চ্চা করিয়াছিলেন। অবনীবাবু বুকখানা ফুলাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ফের—রাস্‌কেল্ কোথাকার। ঘুসিয়ে মুখের থোব্‌না উড়িয়ে দোব—তা জানো?

কুঞ্জলাল বেশ জড়িতকণ্ঠে কহিল, মাইরি আর কি! জাম্ কবুল—একটা ঘুসি হাঁকাও না দেখি। রবার্টসন্ সাহেবকে বলে তোমায় যদি শায়েস্তা না করতে পারি তো আমার নাম 'কুঞ্জলাল' নয়।

অর্থাৎ কি না—রবার্টসন্ সাহেব তাহাদের মটর ফ্যাক্টরির হেড মিস্ত্রী। তাহার অধীনে কুঞ্জলালের মত অনেক দেশী মিস্ত্রী খাটে। কুঞ্জলাল প্রায়ই সকলকে অন্য সময় বলিয়া বেড়াইত যে, রবার্টসন্ সাহেব তাহার হাতের মধ্যে। সে যাহা বলিবে রবার্টসন্ সাহেব তাহা শুনিবে। ইত্যাদি।

মদের খেয়ালে কুঞ্জলাল অবনীবাবুকে তাহার সহকর্ম্মী ভাবিয়াছিল।

অবনীবাবু কহিলেন, তোর রবার্টসন্ সাহেবের নিকুচি করেছে।

কুঞ্জলাল অবনীবাবু হাত গুটাইতেছেন দেখিয়া কেমন যেন একটু ভয় খাইয়া গেল। একটু পিছনে হটিয়া বলিয়া উঠিল, খবরদার বলছি—আর যদি এক পা আমার দিকে এগুবে তো একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। কুঞ্জ জানের পরোয়া করে না—এটা জেনে রেখ।

মনোরমা অবনীবাবুকে দেখিয়া মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল। কৃষ্ণভামিনী তাঁড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া অবনীবাবুর হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। বলিলেন, চলে এস তুমি এখান থেকে।

কৃষ্ণভামিনীকে দেখিতে পাইয়া কুঞ্জলাল কহিল, ওঃ ভারি মরদ রে! আপনি পারে না—আবার বৌকে ডেকে এনেছে। যা—যা—আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা।

অবনীবাবু ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুমি আমার ঘর ছেড়ে দেবে কি না—আমি শুনতে চাই। আজ তিন মাস ভাড়া পড়ে রয়েছে—সেদিকে হুঁস নেই আবার ভাঁট দেখাচ্ছে! রাস্কেল কোথাকার!

কুঞ্জলাল একটু অবনীবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, খবরদার বলছি—মুখ সামলাকে বাৎ বোলেগা। রাসকেল আমি—না—রাসকেল তুই? নিকালো হামারা ঘরসে, জলদি নিকালো হামারা ঘরসে। আই সার কুঞ্জলাল—মটর মেকানিক্ হয় সার্। ভাগো হিঁয়াসে। ওঃ—ঘর ভাড়া নিতে এসেছে—যাও যাও। কার বাড়ী? কে তুমি? এখন আমরা কমুনিষ্ট—বাড়ী সব আমাদের। তোম্ নিকালো হিয়াসে। হাম্ রূপেয়া ওন্ট্ গিভ্ (won't give)। যো করতে পারতা হায়—যাও—করো।

জড়িত কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কুঞ্জলাল আরও অনেক কিছু বলিয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া অবনীবাবুকে এমন একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়া বসিল, যাহাতে উপস্থিত সকলেই বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সুষমা সেই সময় ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা—

অবনীবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কুঞ্জলালের গলা একেবারে সজোরে টিপিয়া ধরিলেন। বেশ ঘাড়টা ধরিয়া দু'বার ঝাঁকুনি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর বলবি—আর বলবি—জিভ টেনে বার করবো না।

কুঞ্জলাল চাপের চোটে কেবল গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

মনোরমা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে। মদ খেয়ে মাতলামো করা একেবারে জন্মের মত শোধ ঘুচিয়ে দিন।

সুষমা অবনীবাবুর এরূপ অগ্নিমূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই এরূপ বেহায়াপনা কুঞ্জলাল অনেকবারই করিয়াছে—অনেকবারই অবনীবাবু উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া ধমক ধামক দিয়া তাহাকে শাসন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেদিন কুঞ্জলাল যেরূপ আরম্ভ করিয়াছিল—এরূপ পূর্ব্বে কখনও করে নাই। কুঞ্জলাল তখনও গোঁ গোঁ করিতেছিল। ভয়ে সুষমা ছুটিয়া আসিয়া অবনীবাবুর বজ্রমুষ্টি শিথিল করিয়া দিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, জ্যেঠাবাবু—জেঠাবাবু—এবার ছেড়ে দিন। আর বাবা কিছু বলবে না।

অবনীবাবু কুঞ্জলালের গলা ছাড়িয়া দিলেন। কুঞ্জলাল মদের খেয়ালে তখন হাউ হাউ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। কাঁদিতে লাগিল আর মুখে যা' আসিল অবান্তর বলিয়া গেল। অবশ্য মনোরমাকে আর মারধোর করে নাই বা অশ্লীল গালাগাল কাহাকেও দেয় নাই। কুঞ্জলাল তখন তাহার জীবনের যত দুঃখ সঞ্চিত ছিল—সবই হাউ হাউ করিয়া প্রকাশ করিয়া গেল। সে কথায় কেহ আর কান দিল না। অবনীবাবু ও কৃষ্ণভামিনী উপরে উঠিয়া আসিলেন। সিড়িতে উঠিতে উঠিতে অবনীবাবু সুষমাকে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, সুষমা—কাল সকাল হ'লেই তোমার বাবা-মাকে বলে আমার ঘর ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। তা' না হলে আমি হুলস্থূল কাণ্ড করবো—তা' বলে রাখছি। যদি তোমাদের বিদেয় করতে থানা পুলিশ মামলা-মোকদ্দমা পর্য্যন্ত করতে হয়—তাও আমি করবো। বুঝলে—

ঘরের ভিতর হইতে সুষমা কহিল, আচ্ছা।

কুঞ্জলাল বেশ ভাল ঘরের ছেলে। সঙ্গদোষে পড়িয়া অমন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মাঝে মাঝে কারখানায়

অন্যান্য মিস্ত্রীদের নিজের ঘরে সন্ধ্যার পর লইয়া আসিত। সুষমা তাহাদের চা তৈয়ারী করিয়া দিত—পান সাজিয়া খাওয়াইত। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়াইতেই অবনীবাবু কুঞ্জলালকে ডাকিয়া একদিন বেশ ধমক দিয়া নিষেধ করিয়া দেন। তাহার পর হইতে কুঞ্জলালের বন্ধু আর কেহ কুঞ্জর ঘরে আসিত না।

আত্মীয় স্বজন বলিয়া কুঞ্জলালের কেহ ছিল না। দূর সম্পর্কের দু'একজন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা কুঞ্জলালের ইতর সঙ্গ ও দুর্নীতিপরায়ণ স্বভাব দেখিয়া কেহই তাহার কোন খোঁজ খবর করিত না।

পরদিন কারখানার ছুটি। কুঞ্জলালকে কাজে যাইতে হইবে না। সে একটু দেরী করিয়া ঘুম হইতে উঠিল। মদের খেয়ালে সে গতরাত্রে কি কাণ্ড করিয়াছে, তাহা তাহার মোটেই স্মরণ নাই। সুষমার মুখে সে সমস্তই শুনিল। এখন আর তাহার নেশা নাই। এখন কুঞ্জলাল বেশ চমৎকার মানুষ; ভদ্রতাজ্ঞান এখন তাহার টনটনে। ঘরের ভাড়া সে সত্যই তিনমাস দিতে পারে নাই। তাহার উপর গতরাত্রে সে অবনীবাবুকে ঐরূপ ভাবে অপমানিত করিয়া বসিয়াছে। কি হইবে এবং কি যে সে করিবে—কুঞ্জলাল কিছু ভাবিয়া পাইল না।

অবনীবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া ডাকিলেন, সুষমা—সুষমা।

অবনীবাবুর কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর। একটা তীব্র বিরক্তির ভাব তাহাতে বিরাজ করিতেছিল। প্রথম ডাকে সুষমার কোন উত্তর না পাইয়া অবনীবাবু পুনরায় ডাকিলেন, সুষমা—সুষমা—

একান্ত অপরাধিনীর মত সুষমা ধীরে ধীরে অবনী বাবুর নিকট আসিয়া অত্যন্ত নম্র সুরে উত্তর দিল, কহিল এই যে জ্যেঠামশাই।

অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবা মাকে আমার কথা বলেছিলে?

সুষমা ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিল না। নীরবে মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তোমার বাবা মা উঠেছে?

কুঞ্জলাল দরজার নিকট আসিয়া বলিল, দাদা—এই যে আমি উঠেছি।

কুঞ্জলালের একেবারে অতি সহজ সরল ভাব।

অবনীবাবু ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, ও সব দাদা-ফাদা ছেড়ে দাও। আমার ঘর ছাড়বে কিনা—আমি জানতে চাই। আর আমার তিন মাসের ভাড়া ৯০৲ টাকা—

বাধা দিয়া কুঞ্জলাল বলিল, দাদা, আগে বলুন, মাপ করলেন। আমি কিন্তু কাল রাতে বুঝতে পারি নি। আমার কেমন জ্ঞান ছিল না।

—তোমার জ্ঞান থাকুক বা লোপ পাক—আমি ওসব কোন কথা শুনতে চাই না। আমার ঘর ছাড়বে কি না—জানতে চাই। আমি মাতাল ভাড়াটে রাখবো না।

—আজ্ঞে—মদ আমি তো খাই না। ও অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

এই বলিয়া কুঞ্জলাল অবনীবাবুর পা দু'টা সত্যসত্যই স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। অবনীবাবু তাড়াতাড়ি একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলেন, দিব্যিটিব্যি আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

কুঞ্জলাল বলিল, আজ্ঞে—আপনাকে আমি কখনো মারতে যেতে পারি বা আপনাকে আমি কখনো গালাগাল দিতে পারি! আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না—আমি স্পষ্ট বলছি—কালীমায়ের দিব্যি—আপনাকে যদি গালাগাল দিয়ে থাকি আমি—আমার জিহ্বা খসে যাবে তিনদিনের মধ্যে, আমার বজ্রপাতে মৃত্যু হবে—আমার এই সোমত্ত মেয়ে—তার মাথায় হাত দিয়ে—

একটু ধমক দিয়া অবনীবাবু কহিলেন, থামো—আমি ও সব কথা শুনতে আসি নি। তুমি আমার ঘর ছাড়বে কি না—বলো?

—ছেড়ে দোব দাদা—এ ঘর আমি ছেড়ে দোব। এ ঘরের ভাড়া আমি কোত্থেকে দোব? আমার আয় কোথা? আমি নারকেলডাঙার বস্তিতে ঘর দেখেছি। সামনের মাসে খালি হবে। আপনার পাওনা কিছু আমি মারবো

না। পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত শোধ করে দিয়ে যাবো যাবার সময়—তা আমি বরাবরই ব'লে আসছি।

ইহার উত্তরে অবনীবাবু কি একটা বলিতে যাইতে-ছিলেন। কুঞ্জলাল তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়া গেল, একটু ইতস্ততঃ করছি কেন জানেন? মেয়েটা বড় হয়েছে। বস্তিতে গিয়ে থাকবো—সেখানে যত সব ছোট-লোকের আড্ডা—

অবনীবাবু তৎক্ষণাৎ কহিলেন, তুমিও ছোটলোক—তুমি কি ভদ্রলোক? প্রথম বুঝতে পারিনি তাই ঘর ভাড়া দিয়েছিলুম। ঐ বস্তিই তোমার ঠিক স্থান। সেখানে থাকোগে—মাতলামো করোগে—বৌ মেয়ে ঠেঙাওগে—

কুঞ্জলাল বিনীতভাবে কহিল, আপনি বলুন, দাদা—আপনি আমার গুরুজন—অপরাধ করলে বকবেন ধমকাবেন, দোষ করলে দু'ঘা জুতো খুলে মারবেন—এতে আর এমন কি! আমি তো তাই চাই। তবু পাঁচজনে বলবে—আমি ভদ্দরলোকের আশ্রয়ে আছি। আপনাকে দুঃখের কথা কি বলবো—আপনি আমার সংসারের সকল কথাই জানেন। আমাদের কারখানার মানুকে—মানিক—সে বেটা বলে কিনা—সুষমাকে সে বিয়ে করবে। ওকে দেখে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বলুন—আমি বাপ হয়ে কেমন করে তার হাতে মেয়েকে সঁপে দিই। বেটা একেবারে পাঁড়মাতাল—স্বভাব-চরিত্তির খারাপ। কারখানার শিবু মিস্ত্রীর বৌটাকে গত বছর বার করে নিয়ে গেল। তারপর—

এ সব নোংরা কথা অবনীবাবুর শুনিতে মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, থামো—আমি তোমার সংসারের কুলুজি শুনতে আসিনি। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমার ঘর ভাড়া নিয়ে। আমার আজ পর্য্যন্ত ভাড়া মিটিয়ে তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাও, তোমার মেয়ে বৌ নিয়ে যা খুসী করোগে—আমার কিছু তা জানবার দরকার নেই। আমি দুদিন সময় দিলুম—আজ আর কাল—পরশু আমি অন্য ব্যবস্থা করবো। এই ব'লে রাখলুম।

এই বলিয়া অবনীবাবু সুষমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সুষমা, তোমার বাবা-মাকে বুঝিয়ে আমার ঘর দুদিনের মধ্যে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। আমার আর সময় নেই দাঁড়াবার—অফিস বেরুতে হবে। বুঝলে?

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া বিনীতভাবে কহিল, আচ্ছা।

অবনীবাবু উপরে চলিয়া গেলেন।

মনোরমার সহিত কৃষ্ণভামিনীর বনিত না। প্রায় অনেক লইয়া উভয়ের ঝগড়া চলিত। কৃষ্ণভামিনী ছিলেন মুখরা। তিনি বাড়ীর মধ্যে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। অবনীবাবু আহারাদি সারিয়া অফিস চলিয়া গেলে মনোরমা কলতলায় জলের কাজ সারিতে সারিতে বলিতে লাগিল, চৌবাচ্চায় এক ছটাক জল থাকবে না; ওপরের বাড়ীওলা-গিন্নী সবটুকু সেঁচে সেঁচে খরচ করে নেবে তখন নীচের ভাড়াটে সংসারের চলবে কি করে।

কৃষ্ণভামিনী তাহা শুনিতে পাইয়া উপর হইতে ফোঁস করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, না চলে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাও না। আমরা তো আর কাউকে পায়ে ধরে সেধে রাখি নি। উঠতে-বসতে দুবেলা তো ঘর ছেড়ে দেবার কথা বলা হচ্ছে—তখন কেন না সে কথা শোনা হয়। আজ সকালে তো কর্ত্তা ব'লে গেল—তখন তোর মানুষ কেন হাত কচলাতে কচলাতে ম্যাও ম্যাও করছিলে। এক রাশ টাকা পড়ে রয়েছে শরম লাগছে না? একেবারে নবাবপুত্তির—ট্যাক্ ট্যাক্ কথা।

মনোরমা বলিল, রাত দুপুরে ঘরের মধ্যে ঢুকে লোক খুন করতে এসেছিল—ভারি তেজ! মাগ-ভাতারে ঘর ভাড়া আদায় করতে কোমর বেঁধে ছুটে আসা হয়। এমন দেখতে পাও না? এক ফোঁটা জলের জন্যে—। ভাড়া দিতে পারিনি—বাকি পড়ে গেছে। আদালত আছে—নালিশ করোগে। এমন শাসানোরি কিসের।

কৃষ্ণভামিনী কহিলেন, রাতদুপুরে আমরা যেচে তোদের ঘরে ঢুকিনি। মেয়েকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিলি কেন? মাতাল সোয়ামীর কাছে লাথি কিল খাচ্ছিলি—তা অমন করে চেঁচিয়ে পাড়া জানাচ্ছিলি কেন? ছিঃ—লির আর জায়গা পাওনি!

এইরকম কথা কাটাকাটি অনেকক্ষণ চলিল। কুঞ্জলাল

বাড়ী ছিল না। সুষমা বেচারী দুইজনের মাঝে পড়িয়া একবার মনোরমাকে বলে, 'মা, তুমি থামো না'; আবার কৃষ্ণভামিনীকে বিনীতভাবে বলে, 'জ্যেঠাইমা দোহাই—আপনার ছুটি পায়ে পড়ি। আপনি দয়া করে চুপ করুন।'

সেদিন এই দুইটি নারীকে লইয়া সারা বাড়ীময় একটা যেন জঘন্য আবহাওয়া বহিতে লাগিল। মনোরমা কেন যে জানাইয়া দিল যে, সে কলতলায় পা ধুইতে বা স্নান করিতে নামিলে উপর হইতে অবনীবাবু বার বার উঁকি মারিয়া দেখিতে থাকেন—ইহা বেশ বুঝা গেল না। এত বড় মিথ্যা অপবাদ অবনীবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। কৃষ্ণভামিনী আর থাকিতে পারিলেন না। মনোরমার চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত করিলেন। কারখানার মিস্ত্রী কুঞ্জলালের বন্ধুর সহিত মনোরমা একা মাঝে মাঝে সিনেমা দেখিতে যাইত—সে কথা তুলিয়া কৃষ্ণভামিনী একেবারে মারমুখো হইয়া যা নয় তাই করিয়া চাড্ডিখানেক অপ্রিয় কথা শুনাইয়া দিয়া মনোরমার স্বভাব-চরিত্র ঘাঁটিয়া দিলেন। ব্যাপারটা সত্য—মনোরমার সেরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক ছিল। খুব সৌভাগ্যের বিষয়—সেদিন সুষমা ছাড়া বাড়ীতে আর অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না।

অবনীবাবু বাড়ী ফিরিয়া পরিবারের মুখে সমস্ত শুনিলেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া অবনীবাবু ঘর ছাড়িয়া দিবার জন্য কুঞ্জলালের নামে আদালতে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন।

কুঞ্জলালের মদ্যপানের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। মনোরমার উপর অত্যাচার মদের নেশায় সমানে চলিত। এক একদিন সুষমাও বাদ পড়িত না। মাকে বাঁচাইতে গিয়া সুষমা নিজেও লাঞ্ছিত-গঞ্জিত হইত। কুঞ্জলালের মুখে অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালাগালি খাইতে হইত। অবনীবাবু কিন্তু আর নীচে নামিতেন না।

দীর্ঘদিন ধরিয়া মামলা চলিবার পর অবনীবাবুর জিত হইল। আদালত হইতে কুঞ্জলালের উপর হুকুম আসিল—একমাসের মধ্যে অবনীবাবুর ঘর ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঠিক এমন সময় সুষমার মা মনোরমার একদিন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কখন কাহার সহিত কি করিয়া যে সে গৃহত্যাগ করিল—তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

সুষমার মুখে কথা নাই, লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। কুলত্যাগিনী জননীর কথা সে কাহাকেও বলিতে পারিল না। অন্যকে বলা দূরের কথা—সুষমা নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, তাহার কথা একবারও না ভাবিয়া মনোরমা কেমন করিয়া তাহার নিজের আপাতরম্য চিরপিচ্ছিল পথ এই বিশাল জগৎ সংসারের বুকের উপর বাছিয়া নিতে পারিল। সুষমা তখন আপন মনে বসিয়া বসিয়া ভাবিত অনেক কথা। মানিকের সহিত তাহার বিবাহ কুঞ্জলাল একরকম পাকাপাকিই করিয়া ফেলিয়াছে। মানিক কুঞ্জলালকে হাত করিবার জন্য কিছু টাকাও দিয়া রাখিয়াছে। অবনীবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া দিতে আর মাত্র দশদিন বাকি আছে। নারকেলডাঙার বস্তিতেই কুঞ্জলাল ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। কি আর করিবে? এবং ঐখানে উঠিয়া গিয়া সুষমার বিবাহ দিবে—মাত্র কয়েকদিনের বিলম্ব। সুষমা আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবিয়া মরিত। আজ এক সপ্তাহ মনোরমার কোন খবর সুষমা পায় নাই। মায়ের জন্য তাহার মনটা মাঝে মাঝে কেমন এক একবার চঞ্চল হইয়া উঠিত। নীরবে খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া চোখের জল ফেলিয়া সুষমা বুকটা একটু হাল্কা করিয়া লইত। সে বাড়ীর দ্বিতলে উঠিয়া কৃষ্ণভামিনীর নিকট আর যাইত না। কৃষ্ণভামিনীর নিকট মুখ দেখাইতে তাহার কেমন আরও লজ্জা বোধ করিত। প্রতি পদে পদে সুষমাই যেন অপরাধিনী—এইটাই তাহার হাবভাবে কেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিত। সুষমা তাই চাহিত আত্মগোপন। রাঁধিয়া-বাড়িয়া কুঞ্জলালকে খাওয়াইয়া নিজের ভাত চাপা দিয়া সে সারাদিন শুইয়া পড়িয়া থাকিত। কোনওদিন খাইত, আবার কোনওদিন তাহার ক্ষুধা থাকিত না—খাইত না। এই কয়দিনেই সুষমার যেটুকু শ্রী ছিল—সেটুকু যেন একেবারে নিঃশেষে লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে কুঞ্জলাল ঘরে ফিরিল। একেবারে মাতোয়ারা অবস্থা। সুষমা তাড়াতাড়ি কুঞ্জলালকে ধরিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। কুঞ্জলালের সেদিন আর জ্ঞান ছিল না। জড়িত কণ্ঠে যেটুকু সে বলিতে পারিয়াছিল তাহাতে সুষমা বুঝিতে পারিল যে, তাহার মায়ের সন্ধান কুঞ্জলাল পাইয়াছে, এবং মনোরমাকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্ত কুঞ্জলাল সেদিন প্রস্তুত হইয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারে নাই, নিজেই শিক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই গভীর মর্ম্মবেদনা ভুলিবার জন্ত কুঞ্জলাল নিজেকে একেবারে মদের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিল।

অবনীবাবু ও কৃষ্ণভামিনী কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন। উভয়েই দিন গণিতেছিলেন—আর তিনটা দিন কাটিয়া গেলে হয়। কুঞ্জলাল তাহার মেয়েকে লইয়া তাহাদের ঘর ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

অবনীবাবু বলিলেন, ভালোয় ভালোয় পাপ বাড়ী থেকে বিদেয় হ'লে বাঁচি। আর ভাড়ার টাকা আমার দরকার নেই।

কৃষ্ণভামিনী কহিলেন, মাগীর ছিনালিটা একবার দেখলে! উপযুক্ত সোমত্ত মেয়েটাকে পথের মাঝে ফেলে দিয়ে—ওঃ—ভাবতেও গাটা শিউরে ওঠে। সয়তানী—সয়তানী! আহা—মেয়েটার শেষে কি হবে গো।

এইটুকু বলিয়া কৃষ্ণভামিনী একটা দমকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কুঞ্জলালের জ্ঞান আর ফিরিল না। অতিরিক্ত মন্তপানের ফলে পরদিন সকালবেলা কুঞ্জলালের মৃত্যু হয়। ভোর হইতেই কুঞ্জলালের কয়েকজন বন্ধু কুঞ্জলালকে দেখিতে আসে। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত জানিত।

সুষমা চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল, বাবা গো—কোথায় গেলে গো?

সুষমার কান্না শুনিয়া কৃষ্ণভামিনী উপর হইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। ঘরের মধ্যে আর ঢুকিতে পারিলেন না। কুঞ্জলালের বন্ধুরা অতঃপর কি করিতে হইবে এবং কি করিতে হইবে না—তাহা লইয়া আলোচনা ও সুষমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া রীতিমত মাতব্বরী করিতেছিল।

সন্ধ্যার পর সুষমা জিনিষপত্র সমস্ত গুছাইয়া লইল। কুঞ্জলালের এক বন্ধু সমস্তই জানিত যে, সুষমার সহিত মানিকের বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াই আছে বন্ধুটি সুষমাকে তাহার বাসায় লইয়া যাইবার জন্ত উদ্যত হইল সুষমা আর কি করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া উপস্থিত পিতৃবন্ধুর সহিত চলিয়া যাইতে রাজী হইল।

উপরে অবনীবাবু ও কৃষ্ণভামিনী বসিয়া আছেন সুষমা প্রথমে অবনীবাবুকে প্রণাম করিয়া পরে কৃষ্ণভামিনীকে প্রণাম করিবার পূর্ব্বে বলিল, জ্যেঠাইমা—এইবার যাচ্ছি।

কৃষ্ণভামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস্?

সুষমা কহিল, আপনাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি বাবা আপনাদের ঘর ভাড়া সব শোধ করে যেতে পারলে না...।

এইটুকু বলিয়া সুষমা আর বলিতে পারিল না অশ্রুরুদ্ধ আবেগ তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল।

কৃষ্ণভামিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস্ তুই?

—বাবার এক বন্ধু এসেছে। সেই আমায় নিয়ে যেতে চায়। আমার কোথাও কেউ নেই, জ্যেঠাইমা! কোথায় আর যাবো—তাই তার সঙ্গেই যাচ্ছি।

কৃষ্ণভামিনী সস্নেহে সুষমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আপনার উচ্ছলিত মাতৃস্নেহে কল্যাণপরশ তাহার মাথার উপর বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, সে কি—তোর কেউ নেই কি, সুষমা? আমি তো রয়েছি তোর। তুই এই অবস্থায় কোথায় যাবি? না—না—আমার কাছে তুই থাক্‌বি—তুই আমার মেয়ে যে রে!

তাহার পর অবনীবাবুর দিকে চকিতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, যাও তো···নীচে গিয়ে একবার দেখ তো। লোকটা কে। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে এসেছে বুঝি। যাও গিয়ে হাঁকিয়ে দাও গে।

অবনীবাবু তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেলেন।

অযাচিত মাতৃত্বের করুণাধারায় সুষমা একেবারে অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠিল। নম্রমুগ্ধ অভিভূতের মত দুঃখ ও আনন্দের যুগপৎ আঘাতে সুষমা কৃষ্ণভামিনীর বুকের উপর মুখ ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণভামিনী তাঁহার নিজের অঞ্চল দিয়া সুষমার অবিশ্রান্ত বিগলিত নয়নাশ্রু অতি স্নেহে, সযত্নে ও সাদরে ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

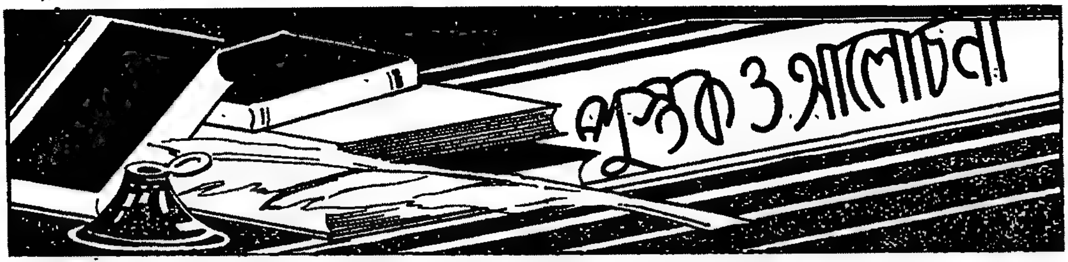

পৃথিবীর স্মৃতিকাগৃহে নূতন আর একটি বৎসর ভূমিষ্ঠ হইল। দিকে দিকে রঙে রসে এষণায় বাসনায় নবজাতকের জন্য আমন্ত্রণলিপি রচিত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্‌লার নম্রনীল আকাশে, বাংলার বেণুবীথিতে, সুরে গানে স্বপ্নে নববর্ষের জন্য আনন্দিত 'স্বাগতম'। পুরাতন বৎসরের গ্লানি-বেদনার, মানস-মৃত্যুর ভৈরবী শ্মশানে নূতন বর্ষ জীবনের মঞ্জরিত প্রকাশের সঙ্গীত গাহিয়া উঠুক।—নববর্ষের দিন বোধনের দিন, উৎসবের দিন, মিলনের দিন। এই বোধন, এই উৎসব, এই মিলন দূরকে নিকট করিয়াছে, পরকে আপন করিয়াছে, শত্রুকে আলিঙ্গন দিয়াছে। দিকে দিকে নূতন বৎসরের তাই প্রহর্ষপ্রকাশ। এই মহামুহূর্তে আমাদের আনন্দ বেদনার, আমাদের ভাব-চেতনায় অংশীদার হইবার জন্য দেশে দেশে সমস্ত মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান পাঠাইলাম। এই শুভ নববর্ষে বাঙ্‌লা সাহিত্যে নূতন প্রাণচেতনার উদ্বোধন হউক —ইহাই আন্তরিক কামনা।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবারে সমালোচনা-সাহিত্য লইয়া বাণী-সাধনার নতুন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার 'সময় ও সাহিত্য' বাংলার আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দুইটি পর্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। সূচনায় আছে কাব্য, রূপক, উপন্যাস এবং সমালোচনার পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং পরিশিষ্টে আছে কবি মধুসূদন, নজরুল ইস্‌লাম ও প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত আলোচনা। কিরণশঙ্কর প্রধানতঃ কবি হইলেও সমালোচনা সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও যুক্তিশীল বিচারশক্তি রহিয়াছে। বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যের একান্ত অভাব, 'সময় ও সাহিত্য' যেমন সে-অভাব কতকাংশে পূর্ণ করিল, তেমনি একথাও অশঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কাব্যের চাইতে যদি কিরণবাবু সমালোচনা-সাহিত্যের উপর জোর দিতেন, তবে একদিকে তাঁহার খ্যাতি যেমন দূরপ্রসারি হইত, তেমনি বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত। গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী; মূল্য—তিন টাকা।

কবি রামপ্রসাদ সম্পর্কে এতকাল বাংলায় একখানি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব ছিল। সম্প্রতি খ্যাতিমান ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' রচনা ও সম্পাদনা করিয়া সে-অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি আয়তনে দীর্ঘ এবং ইতিহাসসিদ্ধ। প্রকাশ করিয়াছেন ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড, কলিকাতা; দাম—আট টাকা। যোগেনবাবু প্রধানতঃ ঐতিহাসিক হইলেও তিনি সুকবি ও সুসাহিত্যিকও বটেন। তাঁহার বহু মৌলিক রচনা ইতিপূর্বে আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' প্রণয়নে তাঁহার সেই কবিহৃদয়ের দরদ ও সাহিত্যিক বিন্যাস সর্বত্র সমভাবেই পরিস্ফুট। রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা উদ্ধার করিয়া কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনীসহ তাঁহার সমসাময়িক কালের নানা তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোচনাসহ প্রসাদ-সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করিয়া লেখক শুধু শ্রম-লব্ধতারই পরিচয় দেন নাই, বঙ্গবাণী-মন্দিরের একটি শূন্য নৈবেদ্যের থালাও উপচারের মহার্ঘতায় ভরিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন।

শ্রীমা সারদামণির জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলায় সারদামণির বহু জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন লেখক ও সাধক তাঁহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ-সহধর্মিণীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেও মূলগত প্রেরণাস্থল যে ভক্তি, তাহা সকলের আলোচনার মধ্যেই সমভাবে পরিস্ফুট। সাম্প্রতিক প্রকাশিত মৃণাল-কান্তি দাশগুপ্তের 'পরমারাধ্যা শ্রীমা'তেও সেই ভক্তিরই সশ্রদ্ধ নিবেদন। গ্রন্থখানি বহুলাংশে অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের রচনা-শৈলীর অনুকরণ হইলেও লেখকের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। লেখকের প্রথম রচনা হিসাবে গ্রন্থখানি সার্থক। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের ভূমিকা গ্রন্থখানির মর্যাদা অধিক বাড়াইয়াছে। সাধক পাঠকমাত্রের নিকটেই গ্রন্থখানির একটি চিরকালীন মূল্য থাকিবে। (প্রকাশক ভারতী বুক ষ্টল; মূল্য—দুই টাকা)।

ছোটদের নতুন ছড়ার বই 'স্বপনবুড়োর হুল্লোড়'। প্রকাশক—সত্যব্রত লাইব্রেরী; দাম আড়াই টাকা। স্বপন-বুড়োকে চেনে না—বাংলা দেশে এমন ছেলেমেয়ে নাই। তাহাদের লইয়া স্বপনবুড়ো রচনা করিয়াছেন ছোটদের পাততাড়ি। ছোটদের অন্তরঙ্গ বন্ধু না হইতে পারিলে ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। স্বপনবুড়ো যখন

স্বপনবুড়ো ছিলেন না, ছিলেন অখিল নিয়োগী, তখন হইতেই তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের পরম সুহৃদ। ছেলেমেয়েদের লইয়াই তাঁহারি নতুন জগৎ রচনা। সেই জগতে যে কত মধু থাকিতে পারে, 'স্বপনবুড়োর হুল্লোড়' তাহার মস্ত-বড় উদাহরণ। ছবি, ছাপা, ছড়া ও প্রচ্ছদপট—সবকিছু মিলিয়া একটি অনবদ্য আকর্ষণ। ছেলেমেয়েরা হাতে পাইলেই লুফিয়া লইবে। স্বপনবুড়োর স্বপ্নরচনা সেখানেই সার্থক।

তরুণ কবি আনন্দ বাগ্‌চীর নতুন কবিতার বই 'স্বগত সন্ধ্যা'। মোট চারি ভাগে তেত্রিশটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। প্রগতিশীল কবিতার নতুন বিষয়বস্তু, ফর্ম ও টেকনিক লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু হইয়াছে আজ নয়, এবং অদ্যাবধি তাহার কিছু-একটা পাকাপাকি ষ্ট্যান্ডার্ড ঠিক হয় নাই। আধুনিক কবিদের যতকিছু রচনা—তাহা সেই ষ্ট্যান্ডার্ডের পথেই উজান-যাত্রা। সেই সফল যাত্রায় রচনাকুশলতার দিক হইতে কিছু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে 'স্বগত সন্ধ্যায়'। গ্রন্থখানি অনুজতমদের ঈর্ষ্যা ও অগ্রজতমদের প্রতি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ।

অশোক মেহেতার নতুন চিন্তাশীল গ্রন্থের বঙ্গীয় সংস্করণ 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'। অনুবাদ করিয়াছেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত এবং প্রকাশ করিয়াছেন—প্রাচী প্রকাশন, কলিকাতা। ধনবাদ আজ বিলুপ্তির পথে; কিন্তু ধনবাদের অবসানের পর মানবসমাজের ভবিষ্যৎ কি হওয়া উচিৎ, ইহা লইয়া পৃথিবীর দুইটি শক্তির মধ্যে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। প্রতিযোগি শক্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি হইতেছে সর্বাত্মক কমিউনিজম্, এবং অপরটি হইতেছে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সোস্যালিজ্‌ম বা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'। এই শেষোক্ত বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীযুক্ত মেহেতা যে সকল তথ্য বিবৃত করেন, সেগুলিই শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকাসম্বলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে যদি কটাক্ষপাত করিতে হয়, তবে বুঝিতে হয় সেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শিকড় শক্ত নয়। শ্রীযুক্ত মেহেতার আলোচনার স্থানে স্থানেই ইহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থে কিছু কিছু বর্জননীতি গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত মেহেতার ঐতিহাসিক মনীষা ও যুক্তিবাদ সামাজিক পরিবর্তনের এই নবীন উষালগ্নে সর্বশ্রেণীর পাঠকচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিত।

নতুন আর-একখানি কিশোর সংস্করণ গ্রন্থ 'প্রাচীন কবির কাহিনী'। লিখিয়াছেন শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, (প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা; মূল্য—দেড় টাকা)। সাম্প্রতিক বাংলার কিশোর-সমাজ জন্মাবধি যুদ্ধের ইতিহাসের কথা শুনিয়া আসিয়াছে, অন্যদিকে পাঠোপযোগি যে-সকল গ্রন্থ তাহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ডিটেক্‌টিভ ও এ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক। বাংলার যে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক বিশাল ইতিহাস আছে, বাংলার অতীত যে একটা বিরাট গৌরবময় অতীত, তাহার সঙ্গে বাংলার কিশোরদিগকে খুব বেশী পরিচয় করিয়া দেওয়া হয় নাই। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের মূলে প্রাচীন কবিদের দানও অসামান্য। সেই কবিদের লইয়াই আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত। ইহাতে আছে—কবি বাল্মীকি, কবি কালিদাস, কবি জয়দেব, কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, বিজয় গুপ্ত, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, কৃষ্ণরাম, রূপরাম, বংশীদাস, ভারতচন্দ্র ও কবি রামপ্রসাদ। ইঁহাদের সকলেই বাংলায় জন্মগ্রহণ না করিলেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক মানসকে উজ্জীবিত করিয়াছেন। শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু কিশোর-সাহিত্যরচনায় সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তিনি বাংলার কিশোর সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বাঙালী সংস্কৃতির একটি মহৎ কাজ করিলেন। তবে আলোচ্য সংকলনে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংযোজিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। পরবর্তী সংস্করণে ইঁহার সংযোজনা আমরা একান্তভাবে প্রত্যাশা করিব।

নতুন ছোটগল্প সঙ্কলন 'রাজঘাট'। লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস; (প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম লাইব্রেরী; দাম—তিন টাকা)। ভ্রমণকে যাহারা রসগ্রাহী করিয়া তুলিতে জানেন, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সেই বিরল ভ্রাম্যমানদের একজন। রেলপথে চলিতে চলিতে যে-কাহিনী চকিতে তাঁহার মনে সাড়া তুলিয়াছে, তাহা শুধু পথের কাহিনীতেই সমাপ্ত হয় নাই, ঘরোয়া আবেষ্টন ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাহা ক্রমে জাতীয় চেতনার লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে। রাজঘাটের অধিকাংশ গল্পই মনস্তত্ত্বধর্মী, তাহাতে অত্যাধুনিকত্বের উন্নাসিকতা নাই, অথচ বক্তব্য ও প্রকাশব্যঞ্জনার স্বচ্ছতায় তাহা নিবিড় ও আন্তরিক। গল্পপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রের কাছেই রাজঘাট আদরনীয় হইবে।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একটি সাম্প্রতিক সংযোজন শ্রীবাস্তব রচিত 'মহাযুদ্ধের একাঙ্ক'। বঙ্গবিভাগের ফলে বাঙালীজীবনে যে দুঃসহ গুরুভার নামিয়া আসিয়াছে, তাহারই বিষয়বস্তু লইয়া মহাযুদ্ধের একাঙ্ক রচিত। নাট্যকার আশাবাদী এবং রচনা দুঃসাহসিক সন্দেহ নাই। বাংলা-

সাহিত্যে শুধু ভালো নাটকই নাই নয়, নাটকেরই পুরোপুরি অভাব। ভাগ্যক্রমে যদিবা কোনো নাটক মঞ্চে অভিনীত হইল, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে নাটকের চাহিদা নাই। আসলে বাঙালী পাঠক অদ্যাবধি নাটক পড়িতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ মঞ্চের সংস্পর্শে থাকিয়া নাট্যকাররা যে-সমস্ত নাটক লেখেন, তাহার অধিকাংশই নটনটী ও মঞ্চোপযোগি করিয়া রচিত; সাহিত্য সেখানে নিতান্তই গৌণ। সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁহারা নাটক রচনায় অগ্রসর হন, বহুক্ষেত্রেই তাহার মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ না থাকায় এবং গল্প উপন্যাসের ন্যায় পাঠকমহলে চাহিদা না থাকায় নাট্যকারকে আশাহত হইয়া রচনাকার্যে নিবৃত্ত হইতে হয়। এই অবস্থার মধ্যেও কচিৎ কখনও কিছু কিছু নাটক যে রচিত না হইতেছে, এমন নয়। মহাযুদ্ধের একাঙ্ক অনুরূপ একখানি নাটক। ইহা পাঠকবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ডক্টর প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নতুন গ্রন্থ **'ক্যান্সার চিকিৎসা'** (ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব হিন্দু কেমিষ্ট্রি এ্যান্ড আয়ুর্বেদিক রিসার্চ, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা)। পৃথিবীর অন্যতম দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার লইয়া আজ সর্বদেশেই গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। বাংলাদেশেও ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতাল খোলা হইয়াছে, কিন্তু যথাযোগ্য চিকিৎসার্দ্বারা বহুলাংশেই এই রোগমুক্তির সম্ভাবনা অদ্যাবধি দেখা যায় নাই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা লইয়া একদিকে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যদিকে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানিও অনুরূপ একখানি গবেষণা-মূলক গ্রন্থ। অন্যতম চিকিৎসাবিদ ডাঃ চট্টোপাধ্যায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে সুরু করিয়া আধুনিককালের সমস্যা পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে আয়ুর্বেদিক মতে ক্যান্সার চিকিৎসা বিবৃত করিয়াছেন। অনেকক্ষেত্রে যদিও আলোচনা প্র্যাক্‌টিক্যাল না হইয়া থিয়োরেটিক্যাল হইয়াছে, কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে থিয়োরিরও মূল্য আছে। সেই দিক হইতে শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণই নয়, শিক্ষিত জনসাধারণও গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করিয়া উপকৃত হইবেন।

বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগি নতুন নাটক **'নীল শৃগাল'**। নাট্যকার সুশীলচন্দ্র দাস প্রণীত এবং মৈত্রী প্রকাশনী-প্রকাশিত। দাম দশ আনা। ছোটদের মনের জহুরি না হইলে ছোটদের উপযোগি সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে ছোটদের নামে বড়দের সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়। 'নীল শৃগাল' ইহার ব্যতিক্রম। ইহার প্রধান নায়ক-নায়িকা জন্তু জানোয়ার, পার্শ্বচরিত্রে আছে ধোপা আর রাখুয়ার মতো দুই-একটি মানুষ। শিশুদের গল্পপ্রিয় মনকে খুসী করিবার যাদু জানেন নাট্যকার। 'নীল শৃগাল' বাংলার শিশুমাত্রেরই ভাল লাগিবে।

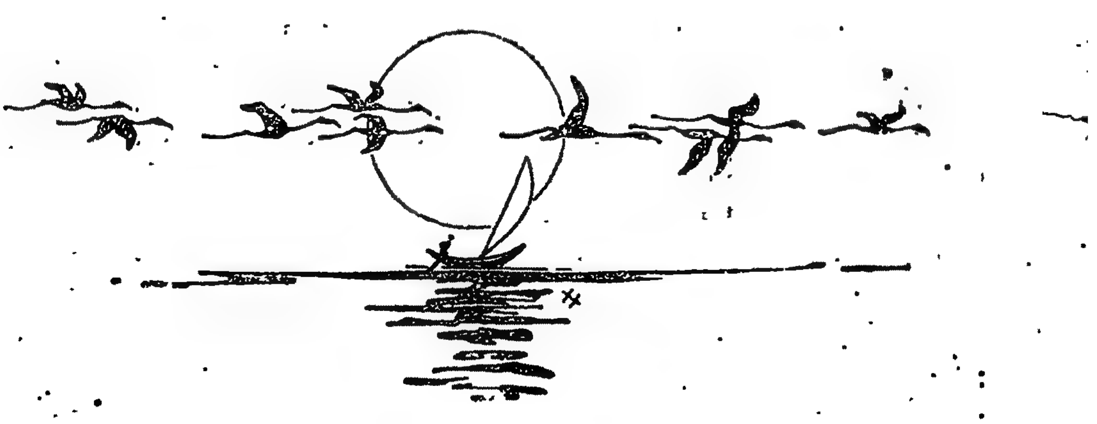

সম্পাদকীয়

নববর্ষ, ১৩৬১

জীর্ণ ক্লান্ত পুরাতন বৎসরকে অতিক্রম করিয়া আমরা আর-একটি নূতন বৎসরের ঊষা-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অতীতের গ্লানী লইয়া আজ আর আমরা দুঃখ করিব না অতীতের পরাজয় দিয়া আজ আর নিজেদের পৌরুষকে খর্ব করিব না, কুহেলিকাচ্ছন্ন তমসার পরপারে আদিত্যের যে উজ্জ্বল প্রকাশ, তাঁহাকে যুক্ত-করে নমস্কার করিয়া নববর্ষের এই নবীন ঊষাকে আমাদের প্রাণের নিকেতনে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। উপনিষদ একদিন বলিয়াছিলেনঃ 'তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি', অর্থাৎ—'যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।' তেমনি নববর্ষের এই যে মহাদ্যুতির স্বপ্রকাশ, যিনি বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত, তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আমরাও বিশ্বের সকলের মধ্যে প্রবেশ করিব। উপনিষদের ঋষি আমাদিগকে সেই আত্মবিকাশের শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন—

'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।' অর্থাৎ—যিনি সর্বভূতকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেন, তিনি কখনও প্রচ্ছন্ন থাকেন না, লোক হইতে লোকে-লোকে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ। আমাদের জীবনে আজ সেই প্রকাশের প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হউক। যেখানে যত গ্লানি, যত ব্যথা, যত হাহাকার, যত পরাজয়, যত ব্যাধি, যত ক্লীবতা—সব কিছুকে বিদূরিত করিয়া আমরা রচনা করিব হাস্য-উজ্জ্বল জীবনের জয়গান। নতুন করিয়া আজ আবার আমরা স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণ করিব; স্বদেশলক্ষ্মীর অর্চ্চনায় সকলকে আহ্বান করিয়া বলিব—

'এস হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন, ধরো হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

বৈশাখের প্রথম প্রভাত আমাদের জাতীয় উৎসবের দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া আমরা নতুন হইয়া উঠিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিব। এই দিনে আমাদের জীবনকে যেমন নতুন প্রাণের হিল্লোলে মধুর করিয়া তুলিব, তেমনি আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও নবীনতার স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিব। নতুনের জয়যাত্রাই জাতীয় কৃষ্টির প্রাণযাত্রা। বিশ্বপ্লাবি উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সেই প্রাণেরই কল্লোলধ্বনি, সেই প্রাণেরই হিল্লোলিত ধারা প্রবাহিত। সেই ধারায় অবগাহন করিয়া আমরা শুদ্ধ হইব, খাঁটি হইব। জীবনকে মিথ্যায় মিথ্যায় আর পঙ্কিল করিব না, মনুষ্যত্বকে ক্রীতদাসের মতো পরপদলেহি করিয়া তুলিব না, সংস্কৃতিকে দুর্নীতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ করিয়া পিষিয়া মারিব না। নবীন প্রাণের জয়যাত্রার পথে আমাদের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতিতে মহত্ত্বের ওঙ্কারধ্বনি মন্দ্রিত হইয়া উঠুকঃ নববর্ষের প্রথম ঊষার উৎসবলগ্নে ভাগ্যবিধাতার কাছে এই বরই আমরা প্রার্থনা করি।

ভারতীয় সাহিত্য একাডেমি

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সভাপতি এবং সহসভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন যথাক্রমে শ্রীজওহরলাল নেহেরু এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ। ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য এইরূপ একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অভিনব সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে বিক্রমাদিত্য প্রমুখ রাজসভায় দেশের গুণী-জ্ঞানীর সমাদর ছিল এবং উপযুক্ততা বিচারে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইত। এই ভাবে তৎকালে বহু শিল্পীসাহিত্যিক সম্বর্ধিত হইতেন। তৎপর ইংরেজ অধিকৃত ভারতের গত দুইশত বৎসরে ইতিহাস অন্যদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। শিল্পীসাহিত্যিকের মর্যাদাবৃদ্ধি অপেক্ষা রাজকার্য সম্প্রসারণই মুখ্য রূপ লইয়াছে। আজ ভারত সেই রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় দেশের শিল্পজাগরণের দিকে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই নব জাগরণ যে কাহাকেও বাদ দিয়া সম্ভব নয়, স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। একটা স্বাধীন দেশের সবচাইতে বড় পরিচয় তাহার শিল্প ও সাহিত্যে; যে দেশের শিল্প ও সাহিত্য যত বড়, সে দেশ ততবেশী উন্নত। ভারত চিরকাল সেই উন্নতির শীর্ষক্ষেত্রে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংরেজরাজত্বকালে ইংরাজি ভাষার রাজকীয় প্রয়োজন ও অত্যধিক প্রসারতার ফলে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি আত্মপ্রকাশের বহির্মুখ খুঁজিয়া পায় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর সে-সুযোগ আসিয়াছে। ভারতের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হইলেও প্রাদেশিক ভাষাগুলিরও যাহাতে সমভাবেই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তাহার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। সাহিত্য একাডেমি তাহারই প্রাথমিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক প্রদেশ হইতেই প্রতিনিধিস্থানীয় খ্যাতিমান শিল্পী-সাহিত্যিককে একাডেমিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে গিয়াছেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এবং শ্রীরাজশেখর বসু। এজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আশা করিব, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও মানোন্নয়নের জন্য তাঁহারা যথোপযোগি কার্য করিয়া যাইবেন।

এই সূত্রে আরও একটি বলিবার দিক আছে। সাহিত্য একাডেমির কার্য দ্বিবিধ হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। একদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য একাডেমি যেমন কাজ করিয়া যাইবেন, তেমনি ভারতের দুঃস্থ শিল্পী সাহিত্যিকদিগকে উপযুক্ত সাহায্য দ্বারা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পেন্‌শন দানের ব্যবস্থা করিয়া মর্যাদার সঙ্গে তাঁহাদের জীবন রক্ষা করাও একাডেমির অন্যতম কর্তব্য হইবে। অন্যথায় নাম-কে-ওয়াস্তে শুধু একটি সাহিত্যসংস্থার জন্য একাডেমি নিতান্তই বিশেষত্ববর্জিত একটি প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইবে। আশা করি, বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করিয়া ভারতীয় সাহিত্য একাডেমি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্যনীতি গ্রহণ করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতিকল্পে ইতিপূর্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন গঠিত হয়, উক্ত সাহায্য কমিশন ১৯৫৩-৫৪ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়াছেন। এই কমিশনের মহাকরণ স্থাপিত হইয়াছিল ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থ সাহায্যের জন্য যে সকল আবেদন আসে, সেইগুলির পরীক্ষা করিয়া আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হয়। মোট টাকার মধ্যে ৪২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭ শত ৯০ টাকা উন্নততর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হইয়াছে। সাহায্যদানের বিস্তৃত হিসাব এইরূপঃ আলীগড়—৩,৪১,০০০৲ টাকা, এলাহাবাদ—২,৫১,০০০৲ টাকা, অন্ধ্র—৩,৬৩,৩১৫৲ টাকা, আন্নামালাই—৫,৯৭,৩৮৫৲ টাকা, কাশী—৯,১২,৮৯০৲ টাকা, বরোদা—৩৫,০০০৲ টাকা, বোম্বাই—১,৫০,০০০৲ টাকা, কলিকাতা—৫,১৪,২৫০৲ টাকা, দিল্লী—৭৫,০০০৲ টাকা, গুজরাট—১০,০০০৲ টাকা, কর্ণাটক—২৫,০০০৲ টাকা, লক্ষ্ণৌ—১,৫০,০০০৲ টাকা, মাদ্রাজ—১,৭৩,৯৫০৲ টাকা, নাগপুর—১৫,০০০৲ টাকা, ওস্‌মানিয়া—৬০,০০০৲ টাকা, পুণা—১,২৫,০০০৲ টাকা, পাঞ্জাব—১,৫০,০০০৲ টাকা, সৌগর—১,৯০,০০০৲ টাকা এবং ত্রিবাঙ্কুর—১,০৩,০০০৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গৃহাদি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ৪র্থ দফায় সাহায্য বাবদ আরও ২৯,৪৭,০৯১৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত টাকার হিসাব এইরূপঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—৮,০৬,৪৬৯৲ টাকা, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—১৩,৬৫,৬২২৲ টাকা। আলীগড় মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয় ৬,৬২,৫০০৲ টাকা এবং বিশ্বভারতী—১,১২,০০০৲ টাকা। ইহা ছাড়াও বোম্বাইয়ের ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়-এর গৃহাদি নির্মাণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য ৩২,২৬৪৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে এই অর্থবরাদ্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একশত বৎসর

দুইশত বৎসরের পরাধীনতার তিমিরাবসান হইয়া সম্প্রতি এই আসমুদ্র হিমালয়বিসারী বিশাল ভারতবর্ষে স্বাধীনতার উজ্জ্বল অরুণোদয় হইয়াছে। অন্নবস্ত্র—এই দুইটি মূল সমস্যাই মানবজাতির আবহমানকালের ঐতিহাসিক সমস্যা। ইহার জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীর শিবিরে শিবিরে যুদ্ধের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে।

বিগত দুইশত বৎসরের ভারতীয় ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস, হতমানের ইতিহাস, পরমুখাপেক্ষিতার ইতিহাস। পনেরই আগষ্ট, উনিশ শো সাতচল্লিশের সঞ্জীবনী মন্ত্রে ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তিস্নান। স্বায়ত্বশাসনের জন্মদিনটি কোটি কোটি মানুষের প্রার্থনায় পবিত্র।

দূরের দিগন্তে আজ আর ভিক্ষাবৃত্তির জন্য করুণ দৃষ্টিপাত নয়, ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমের পবিত্র মূল্যে সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের ভার দেশের মানুষ আজ নিজের অবশ্যকর্তব্য হিসাবে তুলিয়া লইয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় ইতিহাসে নানা গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের শতবর্ষ পূর্তি এই উপলক্ষ্যে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বস্ত্রে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভারতের জয়যাত্রাকে নতুন ক্রান্তির দিকে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের অগ্রগমনের ইতিহাস নিরীক্ষণ করিলে ভারতীয় প্রগতির ধারাটি অনুধাবন করা সম্ভব হইবে।

১৮১৭ সালে একটি বিদেশী কোম্পানী কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তারপর প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৪ সালে। এই বৎসরে বোম্বাইয়ে কাওয়াসজী মনুভাই দভর বোম্বে স্পিনিং এ্যান্ড উইভিং মিলস্' নামে একটি কল স্থাপন করেন। ইহার পর পর-পর আরও কয়েকটি কল স্থাপিত হয়। ১৮৩৬ সালে ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টি। কিন্তু বস্ত্র-ব্যবসা প্রভৃতি লাভজনক বলিয়া বহু বিত্তশালী ব্যক্তি এই বস্ত্রশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে ১৮৮০ সনে বস্ত্রকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬টি। ক্রমে আরও ধনী ব্যক্তি এই ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ায় ১৯০৬ সালে বৃটিশ ভারত ও দেশীয়রাজ্যে বস্ত্রকলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২১৭টি। বলা বাহুল্য, কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আমাদের দেশে বস্ত্রশিল্পের এরূপ বিপুল প্রসার যে, যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রথমতঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং পরে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতবাসীর শিল্পপ্রয়াসকে ক্রমাগত বাধা প্রদান করিয়া আসিয়াছে। তথাপি ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত য়ুরোপের বাজারে ভারতীয় কুটীরজাত বস্ত্রশিল্প অপ্রতিদ্বন্দ্বি ছিল। যান্ত্রিক পদ্ধতি যখন প্রবর্তিত হইল, তখনও বৃটেনের বাজারে বৃটেনের বস্ত্রশিল্প ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়াছে। তখন বৃটেনের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করা হয়। অন্যদিকে আবার ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় বস্ত্রকলের উপর চড়া দরে উৎপাদন-কর ধার্য করা হয়—এবং ইহা প্রচলিত থাকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়াও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প যে কিভাবে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে নিম্নের হিসাব দেখিলেই সঠিক বুঝিতে পারা যাইবেঃ

বৎসর	কলের সংখ্যা	টেঁকো	তাঁত	কর্মীদের দৈনিক গড়	ব্যবহৃত তুলো-গাঁইট
১৮৯৫	১৪৮	৩৮,০৯,৯২৯	৩৫,৩৩৮	১,৩৮,৬৬৯	১৩,৫১,৭১৩
১৯০৫ (ক)	১৯৭	৫১,৬৩,৪৮৬	৫০,১৩৯	১,৯৫,২৭৭	১৮,৫৯,২৪৪
১৯১৫ (খ)	২৭২	৬৮,৪৮,৭৪৪	১,০৮,০০৯	২,৬৫,৩৪৬	২১,৫২,৬০২
১৯২৫ (গ)	৩৩৭	৮৫,১০,৬৩৩	১,৫৪,২০২	৩,৬৭,৮৭৭	২২,৫৬,৩১০
১৯৩৫ (ঘ)	৩৬৫	৯৬,৮৫,১৭৫	১,৯৮,৫৬৭	৪,১৪,৮৮৪	৩১,৫৩,৪১৮
১৯৪৫ (ঙ)	৪১৭	১,০২,০৮,১৩১	২,০২,৩৮৮	৫,০৯,৭৭৮	৪৯,৫৯,৩১৪
১৯৪৮ (চ)	৪০৮	১,০২,৬৫,৮৪১	১,৯৭,৩৬৯	৪,৬৬,৪৭৭	৪২,৫০,১৭০
১৯৫১	৪৪৫	১,১২,৪০,৬৩৫	২,০১,৩৮৪	৪,২৫,০৩২	৩৬,৫৭,১৫৪

(ক) স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে
(খ) প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ায়
(গ) প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী চড়া দরের হিড়িকে
(ঘ) জগদ্ব্যাপী মন্দার পরে

(ছ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে
(চ) পাকিস্থান আলাদা হওয়ার পর শুধু ভারতে

১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত হিসাবগুলি অখণ্ড ভারতের। পরবর্তী হিসাবগুলি শুধু ভারতীয় ইউনিয়নের।

১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে দেশীয় কলে প্রস্তুত কাপড়ের প্রতি দেশবাসীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিলাতী কাপড় আসা বন্ধ হইলে পর জাপান আসিয়া ভারতীয় বস্ত্র-বাজার অধিকার করিয়া লয়। পরে যুদ্ধাবসানে বিলাতী কাপড় আসিলে ভারতের বাজার লইয়া বৃটিশ, জাপান এবং ভারতীয় শিল্পের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় শিল্পকে আত্মরক্ষা করিয়াও ১৯২০ হইতে ১৯২৬ সালের মধ্যে আরও ৮১টি নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালে দেখা গেল সারা পৃথিবীব্যাপি কাপড়ের বাজার অতি মন্দা। বোম্বাইয়ের বাজারে তখন হাহাকার উঠিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে যেখানে ভারতীয় রপ্তানী হইয়াছিল ৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, মাত্র দুই বৎসর পর ১৯২৮-২৯ সালে উহা নামিয়া আসিল ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায়। সে সময় অনেক মিলে আবার ধর্মঘট চলিতেছিল। একে বাজার মন্দা, তাতে আবার ধর্মঘট। অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে দেখিয়া প্রতিকারের জন্য যখন দাবী উচ্চারিত হইল, তখন ১৯২৯ সালে বস্ত্রশিল্পের দাবী বিচার বিবেচনার জন্য ভারত সরকার টেরিফ বোর্ডকে নির্দেশ দেন। টেরিফ বোর্ডের সুপারিশে বস্ত্রশিল্পকে কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়াতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৬-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অবস্থা বেশ ভালো থাকে।

তারপরে আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই সময় বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় কলগুলিতে বিরামহীনভাবে কাজ চলিতে থাকে এবং ১৯৪৪ সালে ভারতে যে বস্ত্র উৎপাদন হয়, তাহা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে অতিক্রম করে।

অধুনা ভারত ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে বস্ত্রশিল্পের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মোট প্রায় ৬ লক্ষ নরনারী এই শিল্পে কর্মীরূপে নিযুক্ত আছে। এই কলগুলির মধ্যে প্রায় ৩০০ শত কলে সুতা উৎপাদন এবং বস্ত্রবয়ন দুই কাজই হইয়া থাকে, বাকী কলগুলিতে শুধু বস্ত্রবয়ন করা হয়। এই দুই প্রকার কলে উৎপাদিত ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, অষ্ট্রেলিয়া, বৃটিশ-পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, আরব, পারস্য, সিংহল এবং পাকিস্থান প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দেশ বিভাগের ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে সরেস তুলা উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত অঞ্চল পাকিস্থানে পড়ায় ভারতবর্ষকে কাঁচামালের জন্য অসুবিধায় পড়িয়া বাহির হইতে প্রায় ৫০।৬০ কোটি টাকার তুলা আমদানী করিতে হয়। অদূর ভবিষ্যতে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতকে বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বিহার সরকারের দমননীতি

সম্প্রতি মানভূমে বাংলাভাষা দমনে বিহার সরকারের চণ্ডনীতি অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে। টুসু সঙ্গীত সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ করিয়া লোকসেবক সঙ্ঘের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী ও লোকসভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতোর প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করা হইয়াছে, ভারতীয় ইতিহাসে তাহা শুধু অভূতপূর্বই নয়, ভারতের ইতিহাসকে তাহা কলঙ্কিত করিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিগত কল্যাণী অধিবেশনে প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের বাংলা ভাষণে বিক্ষুব্ধ হইয়া একদল লোক উষ্মা প্রকাশ করিলে কংগ্রেস-সভাপতি তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছিলেনঃ যাঁহারা বাংলাভাষা অনুসরণ করিতে না পারেন, তাঁহারা বাড়ীতে গিয়া বাংলা শিখিয়া আসুন; বাংলাভাষাও ভারতের রাষ্ট্রভাষার সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি ভাষা। ঠিক সেই একই সময়ে মানভূমে বাংলাভাষার দাবীর জন্য টুসু সত্যাগ্রহীদলকে যথেচ্ছ পীড়নের দ্বারা কারারুদ্ধ করা হয়। বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের হইলেও একেবারেই হালের নয়। ইহার প্রাথমিক গোড়াপত্তন ঘটে প্রাকস্বাধীনতার শেষাশেষি কাল হইতে। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্লোগান দেনঃ বিহার ফর বিহারিজ। স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ সিংহ সেই শ্লোগানের বাস্তব রূপায়নে তখন যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন উঠিল, তখন বিহারও চুপ করিয়া থাকিল না, হিন্দী ভাষাভাষির সংখ্যাধিক্যের নজির তুলিয়া বাংলার ন্যায্য দাবীকে বিহারী সরকার বানচাল করিয়া দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা স্কুলে স্কুলে হিন্দী ভাষা প্রবর্তন করিলেন, অফিস-আদালতের কাজে হিন্দী যোগ

করিতে চাহিলেন, এমন কি বাংলা ভাষাভাষি সাঁওতাল সম্প্রদায়কে এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন যে, তাহারা যদি হিন্দী না শেখে, তবে সেখানকার সুখসুবিধাগুলি হইতেই মাত্র তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে না, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে বিহার হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

অথচ বিহারবাসী বা বিহারসরকারের ইহা গায়ের জোরের কথা। সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায় ৯০ ভাগ বঙ্গ ভাষাভাষি। এই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সত্যকে বিহার সরকার অস্বীকার করিবার ফলে লোকসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে ইহার বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন সুরু হয় এবং ক্রমে সেই আন্দোলন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। বঙ্গ ভাষাভাষি অঞ্চলগুলির বঙ্গভুক্তির দাবীতে কলিকাতায় কয়েক ব্যক্তি অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। এবং বিষয়টি শেষপর্যন্ত এমন অবস্থায় গিয়া পৌঁছায় যে, বিহার সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হন এবং যাহাতে অবিলম্বে বিহার সরকারের এই নীতির পরিবর্তন ঘটে এবং বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষি অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি তাহার কোনো ব্যবস্থাই সাধিত হয় নাই। ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীহুমায়ুন কবীর পুণায় অনুষ্ঠিত ভাষা সম্মেলনে কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দেশ উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করেন যে, স্কুলের নিম্নশ্রেণীগুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তন না করিয়া বিহার সরকার যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, সে-কথা ভাবিলে দুঃখ হয়। কিন্তু আমরা বুঝি না, কেন্দ্রিয় সরকারই বা বিষয়টিকে এমন ভাবে জীয়াইয়া রাখিয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছেন কেন?

সম্প্রতি মানভূমের এই আন্দোলন লইয়া কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে একটি বিক্ষোভ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সমস্ত সংস্কৃতিকর্মীই উপস্থিত থাকিয়া বিহার সরকারের এই চণ্ডনীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং আবহ সমস্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

প্রতি বারের ন্যায় এবারও যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তথা কেন্দ্রিয় সরকার বিষয়টি সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তবে এই আন্দোলন যে অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাসের কোন্ ধারা অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আমরা কেন্দ্রিয় সরকারকে শেষবারের জন্য অনুরোধ করিব, বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এখনও ইহার সমাধানের জন্য তাঁহারা যত্নবান হউন, অন্যথায় আন্দোলন দেশব্যাপী পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে সামলানো কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে এবং সহজ অবস্থায় যাহাকে তাঁহারা অবহেলা করিতেছেন, আন্দোলনের প্রাবল্যের মুখে অবশেষে তাহারই সম্মানিত রূপ দিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন।

কেন্দ্রিয় সরকারের পুনর্ব্বাসন খাতে নূতন বরাদ্দ

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ইতপূর্বে কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক ২৮ কোটি ২০ লক্ষ টকা বরাদ্দ করা সত্বেও উদ্বাস্তু সমস্যার কোনো নির্ভরযোগ্য সমাধান হয় নাই। সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে উদ্বাস্তুদের জন্য উক্ত বরাদ্দ বাড়াইয়া ৫০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের ১৯৫৩-৫৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যে ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা (শতকরা ৪৬·৭ ভাগ) পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। বরাদ্দ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই; এই বরাদ্দ ব্যয়ের দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, তাঁহাদের সুধুজনোচিত বুদ্ধির উপরই এই বরাদ্দের সুষ্ঠু বণ্টন নির্ভর করে। দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বহু অসাধুপন্থার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, এমন কি কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারও উহার সম্মুখীন হইয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর এমন কোনো কলঙ্ক আরোপিত না হয়, তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সমস্যা অনেক সহজ হইয়া আসিবে এবং উক্ত বরাদ্দ অর্থ দ্বারা উদ্বাস্তুদের বহুতর কার্য সাধিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

কেন্দ্রিয় পুনর্বাসন দপ্তরের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে ভারতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষের মতো। ১৯৫১ সালের জন-গণনার পর ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার জন শরণার্থী ভারতে আসিয়াছে, তাহাদের হিসাবেও ইহাতে ধরা হইয়াছে। এখনও প্রতি মাসেই গড়ে ৬ হাজার জন করিয়া উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতে আসিতেছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার। ইহা ছাড়া আরও ৪৭ হাজার আনি-

দিষ্ট উদ্বাস্তু রহিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে যাহারা রহিয়াছে, ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সকল শিবির ১৯৪৯ সালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গের ৪০ হাজার উদ্বাস্তুসহ মোট ৭০ হাজার উদ্বাস্তুকে স্থায়ী দায় হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রাখিতে হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বেসরকারী সমিতিসমূহের সহযোগিতা বর্জনের চেষ্টা করা হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্থানের অক্ষম উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রম পুনর্গঠনের বিষয়ে শ্রীমতী এ, জন, মাথাইয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এক হাজারেরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং এইগুলিতে প্রায় ১॥ লক্ষ ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করিতেছে বলিয়া রিপোর্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাথাপিছু হিসাবে টাকা দেওয়া হইতেছে। এইগুলির মেয়াদ তিন বৎসর। ২৬১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কয়েকটি কলেজকে সাহায্য বাবদ ৪৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ও কলেজে শিক্ষারত ১,৭৫,০০০ ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। ইহার দরুণ মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহা ছাড়া সহরাঞ্চলের বাহিরে শিক্ষায়তনগুলির সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও মণিপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। ঐ সকল রাজ্যে প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রকে সাহায্য হিসাবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের অগ্রগতি সম্বন্ধে তথ্য নির্ধারণ কমিটি এবং মন্ত্রী কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, সে সম্পর্কেও সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের দরুণ মোট আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ২০১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য আরও ৩০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য কোন সালে কত টাকা ব্যয় করা হয়, তাহার মোটামুটি হিসাব এইরূপ, যথা: ১৯৪৮-৪৯ সালে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালে ৫ কোটি ৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, ১৯৫০-৫১ সালে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ১৯৫১-৫২ সালে ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা এবং ১৯৫২-৫৩ সালে ১২ কোটি ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। চলতি বৎসরে সংশোধিত হিসাবে বরাদ্দের পরিমাণ ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা দেখানো হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরবর্তী দুই বৎসরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য যথাক্রমে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের জন্য নবনির্মিত সহরগুলিতে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি টাকা ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ২ কোটি টাকা পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা আছে। ইহা ছাড়াও প্রতি বৎসর পুনর্বাসনের জন্য ৩ কোটি টাকা করিয়া ঋণ দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এই টাকা পর্যাপ্ত নয়। বেকারসমস্যা ভারগ্রস্ত ভারতবর্ষ। এইদিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়া অধিক অর্থ বরাদ্দ না করিলে এই গুরু সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। এ সম্পর্কে কেন্দ্রিয় সরকার অধিকতর যত্নবান হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

পূর্ব্বপাকিস্থানের সাধারণ নির্ব্বাচন

পূর্ব পাকিস্থানের পরম উত্তেজনাপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনপর্ব সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। এই নির্বাচনে সংযুক্ত ফ্রন্ট দল শাসক মুস্‌লিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া মোট ২৩৭টি মুস্‌লিম আসনের মধ্যে ২২০টি আসন অধিকার করিয়াছে। সংযুক্ত ফ্রন্ট আওয়ামী লীগ, কৃষক-দল, নিজামী ইস্‌লাম এবং গণতন্ত্রী দলকে লইয়া গঠিত।

নির্বাচনে সংযুক্ত ফ্রন্টের জয়লাভের মধ্যে পূর্ববাংলার ক্রমজাগ্রত গণদেবতার বিজয়গৌরবই স্বাক্ষরিত হইয়াছে; বিশেষ করিয়া দেশের যুবকসম্প্রদায় তাঁহাদের অমেয় প্রাণশক্তির যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীর যে কোনো দেশের নির্বাচনের ইতিবৃত্তে শাসকদলের এইরূপ পর্যুদস্ত হইবার নজীর নাই। এই দিক হইতে ইহা নূতন ও পরম শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরবর্তী কাল হইতে এই নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলায় স্বৈরাচারী মুস্‌লিম লীগ শাসনের উপর কলঙ্কময় অপমানের একটি অতি সুস্পষ্ট যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। এই নির্বাচনের ব্যাপারেও মুস্‌লিম লীগের চূড়ান্ত কূটচক্রান্তের যে নমুনা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের বিভেদনীতি উদ্ভাবনের যে উর্বরতা লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহা বৃটিশের 'Divide and Rule' নীতিকেও হার মানায়। অমুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট মোট ৭২টি আসনের জন্য ২৩৭টি মুস্‌লিম আসনের প্রতিদ্বন্দ্বি দল-

গুলি অপেক্ষা অনেক বেশী দলকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই ভেদনীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও কূল মান রক্ষা করা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষা আন্দোলন, সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের অভাব-অভিযোগকে এতদিন মুসলিম লীগ ধামা-চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ-বহ্নি এই নির্বাচনের মধ্য দিয়া আগ্নেয়গিরির জ্বালা-মুখ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এবং তাহার ফলাফল আজ বিশ্ববিদিত। তাহার উপর অমেরিকার সহিত পাকিস্থানের সামরিক চুক্তি সেই ক্ষুব্ধ অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের মহকুমায় মহকুমায়, সহরে সহরে ছাত্র-কৃষাণ-রাজনীতি-কর্মী, দলমতনির্বিশেষে সমগ্র পরিশ্রমী জনতা এই সর্বনাশী চুক্তির বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা, পতাকা, ফেস্টুন ও লীগ-বিরোধী শ্লোগান সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সকল কারণে নির্বাচনে জয়লাভের অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্থানের কেন্দ্রিয় গণপরিষদ ভাঙিয়া দিবার প্রবল দাবী উঠিয়াছে।

সংযুক্ত ফ্রন্ট দলের অবিসম্বাদী নেতা এ. কে. ফজলুল হক নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠনের পূর্বে কয়েকদফা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যথা: (ক) ক্ষমতা হাতে আসিলে তিনি পূর্ববঙ্গের সামগ্রিক বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিবেন; (খ) তাঁহার মন্ত্রি-সভায় দুইজন সংখ্যালঘু মন্ত্রী গ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের মধ্যে একজন বর্ণহিন্দু এবং অপরজন তপশীলী; (গ) পূর্ব-বঙ্গ ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় অংশগুলির মধ্যে সহজ চলাচলের জন্য ভিসা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিবার চেষ্টা করিবেন এবং যাতায়াতের অনাবশ্যক কতকগুলি বাধানিষেধ শিথিল করিবেন; (ঘ) লীগ আমলে বিনাবিচারে আটক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তিদান করিবেন এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রের সহিত সৌহার্দপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন; (ঙ) বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রতিশ্রুতিতে হক সাহেব অপরিসীম জোর দেন; (চ) পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক-পত্রিকার উপর লীগ আমলের অনাবশ্যক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও ভীতির জন্য যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য তিনি পূর্ণ আশ্বাস দান করেন; (ছ) সাধারণ মানুষের অতিসাধারণ মোটা ভাত আর কাপড়ের দাবী মিটানোই তাঁহার প্রথম কর্ম—এই উদ্দীপ্ত ঘোষণাও তিনি করেন; (জ) মন্ত্রিসভার অযোগ্য প্রতিনিধিকে ছয় মাসের মধ্যে সরানো হইবে; এবং (ঝ) পাটের উপযুক্ত মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

সংযুক্ত ফ্রন্টের তিন প্রধান সুরাবর্দী, ফজলুল হক ও ভাসানীর আবদুল হামিদ খান তাঁহাদের আসন্ন কর্মসূচী তিনটি নির্দিষ্ট পথে বাছিয়া লইয়াছেন, যথা: (১) সুরাবর্দী কেন্দ্রিয় বিষয় ব্যাপারের অধিনায়ক হইবেন; (২) হক সাহেব প্রাদেশিক শাসনকার্যের নায়ক, এবং (৩) ভাসানীর মৌলানা সাহেব বাহিরে থাকিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে ইহাদের কর্মপরিচালক ও পর্যবেক্ষক থাকিবেন।

পূর্ববঙ্গের গণনির্বাচনে লীগ দলের ভয়ঙ্করভাবে পর্যুদস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপাকিস্থান গভর্নরের শাসনাধীনে আসে। ৩রা এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সংযুক্ত ফ্রন্টের নেতা ফজলুল হক সাহেবের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের মধ্যে গভর্নরের শাসনের অবসান ঘটে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও আপাতত মুসলমান সদস্য লইয়াই ইহা গঠিত হইল। হক সাহেব মন্ত্রি হিসাবে গভর্নরের নিকট এ পর্যন্ত যাহাদের নাম প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন—ঢাকা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট সৈয়দ আজিজুল হক, রংপুরের এড্‌ভোকেট আবুল হাসেন সরকার এবং অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক মৌলবী আস্‌রাফ-উদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

আপাতত এই চারিজনকে লইয়া মন্ত্রিসভার কাজ সুরু হইয়াছে; পূর্ববঙ্গের গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জমান ইঁহা-দিগকে মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করাইয়াছেন। এবং প্রত্যেক মন্ত্রীই বাংলাভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শপথ-পত্রে বাংলাভাষাতেই স্বাক্ষর করেন।

সংযুক্ত ফ্রন্টের এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার প্রায় সকল হিন্দু ও মুসলমান নরনারী আশা করেন যে, উভয় বঙ্গের মধ্যে পুরাতন তিক্ততা ও বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক কুশ্রীতা অপসারিত হইয়া প্রীতি, মৈত্রী ও সহ-যোগিতার সেতু রচিত হইবে,—শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আত্মীয়তাবোধের পারস্পারিক আদান প্রদানের মধ্যে আত্মোন্নতির দিগন্ত আরও স্বচ্ছ, সুগম ও ব্যাপক হইবে।

আসলে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কারণে বাঙলা দেশ আজ খণ্ডিত হইলেও তাহার প্রাণসত্তা আজও অবিচ্ছিন্ন এবং আবহমানকাল ধরিয়াই থাকিবে। তাহাদের দুইজনেরই ভাষা এক, সমস্যা এক, হাহাকার এক আশা-নিরাশা এক, আনন্দ-বিষাদ এক। সংযুক্ত ফ্রন্টের সুশাসনে দুই বাঙলার সকল বিভেদের কালিমা অপসারিত হইয়া, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাঙলার অপমানিত আত্মসত্তার উপর অখণ্ড বাঙালী প্রাণের জয়ধ্বজা উড্ডীন হউক—আজ নূতন প্রভাতে

আমরা পশ্চিম বঙ্গীয় ভারতবাসীরাও সেই দিনের আশায় চাহিয়া রহিলাম।

ফরাসী-ভারতের কমিউনগুলির ভারত-ভুক্তি আন্দোলন

ফরাসী এলাকার বিভিন্ন কমিউনগুলির ভারতভুক্তির দাবী লইয়া সম্প্রতি ব্যাপক আন্দোলন সুরু হইয়াছে। কারিকলের ছয়টি কমিউন—কারিকল, থিরুমলরয়ান, পত্তনম, কচেরি, নেদুনকাড়ু, নেরাভি ও থিরুমাল্লারের মেয়ররা প্যারিসে ফরাসী সরকারের নিকট তার করিয়া জানান যে, তাঁহাদের কমিউনগুলি বিনা গণভোটে ফারাসী এলাকাগুলির সরাসরি ভারতভুক্তি দাবী করিয়া সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ফরাসী ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ও ফরাসী জাতীয় পরিষদের সদস্য মিঃ এডওয়ার্ড গোবার্ট ঘোষণা করিয়া বলেন যে, ফরাসীভারতের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থনে ফরাসী ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল ভারতস্থ ফরাসী উপনিবেশগুলির মুক্তি অর্জনে শেষপর্যন্ত সংগ্রাম করিতে কৃতসঙ্কল্প এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না। পণ্ডিচেরীর মেয়র শ্রী কে, মুথু পিল্লাই সহ মিঃ গোবার্ট ভারত-পণ্ডিচেরী সীমান্তবর্তী তাঁহাদের বিদ্রোহঘাঁটিতে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে মুক্তিকামী ফরাসী ভারতীয়দের এক নূতন রণহুঙ্কার উপহার দেন: 'পণ্ডিচেরী চলো।' অবস্থা ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী সরকারের দমননীতির জাঁতাকলে পিষ্ট ফরাসী ভারতীয়দের প্রতি নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে নৈরাশ্যপ্রপীড়িত না হইয়া সাহস, ধৈর্য ও বিশ্বাসের সহিত মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিতে আবেদন করেন। গোবার্ট স্বয়ং দলে দলে লোক লইয়া নেট্টাপাকোম ও মুদুকোর গ্রামে পুলিশ-ফাঁড়িগুলি দখল করিয়া লয়েন। উক্ত গ্রাম দুইটি পণ্ডিচেরীর ফরাসী এলাকার অংশ। গোবার্ট গ্রাম দুইটিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সমস্ত সরকারী ইমারৎ দখল করেন। ফরাসী ঔপনিবেশিক দপ্তরের ও ওভারসীজ বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল মঃ আঁদ্রে মচেলের নিকট এক খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়া বলা হইয়াছে: 'আপনার সরকার সময় নষ্ট করার উদ্দেশ্যে গণ-ভোট গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। আমরা গণ-ভোট ছাড়াই ভারত ইউনিয়নের সহিত যোগ দিব। আমরা ফরাসী ভারত পরিষদের সদস্য এবং কন্সালের মেয়রগণ ফরাসী ভারতের অধিবাসীদের সর্বসম্মত অভিমতের প্রতিধ্বনি করিতেছি। আমরা প্যারিসে আপনার সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছি যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে ফরাসী ভারতের ভারতভুক্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

লোকসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেন: ইহা সত্য যে, ভারতস্থ ফরাসী উপনিবেশগুলিতে ফরাসী কর্তৃপক্ষ প্রচণ্ড রকমের অত্যাচার চালাইতেছেন। সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী ভারতের সমাজতন্ত্রীদলের প্রতিনিধি-দল কুন্ডালোরে শ্রীনেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে শ্রীনেহেরু দক্ষিণভারত পরিদর্শনে বাহির হইলে শ্রীমুথু কুমারাপ্পা রেড্ডিয়ার সমভিব্যাহারে পণ্ডিচেরীর মেয়র শ্রীমুথু পিল্লাইও শ্রীনেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে মীমাংসামূলক আলোচনা চালাইবেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের কয়েকজন সদস্যের এক বৈঠকে ভারতের ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির ভারতভুক্তির জন্য ভারত সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের অস্থায়ী নেতা শ্রী বি, রামচন্দ্র রেড্ডি। স্বাধীনতা লাভ ও ভারতের সহিত ঐক্যস্থাপনের জন্য ভারতের ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির জনগণ যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাইতেছেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়।

ফরাসী ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ভারত সরকার অবশ্যই স্বীকৃতি দিবেন এবং উক্ত বিভিন্ন কমিউনগুলির যত সত্বর ভারতভুক্তি সম্ভব, ভারত সরকার তদ্বিষয়ে সহায়ক হইবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

হাইড্রোজেন বোমার প্রাণবিধ্বংসী মহড়া

পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণে যখন শান্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত সাধারণ পরিশ্রমী মানুষ যখন নূতন করিয়া শান্তির নীড় নির্মাণ সুরু করিয়াছে, দেশে দেশে মানবতার দূতেরা সম্মেলন করিয়া যখন শান্তির মঙ্গলশঙ্খ বাজাইতেছেন, ঠিক সেই একই সময়ে সাম্রাজ্যলোলুপ আমেরিকা মানুষের সম্মিত প্রার্থনাকে ধ্বংস করিবার জন্য বীভৎস সমরপ্রস্তুতি চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মার্চ মাসের প্রথম তারিখে মধ্যপ্রশান্ত মহাসাগরে বিকিনি দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষাকার্য পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের মনে ভয়ঙ্কর

আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। ধ্বংস করার কুশলতায় হাইড্রোজেন বোমা পরমাণু (atom) বোমা অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী।

মাত্র দশ বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার যে নৃশংস হত্যালীলা সংসাধিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব মিলিতকণ্ঠে প্রতিবাদ-জ্ঞাপন করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এই প্রাণবিধ্বংসী কার্যের নিন্দা করিয়া ইহা নিরোধ করিবার জন্য নির্মমভাবে অভিমত প্রকাশ করে। পাঁচ বৎসর পর কোরিয়ার যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহারের হুমকি দিয়াছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিমেন্ট এট্‌লি প্রমুখেরা ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে স-রবে পরমাণুবোমা বন্ধের আবেদন জানান এবং তাহা সাময়িকভাবে কার্যকরী হয়।

কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধ-প্রভুরা আদপেই নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহেন। পৃথিবীর সমস্ত আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও আইক-নিক্সন-ম্যাকার্থি প্রমুখ সমরপ্রিয় ধুরন্ধরেরা নূতন করিয়া হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাকার্য সুরু করিয়াছেন। অথচ ৮ই ডিসেম্বর নাটকীয়ভাবে বারমুদা হইতে আমেরিকা ফিরিয়া আইক একটি পরম বৈপ্লবী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় মানুষের ঐন্দ্রজালিক উদ্ভাবনী শক্তিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার উদার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয়, এই ঐতিহাসিক বিবৃতির বিরাশী দিন পরেই বিকিনি প্রবালদ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ পরীক্ষা। ইহার ফলে সত্তর মাইল দূরে অবস্থানকারী তেইশ জন জাপানী ধীবর গুরুতরভাবে আহত হয় এবং এখনও তাহারা চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। ডক্টর ম্যাসাও সুজুকির নেতৃত্বে জাপানী চিকিৎসাবিদগণের সহিত জাপানস্থিত মার্কিন চিকিৎসকদের এই 'রেডিও-এ্যাক্‌টিভ্' রোগের ব্যাপার লইয়া চূড়ান্ত মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। তাঁহারা রূঢ়ভাবে আমেরিকার সাহায্য প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

বিকিনি-বিস্ফোরণের আধিক্য হিরোসিমাপেক্ষা প্রায় ছয়শত গুণ অধিক। এমন কি স্বয়ং আইসেনহাওয়ারও এই প্রসঙ্গে উলঙ্গ উক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার বক্তব্য ছিল ১লা মার্চ তারিখে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে—যাহা ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব এবং বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণভাবে স্তম্ভিত করিয়া দিবে

জাপান এবং বৃটেন হইতে ইতিমধ্যেই এই হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা ব্যাপারে সুতীব্র প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হইয়াছে ক্যানাডার বহির্দেশীয় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ লেস্টার পিয়ার্সন ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলিয়াছেন, জার্মানীতে আজ পর্যন্ত যত বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলি অপেক্ষা এই একটি হাইড্রোজেন বোমা অধিকতর ধ্বংসকারী।

শান্তিকামী ভারতের পক্ষ হইতেও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু আমেরিকার নিকট ইহার নিবৃত্তির জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ কেবলমাত্র হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাই সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুধু ভারত বা রাশিয়াই নয়, দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিরা পৃথিবীব্যাপী এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদে কণ্ঠ মিলাইয়াছেন। মানুষের চিরবাঞ্ছিত শান্তিকে, তাহাদের প্রেমমধুর নিকেতনের স্বপ্নকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য আমেরিকা উনিশ হইতে বাইশে এপ্রিল আবার হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাকার্যে তৎপরতা দেখাইবার প্রস্তুতি চালাইতেছে।

কিন্তু ইহার আগেই শান্তিকামী মানুষের জীবন লইয়া এই হৃদয়হীন ছিনিমিনি খেলার অবসানের জন্য পৃথিবীর সমস্ত শান্তিসংস্থাগুলিকে একত্রিত হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এবং প্রয়োজন হইলে একটিমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা কঠোরভাবে দমন করিবার কঠিন শপথ সমস্ত বিশ্বকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড, ৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

বঙ্গশ্রী

★ সংস্কৃতিমূলক শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র ★

বঙ্গ-ভারতীর নবীন ও প্রবীণ চিন্তানায়কদের শ্রেষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করে। রসানুভূতির সঙ্গে জ্ঞানানুভূতির একত্র সমন্বয় বঙ্গশ্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আষাঢ় হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ত্তমানে একবিংশবর্ষ চলিতেছে। বৎসরের যে কোনো মাস হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক মূল্য ৮৷০ মাত্র, প্রতি সংখ্যা ৸০ আনা। কোনো বিশেষ সংখ্যার জন্যই গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বর্ত্তমান বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ রাখিতে হইলে বঙ্গশ্রী-পাঠ অপরিহার্য্য।

সারা ভারত, পাকিস্থান, সুদূর ব্রহ্ম ও সিংহলে বহুল প্রচারিত বঙ্গশ্রীতে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই লাভবান হন। এজেন্টগণকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়

* ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩ *

ঘাট

ফটো—ক্ষীরোদ রায়

একবিংশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৬১ | ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাংখ্য ও বেদান্ত

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে একটি সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতায়। কিন্তু গীতায় ব্যাখ্যাত দর্শনের সঙ্গে চরক সংহিতায় বর্ণিত সাংখ্য দর্শনের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও তাহার সহিত সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য প্রবচন সূত্রে বিবৃত দর্শনের সমন্বয়-সাধন অসম্ভব। ঈশ্বর বেদান্তের আদি, অন্ত ও মধ্য। যে দর্শনে ঈশ্বরকে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্তের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টাকে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনকে "ঢালিয়া সাজিতে" হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা বিফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বেদান্তে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীব-সমন্বিত জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বিধৃত এবং পরিণামে ব্রহ্মেই বিলীন হয়, ইহাই বেদান্তের মত। সাংখ্যমতে অচেতন প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব। বেদান্তে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই একমাত্র পুরুষ; সাংখ্য মতে পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই অবিদ্যার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ জ্ঞানই অবিদ্যা; বেদান্ত মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান অবিদ্যা। এইরূপ বিরুদ্ধ-বাদী দর্শনদ্বয়ের সমন্বয় হইবে কিরূপে?

বেদান্ত দর্শন মুখ্যতঃ শব্দ প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য শব্দকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার যথোচিত ব্যবহার করেন নাই। করিলে ঈশ্বর প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিতে পারিতেন না। সমগ্র উপনিষৎ

তো ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ। তবুও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই॥ সাংখ্য সূত্রে "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩।৫৭) সূত্রে যে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, তিনি ঈশ্বর নহেন, সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীব মাত্র।

বিজ্ঞান ভিক্ষু ঈশ্বরবাদী। তিনি লিখিয়াছেন ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্ম সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ নিত্য ঐশ্বর্য্য দর্শনে, তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইতে পারে, এবং সেই অভিনিবেশবশতঃ বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সাংখ্য ঈশ্বরকে অপ্রমাণিত বলিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই উক্তির কোনও সারবত্তা নাই। প্রথমতঃ প্রচলিত সাংখ্য দর্শনে যে ভাবে জগতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনও স্থানই নাই। অচেতন প্রকৃতি হইতে জড় জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। জগতের সৃষ্টিতে অন্ম কাহারও যেমন কর্তৃত্ব নাই, তেমনি এই জগতের বহিঃস্থ অসংখ্য পুরুষও কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই; তাহারা সনাতন। এই মতে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার বিবেকজ্ঞানের এবং মুক্তির প্রতিবন্ধক। যে ঈশ্বর জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবন্ধক, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন। তৃতীয়তঃ দর্শনের কার্য্য সত্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণ। কোনও উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া সত্য গোপন বা সত্য বর্জ্জন দার্শনিকের উপযুক্ত নহে। ঈশ্বরকে মনে স্বীকার করিয়াও সাংখ্যাচার্য্যগণ যদি প্রকাশ্যে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন, তাঁহাদের কার্য্য দার্শনিকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বস্তুতঃ প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের সহিত উপনিষদের সামঞ্জস্য নাই। প্রাচীন সাংখ্য উপনিষদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য উপনিষদ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবেই যে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদান্তের ব্রহ্মকে বর্জ্জন করিয়া সাংখ্য তাহার স্থানে পুরুষকে বসাইয়াছেন। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং—ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। সাংখ্য জানেন যে কেবলমাত্র অচেতন প্রকৃতি দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কেননা অচেতন প্রকৃতি হইতে কেবলমাত্র অচেতন বস্তুই উদ্ভূত হইতে পারে, চৈতন্ম ও তাহার প্রকাশ—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার উদ্ভব অসম্ভব। জগতে বর্ত্তমান চৈতন্মের ব্যাখ্যার জন্ম সাংখ্যের চেতন পুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল। চৈতন্মের অধিষ্ঠান বহু জীবের অস্তিত্ব হইতে সাংখ্য পুরুষ বহুত্ব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পুরুষের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা হইতে পুরুষের বহুত্ব কল্পনা করা যায় না। সাংখ্য মতে পুরুষদিগের মধ্যে কোনও ভেদই নাই; তাহারা একরস, সকলেই চিৎ-স্বরূপ। সকলেই অন্ম নিরপেক্ষ, অসঙ্গ, সকলেই বিভু। কিন্তু বহু সংখ্যক বিভু (সর্ব্বব্যাপী) ও অনন্মাপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। যেখানেই বহু, সেখানেই তাহারা পরস্পরকর্তৃক সীমাবদ্ধ। সাংখ্য মতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রকৃত পক্ষে পুরুষের নহে; তাহা প্রকৃতির মধ্যগত জীবের। জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের কোনও পরিণাম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রত্যেক জীবের সহিত কোনও নির্দ্দিষ্ট পুরুষের সংসর্গ আছে, ইহা বলা যায় না। যদি কোনও সংসর্গ থাকে, তাহা হইলে সাংখ্যমতে তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। যে কোনও পুরুষের অথবা একমাত্র পুরুষের দ্বারাই যাবতীয় জীব-চৈতন্মের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। কেননা পুরুষের প্রতিবিম্ব মাত্রই প্রকৃতির মধ্যগত বুদ্ধিতে পতিত হওয়ার ফলেই জীবের উদ্ভব হয়। সুতরাং একাধিক পুরুষ কল্পনার কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। যে ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি সাংখ্য দর্শনের লক্ষ্য, সে দুঃখ প্রকৃতপক্ষে জীবের, পুরুষের নহে। একমাত্র পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির বিভিন্ন অংশে পতিত হইয়া বহু জীবের সৃষ্টি করিতে পারে। চরক সংহিতায় পুরুষকেই অব্যক্ত বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদেও (৬।৮) এক "ব্যাপক অলিঙ্গ পরপুরুষের কথা আছে। সাংখ্যে পুরুষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই পর-পুরুষেই প্রযোজ্য। সেই পর-পুরুষের জ্যোতিতেই প্রকৃতি আলোকিত হয় এবং মহৎ বা মহান্ আত্মার উদ্ভব হয়।

সাংখ্য পুরুষ-বহুত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদ্বারা জীববহুত্বই প্রমাণিত হয়, পুরুষ-বহুত্ব নহে।

শঙ্কর জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। জগৎ মিথ্যা, জগতের প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহা অনিত্য; এবং যাহা অনিত্য, তাহাকে সৎ বলা যায় না। রামানুজ ও অন্যান্য পরিণামবাদীদিগের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, এবং অনিত্য হইলেও জগৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। সাংখ্য জগৎকে সত্য বলিয়াছেন; এ বিষয়ে পরিণামবাদীদিগের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও, তাঁহার মতে অচেতন প্রকৃতি হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। বেদান্তমতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তু জগতের মধ্যে নাই। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন বস্তু জগতের উপাদান; তাহারা অচেতন এবং পুরুষ হইতে ভিন্ন। এই তিনগুণ যখন প্রকৃতির মধ্যে সাম্যভাবে থাকে, তখন সৃষ্টি থাকে না। সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলে সৃষ্টি হয়। কেন এই বিচ্যুতি হয়, স্পষ্ট করিয়া সাংখ্য তাহা বলেন নাই। সাম্যাবস্থার বিচ্যুতির জন্য কি পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগের অথবা পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন? প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধনের জন্য এক প্রবৃত্তি আছে, সাংখ্য বলিয়াছেন। বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য যেমন গাভীর দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়, পুরুষের বিমোক্ষের জন্য সেইরূপ প্রধানের (প্রকৃতির) প্রবৃত্তি হয় (সাং কা ৫৭), ইহাও বলিয়াছেন। মোক্ষের জন্য প্রথমে বন্ধের প্রয়োজন। বন্ধ হয় প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে। এই সংযোগ কি পুরুষের ভোগ-সাধনের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তির ফল, অথবা ইহা সম্পূর্ণ আপতিক। অসংখ্য পুরুষ প্রকৃতির সহিত অস্তিত্বের রঙ্গক্ষেত্রে একত্র অবস্থিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও আকস্মিক ভাবে কি তাহাদের সংযোগ সাধিত হয়? সাংখ্যকার এই দুই বিকল্পের কোনওটিই সংযোগের কারণ বলেন নাই। তাহার মতে অবিবেকই সংযোগের কারণ। সাংখ্যের অবিবেকের সহিত বেদান্তের অবিদ্যার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও বিস্তর। বেদান্তের অবিদ্যা জীব ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান; সাংখ্যের অবিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ জ্ঞান। অবিবেক শব্দের অর্থ ভ্রান্তজ্ঞান-বাসনা। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের পূর্ব্বে কোনও জ্ঞান-বাসনার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অবিবেককে অনাদি বলা হইয়াছে। এই অনাদি অবিবেক প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, ইহা পুরুষের নহে। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের অর্থ প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পাত। পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় বুদ্ধিতে। এই প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা প্রকৃতিতে চৈতন্যের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারিত, পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির উপর পতিত হয় কি বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অথবা পরে? প্রকৃতি কি আপনার প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এই সকলের উদ্ভাবন করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের ব্যবহারের জন্য পুরুষের হস্তে অর্পণ করে? পাশ্চাত্য দার্শনিক দে-কার্ত্ত জীবদেহকে একটি স্বতশ্চালিত যন্ত্র এবং প্রত্যেক যন্ত্র এক একটি আত্মাকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়াছেন। সাংখ্যের মতও কি তাহাই? অথবা পুরুষের আলোক প্রকৃতির উপর পতিত হইবার পরে প্রকৃতির অভিব্যক্তির আরম্ভ হয়? অবিবেককে অনাদি বলিয়া সাংখ্য অতি কৌশলে প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছেন। অবিবেকের উৎপত্তির যখন কোনও কাল নাই, তখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেরও কোনও কাল নাই; সে সংযোগও অনাদি। অবিবেক ও সংযোগ এক সংগেই বর্ত্তমান। অবিবেককে যে সংযোগের কারণ বলা হয়, তাহার কারণ অবিবেকের ধ্বংস ও বিবেকের উৎপত্তি হইলে সংযোগ থাকে না।

পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধনের জন্য প্রকৃতির যে প্রবৃত্তির কথা সাংখ্য বলিয়াছেন, তমোভূত অন্ধ প্রকৃতির পক্ষে অন্ধভাবে সৃষ্টি করিয়া সে প্রবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন সম্ভবপর নহে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যদিগকে পুরুষের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য প্রথমেই চিত্তের আলোকে তাহাদিগের উদ্ভাসিত হওয়ার প্রয়োজন। এই দিক হইতে বলা যায় পুরুষের সহিত সংযোগের পূর্ব্বে প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু সে সংযোগ

তো অনাদি। সুতরাং পূর্ব্বাপরের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

বেদান্তের আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষে জ্ঞান নাই, যদিও তাহা চিৎ-স্বরূপ। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই বর্ত্তমান। জ্ঞাতায় অহংভাব বর্ত্তমান। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞান থাকে। বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সাংখ্যের পুরুষে এই অহং জ্ঞান নাই—বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নাই। সুতরাং সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিকে না জানিলেও আপনাকেই যে জানেন, তাহাও বলা যায় না। সাংখ্য মতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ হয় অহংকারসহ মহত্তের আবির্ভাবের পরে। প্রকৃতির সংস্রব-বিযুক্ত পুরুষের যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সে জ্ঞানের স্বরূপ অজ্ঞাত। সাংখ্যকারিকায় (৬৪) আছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি, নমে, নাহমিত্যপরিশেষম্
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

তত্ত্বাভ্যাসের ফলে "আমি বুদ্ধি" "আমি সুখী", আমি দুঃখী" ইত্যাদি ভাব, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, ইত্যাকার মমতা বিদূরিত হইয়া বিশুদ্ধ, অপরিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জ্ঞান তো বুদ্ধির। অহন্তা ও মমতাভাব ছিল বুদ্ধিতে। বুদ্ধিতে বিবেকের উদয়ের ফলে তাহার বিপরীত ভাবও উদ্ভূত হয় বুদ্ধিতে। অবিবেকের আশ্রয় যেমন বুদ্ধি, বিবেকের আশ্রয়ও তেমনি বুদ্ধিই। সুতরাং উপরোক্ত কারিকায় যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধির, পুরুষের নহে। পুরুষের জ্ঞানের স্বরূপ অজ্ঞাত।

বেদান্তমতে জগতের সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, অর্থাৎ এক জ্ঞানবান্ পুরুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। "আত্মৈব ইদম্ অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ। সঃ অনুবীক্ষ্য ন অন্যৎ আত্মনো অপশ্যৎ…স বৈ নৈব রেমে…" পূর্ব্বে এই জগৎ পুরুষরূপী আত্মা রূপে বর্ত্তমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না।… তিনি আনন্দলাভ করিলেন না। ইহার পরে তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। (বৃহদারণ্যক উপঃ ১।৪)

সাংখ্য মতে জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। সেই বুদ্ধি হইতে জাগতিক অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি হইলেও, সেই বুদ্ধির সৃষ্টি কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক করে নাই। প্রকৃতি হইতে তাহা আপনিই উদ্ভূত হইয়াছিল। হয়তো বুদ্ধির আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুরুষের দৃষ্টি প্রকৃতির উপর পতিত হইয়াছিল; কিন্তু পুরুষে বুদ্ধি ছিল না; সুতরাং সে দৃষ্টিপাত বুদ্ধিপূর্ব্বক ছিল না। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বুদ্ধির আবির্ভাবের পরবর্ত্তী সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। তিনি লিখিয়াছেন "বহু স্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিভ্যঃ তাবৎ সৃষ্ট্যাদিসৃষ্টেঃ অভিমানপূর্ব্বক-ত্বাৎ বুদ্ধি-বৃত্তি পূর্ব্বক সৃষ্টৌ কারণতয়া অভিমানঃ সিদ্ধঃ। অর্থাৎ "আমি বহু হইব", "আমি প্রজাসৃষ্টি করিব" শ্রুতি ও স্মৃতিতে ইহা আছে। সুতরাং সৃষ্টি যে অহংকারপূর্ব্বিকা, তাহা সিদ্ধ। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে "মহৎ" সমষ্টি বুদ্ধি, ব্যষ্টি বুদ্ধি নহে। সাংখ্য সূত্রে ২।৬৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন, "সমষ্টিবুদ্ধ্যাদি-উপাদানিকা এব সৃষ্টিঃ…নতু তদংশব্যষ্টি-বুদ্ধ্যাদি-উপাদানিকা, যথা মহা পৃথিব্যা এব স্থাবরজঙ্গমাদিউপাদানত্বং, নতু পৃথিব্যাংশ-লোষ্ট্রাদেঃ ইতি" অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি বুদ্ধির অংশ ব্যষ্টি বুদ্ধি নহে। স্থাবর জঙ্গমাদির উপাদান যেমন মহা পৃথিবী, তাহার অংশ লোষ্ট্রাদি নহে, সেইরূপ মহৎই (হিরণ্য গর্ভ) যাবতীয় ব্যষ্টি বুদ্ধির আশ্রয়।

অচেতন প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির আবির্ভাব একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার মনে হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্য মতে বুদ্ধি ও তাহা হইতে উদ্ভূত জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকলই অচেতন। পুরুষের সহিত সংযোগের ফলেই অচেতন লিঙ্গ চেতনবৎ হয়। "সোঽয়ং বুদ্ধি-তত্ত্ববর্ত্তিনা জ্ঞানসুখাদিনা তৎপ্রতিবিম্বিতঃ তৎছায়াপত্ত্যা জ্ঞানসুখাদি মান্ ইব ভবতি।" (বাচস্পতি—৫) পুরুষের সহিত বুদ্ধির বাস্তব সংযোগ নাই—তাহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হয়। বুদ্ধির ছায়া আবার সেই প্রতিবিম্বে পতিত হয়, এবং বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-জ্ঞানের সহিত সেই প্রতিবিম্বের সংযোগবশতঃ পুরুষ জ্ঞান-সুখ-দুঃখমানের মতো হয়; এবং বুদ্ধিও চেতনের মতো হয়। এই বর্ণনায় অর্থ গ্রহণ নিতান্তই কষ্টকর। অচেতন বুদ্ধি, অচেতন অহংকার,

অচেতন মনঃ, অচেতন ইন্দ্রিয়, অচেতন সুখ, দুঃখ, জ্ঞান যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহারা কি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিশেষ্ বিশেষ সন্নিবেশ মাত্র—চৈতন্য-সংসর্গহীন সন্নিবেশ মাত্র—এবং চৈতন্যের সহযোগে বুদ্ধি, অহংকার, সুখ-দুঃখাদি রূপ প্রাপ্ত হয়? ইহাই যদি উক্ত বর্ণনার অর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রশ্ন উঠে—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির এবং বুদ্ধি হইতে অহংকার প্রভৃতির উদ্ভব কি পুরুষ-সংযোগ ব্যতিরেকেই নিষ্পন্ন হয়, এবং অভিব্যক্তির পরে কি প্রকৃতি ইহাদিগকে পুরুষের নিকট উপস্থাপিত করে? প্রকৃতি কি তথাকথিত জড় জগৎ সহ স্নায়ুযন্ত্র সমন্বিত জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া সেই স্বতশ্চালিত যন্ত্র পুরুষের ব্যবহারের জন্য তাহাকে সমর্পণ করে? জড়বাদী দার্শনিকগণ জীবদেহ প্রকৃতির নিয়মানুসারে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করেন এবং চৈতন্যকে স্নায়ুযন্ত্রের ক্রিয়া বলেন। চৈতন্য ও জ্ঞান তাহাদের মতে উপজাত বা অতিরিক্ত সমুৎপাদ (Epi-phenomenon) মাত্র। সাংখ্য চৈতন্যরূপী পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বুদ্ধি-অহংকার-মনঃ-ও-ইন্দ্রিয়সমন্বিত জীবদেহের সৃষ্টি কি তাহার মতে পুরুষ-নিরপেক্ষ? অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কপিল কি মনে করিতেন যে প্রতীতি (preception) ও চিন্তা (thought) পুরুষের ব্যবহারের জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো যন্ত্র মাত্র, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা পুরুষকর্ত্তৃক ব্যবহৃত না হয়, ততক্ষণ তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো নিশ্চেষ্ট থাকে? অথবা প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় যখন তাহার উপর পুরুষের দৃষ্টি প্রথম পতিত হয়, তখনই প্রকৃতি সক্রিয় হইয়া উঠে, এবং পুরুষদৃষ্টি-উদ্ভূত প্রকৃতির এই চেষ্টাই ত্রিগুণে আরোপিত হয়?" মোক্ষমূলর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রশ্নের অর্থ এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থার যে বিচ্যুতি হইতে প্রকৃতির অভিব্যক্তি আরব্ধ হয়, সেই বিচ্যুতি কি পুরুষের দৃষ্টির ফলে সংঘটিত হয়, অথবা তাহার অন্য কোনও কারণ আছে? অন্য কোনও কারণের কথা সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য সূত্রে নাই। আবার তাহা যে পুরুষের দৃষ্টির ফল, তাহাও কোথাও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু সাংখ্য সূত্রের ১।১৮ সূত্রে আছে যে, প্রকৃতি-নিমিত্ত পুরুষের বন্ধ হয় না, কেননা প্রকৃতি পরতন্ত্র। (প্রকৃতি নিবন্ধনাৎ চেৎ, নঃ, তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্।) পুরুষের সহিত সংযোগের উপরই প্রকৃতির পুরুষকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে। পুরুষকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা প্রকৃতি লাভ করে তাহা হইতে মহৎ, অহংকার প্রভৃতির উদ্ভবের ফলে। সুতরাং প্রকৃতির বন্ধনক্ষমতাকে পুরুষের সহিত তাহার সংযোগের ফল বলিয়া সূত্রকার মহৎ অহংকার প্রভৃতির উদ্ভবকে সংযোগের পরবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতেন, ইহা মনে করা অসঙ্গত হয় না।

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বস্তু—প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ চেতন, উভয়ের সংযোগ কিরূপে সম্ভবপর হয়? সাংখ্যকারিকার ২০ কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি "সংযোগ" শব্দের অর্থ "সন্নিধান" বলিয়াছেন। কিন্তু পুরুষ দেশ ও কালাতীত। দেশকালাতীত বস্তুর সন্নিধানের অর্থ কি? ৬৬ কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি সংযোগ শব্দের অর্থ "যোগ্যতা" বলিয়াছেন। পুরুষের সম্বন্ধে ভোক্তৃত্ব যোগ্যতা, প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভোগ্যতাই যোগ্যতা। এই যোগ্যতা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষের ভোগ ও বন্ধন নাই। এক এক পুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিই এক একটী জীবের উৎপাদন করে; সেই জীবেরই ভোগ, বন্ধন ও মুক্তি হয়। (সাংকা—৬২, ৬৩)। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম সকলেই জীব। এক অনির্ব্বচনীয় উপায়ে প্রকৃতির উপর পুরুষের আলোকপাতে আমরা প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছি, এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছি। মুক্তি অর্থে পুরুষের আলোক হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যে চৈতন্যের আভাস আমাদের মধ্যে আছে, তাহার বিনাশ-সাধন করিয়া আত্মনাশ করা। যে যে পুরুষের আলোকে আমাদের চিত্ত আলোকিত, আমরা সেই সেই পুরুষ নহি। ইহাই সাংখ্য মত, কিন্তু ইহার সহিত গীতা অথবা বেদান্তের সামঞ্জস্য হয় না।

অন্ধ তমোভূত প্রকৃতির পক্ষে নিজে কিছু সৃষ্টি করা

অসম্ভব। পুরুষের সেবার জন্য প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি আছে, পুরুষের সহায়তা ব্যতীত সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে না। পুরুষের দৃষ্টিপাতে তমোময়ী প্রকৃতি উজ্জ্বলিত হয়। এই উজ্জ্বলতা বা আলোক দ্বারা প্রকৃতি যে কেবল গ্রহণযোগ্য বা জ্ঞেয় হয় (অজ্ঞেয় অবস্থা হইতে জ্ঞেয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়), তাহা নহে; প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞাতৃত্বেরও উদ্ভব হয়। এই আলোকই মহৎ বা বুদ্ধি; প্রকৃতির প্রথম জাত সন্তান। এই মহতের মধ্যে অহংকার, মনঃ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াদি সকলই বর্ত্তমান। বুধ্ ধাতুর অর্থ জাগরিত হওয়া। সুপ্ত প্রকৃতি পুরুষের দৃষ্টিপাতে প্রবুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এই মহৎ বা বুদ্ধি সমষ্টি-বুদ্ধি, ইনিই বেদের হিরণ্যগর্ভ—অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য গোপ্তা (মুণ্ডক উপ ১।১।১) এই অব্যক্ত পুরুষ (চরক)—অচেতন নহে। ইনি মহৎ অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপ—জ্ঞান-জ্যোতিঃ। ইনি মহৎ অর্থাৎ পূজনীয়, বরেণ্য। ইনি বরেণ্যং ভর্গঃ। ইহা হইতেই যাবতীয় ব্যষ্টি বুদ্ধির উদ্ভব এবং ইহা কর্ত্তৃক ব্যষ্টি বুদ্ধি বিধৃত। ইনিই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন। (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)। যে অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য, সনাতন তমোনুদ, স্বয়ম্ভু, অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদিসহ ব্যক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, ইনি সেই স্বয়ম্ভু ভগবান্, প্রাচীন সাংখ্যের মহৎ, কঠোপনিষদের মহান্ আত্মা। মহাভারতে অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে এই মহৎ তত্ত্বকে "গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী পুরাতন পরম পুরুষ" বলা হইয়াছে। বেদান্তের জ্ঞানময় অব্যক্তের এই প্রথম প্রকাশ অর্ব্বাচীন সাংখ্যে অচেতন বুদ্ধিমাত্রে পরিণত হইয়াছেন। দুর্ভাগ্য।

★

ফিরে যাই

করুণাময় বসু

জীবনের ছায়াস্রোত ধরে
যাই আমি ফিরে যাই পিছনের ধূসর সাগরে,
যেইখানে বালু বেলাভূমে
গন্ধের বেদনা ভাসে ঘুমানো কুসুমে।
দিগন্তরে উড়ে যায় সাদা বক ছিন্নমালা যেন,
তুমি কি শুধাবে মোরে, আজ আর কেন
এতোকাল, এতোকাল পরে,
নিরুত্তর মুখোমুখি: বিন্দু বিন্দু সময়েরা ঝরে।

নিস্তরঙ্গ হৃদয়ের নদী,
ভোরের মিঠেল হাওয়া থেমে গেছে, তবু আজ যদি
তুমি শুধু বলো,
বস কাছে একটুকু, বাষ্প ঢাকা আঁখি ছলোছলো,
হাতে মোর হাতখানি রাখো,
সেই দণ্ডে পার হয়ে চলে যাব ভাঙাচোরা
জীবনের সাঁকো।

হয়তো যৌবন গেছে বয়সের জীর্ণ শেষ ঘাটে,
তবুও সময় আছে, অস্ত-সূর্য বসেনিক পাটে;
এখনো দুরন্ত হাওয়া বয়ে যায় মউ ক্ষেতে
মহুয়ার বনে,
দেখেছি আগুন লেখা তোর দু'টি নয়নের কোণে।
এখনি বলোনা তুমি, যাই যাই, তবে চলে যাই,
এখনো ঝর্ণার জল বেজে ওঠে ঝিকিমিকি,
হেসে বলে, পাতাঝরা শালবনে কাঁকণ বাজাই।
এখনি বলোনা, যাই যাই।

এখনো হয়নি শেষ, ভাঙা হাটে আছে কিছু খেলা:
এখনো চোখের জল, জীবনের ছেঁড়া মণি-হার,
শুকানো কুসুমলতা বিদায় বেলার
রেখে যাব শূন্য ঘাটে, তাই নিয়ে ফিরে যেও
দূর পথে সন্ধ্যায় একেলা।

কালান্তর

অখিলকুমার ভট্টাচার্য্য

রক্তের টান না থাকলেও আত্মীয়তার বন্ধনটা তা ব'লে শিথিল নয়। আমার মায়ের দূর সম্পর্কের ভাইও তিনি নন—তাঁর বাপের বাড়ির গ্রাম-সম্পর্কীয় ভাই, যা নাকি আজকের দিনে নিতান্ত পরজন ব'লেই বিবেচিত হয়। তবুও রতন মামা আমার অতি আপন জন। নিজের মামা নেই—মায়ের পিত্রালয়ের অপর কোন স্বজনও তেমন আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করেন না রতন মামা যতখানি করেন। শৈশবেই পিতৃ-হারা। বিধবা মায়ের সাংসার-যাত্রা অতি কায়ক্লেশেই চলে; আমি তাঁর একটি মাত্র সন্তান।

কলকাতায় কোন এক সদাগরী অফিসের নিম্ন বেতন-ভুক কেরাণী হ'চ্ছেন রতন মামা; তাই তিন-চারটি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তাঁকেও দুঃখের মাঝেই দিন যাপন ক'রতে হয়; তবুও সময়-অসময়ে তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রকারের সাহায্যই পেয়ে থাকি। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। নিজে তেমন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি; কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় মা আমাকে রতন মামার কাছেই সর্ব্বপ্রথম পাঠালেন তাঁর অফিসে কোন একটি চাকরী সংস্থানের জন্যে।

রতন মামা তা শুনে বললেন, আরে ছোঃ, এই বয়সে চাকরি। আর চাকরি আবার মানুষে করে। মন দিয়ে লেখাপড়া করো।

—গরিবের ছেলে আর কী ক'রতে পারে ব'লুন? বাপ নেই; মা কষ্টেসিষ্টে যেটুকু পড়িয়েছেন তাই যথেষ্ট। আমাদের অবস্থায় এর বেশি আর কিছু প্রত্যাশা করাই অন্যায়।

আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন রতন মামা। কিশোর বালকের মুখে সংসার-অভিজ্ঞের এই উক্তি হয়ত তাঁর বিস্ময় উৎপাদন ক'রেছিল।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, বাপ নেই তার জন্যে এ দুঃখ তোমাকে করতে হবে না। মামা তো এখনও বেঁচে আছে। তোমার মাকে ব'লো এ বয়সে চাকরি করার প্রয়োজন হবে না। পড়ার খরচ আমার কাছ থেকেই নিও।

একথার পর আর কোন ওজর আপত্তি টেকে না। বরঞ্চ উৎসাহের সঙ্গে কলেজে ভর্ত্তি হই। রতন মামা আমার তত্ত্বাবধান করেন। আরও খুশি হন তিনি আমার অধ্যবসায় আর স্বাবলম্বনের মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে। দু'টি ট্যুশানি করে আমি আমার পড়ার খরচ চালাই; সুতরাং আর্থিক সাহায্য তাঁর কাছ থেকে আর গ্রহণ ক'রতে হয় না। কিন্তু তা ব'লে তাঁর কাছে আমার ঋণের বোঝা বড় কম নয়। সর্ব্ব ব্যাপারে তিনি আমাকে ভরসা দেন; ছুটীর দিনে আদর করে বাড়িতে আহ্বান জানিয়ে ভুরিভোজে আমাকে আপ্যায়িত করেন। তাঁর উদার হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহ এমনিভাবেই অজস্রধারায় আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছিল।

মাঝে মাঝে তাঁকে চাকরি সংগ্রহ করে দেবার কথা বললেই শুধু তিনি ক্ষেপে উঠতেন। শাস্ত্র বাক্যকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে তিনি বলতেন, রাজসেবায়াং নৈব চ নৈব চ। অর্থাৎ চাকরির মতন জঘন্য বৃত্তি আর কিছুই নাকি নেই ত্রিভুবনে।

মামী বরঞ্চ মাঝে মাঝে আমার পক্ষ অবলম্বন ক'রতেন, গরিবের ছেলে রাজসেবা না ক'রে ক'রবে কী শুনি?

—পড়বে।

—তারপর?

—তারপরের ভাবনা তারপর করা যাবে।

—সে ভাবনাটা একটু আগে থেকেই যদি ক'রে রাখা যায় তাতেই বা ক্ষতি কিসের?

—কেন চাকরি ছাড়া ছুনিয়াতে আর কিছুই কী করবার নেই?

মামার কথায় মামী দৃঢ়স্বরে জানাতেন, না, আর কিছুই করবার নেই। তা যদি থাকে তবে তাহ'লে তুমি নিজে সে পথ দেখালে না কেন?

—নিজের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেছে; আর তার জন্যে দিনরাতই মনের মধ্যে অনুশোচনার আগুন। এ দুঃখ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আর যাতে কেউ না পায় সে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য ব'লেই মনে করি।

মামী প্রতিবাদ জানাতেন, দুঃখ এমন প্রায় প্রতি সংসারেই আছে। তবু চাকরিটি ছিল তাই রক্ষে—এতগুলি প্রাণী খেয়ে প'রে বাঁচছি।

মামা ব'লতেন, একে কী বাঁচা বলে! এর নাম তিলে তিলে মৃত্যু। মনের মৃত্যু, দেহের মৃত্যু। মামার এ হেঁয়ালিভরা কথার অর্থ মামী বুঝতেন না।

—মৃত্যু আবার কিসের? কালিয়া পোলাও খেতে পাই না, এই না কথা। কিন্তু তা' পেলেও এমন দিন থাকলেও বাঁচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ছেলেরাও যেন অন্ততঃ মানুষ হ'য়ে এমনি দিনও কাটিয়ে যেতে পারে।

—কক্ষণো নয়, আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলেদের কখনও এই চাকরির ফাঁসী-কাঠে গলা ঝুলোতে দেবো না —তা তুমি দেখে নিও।

এই কথাগুলি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে রতন মামা রীতিমত উত্তেজিত হ'য়ে উঠতেন। তাঁর এই উত্তেজনার প্রকৃত অর্থ আমি তখন অনুধাবন করতে পারতাম না।

রতন মামা আমাকে উপদেশ দিতেন, ভিক্ষে ক'রে খাবে, তবুও কেরাণীগিরি ক'রো না সত্যেন!

তাঁর উপদেশ আমার কাছে পাগলামিরই রূপান্তর ব'লে বোধ হ'ত। আবার এও ভাবতাম, মানুষ নিজের অবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট নয়।

রতন মামার উপদেশ এবং নীতি আমার জীবনে আমি গ্রহণ ক'রতে পারি নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারণ ক'রে আর একবার তাঁর কাছে চাকরীর উমেদারি ক'রতে যাই।

রতন মামা আমার শিক্ষার সাফল্যে রীতিমত আনন্দ প্রকাশ করলেন। নিজে বাজারে গিয়ে নানা ভোজ্য সামগ্রী নিয়ে এলেন। খুব ঘটা ক'রে খাওয়ালেন। আশপাশের পাড়া প্রতিবেশীদের ডেকে তিনি তাঁর শিক্ষিত ভাগ্নের পরিচয় সগর্ব্বে দিতে লাগলেন। ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিলেন, তারা যেন আমার মতন শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হয়।

মামীও কম খুশি ন'ন। মামাকে বললেন, এইবার সত্যেনের একটা চাকরি ক'রে দাও তোমার অফিসে।

মামীর একথায় মামা রুখে উঠলেন, খবরদার অমন পাপ কথা তুমি আর মুখেও এনোনা। ওর অমন ভবিষ্যৎকে নষ্ট হ'তে দিও না।

আমি বললাম, তাহ'লে কী ক'রবো?

রতন মামা বললেন, এম্-এ প'ড়বে।

—তারপর?

—তারপর প্রফেসারি।

মামার কথা শুনে বললাম, সেও তো চাকরি!

রতন মামা বললেন, হ্যাঁ, সে চাকরি নোকরী তো নয়।

আমি বললাম, মাষ্টারিও তো দরিদ্রতম বৃত্তি! ওতে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচে না। রতন মামা উত্তর দিলেন, দেহের দারিদ্র্য হয়ত ঘোচে না; কিন্তু মনের দারিদ্র্য ঘোচে।

আমি বললাম, চাকরি মাত্রই তো খারাপ কিছু নয়।

রতন মামা জবাব দিলেন, কেরাণির অশেষ জ্বালা। আমরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝি।

মামার এ নীতির কাছে কোন যুক্তি তর্কেরই স্থান নেই। অতএব তাঁর কাছ থেকে চাকরির প্রত্যাশা পরিত্যাগ করি।

কিন্তু বিহারের সরকারি দপ্তরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটি চাকরি জুটে গেল আমার। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম—বিনা তদ্বিরেই চাকরিটি হ'ল। একেই বলে হয়ত কপাল!

মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন পুত্রের এহেন সাফল্যে। ঘটা ক'রে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিলেন —কালিঘাটে পূজো পাঠালেন। আত্মীয়-স্বজনের মাঝে

সকলেই সুখী আমার এ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে। এতখানি আনন্দ তাঁরা আমার পরীক্ষার সুফল প্রকাশেও পাননি।

রতনমামা কিন্তু খুশি হ'তে পারলেন না, আত্মহত্যা ক'রলে হে সত্যেন।

মামী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। স্বামীর কথার প্রতিবাদ জানিয়ে ব'ললেন, তোমার কথার যেন কোন ছিরি নেই। আনন্দের দিনে কোথায় ওকে উৎসাহ দেবে তা নয় যত আপদ-বিপদের কথা ব'লছো।

রতনমামা দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন, সত্যেনের পর অনেক ভরসা ক'রেছিলাম কিনা তাই। ওর মধ্যেই আমার আদর্শের ছবি দেখতে চেয়েছিলাম।

মামী ব'ললেন, এতো আর তোমাদের মত হা-ঘরে অফিসের চাকরি নয়। গভর্ণমেণ্টের পাকা চাকরি—পেন্‌সন পাবে।

তবুও রতনমামা খুশি হলেন না। যতই হোক্, সেই কেরাণীগিরি তো। কেরাণিদের আবার জাত আছে নাকি?

মামী গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, জাত আছে কিনা দেখে এসোগে আমার বাপের বাড়িতে। সরকারি চাকরির দৌলতে ঘরে হাতি বাঁধা।

মামী আদর ক'রে সন্দেস খাওয়ালেন। আমার এ সৌভাগ্যে তাঁর আর আনন্দের পরিসীমা নেই। পাড়া-প্রতিবেশীদের সুখবর জানাতে ছুটলেন।

রতন মামা আবার ব'ললেন, কথাটা ভেবে দেখো সত্যেন। এখনও সময় আছে।

ব'ললাম, মার অত্যন্ত ইচ্ছে। চাকরিটা কিছুদিন ক'রেই দেখিনা কেন? না পোষায় ছেড়ে দেবো।

মামা ব'ললেন, ওইটিই একেবারে ভুল ধারণা। এ হচ্ছে আফিঙের নেশা। একবার ধ'রলে আর ছাড়া যায় না।

রতন মামার একথায় মনে মনে বিরক্তই হ'য়েছিলাম।

বিহারে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় বাঙলা দেশের আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ খবর বড় একটা রাখি না। চাকরির জোয়াল কাঁধে নিয়ে ভারবাহী জীবের মতনই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করছিলাম। বোঝার ওপোর শাকের আঁটির মতন দিন দিন জীবন-সমস্যা বেড়েই চ'লেছিল। পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত সংসার রাজ-সরকারের সিনিয়র গ্রেড কেরাণির পক্ষেও পরিবহন করা এ বাজারে রীতিমত কষ্টসাধ্য, অত্যন্ত দুঃখের মাঝে স্মরণ করতাম—রতনমামাকে। তাঁর জীবন-নীতিতে তিনি বুঝেছিলেন চাকুরে জীবির অপরিসীম দুঃখ-দারিদ্র্যকে। বিশেষ ক'রে বেদনা অনুভব করতাম তখনই যখন মনুষ্যত্বের নীতি মাঝে মাঝে চাগাড় দিয়ে উঠতো।

রতনমামার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলাম। চাকরি করতে ক'রতেই হৃদ-রোগে আক্রান্ত হ'য়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহ-লীলা শেষ ক'রেছিলেন তিনি। মামার ছেলে-মেয়েরা তখনও না-বালক, না-বালিকা। বড় মেয়েটি যদিও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শিখেছে, কিন্তু বেণী দুলিয়ে তখনও সে ক্রিশ্চান স্কুলে পড়তে যায়। আর একটি মাত্র ছেলে রতনমামার অপরিণত বয়সেই খেয়াল-খুশীর কসরৎ করে—লেখা পড়ায় মোটেই মন নেই। কোলের মেয়েটি তখনও শিশু।

মামীর বাপের বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়—তাঁরাই এসে দাঁড়িয়েছেন মামার পরিবারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে।

তবুও পূর্ব্বের কৃতজ্ঞতাকে স্মরণ ক'রলাম—যখনই কোন দরকার হবে মামী, জানাতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

মামীর দু'চোখ বেয়ে বেদনাশ্রু নেমে এসেছিল।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে রতনমামার পরিবারের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাই না। সিনিয়র গ্রেড কেরাণিপদ থেকে অফিসারী লাভ ক'রে চাকরির বনিয়াদ পাকা হ'য়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাকা ইমারত আর সংসার-পরিজনে উচ্চপদস্থ অফিসার মহলে আমিও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। জীবন-নীতিতে তাই আর এখন চাকরিকে অভিশম্পাৎ জানাই নে। বিহারী সরকার থেকে বাঙলা-সরকারের দপ্তরখানায় চলে এসেছি। এখন কলকাতারই অধিবাসী।

এমন সময় একদিন গিয়েছিলাম রতনমামার বাড়ি। মামীই ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। অত্যন্ত সমাদরের

সঙ্গে মামী আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। পরিপূর্ণ ভোজ্যে আপ্যায়িত ক'রে ব'ললেন, একটা অনুরোধ জানাবো তোমায় বাবা, তুমি তো আমাদের পর নও, আর সেই ভরসাতেই বলতে সাহস পাচ্ছি। এ অনুরোধটা তোমাকে রাখতেই হবে।

মামীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—অনুরোধ কেন বলছেন, বলুন আদেশ।

মামী আমার এ বিনয়ে উৎফুল্ল হয়ে মনের কথা প্রকাশ করলেন, বড় মেয়েটার তো কোন রকমে বিয়ে দিয়েছি। ছেলেটাতো দুনিয়ার বাঁদর। এখন ছোট্ট মেয়েটার ভরসাই আমার একমাত্র সম্বল—তাও সেও আর বেশীদিন নয়। তার চাকরিটি তো যায় যায়—সে বেকার হ'য়ে পড়লে শেষ-জীবনে অনাহারে মারা পড়বো।

মামীর কথায় বেদনা অনুভব করি। কোথায় চাকরি করে আপনার ছোট মেয়ে ?

—এক সিনেমা কোম্পানীতে। কোম্পানীর অবস্থা খারাপ—একমাসের নোটিশ দিয়েছে।

—আর ছেলেটি ?

—তার কথা আর বলোনা বাবা। সারাদিন গানের মজলিশে প'ড়ে থাকে।

—কতদূর লেখা পড়া শিখেছে ?

ম্যাট্রিকও পাশ ক'রতে পারে নি।

মামীর একথায় আমি বললাম, তা আজকাল তো শুনি গান বাজনা শিখলে দু'পয়সা রোজগার হয়।

কিছু না বাবা। তারপর আবার একটা বিয়ে করেও ব'সেছে।

পাতের খাবারগুলি বিস্বাদ ঠেকতে লাগলো, আহারের থালা হতে হাত তুলে নিলাম।

মামী বাধা দিয়ে বললেন, সে কী বাবা, কতদিন বাদে এলে, এটুকু খেয়ে ফেল।

অনেক অনুনয়ের মাঝেও অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম—আর খাওয়া চলবে না মামী। বয়েসকালে খাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয় তাই না বেঁচে আছি।

মামী বললেন, কণিকাকে তা হ'লে পাঠিয়ে দেবো তোমার কাছে ?

জিজ্ঞাসা করলাম—কণিকা পড়াশুনা ক'রেছে কতদূর ?

মামী গদগদ হ'য়ে বললেন, তোমারই তো বোন—আই-এ প'ড়তে প'ড়তে চাকরীতে ঢুকেছে। এখানে দেড়শো টাকা মাইনে পায়। এ বাজারে ওই আমার সম্বল।

চাকরির কথায় হঠাৎ নাড়ির তাড়না অনুভব করি। বিশেষ ক'রে, কণিকার চাকরি—সিনেমার কোম্পানীর অফিস থেকে যাকে দেড়শো টাকা কুড়িয়ে আনতে হয় অপদার্থ ভাই-এর পরিবার এবং অসহায় বিধবা মায়ের ভরণ-পোষণের জন্তে। রতন মামার দূরদর্শিতাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর স্বকর্ণে শুনি যেন, রাজসেবায়াং নৈব চ, নৈব চ। সিনেমার কোম্পানীর চাকরি কী রাজসেবা ?

কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আর মেলে না। চাকরি শেষ ক'রে কণিকা এসে বাড়ি ঢুকলো।

মামী কন্যাকে নির্দেশ দিলেন, তোমার সত্যেন দা, প্রণাম করো কণিকা।

কঙ্কালসার চেহারায় ধূসর রঙের শাড়ি অত্যন্ত পাংশুটে, বয়সের ছাপও পড়েছে চোখের কোণে, কপোলের কুঞ্চিত রেখায় রেখায়। তবুও চোখ দুটিকে উজ্জ্বল রেখেছে কণিকা—সুর্মার কজ্জল রেখায় টানা টানা চোখ দু'টিকে আজও সুন্দর দেখায়।

কণিকা বললে, আপনার অফিসে আমাকে নিন না সত্যেন দা, টাইপের কাজ জানি। টেলিফোন অপারেটারও করেছি কিছুদিন।

কোথায় ?

সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে।

তা চাকরী গেল কেন ?

আমার কথার উত্তরে কণিকা বললে, যুদ্ধ থেমে যেতে আমাদের অফিসই উঠে গেল।

মামী দুঃখ প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, তা, আর কী যুদ্ধ লাগবে না সত্যেন ? আড়াইশো টাকা মাইনে ছিল কণিকার সে সময়।

একথার জবাব না দিয়ে কণিকাকে আশ্বাস দিলাম চাকরির। দেড়শো টাকা মাইনের নয়—তার থেকেও নিম্ন পদে নিম্ন বেতনের।

মামী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন, পাকা চাকরি তো বটে।

খুসির বন্যায় তিনি ভেসে চললেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সুখবরটা জানাতে—রক্তের সম্পর্কের চাইতেও বড় সম্পর্ক আমার সঙ্গে তাঁদের। রতন মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলিপথে যেতে যেতে আমি কিন্তু ভাবতে পারলাম না সে কথা।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মামার দরবারে যখন চাকরির জন্তে আর্জ্জি পেশ করেছিলাম, রতন মামা তখন সে-কথা কানে না নিয়ে আমাকে কলেজে পড়তে উৎসাহ দিয়েছিলেন। দরিদ্র কেরাণী প্রকাণ্ড ভরসার কথা শুনিয়েছিলেন পিতৃহীন অনাত্মীয় ভাগ্নেকে—বাপ নেই তার জন্তে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না। মামা তো তোমার এখনও বেঁচে আছে। পড়ার খরচ আমার কাছ থেকেই নিও।

আর তাঁর দুঃস্থ পরিবারকে এযুগের বড় অফিসার হয়েও সে উৎসাহের কোনো বাণী শোনাতে পারলাম না। কণিকার মেধা ছিল—পড়াশুনা করলে শিক্ষা সে লাভ করতে পারতো। চেহারাও কুশ্রী নয়, কিন্তু রাজপথে জীবন-সংগ্রামে চেহারার আর সে জৌলুষ নেই। রতন মামার মৃত্যুশোক আজ নতুন করে উপলব্ধি করলাম মধ্যবিত্তের জীবন-সমস্তায়।

★

স্বপ্ন-সুন্দর-আমি

মৃণালকান্তি দাশ

সবুজ সোনালী নীল বিচিত্র রঙিন—
যেন রঙ্গিনী নাচে রামধনু লয়ে
সোনার হরিণ শিশু চোখে বুকে তার
উঁকি দেয় ডেকে যায় আবার মিলায়।

সবুজ ঘাসের শিষে কনক কুসুম
মন আননে শোভা আর স্বাতীর প্রদীপ
এক নয়—দুই নয়—তিন নয় অজস্র দীপ
ময়ূরের পেখমের মত যেন প্রথম স্বপন।

সুন্দর লোভাকর মনোহর মোহন মোহিনী
বাসক শয্যা তার ভেতরে বাহিরে;
মেহেদির স্নিগ্ধ সুবাসে ললিত
লবঙ্গ লতিকায় মন্দ সমীর।

কুন্তল আকাশের কাঁদো কাঁদো মেঘ
রং তার দেহটার একখানি নদী ধরাশর
স্তন;
সম্মানে নারিকেল শিশুর মতন
আহা কি রূপের নেশা মন মৌতাত।

মোহ গেল ঘুম গেল
ঝরে গেল শেফালী বকুল,
ডাহুকের মত হোল জীবনের সুপ্ত অভিযান
স্বপনের রাজপরী ডানার ঝাঁপটে তার
মুছে নিয়ে গেল হায়!
দিবসের শেষ আলোটুকু;
আজ ঘাটে ঘাটে যাওয়া
হাল ভাঙ্গা পাল ছেড়া তরীর মতন।

উত্তর-দক্ষিণী সংস্কৃতি এবং বাঙালী-সংস্কৃতি

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার 'Discovery of India' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ হিন্দুস্থানের হৃদয়—প্রাচীন মধ্যযুগীয় সভ্যতার কেন্দ্র। যুক্ত প্রদেশ ভারতের প্রতীক। এটী হিন্দু কৃষ্টি এবং আফগান ও মোগলযুগের পারসিক সংস্কৃতির কেন্দ্র—আর তাই দুইয়ের মিলন হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে। ভারতের অন্যান্য যায়গার তুলনায় প্রাদেশিকতা এখানে কম।"

প্রাদেশিকতার অর্থ স্বীয় বাসভূমির প্রতি অন্ধ অনুরক্তি এক শ্রেষ্ঠত্বের অন্ধধারণাই বুঝায়, তবে নেহরুজীর এই উক্তি তাঁহাকেই অন্ধ প্রাদেশিক বলিয়া প্রমাণিত করিবে। লেখনীর ফাঁক দিয়া তাঁহার অবচেতন মনটীর পরিচয় ধরা পড়িয়াছে।

"প্রাদেশিকতা" শব্দটী বহুদিনের সৃষ্টি নয়। ভারতবর্ষ সমগ্রভাবে এখনও দেশকেন্দ্রিক হইতে পারে নাই। ইহার কোন কোন প্রদেশে দেশাত্মবোধ বিকশিত হইতেছে, কোথারও বা ইহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। বিগত তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে ইহার অধিকাংশ প্রদেশগুলিতেই পারিবারিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সামাজিকস্তর অতিক্রান্ত হয় নাই; দেশকেন্দ্রিক সভ্যতা গঠিত হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

"প্রাদেশিকতা" দেশকেন্দ্রিক সমাজের সৃষ্টি। ভাষাগত বৈষম্য, আচারগত বৈশিষ্ট্য; কুলগত পার্থক্য—ইহাই ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহের এবং ক্ষমতাদ্বন্দ্বের কারণ। এক প্রদেশের লোক বা এক গোষ্ঠীর লোক অন্যের অধিকারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় কুলগত বৈশিষ্ট্য অন্য কুলের উপর প্রয়োগ করিয়া স্বীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহারই ফলে বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদের অচলায়তনের সৃষ্টি।

দেশগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইয়াছে বাংলায়। বাংলাতে দেশকেন্দ্রিক হইবার উপকরণ প্রচুর ছিল। সেই জন্যই বাংলার যৌথপল্লী সমাজ গঠিত হয় নাই। বাংলার একত্ব কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের সমাবেশে সংগঠিত হয় নাই। বাংলার মাটীর প্রতি আসক্তিই বাঙালীর একত্ব প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ। সমস্ত জাতিবর্ণের বৈষম্য বাঙালী তাহার ভাষার একত্বে সমাহিত করিয়া এক সমবেদনার "বাঙালী জাতি" গঠিত করিতে পারিয়াছিল।

হু'এন সাঙ, ৭ম শতাব্দীতে আসিয়া বাংলার সর্বত্রই একভাষা দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই কোন একটী ধর্ম বা মতবাদ তাহার নিজস্ব দেশকেন্দ্রিক সভ্যতাকে অতিক্রম করিয়া কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উচ্চ আসন দেয় নাই। বাঙালী, তাই অসাম্প্রদায়িক। অযোধ্যা ও যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিকতা আধুনিক। দেশকেন্দ্রিক সমাজগঠনের উপকরণের এখানে অভাব ছিল। যুক্তপ্রদেশে কত শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গেল—ভাষার মিলন হইল না। একই প্রদেশে জানপদ, জয়পুরী, পশ্চিমাহিন্দী, কনোজী বুন্দেলী কোশলী, উর্দ্দু প্রভৃতি স্পষ্টতর পৃথক ভাষা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত। এখানে সাংস্কৃতিক মিলন হয় নাই। —এই প্রদেশ চিরদ্বন্দ্বের ঝগড়াকুঠী। এখানে দিল্লীর লাডডুর লোভে আর্য্য, শক, হুণ, আফগান এবং মোগল পরস্পর মানবতার উপর চরম নিষ্ঠুরতার অভিযান পরিচালনা করিয়া পরস্পরের উপরের বর্ব্বরতার আঘাত হানিয়া একে আরকে অপসারিত করিয়াছে। কোন সংস্কৃতিই কাহাকে হজম করিতে পারে নাই; ইহা অজীর্ণ সভ্যতার স্মরণ মন্দির, মিউজিয়াম। ইহার কারণ এই প্রদেশ গোষ্ঠী ও কৌমধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহার সমাজ দেশকেন্দ্রিক হইতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় উক্ত পশ্চিমী সভ্যতা বা আর্য্য সভ্যতার গোষ্ঠীচেতনার সংস্কৃতির পথ ধরিয়া চলিতেছে। ইহার যৌথ পল্লীসমাজ, ইহার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা

এবং ব্যক্তিচেতনার দারিদ্র্যই তাহার প্রমাণ। দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত এখানে হিন্দু-মুসলমানের বাস বিনিময় হইয়া গেল। বাংলায় ইহা হয় নাই। বাঙলায় যে নিষ্ঠুরতার অভিনয় হইয়াছে তাহাতে বাঙালী মুসলমানের বড় হাত ছিল না। যতটা ছিল রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের চাল, যাহারা অধিকাংশই ছিল অবাঙালী। অর্থনৈতিক কারণটিও লুণ্ঠন ইত্যাদির অন্তর্নিহিত কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুসলমান বাঙালী হিন্দু বাঙালীকে আন্তরিক ভাবেই পূর্ব্ব বাংলা হইতে আসিতে দিতে চাহে নাই বা এখনো চাহে না।

প্রাদেশিকতাই স্বাদেশিকতার জন্মদাতা

বাঙালী বহুকালের প্রাদেশিক। বাঙালী তাহার নদীমেখলা, শস্যশ্যামলা দেশকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। এই প্রাদেশিকতাই তাহার দেশকেন্দ্রিক সভ্যতার বুনিয়াদ। ইহাতে দোষ কিছুই নাই। সে অন্ধপ্রাদেশিক নহে। বাঙালী প্রাদেশিক কিন্তু মানবিক। বাঙালী উদার, অসাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিচেতনার রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের আস্বাদনে অপূর্ব্বরূপে সজীব ও স্বাভাবিক। তাহার প্রাদেশিকতাই তাহাকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছে। এই প্রাদেশিকতাই তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ধ কুসংস্কারের জটিল বন্ধনের কঠোর শাসনের জাল হইতে মুক্ত করিয়া অগ্রগতির প্রেরণা দিয়াছে। বাঙালী বাউলেরই কথা,

> "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।"

গোষ্ঠীসভ্যতার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে দেশকেন্দ্রিক সমাজ গঠন করা যায় না। উত্তরপশ্চিমী সংস্কৃতি এই জন্যই দেশকেন্দ্রিক বা স্বদেশ প্রেমমূলক নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপ এই গোষ্ঠী বা কুলগত চেতনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তারপর সামন্ততন্ত্রের কবল হইতে মুক্তি আসিল দেশ-কেন্দ্রিক চেতনার। শিল্প সভ্যতা ইউরোপের পারিবারিক গোষ্ঠীর এবং সামন্ততান্ত্রিক গণ্ডী ভাঙিয়া চুরিয়া সামাজিক বৈষম্যের বন্ধনে কুঠারাঘাত করিবার ফলেই দেশকেন্দ্রিক সমাজ উদ্ভব হইতে পারিয়াছিল। তাই ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে জাতিকে, দেশকে সকল ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে দেশকেন্দ্রিক সমাজ ও জাতি গঠিত হইতে পারে না।

মানবসমাজ, পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে দেশ-কেন্দ্রিক হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া বিবর্ত্তন অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্বামীজির বাণী ইহারই সার্থকতা ঘোষণা করে, "Expansion is life and Contraction is death."

বর্ত্তমান যুগে, এই শিল্পবিজ্ঞানের জন্যই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, রোমান প্রটেষ্ট্যান্ট, সিয়াসুন্নি, আর্য্য ও অনার্য্য প্রভৃতির কৌল সম্বন্ধের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য-বিদ্বেষ দূরীভূত হইবার বেশী বিলম্ব নাই—ইহা স্বভাবের নিয়মেই অগ্রসর হইতেছে। এই স্বভাবের অব্যর্থ গতিতে পুরাতন গোষ্ঠীসভ্যতা অপসারিত হইবে অবাঙালী সমস্ত প্রদেশেই—এবং এই অগ্রগতির নেতৃত্ব দেশকেন্দ্রিক বাঙালীরই। নেহরুজীর যুক্তপ্রদেশ এই ব্যাপারে বহু পশ্চাৎবর্ত্তী।

উত্তর পশ্চিমী সংস্কৃতি

যুক্তপ্রদেশ উত্তর পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্তর্গত। এই সংস্কৃতি বর্ত্তমানে প্রধানতঃ আর্য্য প্রভাবান্বিত। নিম্নে এই সংস্কৃতির রূপ সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "বাঙলা ও বাঙালী" হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম :—

"উত্তর ভারতের সমাজ স্থাণু, তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিকারহীন, উত্তরাপথ হইতে আর্য্য, শক, তুর্ক, হুণ, যুগের উপর যুগ নদী-পথ ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রবাহের মত গ্রামের উপর ঝঞ্ঝা ও অশনি বর্ষণ করিয়াছে।......কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে সনাতন সভ্যতার প্রতিক্রিয়ায় তাহারা হীনবীর্য্য ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে এবং পরবর্ত্তী যুগে দেশীয় সমাজ ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কতিপয় রাজধানীর ইতিহাস রাজন্যবর্গের জয়পরাজয়ে চঞ্চল ও বেদনাময়, কিন্তু পল্লীসমাজ একেবারে নির্ব্বিকার ও

অনাসক্ত। ... কিন্তু চারিদিকের পল্লীসমাজ ও সভ্যতা দিল্লীর বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল ইতিহাসের চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হয় নাই। উত্তর ভারতের উদারভূমিতে সমাজ শাসনে শিথিলতা দেখি না। গঙ্গার প্রবাহে বাংলা দেশে কত নগরনগরী ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু কাশীর স্থান-মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। অটুট পাথরের উপর যেমন কাশী শতযুগের শত বন্যার মধ্যে অচল অটল, তেমনি উত্তর ভারতের সমাজ ধর্ম্ম ও সমাজ শাসন আজও শত বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে নির্ব্বিকার।"

উত্তর পশ্চিমী সংস্কৃতি শত শতাব্দীর সান্নিধ্য সত্ত্বেও পূর্ব্বীয় ও দক্ষিণী-সংস্কৃতির সহিত সম্মিলিত ঐক্য গঠন করিতে পারে নাই। উত্তর পশ্চিম ভারতের বেশ-ভূষা, বাসগৃহ নির্ম্মাণ, ক্রীড়া, বিবাহ, মৃত সৎকার, সামাজিক উৎসব ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের শিরস্ত্রাণ, ইহাদের টিকি, ইহাদের নিরামিষ আহার, ইহাদের রামোপাসনা, ইহাদের ডালরুটী ও সামান্য তরকারী খাদ্য, ইহাদের বস্ত্র পরিধানের কৌশল, ইহাদের দীর্ঘ আকৃতি, নাসিকা ও কপালের গঠন, ইহাদের মৃত সৎকারের সময় রামনাম উচ্চারণ, ইহাদের উত্তরাধিকারের মিতাক্ষরার যৌথ পল্লীপ্রথা, সর্ব্বোপরি স্থায়ু ও অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন সমাজ-প্রথা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বন্ধনের পরিপন্থী।

অনার্য্য সংস্কৃতি

দক্ষিণী সংস্কৃতি ও পূর্ব্বীয় সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। দক্ষিণে ও পূর্ব্বের মিলনের কথা অনেকাংশে আশাপ্রদ। ভারতের আদিম অধিবাসী অষ্ট্রিক জাতি এবং দ্রাবিড় জাতি। ইহারা একই অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি-ভুক্ত। যাযাবর আর্য্যজাতির আক্রমণে এই দুই জাতি উত্তর ভারত হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অপসারিত হইয়া প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কালক্রমে ইহাদের উন্নততর সভ্যতার সহিত আর্য্যগণ আস্তে আস্তে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষি সভ্যতা সমুন্নত; কৃষি সমাজের প্রভাবে আর্য্যগণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়া অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় দেবদেবী, ভাষা, সামাজিক প্রথা গ্রহণ করে। আদিম দেব দেবীর মধ্যে শিব, গণেশ, কালী, শীতলা, মনসার পূজা আর্য্য-গণের মধ্যে গভীর ভাবেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঋক অথর্ব্ব বেদের ভাষাই আর্য্যগণের ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে উপনিষদের ভাষার বহু পার্থক্য। পৈশাচ, মহারাষ্ট্রীয়, শৌরসেনী ও মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা হইতেই প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব। এই কয়টী ভাষা ব্যতীত অপভ্রংশ ভাষা প্রতি প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। এই অপভ্রংশ ভাষাই মূল প্রাদেশিক ভাষা। এই ভাষা আর্য্য ভাষার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আর্য্য ভাষার প্রধান প্রধান শব্দের সহিত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার (প্রাদেশিক ভাষার) শব্দ ও ধাতুর মিলনেই ঔপনিষদী ভাষার সৃষ্টি। ঔপনিষদী ভাষা বিশুদ্ধ আর্য্যভাষা নহে। ইহা আর্য্য অনার্য্যের উভয়ের মিলিত ভাষা। উপনিষদের ঋষিরাও উভয় সংস্কৃতির সন্ধিস্থল অধিকার করিয়া আছে। পরবর্ত্তীকালে সর্ব্ব ভারতীয় সংস্কৃতি গঠনের কার্য্যে রাম, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, জন্মেজয়, চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক প্রভৃতি সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া এবং পাণিনির অভ্যুদয়ে সংস্কৃত ভাষার জন্ম লাভ হয়। উপনিষদে আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতির বিরোধের সুন্দর সুন্দর আখ্যান আছে; ইহা হইতেই উভয়ের মিলনেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনের পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে উপনিষদ হইতে তন্ত্রান্তর সাহিত্য দর্শনে আর্য্যামির গৌরব অপেক্ষা সমুন্নত অনার্য্যের প্রভাবই বেশী প্রামাণিত হয়। প্রত্যেকটী প্রাদেশিক ভাষায় দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক শব্দ অবিকৃতভাবে বিরাজ করিতেছে। অমরকোষ ও পাণিনি দেখিয়া যে সকল পণ্ডিত আর্য্য ভাষার প্রভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহারা অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নাই বলিয়াই অনার্য্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্তমত স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে এই সমস্ত মতের খণ্ডন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যতই অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা-গুলি সম্বন্ধে গবেষণা হইবে ততই এই সত্যের প্রমাণ উদ্‌ঘাটিত হইবে।

দক্ষিণী সংস্কৃতি

সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রাদেশিক ভাষার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য দূর করা সম্ভব হয় নাই। গুপ্তযুগের পূর্ব্ব হইতেই প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়া কাব্য ও সাহিত্য রচনা আরম্ভ হইয়াছিল।

এই দ্রাবিড়ী সভ্যতা বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্রাবিড়ী সমাজে বিভক্ত থাকায় ইহারা ভিন্ন ভাষাভাষী। অন্ধ্র, তেলেগু, দ্রাবিড়ী, মালায়ালম, কানাড়ী প্রভৃতি ইহাদের ভাষা। ইহারা বেশ, আহার, সামাজিক রীতিতে উত্তরপশ্চিমী সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সংস্কৃতিসম্পন্ন। এই বিষয়ে ইহারা বাঙালীর সহিত সম্পর্কযুক্ত। ধর্ম্মের প্রচার ও ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদানের ব্যপদেশে ইহাদের সহিত বাঙালীদের বেশী সংমিশ্রণ হইয়াছে।

ইহাদের সহিত রক্তগত সম্পর্ক থাকায় রাঢ়ী বাঙালীর সহিত আকৃতিতেও ইহাদের মিল আছে। নিম্নে ক্ষিতিমোহন সেনের "বাংলার সাধনা" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদের দেশের ধর্ম্মে ও আচারে এমন বহু জিনিষ আছে যা' দ্রাবিড় আচারের সঙ্গেই মেলে। বাংলাদেশের ঘরবাড়ীর সংস্থান উত্তর প্রদেশের সংস্থানের সঙ্গে মেলে না। বরং, তা মেলে কেবল কোচিন প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে। বাড়ীর চতুঃসীমা মধ্যেই তার দিঘী পুষ্করিণী, নিজেদের জমিতে তাদের চিতা রচনা করতে হয়। আমাদের জাতাচার, মৃতাচার, বিবাহ আচার, মঙ্গল অমঙ্গল, সুযাত্রা অযাত্রা প্রভৃতি অনেক সংস্কারই মেলে দক্ষিণের সঙ্গে। তাঁদের মতই আমরা উঠানে অস্থায়ী আঁতুড়ঘর বাঁধি। আতুঋতুতে মেয়েদের আচার ও ঋতুকালে মেয়েরা যে নিয়ম পালন করে তাও এই দেশের মত। ধোপার হাতে বস্ত্র না দিলে তখন তাহা শুদ্ধ হয় না। বিধবাদের আচারও অনেকটা একই রকম। কনের বাড়ীতে বর বিবাহমাঙ্গলী পাঠায়। কলাতলায় বর কন্যা পুকুর খেলা করে। এ সবই দক্ষিণী আচার। উত্তর ভারতে ফলিত জ্যোতিষে সর্ব্বত্রই বিংশোত্তরী গণনা; বাংলাদেশে অষ্টোত্তরী।

বাংলা ছাড়া আর কোথাও উলুধ্বনি শুনি নি; কিন্তু দক্ষিণে নায়ার প্রভৃতি জাতির মধ্যে তা আছে। আয়ুর্ব্বেদ ও রসশাস্ত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় কেরলাদি ভূভাগ।

বাঙালী সংস্কৃতি

বাংলায় গোষ্ঠীধর্ম্মের অচলায়তন বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়াছে। বাংলা নদীমাতৃক-দেশ। এখানে তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অনার্য্য কৃষিশিল্প সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশে কৃষিজমি পূর্ব্বকাল হইতেই মূলধনের মতই বিনিময়যোগ্য ছিল। কৃষিজমি উত্তরাধিকারী সূত্রে ও ব্যক্তিগত হস্তান্তরযোগ্য এবং দান বিক্রয় করার যোগ্য ছিল। একালের দায়ভাগে সম্পত্তির মালিক সম্পত্তি সম্বন্ধে দান বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকারী। সুতরাং সম্পত্তির সাথে সাথেই সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া চুড়িয়া দুর্দ্দান্ত পদ্মার মত ধনীকে দরিদ্র ও দরিদ্রকে ধনী করিয়া আবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীলতাই বাংলার বৈশিষ্ট্য, ইহার জন্যই উত্তর পশ্চিমী সভ্যতার পার্থক্য এত বেশী। বাঙালীর বেশভূষা, আকৃতি, আহার, চিন্তাধারা উত্তর ভারতীয় ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বাঙালীর আহার ভাত মাছ, রসোগোল্লা সন্দেশ, মুড়ি, পায়স, পিঠা, ইহা অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিভিন্ন। বাঙালীর উষ্ণীষ ব্যবহার নাই, টিকি নাই।

বাঙালীর বেশ ধুতি-চাদর—এই ধুতি-চাদর পরিধানের ধারাটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পৃথক; বিশেষ মহিলাদের কোমরের খুটটি দেওয়াও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে পৃথক। বাঙালীর দেবতা প্রধানতঃ মাতৃস্থানীয়া—কালী, মনসা, শীতলা ইত্যাদি। বাঙালীর সাধনার পদ্ধতি নিরস নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করে না। বাৎসল্য, সন্তানভাব, সখ্য, দাস্য ও মধুর ভাবের রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দে, প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাঙালী মাতোয়ারা। শুষ্কজ্ঞানবাদ ও এখানকার ত্যাগদৃপ্ত সন্ন্যাসীর মুখে, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" বাঙালীর চিত্তবৃত্তির পরিচয় দোঁহা, চর্য্যাপদ, বাউল গান, পদাবলীর মধ্যে। বাংলার আদি সভ্যতার শৈব ও তান্ত্রিক মত পাহুড দোঁহায় জৈনমত, মহাজন বৌদ্ধমত, সহজিয়া বাউলমত,

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব মত এবং বিংশশতাব্দীর দেশজননীর অর্চ্চনার স্বদেশী মত বাঙালীকে চিত্তবৃত্তির সম্পদে অতুল ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিয়াছে। পৃথিবীতে ইহার তুলনা নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা তো দূরের কথা।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষের "বাঙ্গালী" হইতে নিয়ে একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম :

"বাঙালীর ব্যক্তিত্ববোধ ও মানবিকতার মূল্য বোধ তার মনকে করেছে উত্তর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হতে পৃথক ; তাই তার পারিবারিক জীবন, ব্যবহার শাস্ত্র, সমাজনীতি, কর্ম্মপদ্ধতি ও সাধনা আর্য্যপদ্ধতি হতে বহুধা ভিন্ন। উত্তর ভারতের সমাজে একটা সনাতন ধারা রয়েছে, বাংলার মত নমনীয়তা ও পরিবর্ত্তনশীলতা নাই। বাংলার সমতল ভূমিতে রাজনৈতিক যুগবিপ্লব বাধা পায় নাই ; অভিযানের প্রতি বেতসবৃত্তি অবলম্বন করে বাঙালী নিজের সমাজে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন চালিয়ে গেছে। উত্তর ভারতের বড় বড় সহরগুলিতে বিপর্য্যয় হয়েছে ; কিন্তু গ্রাম্যজীবনে বিকার হয় নাই। বন্ধুর, কঠিন, উদাসীন, অনাসক্ত প্রকৃতি বার বার বাধা দিয়েছে, প্রতিরোধ করেছে নূতন আন্দোলনকে। সাময়িক আলোড়ন স্তব্ধ হয়েছে সনাতনী প্রতিক্রিয়ার সমাধিতে।"

শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের লেখা হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"বাংলাদেশের আর একটী বিশেষত্ব হচ্ছে সুকুমার সূক্ষ্মত্ব বোধ। যে দরদী হাতে মসলিন সুতোর সৃষ্টি, সেই হাতে বাংলায় বহু সুকুমার শিল্প গড়ে উঠেছে। মাধুর্য্যের সঙ্গে এদেশের চিরযোগ। সে ভাল বেনে না হ'তে পারে কিন্তু তার দেশ বিস্তৃত বলে তার দৃষ্টি উদার হ'বারই কথা। বাংলাদেশ যে দেবভূমি নয়—এদেশ মানবের দেশ—বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে।"

বাংলার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কারণ বাংলার নাতিশীতোষ্ণ পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়া এবং পরিবর্ত্তনশীল গঙ্গাব্রহ্মপুত্রের পলিপড়া "ব" প্রদেশ। এই পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশ বাংলার মনের উপর অচলায়তনের আবরণ মোচন করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য দ্রাবিড় অষ্ট্রিক অধ্যুষিত সভ্যতার বাহক বাঙালী আর্য্যসভ্যতা পরিপাক করিয়া নিজস্ব করিয়াও নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। অন্য প্রদেশ আর্য্যসভ্যতার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে এমন কি দক্ষিণ প্রদেশীয় দ্রাবিড় তাহার নিজস্ব আদিম সহজধর্ম্ম ও চিন্তাধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—রাখিয়াছে শুধু ভাষার পার্থক্য। বাংলা আর্য্যভাষার সৌধ নিজস্ব মৌলিক ভাষার বুনিয়াদের উপর গড়িয়াছে সাহিত্যের দরদী মর্ম্মকথা। সেই উপলব্ধি, সেই তত্ত্ব দিয়াছে আর্য্যসভ্যতাকে নূতন জীবন।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের "বাঙালীর সাধনা" হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

"আর্য্যেরা এলেন উত্তর পশ্চিমভারতে ; তাই আর্য্য পূর্ব্ব সংস্কৃতিকে সরতে হল হয় পূর্ব্বদিকে নয় দক্ষিণে। পূর্ব্বদেশে আর্য্যপূর্ব্ব বহু সংস্কৃতি এসে স্থান পেল। সেই গুলি পরে জৈন ধর্ম্মের সঙ্গে মিশে গেল এবং পাহুড় দোঁহা প্রভৃতি মরমী মতবাদের সৃষ্টি হ'ল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে দেখা গেল, মানুষই সব দেহেই বিশ্বচরাচর। প্রেমেই সাধনা, দেহকর্ষণ ব্যর্থ, কায়া যোগই সাধনীয়, বাহ্য দেবতা মন্দির পূজা সবই ব্যর্থ, বাহ্য আচার সম্প্রদায় সবই নিষ্ফল। এসব মতবাদ বেশী করে ছিল বাংলা দেশেই। ভূমির সঙ্গে যোগ থাকায় এর জোর ছিল এত বেশী যে এরই প্রভাবে ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম হইল উপনিষদের কায়াযোগী প্রাকৃতধর্ম্ম। জৈন মতের ক্রমে পরিণতি হ'ল সেই জাতীয় পাহুড় দোঁহা প্রভৃতি মন্তে। বৌদ্ধ মতের সঙ্গে এই মত মিলে হ'ল মহাযান বজ্রযান প্রভৃতি সম্প্রদায়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে বাঙালী চিরদিনই অগ্রাহ্য করিয়াছে। বাঙালীর কৃষ্টি চিরবিবর্ত্তনশীল—বাঙালী সেজন্য মানবিকতার মাধুর্য্যে ভরা—বাঙালী সেই জন্যই চিরবিদ্রোহী।"

বাংলার বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক অচলায়তনের বাঁধ ভাঙিয়া যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিলেন রামমোহন, বিবেকানন্দ আর উত্তর পশ্চিমে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অচলায়তন পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন স্বামী দয়ানন্দ। বেদ বিরোধী বলিয়া বাঙালীকে পক্ষী ব্রাত্য বলিয়া আর্য্যগণ নিন্দা করিত। বাঙালীর সঙ্গে উত্তর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক সূত্রে কোন সমন্বয় সম্ভব হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র ও কান্যকুব্জের হর্ষবর্দ্ধন বা গুপ্ত সম্রাটেরা বাংলাকে আক্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলা পদানত হয় নাই। সাময়িক প্রাধান্যকে উৎক্ষিপ্ত করিতে বাঙালীর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। বাঙলার মাটীর সহিত যোগ নাই, এমন রাজার প্রাধান্য বাঙালী সহ্য করে নাই। মুসলমান আমলেও ইলিয়াস, গণেশ হোসেন, প্রতাপ কেদার, ঈশাখাঁ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই। মোগল আমলেও বাঙালী প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর অধীন ছিল না। ইংরাজ আমলে দিল্লীই বাংলার অধীন ছিল এবং বাঙালীই সমস্ত ভারতের মধ্যে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৈদেশিক ইংরাজের শাসন উৎক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টা বাঙালীরই প্রথমাবধি ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাঙালীর জন্যই ইংরাজ বিতাড়িত হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বৌদ্ধধর্ম্মকে সমর্থন করা, আবার বৌদ্ধধর্ম্ম যখন রাজধর্ম্মরূপে সাম্রাজ্যিক হইয়া পড়িল, তখন মহাযানরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নূতন অভ্যুত্থান এই বিদ্রোহী বাংলাদেশেই হয়। তারপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাসে যখন বাঙালীর সামাজিক দুর্নীতি বা বাঁধা নিষেধের বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গেল, তখনও বাঙালীর এই বৈপ্লবিক কৃষ্টির পরিচয়। বাঙালীর অধিক সংখ্যায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের মধ্যেও সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের বিদ্রোহী মনস্তত্ত্বের মূল এইরূপে বাঙালীর শতশতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাস।

★

নির্জন নীল

শ্রীকৃষ্ণ দাশ

এ শাল অরণ্যদেহ শাখা-প্রশাখায় নীলনির্জন
মমতায় ছলছল রৌদ্র আঁকে।
উষ্ণ আলগোছে পৃথিবীর ঘ্রাণ পাই,
অনেক ইচ্ছে যায় গাছেদের ভীড়ে তলিয়ে ঘুমাই—
এখানে নগর নেই, নাগরিকজন, ব্যস্ততা, পথঘাট—
শুধু মুখর নির্জন মেলে অরণ্য ছেয়ে আছে
ডালপালা সমীচীন উপকথা মাখা।

আমার হৃদয় পুনর্বার বিস্ময় পায়
অরণ্যের আনন্দ ভাষায়।
মনে হয় কতোদিন আগেকার স্মৃতির উজ্জ্বল,
এ অরণ্য চেনে—জানে তার যৌবনের গান,
যে গান অনেক সময় নীলাঞ্জন ঋতুদের মাসে
পৃথিবীতে নীড় খুঁজে শরীর বিছায়।

অরণ্য কি কথা কয় যারা যারা জানে ;
তারা জানে এখানে প্রকৃতি নারীর কিছু ভালোবাসা দ্বীপ হয়ে আছে
অনায়াস তার সেই ভালোবাসা মায়াবিনী মুখের মতন—
বিকেলের অগণিত রঙের আলোয়।

নগরের প্রলাপে যখন স্নায়ুর অস্থির বাজে দিনের কার্ণিসে
যখন নরমমন গভীর চৈতন্যে ডুবে ভীরুতর হয়,
তখন অরণ্য ডাকে জীবনের আনাচে-কানাচে,
পৃথিবীর দিকে মুছে—
দুরারোহ জীবনের ছাদ থেকে আকাশের মাঠে।

টুসু

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সাঁওতাল জাত মিথ্যা বলে না।

সেই যে আসনবনির সভায় অতুল ঘোষের কাছে কাঁড় ছুঁইয়া বুড়ো হাড়োয়া মাঝি প্রতিজ্ঞা করিল—টুসু গান গাহনা ছোড়বো না—সেই প্রতিজ্ঞায় তারা অটল রহিল। টুসু আসলে বিহারের লোকসংগীত, কিন্তু মানভূম, সিংভূমের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির কি যোগ আছে টুসু তা' বেশ বুঝাইয়া দিল দুনিয়ার লোককে। কী অত্যাচার যাইতেছে তাদের উপর কিছুদিন হইতে! বিহারী পুলিশের লাঠিবাজিতেও তারা দমিতেছে না। আজ দলবল লিয়া হাড়োয়া মাঝি গানের মহড়া দিতেছে অসনবনির পাহাড়ের বনে। কাল সদলে তারা মানভূমে যাইবে। প্রধান গাইয়ে সাধুয়া গোঁসাইয়ের হাতে আছে একটি টুইলা। টুইলাকে একতারা বলা যায়। কিন্তু বেহালার মতো ছড় নিয়া সেই তারটার উপর টান দিয়া বাজাইতে হয়। বুকের উপর নিয়া লাউয়ের শুকনো খোলে বাঁধা তারযন্ত্রে বেশ আওয়াজ ওঠে।

সাধুয়া গোঁসাই গাহিল—

টুসু হামারে কী বাত শুনাইলে ?
'লাবণপোরভা' জেহেলে কেনো গেলো—
'অতুলঘোষে' লাঠ্ঠি কে মারিলো ?
'কিষণ' মারে 'ঘোষ'কে লাঠ্ঠি—
টুইলা, কেমোন ধারা হইলো রে—
কেমোন ধারা হইলো।

জোরে জোরে মাদল বাজিল। পাহাড় টিলা দুড়দুড় করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মেয়ে পুরুষ নাচিতেছে ক্ষেপে উদ্দীপনায়। তাই এটাকে ঝুমুর নাচ বলা চলে না। ওদিকে বিহারী পুলিশগুলোও ঝাপটি মারিয়া লুকাইয়া ছিল। গাছে লাঠি ঠুকিয়া তারা ভয় দেখাইতেছে। কাছে আসিতে সাহস করিতেছে না। কারণ দলে ভারি এই সাঁওতালরা। বিশেষ করিয়া সাঁওতালরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। হাজার হোক বেতনভুক চাকর তো—এই বিহারী পুলিশগুলো। সাঁওতাল সর্দ্দারের কাঁড় যে কি বস্তু তাহার পরিচয় রাখে তারা।

আমাদের সেকালের লোক-সংগীত কবির গান, কথকতা, তরজার লড়াইয়ের মধ্যে সময়োচিত ঘটনার ছবি থাকিত, শ্লেষ থাকিত, চাবুক থাকিত। উপরের কয়েক লাইন টুসুর গানেও মানভূমের সাম্প্রতিক রাজনীতির একটি স্পষ্ট ছবি আছে, কড়া চাবুকও আছে। একেবারে রাজগদীর মালিক 'কিষণকে'ও বাদ দেয় নাই। রসিকতাও আছে, 'কিষণ মারে ঘোষকে লাঠি'—এই উক্তিতে যে কৃষ্ণ ঘোষদের কোলে মানুষ হইলেন, তিনিই রাজগদি পাইয়া এখন ঘোষকে প্রচার দিতেছেন—ইহা কেমন ধারা হইল।

মাদলের বাজনা থামিল, আবার টুইলার মিহি সুর উঠিল, গোঁসাই গান ধরিল—

হামি বিহার বুলি লিব না—
বাংলা বুলি ছাড়বো না।
মানভূম, সিঙভূম—
বাজা মাদল ডুম-ডুম।
বাজা ঝাঁঝ, বাজা বাঁশি
টুইলা করো টুমটুম্‌।
হামরা হরবা ক্ষেতে নাচি—
বাঙলা মায়ীর বুকে নাচি।
মায়ের সোনার ক্ষেতের ফসল খেয়ে
হামরা বেঁচে আছি।
হামরা বিহারী না হইবো টুসু,
বিহারী না হইলো।
—টুসু হামারে কী তু শুনাইলো ?

কিন্তু মাদলের শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল সর্দ্দারের উচ্চ শব্দে। বিপক্ষেরা পাহাড়ের একটা দিকে শুকনো পাতায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। হাওয়া পাইয়া আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আগুন কাছে আসিয়া পড়িল। সর্দ্দার আদেশ দিলেন পাশের গভীর জঙ্গলে সকলে চলিয়া যাও। একে একে সকলে চলিয়া গেল, কিন্তু সর্দ্দারের যুবতী মেয়ে মহুয়া বাপের কাছ ছাড়া হইল না। সর্দ্দার বলিলেন—যা বেটী হামার সঙ্গ ছাড়। মহুয়া ঘাড় দুলাইয়া বুক দুলাইয়া বলিল—নেঁহি। সর্দ্দার বলিল—তব্‌ চল্‌, হামি যাবো মানভূম।

বনের রাস্তার পাশে আগুন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইল পিতাপুত্রী অকুতোভয়ে। তাহাদের মানভূম যাওয়ার রাস্তাই যে এই। আগুনকে ভয় করিলে চলিবে না। লাফাইয়া পার হইতে হইবে, যতই থাকুক ওদিকে শত্রুপক্ষ। আগুনের আলোয় তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল সর্দ্দারের মুখখানা। পিছনে সর্দ্দার কন্যা। আরও পিছনে কে যেন অনুসরণ করিতেছে। মহুয়া বাঘিনীর মতো পিছু ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইল। তারপর মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিল। আসিতেছে মোহন। যৌবনশ্রী তার সারা দেহে আঁকা রহিয়াছে। কমনীয়তার সঙ্গে বীরত্ব অর্দ্ধ নগ্ন বন্য যুবকটিকে রমণীয় করিয়াছে। গলায় কুঁচের মালা, ডান হাতে বাজুর মতো বাঁধা পলার ছড়া। বাবড়ি চুলে রঙিণ ফেটী বাঁধা। তাতে পাখীর পালক গোঁজা। কোমরে একটা টুইলা ঝুলিতেছে। ডান হাতে কয়েকটা তীর। বাঁ হাতে তার বাপের আমলের কাঁড়। মহুয়া তাহার দিকে তাকাইল। চোখে চোখে মিলন হইতে মোহনের চোখ দুইটি যেন মদির হইয়া উঠিল। টাটার কারখানা যখন খোলা হয়, তখন প্রথম দলে কামিয়া ছিল তার বাপ, বড় দুই ভাই।' একটা বয়লার ফাটিয়া তারা সবাই মারা যায়। তার মা তাকে শিশু রাখিয়াই মারা যান। তার নিজের খেতখামার আছে। মহুয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হইবে সকলেই জানে। কিন্তু মজলিশ করিয়া তাহা অনুমোদিত হয় নাই। তারও কারণ এই টুসু আন্দোলন। মাসের পর মাস কাটিতেছে, কত পূর্ণিমার রাত গেল, কিন্তু সময় হয় না আদিবাসীদের মজলিশ করিতে। টুসুর গান গাহিয়া তারা মাতিয়াছে, হাড়িয়া খাইয়া মজলিশ করার সময় মিলিতেছে না। তার উপর পুলিশের তাড়া আছে। কোন্ বনে কখন লুকাইতে হইবে তাহার ঠিকানা মিলিতেছে না। সর্দ্দারের মুখখানা আগুনের আলোয় চক্ চক্ করিতেছে। পুলিশরা তাহা দেখিতে পাইল। নির্ব্বোধ পুলিশরা একখানা পাথর ছুড়িয়া মারিল সর্দ্দারের মাথায়। সিংহনাদ করিয়া সর্দ্দার পড়িয়া গেল। লাফাইয়া আসিয়া পড়িল সেখানে মোহন।" বলিল—হুকুম দাও সর্দ্দার। সর্দ্দার বলিল—হামরা গান্ধীজীকি চেলা আছি……হিংসা কোরবো না বাপধন।. পিতাকে আগুনের কাছ হইতে টানিয়া আনিয়া সর্দ্দার কন্যা দাঁড়াইয়া উঠিল। প্রতিহিংসার শিখা তাহার চোখে-মুখে। আবার তাকাইল মোহনের দিকে। মোহনের হাতের বাণ মুহূর্ত্তে গিয়া সেই পুলিশ পুঙ্গবকে বিঁধিয়া ফেলিল। তারপর আবার বাণ…আবার বাণ। মোহনের হাতের বিশ্রাম নাই। মহা কলরব করিয়া পুলিশদল পলাইতেছে।

এইভাবে টুসু গ্রামে-গ্রামে, পাহাড়ে-পাহাড়ে আছাড় খাইয়া, তাহার আবেদন জানাইয়া বেড়াইতেছে।

সর্দ্দারকে মহুয়া ও মোহন ধরাধরি করিয়া আনিয়া উঠাইল তাহার পাহাড়তলির ছাপ্পরে। আবার সেই গোঁসাইকে ডাকা হইল। সে শুধু গান গায় না, সে যে তাহাদের চিকিৎসকও বটে। বন্য লতা-পাতার প্রলেপ দিয়া সর্দ্দারের মাথার ক্ষত গোঁসাই সারাইয়া তুলিল।

সহর হইতে একদল লোক টুসুর গান গাহিয়া যাইতেছে—

বাঙলা মাঈ পিধান শিখাইলো
　　　　কামিজ তেরে দিলো
　　　　ইনাম তেরে দিলো।
তার পরসাদে 'পরসাদ' ভাইরা
　　　　ইজ্জৎবালা হোলো।
টুসু কহে হরহামেসা
　　　　বাঙলা বুলি বোলো—
　　　　বাঙলা বুলি বোলো।

এই গানের মধ্যে যে সত্য কথা আছে তাহা হুলের মতো ফুটিবে বিরোধীদের। এমন চমৎকার করিয়া ধুতিপরা (পিধান) বাঙ্গালীই শিখাইয়াছে। এরূপ. পাঞ্জাবী (কামিজ) পরা—বাঙালীই শিখাইয়াছে, '—প্রসাদ' ভুমি বাঙলা মা'র প্রসাদেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি (ইনাম্) পাইলে, রাষ্ট্রনায়কের সম্মান (ইজ্জৎ) পাইলে। টুসু বলিতেছে সব সময়েই (হর্‌হামেসা) বাঙলা কথা বল।

সর্দ্দার ভাল হইয়া গিয়াছে। বন্যরমণীদের টুসু গানের মিছিল বাহির হইয়াছে। আগে-আগে মহুয়া। হাজার হোক সর্দ্দারকন্যা তো সে। তাহারা ঝুমুর নাচার চেয়ে এই টুসু গান গাওয়াতে বেশী আনন্দ পাইতেছে। গাহিতেছে—

তেরে জমিন দিলে বাঙলা মাঈ
　　　　ক্ষেতি করিয়ে লে,
নদী আনলো বাঙলা মাঈ
　　　　সিনান করিয়ে লে।

ধানে ধানে ভরলো খামার—
গাই বলোদে খেলো দেদার।
পোলাশ ফুলে ভরলো টিলা—
গোড়লাগে বাঙলা মাঈ।
বনতুলসীর মালা গেঁথে
খোঁপাতে জড়াই।

বন্যজীবনের কী অপূর্ব্ব ছবি এই টুসু গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে! সরল অন্তরের কী ভক্তি প্রীতি দিয়া তারা বাঙলা মায়ের চরণে প্রণাম (গোড়লাগি) করিতেছে!

মোহনের ঘরে তো দ্বিতীয় লোক নাই। তাই তাকে ক্ষেতের মধ্যে মাচান্ বাঁধিয়া ক্ষেত আগলাইতে হয়। সে ক্ষেত আগলায় এবং তার সঙ্গে টুসু গায়। তাহা শুনায় বিরহ সঙ্গীতের মতো। মোহন গাহিতেছে—

তুহার রূপ হেরলো হামি হেরলো রে
ধানের গাছে তুহার রূপ হেরলো রে!
ধান ডেকে-ডেকে রূপ দেখায়,
সে, সোরে সোরে পলায় রে।
ধান দিমাক দেখায় হেলে দুলে—
তার সবুজ কচি কোমর হেলে।
ধান হেসে হেসে পড়ে ঢলে
হাওয়া নাগর চুমকি দিলো রে।
তার সাথে হামার দেখা হলে
হায় মুচকি হেসে ছিপায় সে।

ধানগাছে সে প্রিয়ার রূপ দেখিতেছে। প্রিয়া ধরা দিতেছে না।—চমৎকার টুসুর গানটি।

আবার এক মধুর প্রভাতে গাহিতেছে—

আজ বাজ-বাজ-বাজ টুইলা
জানের পরে বাজ।
সে, এইসনে চোখে চাহালো—
হামার দিকে চাহালো,
কলিজা হামার গাহান ধরলো
কেয়া, মিঠি সে আওয়াজ!
হামার ক্ষেতের নীল দরিয়ায়
সে সিনান করে আজ।

দেখা যাইতেছে মোহন একজন ভাল কবি। তার প্রাণের কথা সে কেমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতেছে।

কিন্তু এই নির্দ্দোষ প্রেম নিবেদনও সে দেশে দোষাবহ হইল। কারণ ইহা যে টুসু গান। টুসু গান গাহিলেই রাষ্ট্র-বিরোধী হইবে। তাই দেশোয়ালী পুলিশরা দল বাঁধিয়া আসিল মোহনকে ধরিতে। দল বাঁধিয়া আসিল এইজন্য যে, তাহাদের কাছে মোহনের শক্তির পরিচয় অজ্ঞাত নয়। সেই মোহন যে এখন অহিংস হইয়া পড়িয়াছে তাহা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাহারা মোহনকে ধরিল, মারিল, একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিল।

মহুয়া এই অবস্থায় তো চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সে ঐ সব বিরুদ্ধ পক্ষের প্রহরীদের কাছে নিবেদন করিতেছে—সম্পূর্ণ আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে বলিতেছে :

টুসু গাহানা ছোড়বো না—
বাঙলা বুলি ছোড়বো না।
হামার মরদ টুসু গাহালো বাঙলামে,
তু বিহারী লাঠ্‌ঠি মারলি ছাতিমে।
মরদ মেরা জোয়ান আছে—মরবে না;
তু আনি লিলি, তব্‌ভি উনকো ছোড়লি না।
তু যৌবন লিবি রে শয়তান—
সেটি হামি দিবো না।
মেহেরবান-তোরা উনকো খোলদে না—
বিলম বেশি নেহি করনা।

মেহেরবানদের লুব্ধ দৃষ্টি যত প্রবল হইতেছে, সে ততো পিছু হটিয়া আসিতেছে। সে এক আনা মাত্র ঘুষ দিয়াছে, তাহাতে মেহেরবানদের মন গলিবে কেন? তারা তার দেহ চায়। তা' সে দিবে না। তাহা যদি না দেয়—তবে মোহন বাঁধা থাকুক···হো-হো করিয়া হাসিয়া মেহেরবানরা সেই কথাই আবার ইঙ্গিতে বলিল।

গাছে বাঁধা মোহনের অসহ্য হইল মহুয়ার এই অপমান। একটা ঝাঁকি···দুইটা ঝাঁকি···তিনটা ঝাঁকি। পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া গেল পাটের দড়ি। হুড়মুড় করিয়া দৌড় দিল মেহেরবানের দল।

দূরে দাঁড়াইয়া আছে মহুয়া। তাহার দিকে প্রাণ ভরিয়া তাকাইয়া আছে মোহন। মহুয়া চোখ নত করিল।

অভ্যাস মতো সেদিনও বৈকালে সর্দ্দারকে দেখিতে গিয়াছে মোহন, সর্দ্দার বলিল—এই পূর্ণিমার মজলিশে তোমাদের বিয়ে দেবো···ঘোষবাবু আসবে···মাসী ভি আসতে পারে।

পাপপুণ্য

সুরুচি সেনগুপ্তা

শাশুড়ী বলেন, গলার হার কোথায় গেল বৌমা, খুলে রেখেছ নাকি ?

বিবর্ণমুখে গলায় হাত বুলিয়ে মন্দিরা বলে, না, খুলে রাখিনি তো, কোথাও পড়ে গেল নাকি ?

উৎকণ্ঠিতা শাশুড়ী বলেন, পড়ে যাবে কেমন করে ? মুখ তো খুব ভালো ক'রে আটকানো ছিল।

ব্যস্ত হ'য়ে মন্দিরা এদিকে ওদিকে খোঁজে, শঙ্কিতকণ্ঠে বলে, নিশ্চয়ই কোথাও প'ড়ে গেছে, নয়তো গলা থেকে যাবে কোথায় ?

শাশুড়ী বলেন, তুমি তো আর বাইরে কোথাও যাও নি। বাড়ীর ভেতরেই ওপর নীচে ঘোরাঘুরি ক'রেছ। পড়লে পাওয়া যাবেই, খুঁজে দেখ, কোথায় প'ড়েছে।

বউ খোঁজে, শাশুড়ী খোঁজেন, ছেলেমেয়েরা সবাই খোঁজে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হয়, কিন্তু হার পাওয়া যায় না।

অপ্রসন্ন মুখে শাশুড়ী বলেন, বিয়ে হ'য়ে এসেছো বউমা, এখনো বছর ঘোরে নি, এরি মধ্যে কানের দুল হারালে দু'জোড়া, গোটা কয়েক আংটি গেল, ব্রোচও গেছে একটা। সেগুলো যেন ছোট খাটো জিনিষ ছিল, অত গায়ে লাগে নি। এবারে হারালে পাঁচ ভরির হার ছড়া। এ তো বড় অন্যায় কথা।

ম্লানমুখে মন্দিরা বলে, হয়তো খুলে পড়ে গিয়েছিল, কেউ পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে।

সকাল থেকে তো বাইরের লোক কেউ আসে নি। তবে আর কে কুড়িয়ে নেবে ? বামুন, চাকর, ঝি এরা কত কালের পুরোনো লোক, কুটো গাছও তুলে নিয়েছে ব'লে কোনো দিন সন্দেহ ক'রতে পারি নি। ওদের তো আর বলতে পারিনে কিছু। আলি তো বাগানে কাজ ক'রেই চলে যায়, ভেতরেও আসে না যে তাকেই সন্দেহ ক'রব ?

শ্বশুর শুনে বলেন, মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে বল ? মুনিরও মতিভ্রম হয়। কেউ না নিলে পাখা হ'য়ে জিনিষটাতো আর উড়ে যায় নি। এ ঝি চাকরেরই কাজ।

চাকর অভয় বাড়ী নেই, খাওয়া দাওয়ার পরে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। ঠাকুর আর ঝিকে ডাকা হল।

শ্যামা ঝি এ বাড়ীতে আছে পনের বছর। হার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্র কণ্ঠকে সপ্তমে চড়ায়, কে তোমাদের হারের খবর রাখে শুনি ? চুরি ক'রতে পারলে আর বাসন মেজে, মসলা পিষে গতর ক্ষয় ক'রতে আসতুম না।

শ্যামার ঐ বড় দোষ, কথায় একটু হেরফের হলেই আর রক্ষে নেই।

রসুয়ে বামুন গণপতি মন্দিরার স্বামী অচিনকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। এ বাড়ীতে এসেছিল কিশোর বয়সে, এখন মাথার চুল পেকেছে। সে বলে, রোজ রোজ বৌমার গায়ের সোনা হারাবে, এ কি অলক্ষুণে কাণ্ড মা। একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর, গ্রহের দোষ কেটে যাক্—

অভয় এলো সন্ধ্যার পর, এসেই গৃহিণীর পায়ের কাছে বসে পড়ে কেঁদে ফেলে, আমার দাদার ছেলে বিজয়কে তো আপনি দেখেছেন মা, আমার কাছে এখানে এসে তো একবার একমাস ছিল। কত যত্ন ক'রে তাকে আপনি খাইয়েছেন। দেখেছেন তো কী জোয়ান চেহারা। কলির ভীম ব'লে দাদাবাবু কত ঠাট্টা করেছেন। কাজ করত সাবানের কারখানায়। অনেকদিন খবর পাইনি ব'লে আজ খাওয়া দাওয়ার পর তার ওখানে গিয়ে দেখি তার ভেদ-বমি হচ্ছে, খুব খারাপ অবস্থা। ট্যাক্সি ডেকে তক্ষুণি তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই ছুটে আসছি। কিছু ওষুধ পত্র কিনে দিয়ে আসতে হবে মা, আমাকে কয়েকটা টাকা দিন। রাতে হয়তো আর ফিরতে পারবনা।

চাকর বাকরের বিপদে গৃহিণী চিরদিনই সহানুভূতিশীল ও মুক্তহস্ত ছিলেন। আজ কিন্তু তাঁর মন গল্‌লে না। অভয়ের কথা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'বৌমার গলার হার ছড়া পাওয়া যাচ্ছে না, তুই দেখেছিস্ অভয় ?

বৌমার শূন্য কণ্ঠের দিকে চেয়ে অভয় বলে, আমি তো খেয়ে বেরিয়েছিলাম, আর এই এলাম। তখন তো বৌদির গলায় হার ছিল দেখেছি। কোথাও হয় তো খুলে পড়েছে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

বাজে কথা রাখ্, তো, খোঁজার কিছু বাকি আছে নাকি ? তুই পেয়েছিস্ কিনা তাই বল্।

হতবুদ্ধি হয়ে অভয় বলে, সে কি কথা মা ? আমি পেলে কি নিজের কাছে রাখ্‌তাম নাকি ? আপনার কত গয়না কত জায়গায় পেয়েছি, সে কি নিজের কাছে রেখেছি কখনো ? তক্ষুণি তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।

—তা তো দিয়েছিস্, একটু অপ্রস্তুত হয়েই গৃহিণী নিজেকে সাম্‌লে নিলেন।—'সে কথা তো অস্বীকার করছিনে। কিন্তু পর পর বৌমার গায়ের কতগুলো সোনা গেল বলতো ? এতদিন তত গা করিনি, কিন্তু এবার আমি পুলিশে খবর দেব। পুলিশ এলে তোমাদের তিনজনকে টানাটানি পড়বে। তাই তোমাদের হিতের জন্যই বলছি, পেয়ে থাকলে বার ক'রে দাও। কাক পক্ষীও জানবে না, আমি বলব, আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলেও ওরা দোষ স্বীকার করে না।

পুলিশ আসে, ঠাকুর চাকর আর ঝিকে অনেক প্রশ্ন ক'রে ওদের ঘরগুলো তন্ন তন্ন ক'রে দেখে, তারপর চিরাচরিত প্রথামত অভয়কে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে অভয় হাত জোড় ক'রে বলে, বাবু আমরা গরীব, আমাদের কথা তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না। বাড়ী থেকে জিনিষ খোয়া গেলে আমরা দায়ী হবই, সেজন্যও কোনো দুঃখু নেই। কিন্তু আমার ভাইপোটা হাস্‌পাতালে মর মর, আমি না দেখলে তাকে দেখবার কেউ নেই এখানে। এক্ষুণি তাকে কিছু ওষুধপত্র কিনে দিয়ে আসতে হবে। আজকের দিনটে আমায় মাপ করুন, কাল্‌কে আমি নিজে গিয়ে হাজির হব থানায়।

পুলিশ হাসে। হ্যাঁ, তা' হ'লেই চোরাই মাল সরিয়ে ফেলবার তোমার সুবিধে হয়।

চোখের জল মুছতে মুছতে গৃহিণীর পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যায় অভয়, গৃহিণী মুখ ঘুরিয়ে থাকেন অন্য দিকে। অভয়ের জন্য বাড়ী শুদ্ধ লোকের মন খারাপ হ'য়ে যায়।

ধরা গলায় গৃহিণী বলেন, পুরোণো চাকরদেরই এই প্রবৃত্তি, নতুন এলে তো তারা খুন ক'রে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যাবে। এখন আর নতুন লোক এনে কাজ নেই, শ্যামা আছে, বৌমা আছেন, আমি আছি, চ'লে যাবে একরকম।

মন্দিরা বলে, কিন্তু মা, আজই খবর পেলাম, বাবার বড় অসুখ, তিনি আমাকে দেখতে চান। চাকর না এলে আমি যাব কেমন করে ? আপনার তো ভারী কষ্ট হবে। শ্যামা দিদি আর ক'দিক্ সামলাবেন ? হাট, বাজার, রেশন—

শাশুড়ী বলেন, বিয়ের পর থেকেই তো শুনছি তোমার বাবার অসুখ, আর অসুখেরই বা দোষ কি বল, যে বাড়ীতে থাকেন, না রোদ না হাওয়া—বেঁচে আছেন যে সেই-ই ঢের। তা' তোমাকে যখন দেখতে চেয়েছেন, যাবে বই কি, এখানে যা' হোক্ ক'রে চ'লেই যাবে। শুধু গলায় যাবেই বা কি করে, লোহার আলমারী থেকে নেক্‌লেস্ ছড়া বের ক'রে প'রে যেয়ো। আর তা-ও বলি বৌমা, জন্মেছ তো একেবারে গরীবের ঘরে, বাপের সংসারে তো দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না এই অবস্থা। শাঁখা সিঁদুর দিয়ে তো তিনি মেয়ে পার ক'রে দিয়েছেন। আমাদের যা' সাধ্য দিয়ে বউ সাজিয়ে ঘরে এনেছিলাম। সে জিনিষের উপরে তোমার মায়া নেই কেন ? গায়ের সোনা হারানো অকল্যাণও তো বটে। এবার সাবধান হোয়ো, আর যদি কিছু হারাও, থাক্‌বে শুধু গায়ে, আর গড়িয়ে দেওয়া আমার সম্ভব হবে না। যা সোনার দাম।

বাপের কাছে দিন কয়েক থেকেই মন্দিরা ফিরে আসে। শাশুড়ী বৈবাহিকের কুশল প্রশ্ন করেন।

ম্লানমুখে মন্দিরা বলে, ভালো নেই মা, জ্বরটা একটু ক'মেছে, একেবারে ছাড়েনি। কাশি, পেট খারাপ সব আগের মতই আছে।

শাশুড়ী বলেন, তবে তুমি চ'লে এলে কেন? বাপের কাছে আর ক'দিন থাক্‌লেই পারতে।

লোকজন নেই, আপনার কত কষ্ট হচ্ছে তাই মা পাঠিয়ে দিলেন।

শাশুড়ী বিকৃত মুখে বলেন, কষ্টের কি আর শেষ আছে? অমন চাকর অভয়, সে থাক্‌তে সংসারে কী শৃঙ্খলাই না ছিল! আবার কোন চোর ছ্যাঁচোর এসে ঢুক্‌বে, ভয়ে আমি নতুন লোক আনতে সাহস পাইনে।

তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

—তা' তোমার বাবার চিকিৎসা করছেন কে?

—চিকিৎসার টাকা কোথায় মা? এতদিন তো পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারই দেখেছেন। এই ক'দিন হয় একজন বড় ডাক্তার দেখানো হ'য়েছে। তিনি বুকে আর পেটে এক্সরে করতে বলেছেন।

—সে তো অনেক টাকার কাজ, তার চেয়ে হোমিওপ্যাথি করানোই ভালো ছিল। তোমার ভাইয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা হ'য়ে গেল তো? আর পড়ে কাজ নেই; এখন দেখে শুনে একটা চাক্‌রী নিতে বল। বুড়ো মানুষ ভুগে ভুগে যদি সেরেই ওঠেন, আগের মত কি আর খাটতে পারবেন?

দিন চলে যায়। শ্বশুর একদিন বলেন, শুন্‌ছো গিন্নি, হস্‌পিটাল থেকে খবর এসেছে অভয়ের ভাইপোটি মারা গেছে। মড়া নিয়ে আসবার জন্য খবর পাঠিয়েছিল কিন্তু কে আর আন্‌বে? ও ডোমেই টেনে ফেলে দিয়েছে।

গৃহিণীর চোখ ছল্ ছল্ করে: আহা, ওদের বংশের ঐ একমাত্র ছেলে ছিল।

অভয় ওকে বড় ভালো বাসত। বাছার গতিটা পর্য্যন্ত হ'ল না—।

বজ্রাহতের মত চেয়ে থাকে মন্দিরা। শ্বশুর বলেন, তোমাকে অত শুক্‌নো লাগছে কেন বৌমা? বড্ড খাটুনি প'ড়েছে তোমার। দেখে শুনে একজন লোক রাখো গিন্নি, কতদিন আর এভাবে চল্‌বে? আজ তোমার ভাই এসেছিল না বৌমা! কেমন আছেন তোমার বাবা?

নতমুখে মন্দিরা বলে; 'এক্সরে করা হ'য়েছে, ফল ভালো নয়। তবে ডাক্তার বলেছেন ইন্‌জেক্‌শন দিলেই ভালো হ'য়ে যাবেন, তার পর যেতে হবে চেইঞ্জে।

—গরীবের ঘোড়া রোগ আর কি! নিজে পড়ে আছেন বিছানায়, এত খরচ চল্‌বে কি ক'রে?

দিন দু'তিন পরে একদিন শ্বশুর হঠাৎ বলেন, আমার ড্রয়ারে পাঁচশো টাকার পাঁচখানা নোট রেখেছিলাম এই কয়েকদিন আগে, আজ দেখি তিনখানা নেই, দু'খানা রয়েছে, কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড বল তো?

ভ্রু কুঁচকিয়ে গৃহিণী বলেন, তোমার যে ভুলো মন, কোথায় কিসে খরচ ক'রেছ ভালো ক'রে ভেবে দেখ।

—না, না, খরচের টাকা তো আলাদা ক্যাশ বাক্সে থাকে। এ টাকা সেদিন চা বাগান থেকে এসেছে।

—তোমার ড্রয়ার থেকে টাকা নেবে এত বড় বুকের পাটা হবে কার? যত অনাসৃষ্টি কথা—

ব'লে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন গৃহিণী, 'তোমার ঘরে কেউ তো ঢোকেই না। এক, ঘর ঝাঁটপাট দিত অভয়, সে যাবার পর বৌমাই ও ঘরের কাজ করে, কচিৎ কখনো শ্যামা ও ঘরে যায়।

শুষ্ক মুখে শ্যামা বলে, দু'দিন হয় বৌদির মাথা ধ'রেছে ব'লে ও ঘরের ধোয়া মোছা আমিই করছি মা।

—কবে গেছে নোট? গৃহিণীর কণ্ঠে বিরক্তি, যেন বাড়ীর কর্ত্তা ইচ্ছে করেই এই ঝামেলা বাধিয়েছেন।

কর্ত্তা বলেন, টাকাটা রেখেছি দিন পনের হয়। আজ আরো টাকা এলো, ভাবলাম এক সঙ্গে সব টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখে আসি। খুলে দেখি এই কাণ্ড! কবে খোয়া গেছে, তা তো বলতে পারব না।

স্ত্রীলোক ব'লে শ্যামাকে আর পুলিশে দেওয়া হ'ল না। ওর মাইনের টাকা কেটে রেখে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। অনেক দিনের পুরোণো ঝি হ'লে হবে কি, জেনে শুনে এমন চোর ঝিকে ঘরে রাখবে কে? আকাশের দিকে চেয়ে এই অন্যায় অপবাদের বিচার প্রার্থনা ক'রে শ্যামা বিদায় হ'ল।

বাড়ীশুদ্ধ লোক বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ে, অজানা একটা অকল্যাণের আশঙ্কায় সকলেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে। গ্রহশান্তির জন্য গৃহিণী শনিপূজা, সত্য-

নারায়ণের পূজা করেন। অচিন্ রাগ ক'রে বলে, যেখানে সেখানে তোমরা টাকা আর গয়না ফেলে রাখবে, আর একটা একটা ক'রে ঝি চাকর তাড়াবে। এখন সংসার চলে কি ক'রে? রোজ রোজ আমি বাজার আর রেশন আনতে পারব না ব'লে দিচ্ছি।

ম্লান মুখে মন্দিরা বলে, আমিই রান্না ক'রছি মা, ঠাকুর বরং বাইরের কাজে যাক—

কিছুতেই সমস্যার সমাধান হয় না, সময় মত কেউ ভাত পায় না, রোগী পায় না ওষুধ পথ্য। সুশৃঙ্খল সাজানো সংসারে যেন ভূতের নাচন সুরু হ'য়েছে। খেটে খেটে গৃহিণীর শ্রমবিমুখ স্থূল দেহ ক্ষীণ হ'য়ে আসে, খাঁদা ঝি চলে যাওয়ার পর থেকে বাতের তেল মালিশ বন্ধ হ'য়ে গেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাতের ব্যথাটাও বেড়ে উঠেছে। বধূর যে সৌন্দর্য্য দেখে তাঁরা শুধু শাঁখা সিন্দুরে তাকে ঘরে এনেছিলেন, প্রকাণ্ড সংসারের খাটুনি খেটে খেটে তার সে সৌন্দর্য্যও ম্লান হ'য়ে আসে।

কেটে গেল মাস দুই; পুরোণো ক্ষতি ভুলে গিয়ে যখন আবার ঝি চাকর রাখবেন ব'লে ওঁরা লোক খুঁজতে সুরু ক'রেছেন, ঠিক তখনই একদিন দেখা গেল, সোনার বোতাম সহ অচিনের সার্ট আর সোনার ঘড়ি ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গণপতি ছাড়া বাড়ীতে আর বাইরের লোক কেউ নেই, মালি তো বাগানে কাজ করে, তার সঙ্গে এ চুরির কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই গণপতিকে সন্দেহ না ক'রে উপায় ছিল না। পুলিশ এসে জিজ্ঞেসবাদ ক'রে যখন গণপতিকে ধরে নিয়ে যায়, সে তখন অচিনকে জড়িয়ে ধ'রে হাউ মাউ ক'রে কেঁদে বলে, তোমার এক বছর বয়স থেকে তোমাকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি অচিন, আমি তোমার ঘড়ি আর বোতাম চুরি ক'রব এ কথা তুমি বিশ্বাস করলে কেমন করে? জেলে গিয়ে ঘানি টানব, তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি অবিশ্বাসী হ'লাম এ দুঃখ রাখবার যে ঠাঁই নেই আমার।

গৃহিণী কাঁদেন, কর্ত্তা কাঁদেন, রুমালে চোখ মো'ছে অচিন, ছোট ছেলে মেয়েরা ম্লান মুখে গণপতির পেছন পেছন যায়। মন্দিরা যেন বোবা হ'য়ে গেছে, প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে সে।

সংসার অচল, দেহ অচল, কোন্ নিরপরাধ অত্যাচারিতের করুণ ক্রন্দন যেন সকলের বুকের উপর এসে আছাড় খেয়ে পড়ে, কার উচ্চারিত তীক্ষ্ণ অভিশাপ যেন ওদের জীবনের উপর পাষাণ চাপা দিয়ে রাখে।

এ কার পাপে? কার পাপে? ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটে কুটে কাঁদে মন্দিরা, ঠাকুর তুমি ব'লে দাও, একি আমার পাপ? স্বামী-শশুরের ঐশ্বর্য্যে কি আমার কোনো অধিকার নেই? আমার এত ঐশ্বর্য্য থাকতে আমার বাবা যদি বিনে চিকিৎসায় মা'রা যেতেন, একটা সংসার অসহায় হ'য়ে ভেসে যেত, তাতে কি আমার পাপ হ'ত না? আমার দরিদ্র পিতা ধনী জামাতাকে উপযুক্ত যৌতুক দিতে পারেন নি, এখনো জামাতার উচিত প্রাপ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হ'য়েই আছেন। সেজন্য শশুরের প্রতি জামাতার শ্রদ্ধা নেই, সহানুভূতি নেই; আছে অবজ্ঞা মিশ্রিত অনুকম্পা। পিতার দৈন্য জানিয়ে স্বামীর কাছে হাত পেতে তাঁকে যে আরো অপমানিত ক'রতে পারিনি, সে-ও কি আমার অপরাধ? এঁদের তো অনেক আছে, ঐ সামান্য লোকসানে এঁদের সচ্ছল জীবন যাত্রা তো একটুও বিঘ্নিত হয় নি। অথচ আমার বাবা সুচিকিৎসায়, উপযুক্ত শুশ্রূষায়, হাওয়া পরিবর্ত্তন ক'রে মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। একটি দরিদ্র সংসার অনাহারের দায় থেকে রক্ষা পেয়েছে, তুমি ব'লে দাও ঠাকুর, একি আমার পাপ? তোমার ন্যায় বিচারে আমার বাবার জীবনের জন্য আমি কি ক্ষমা পাব না? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার অপরাধের কালি কি ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হয়ে উঠবে না? আমার বাবার জীবনের বিনিময়ে যারা লাঞ্ছিত উৎপীড়িত হ'য়েছে, তোমার সুবিচারে কি তাদের অভিশাপ নিষ্ফল হ'য়ে যাবে না? যদি না হয় তবে সে অভিশাপ যেন কোনো নির্দ্দোষকে স্পর্শ না করে, আমার জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি আমাকেই করতে দাও ঠাকুর—।

চোখের জলে বুক ভেসে যায় মন্দিরার।

পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

বৈষ্ণব পদাবলী রাগানুগ বৈষ্ণব ভক্তগণের সাধন-ভজনের সহায়, বাংলার প্রাচীনযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য, কীর্ত্তন সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন। এইগুলির উপজীব্য একাধারে ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত, বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের কাছে পদাবলী একাধারে ভাগবতের মতই ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্য। যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন—তাঁহাদের কাছে উৎকৃষ্ট অনুরাগ মূলক সাহিত্য।

বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা খুব বেশী ছিল না। পাঁচ-ছয় শত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালীজাতির সাহিত্য পিপাসা মিটাইয়াছে এই পদাবলী সাহিত্য। প্রধান পদকর্ত্তারা পদাবলী রচনায় বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে কবিত্ব রসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সেকালে কাব্য-সাহিত্য কোন লৌকিক, ব্যাবহারিক বা ঐহিক বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত হইত না। বিশেষতঃ পদকর্ত্তারা বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। কাজেই বৈষ্ণব-লীলাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পদকর্ত্তাদের গুরুস্থানীয় রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, কবিকর্ণপুর, রায় রামানন্দ ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংস্কৃতে লীলাতত্ত্ব অবলম্বনে কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত উজ্জ্বল নীলমণি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিরসামৃতশেষ, অলঙ্কার-কৌস্তুব ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তকগুলি ভক্তিতত্ত্বের অনুগত সাহিত্যরচনারই রীতিপদ্ধতি ও পরিচালনা দান করিয়াছে এবং সাহিত্যেরই রসবিশ্লেষণ করিয়াছে। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী এবং নাটকান্তর্বর্ত্তী শ্লোকগুলি এবং সনাতন গোস্বামীরা যে সংস্কৃত পদগুলিতে আলঙ্কারিক চাতুর্য্য ও কবিত্বের মাধুর্য্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের পল্লবিত শ্যামলতাতে ভক্তিরস পুষ্পের মতই বিকশিত হইয়াছে।

এক একটি লীলা অবলম্বনে এক একটি কাব্য বিরচিত হইয়া আছে। এই কাব্যের রচয়িতা একজন নয়, অনেকে। পদসংকলয়িতারা ও কীর্ত্তনীয়ারা এই কাব্যগুলির সম্পাদক। বহুজনের মিলিত কণ্ঠে উদ্গীত সংকীর্ত্তনের ন্যায় বহুজনের রচনার রসসঙ্গত সমাবেশে এই কাব্যগুলি রচিত। ভিন্নভিন্ন কবির পদ লইয়া রসের ক্রম অনুসারে এমন করিয়া পালাগুলি সাজানো হইয়াছে যাহাতে এক একটি পালা এক একটি কাব্যে পরিণত হইয়াছে। পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরুর মত যে সকল সংগ্রহ পুস্তকে ব্রজলীলার সব পালাগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে সেগুলি ভাগবতের মত এক একখানি মহাকাব্যের রূপ ধরিয়াছে। একভাবনিষ্ঠ লীলারসে বিভাবিত অভিন্নহৃদয় কবিদের প্রয়াসের সমবেত সাধনায় এই মহাকাব্যের সৃষ্টি।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞান দাসের মত কবিরা ব্রজের প্রত্যেক লীলাঙ্গেরই পদরচনা করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের পদাবলী সুবিন্যস্ত হইয়া এক একটি পরিপূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপ ধরিয়াছে। আর অনন্ত দাস, উদ্ধব দাস, ঘনশ্যাম, বলরামদাস, কবিশেখর, শশিশেখর ইত্যাদি কবিরা লীলার কোন কোন অঙ্গের পদ রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের পদ কীর্ত্তন গানের পালার মধ্যে স্থান পাইয়া পরিপূর্ণ কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

কতকগুলি পদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সংযোগে গাঢ় বন্ধতা নাই। এইগুলি অনেকটা চিত্রাত্মক। কতকগুলি সুসংবদ্ধ, এক একটি ভাবের ক্রমোন্মেষ—(organic development,—rounded as a star), এইগুলিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদ অজস্র নয়। অধিকাংশ পদ ঐ উৎকৃষ্ট পদগুলির অনুকৃতি, অথবা উৎকৃষ্টশ্রেণীর পদের ভাবই রূপান্তরে প্রকাশিত। এমন কি সেগুলিতে অন্যপদের পদবিন্যাস, অলঙ্কৃতি ইত্যাদির permutation combination হইয়াছে।

লিরিক কবিতা বলিতে যাহা বুঝায় এগুলি তাহা নয়। এগুলি বাণীভূয়িষ্ঠ গানই। গীতিকবিতার সাধারণতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা বা গণ্ডী নাই। তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার নিজস্ব একটা বেগ আছে—সে বেগ কতদূরে গিয়া বিশ্রান্ত হইবে তাহার একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তাহা দীর্ঘও হইতে পারে, হ্রস্বও হইতে পারে, কিন্তু গানের একটা নির্দ্দিষ্ট অবধি আছে—তাহার আকাঙ্ক্ষার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। তাহার রূপ সংক্ষিপ্ত। পদগুলি সেইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় গিয়া শেষ হইয়াছে,—সনেটের মত।

এমন এক একটি ভাবখণ্ড লইয়া পদ রচিত হইয়াছে যে তাহার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ১২।১৪ চরণেই শেষ হইয়াছে। ফলে, অনেক সময় একএকটি কবিতার পরিপূর্ণ ভাবাবেগ হয়ত ৫।৭টি পদে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তাহাছাড়া গীতিকবিতার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। কবি তাহাতে নিজের প্রাণের কথাই বলেন—নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকেই ছন্দে রূপ দান করেন। পদাবলীর মত একটা গোষ্ঠী, সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভাবধারাই তাঁহার উপজীব্য হয় না। অন্ততঃ রচনাশৈলী-বা ভাব প্রকাশের ভঙ্গীটা তাঁহার নিজস্ব থাকে। অন্ধভাবে একটা অনুশাসনের বিধিবদ্ধ রীতি বা ভঙ্গীর অনুসৃতি গীতিকবিতা নয়।

তাহা ছাড়া, আবৃত্তির জন্যই গীতিকবিতা রচিত হয়, যদিও তাহাকে গাওয়াও যাইতে পারে। সেইজন্যই নামও ইহার গীতিকবিতা। কিন্তু গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতিকবিতা রচিত হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ছন্দের মর্য্যাদা সেজন্য অনেকে গোবিন্দদাসের মত নিখুঁত ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন নাই। সুরে সুবিধা হয় নাই বলিয়া হ্রস্বস্বরকে বহুস্থলে দীর্ঘত্ব এবং দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বত্ব দান করা হইত।

পদাবলী যেন অর্দ্ধসৃষ্টি—বাকি অর্দ্ধেক সৃষ্টি সম্পাদিত হয় গায়কের কণ্ঠে। কেবল পাঠ করিয়া আমরা যে রস পাই না—কীর্ত্তনীয়াদের কণ্ঠে শুনিলে তাহা পাই। গায়ককণ্ঠের আঁখর, আবেগ ও দরদ তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করে। পাঠ করিয়াই আমরা যে পদে রস পাই, গায়ক-কণ্ঠে সে পদে আমরা অধিকতর রস পাই এবং নব নব ব্যঞ্জনা লাভ করি। যে পদে আমি ছন্দের অঙ্গহানি লক্ষ্য করি, গায়ক-কণ্ঠে শুনিলে ছন্দের দিক হইতে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইবে। গানের সুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া মনে মনে গাহিয়া আবিষ্ট অবস্থায় পদকর্ত্তারা পদ রচনা করিতেন। তাই বোধ হয় তাঁহাদের কাছে সে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইত। নূতন কথা নূতন ভঙ্গীতে বলাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যে কথা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা বলিয়াছেন—যে কথা বৈষ্ণবগোষ্ঠীর অভিমত, যে কথা চৈতন্যদেবের রসাদর্শের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত এবং যাহা তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ সম্পদ—সেই কথা সুরসঙ্গতরূপে বলিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাধা হইত।

পদগুলি যেন এক একটি শ্লোকের মত, শ্লোকের মতই ইহার চতুঃসীমা বিধিবদ্ধ। অনেক পদ বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধব, উদ্ধব সন্দেশ, দানকেলিকৌমুদী—এমন কি সংস্কৃত কাব্য নাট্যের শ্লোকের ভাবানুবাদ। এই নিবন্ধের মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত কয়েকটি দেখানো হইল। আবার পক্ষান্তরে কোন কোন পদ সংস্কৃত শ্লোকেও রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কোন একটি বিশেষ ভাবকে বিকশিত করিয়া তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়, নির্দ্দিষ্ট সীমাবন্ধনের মধ্যে সুরের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলেই পদকর্ত্তারা স্বকীয় ভণিতা দিয়া শেষ করিতেন—গীতিকবিতার বিকাশ ধারার অনুসরণ করিতেন না। অনেক সময় কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন না করিয়া তিন চারিটি বিভিন্ন ভাবের অন্তরায় পদটিকে পরিপূর্ণতা দান করিতেন। পদের গঠনে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী থাকায় বাধ্য হইয়া কবিদের ভাবাবেগ সংবরণ করিতে হইয়াছে। পদের বাক্যাবলীর ক্রম সকল কবির একরূপ নয়। তাহার দ্বারাই রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। গোবিন্দদাসের রচনার ক্রম আলঙ্কারিক (Rhetorical Sequence). অলঙ্কৃতির আকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহার পদের গঠন নির্ভর করে।

চম্পতির রচনার ক্রম যুক্তিমূলক (Argumentative Sequence) যুক্তি পরম্পরার আকাঙ্ক্ষার উপর পদের গঠন নির্ভর করে। চণ্ডীদাস নরোত্তমদাস বলরামদাস ইত্যাদি অধিকাংশ কবির রচনার ক্রম আবেগাত্মক (Emotional Sequence)। অনেকের পদে কোন বিশিষ্ট ক্রম অনুসৃত হয় নাই। সেজন্য বাক্যগুলি তাঁহাদের পদের মধ্যে গাঢ়বদ্ধতা লাভ করে নাই।

পদাবলী একটা রসগোষ্ঠীর রচনা। যাঁহাদের নামের ভণিতা আছে তাঁহারা যেন উপলক্ষ মাত্র। কাহার রচনায় যে কাহার ভণিতা আছে তাহার ঠিক নাই। একটা ভণিতা দিতে হয় তাই যেন দেওয়া হইয়াছে। বহু কবি সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিজের রচনায় বিখ্যাত কবির ভণিতাই চালাইয়াছেন। আত্মবিলোপ যে সাধনার অঙ্গীভূত সে সাধনায় ভণিতা যোগও যেন একটা অভিমানের কথা। তাই ভণিতায় দীনতার অবধি নাই। যাঁহার যে উপাধিই থাকুক সকলেই দাস। যাঁহার নামে পদ, ভাষা যদি তাঁহার নিজস্ব হয় ভাব তাঁহার নয়, ভাব ঐ রসগোষ্ঠীর নিজস্ব। এমন কোন ভাব কোন পদে পাওয়া যায় না—যাহা অন্যান্য পদেও নাই। এই সকল কারণে ইহাকে গোষ্ঠী-সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—

বিদগ্ধমাধবে রূপগোস্বামী লিখিলেন—

অকারুণ্য কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত ভুজা বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ।।

যদুনন্দনদাস শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ করিয়া লিখিলেন—

তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিছ বান্ধিয়া।

শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে ।।

শশিশেখর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছন্দোমাধুর্য্য যোগ দিয়া বলিলেন—

নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে।
হামারি দুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে।

শুধু ভাব নয়, এমন একটি অলঙ্কারেরও প্রয়োগ দেখা যায় না—যাহা অন্যান্য কবির রচনাতেও পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মতে পদরচনার ভাব, ভাষা, অলঙ্কৃতি সমস্তই সাধারণ সম্পত্তি—তাহাতে সকলেরই ছিল সমান অধিকার। সে যুগের রসজ্ঞদের কাছেও ব্যক্তির বিশেষ কিছু মূল্য ছিল না—রসবস্তু ও রসগোষ্ঠীর দিকেই তাঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন।

পদগুলি যেন একটি বিশাল রস-প্রবাহের কতকগুলি হিল্লোল, রস ধারার প্রবাহরক্ষাই সেকালের রসিক ভাবুক ও কবিদের লক্ষ্য ছিল।

রসপ্রবাহের সোনার তরীতে সোনায় ফসল তুলিয়া দিয়াই কবিরা দায়মুক্ত। কবিগুরুর ভাষায় 'রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায় চলে তার দেয় না ঠিকানা।'

কবিদের নিজস্ব যাহা ছিল সেটুকুকেও রচনায় রূপ দেওয়ার সুযোগসুবিধা হয় নাই। প্রচলিত আদর্শ ও বিধি বিধানের অনুগত হইয়াই তাঁহাদের চলিতে হইত। পূর্ব্ববর্তী মহাজনগণ যাহা বলেন নাই তাহা বলিতে কাহারো সাহসও হয় নাই। বলা সঙ্গত নয় বলিয়াই বোধ হয় ধারণা ছিল। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে সুর সৌষম্য (Harmony) নষ্ট হয়, পাছে গোষ্ঠীধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয়, পাছে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এ আশঙ্কাও ছিল। এ কালের মত তখন ত আর সাধারণ পাঠক সমাজ ছিল না—কাজেই বৈষ্ণব সমাজের মুখপানে চাহিয়া তাঁহাদের পদগুলি রচনা করিতে হইয়াছে।

একটা বিরাট মহাসংকীর্ত্তনে দুই একজন মূল গায়েনের কণ্ঠের সঙ্গে সকলে সুর মিলাইয়া গিয়াছেন।

(২)

পদাবলীর জন্মসূত্র—আমাদের দেশে সংস্কৃত কাব্যের যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল কালক্রমে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া

দিলে ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার' নাটকই উল্লেখযোগ্য নাটক, গোবর্দ্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী' ও ধোয়ী সেনের 'পবন দূত' উল্লেখযোগ্য কাব্য আর সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ঐতিহাসিক কাব্য। বাংলা দেশের কাব্য সাহিত্যের ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হইল সঙ্গীতের আমন্ত্রণে ও প্রয়োজনে। সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দে আর বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদে এই নূতন ধারার সূত্রপাত এই ধারা একাধারে ধর্ম্ম সঙ্গীত ও কাব্যসাহিত্যকে পুষ্টিদান করিয়াছে। জয়দেব যে ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাই পদাবলীর ধারা।

জয়দেবের এই মধুর কোমলকান্তপদাবলী শ্রীকৃষ্ণের মধুররসের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত, রাগতাল সংযোগে গেয়। প্রাকৃত ভাষাতে শ্লোকের আকারে বৈষ্ণবপদও দুই চারিটি পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস প্রধানতঃ জয়দেবের অনুসরণে যে পদগুলি রচনা করেন—সেইগুলিই বাংলা ভাষার প্রথম পদাবলী। বিদ্যাপতির ভাষা যদিও ঠিক বাংলা নয়, কিন্তু বাংলাদেশে তাঁহার পদগুলির ভাষা বাংলা ভাষারই সমীপবর্ত্তী। চর্য্যাপদের ভাষার তুলনায় বিদ্যাপতির পদের বাংলায় প্রচলিত রূপের ভাষা খাঁটি বাংলার অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

জয়দেব—পদকর্ত্তাদের গুরু জয়দেব। জয়দেবের পদাবলীর ছন্দ, বিষয়বস্তু, গঠনভঙ্গী, পদবিন্যাস, আলঙ্কারিকতা ও ভাবভঙ্গীরই অনুসরণ করিয়াছেন পরবর্ত্তী পদকর্ত্তারা। কেবল তাঁহার পদে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাবের কথা মাঝে মাঝে আছে, বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন পদকর্ত্তা তাহার অনুসরণ করেন নাই। পদকর্ত্তারা জয়দেবের পদবিন্যাসও অনেক পদে গ্রহণ করিয়াছেন—কোন কোন শ্লোককে পদের আকার দান করিয়াছেন এবং জয়দেব রচিত পদের কোন কোন অংশ নিজেদের পদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়াছেন। জয়দেবের আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের সবটুকুই পদকর্ত্তাদের বিভিন্ন পদে বিকীর্ণ হইয়া আছে।

জয়দেবের পদগুলি বাংলা ও ব্রজবুলির পদের তুলনায় দীর্ঘ। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, দানলীলা, গোষ্ঠলীলা, মাথুর, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি নাই। এই গুলির কোন কোনটির বিদ্যাপতি হইতে, কোন কোনটির বড়ু চণ্ডীদাস হইতে সূত্রপাত হইয়াছে। গীতগোবিন্দে রাধা প্রধানতঃ খণ্ডিতা ও মানিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। ভণিতায় জয়দেব হরিস্মরণে যাহাদের মন সরস, বিলাসকলায় যাহাদের কুতূহল তাহাদের হর্ষবৃদ্ধি ও ভক্তিসঞ্চারের কামনা করিয়াছেন। পদকর্ত্তারা নিজেদের শ্রীমতীর সখীস্থানীয় কল্পনা করিয়া মধুররসের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার উদ্দেশে আশ্বাস; সমবেদনা ও উপদেশাদি সংযোগ করিয়াছেন। এই প্রথা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

জয়দেবের আগে প্রাকৃতভাষায় পদরচনার পদ্ধতি ছিল। প্রাকৃত পিঙ্গলের ছন্দের গ্রন্থে ২।১ টি পদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন কি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পদও পাওয়া যায়। জয়দেব যে ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন—সে ছন্দ যেমন—মরহট্টা, বৃত্তনরেন্দ্র, চৌপইআ, চর্চ্চরী, দোহা ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষারই ছন্দ। এইগুলিই পদকর্ত্তারাও গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাকৃতভাষা আর কথিত ভাষা হিসাবে চলিল না। দেশের বিদ্বৎসমাজও প্রাকৃত ভাষার রচনার বিশেষ আদর করিলেন না—তাহার ফলে প্রাকৃতভাষার পদগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হইল। জয়দেবের সময়ে প্রাকৃত ভাষায় কবিতা রচনার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও জয়দেব প্রাকৃত ভাষায় না লিখিয়া অত্যন্ত সহজ সরল সংস্কৃতে অথবা সংস্কারিত প্রাকৃতে লিখিয়া অসামান্য সমাদর লাভ করিয়াছেন।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই—এমন কি দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থলে তাহার প্রচার ও সমাদর হইয়াছিল। বাংলার মত অন্য প্রদেশে ইহা গীতিকাব্যে এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গীতগোবিন্দের অনুসরণে হিন্দী ভাষায় গীতিকবিতা কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে ইহা গীতিরসের বন্যার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়াছিল। ইহার কয়েকটি কারণ আছে—প্রথমতঃ বাঙ্গালী প্রেমিক জাতি, প্রেমের কবিতার অনুরাগী। বাঙ্গালীরা গীতগোবিন্দে প্রেমগীতির

একটা চূড়ান্ত আদর্শ পাইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে তাঁহার প্রেমধর্ম্মপ্রচারের ফলে গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবজগতে বেদ বা গীতার মর্য্যাদা লাভ করিল। চৈতন্যোত্তর গীতিসাহিত্যে গীতগোবিন্দ অসাধারণ প্রেরণা দান করিল। চৈতন্যদেব গীতগোবিন্দে লোকাতীত ব্যঞ্জনা সমারোপণ করিলেন। তৃতীয়তঃ বাঙ্গালীর নিজস্ব কীর্ত্তন সঙ্গীতের অভাবনীয় সমুন্নতির ফলে গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তনের অঙ্গীভূত হইয়া অসাধারণ সমাদর লাভ করিল—তদনুসরণে রচিত পদেরও তেমনি মর্য্যাদা বাড়িয়া গেল। চৈতন্যোত্তর কীর্ত্তন সঙ্গীতে গীতগোবিন্দ কেবল অভিনব সার্থকতা (Interpretation) নয়—অভিনব সুরতালও লাভ করিল।

চর্য্যাপদ—প্রাকৃত ভাষার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ভাষায় পদরচনা করিয়াছিলেন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য্যগণ। এইগুলিকে চর্য্যাপদ বলা হয়। এইগুলিতে বঙ্গদেশে রূপান্তরিত বৌদ্ধ সাধনমার্গের তত্ত্বগুলি রূপকের আবরণে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। মনে হয় এইরূপ পদ দেশে আরও অনেক ছিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলুপ্তি এবং ভাষার দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে চর্য্যাপদগুলিও অপ্রচারিত হইয়া পড়িল। কতকগুলি এই শ্রেণীর পদ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলিতে বাংলাভাষার আদিমরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে অপ্রচলিত হইলেও সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি বড়ু চণ্ডীদাসের যুগে অপরিচিত ছিল না। এইগুলির পঠনগত সাম্য ছাড়া পদাবলীর সহিত এইগুলির কোন সম্পর্ক নাই। চর্য্যাপদগুলি সাধারণতঃ পজ্ঝটিকা ও চৌপইআ ছন্দে এবং ভণিতান্ত হ্রস্বাকারে লিখিত। ধ্রুবপদও পদের প্রথমে কিংবা মধ্যে আছে। বৈষ্ণবপদের গঠনভঙ্গী পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, কেবল এই কথাটাই ইহাতে প্রমাণিত হয়।

সংস্কৃত-উৎস—বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভাগবত ছিল তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। অন্যান্য পুরাণের সঙ্গেও তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র, রসমঞ্জরী, অমরু শতক, আর্য্যা সপ্তশতী, গাথাসপ্তশতী, শৃঙ্গারতিলক ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ হইতে তাঁহারা অনেক ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের অনেক অংশ ইঁহারা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত-লীলাতত্ত্বের অনুগত করিয়া লইয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। রাসলীলা প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করা গেল। বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবত, হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণের ভাব লইয়া সেকালে প্রচলিত ধামালী সঙ্গীতের আধারে ঢালিয়া তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন। মালাধর বসু পদকর্ত্তাদের আগেই ভাগবতের মর্ম্মানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের এক একটি অংশ রাগরাগিণী সংযুক্ত হইলেও পদের আকারে রচিত নয়। ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত প্রধানতঃ পয়ার ছন্দে গ্রথিত। দীনচণ্ডীদাস ভাগবতের অনুসরণে এবং অনেকস্থলে অনুবাদ করিয়া পদের আকারে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহাকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য বলা যাইতে পারে। প্রাচীন সঙ্কলন পুস্তকেও দীনচণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ স্থান পাইয়াছে।

বিদ্যাপতি—বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদের গুরুস্থানীয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রায় সকল স্তরের ও সকল অঙ্গেরই পদ রচনা করিয়াছেন। পদকর্ত্তারা বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তারা প্রায় সকলেই বিদ্যাপতির অনুবর্ত্তী। বিদ্যাপতির প্রধান শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাস শিষ্যজনোচিত দীনতার সঙ্গে নিজেই বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে।
হরিহরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥

ব্রজবুলি—সে যুগে মিথিলার সঙ্গে বিদ্যাজ্ঞানের আদান প্রদানের পথে বাংলার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ নামে এক প্রকার মৈথিলীতে পদ রচনা করেন। এই ভাষাই বাংলাদেশে প্রচুর বাংলা শব্দের মিশ্রণে এবং সংস্কৃত

শব্দের বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তিজাত রূপের সহিত মিশিয়া ব্রজবুলির রূপ ধরিয়াছে। বিদ্যাপতির বহু পদ বাংলায় ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার পদকর্ত্তারাই বিদ্যাপতির পদগুলিকে অবলম্বন করিয়াই ব্রজবুলির সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য অন্য মতও আছে। কেহ কেহ বলেন—ইহার জন্ম কোথায় ঠিক বলা যায় না। যেখানেই জন্ম হউক ইহা কখনো কথিত ভাষা ছিল না। ইহা পূর্ব্বভারতের কবিতা রচনার ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল—হিন্দী, মৈথিলী, বাংলা, আসামী, উড়িয়া ইত্যাদি সকল প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে ইহার সামীপ্য সম্বন্ধ আছে। আসামের শঙ্করদেবের পদ, উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের পদ, নেপালের কোন কোন গান প্রায় একই সময়ে ব্রজবুলিতে রচিত হইয়াছিল। অতএব বঙ্গদেশে ইহার জন্ম নাও হইতে পারে। কিন্তু অন্য কোন প্রদেশে এমন ব্যাপক ভাবে ব্রজবুলির পদ রচিত হয় নাই। বাংলায় ব্রজবুলির প্রথম পদ যশোরাজ খাঁর,—তারপর উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের বিখ্যাত পদ—

পহিলহিঁ রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বাংলায় ব্রজবুলিতে পদরচনার পদ্ধতি বিশেষরূপ প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুদিন পরে ব্রজবুলিতে পদ রচনার ধুম পড়িয়া যায়।

খেতুরির উৎসব সময়ে ব্রজবুলির পদ লীলাকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এ ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বৈষ্ণব সমাজেও ইহা কথ্যভাষা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ঐ সমাজের সকলেই এই ভাষা বুঝিত। ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা। এই ভাষায় পদ রচনার সার্থকতা কি ?

১। এই ভাষা এতই উদার ও আতিথেয় যে ইহার মধ্যে যে কোন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ সহজে সামঞ্জস্য লাভ করে। সেজন্য এই ভাষায় কখনও উপযোগী শব্দের অভাব হয় নাই।

২। ব্রজবুলির সঙ্গে কবিরা প্রাকৃত ভাষার বিবিধ সুললিত ছন্দ পাইয়াছে। এই ছন্দগুলি দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সমাবেশে হিল্লোলিত। বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বর তাহার গুরুত্ব ও দীর্ঘতা হারাইয়াছিল—বাংলায় যুক্তাক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে গেলে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত। কিন্তু ব্রজবুলিতে তাহা হইত না। কথিত ভাষায় দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ অস্বাভাবিক শুনায়—কৃত্রিম ভাষাতে সে অসুবিধা নাই। এইভাবে ছন্দোহিল্লোল পাওয়ার সুযোগের জন্য কবিরা ব্রজবুলিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় হসন্ত শব্দের সংখ্যা খুব বেশী, ব্রজবুলির অধিকাংশ শব্দ স্বরান্ত। পদকর্ত্তারা যে ছন্দগুলিতে পদ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন—সে ছন্দগুলিতে হসন্ত শব্দ একেবারেই উপযোগী নয়, সেজন্যও তাঁহারা ব্রজবুলির আশ্রয় লইয়াছিলেন।

৩। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্য্যাবর্ত্তেও বঙ্গীয় পদাবলী সাহিত্যপ্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের বহু লোকও এই সাহিত্য উপভোগের জন্য পিপাসু হইয়াছিল। সেজন্য কবিরা এমন ভাষার আশ্রয় লইলেন যাহা আর্য্যাবর্ত্তের সকল লোকেরই সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাধনার সহায়ক একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা থাকে কবিগণের সম্ভবতঃ ইহা অভিপ্রেত ছিল। সর্ব্বজনের উচ্ছিষ্ট ভাষাকে অলৌকিক রসের অভিব্যক্তিতে যথাসম্ভব বর্জ্জনের চেষ্টা হইয়াছে।

৫। অনধিকারী প্রাকৃতজনের দ্বারা পাছে পদাবলীর মর্য্যাদা হানি হয় বলিয়া হয় ত কবিরা প্রাকৃতিক জনের ভাষা বর্জ্জন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সম্ভোগের বর্ণনা সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রজবুলিতে যাহা আদিরসাত্মক সাহিত্য তাহা প্রচলিত ভাষায় অশ্লীল কামলীলা বর্ণনা মাত্র বলিয়া মনে হইবে।

৬। প্রেমলীলাবর্ণনার পক্ষে এই ললিত কোমল তরলায়িত ভাষাকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। বাংলায় রূপান্তরিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে মধুর রসাত্মক ব্রজলীলা বর্ণনা ব্রজবুলিকে একটা আদর্শ প্রেমলীলার ভাষা করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের কবিরা অন্যান্য রসোপকরণের সঙ্গে তাই বিদ্যাপতির ভাষার

বঙ্গীয় রূপকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে এই ভাষায় অন্য রসের কবিতাও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কবিতার আদর হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ—রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার নাম করা যাইতে পারে।

৭। স্কটল্যাণ্ডের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত Burns এর কবিতা যেমন ইংলণ্ডের নাগরিকদের মধুর লাগে—ব্রজবুলিও তেমনি বাঙ্গালী পাঠকের মধুর লাগিত। রসিক শ্রোতাদের চাহিদাতেই বোধ হয় এই ভাষা কবিদের আদরণীয় হইয়াছিল।

৮। দেশগত ও কালগত ব্যবধানে যেমন একটা Romance-এর সৃষ্টি করে ভাষাগত দূরত্বও তেমনি একটা Romance-এর সৃষ্টি করিত।

৯। কীর্ত্তন সঙ্গীতের রস মূর্চ্ছনা ও সুরের অলঙ্করণের পক্ষে বাংলা অপেক্ষা ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয় কবিরা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতেন। মোটের উপর এই অপূর্ব্ব ভাষাটির জন্য বঙ্গীয় কবিরা বিদ্যাপতির কাছে ঋণী।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব—শ্রীচৈতন্যের আগে প্রচলিত ছিল বিদ্যাপতির পদাবলী এবং কাহারও কাহারও মতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই পদাবলী সাহিত্যের প্রকৃতপক্ষে সূত্রপাত। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর ইহার স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয়। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে যাহা ছিল কলিকা তাহাই তাঁহার পরে বহুদলে বিকশিত হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যের জীবনই ছিল একখানি মহাকাব্য, তাহাই শত শত ভাগে বিকীর্ণ হইয়া পদাবলীর রূপ ধরিল। সমগ্র বৃন্দাবনলীলা শ্রীচৈতন্যের জীবনে রঙ্গমঞ্চে নাট্যের মত অভিনীত হইয়াছিল। ফলে, শ্রীচৈতন্যদেবই ব্রজলীলাকে বাস্তব রূপ দেন। তিনি নিজেই এই অভিনয়ে ছিলেন রাধা। তাঁহার জীবন পূর্ব্ববর্ত্তী পদাবলীর কুসুমে দিয়াছিল অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধু ও গন্ধ এবং পরবর্ত্তী পদাবলীর কুসুমপুঞ্জে দিয়াছিল প্রাণরস, মধু, গন্ধ ও সুষমা। শ্রীচৈতন্যকে একজন কবি মেঘের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সত্যসত্যই এদেশে রসের বর্ষা নামাইয়াছিল। তাহার ফলে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে যে সোনার ফসল ফলিয়াছে—সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বর্ষা ঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই তখন দেশে যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষা ও নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্য্যে ও প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তারা সব চেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপূর ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রচনা হইতে। শ্রীচৈতন্যের সময়ে ইঁহাদের রচনা বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই—সম্ভবতঃ বহু গ্রন্থ তখনও বিরচিত হয় নাই। সেজন্য তাঁহাদের রচনার প্রভাব চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্ত্তাদের রচনার বিশেষরূপ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যের তিরোধানের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের গ্রন্থগুলি বাংলার বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত হয়। তাহার ফলে ঐ সকল বৈষ্ণব গুরুদের রচনার ভাবসম্পুট চৈতন্যোত্তর যুগের অর্থাৎ খেতুরীর মহাসম্মেলন যুগের পদাবলীর পুষ্টি সাধন করিয়াছে। এই বৈষ্ণবগুরুদের রসঘন শ্লোকগুলিকে যাঁহারা পদে পরিণত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং রসকদম্ব ও গোবিন্দলীলামৃতের গ্রন্থকার যদুনন্দন দাসই অগ্রগণ্য।

বড়ু চণ্ডীদাস—বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তৎপরবর্ত্তী কালে অপরিচিত ছিল না। এই পুস্তকের দানখণ্ড, নৌকা খণ্ড ইত্যাদির পদগুলি অমার্জ্জিত ও রসাভাসদুষ্ট হইলেও পদকর্ত্তাদের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গী যোগাইয়াছিল ইহা মনে করিতে পারা যায়।

বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহেই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার পদরচনার সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

'বড়ু চণ্ডীদাসের' কে না বাঁশী বায় বড়ায়ি কালিনী নই কূলে' এইটিকে প্রথম শ্রেষ্ঠপদ বলা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ আর পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের গোবিন্দ গোঁয়ার গোবিন্দ. পদাবলীর গোবিন্দ বিদগ্ধ মাধব—রসিকচূড়ামণি। তবে রাধার সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা-চন্দ্রাবলীই যেন রূপান্তরিত হইয়া পদাবলীর চন্দ্রাবলীর প্রতিনায়িকা রাধায় পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের Realistic রাধা পদাবলীতে Idealised হইয়াছে। বিরহের অনলে রাধার বাস্তবতা বিগলিত হইয়া 'কালিনী'-নীরে মিশিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন খণ্ড হইতেই রাধার রূপান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহার্ত্তা রাধার মুখের রত্নগুলি ব্রজবুলিতে না হোক খাঁটি বাংলা ভাষায় পদগুলিতে বিকীর্ণ হইয়া আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দূতী জরতী বড়ায়ি, কৃষ্ণকীর্ত্তনের বাস্তব পটভূমিকায় জরতী অসমঞ্জস নয়। পদাবলীর সৌন্দর্য্যঘন পটভূমিকায় বড়ায়ী অচল হইয়াছে—তাহার স্থলে আসিয়াছে বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা ইত্যাদি তরুণী দূতী ও সখীগণ।

ভক্তিসাহিত্য—বিদ্যাপতি মহাকবি ছিলেন বৈষ্ণব সাধক ছিলেন কিনা জানা নাই। তিনি কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গান লেখেন নাই; তিনি অনেক বিষয়ে কাব্য ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। নরনারীর প্রাকৃত অনুরাগের গানও তিনি লিখিয়াছিলেন অনেক। সেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই, এমন কি বৃন্দাবনের পটভূমিকাও নাই। সে গুলিকেও সংগ্রাহকগণ বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বাংলার পদকর্ত্তারা প্রায় সকলেই সাধক কবি। তাঁহারা জানিতেন—তাঁহাদের দুর্লভ কবিশক্তিকে শ্রীকৃষ্ণছাড়া অন্য কাহারও উদ্দেশে নিবেদন বা ব্রজলীলা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিনিয়োগ করা স্বধর্ম্মচ্যুতি। তাই তাঁহাদের "কানু বিনা গীত নাই।"

প্রশ্ন—গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম্ম?

উত্তর—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম।

ইহাই ছিল তাঁহাদের কবিধর্ম্ম। তাঁহারা তাঁহাদের দুর্লভ কবিশক্তিকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করেন নাই। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্য বিষয়বৈচিত্র্যের দিক হইতে হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—কিন্তু ইহাতে পদাবলী-সাহিত্যের তথা প্রেমগীতিরচনার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। গোবিন্দদাস ছিলেন একজন মহাকবি। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, তাই তিনি প্রথম জীবনে হর-গৌরীর স্তবও লিখিয়াছিলেন। তিনি যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম-আশ্রয় না করিতেন—তাহা হইলে হয়ত তাঁহার কাছ হইতে আমরা নানা বিষয়ের কবিতাই পাইতে পারিতাম। কিন্তু তিনি পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হওয়ার পর আর বিষয়ান্তর লইয়া কবিতারচনা করেন নাই।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য শাখা হইতেও বুঝা যায়, ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র বিষয়-বস্তু ছিল। তাহা হইতেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের অসাধারণ কবিশক্তি ব্রজলীলা ও গৌরলীলা ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয় ইঁহারা মনে করিতেন—এই দুই লীলা ছাড়া আর সবই অনিত্য। অনিত্য বিষয়ে কবিত্বশক্তির প্রয়োগ শক্তির অপব্যবহার। যাহা অনিত্য যাহা ধর্ম্মমূলক নয় তাহাকে আশ্রয় করিলে রচনা স্থায়ীও হইবে না। বোধ হয় বিষয়ান্তর অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ের চিন্তায় তাঁহারা রস পাইতেন না। উহা তাঁহাদের চিত্তে রসসৃষ্টির কোন প্রেরণাই দিত না।

শব্দালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালঙ্কারের আতিশয্য বহু সংস্কৃত কাব্যকে দুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা যাহা হৃদয়-মাধুর্য্যের মহামহোৎসব, তাহাতে ঐ শ্রেণীর আলঙ্কারিক আতিশয্য আমরা প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু বহু পদে আমরা ক্লিষ্ট কল্পনার ও শ্লিষ্ট জল্পনার আলঙ্কারিক প্রাধান্য দেখিতে পাই। রূপবর্ণনার ত কথাই নাই—অভিসার, বয়ঃসন্ধি, বিহার, মান ইত্যাদির বর্ণনাতেও আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের প্রসাধন খুব বেশি। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বক্রোক্তি ও শ্লেষের আতিশয্য দৃষ্ট হয়।—অনেক পদ স্বাধীন ভাবাবেগের বাণীরূপ নয়—রসশাস্ত্রের অনুশাসনেই পরিকল্পিত। মনে হইতে পারে যে সকল কবি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁহারাই এইভাবে আলঙ্কারিক কৃতিত্ব দেখাইতেন। কিন্তু একথাও সত্য

নয়। রূপসনাতন ও গোবিন্দদাসের মত ভক্ত কবিও তাঁহাদের রচনাগুলিতে আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে তৃণাদপি সুনীচ নিরভিমান বৈষ্ণবভক্ত এই কৃতিত্ব দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই কেন?

ইহার একটা উত্তর আছে। ভক্ত কবিরা আলঙ্কারিক কলাচাতুর্য্য সৃষ্টিকেও উপাসনা বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। গায়ক ভক্ত যেমন কলাকৌশলময় সঙ্গীতের দ্বারা, নটী উপাসিকা বা দেবদাসী যেমন নৃত্যের দ্বারা, সুবাদক যেমন বাদ্যের দ্বারা উপাসনা করে, কবিরাও তেমনি ভাবাচ্ছন্দের মতন শিল্পের দ্বারা উপাসনা করিতেন। যাঁহার যাহা সম্বল, যাঁহার যাহা শক্তি ভগবানের উদ্দেশে তৎ সমর্পণই উপাসনা। দেবতার পূজারবেশ রচনা যেমন পরিচর্য্যা বা উপাসনার অঙ্গ, লীলাবর্ণনায় আলঙ্কারিক চাতুর্য্যসৃষ্টিও তেমনি সাধক কবিদের ছিল সাধনার অঙ্গ। যাঁহার এই রস চাতুর্য্য সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে যাঁহার বিধিদত্ত সৌকর্য্য আছে, তিনি যদি তাহা শ্যামের সেবায় নিবেদন না করেন তাহা হইলে সেবাপরাধ হইবে —সাধক কবিদের সম্ভবতঃ এই সাধনা ছিল।

শুধু কাব্য ও সঙ্গীত নয়, রূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—তাহাও শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা বলিয়াই মনে করিতেন। গোস্বামী প্রভু উজ্জ্বল নীলমণির গ্রন্থ সমাপন করিয়া বলিয়াছেন—

হে দেব, দুর্গম মহাঘোষ সাগরোৎপন্ন এই উজ্জ্বল নীলমণি আপনার মকরকুণ্ডল পরিসরে সেবকজনোজ্জিত ভজনা করুক।

কবিকর্ণপুর, রূপগোস্বামী ও জীব গোস্বামীর অলঙ্কার কৌস্তুভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিরসামৃত শেষ ইত্যাদি অলঙ্কারের পুস্তকে প্রত্যেক দৃষ্টান্তটি রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচিত। এইভাবে এই সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অলঙ্কারের গ্রন্থ-রচনাচ্ছলেও শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবিধবিষয়ক জ্ঞান যেন ভারস্বরূপ হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া তাঁহারা ভারমুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যার নৈবেদ্য যেন ভক্তি-তুলসিপত্রবাসিত হইয়া দেবপ্রসাদরূপে ভক্তজনের আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(৩)

অনির্বচনীয়তা—ব্রজের প্রেমলীলার গূঢ়তা ও গাঢ়তা প্রকাশের ভাষা মানবকণ্ঠে নাই। প্রাকৃত প্রেমের ভাষাতেই তাহার প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে যে অনির্বচনীয় নব নবায়মান মহাপ্রেমের যথাযথ প্রকাশ হইতেছে না—তাহা কবিরা অনুভব করিয়াছেন। রচনার মধ্যেই অনুভব করা যায় তাঁহাদের প্রাণের আকুলি বিকুলি। সোজা ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ঠারেঠোরে বক্রোক্তি-ব্যঞ্জনায় সাহায্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কেহ কেহ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলঙ্কারের মালা গাঁথিয়াছেন—মনে করিয়াছেন একটি তরঙ্গ যেমন রাজহংসকে অন্য তরঙ্গের দিকে আগাইয়া দেয়, একটি অলঙ্কৃতি তেমনি ভাবটিকে অন্য অলঙ্কৃতির দিকে আগাইয়া দিবে—এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত সবগুলি মিশিয়া ভাবটিকে উপলব্ধির অধিগম্য ও আস্বাদ্য করিয়া তুলিবে। আর একটি চেষ্টা অন্তর্নিহিত সুরের আবেদনের দ্বারা। প্রকাশের ভাষায় এই Mystic সুরটি পাওয়া যায় চণ্ডীদাসের অনেকগুলি পদে। চণ্ডীদাসের ভাষার সুর আমাদিগকে লৌকিক জগৎ হইতে লোকাতীত স্তরে লইয়া যাইতে পারে। সেইজন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাসের পদের সবচেয়ে বেশী আদর হইয়াছে।

পরবর্ত্তী কবিরা দেখিলেন—সর্ব্বজনের উচ্ছিষ্ট ভাষায় মহাপ্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয় তাই বোধ হয় ব্রজবুলির আশ্রয় লইলেন। তাহাতে অধিকতর ব্যঞ্জনার এবং ভাষাগত দূরত্বের দ্বারা Romance-এর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাষা ত মর্ম্মের গভীরতার ভাষা নয়। সেজন্য ব্রজবুলির পদগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে Romantic ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মত Mystic মাধুর্য্য লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃতে রচিত পদগুলি রসঘন ও গাঢ়বন্ধ, কিন্তু তাহাতে ভাষাগত ব্যবধান এতই অধিক যে ঐগুলি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে Romantic ও Mystic দুই বৈভবই হারাইয়াছে। ঐগুলি কেবল বিদ্বজ্জনের বুদ্ধিশক্তির উপভোগ্য হইয়া থাকিয়া গিয়াছে—চতুষ্পাঠীতে যতটা অধিগম্য হইয়াছে, বৈষ্ণব সমাজে ততটা হয় নাই।

চণ্ডীদাসের পর জ্ঞানদাস, বলরাম দাস ও নরোত্তম দাস মহাপ্রেমলীলার পক্ষে কতকটা উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। ভক্ত কবিরা যথাযথ ভাবপ্রকাশের দ্বারা যাহা পারেন নাই, প্রকাশের ব্যাকুলতার দ্বারা তাহা পারিয়াছেন আভাসে ইঙ্গিতে। মোটকথা, পাঠকের মন পূর্ব্ব হইতে লীলারসে অভিষিক্ত না থাকিলে কবিদের অসম্যক্ প্রকাশ পাঠকচিত্তে রস সঞ্চার করিতে পারে না—ভাবকেও উপলব্ধব্য করিয়া তুলিতে পারে না।

অলঙ্কার ও বক্রোক্তির সাহায্যে বিদ্যাপতি—তাঁহার পদগুলিকে Romantic করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু Mystic করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বোধ হয় সে উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল না। তাঁহার শিষ্য গোবিন্দদাস বক্রোক্তি, অলঙ্কৃতি ও ভাষার পারিপাট্যের সহায়তায় মহাপ্রেমলীলা বর্ণনায় অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকের গাঢ়বদ্ধতাকে তরঙ্গায়িত করিয়াও তিনি অনেক পদে মহাপ্রেমের আভাস দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

ইহার অর্থ—এ দেহ পঞ্চত্ব পাউক, আমার দেহের পঞ্চভূতের যে অংশগুলি আছে সেগুলি পঞ্চভূতে মিশিয়া যাক। তবুও বিধাতার কাছে এই বর চাই, তাহার বাপীতে আমার দেহের জলীয়াংশ, তাহার মুকুরে আমার দেহের জ্যোতিরংশ, তাহার অঙ্গনাকাশে আমার ব্যোমাংশ, পথে আমার দেহের মৃদংশ ও তাহার তালবৃন্তে আমার দেহের বায়বাংশ যেন মিলাইয়া যায়। ইহাতে গভীর প্রেম কি প্রকাশিত হইল? কিন্তু গোবিন্দদাস ইহাকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহাতে কতটা সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত,
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোবর পহুঁ নিতি নিতি নাহ
মঝু অঙ্গসলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তথি হোই মৃদুবাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

বর্ত্তমান যুগের ভাষায়—

যেথা যেথা প্রভু অরুণ চরণে যাইবে হাঁটি।
সেথা সেথা সখি আমার অঙ্গ হউক মাটি॥
যেই সরোবরে নিতি নিতি প্রভু সিনান করে।
আমার এ দেহ হউক সলিল সে সরোবরে॥
বিরহ মরণ দ্বন্দ্ব ঘুচাতে যাক জীবন।
গোকুল চন্দ্র সাথে এইভাবে হোক মিলন॥
যেই দরপণে নিজ মুখ দেখে প্রভু আমার।
অঙ্গের জ্যোতি ঠাঁই পাক মোর মাঝারে তার॥
যেই বীজনীতে প্রভু নিজ দেহ করে ব্যজন।
তাহার মাঝারে মোর দেহ হোক মৃদু পবন॥
শ্যাম জলধর প্রভু যেথা যেথা করে বিহার।
সেথায় সেথায় হউক গগন দেহ আমার॥
আমার এ দেহ মিলায়ে এমনি পঞ্চভূতে।
নূতন করিয়া পায় যেন সেই নন্দসুতে॥
কনক গৌরি, গোবিন্দ দাস তোমারে ভণে।
সেই মরকততনু তোমা ছাড়ি রবে কেমনে?

গোবিন্দদাস বিরহ মরণের নির্দ্বন্দ্বতা দেখাইয়া একটি কলিকাকে মধুগন্ধে চতুর্দ্দশ দলে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্নিগ্ধ মনোভাব হইতে মহাপ্রেমের ক্রমোদ্বর্ত্তন দেখাইবার জন্য এটি রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন—ইক্ষু হইতে মিছরিদানার ক্রম পরিণতি।

বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমুখের বাণী—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়
রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়।
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ মান ও প্রণয়
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।

রাধার প্রেম ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম এই—মহাভাব।

শ্রীচৈতন্যের এই মহাভাবাবেশ যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন—তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন—এই মহাভাব অনির্ব্বচনীয়—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পদকর্ত্তারা এই মহাভাবের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—ইহা অনির্ব্বচনীয়। কবিরা কেহ উপমার দ্বারা, কেহ অতৃপ্তির ভাষায়, কেহ প্রকাশ-ব্যাকুলতার দ্বারা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া ইহার অনির্ব্বচনীয়তাই স্বীকার করিয়াছেন।

জয় জয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম অদ্ভূত
নিতুই নূতন প্রেম অনুরাগ যুত।

রূপের ভাষায়

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। *

জং সব্বদএ উপভুজ্যমানবিব অভুঅরুব্ব জেব্ব ভোদি (নিয়ত উপভুজ্যমান হইলেও অভুক্তপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়)

এই অনুরাগ বুঝাইবার ভাষা নাই। বিদ্যাপতির নীর ও ক্ষীরের উপমায় চাতুর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

দুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোড়।
কো নাহি করল কতহুঁ পরকার
দুহুঁজন ভেদ করই নাহি পার।

রাধাকৃষ্ণ নিত্যকাল অবিচ্ছেদ্য প্রেমে আবদ্ধ—কোন পার্থিব বাধা এই অপার্থিব মিলনের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। ইহার বেশি ব্যঞ্জনা ইহাতে নাই।

দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।

মানসলোকে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদে একে অন্যের অন্তরে বিরাজ করে—

'স্বপনে না হেরত আন।'

গোবিন্দদাস শেষ পর্য্যন্ত বলিলেন—

অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মিলন অমিলন দুইই সমান।

কবিবল্লভ বলিয়াছেন—

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই-পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নোতুন হোয়।

তিলে তিলে যাহা নবনবায়িত তাহার ব্যাখ্যান কি করিয়া সম্ভব? যে প্রেম কখনও বৈচিত্র্যহীন বা পুরাতন হয় না—তাহাতে একটা তৃপ্তির ছেদ থাকিতে পারে না। তাই লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিলেও হিয়া জুড়ায় না—জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। কবিবল্লভ এখানে লাখ লাখ যুগের কথা বলিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনাদি অনন্ত চিরন্তন ইহাই ব্যঞ্জিত করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

আঁখে রৈয়া আঁখে নয় সদা রয় চিতে।
সে রস বিরস নয় জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি বাঁধি
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপন সমাধি॥

ইহাতে উল্লিখিত কবিদের কথারই প্রতিধ্বনি হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।

নরনারীর হৃদয়াবেগের ভাষায় ও ভঙ্গীতে ইহার প্রকাশ দেওয়ার চেষ্টা হইলেও ইহা অমানুষিক ও

---

* ন কেঅলং লোওত্তরস্স বত্থুনো গাঢ়াণুরাঅস্স বি ক্কেণ নিঅ গোঅরো জণো কৃখণে কৃখণে অউব্বো অউব্বো করীঅদি।

কেবল লোকোত্তর বস্তু নয়, গাঢ় অনুরাগের ধর্ম্মই এই, প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিলেও ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়।

অপার্থিব। ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে চণ্ডীদাস এই প্রেমকে ত্রিভুবনাতীত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিয়া যায় যে মরিয়া।
ভানুকমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নয় তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডিদাস কহে।

যে জন সাঁতার জানে না সে যেমন পাথারে পড়িয়া আকুলি বিকুলি করে বলরাম দাস এই প্রেমের গভীরতা বুঝাইতে তেমনি আকুলিবিকুলির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—

বসিয়া দিবস রাতি অনিমিষ আঁখি।
কোটি কল্পকাল যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিয়া তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
দেখিতে দেখিতে আঁখি কান্দে দেখিবারে।
পরশিতে চাহে অঙ্গ পরশিতে নারে॥
ঘৃত দধি করি পিয়েঁ। হেন লয় মনে।
অঞ্জন করিয়া পরেঁ। এ দুই নয়ানে॥
চন্দন করিয়া তোমা মাখোঁ মুঞি গায়।
না জানো দগধ প্রাণ তবে বা জুড়ায়॥
আন নাহি লয় মোর চিতে।
রাত্রি দিন কান্দে প্রাণ নারেঁ। পাশরিতে॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহ পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নয় থির॥

এই প্রেম অপার্থিব। লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয়। এইভাবে কবিরা মহাপ্রেমের আভাস দিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া অনির্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাঠক একজনের পদ হইতে নয়, বহুজনের পদ হইতে মহাপ্রেম সম্বন্ধে একটা আভাস মাত্র পাইতে পারিবেন। যাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধব্য তাহা কবিদের অসম্যক প্রকাশ হইতে কি করিয়া পাওয়া যাইবে?

★

জীবন-প্রশ্ন

মিতা বসু

এ জীবন,—মনে হয়,—মরা গাঙ, ধূ ধূ বালুচর,
গলিত রৌদ্রের তাপে অতীতের মুছে গেছে ছাপ
ঝিলিমিলি ঢেউ আর দু'ধারের কচি ডগা ঘাস
সবুজের বন্যা ও সুরেলা-সে স্রোতের প্রহর
কোথায় হারালো হায়, আজ জরা জীবনের তাপ
অসহ আগুন ঢালে, বীতরঙ-দিনের আকাশ
ধূসর মেঘেরা আর পিঙ্গল ধূলোর পাহাড়
তপ্ত বালুর ঝড়ে মিশে ধূ ধূ জলে একাকার।

হে আকাশ, কথা কও, মেঘের কাজল বন্যায়
ব্যথার ক্লান্তি মুছে, বালুকার ধূসর পাহাড়
দু'পায়ে গুঁড়িয়ে দাও, অফুরান কান্নায় কান্নায়
মনের প্রান্ত ছুঁয়ে, ছুঁয়ে যাক চেতন্য অপার॥

বান্ধবী

সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আস্তে আস্তে লক্ষ্মীর শিথিল হাতের বাঁধন খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম, এসে দেখি বুড়ো ম্যানেজার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন, বয়, বেয়ারা, বাবুর্চিরা অবসন্ন দেহে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা বাড়িটায় কেবল আমিই জেগে। মৃদু নাড়া দিয়ে ম্যানেজারকে উঠিয়ে দিলাম। ভীষণ বিব্রত হয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি, আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শংকিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ?

বললাম, ভয় নেই। ঘুমিয়ে আছে।

আশ্বস্ত হয়ে করুণভাবে বললেন, ডাক্তারবাবু আমায় বলে গেলেন, আপনি কিছুতেই যেন ওকে ছেড়ে না যান। আপনি চলে গেলে ও আর বাঁচবে না। শেষ পর্য্যন্ত এখানে এসেই আপনাকে থাকতে হবে। এখন কেমন আছে ?

—ঘুমোচ্ছে। বয়-বেয়ারাদের উঠিয়ে দিন। ও বেচারারা কি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছে দেখুন।

কথা শেষ করে লক্ষ্মীর ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা হল্লার শব্দ কানে আসলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফিরে দাঁড়াতেই ম্যানেজার বাবু বললেন, আপনি চলে যান। ওদিকে যাবেন না। কে জানে একটা বোতল-টোতল ছুঁড়ে মারতে পারে।

স্তব্ধ হয়ে তবু দাঁড়িয়ে আছি দেখে বিব্রত হয়ে বললেন, আপনার আর বুঝবার কী বাকী আছে ? ঐ হতচ্ছাড়া লোকটার জন্যেই তো লক্ষ্মীর এই অসুখ। কি করে যে দুপুর বেলা সকলের চোখ এড়িয়ে এসে ওপরে উঠল। ভাগ্যি তখন বাইরের লোক বড় একটা ছিল না তাই রক্ষে। লক্ষ্মী রেগে অজ্ঞান হয়ে গেল, সেই থেকেই এই অবস্থা। কেলেঙ্কারী বাঁচাবার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে লোকটাকে বিদায় করে দিলাম তখনকার মত।

—পুলিশে খবর দিলেন না কেন ?

—পুলিশ করবে কি ? ও যে আইনত লক্ষ্মীর স্বামী, যদি বলে বউকে দেখতে এসেছিলাম, পুলিশের তাতে বাধা দেবার কোন অধিকার তো নেই।

এ কথাটা আমি ভেবে দেখিনি এতদিন, এবার বুঝতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

ম্যানেজার স্বর নিচু করে বললেন, যত রাগ আপনার ওপর। দারোয়ান চাকরদের বলে দিয়েছে আপনাকে নাকি ও খুন করবে। এত রাতে এসে কী কাণ্ড করছে দেখুন না, ওরতো কোন জ্ঞান নেই, পাঁড় মাতাল। লক্ষ্মীর কানে গেলে আর রক্ষে নেই। যাই আবার দু' পাঁচটা টাকা দিয়ে আসি গে।

ম্যানেজার বাবুকে বাঁধা দিয়ে বললাম, এতে ওর গুণ্ডামী শুধু বেড়েই যাবে, টাকা দিয়ে কি মাতালকে বশ করা চলে ?

হল্লা যে তারও কানে গিয়েছে, একটু পরেই লক্ষ্মীর ঘর থেকে একটা অস্ফুট তন্দ্রাজড়িত মৃদু আর্ত্তনাদ কানে যেতেই সেটা বুঝতে পারলাম। ছুটে এলাম ওর কাছে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কোথায় গিয়েছিলে ?

—এই একটু বাইরে থেকে ঘুরে এলাম।

—রাত ক'টা বাজে ?

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, প্রায় সাড়ে বারোটা।

—তুমি শোওনি ?

—কী করে শোব ? তুমিতো হাত ধরে রেখেছিলে ?

—আমিতো ভেবেছিলাম তুমি আমার কাছেই শুয়ে আছ।

—তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলে? এখন কেমন আছ?

মাথা নেড়ে বলল, ভাল লাগছে না? তুমি কিন্তু একটুও বাইরে যেও না। আমার কাছে থাক।

অভয় দিয়ে বললাম, তোমার কাছেই তো আছি। তোমায় ফেলে কি যেতে পারি? পাগল হয়েছ?

আমার হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে পরম নির্ভয়ে চুপ করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। একটু পরে বালিশটার একপাশে সরে গিয়ে বলল, আর কত বসে থাকবে?

আবার একটু ওডিকোলনের জল তপ্ত কপালে দিয়ে বললাম, এবার ঘুমোও।

ঘুমের ওষুধে ওর দু' চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু কি এক মানসিক অশান্তিতে ও যেন ঘুমোতে পারছিল না। হাত-পাখাখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগলাম, অনেকক্ষণ পরে ওর দু'চোখে নেমে এল তন্দ্রা।

হঠাৎ বাইরে একটা কর্কশ গলার বিকট চীৎকারে ধড়ফড় করে জেগে উঠল লক্ষ্মী। বাইরে দেউড়িতে দারোয়ানদের উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল। লক্ষ্মী স্বর চিনতে পেরেছিল। তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করে উত্তেজনায় উঠে বসতে চাইল। জোর করে শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ম্যানেজার, বাবুর্চি, বেয়ারা সব ছুটে এল।

ম্যানেজারকে বললাম, যান, আপনারা ওদিকে যা হয় একটা কিছু করুনগে, আমি ওকে দেখছি।

লক্ষ্মী বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সবাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, ছেড়ে দাও আমাকে, যেতে দাও। দেখে আসি ওকে একবার। আমাকে পাগল করে দেবে ও।

বললাম, তুমি শান্ত হও। আমি যাচ্ছি না হয়।

এবার খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে শংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়তে লাগল, না না, তুমি যেতে পারবে না। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

ম্যানেজার বাবুকে ইসারায় নীচে যেতে বলে অনেক চেষ্টায় শান্ত করে লক্ষ্মীকে শুইয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুমোতে পারল না—কেমন ছটফট করতে লাগল।

রাত তখন প্রায় দু'টো বাজে। মনে হল একটু প্রলাপ বকছে, এত অসংশ্লিষ্ট আর অস্পষ্ট, কান পেতেও কিছু শোনা যায় না। ঘুমের ওষুধে খুব কাজ হচ্ছে বলে মনে হল না, অনুপায় হয়ে হাতপাখাখানা তুলে নিয়ে আবার বাতাস করতে সুরু করলাম। সেই সন্ধ্যে থেকে এমনি চলছে, আজই সবে শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছি, শরীর, মন সব আমার ক্লান্ত, ঘুমে দু'চোখ ঢুলে আসছে। পাখাটা কখন একসময় হাত থেকে খসে পড়েছে ওর গায়ে, টের পাইনি।

চমকে উঠলাম ওকে আবার জেগে উঠতে দেখে। বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, একি? তুমি ঘুমোও নি? সেই থেকে বাতাস দিচ্ছ? রাত ক'টা বাজে?

—বেশী হয়নি।

ও উঠে বসে ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করল, বললাম, আমি কি ঘড়ি দেখতে জানি নে? তুমি একটু শান্ত হয়ে শোও তো দেখি। দু'টো বেজেছে।

আমার হাত থেকে পাখাটা টেনে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, তুমি শোবে কিনা বল?

পাখাটা ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে বললাম,—এ আমার অভ্যেস আছে। কত সেবা করেছি। আর এখনতো আমার পালা, মনে নেই?—খুব আছে। কিন্তু তুমি অসুখে পড়লে কে আমায় বাঁচাবে? বলে ওর দুর্ব্বল হাতে আমাকে বুকে টেনে নিল।

নিস্তব্ধ নিশীথে, অন্ধকারের আবরণে দু'টি হৃদয় অজানী হয়ে এমনভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রইল যেন বাইরের কোন শক্তিই আর তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। এতদিন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকোচের কুহেলিকায় যা ছিল ঢাকা, আজ প্রেমের অমল জ্যোতি তার বাইরের আবরণকে দিল সরিয়ে। একজনের জীবনে এই শঙ্কাহীন অনাস্বাদিত প্রথম সান্নিধ্যকে বিহ্বল করে দিল, পাগল করে তুলল। সর্ব্বদেহে এনে দিল অসীম পুলক, অপূর্ব্ব শিহরণ। আর একজন নিঝুম হয়ে পড়ে রইল বুকের মাঝে, পরম শান্তিতে, নিশ্চিন্ত নির্ভরে।

একজনের মন চলল ধেয়ে বসন্ত রাতের পাগলা

ঝোড়ো হাওয়ার মত মহুয়ার বনে বনে মাতাল গন্ধ নিয়ে, জীবনসুরা আকণ্ঠ পান করে, আর একজন রইল পড়ে তারই বুকে নিশ্চল, নিথর, যেন উদ্বেলহীন দিঘীর জলের মত শান্ত, স্থির, অচঞ্চল।

এমনি করে ভোরের আলোয় যখন অন্ধকার গেল কেটে, লক্ষ্মী চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে পরম তৃপ্তিতে আবার আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোল।

বললাম, ছাড়বে না আমাকে?

—না।

শুধু ক্ষুদ্র একটি কথা।

—নগীন আসতে পারে।

—কেউ আসবে না।

—এখন কেমন লাগছে শরীর?

—ভাল—কালকের চেয়ে অনেক ভাল। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। তাহ'লে আর আমার অসুখ করবে না।

হঠাৎ বাইরের দরজায় মৃদু আঘাত হল।

লক্ষ্মী একটু অবাক হয়ে বলল, এ কি?

তার দরজায় যে এ বাড়ীতে এমনি করে কেউ এসে আঘাত করতে পারে না আমরা দু'জনেই তা জানতাম। সে ক্ষমতা কেবল একজনেরই আছে—তিনি লক্ষ্মীর মা।

দরজা খুলে দেখি ডাক্তার—স্মিত হাসিটি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

তেমনি হাস্যোদ্ভাসিত মুখেই বললেন, ঘরে আসতে পারি কি?

—ডাক্তারের আবার হুকুমনামা লাগে নাকি?

উনি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আপনার রোগীর খবর কি? এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম—বড় ইচ্ছে হল একবার দেখে যাই।

—আমার না আপনার?

—চলতে চলতে বললেন, রোগী আমার বটে কিন্তু রোগ সারাবার মালিক তো আপনি। কথাগুলো সবই বোধ হয় লক্ষ্মীর কানে গিয়েছিল তাই যখন ডাক্তার সাহেব চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, কেমন আছেন বলুন দেখি। তখন লজ্জায় লাল হয়ে উত্তর দিল, বলবেন তো আপনি।

হাতের নাড়ি চেপে ধরে ওষুধের শিশির দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন, একি? মাত্র দু'দাগ ওষুধ খাইয়েছেন।

আপনার আওতায় রোগী থাকলে আমাদের দেখছি উপোষ করে মরতে হবে। তারপর লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঈ সাহেবাকে খবর দেওয়া হয়েছে তো?

ম্যানেজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, দিতে দিলে তো। যা জেদি মেয়ে। কত বললাম, বলে দরকার হলে সে নিজেই দেবে।

ওষুধের আর দরকার নেই, কেবল একটা টনিক দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু পূর্ণ বিশ্রামের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে ম্যানেজার বললেন, তা তো ঠিক। কিন্তু ডাক্তার বুঝতে পেরে লক্ষ্মীকে অভয় দিয়ে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বিদায় নিয়ে বাইরে এলেন, ম্যানেজার তাঁকে রাতের ঘটনা সব খুলে বললেন। আমি সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। উনি একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, ভাবছিলাম একটু ভাল হলে বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসতে বলব। সেই ভাল হবে, এই উৎপাতের হাত থেকেও বাঁচা যাবে আর শরীরও ওর একদম সেরে যাবে। বলে, একটু ঘুরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, আমার মতের অপেক্ষায় রইলেন।

ম্যানেজার বললেন, আমি বাঈকে লিখে জানাচ্ছি তিনি অমত করবেন না। ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে ডাক্তার সাহেব আমাকে খুব উৎসাহিত করে কোথায় যেতে হবে, আর যে দেরি করা উচিত নয় এ বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

আবার অনেকদিন পরে পওয়াগড় পাহাড়ের সেই নির্জন ধরমশালায় এসে পৌঁছলাম, বান্ধবী নিয়ে। লক্ষ্মীর অনেকদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। মনে মনে একটা ঈর্ষ্যা তার ঘনায়িত হয়ে আসতো প্রায়ই, ওকে ফেলে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এখানে এসেছিলাম বলে। এখানে এসে তাই ভারী খুসি আর ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সহরের কলকোলাহল থেকে নির্জনতায় এসে। আরও খুসি হল বোধ হয় আমাকে একান্ত নিজস্ব করে পেয়ে।

সঙ্গে এসেছিল প্রচুর খাবার উপকরণ, চাকর-বাকর-দরোয়ান। ধরমশালার চৌকিদার আমাদের জন্যে এক-দিকের মস্ত একটা হলঘর ছেড়ে দিল। নীচে রইল, লটবহর আর চাকর-বাকরদের থাকবার জায়গা। লোকে হয়তো ভাবলো হয়তো হবে কোন খেয়ালী রাজকুমারীর খেয়াল। নইলে বিশেষ কোন উৎসব ছাড়া কি কেউ এই নির্জ্জন জায়গায় আসে?

বেশ কাটলো দু' চার দিন শান্ত হয়েই। তারপর খেয়ালী মেয়ের খেয়াল-খেলা হল সুরু। লক্ষ্মী ধরে বসল ওই পাহাড়ের চুড়ায় মন্দিরে যাবে। কত আপত্তি জানালাম, বললাম তোমার এরকম দুর্ব্বল আর অসুস্থ শরীর নিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু কোন কথাই সে শুনবে না। রাজকুমারীর হুকুম—টাকায় কি না হয়। ডাকলাম ছুতোর মিস্ত্রি—তৈরী হল একটা খাসের দড়ির পালকী, চারটে লোক বয়ে নিয়ে যাবে সেটা।

যখন একটা তৈরী শেষ হল, লক্ষ্মী জেদ করে বসল, তোমার জন্যেও তৈরী করতে হবে আর একটা। ঘোর আপত্তি জানালাম আমি—বললাম, তোমার মত আমি কি অসুস্থ, না মেয়ে মানুষ?

—আচ্ছা খুব মরদ! কিন্তু তোমাকে আমি অতদূর হেঁটেযেতে দেব না। বাপরে বাপ, চার হাজার ফুট চড়াই।

তর্ক যখন সপ্তমে উঠেছে, দরোয়ান এসে খবর দিল, অনেক কষ্টে মাত্র চারটে লোক জোগাড় হয়েছে, আর লোক যোগাড় করা অসম্ভব।

আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম, "হেরে গেলে তো?"

—হারতে আমি জানি না, জেদ করেই রইল সে।

—আচ্ছা লছমন্‌? তুই একটু কাঁধ দিতে পারবিনে? আমরা যদি দু'জনেই চাপি?

—হাঁ, বাঈ সাহেবা জরুর, বলে লছমন একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে পরখ করে নিল, যেন কত বাহাদুর।

হাসতে হাসতে লক্ষ্মীকে ইসপ্‌সের গাধা আর বাপ-ছেলের গল্পটা বললাম।

ও রেগে টং হয়ে বলল, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এ জন্মে হবে না। কী সব বলছ ওদের সামনে? আমি যখন বলেছি তখন তোমাকে ওতে যেতেই হবে।

—বেশ যাব, উদাস হয়ে বললাম আমি।

পরের দিন খুব ভোরে যেন অভিযানে চলেছি, এমনি করে খাবার, লট-বহর, লোক-লস্কর নিয়ে চললাম আমরা। লক্ষ্মী পালকীতে উঠে আমাকেও উঠতে বলল।

বললাম, এখন তো চড়াই-উৎরাই নেই, আর একটু এগিয়ে গিয়ে উঠবো। হাঁটতে আমার ভালই লাগছে।

ওর পালকীর পাশে পাশে আমি চললাম। যখন পাহাড়ের নীচে পৌঁছলাম, আবার ও জেদ ধরল পাল্কীতে ওঠবার জন্যে।

একটু এগুতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে তৈরী খুব প্রশস্ত একটা পথান রাস্তা এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। মনে হল পাশাপাশি চার পাঁচটা ঘোড়া একত্রে উঠতে পারে এমনি করে যেন সেটা তৈরী। উঠতে আমার ভালই লাগছিল। ওপরে যেয়ে দেখলাম আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়—একটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ। তার চারিদিকে বিরাট বিরাট গান মেটাল আর ব্রোঞ্জের তৈরী কামান ইতস্তত ছড়ান পড়ে আছে।

আমরা দু'জনে পাশাপাশি যেয়ে একটা কামানের ওপর বসলাম। নিচের পাহাড়টা একটা ড্যামের মত। মেয়েদের মেখলার মত হয়ে যেন দু'টো দিকে এসে মিলে গেছে। এই রকম একটা ড্যাম তৈরী করতে কত কোটী টাকা যে ব্যায় হত। যে প্রকৃতির খেয়াল মুহূর্ত্তে জন-পদকে ধ্বংস করে দেয়; শ্যামল বনানীতে দাবাগ্নির দাহনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এও তারই আর এক খেয়াল। যে কামানগুলি দেখলাম, ভাঙা-গড়ার শিল্পী অনন্তকাল তাকে ক্ষয়-লাঞ্ছিত করতে পারে নি। কেউ বলল এ রামচন্দ্রের তৈরী, কেউ বা বলল পৃথ্বীরাজের। শুধু পাথরের ওপর পাথর রেখে কী মশলা দিয়ে যে এ দুর্গ তৈরী যা কালের পরোয়া রাখে না। ভাবছিলাম, কেন সে মুক, মুখে ফোটে না কথা, কেন সে দেয় না সত্যের সন্ধান। কে তার শিল্পী, কে একে তৈরী করেছিল? একদিন শত শত অশ্বের খুরে খুরে যে পাহাড়ে আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠেছিল, পাহাড় উঠেছিল কেঁপে, কোন

সুদূর অতীতে এক তিল ভূমির জন্য শত শত প্রাণ অবহেলে দিয়েছিল ডালি, আজ সে নির্জ্জন নিথর। ঝিঁ ঝিঁ-র ঝিল্লিরবে মুখরিত বন্য পশুর বিচরণ ভূমি।

আবার যাত্রা হল সুরু। সূর্য্য তখন পূবদিক ছেয়ে ফেলেছে। সুরু হল পায়ে চলার পথে চড়াই আর উৎরাই। লক্ষ্মীর অস্বস্তি বেড়ে চলল আমি উঠতে হাঁফিয়ে যাচ্ছি বলে। একবার জোর করে চাপিয়ে দিল পালকীতে, কিন্তু একটু পরেই আবার ওদের কষ্ট হচ্ছে বলে নামিয়ে দিল। এমনি করে মন্দিরের একেবারে নীচে এসে পৌঁছলাম। অসংখ্য সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে, সমস্যা হল কী করে লক্ষ্মীকে ওপরে ওঠান যায়। পালকী অচল, অবশেষে লছমন্ এগিয়ে এসে কোলপাঁজা করে ওকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলে দিল।

দূর থেকে যা দেখতে পাইনি এখন তা দেখতে পেলাম, মন্দির আর মসজিদ্ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কতবার যে মন্দির মসজিদে আর মসজিদ মন্দিরে হাতবদল হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। দু'টী মন্দিরের দেওয়ালে তার সাক্ষ্য রয়েছে। সম্প্রতি মস্জিদটি পূজারীর বিশ্রাম ঘর। মন্দিরে, পাথরের অভয়া কালীমূর্ত্তি। নারকেল, চাল, খেজুর দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ পাশের দরজা দিয়ে কুটকুট করে এসে ঢুকল কতগুলো বাচ্চা নিয়ে একটা মুরগী। এমন ব্যাপার জীবনে কখনও দেখিনি। বুঝলাম এ পাহাড় মুসলমান আর হিন্দুর হাতে বার বার হাতবদল হয়েছে বলেই সেই আদিকাল থেকে বংশানুক্রমে এরা এখানকার বাসিন্দা হয়ে আছে। মন্দিরের আশ্রিত হয়ে যুগযুগান্তর ধরে এখানেই তারা আছে।

লক্ষ্মী বলল, এ মূর্ত্তি আমি আর আগে কখনও দেখিনি।

—কী করে দেখবে, তোমাদের দেশেতো আছে শুধু শুঁড়ওয়ালা গণেশ।

—আর তোমাদের বাংলা দেশে ত যত মেয়েদের পূজো করে বেড়াও তোমরা।

—তাতো দেখতেই পাচ্ছ, হেসে বললাম আমি।

—যাঃও।

—যাঃও কি, এই যে তোমার পিছু পিছু ঘুরে মরছি।

—যা বলেছ। কে যে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই জানে। আমার দিন-রাত যা চিন্তা তা তুমি কী বুঝবে? এ অসুখ আমার কেন? দিনরাত হারাবার ভয়েতো পাগল হয়ে গেলাম; বলে ধীরে ধীরে প্রতিমার উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম করতে লাগল। আমি আবিষ্টের মত চেয়ে রইলাম। লক্ষ্মী উঠে যেয়ে মূর্ত্তির কাছ থেকে খানিকটা সিঁদুর কুড়িয়ে নিয়ে এল। অবাক হয়ে বললাম, এ কি? এ দিয়ে হবে কি?

মুখ ফিরিয়ে অনাসক্ত ভাবে বলল, কী জানি।

তবু আবিষ্টের মত মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে লজ্জায় লাল হয়ে বলল, যাবে না?

হাত ধরে উঠিয়ে বললাম, চল, কিন্তু যেতে পারলাম না। দু'জনে হাত ধরে নিশ্চল-নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সামনের পাষাণ প্রতিমার মতই। মনে হল এমন কোন শক্তিই নেই যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে। দূরে আমাদের লোকজন বসে আছে। পূজারীর আবাস হ'চ্ছে পাশের ভাঙা মসজিদটায়, সারাদিনে একবার সে পূজো দিয়ে কাজ সেরে চলে যায়। সেই নিস্তব্ধ কালের প্রহরীর সামনে বাধাহীন শংকাহীন আমরা যেন এক হয়ে সমাধিস্থ হয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কেটে গেলে আবার বললাম, চল, এবার যাই।

কিন্তু লক্ষ্মী যাবার কোন লক্ষণই দেখাল না। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল, এই প্রতিমার সামনে প্রতিজ্ঞা করে বল, আমায় তুমি ছেড়ে যাবে না কখনও?

—কী পাগল।

—এ সব কথায় আমি ভুলিনা, হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল।

—বারে, এ কি বলতে হয়?

—হ্যাঁ, বলতে হয়।

—এ তো পাষাণ। এর সামনে বললেই কি বলা হয়? আমার মনের কথা কি তুমি জান না? এই যে অন্তহীন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, তার চেয়ে কি মানুষের হাতে গড়া মূর্ত্তি বড় হল?

লক্ষ্মী হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বলল, তুমি নাস্তিক, এ কথা জানি, কিন্তু এত বড় নাস্তিক, একথা জানতাম না।

হেসে ফেলে কানের কাছে মুখ নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ওর মনের কথাগুলো বলতেই হল। আর একবার প্রতিমার পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করে ও গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল। সারাটা উৎরাই ওর পালকীর সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলাম, আর একটি কথাও বলল না।

এমনি করে ধরমশালায় আরও পাঁচ সাত দিন কাটিয়ে দিলাম। সকাল-সন্ধ্যায় লম্বা প্লাটফরমটার ওপর পায়চারী করে আস্তানায় ফিরে আসি। বিকেলের ট্রেনটাই একমাত্র অল্প সময়ের জন্যে এই নিস্তব্ধ বনানীকে চঞ্চল করে আস্তে আস্তে দূরের পথে মিলিয়ে যায়।

আমরা ধরমশালার বারান্দায় বসে বসে গল্প করি।

বাইরের অঙ্গনে দারোয়ান, লছমন, আরো দশজন গাঁয়ের লোক দেশোয়ালী ভাষায় গল্প করে। সহরের গল্প শুনতে শুনতে তাদের মুখগুলো বিস্ময়ে হাঁ হয়ে ওঠে। একবার যদি সহরটা ঘুরে আসতে পারতো।

ওরা আমাদের সব সময় চোখে চোখে রাখে, পাছে কোন বিপদ ঘটে। এ সব ম্যানেজার সাহেবের চুলচেরা উপদেশের ফল।

মনে হল ওমরখৈয়ামকে। নিজের মনেই সুর রেখে গুণগুণিয়ে বলি, "এইখানে এই তরুতলে, তোমার আমার কুতূহলে"—তরুরও অভাব ছিল না, না ছিল কৌতূহলের, অভাব ছিল সুরার। ওমর খৈয়ামের প্রেমটা খাতন্ত্র হলেও ঐটে সয় না। একদিন-দুপুরে ওরা সব ঘুমিয়ে পড়লে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু যাব কোথায়? ধরমশালার নিচু থেকেই জঙ্গল সুরু হয়ে গাছ-পাথরে ঠাসাঠাসি হয়ে অনন্ত অরণ্য সুরু হয়েছে। গুজরাটের জঙ্গল, একটা সিংহ সিংহী যদি বেরোয় তবে আমাদের না হোক তাদের আহার আর সুরা দুটোই জুটে যাবে।

অদূরে একটা পাথরের ওপর বসবার উপক্রম করতে লক্ষ্মী বলল, চল না, আর একটু এগিয়ে যাই?"

আমি মিনতি করে বললাম, "পশারিণী, কথা রাখো। দূর পথে যেও নাকো, এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

ও একটু কান পেতে রইল, ময়না, কাকাতুয়া যেমন কান পেতে শোনে, তারপর বুঝতে পেরে বলল, ধ্যেৎ। যাও, তুমি দুষ্টু।

—কেন? প্রতিজ্ঞার মেয়াদ কি আজও ফুরোয় নি?

লক্ষ্মী লজ্জায় লাল হয়ে চোখ ঢাকলো।

একদিন কি যে মর্জ্জী হল রাজকুমারীর, আস্তানা গুটিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে হল। যেন "স্বর্গ হতে বিদায়" হয়ে গেলাম। অবশ্য একা নয়—এই যা। [ক্রমশঃ

★

স্মরণী

সুনীলকুমার নন্দী

আজিও নিভৃত খণে তোমার হৃদয় হ'য়ে আমার হৃদয়
গান গেয়ে ওঠে আহা! কতো না সময়
গানের আবেগে তাই ভেসে যাই পৃথিবীর ধূসর জীবন
ভুলে গিয়ে নরম আকাশ নীলে। তারপর আবার কখন
অঝরে পড়েছি ঝরে এলোমেলো জীবনের
মৌসুমী হাওয়ায়—
তবুও কি গান গাওয়া হায়রে ফুরায়!
নীল বেদনার হ্রদে বার বার ডুবে আজো বিষণ্ণ হৃদয়
গানের মায়াবী ঢেউয়ে নদী হ'য়ে বয়ে চলে, এ এক বিস্ময়
মনে হয়।

ঘুম ভুলে একা বিছানায় নীল তারার আলোকে
স্বপ্নিল শৈশব রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছি আমি
আমার হৃদয় দেখে অজস্রের চোখে
আমার চোখেতে দোলা তোমার ছায়ার মতো,
কেউ কি তা জানে?
জীবন মধ্যাহ্নে এসে দেখি শিশু-স্বপ্ন-সুর পেলো না
পূর্ণতা আজো পৃথিবীর বাহু কোণে মুগ্ধ আত্মদানে।
নিয়মের নীড়ে বাঁধা বিষয়ী পৃথিবী-মন গানের কী দাম
দেবে? কবি, চুপি চুপি দু'মুঠো বেদনা-কলি তোমার
স্মরণ-তীর্থে ভাসিয়ে দিলাম।

সিদ্ধার্থের কবিত্ব-লাভ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

রমণীয়া প্রসন্নসলিলা কল্লোলিনী তমসার তীরে নিষাদশর-হত ক্রৌঞ্চকে দর্শন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির মনে করুণার উদয় হইল। তারপর সহসা তাঁহার শোক শ্লোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি 'বাগাত্মক ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ' হইলেন। তাঁহার কবিত্ব-লাভের এই কাহিনী রামায়ণের আদিকাণ্ডে চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক, মূক বিহগের প্রতি এই সীমাহীন সমবেদনাই তত্ত্বদর্শী মহর্ষিকে রসস্রষ্টা মহাকবিতে পরিণত করিয়াছিল। বাল্মীকির এই বেদনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাঁহারে দেন, তাঁর বক্ষে বেদনা অপার,
তাঁর নিত্য জাগরণ অগ্নিসম দেবতার দান,
ঊর্দ্ধ শিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

সকলেই জানেন, মহর্ষির এই সমবেদনা হইতেই পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাকাব্য জন্ম লাভ করিয়াছে। তাই তো রামায়ণী কথা বিশ্ব-মানবের চিরন্তন সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণী কথা ভূতলে প্রচরিষ্যতি ॥'

এ উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সে বিষয়ে আজ আর কোন সহৃদয় ব্যক্তিরই সন্দেহ নাই।

বিশ্বের অন্যতম প্রকৃষ্ট মহাকাব্যের মত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেরও উদ্ভব হইয়াছে সহানুভূতি বা সমবেদনা হইতে।

একদিন দেবদত্তের শরে আহত শুভ্র মরালশিশুকে দর্শন করিয়া তরুণ সিদ্ধার্থের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি জীবনে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। যন্ত্রণাক্লিষ্ট হংসের ধূলিধূসর, রুধিরপ্লুত, পুষ্পপুঞ্জের ন্যায় পেলব দেহখানির দিকে তিনি অশ্রুসিক্ত করুণ নয়নে চাহিলেন, কিন্তু কাহারও উদ্দেশ্যে তাঁহার কণ্ঠ হইতে অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হইল না। তারপর বিহগের তূলরাশির ন্যায় কোমল দেহ হইতে অতি সন্তর্পণে বাণ নিষ্কাশন করিয়া তিনি উহার ক্ষতস্থানে ভেষজ প্রয়োগ করিলেন। বিহগ-শিশুর যন্ত্রণার উপশম হইলে দেবদত্তের সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবদত্ত বলিলেন—পাখীটি আমার, কেননা, আমার বাণে উহা বিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধার্থ বলিলেন—পাখীটি আমার, কেননা, আমি উহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। অনেক বাদানুবাদের পর বিচারকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিলেন—'যিনি হংসটির প্রাণদাতা, তিনিই উহার অধিকারী'। সিদ্ধার্থ তখন হংসটিকে লইয়া কি করিলেন? তিনি বুঝিতে পারিলেন, উদার আকাশ পাখীটিকে 'আয়, আয়' বলিয়া আহ্বান করিতেছে, পাখীর ক্ষুদ্র হৃদয়ও সে আহ্বানে

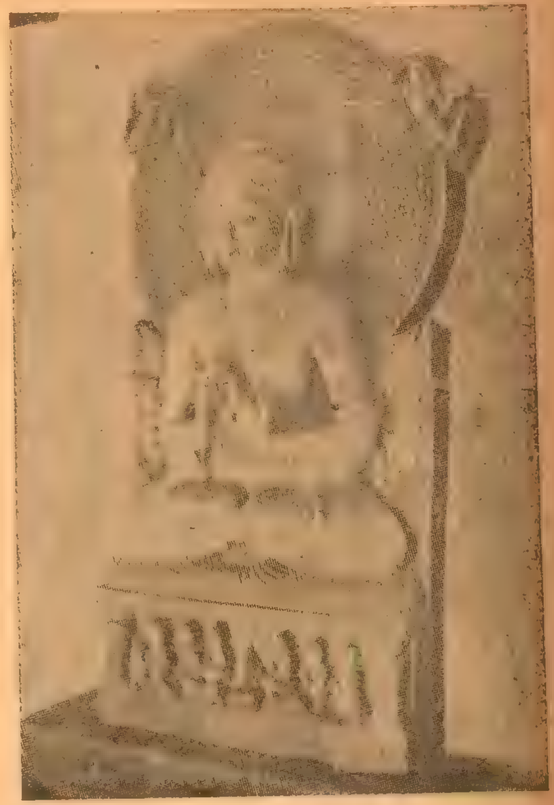

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

সাড়া দিয়াছে, তাই তিনি পাখীটিকে মুক্তিদান করিলেন। তখন বিহগশিশুর কলধ্বনিতে তাঁহার অন্তর বিপুল পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিহগের বেদনা ও আনন্দে সিদ্ধার্থের এই যে সহানুভূতি, ইহাই পরে নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই যুবক সিদ্ধার্থ, উনত্রিংশ বৎসর বয়সে, এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নিদ্রামগ্না যশোধরা ও তাহার বক্ষোলগ্ন স্নেহের পুত্তলীকে পরিত্যাগ করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।

যে বেদনায় একদিন মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল, উহা পরিমিত নয় বলিয়াই উহাতে আনন্দের অনুভূতি ছিল, আর অভিনব ছন্দে সেই বেদনা ও আনন্দই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। তাই তিনি করুণরসাত্মক অতুলনীয় মহাকাব্য রচনা করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। বাল্মীকি শুধু রস-স্রষ্টা নন, তিনি তত্ত্ব-বেত্তা ও ক্রান্তদর্শী। বাস্তবিক, যিনি মানুষকে ক্ষণিক আনন্দ দান করেন বা শ্রবণসুভগ পদবিন্যাসের দ্বারা শ্রোতার কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করেন, তিনি যথার্থ কবি নহেন, যথার্থ কবি তিনিই যাঁহার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হয়। বাল্মীকি, বেদব্যাস ও কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি; কারণ, তাঁহারা একাধারে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা; তাঁহাদের রচনাবলী যেন ভারতের আত্মারই বাণীরূপ। বিহঙ্গের জন্য বাল্মীকির যে শোক, উহা 'লৌকিক' নয় বলিয়াই তো করুণরসে পর্য্যবসান লাভ করিয়াছে। কোন্ স্মরণাতীত কালে বাল্মীকির কণ্ঠে অভিনব ছন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু যে উদার সহানুভূতির বলে তিনি শোণিতপ্লুত ক্রৌঞ্চের ব্যথা ও ক্রৌঞ্চীর মর্ম্মভেদী হাহাকারকে আপন-আত্মায় অনুভব করিয়াছেন, সেই সহানুভূতিই যথার্থ কবিত্বের উৎস। আর এইরূপ কবিরাই প্রকৃত পক্ষে লোক-কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ যেদিন মরালশিশুর বেদনা ও আনন্দ সমগ্র সত্তা দিয়া অনুভব করিলেন, সেদিন তাঁহার প্রজ্ঞা-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই কবিত্বের পরিপূর্ণ সিদ্ধির ফল সেই মহামহীরুহ, যাহার সুশীতল ছায়ায় নিখিল জগতের দাবদগ্ধ নরনারী চিরদিন বিশ্রাম লাভ করিয়া আসিতেছে।

সাম্য ও মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ভূতে দয়া, মুদিতা ও উপেক্ষার আদর্শে যিনি জগতের নরনারীকে দীক্ষিত করিয়াছেন, মারের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া যিনি দুর্জ্জয় পৌরুষের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, মানুষকে যিনি দৈব-কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন, যিনি আত্মদীপ ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব-তিথিতে, পুণ্য বৈশাখী পূর্ণিমায় আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে বারংবার অন্তরের প্রণতি জানাই।

★

যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্যং কুশলং বহুং।
—বুদ্ধদেব

বল বীর : চির উন্নত মম শির

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না ;
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।
আমি সেইদিন হব শান্ত
মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত।

—কাজী নজরুল

★

কবি নজরুল দর্শনে

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

বনস্পতির ছায়ায় নাকি অন্য কোন বনস্পতি শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া উর্দ্ধে মাথা তুলিতে পারে না ; এ-কথাট অরণ্য-জগতে যতখানি সত্য কাব্যজগতে ততখানি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আকাশে উদিত রবির মতই বাংলার কাব্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। এই কাব্য-বনস্পতি রবীন্দ্রনাথের যুগেই নজরুল ইসলামকে আমরা আর একটী বনস্পতিরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, কৃতিত্ব নজরুলেরই। দিকদিগন্ত তাঁহার কাব্য-প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা নজরুলকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বাংলাদেশে যখন রবীন্দ্রযুগ, নজরুল তখন সেখানে নিজের শক্তিশালী কলমের সাহায্যে কাব্যের ধারাকে বিচিত্র পথে প্রবাহিত করিয়া নিজের জন্য রবীন্দ্রযুগের মধ্যেও আর একটা যুগ সৃষ্টি করিলেন। এই যুগ সৃষ্টি করিতে নজরুলকে আমরা বিভিন্নরূপে দেখিতে পাই : তিনি গীতিকার—তিনি কবি, তিনি দেশপ্রেমিক—তিনি যোদ্ধা, তিনি মানবপ্রেমিক—তিনি সাম্যবাদী ; পরিশেষে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি একজন বিদ্রোহী। একই মানুষ নজরুলের এই বহুমুখী প্রতিভা তাঁহার মনের কর্ম্মশালার বিভিন্ন সময়ের সাক্ষ্য। তিনি কোমল—তিনি কঠোর।

তিনি বিদ্রোহী—তিনি দরদী। প্রয়োজনমত তাঁহার কাব্যবীণা কখনও মধুর ছন্দে কখনও-বা রুদ্রঝঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে। এই গর্জ্জন বা বিদ্রোহ শুধু মানুষের বিরুদ্ধেই ঘোষিত হয় নাই, পরন্তু মানুষের আদি পিতা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধেও ঘোষিত হইয়াছে। পাশাপাশি তাঁহার কবিতা হইতে উদ্ধৃত লাইনগুলি পড়িলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

গীতিকার হিসাবে নজরুল গজল গানের রাজা—যাহার প্রতিটি লাইন নিরস শ্রোতার মনেও রসের সঞ্চার করে। বাগিচায় বুলবুলিকে ফুল-শাখায় বসিয়া দোল দেওয়া দেখিলে মানুষের মনও অলক্ষ্যে দুলিয়া ওঠে। ফুলশাখায় দোল দেয় যে বুলবুলি—তাহাকে দেখা যায়, কিন্তু মানুষের মনে যে দোলা দেয়, সে থাকে লোক-লোচনের অন্তরালে। সেই আলোড়নে মন আন্দোলিত হয়—এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দধারায় মন কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়। এই অতি ভাল লাগায় মুর্চ্ছিত হইয়া না পড়িবার জন্য বুলবুলির কাছে কবির আবেদন : 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল'।

শুধু গজলগানেই নয়, শ্যামাসঙ্গীতেও নজরুলের কণ্ঠ ভরা :

কালোমেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
তাঁর রূপ দেখে শিব বুক পেতে দেয়
যাঁর হাতে মরণ বাঁচন॥

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে-কণ্ঠ এমন মন-মাতান গজল আর ভক্তি-অর্ঘ্য শ্যামাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ, সে-কণ্ঠই আবার জাতীয় প্রয়োজনের চরম মুহূর্ত্তে ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যুবক-বৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিতে জলদমন্দ্রে অমোঘ আহ্বান জানাইয়াছে। তখন পরাধীন ভারতবাসীর শির ছিল নত। সেই লক্ষ লক্ষ নতশির বীর ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া নজরুল একসুরে তাহাদিগকে বলিতে বলিয়াছেন :

বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।

কথাগুলো যদি কাহাকেও অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করা যায়, তবে ইহা হইতে বেশী উৎসাহব্যঞ্জক কথা আর কি বলা যাইতে পারে?

সাম্যবাদী রুশো বলিয়াছেন,—Man is born free but everywhere he is in chain. নজরুলের বিদ্রোহী মন কখনও এই chainকে স্বীকার করিয়া নিজেকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাই এই শৃঙ্খলের বিরুদ্ধেই তাঁর আত্মঘোষণা :

আমি দুর্ব্বার
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

ভারতবাসিগণও শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। পরাধীনতা হইতে স্বাধীন হইতে চাওয়া ইংরাজ সরকারের কাছে হইল অমার্জ্জনীয় অপরাধ—রাজদ্রোহ। মানুষের এই জন্মগত অধিকারকে খর্ব্ব করিবার জন্য শাসক ইংরাজজাতি এমন প্রচণ্ড শাসন আরম্ভ করিল যে মায়ের কোল হইতে ছেলেকে, রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যাপার্শ্ব হইতে স্বামীকে ছিনাইয়া আনিয়া জেলখানা পূর্ণ করিতে লাগিল। এই অন্যায়ে নজরুল-চিত্ত হইল চঞ্চল, ব্যথিত। তখন আর দশজন রাজনৈতিক দেশপ্রেমিকের মতই নজরুলের দেশ-প্রেমও মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। অমর কবি মিল্টন তাঁহার 'প্যারাডাইস নষ্ট'-এ শয়তানকে একটা বিদ্রোহীরূপে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কবি শেলী তাঁহার বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'প্রোমেথিয়াস আনবাউণ্ড'-এ একটা বিদ্রোহের কল্পনা করিয়াছিলেন। কাব্যজগতে কবি মিল্টন এবং কবি শেলীর সেই কল্পনার বাস্তবরূপ বিদ্রোহী নজরুলে এতদিন পরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অত্যাচারিত দেশবাসীর অপমানে অপমানিত হইয়া নিজের মনে যে ব্যথার পাথার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ব্যথাই কবি নজরুলকে বিদ্রোহী নজরুলরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। তাই দেশপ্রেমের অপরাধে আমাদের যে ভাই-বোনেরা তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ইংরাজের হাতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন,—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট,
লাথি মার ভাঙরে তালা
যত সব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা···

দেশবাসীর অন্তরে এই বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তিনি ভগবানকেও প্রশ্ন করিয়াছেন—তাঁহার সৃষ্টসন্তান কেন তাঁহারই সৃষ্ট অপর সন্তানকে ঘৃণা করিয়া তাঁহাকেই অসম্মান করিতেছে ?

শ্বেত, পীত কালো করিয়া সৃজিলে মানবে,
সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান,
নহে তাহা অপরাধ।
তুমি বল নাই, শুধু শ্বেত দ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশি-দীপে
সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।

—নম্রভাষায় প্রশ্নের আকারে ইহাও ভগবানের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহ ঘোষণা। এইখানে ওমর খৈয়ামের সঙ্গে নজরুলের কিছুটা মিল দেখা যায়।

নজরুলের কাব্যে যেমন সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লবের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এমনভাব পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। নজরুলের এই বিপ্লব সার্থক—তাঁহার লেখনীর জন্য। তিনি দেশের সুপ্তভাবকে তাঁহার অগ্নিবীণার ঝঙ্কারে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। বিদ্রোহীর কলমে এমন সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লবের চিত্র যেমন আর কাহারো কাব্যে অঙ্কিত হয় নাই, তেমনি মানুষের প্রতি এত মমত্ববোধ এবং অত্যাচারিত শোষিত জনগণের জন্য সহজাত বেদনাবোধ-ও কাহারো কাব্যে ফুটিয়া ওঠে নাই। অন্তরে এই পুঞ্জীভূত বেদনাবোধের তাড়নায় নজরুল অত্যন্ত দুঃখে বলিয়াছেন—

মাটীতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটীর মালিক তাঁহারাই হন···

যাহারা বর্ষার বারিধারায় আর গ্রীষ্মের খরতাপে অনাবৃত মস্তকে শরীরের রক্ত জল করিয়া মাঠে লাঙ্গল চাষ করে—জমি তাহাদের নয়। জমি যাহাদের তাহাদের পা জমিতে পড়ে না। এককথায় নজরুল বলিতে চাহিয়াছেন, 'লাঙল যার জমি তার।' এই মতবাদ প্রকাশে নজরুলকে কিছুটা সাম্যবাদী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নজরুল যে সত্যিকারের সাম্যবাদী, তাহা তাঁহার নীচের রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে—

এই ধরনীর যাহা সম্বল,—
বাসে-ভরা ফুল, রসে ভরা ফল
সুরসাল মাটী, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠগান
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান।

এই গানের রাজা, শ্যামা মায়ের চরণতলে অবলুণ্ঠিত বীর বিপ্লবী, বিদ্রোহী, মানবপ্রেমিক সাম্যবাদী নজরুল ১৯৫১ সালের ২৭শে মে পর্য্যন্ত ছিলেন আমার না-দেখা। শুনিয়াছিলাম কবি অসুস্থ। ছোটবেলা হইতে যাঁহার কবিতা পড়িয়া অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে দেখি নাই—ইহা যেন নিজের কাছে নিজেরই একটা অপরাধ বলিয়া মনে হইতেছিল। এই অপরাধ-মুক্ত হইবার জন্য কবি নজরুলকে চাক্ষুষ দেখিতে গেলাম ১৯৫১ সালের ২৮শে মে বৈকাল সাড়ে পাঁচটায়।

১৬ নং রাজেন্দ্র লাল রোড, মাণিকতলা (কলিকাতা)। সিঁড়ি বাহিয়া তিনতলায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাসাখানি ছোট। মেঝেতে একটা শতরঞ্চির উপর বসিলাম। কাপড় পরা অনাবৃত দেহে কবি দাঁড়ান। হাত জোড় করিয়া কবিকে নমস্কার জানাইলাম—কিন্তু কাহাকে ? কবির মস্তিষ্ক বিকৃত।

'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

—এই কি কবির সেই রণক্লান্ত—শান্ত অবস্থা ?

আমার সম্মুখেই দাঁড়ানো কবি নজরুল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার বহিতেছে—শরীরে আছে প্রাণ—কিন্তু প্রাণের প্রাণ নাই নজরুলের। ঐ তো মস্তক—যে স্থান হইতে বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া কবির দক্ষিণহস্তধৃত কলমের

মুখনিঃসৃত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল যুবকদের অন্তরে অন্তরে!—সে মস্তকে তখন কি! একদিন যিনি বলিয়াছিলেন—

'আমার একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য্য,' সেই হাত দু'খানি তখন শূন্য! যাঁহার কাব্যে ছিল বীণার ছন্দ, অশনি নিনাদ—সাত সাগরের গর্জ্জন, যিনি ছিলেন পরশুরামের কঠোর কুঠার, টর্পেডো, মাইন, সেই কবি তখন জীবিত থাকিয়াও জীবনের বাহিরে! একি নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা!

কবি তাঁহার বড় বড় চোখ দুইটীর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আমাকে একবার দেখিয়া নিজেই মেঝেতে জোড়াসন করিয়া বসিলেন। তারপর ডুব দিলেন মহাসাধনায়—একখানা ছেড়া ইংরাজী ম্যাগাজিনের প্রথম পাতা হইতে শেষ পর্য্যন্ত দ্রুত উল্টাইতে লাগিলেন—যেন পড়িয়া চলিয়াছেন তিনি।

ঘরখানি ছোট, চেয়ার টেবিল নাই। আছে শুধু তিনটী শূন্য আলমারী—কাঁচগুলি ভাঙ্গা। ঐ আলমারীতে পূর্ব্বে বই ছিল ভর্ত্তি। কবির চোখের আড়াল করিবার জন্য বইগুলিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে অন্য কোন স্থানে। কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত হইলেও বইয়ের নেশা কবির অটুট রহিয়াছে, তাই কবিকে ভুলাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে একখানা ছেড়া ইংরাজী ম্যাগাজিন—কবিও উহাই পড়িয়া চলিয়াছেন, চোখ দিয়া নয়, হাতের আঙ্গুলে পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া।

আর একপাশে মেঝে হইতে সামান্য উঁচু একখানা চৌকিতে কবিপত্নী রোগে আক্রান্ত হইয়া শুইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কবি কি নিজে থেকে খেতে চান?

কবি-পত্নী বলিলেন, এই অসুখের আগে খাওয়া সম্বন্ধে কোন দিনই ওঁর তেমন একটা চাহিদা ছিল না—বই নিয়েই থাকতেন। এখনও খেতে চান না। কিন্তু যখন খাওয়ান আরম্ভ করা হয় তখন বেশ খেতে পারেন।

—যে পরিমাণে খেতে চান, তা' আপনারা দেন কি?

—না। যতটুকু ওঁর দরকার, সেটা বুঝে দেওয়া হয়।

—ঘুম কেমন?

—বেশ ঘুমান। দিনে এবং রাত্রে।

ঘরে একটা রেডিও সেট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, গান শুনতে এখনও ভালোবাসেন?

—কোন কোন সময় ওঁর মুখের ভাব দেখে মনে হয়, গান ওঁর ভালো লাগছে।

—ওঁর লেখা গান যদি হয় তবে কি বুঝতে পারেন?

—না।

—ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে স্নেহ করেন?

—সব সময় নয়। মুখে তো কিছু বলেন না—আমরা কেবল ওঁর মুখের ভাব দেখে বুঝি।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টায় কবি-পত্নীকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কবি তখন পাশের ঘরে আবার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—নির্ব্বাক, বড় বড় চোখ দুইটীতে বোবা দৃষ্টি, মাঝে মাঝে মুখ দিয়া কেমন একটা শব্দ করেন—ভম্—ভম্।

মাইকেলের শেষ জীবন পড়িয়া অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছিলাম। আর সেদিন নিজের চোখে বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল এবং কবিপত্নীকে দেখিয়া নিজের মনকে এমন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলাম যাহা হইতে কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিব না। যতদিন পর্য্যন্ত কবি ছিলেন আমার অদেখা, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখ ছিল আমার এক রকম, যখন নজরুলকে চাক্ষুষ দেখিলাম, তখন হইতে নূতন আর একটা দুঃখে, বেদনায় সারা মন আমার আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফেরার পথে গাড়ীতে বসিয়া শুধু এই কথাটাই আমি ভাবিলাম,—ইহাপেক্ষা কবিকে না-দেখাই বোধ করি ভালো ছিল।

* ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবির জন্মদিন উপলক্ষে

সাধক শ্রীকবিরঞ্জন

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালিশহর কুমারহট্ট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বাসগৃহ ছিল শিবের গলিতে, জনশ্রুতি অনুসারে ঐ বাটী 'নকুল বাটী' নামে পরিচিত ছিল (নকুল-অর্থে শিব)। দয়াল ঘোষ (১২৮২ সনে) লিখিয়াছেন—"জনমানবশূন্য জঙ্গলময় প্রসাদের আবাসভূমিতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্রসাদের গৃহপ্রাঙ্গণে পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে।" নব্যভারত পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১২৯২ সনে) দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"বহুকাল হইল তাঁহার বাসস্থান ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ···। যে ভূমিখণ্ডের

সাধক রামপ্রসাদ

[দীনেশ সেনের সংগ্রহ হইতে গৃহীত]

উপর প্রসাদের বাসগৃহ ছিল তাহা দেখিলে মনে দুঃখ হয়। ···। এই ভূমিটির পূর্ব্বদিকে তিনটি বৃক্ষ একত্র বিরাজ করিতেছে, একটি বট, একটি অশ্বথ এবং একটি গাব বৃক্ষ। গাব গাছটি বহুকালের বোধ হয়। জনশ্রুতি, রামপ্রসাদ এই গাববৃক্ষ হইতে পদ্মফুল তুলিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। অতুল মুখোপাধ্যায়ের 'প্রসাদী কথা' পুস্তকে (১৩৩০ সনে) রহিয়াছে—"১ বিঘা জমির উপর প্রসাদগৃহ প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রসাদের পূর্ব্বপুরুষদের এই জমি দান করিয়াছিলেন। বাস্তু ভিটার দক্ষিণ দিকস্থ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে পঞ্চবটী ও পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন দেখিলাম। পঞ্চবটীর অশ্বথ ও বট এই দুইটি মাত্র গাছ তখনও বিদ্যমান আছে। ইহার উপর একটি গাব গাছ অর্দ্ধগলিত অবস্থায় আছে।" অতুলবাবু তৎকালে লোকমুখে যেমন শুনিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে যে দানপত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎ-সমুদয় প্রসাদের বিভিন্ন গানের সহিত মিলাইয়া দেখিলে

যশোদা

[দীনেশ সেনের সংগ্রহ হইতে গৃহীত]

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে প্রসাদ বাল্যাবধি পৈতৃক গৃহে বাস করিতেন এবং পরে (১১৬০।৬৫ সনে) সাবর্ণ চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়ের দান স্বীকার করিয়া লন। এবং সম্ভবতঃ সুভদ্রাদেবীর দেওয়া সবৃক্ষ বসতবাটীতেই বসবাস আরম্ভ করেন। এই গৃহের সংলগ্ন জমিতে উপরোক্ত পঞ্চবটী। গাবগাছে পদ্মফুল সম্পর্কে যে প্রবাদ তাহার সমর্থন গানেও পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ তরুণ বয়সের দুঃসময়ে একদা বলিয়াছিলেন, "বনের পুষ্প বেলের পাতা

মাগো আর দিব আমার মাথা" এবং প্রৌঢ়ারম্ভে গাহিয়াছিলেন—"রাম করেছেন লঙ্কা জয় নীলকমলে চরণ পূজি। আমি শতদল দিয়ে যে পদে ডঙ্কা মেরে বসে আছি॥" শতদল দিয়া পূজার কথায় প্রসাদ শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্কল্পিত পূজায় তাঁহার একটি নীলকমল কম পড়িয়াছিল। এবং উহা না পাওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা সংখ্যা পূরণ করিতে উদ্যত হন। তখন কাত্যায়নী দেবী আবির্ভূতা হইয়া রামচন্দ্রের সঙ্কল্পিত সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য একটি পদ্মপুষ্প দেন। এখানে হালিশহরে, রামপ্রসাদও উক্তরূপে নিজ মাথা দিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এরূপ করিতে হয় নাই; তিনি স্বপ্নাদিষ্টের ন্যায় অগ্রসর হইয়া গাব গাছ হইতে পদ্মপুষ্প পান এবং ঐ পুষ্পেই ইষ্টদেবীর চরণে অর্পণ

আজু গোঁসাইর বাটী

করেন। এই ঘটনা সত্য, এভাবে শতদলের উল্লেখ অন্য কুত্রাপি দৃষ্টিতে পড়ে না; বিভিন্ন স্থলে পূজাদি সম্পর্কে জবাপুষ্পেরই নাম করিয়াছেন। এই শুভ ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎ সময়ে প্রসাদ কোন চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন না। নিম্নের গানটি হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তখন দেশের ও তাঁহার নিজ-সংসারের কি অবস্থা। তিনি ইষ্ট দেবীকে বলিতেছেন—

"যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে পেয়ে নানা ভয়।
ওমা, তুমি তো অন্তরে জাগ সময় বুঝতে হয়॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায়॥

'নানা ভয়' বাক্যে অনেক কিছুই বুঝাইতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস অনুসারে রামপ্রসাদের জীবিতকালের মধ্যে বারে বারে ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি, চতুর্দ্দিকে অনাচার-অত্যাচার, রাজ্য বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে প্রজাবৃন্দ বহু নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। এই-পরিস্থিতির মাঝে তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

সমাজে-সংসারে তিনি নির্ভীক হৃদয়ে স্থিরচিত্তে সকল বিষয় সমাধান করিতেন, ব্যস্ততা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল একমাত্র সাধনা-সম্পর্কে; তাঁহার জীবনের ব্রত, সঙ্কল্প—"কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ ভাল মতে তাই জানাব। তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন যা হবার তাই ঘটাব॥" কিন্তু সময় সময় তিনি বিব্রত হইয়া পড়িতেন, তাঁহাকে ব্যাকুল করিত, একদিকে রাজা—মহারাজা—ধনী সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য অপর দিকে দীনহীন ভিক্ষুকের অন্নত্রাস। দুর্দ্দমনীয় হৃদয় যাতনায় এই বৈপরিত্যের জন্য তিনি ইষ্টদেবীকেই দোষী করিয়া বলিয়াছেন—"এক হাটে দুই দর করেছ এই মা তোর বিবেচনা॥" তথাপি একথাও অস্বীকার করেন নাই "কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন কেবা পাবে তার বাড়া॥" কুত্রাপি কোন স্থলে ভাগ্যের দোহাই দেন নাই, কর্ম্মকেই বড় করিয়া বলিয়াছেন "কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।"

নিজ সংসারে তাঁহার অভাব-অনটনের অভাব ছিল না; এক সময়ে যখন ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন দেশ বিদেশে তখন সবাই ছিল তাঁহার বশে, এখন ধন-উপার্জ্জন না হইলে "ভাই বন্ধু দারা সুত নির্দ্ধন বলে সবাই রোষে"॥ এ চিত্রে কল্পনা নাই, এ রীতি আজও প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। প্রসাদ নিজের সম্বন্ধে এবং প্রকারান্তরে নিজের সংসারেরও কোন কথা প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই। যখনই অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশেষ রকম কোন কিছু লাভ ঘটিয়াছে নিজেকে নিজেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"ওরে অধম মন, মুগ্ধ কেন অনুক্ষণ,
বিষম বিষয় মায়াজালে।
ভ্রান্তিময় এ সংসারে অজ্ঞান এ অন্ধকারে,
আছ অন্ধপ্রায় হয়ে (কভু) চাহনা নয়ন মেলে।

প্রসাদেরে বিষয় পিপাসায় করেছে পাগল প্রায়,
করিছে প্রলাপ তাই আমার আমার বোলে ॥"

এই রূপ বারে বারে নিজে সতর্ক সাবধান হইয়াছেন; কাহারও দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই মহামনা দাতাগণের ঐকান্তিকতা বশতঃ তথাপি তিনি স্বয়ং বিষয়-বৈভব এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন 'এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ।' তিনি নিজের সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কোনরূপ কর্তৃত্ব নিজের উপর রাখেন নাই, স্পষ্টই বলিয়াছেন: "আমি উপলক্ষ মাত্র, মায়া পাশে আছি ঘেরা।" সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন "জীবনধন জননীর" উপর। তাঁহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জননীর নিকট নিবেদন করিয়া নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিতেন, জননীই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। তিনি 'দুবেলা আঁচাতে' পেলেই হইল, এ অবস্থাতেও তাহাই করিলেন—

"ও মা মা বিনে দুঃখ বলব কাকে।
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখলে যাকে
পরম সুখে ॥"

আবার বলিয়াছেন—

"জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায়না খেতে, কারু পেটে ভাত
গেঁটে সোনা ॥
কেহ যায় মা পালকী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা, কেহ পায়না ছেঁড়া
টেনা ॥

রামপ্রসাদ নিজের সাংসারিক অবস্থা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধনাঢ্য বর্গের সহিত ধর্ম্মকথা কহিতেন, গান শুনাইতেন; দীনহীনকে সাহায্য করিতেন নিজ সংগৃহীত অর্থ দান করিয়া, বহু ভিক্ষুকের অভাব মোচনে সহায়তা করিয়াছিলেন (কলিকাতা ও হালিসহর প্রভৃতি স্থলের) গান ও সুর শিক্ষা দিয়া, অতিথির তুষ্টি বিধান করিবার জন্য নিজের গ্রাসটিও ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। গৃহাভ্যন্তরে রুষ্ট কথা শুনিলে ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরের কথা, তিনি ক্ষোভহীন পুরুষ, গৃহিণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াই জননীকে শুনাইয়া দিলেন "ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিখারী" ॥ এইরূপ পরিবেশের মধ্যে সর্ব্বাবস্থায় সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহাকে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ভগবতী অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের অন্নসংস্থানের ভার বহন করিতেন। বাস্তব জগতের কোন কিছুই তাঁহাকে বিচলিত বা চঞ্চল করিতে পারে নাই, কোন

প্রাচীন শিবমন্দির—হালিসহর

আকর্ষণই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; ক্ষমা বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সন্তোষ ও নিস্পৃহা এই ছয়টি গুণে অলঙ্কৃত যোগভোগরত রামপ্রসাদ "শ্যামা নাম ব্রহ্ম জেনে" শেষে ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই ছাড়িয়াছিলেন। গৃহী-সংসারী হইয়াও ত্যাগীর আদর্শ পুরুষ সর্ব্বত্যাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ রামপ্রসাদ 'বড় হবি ত' 'ছোট হ' এ মহাবাক্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনে; ভগবদ্গীতার উপদেশাবলী প্রতিভাত হইয়াছিল তাঁহার ধ্যান-ধারণা

তাঁহার ধর্ম্মে-কর্ম্মে; লোকে তাহা জানিয়াছিল, পরম ভাগবত নন্দকুমারও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপা ইষ্ট দেবীকে নিজ গর্ভ-ধারিণী জননীরূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। জননীর প্রতি সন্তানের মনোভাব স্বভাবত যেমন সহজ সরল হয় সেই ভাবেই তিনি আপনার সুখ দুঃখ অকপট হৃদয়ে নিবেদন করিতেন। আদুরে আব্দারে ছেলের মত মাতার কাছে কোন কিছু চাহিতে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই, আবার অভিমানী দুরন্ত বালকের মত তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিতেও ছাড়েন নাই। জননীর

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির—কাশীপুর

উপর তনয়ের দাবী-স্বত্ব সাব্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য তিনি ধূম করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইতেও প্রস্তুত। এ কথাও প্রসাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল—"যাকে ডাকিস্‌নেরে···সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই"। কথোপকথনের মাঝেই জননীকে বলিতেছেন—

"হ্যাদে গো জননী শিবে।
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে।
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকেতো কাজ কি আমার ভবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো মা রবে।
তখন আমি-ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে॥"

রামপ্রসাদ প্রাণ দিতে প্রস্তুত তথাপি অভয়পদ ছাড়িবেন না। সে পদে মন থাকিলে "ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম পরে। রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥" পুনরায় জননীকে শুনাইলেন—

"তুমি কি জানিবে সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না—মরিলে না।
রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের মনে,
তবু রব মার চরণে আর ত' ভবে জন্মিব না।"

প্রসাদ জন্মান্তরবাদী ছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও বলিয়াছেন—"জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।"

গানগুলির পর্য্যালোচনা হইতে দেখা যাইবে রাম-প্রসাদ জন্মান্তর স্বীকার করিয়া কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়াছেন, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার মতে কর্ম্মসাধনা ইষ্টদেবীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে (ভাগ্য নহে)।

"প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র, সে সুতার কাটনা কেটেছে।
ওমা মায়াসূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে॥"

কাজেই কর্ম্মের সহিত ইষ্টসাধনা নিতান্ত প্রয়োজন, ইষ্ট সাধনা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। একথা তিনি নানা ভাবে বিভিন্ন গানে প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে—"তারা নামে সকলি ঘুচায়। রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা সেটাও নিত্য নয়॥" অর্থাৎ নিত্য পদার্থই সাধ্য ও উপাস্য এবং সংসার-সমাজে অনাসক্ত ভাবে অথচ সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত—কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে; ফলাফলের কোন প্রসঙ্গ নাই—"ফলাফল ভাসাব নৈরাশে।" এবম্বিধ আচরণে "লোকে মন্দ বলে বলুবে তায় কিরে তোর বঁয়ে গেল। আছে ভাল মন্দ দুটো কথা যা ভাল তাই করা ভাল॥" এবং কোনটি ভাল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে বলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানকে খড়্গা, সমুদ্র, সমুদ্রতীর ইত্যাদি বহুভাবে বিশেষিত করিয়াছেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে সুষ্ঠুভাবে কর্ম্ম সম্পাদন অসম্ভব, ইহাই তাঁহার অভিমত। ইহাও দেখা যাইতেছে তিনি স্থানে স্থানে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যকরূপে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন—ষড়রিপুকে। এবং ইহাদের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র পন্থা নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন—

প্রথম—"কামাদি তুফানে হাল দমনে সতর্ক হবি।
ওরে জ্ঞান কিনারায় লাগিয়ে তরী ভক্তি ডোরে
বেঁধে থুবি॥

অনন্তর বলিলেন—

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরের বাঁধ এঁটে।
ওরে কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥

এবং "যদি না প্রবোধ মানে, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥"

গানের মধ্য দিয়াই রামপ্রসাদের খাঁটি রূপটি ধরা পড়ে। গানের ভিতর দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি। গৃহী-সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার জীবন ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারই মত সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন ভাষা ও স্বরে, এ সমুদয় তাঁহার মন-প্রাণের অভিব্যক্তি। তাঁহার ইষ্টদেবীর রাঙ্গাচরণের নূপুর ধ্বনিতে ধ্বনিত, নন্দিত,—হৃদয়তন্ত্রীর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, যে শব্দরাশি তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তর হইতে গানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে গানের রেশ সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, অদ্যাপিও তাহা অনির্ব্বচনীয় ভাবে বায়ুস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এ সকল গান সাধকের নিকট প্রতিভাত হয়, এ কথা পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন। মন্তব্য দিবার যিনি অধিকারী তিনি তাহা করিতে পারেন; সে ভাব, সে গান আমরা বুঝি না, ধরিতে পারি না, "সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥" কয়েকটি গানের অর্থ এত গভীর, উহাতে এত তত্ত্বকথা—অধ্যাপক তত্ত্বজ্ঞানীকে তত্ত্বদর্শী করে। শ্রোতাকে কোথায় কোন্ রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়, কত উচ্চস্তরে মন-প্রাণকে লইয়া যায়! নির্ম্মলচিত্ত গৃহী সাধকের মন তোলপাড় করিয়া সত্যকে বাহির করিয়া সম্মুখে ধরে, অবনমিত মস্তকে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করায়। উহার সুর—তাহার উপমা নাই। প্রসাদ আজও সজীব রহিয়াছেন তাঁহার গানের ভিতর দিয়া, অমৃতময়ী জননীর প্রিয়পুত্রের গান ও সুর অপূর্ব্ব, চিরসুধাবর্ষী, উহার অভিনবত্ব চির নূতন। কোন কোন গান অতি সাধারণ বিষয় লইয়াই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দৃষ্টিভ্রম ঘটে নাই। শিব-রাম-কৃষ্ণ-কালীকেই কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় গান রচিত।

এতদঞ্চলে উত্তরে মুর্শিদাবাদ হইতে দক্ষিণে খিদিরপুর (ভূকৈলাশ) পর্য্যন্ত তাঁহার গান তাঁহার সুর ব্যথিত হৃদয়কে শান্তি দান করিয়াছে, সাধকের সাধনায় অব্যাহত গতি সঞ্চার করিয়াছে, প্রমদার প্রমোদের প্রমাদ দূর করিয়াছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, কৃষ্ণচন্দ্র, নন্দকুমার, নবকৃষ্ণ, জয়নারায়ণ, সাবর্ণ চৌধুরী বংশ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রসাদের সহিত সদালাপের সুযোগ খুঁজিতেন। খিদিরপুরে (ভূকৈলাশে) গোকুল ঘোষাল মহাশয়ের সহিত রামপ্রসাদের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল ও তাঁহার বৈঠকে প্রসাদ গান করিতেন। তখন জয়নারায়ণ ঘোষাল

ভূকৈলাশ পতিতপাবনী মন্দির

তরুণ মাত্র। প্রসাদ তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন "দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গা নাম আমার। অনিত্য সংসার নাহি পারাবার, সকলি অসার ভেবে দেখ না॥" প্রসাদ এইখানেই বীজ বপন করিয়াছিলেন জয়নারায়ণের সুকুমার হৃদয়ে—তাহারই ফল পতিতপাবনীর মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ইহা প্রসাদের কীর্ত্তি বলিয়াই কথিত হয়—পতিত পাবনীর স্বস্বরূপ পরিগ্রহ ঝুলন উপলক্ষে। খিদিরপুরে গীত প্রসাদের গান সমুদয় ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্র বংশীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পরন্তু এক্ষণে ঐ সংগ্রহ পুস্তকখানি পাওয়া যাইতেছে না। এ দিকে পরম ভাগবত মহারাজ নন্দকুমার হুগলীতে দেওয়ান থাকা কালে রামপ্রসাদের নাম শুনিয়াছিলেন, ভিখারীর কণ্ঠে প্রসাদী সুর শুনিয়াছিলেন। অতঃপর আর স্থির থাকিতে

পারেন নাই, স্বয়ং কুমারহট্ট গ্রামে আসিয়া প্রসাদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। তদবধি মহারাজ আর প্রসাদকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দেন নাই এবং এতদূর পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে শেষের দিকে নন্দকুমার হালিশহরে আসিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রসাদের সহিত একযোগে গান করিতেন এবং প্রসাদের অনুকরণে কয়েকটি গানও রচনা করেন, নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রসাদী সুর

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব ত্যজি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে।
... ...
কহে শ্রী নন্দকুমার ক্ষমাদে হরি নিস্তার
পার হবে ব্রহ্মদ্বার শিব শক্তি আরাধনে॥

একদা নৌকাবিহাররত নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা দূর হইতে রামপ্রসাদের সুর শুনিয়া তীরবর্ত্তীস্থলে নৌকা লইয়া যাইতে আদেশ করেন এবং প্রসাদকে অনুরোধ করেন তাঁহার নিজের সুরে একটি গান শুনাইতে। প্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"কে মোহিনী ভালে ভাল শশী
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয় বাম করে মুণ্ড অসি॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী, কি পন্নগী কি মানুষী॥

... ...
ভণে রামপ্রসাদ সার না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মময়ী মহেশী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
অকার করিয়া লোপ অসি ভাব বাঁশী॥

উপসংহারে রামপ্রসাদের সমকালীন আজু গোঁসাই মহাশয়ের উল্লেখ প্রয়োজন আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কুমারহট্ট গ্রামে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া সঙ্গীতযুদ্ধের আমোদ উপভোগ করিতেন। একদিন রাজার সভায় রামপ্রসাদ গাহিলেন

"এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যিটি॥" ইত্যাদি।

আজু গোঁসাই তখনই উহার উত্তরে গাহিলেন—

এই সংসার রসের কুটি।
খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওহে যেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সংবাদ প্রভাকরে এতৎ সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আজু গোঁসাই মহাশয়ের ভিটার শেষ চিহ্নও অধুনা বিলুপ্ত।

হাভেলি-শহর = হালিশহর, প্রাচীন নাম কুমারহট্ট, এখানে বসিয়া—

"কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে॥"

বার্নার্ড শ'-সেক্সপীয়র কথোপকথন

[কাল্পনিক]

(An Imaginary talk between Shaw and Shakespeare)

মুল্কেরাজ আনন্দ

[স্থান—স্বর্গ; কাল—বানার্ডশ'র মৃত্যুর কতিপয় দিবস পরে]

সেক্সপীয়র—হ্যালো, জি, বি, এস্!

শ—কে?

সেক্স—চিনতে পারছো না? আমি উইলিয়ম সেক্সপীয়র, যদিও আমার বন্ধুরা সাধারণতঃ আমায় 'উইল' বলেই ডাক্ত।

শ—তাই বল। ষ্টীভেনসনের 'রত্নদ্বীপের' কাপ্তেনের চেহারার সাথে তোমার চেহারার এমন অদ্ভুত মিল যে আমি তো প্রথমটা তোমাকে একটা জলদস্যু বলেই ভেবেছিলুম।

সেক্স—আমার সম্বন্ধে তোমার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ বরাবরই অতিশয় রূঢ়। আমার রচনার মতো আমার চেহারাও তোমার খারাপ ঠেক্‌বে তাতে আমি বিশেষ বিস্মিত হইনি।

শ—না, না…নাট্যকার হিসেবে আমি তোমার চেয়ে বড়—আমার এই উক্তি যদি তোমার ইঙ্গিতের বিষয় হয়ে থাকে, তবে বল্‌তে হয়—আমি যা বলেছি, তা পুরোমাত্রায় সত্যি। এতে আমার ঔদ্ধত্যের কি পরিচয় পেলে তা আমার ধারণার অতীত। আর তোমার চেহারা সম্বন্ধে কি বলব—আয়নার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে, তোমাকে কেমন যেন একটু ঘিয়ে-ভাজা-মত দেখাচ্ছে!

সেক্স—তা তো সত্যিই; এ জায়গায় আমরা যখন এসে পৌঁছুই, আমাদের সকলেরই চেহারা প্রায় এ রকমটি হয়ে পড়ে। তা' ছাড়া, আমার জীবনে ঝড়-ঝাপটা গেছে তোমার জীবনের চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু তোমাকে দেখেও তো খুব ভাল মনে হচ্ছে না!

শ—তা সত্যি। কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত—আমি বেঁচেছিলুম নব্বুই বছরেরও বেশি। সে বয়সে চেহারার জৌলুষ বজায় রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার বেলা তো সে যুক্তি খাটে না। কারণ, শোনা যায়, তুমি নাকি মরেছিলে সবে পঞ্চাশ পেরিয়ে?

সেক্স—মৃত্যুকালে আমার বয়স কত ছিল—তাও তুমি জান না দেখছি!

শ—তোমাকে স্বীকার করতেই হবে—তোমার সমস্ত জীবনটাই প্রচুর গুজব আর অনুমানে ভরা। অবশ্যি, যারা বলে তোমার সব নাটক বেকনের রচনা, তাদের মতো আমি তোমার অস্তিত্বে সন্দিহান নই। তোমার সৃষ্ট অনেক চরিত্রেই তোমার অভিনয়-ভঙ্গির নির্ভুল ছাপ রয়েছে; আর তোমার লেখায় বাক্‌-স্বচ্ছতা এত বেশি যা বেকনের সাধ্যাতীত। কাজেই, তুমি যে সত্যি সত্যি বেঁচেছিলে—ল ষ্ট্রাট্‌-ফোর্ডের এক ছিঁচকে-পড়া অভিনেতা লণ্ডনে এসে স্থিতিলাভ করেছিলে—এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে যে সাহসের সহিত লড়াই করে তুমি সাহিত্যিক খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছ, তোমার সে সাহসের যদিও আমি প্রশংসা করি, তবু আমার সমসাময়িক অধিকাংশ লোকের মত আমি এত সহজে ঠকবার পাত্র নই যে তোমার অমিত্রাক্ষর-ছন্দ শোনামাত্রই আমি বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়ব।

সেক্স—তোমাকে শোধরানো অসম্ভব। আমার ধারণা, তোমার উদ্ধত বাক্‌ভঙ্গি তোমাদের এ শতাব্দীরই বৈশিষ্ট্য। তোমার এ অভদ্রতাও তাই আমি ক্ষমা করছি।

শ—আমি অভদ্র হতে চাই নি, উইল। আমার স্পষ্ট ভাষণ যদি তোমার অসন্তোষের কারণ হয়ে থাকে, তবে আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু তোমার মৃত্যুর পর অনেক সময় বয়ে গেছে আর অনেক কিছুই ঘটেছে এবং

আমরা এই বিংশ শতাব্দীর লোকেরা, তোমাদের পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকগুলোকে কতকগুলো দেহাতি-ভূত বলেই মনে করে থাকি।

সেক্স—দেহাতি ?—সে আবার কি হে ?

শ—আমার স্বদেশবাসী ডিন স্যুইফ্‌ট গেঁয়ো লোকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শব্দটি চয়ন করেছিল। সে আবার খানিকটা মানব-দ্বেষী প্রকৃতির লোক ছিল কি না।

সেক্স—আহা, আমি যদি এমন একটি শব্দ চয়ন করতে পারতুম।

শ—তোমার বিরুদ্ধে আমার এই সব চেয়ে বড় অভি-যোগ। হামেশা শব্দ-চয়ন তুমি করে গেছ—সুন্দর, রঙীন, মিষ্টি ধ্বনিসর্ব্বস্ব কথার ফুলঝুরি। কিন্তু ঐ মাত্রই। তুলনায় তাদের অর্থ-ব্যঞ্জনা খুবই কম। আমি এমন এক যুগের মানুষ—যে যুগে আমাদের ভাবতে হয়েছে, অনুভব করতে হয়েছে এবং তোমার মৃত্যুর পর রেনেসাঁর সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধির সঞ্চিত আলোকে আমাদের চেতনাকে প্রসারিত করতে হয়েছে। মানব-চরিত্রে তোমার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিকে যতই প্রশংসা করি না কেন, চতুর্থ ও পঞ্চম হেনরি নাটকে তোমার স্বেচ্ছাপ্রসূত "রণং দেহি" ভাব এবং উপমা-অলঙ্কারের অস্পষ্টতায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

সেক্স—সে অন্তর্দৃষ্টি তোমার মোটেই ছিল না বললেই চলে—আর তার ফলে তোমার নাটকের পাত্র-পাত্রীরা তোমার শ্লোগান ও লম্বা-চওড়া বক্তৃতার শুধু প্রাণহীন মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে।

শ—তোমার অভিযোগ খানিকটা সত্যি।

সেক্স—তোমার এই হঠাৎ বিনয়ে বিস্ময় বোধ করছি।

শ—না, বিনয় নয়। আমার নিজের ব্যাপারেও আমি বেশ খোলাখুলা। নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন বাড়াবাড়ি ধারণা নেই; যদিও বরাবরই আমার ধারণা (এবং সে ধারণা এখনও অপরিবর্ত্তিত) এই যে নাট্যকার হিসেবে আমি তোমার চেয়ে ঢের ঢের বড়। তুমি জানো —আমার যুগের চাহিদা তোমার সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাধ্য। বিজ্ঞানের সমস্ত বিস্ময় ও মানবিক-প্রচেষ্টার আভিধানিক জ্ঞান-কল্পদ্রুমকে কতিপয় গীতিপ্রধান রচনাংশে বিধৃত করা তোমার কর্ম্ম নয়। কতিপয় নৃপতির অথবা রাজ-সভা-পারিষদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মাধ্যমে বিশাল সাম্রাজ্য সমূহের পারস্পরিক ভীষণ সঙ্ঘর্ষের রূপায়নও অসম্ভব। যে বিপ্লবোত্তর উত্তরাধিকার আমি পেয়েছি, কোনওপ্রকার সাংকেতিক লিখনপদ্ধতির সাহায্য ব্যতি-রেকে তাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সেক্স—তোমার সময়ে তুমি যত বড় বড় ঘটনাই দেখে থাকো না কেন, মানব-চরিত্রের বিকৃতি কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। শিল্পে ব্যক্তিই চরম-কথা। মানুষেই বিশ্বের পরিচয়। যে সমস্ত অনুভূতি, আবেগ ও ঝোঁকের সমাবেশে মানবের সৃষ্টি, তাদের অবহেলা করে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। তুমি বিশ্বজগৎকে গ্রাস করতে পারো না। তোমার যা কাজ তা হোল রূপকের সাহায্যে এর তাৎপর্য বিবৃত করা—

শ—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—তুমি যে যুগে লিখে গেছ, সে যুগ যে বেশ খানিকটা অনগ্রসর, সে সম্বন্ধে তুমি যেন সচেতন নও। অবশ্যি গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার তুলনায় তোমার যুগের সভ্যতা খানিকটা অগ্রসর ছিল—একথা স্বীকার্য। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যদিও তোমার সময়ের লোকেরা মানুষের শয়তানির অন্তর্নিহিত বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তবু তোমরা অপরিজ্ঞাত অদৃষ্টে বিশ্বাস-প্রবণতা পরিত্যাগ করতে পারোনি। এই অদৃষ্ট-কেই গ্রীকরা দেবতা বলত। কিন্তু পনর শতকের পর ইয়োরোপে যে সকল বাদবিতণ্ডার ঝড় বয়ে গেছে, তাদের অনেকগুলোই ভগবানে বিশ্বাসবাদের মূলোৎপাটন করেছে। অবশ্যি, সত্যকারের আধুনিক হিসেবে আমি আমার বক্তব্য বিষয়বস্তু হতে এই ধরণের কুসংস্কারকে গোড়া থেকেই বাদ দিয়ে আমার যাত্রা সুরু করেছিলুম। আমার চোখের সুমুখে মনুষ্য-স্বভাবের পরিবর্ত্তন আমি দেখেছি। ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার যা বক্তব্য, তাতে তুমি এ পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করেছ বলে মনে হয় না। সুতরাং যাকে তুমি 'ব্যক্তি' বল সে অনুভূতি ও আবেগের শুদ্ধ পুঁটুলি মাত্র নয়; সচেতন বিপ্লবীসত্তা তার সাধ্যায়ত্ত; সে তার ভাগ্যবিধাতা। পুরাণোর খোলস বদলে নব জাতক হয়ে সে জন্মাতে পারে। অবিশ্যি, আমার এক পা তখনও ছিল উনিশ শতকে এবং তার ফলে আমার বক্তব্য পেশ

করতে গিয়ে আমাকেও এমন কতকগুলো পাত্রপাত্রীর সাহায্য নিতে হয়েছে, যারা তখনও পর্যন্ত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। মানুষ যে পরিবর্ত্তনক্ষম সে সত্যটাও তাদের নিকট ধরা পড়েনি। কিন্তু তুমি জানো না লেখকের বিশেষ প্রবণতা তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁর সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেক চরিত্রও বস্তুতঃ অনেকটা তাঁরই অনুরূপ। তাই আমার সৃষ্ট চরিত্রসমূহে দেখতে পাবে, যারা সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যেও অস্পষ্ট হলেও এই বোধ আছে যে তারা পরিবর্ত্তনক্ষম। আমার পরবর্ত্তী নাটকসমূহে আমি একটু বেশি বিদ্রোহী হওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ, আমি অনুভব করেছি, কতকগুলো দুর্বল স্নায়ু চরিত্র সৃষ্টি করে সত্য বিশ্লেষণ সম্ভব নয়; বরং মূল ধরে নাড়া দিয়ে যে সব লোক কথা বলতে পারে, তাদের পক্ষেই সত্য বিশ্লেষণ সম্ভব।

সেক্স—তোমার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ কমবেশি বিদ্রোহী—এ অভিযোগ তা হলে তুমি মেনে নিচ্ছ?

শ—বিশ্বজনীনতা রঙ্গ-মঞ্চে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলেই আমার ধারণা। বৈঠকখানার আলাপ-আলোচনাকে রঙ্গ-মঞ্চে আমিই অভিনয়োপযোগী করে তুলেছি। অথচ মজা এই যে সব মোটা-মাথা প্রেক্ষাগৃহে চকোলেট খেতে আসে, তারাও আমার বই দেখে বিরক্তি বোধ করে না।

সেক্স—তুমি কি বলতে চাও, তোমার বই দেখে কেউ কখনও বিরক্তি বোধ করে নি?

শ—অন্ততঃ তোমার বই দেখে যতটা, ততটা তো নয়ই।

সেক্স—হাঃ, হাঃ।

শ—আমার সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে আমি সুচতুর ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়েছি। এ সুসাধ্য। আমাদের সমাজের সমস্ত পরিপাটি ভণ্ডরা অভ্যাস দোষে কখনও সত্যি-কথার ধার দিয়েও যায় না। কিন্তু আমার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ পরস্পর সম্বন্ধে শুধু সত্যি কথাই বলেছে, যার ফলে এরা শ্রোতাদের চোখে মহান হয়ে উঠেছে।

সেক্স—নিজের সম্বন্ধে তোমার ধারণা নিশ্চয়ই খুব উঁচু।

শ—আমি তোমাকে এ কথাটাই বলতে চাই, নিজের সম্বন্ধে আমার উঁচু ধারণা আমার যুগের মহত্তর কৃতিত্বের প্রতিচ্ছবি মাত্র। আমি তোমার চেয়ে বড়—এ কথা যখনই বলতে চেয়েছি, তখনই আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল—আমার যুগ তোমার যুগের চেয়ে মহত্তর। অজ পাড়াগাঁ-বাসী চাষা নিজের ক্ষেত-খামারের কাজে অন্ধ হয়ে বোবা ষাঁড়ের মত যেমন আপন চিন্তাধারার মাঝে অনবরত ঘুর-পাক খেয়ে মরে, আইনষ্টাইনের চিন্তাশক্তি যেমন তার অনধিগম্য, তেমনি, বহু অসাফল্য সত্ত্বেও আমার যুগ যে দুটী চরম কৃতিত্বের অধিকারী, তাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা পনের শতকের কোন অভিজ্ঞতার পক্ষে বোধ হয় অসম্ভব। এদের একটী হল—প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যে বিজ্ঞানের সজ্ঞান প্রয়োগে সাফল্যবোধ অপরটি হল—মানুষ স্বীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তনক্ষম—যেমন রুশ-বিপ্লবের দ্বারা এই বোধ।

সেক্স—তুমি যে একজন বলশেভিক, তা আমার জানা আছে। তোমার বক্তব্য কি, তাও আমি জানি। তোমার বেপরোয়া নতুন জগতে আমি বিশ্বাসী নই।

শ—কম্যুনিষ্ট বলে নিজের পরিচয় দিতে আমি গর্ব্বিত বোধ করি। গেঁয়ো ভূতেরাই রুশ-বিপ্লবের নামে ভয় পায়। বলশেভিকরা রাশিয়ায় যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করেছে, তার প্রতি তোমার মত রাজা-উজির-ঘেঁষা লোকের সহানুভূতি আমি আশা করিনে।

সেক্স—তাদের আশ্চর্য্য সব কৃতকার্য্যতা সত্ত্বেও তারা এখনও আমার নাটকসমূহের মধ্যে তাদের আত্মার খোরাক খুঁজে পায়। শুনেছি, রাশিয়ার সর্ব্বত্র আমার নাটকের অভিনয় হয়, আর এও লোকদের মুখে শুনেছি, তাদের বর্ব্বর জনসাধারণের শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবেই নাকি সেদেশে আমার নাটকসমূহের এত সমাদর।

শ—সোভিয়েট য়্যুনিয়নের রুশ জগতের লোকেরা তোমার নাটকের যে সমাদর দেখিয়েছে, সে তাদের বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। তোমার নাটকে আমার খোরাক কিছুই নেই—একথা আমি কখনও বলিনি। বস্তুতঃ, চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকদের অপ্রলাপ দ্বন্দ্বের সাক্ষ্যহিসেবে তোমার নাটক সমূহের অবশ্যই যথেষ্ট মূল্য

আছে। আমার কিন্তু ধারণা, সোভিয়েটরা প্রধানতঃ ইতিহাসের রীতিবিচারের জন্যই তোমায় কদ্রে দিয়েছে। তা না হলে সোভিয়েট য়ুনিয়নে আমার নাটক তোমার নাটকের চেয়ে কম জনপ্রিয় নয়।

সেক্স—এ সব ব্যাপারে তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। যে সব মানুষকে জেনেছি আর যে সব ঘটনা দেখেছি ও অনুভব করেছি—তাদের কিছু কিছুর সাধারণ এক বিশ্লেষক হিসেবেই আমার স্থান। আমার রাজনৈতিক অনগ্রসরতার সপক্ষে মাত্র এইটুকুই বলতে চাই—আমার নাটকে প্রথম-প্রথম রাজা-রাজরাদের সপক্ষে ওকালতি ধীরে ধীরে অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর আস্থাবাদে পর্য্যবসিত হয়েছে। হয়ত তোমার স্মরণ আছে, সন্দেহবাদী "হ্যামলেট্" আমার মধ্যবয়সের সৃষ্টি। সম্প্রতি আমার "টেম্পেষ্ট" তুমি পড়েছ কিনা জানিনা। কিন্তু আমার ঐ শেষ নাটকে আমি এমন কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কথাও বলেছি এবং ক্যালিবান্ চরিত্রের রূপকের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিতও করেছি।

শ—উইল, তোমার বিনয়ে আমার আক্রমণাত্মক বাচনভঙ্গির কথা খেয়াল হল। তোমার রচনায় একটা ধীর নিশ্চিত পরিণতির ধারা আমি লক্ষ্য করেছি। জীবনের শেষ দিকে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারও লক্ষ্যণীয়। আমার জীবনেও পরিণতির বিভিন্ন স্তর এসেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমে আমি লিখেছিলুম কয়েকটি কাঁচা উপন্যাস। তারপর যখন নাটকে প্রথম হাত দিই, তখন সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের চোরা বালিতে আমার সফলতা ব্যাহত হয়েছে। যখন হতে মানব সমাজের একটা কাব্যিক ধারণা আমার মনে দানা বেঁধে ওঠতে লাগল, শুধু তখন হতেই আমার মনের বিভিন্ন অংশের সমন্বয় ঘটল—আর আমার লেখাও উৎরালো।

সেক্স—তোমার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে—তোমার বক্তব্যের ঝোঁক শুধু মন ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর।

শ—মানবহৃদয়ের আহ্বান আমার কানে পৌঁছায় না—এ অভিযোগ এই প্রথম নয়। কতকাংশে এ সত্যও বটে। কিন্তু মানবের হৃদয়-বৃত্তির অযৌক্তিকতার মাঝেও একটা যুক্তির বাঁধন—একটা নিয়মের ধারা আছে—এ আমি বরাবর অনুভব করেছি এবং গতানুগতিকতামুক্ত গুটিকতক মনস্তাত্ত্বিক সত্যে পৌঁছুতে চেষ্টা করেছি: যেমন, তোমার এবং তোমার মত অনেক লেখকের ধারণা, নারী পুরুষের কাঙ্ক্ষিতা, প্রেমের পাত্রী. আর আমি দেখিয়েছি, প্রকৃত পক্ষে নারীই প্রেমিক এবং পুরুষই নারীর কাঙ্ক্ষিত অনুরূপভাবে আমি বহু উনিশ শতকীয় চলতি ভণ্ডামির মূলোৎপাটন করেছি আর প্রমাণ করেছি—প্রাণ-প্রাচুর্য্যই নর-নারীকে মহত্তর করে তোলে।

সেক্স—একটা কাব্য-বোধের দ্বারা তোমার নাটক সমূহ বিধৃত—তোমার এ ধারণায় আমি বিস্মিত হচ্ছি। আমার তো ধারণা, তোমার নাটকগুলো সব সাদামেটে।

শ—আমার মনে হয় তোমার কাব্য-বোধ খুব সীমাবদ্ধ। মানব সমাজ সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধারণাটাই কাব্যিক। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কল্যাণকারিতা প্রাণ-প্রাচুর্য্যে অনুপ্রেরিত মানুষের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজ-দেহের রূপান্তর ঘটাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সেক্স—তোমার এই প্রাণ-প্রাচুর্য বস্তুটি কি? ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ-এর Elan vital (গতি চঞ্চলতা) আর এ কি একই পদার্থ? তোমার বিজ্ঞান-প্রীতি সত্ত্বেও তুমি একজন মরমী মাত্র।

শ—বার্গসঁ নিশ্চয়ই মরমী ছিলেন। আমার প্রাণ-প্রাচুর্য্যের সংজ্ঞার মূলে কতিপয় লোকের প্রচুর জীবনী-শক্তিতে আমার বিশ্বাস। জ্ঞানের সুপরিকল্পিত প্রয়োগে বিশ্বজগতের উপর জৈব ও বুদ্ধিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এদের পক্ষে সম্ভব। বলতে কি, মানবমাত্রেরই অতিমানবত্ব সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

সেক্স—তুমিও তা হলে আমার মতই বীর-উপাসক?

শ—নিশ্চয়ই। তোমার মত আমিও বীরত্বে আস্থাশীল। পাশ্চাত্য সভ্যতার খর্ব্ববামনেরা নিজেদের এবং অপরের চোখে নিজেদের এমন খাটো করে তুলেছিল যে নতুন কোন নায়কের অনুসন্ধান আমার অন্যতম প্রধান কাজ বলে মনে করেছি।

সেক্স—আমার রাজন্যপ্রীতি নিয়ে তুমি আমাকে আক্রমণ করেছ, ঠাট্টা করেছ, অথচ তুমি নিজেই হিটলারের মত লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শ—সত্যিই তো আর আমি হিটলারের প্রশংসা করিনি। হিটলার কি সুন্দর ভাবে কাজ করে তা' দেখিয়ে ইংলণ্ডের তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিকদের লজ্জা দিয়ে কার্য্যে প্রণোদিত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

সেক্স—এ শ-সুলভ একটি চালাকি মাত্র।

শ—বোকা মানুষদের সত্য দেখাবার একমাত্র উপায় হল—তর্কশাস্ত্রের প্রধান হেতুবাক্যকে উল্টে দেওয়া।

সেক্স—তোমার জীবদ্দশায় যে সকল বিপ্লব ও যুদ্ধ দেখেছ, তৎসত্ত্বেও কি মানবসমাজের কাব্যিক আদর্শে সত্যিই তুমি বিশ্বাসী ?

শ—আমার ফেবিয়ান-থিসিসকে ভিত্তি করে যখন লেনিন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন, আমার মনে হল, মানব-জীবনের কাব্যিক আদর্শের সফলতা আয়ত্তপ্রায়। দুই বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্য-জগতের কল্পনাশক্তিবিহীন পুঁজিবাদীদের ভুলই শুধু প্রমাণিত হল। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ সমাজতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। এমন কি, তোমাদের ছোট্ট নীরেট দ্বিপটী পর্যন্ত কম্যুনিজমের দাওয়াই চেখে দেখেছিল, যদিও সেই গতানুগতিক আধমরা বৃটিশ পদ্ধতিতে, যা' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মধ্যবিত্ত হাতে ক্ষমতা আসার সময় হতে ধীরে ধীরে চলে আসছে।

সেক্স—তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় তোমার আদর্শ কি ব্যর্থতা-বোধে পীড়িত নয় ?

শ—না, একজন মার্কস্-পন্থী হিসেবে বরাবরই আমি আশাবাদী। যে সব উন্মাদ আনবিক বোমা নিয়ে খেলা করছে, এরা শোষণ বিহীন সমবায়-সমাজের অপ্রতিরোধ্য ভাবাদর্শকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে বলে আমার মনে হয় না। উন্মাদের হঠকারিতার ফলে যদি আনবিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে মানুষ যে নতুন নতুন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, সে সকল ক্ষমতাই মানব-জাতির মৃত্যু ঘটাবে—এ বিপদ সম্বন্ধে আমি সচেতন নাই মনে করো না।

সেক্স—মানুষের মধ্যে যে শয়তান আছে, সে সম্বন্ধে তোমাকে একদম আনাড়ি বলে মনে হচ্ছে। একটু আগে তোমার বন্ধু এইচ, জি, ওয়েল্স্-এর সঙ্গে আলাপ হল। মৃত্যুর আগে মোহমুক্তিটা তার আকস্মিকই ঘটেছিল—সে আমায় বলল। কিন্তু চারদিকের এত সব ভাঙ-চুড়ের মধ্যেও তোমাকে বেশ নির্ব্বিকার বলেই যেন মনে হচ্ছে।

শ—আমার জীবদ্দশায় সে বিশ্বাস আমার আসে নি, শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় মানব হৃদয়ে সেই বিশ্বাস আমি খুঁজে পেয়েছি। মানব-হৃদয় অবিনশ্বর—এ বোধ আমার এসেছে।

সেক্স—তা হলে শেষ পর্য্যন্ত আমার পথেই এলে দেখছি।

শ—তোমার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে—তুমিও যেন আমার পথ ধরেছ।

সেক্স—হ্যাঁ, তা বটে। ভাবের আদান প্রদান সব সময়েই উত্তম। চল খেয়ে আসি। ঐ ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

শ—তুমি বোধ হয় এখনও মাছ মাংস খাও। আমার জায়গা ঐ অন্য টেবিলে—সেখানে বুড়ো গান্ধী আমার সাথী। বোধ হয় তুমি জান—আমি গত ষাট বছর ধরে নিরক্ষ নিরামিষাশী। সুপ্রভাত, তোমার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলুম—আর এও বুঝলুম—আমরা দুজনেই প্রায় সমান সমান।

অনুবাদক : অনিলকুমার আচার্য্য

কবিতা

কলকাতা-র প্রার্থনা

বটকৃষ্ণ দে

এখানে আকাশ নেই : নেই জাম-জারুলের পাতাঝরা জল
আমের বনের বৃষ্টি : শিশিরের টিপ-আঁকা কাশের কাজল :
সেই ছোটো খুশি-হাওয়া,রূপকথা-বাসরের বাসন্তী বাসনা :
নেই আজ নেই, সেই স্মৃতির সোনালী রঙে বর্ণালী বর্ণনা !

এখানে কলকাতায় কালো হ'য়ে ঝরে যায় হৃদয়ের সোনা !

কলকাতায় বাঁচা যায় কী ক'রে তাহলে বলো !
তুমি কি জানো না,
এতো স্বপ্ন, এত সাধ অগাধ কামনা নিয়ে এই গান বোনা
কেন-বা এ-কার জন্য ! তোমার নামেই জ্যোতির্ময়
আকাশের-সাগরের মিল খুঁজে সবুজের, তবু জের টানি
জীবনের। তা হলেই ফাঁকা হয় স্তম্ভিত সময়,
তা হলেই হাল্কা হয় ধুলোজমা এই মন,
হাওয়া দেয় অগণন,
খুলে যায় ব্যথার বুনানি !

এখানে বইএর পাতা, আর তুমি, তুমি আর এ'-তা'—
এই নিয়ে বেঁচে থাকি ! এরও মাঝ থেকে তুমি
যদি চ'লে যাও
তোমার মনের মেঘ শ্রাবণের বৃষ্টি ক'রে মরুমাঠে
যদি-না ঝরাও
তবে কী রইলো, বলো ! টেবিলের জড়ো-করা
খান ক'টি বই,
আর আমি একাকী অথই !

আমাকে এমন ক'রে একা ফেলে, ভয় দিয়ে যেওনা কখনো
এখানে বাতাস নেই : নেই কোনো চোখে-ঝরা
উপচানো জল :
আহা সেই মুখ নেই, ছোটো সুখ, ঢেউ-চোখ,
ছায়াছলোছল :
কে তবে বাঁচাবে বলো ! এখানে একটি কোনো
নীলমন নেই :
যে-মন হ্রদের মতো কলকল তানে—
ভালোবাসা ঢেলে প্রাণে, পরিপূর্ণ ক'রে দিতে জানে ॥

ঋতুদগ্ধ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি তো দু'-চোখ ভ'রে শ্রাবণের স্নেহই চেয়েছি।
আমি এই অপরাহ্ণ হলুদ আলোর কানে-কানে
তোমাকেই খুঁজে ফিরি। তোমারই তো সে-গান গেয়েছি।
আমার হৃদয় প্রিয় ভ'রে দাও স্বপ্ন গানে-গানে।

আমি তো ভীরুতা চেয়ে শীতের শিশিরে ঢাকি মুখ
কতোবার, কুয়াশার কান্না হ'য়ে, বৃষ্টি হ'য়ে ঝরি
বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ; মৃত্যু-তরঙ্গের আবেগে উৎসুক
পাতাঝরা বেদনায় এ-হৃদয়শিখা তুলে ধরি !

আমি তো রাত্রির নদী, ভোরের আলোর সুষমায়
হৃদয়কে মেলে ধ'রে ঝরে যাই অস্ফুট কান্নায় !
ভাদ্রের উজ্জ্বল দিনে মুক্তমেঘ প্রসন্ন আকাশ,—
অরূপের নৃত্যচ্ছন্দে আশ্বিনের শুভ্রতনু কাশ !

সব শোক ভুলে যাই, অমর্ত্য-রঙিন গোধূলির
লাল মেঘে যার নাম লিখে যাই মায়াবী অক্ষরে,
নিবিড় গভীর ম্লান সন্ধ্যা এসে জানি পূরবীর
শোনাবে করুণ তান ; সে-নাম হারাবে এ-প্রহরে !

তবুও অদম্য তৃষ্ণা। তুমি যতো বৈশাখের গান
শোনাও, যতোই আলো কৃষ্ণচূড়ার সুরে মন,
উদ্ধত শপথে হও মরুদগ্ধ মেঘ, হানো প্রাণ,
আমি তো হৃদয় ভ'রে শুধু স্নেহ চেয়েছি শ্রাবণ !

আমি যে দু'-চোখ ভ'রে বৃষ্টিস্নিগ্ধছায়া খুঁজে মরি :
হৃদয়ে একান্ত হও তুমি সখি, শ্রাবণ-শর্বরী ॥

নিবৃত্তি

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

—আমার যেটুকু দরকার, কেবল সেটুকুই চাচ্ছি। বেশীর কথা বলব কেন? জায়গা তো আর আমার সঙ্গে যাবে না, বাবাজী, ক'দিনই বা আছি। এই বোশেখে সত্তরে পা দিলুম।

মাধব কোন জবাব দিলে না—মুখ নিচু করে বসে রইল।

মহাদেব মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু বাইরে সেভাব প্রকাশ করলেন না; বরং শান্ত কণ্ঠে বললেন: মুখের কথার দরকার কি—দেখিয়েই দিচ্ছি, চল। মহাদেব বেতের লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠনে নামলেন। মাধব নিঃশব্দে অনুসরণ করল।

একটা বাগান ঘুরে মহাদেব ভট্টচায ভাইপোকে নিয়ে বাড়ীর পুবদিকে গাঁয়ের রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর পশ্চিম মুখো হয়ে লাঠিটা তিনদিকে ঘুরিয়ে বললেন: অতি সামান্যই বাবাজী, উত্তরে-দক্ষিণে হাত পাঁচেক আর পুবে-পশ্চিমে হাত দশেক, এটুকু পেলেই রাস্তাটা বের করতে পারি। বাড়ীটা একেবারে কাণা হয়ে আছে—এককণা আলো পড়ে না। অন্যায় বলেছি কিছু? মহাদেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাইপোর দিকে তাকালেন। মাধব তবুও কিছু বললে না। মহাদেবের ধৈর্য্য ভেঙে পড়বার উপক্রম হ'ল। কিন্তু পড়তে দিলেন না তিনি। সংযত কণ্ঠেই বললেন: তোমরা দেশ ছেড়েছ বললেই হয়। লেখাপড়া শিখেছ, চাকরী-বাকরী করছ। বিদেশে ঘরবাড়ীও করেছ। কিন্তু আমার? পিতৃপুরুষের এই ভিটে ছাড়া আমার গতি কি, বল? ভেবেছিলুম ভবাটা মানুষ হবে। শেষ বয়সটা কাশী গিয়ে বিশ্বনাথের চরণামৃত পান করে কাটাব। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কি বলব—চোখের ওপরই তো দেখছ। সারাদিন টো টো কোম্পানী করছে। ভাবনা তো ওরই জন্তে। একটা ব্যবস্থা তো করে যেতে হবে।

মাধব অনেকক্ষণ পরে সায় দেবার মত একটা কিছু পেয়ে বললে: সে তো বটেই। মহাদেব স্মিতমুখে বললেন: কিন্তু, কর্ত্তব্য কি কেবল আমারই? ধর, আজই যদি চোখ দুটো বোজে, বলা তো যায় না—তখন? তখন তুমি ছাড়া ওর কে আছে, বল? বংশের প্রধানই বল, আর প্রদীপই বল, সে তো তুমিই—

মাধব মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু কিছু বললে না।

মহাদেব বলে যেতে লাগলেন: মনে রেখো বাবাজী, তারানাথ তর্কালঙ্কারের বংশধর আমরা।

—সে কথা অনেক সময়ই ভাবি।

মহাদেব উৎসাহিত হয়ে বললেন: তা'হলে আরও ভাবো—তোমাদের অবর্ত্তমানে তোমাদের অংশের অবস্থা। জঙ্গলে-আগাছায় ভরতি হয়ে হয়েছে সাপ-শেয়ালের আড্ডা। আর তিনদিকে এই জঙ্গল নিয়ে ভবা থাকবে একা। আমি আর ক'দিন পাহারা দেব। তাই বলছি, বাবাজী, জায়গাটুকুন ছেড়ে দাও। যে দাম চাও, সেই দামই দেব। চাও তো বদলে অন্য ভাল যায়গা দেব। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। উপরন্তু তোমার বাড়ী-ঘরদোর, পুকুর-বাগান জমি-যায়গার দেখাশুনা হবে। বিদেশে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারবে। আমিও শেষ বয়সটা নির্ভাবনায় ভগবানের নাম করে কাটাতে পারব। পরকালের জন্তে তো কিছুই করলাম না—ভবার ভাবনাতেই —যাক্, অনেকদিন পরে এসেছ, আবার কবে আসতে পার, ঠিক কি—আর আমার তো কিছুই ঠিক নেই—দেখা নাও হতে পারে। তাই এ যাত্রায়ই একটা ফয়সালা করে যাও—এই বলে মাধবের হাত দুখানা ধরলেন।

মাধব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিতৃব্যের পায়ে হাত দিয়ে বললে: এমন করে বলবেন না জ্যাঠামশায়! আপনি

তো জানেন, জমি-জমার ব্যাপারে আমি থাকিনে। যা করবার মা-ই করেন। তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলব।

মহাদেব শুষ্ক মুখে বললেন: বেশ, তাই কর। আমিও সদর থেকে ঘুরে আসি। হালদারদের মামলা নিয়ে বড্ড ঝামেলায় পড়েছি। খরচ করবে না আধ পয়সা—ডিক্রী চাই হাজার টাকার।"

মহাদেবের বরাবরের ইচ্ছে, বাড়ী থেকে সিধে একটা রাস্তা গাঁয়ের প্রধান সড়ক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যান। অনেকটা নিয়েওছেন। কিন্তু খানিকটার জন্তে তাঁকে থামতে হয়েছে। সামনে পড়েছে মাধবের জায়গা। মহাদেব ইচ্ছে করলে রাস্তাটা একটু ঠেকিয়েও নিতে পারেন। কিন্তু তাতে সংপ্রতি যে পাকা বাড়ীটি তুলেছেন, সেটি ঢাকা পড়ে যায়। তাই মহাদেব অত করে বলছিলেন।

কথিত জমিটুকু মাধবের বাগানের একটা অংশ। মাধবের বাবা অনেক অর্থ ব্যয় করে বাগানখানা করেছিলেন। নানা রকমের ফলের গাছ ছাড়াও দক্ষিণদিকের সীমানা ঘেঁষে কয়েক ঝাঁড় বাঁশও আছে। বাগান করার সময় মহাদেব দক্ষিণদিকের সীমানা সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ ওকে ম যেতেন না। তাছাড়া আইনের দিক থেকেও মহাদেবের কোন এক্তিয়ার ছিল না। এসব ঘটে মাধবের ছেলে-বেলায়। বড় হয়ে এসব শুনেছে সে।

মাধব চলে গেলে মহাদেব খানিকক্ষণ জমিটুকুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বললেন: মাধব! সোজা আঙুলে ঘি ওঠেনা বলেই আঙুল বাঁকোতে হয়। কী করব, বাবাজী, আমি নিরুপায়। যেমন করেই হক্, ওটুকু আমাকে নিতে হবে।" মহাদেব ভট্টচায ডাকসাইটে মামলাবাজ। মামলা বাধাতে ও তার তদ্বির করতে গোটা ইউনিয়নে তাঁর জুড়ি নেই। জমি-জমা ও তালুকের মালিকমাত্রেই সমীহ করে চলে মহাদেবকে। জেলার উকিল-মোক্তাররাও তাঁর সম্পর্কে কম হুঁশিয়ার নন। মহাদেব যে পক্ষের তদ্বির করে, সে পক্ষের জয় প্রায় অবধারিত। প্রতিপক্ষের আইনজীবীরা তাই মামলা নেবার সময় জিজ্ঞেস করে, মহাদেব কোন্ পক্ষে? এ ভাবে সুযোগ (প্রায়ই সৃষ্টি করেন) বুঝে দাঁও মেরে মেরে কেবল দু'পয়সাই নয়—দু'পাঁচখানা তালুকও করেছেন, এর সঙ্গে বন্ধকী-তেজারতি চালিয়েও বেশ কিছু জমিয়েছেন। লোকে বলে, ও তল্লাটের গরীবদের সব সোনাদানা ও কাঁসা-পেতলই মহাদেবের সিন্দুকবন্দী। কয়েকবার ডাকাতিও হয়েছে। কিন্তু সামান্য কাঁসা-পেতল ও দু'দশ টাকা ছাড়া আর কিছুই নিতে পারেনি তারা। সোনারূপা মহাদেব ঘরে রাখেন না। সেদিকে তিনি খুব হুঁশিয়ার। একবার ডাকাতরা কিছু না পেয়ে তাঁকে রামদা'র এক ঘা বসিয়ে দিয়ে যায়। তবু মহাদেব নিরস্ত হন নি। মামলা ও তেজারতি তাঁর কাছে নেশার মত। এ তিনি ছাড়তে পারেন না। বন্ধুরা অনুরোধ করলে বলেন: ছাড়ব যে—থাকব কি নিয়ে? ছেলেটাকে তো আর পথে বসিয়ে যেতে পারিনে। সদর থেকে ফিরে এসে মহাদেব মাধবকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কি স্থির করলে, বাবাজি?

মাধব বিনীত কণ্ঠে বললে: মা রাজী হচ্ছে না—বলে, স্বামী-শ্বশুরের সম্পত্তিতে তার হাত দেবার অধিকার নেই।

মহাদেব কয়েকমুহূর্ত্ত গুম হয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন: আর কি বলব, বল? ভবাকে ভগবানের হাতে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছেই সব, তুমি আমি কি করতে পারি? নিমিত্ত বৈ তো নয়—বলে হাত দুখানি জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন। খানিক পরে বললেন: ক'দিন আছ?"

—এ হপ্তাটা।

—শুনলাম, বৌমা কাশী যাচ্ছে?

—হ্যাঁ, মা কাশী থাকাই স্থির করেছে।

—খুব ভাল, খুব ভাল। আমিও ভাবছি, ৺পূজাটা কাটিয়ে তীর্থগুলো ঘুরে আসব। মন তো সেদিকেই পড়ে রয়েছে। কেবল ভবাটার জন্তে—তা কতকাল থাকব?

মাধবের কাছে মিছে বলেন নি মহাদেব। ৺পূজার পরে সত্যই তিনি কাশী-গয়া-হরিদ্বার ঘুরে এসেছেন।

মাধবকে সে কথা লিখেও জানালেন। শেষের দিকে লিখলেন: তীর্থপর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। শরীর দিন দিনই ভেঙে প'ড়ছে। এখন শেষের দিন ক'টা শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে শান্তি দিতে পার একমাত্র তুমিই—ভবা নয়। তাই বলছি আমার অনুরোধটা বৌমাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিও। তাকে ব'লো বৃদ্ধের এই শেষ অনুরোধ—হ্যাঁ শেষ অনুরোধই, যেন অগ্রাহ্য না করে। তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সত্যই মহাদেবের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। এখন আর সদরে দৌড়াদৌড়ি করেন না, করতে পারেন না। বাড়ীতে বসেই মক্কেলদের বুদ্ধি পরামর্শ দেন। এতেও নেহাৎ কম কামাই হয় না। কিন্তু মনে তার শান্তি নেই। মাধব জানিয়েছে, বার বার অনুরোধ জানিয়ে তিনি যেন আর লজ্জা না দেন।

চিঠিটা পাবার পর থেকে মহাদেব বড় গম্ভীর হয়ে গেছেন। গাঁয়ের লোকজনও অবাক। আবাল্য বন্ধু মহেন্দ্র দাস ও গোলক রায় এলেও আগের মত আর জমে না—তেমন পাঁচ কলকে তামাক পোড়ে না। একদিন মহেন্দ্র বললেন: তুমি হঠাৎ এমন মনমরা হয়ে উঠলে কেন, বল তো? ব্যাপার কি?

—তুমি তো জানো, সবই প্রায় একরকম গুছিয়ে এনেছিলুম—পারলাম না কেবল রাস্তাটা বের করতে—বলে জানালার ফাঁক দিয়ে অসমাপ্ত রাস্তাটার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মহাদেব।

মহেন্দ্র বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন: অবাক্ করলে তুমি। গোটা ইউনিয়নের নক্সা উল্টে দিলে—আর ঐ এক ফালির কিছু করতে পারছ না!

মহাদেব শুষ্ক হাসি হেসে বললেন: ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছে নয়।

এমনি করে দিন মাস বছর গড়িয়ে চলে—রাস্তা আর শেষ হয় না, মহাদেবের স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে থাকে। সামান্য চলাফেরাতেও তার কষ্ট হয় এখন, ডাক্তার ও হিতৈষীদের পরামর্শে এখন আর তিনি বাইরে বেরন না—বেশীর ভাগ সময়ই বারান্দায় শুয়ে কাটান। আর অসম্পূর্ণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবেন। এ ছাড়া, আর একটা কাজ করছেন মহাদেব। ভবানী যাতে বিষয়-আশয় বুঝে থেতে পারে, সে সম্পর্কে তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছেন, দেনা-পাওনা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করছেন, দলিল-দস্তাবেজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কয়েক মাস পরে মহাদেব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সামনেই কার্ত্তিক মাস। গাঁয়ের লোকে বলাবলি শুরু করল, ভট্টচায বুড়ো এ কার্ত্তিক আর কাটাবে না—একে হাঁফানীর রোগ, তার ওপর জুটেছে নানান উপসর্গ। একজন বললে: আফিংয়ের মাত্রা বাড়িয়েও নাকি কোন ফল হচ্ছে না, দুর্মুখ ভজহরি বললে: হওয়া-না-হওয়া আমাদের কাছে একই কথা। একপাত মারবে, সে আশা ক'র না। সারা রাত জেগে পোড়ালেও সেই ঘনশ্যামের ঘোল আর গোবিন্দের গুলি। এ কি মাধব যে, শহর থেকে দই-রাবড়ী এনে খাওয়াবে?

৺পূজাটা নির্ব্বিঘ্নেই কেটে গেল। কিন্তু আশ্বিনের শেষেই একদিন টান উঠল। মহাদেব বুঝলেন, দিন শেষ হয়ে আসছে। ভবানী বাড়ী ছিল না। তাগাদায় বেরিয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে এল। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ডাক্তার এসে দেখেশুনে বললেন: চিকিৎসার তেমন কিছু নেই, তবে কয়েকটা ইন্‌জেক্‌সান দিতে পারি—

মহাদেব মৃদুকণ্ঠে বললেন: আর খোঁড়া-খুঁড়িতে কাজ নেই বাবা, পারো তো অন্য চেষ্টা দেখ।

ডাক্তার ভবানীর দিকে তাকালেন, ভবানী বাপের দিকে তাকাল। মহাদেব হাত নেড়ে আপত্তি জানালেন। অগত্যা ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপসান লিখে দিয়ে গেলেন।

মহাদেব ইঙ্গিতে ছেলেকে মাথার কাছে বসতে বললেন। ভবানী যথাস্থানে বসলে মহাদেব টেনে টেনে বললেন: বাইরের লোক কেউ নেই তো এখানে?

—না।

—গোলক ও মহেনকে খবর দিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

মহাদেব একটু দম নিয়ে খানিক পরে মৃদুস্বরে বললেন, আমি বুঝতে পারছি, আমার সময় হয়ে এসেছে। একটা

কথা অনেকদিন বলি-বলি করেও বলা হয়নি। আর হয়ত সময় পাব না। একটু জল দে—"

ভবানী মুখে জল ঢেলে দিল। মহাদেব কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবলেন, তারপর বললেন: জীবনটা হেলা ফেলা নয়, ভবানী। কঠিন সংগ্রামের, কঠিন হিসাবের। সংগ্রাম অবশ্য তোকে করতে হবে না। যা রেখে গেলাম, বুঝে চলতে পারলে কোন কষ্ট পাবিনে। একটা কাজ কেবল বাকী রইল, রাস্তাটা শেষ করে যেতে পারলাম না। সেটি তোকে করতে হবে—

হ্যাঁ, তোকেই করতে হবে—বলতে বলতে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। শ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুততর হল। ভবানী ও তার মা মাথার কাছে ঝুঁকে এল। কিছুক্ষণ পরে মহাদেব বললেন: জগবন্ধুদের খবর দে—একটু নামকীর্ত্তন করবে।

বলতেই মা ও ছেলে আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন। মহাদেব বললেন: এখনও সময় হয়নি গিন্নী। আমার আরও বলবার আছে। এই বলে ভবানীর কানের কাছে মুখ রেখে অস্ফুটে কী যেন বললেন। শুনে ভবানী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকাল। খানিক পরে বললে: তুমি বলছ কি? সে কি করে হয়?

—বেশী বকাস্ নে ভবা। কোনদিন তো কথা শুনলিনে। এই শেষ কথাটা রাখিস। নৈলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। মহাদেবের চোখে মুখে একটা প্রবল অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। তবুও বললেন: আরও একটা কাজ করবি। সৎকারের দু'একদিনের চিতার ওপর একটা মঠের ভিৎ গেঁথে ফেলবি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা-টাও—এতটুকুও দেরী করবিনে।"

ভবানী বলে উঠল: বড়দা যদি মামলা করে? মহাদেব একটু হাসলেন, বললেন: হাজার মামলা করলেও আদালত গ্রাহ্য করবেনা। কিন্তু তুই করবি কিনা, বল?

ভবানী বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে বললে: তাই হবে বাবা।

মহাদেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতিকষ্টে ডান হাতখানা ছেলের মাথায় রেখে জড়িত স্বরে বলে উঠলেন: আর আমার কোন আফশোষ নেই। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব, হ্যাঁ, এবার আমি—কথাটা শেষ করতে পারলেন না মহাদেব। স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন গাঁয়ের বিষয়ী লোকেরা মাধবের জায়গায় মহাদেবের সৎকার হতে দেখে বলাবলি করলে: বাপস্! ভবা দেখছি, মহাদেবের বলদ নয়—মূর্ত্তিমান গোখরো।"

★

রৌদ্র-স্নান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

রৌদ্র স্নান করিতেছে আরণ্য-শাখীরা।
সূর্য্য-সুধা কাণ্ড-মুখে করিতেছে পান
পরম আনন্দ-ভরে; সারা দিনমান
রৌদ্র-রসে সঞ্জীবিত শিরা-উপশিরা—
কাণ্ড-শাখা-পত্র-পুষ্প জানে না যে পীড়া।
অপর্য্যাপ্ত ঝরিতেছে দ্যুলোকের দান;—
সর্ব্ব সত্তা দিয়া লয় মাটির সন্তান

ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য যত; আনন্দে পাখীরা
নৃত্য করে, পতঙ্গেরা করে যে গুঞ্জন
ভুঞ্জন্ করিয়া সুখে সূর্য্য-রসায়ন।
ধরিত্রীর বক্ষ-নীর আহ্লাদে আকুল
রোমাঞ্চিত হ'তে থাকে। চিত্তে ফোটে ফুল।
আশীর্ব্বাদে-ভরা এই নীলাম্বর-তলে
স্নপায়ণ লভে হিয়া-আনন্দ-কমলে।

ভারতের শিক্ষা-সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে। তার সমাধান না করিতে পারিলে ব্যর্থ হইয়া যাইবে আমাদের সকল প্রচেষ্টা। নূতন যুগের নূতন শিক্ষা পাইয়া নূতন নাগরিক না জন্মিলে কারা করিবে ভারত-রাষ্ট্রের বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাহা বহন করিয়া ভারতের সংস্কৃতির ধারা বিশ্ব-মানবের মধ্যে বিতরণ করিবে ?

এই সব কথা ভাবিয়াই ভারতবর্ষের চিন্তানায়কগণ—রামমোহন রায় হইতে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধি পর্য্যন্ত সকলেই—শিক্ষাসমস্যাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। রাম-মোহন রায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন করিবার সর্ব্ব-প্রকার চিন্তায় অগ্রণী ছিলেন। তাঁর যুগের রক্ষণশীল নেতৃবর্গ— রাজা রাধাকান্ত দেব, রসময় সেন প্রভৃতিও সে চেষ্টায় উৎসাহী ছিলেন।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠিও এই বিষয়ে সজাগ ছিলেন; তাঁদের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে যাহা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহাই এই দেশে প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। অক্‌সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ-লণ্ডন বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দান করা হয়, তার অনুকরণে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এবং প্রতি ২০।৩০ বৎসর তার ফল পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করিয়া নানা সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টা করিতেন।

হান্টার কমিশন (বড়লাট রিপন), র‍্যালে কমিশন (বড়লাট কার্জ্জন) তার পরিচয় প্রদান করে। স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন জাতীয় শিক্ষাপরিষদে রূপ গ্রহণ করে। গান্ধি-যুগে তাহা নূতন শক্তিলাভ করিয়া নব ভারতের গোড়া-পত্তন করে। আন্দোলনের উত্তেজনার সময় জাতীয় শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ হয়ত সজাগ ছিলেন না। কিন্তু গান্ধিজীর ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর "হিন্দ স্বরাজ" পুস্তকে (১৯০৮ খৃঃ লিখিত এবং খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় অনুদিত) সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা আছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরি-বর্দ্ধিত করিয়া নব-ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করা হয়, তাহাই ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। তার নূতন নাম বুনিয়াদি শিক্ষা।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠিও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শিমলা সহরে এক মন্ত্রণা-সভা (Conference) ডাকা হয়। তাতে প্রস্তাব করা হয় যে ১৫ বৎসরে বালক-বালিকার সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহাদিগকে শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে (vocational) নিয়া যাইতে হইবে। যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহা নির্ণয় করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের সহজাত সংস্কারাদি আমাদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি গঠন করে। তার নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-নীতির প্রবর্ত্তকবৃন্দ ফ্রবেল মণ্টেসরি শিশুর শিক্ষার উপর সেই জন্যই বিশেষ জোর দিয়াছেন। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন মহিলার The Making of Man নামে একখানি বই পড়িয়াছিলাম। তার মধ্যে দেখিতে পাই সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কর্ণধারগণ নূতন মানুষের সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কোন কার্পণ্য করেন নাই। ৩০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৯৯জনকে শিক্ষিত করিবার যে দাবী তাঁরা করিয়া থাকেন, তার মধ্যে অত্যুক্তি নাই বলিলেই হয়।

তার বিস্তৃত বিবরণ প্রায় প্রতি সপ্তাহে নূতন দিল্লী হইতে প্রচারিত পত্রাদিতে পাওয়া যায়। মার্কিণ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারতরাষ্ট্র সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্ব পরিবেশন করেন। তুলনামূলক হিসাব নিলে আমরাই পিছনে পড়িয়া আছি বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষার জন্ম। আমাদের সমাজ বৃদ্ধ, স্থবির হইয়া পড়িয়াছে। তার মধ্যে নূতন রক্ত ঢুকাইতে হইলে, আগ্রহী রক্তদানকারী চাই। কবির আহ্বান-ধ্বনি তাই বাজিয়াছিল :

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

নিঃশেষে রক্তদান করিলে আমাদের সমাজ যযাতির মতন নব-যৌবন প্রাপ্ত হইবেন। এই নব-যৌবন প্রাপ্তির অন্যতম লক্ষণ হইবে লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

দারিদ্র্য দূর করিতে পারিলে কেবল ভারতবর্ষে নয়, পাশ্চাত্য জগতের ঘোরতর কষ্টের (drastic distresses) দূর হইবে। ইহাই আমাদের কবির নিদান।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই বুঝিয়াছিলেন যে ইংরেজরাজ-প্রদত্ত শিক্ষা আমাদের দেশের উপযোগী নয়। তাকে রূপান্তরিত করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সেই জন্যই "শান্তি-নিকেতনের" প্রতিষ্ঠা (১৯০১ খৃঃ); সেই জন্যই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা, সেই জন্যই বিশ্বভারতীর প্রচেষ্টা। তিনি কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষার পক্ষে ছিলেন; এবং গান্ধিজী যখন অসহযোগ আরম্ভ করিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তার ১৫ বৎসর পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে বাঙলা ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন তার মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষার দোষ-গুণের বিচার করেন। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় ৫০ বৎসর এই শিক্ষার মোহে ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছিল; নিজেদের আচার-আচরণ ইংরেজদের অনুকরণে করিত। কিন্তু ইংরেজ শাসনের পরদেশী ভাব, সাদা চামড়ার আভিজাত্য শিক্ষিত ভারতবাসীকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল; তারা—শেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে যে বিদ্রোহের বাণী ছিল; বার্কস-শেরিডানের বক্তৃতার মধ্যে ইংরেজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে যে ধিক্কার ছিল, তাঁহা উচ্চারণ করিয়া ইংরেজ শাসনকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

ইংরেজ তার উত্তর দিতে পারিল না। নিজের অস্ত্রে ঘায়েল হইয়া তার নৈতিক প্রাধান্যের বর্ম্ম ফুটো হইয়া গেল। এই পরাজয় চুড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিল ১৯৪৭ খৃঃ ১৪-১৫ই আগষ্ট তারিখে। তখন পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়া, ভারত-বিভাগ করিয়া, ইংরেজ রাজ-শক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিল। রাখিয়া গেল কি? "সভ্যতার সঙ্কট" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তার মধ্যে অত্যুক্তি আছে, সমস্তটাই ক্লেদ ও কঙ্কাল নয়, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহক ইংরেজই আমাদের সকল অধোগতির জন্য দায়ী নয়। রবীন্দ্রনাথ এই কথা জানিতেন, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ইংরেজের রাষ্ট্রশক্তি আমাদের কল্যাণের প্রয়োজনে ব্রতী থাকিবে।

কোন রাষ্ট্রশক্তির কল্যাণ রূপ বেশীদিন অটুট থাকে না। এই শক্তির মধ্যে এমনি একটা গলদ থাকে যে তাহা ৪০-৫০ বৎসরের মধ্যে পচিয়া যায়।

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের শাসক-বর্গের নিন্দায় আজ প্রায় সকলেই পঞ্চমুখ। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, নূতন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অনেক প্রাচীন-পন্থী কর্ম্মচারীবৃন্দকে নিয়োগ করিতে হয়। এবং তারা তাদের জাত-ক্রোধ, আমাদের অকল্যাণের কাজে নিয়োজিত করে। তাঁরাই আবার সমস্ত পরিকল্পনার রচয়িতা, নৈবিদ্যের মাথার ফুলের মতন মন্ত্রি মহাশয় তাঁদের মন্তের নীচে নিজের নাম সহি করিয়া দেন। মন্ত্রিবর্গের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম-বিমুখতা, স্বজন-প্রীতি এই কর্ম্মচারীবৃন্দের পক্ষে শুভ-সুযোগ হইয়াছে। এইভাবে নানাকারণে আমাদের অনেকের স্বাধীনতা "অস্বাধীনতা" বা ঝুটা স্বাধীনতা হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু, ইহাও সাময়িক। এই কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি বলিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিলাম। এবং এক কথাই বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া যাইতেছি। নূতন নর-নারীর সৃষ্টি করিতে পারে নূতন শিক্ষা। যে শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়ের কাল হইতে। স্বদেশীযুগে "গোলাম-খানা"—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সে চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। যদিও জাতীয় বিদ্যালয় সমূহ একে একে নিভিয়া গিয়াছিল; এবং

ন্যাশন্যাল কাউনসিল অব এডুকেশন আজ যাদবপুরে বিরাট শিল্প বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে, এই বিদ্যালয় সমূহের প্রধান ও প্রথম উৎস ছিল রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়। তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। আজ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবিবর্গের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনে সর্ব্বদা তাঁকে অগ্রণীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর কোন "জীবন-স্মৃতি" লিখিত হইয়াছে বলিয়া দেখি নাই। ৪৫ বৎসর পরে তিনি বলিতে পারেন—কি আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বাধীন ভারতে লোক শিক্ষা কি প্রণালীতে দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন "বয়স্ক শিক্ষা" সম্বন্ধীয় কমিটির সভাপতিরূপে। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তখন শিক্ষা-মন্ত্রী। তিনি "বয়স্ক শিক্ষা" প্রচলনের জন্য একটি পৃথক কমিটি নিযুক্ত করেন। অতুলবাবু তাঁর রিপোর্টে তৎ-সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত আলোচনা করেন। ইংরেজী ভাষায় তাহা লিখিত হইয়াছিল। কারণ, তার একটা সর্ব্ব ভারতীয় গুরুত্ব ছিল ও আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। এবং তাঁদের উৎসাহের কথা ভাবিয়াই অতুল বাবু নিজের মন্তব্য রচনা করেন। তাহা বাঙ্গলা ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইয়াছে কিনা জানি না।

তবে ইহা জানি যে "শিক্ষক" "শিক্ষাব্রতী" প্রভৃতি পত্রিকা দীর্ঘকাল যাবৎ এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন। জাতীয় শিক্ষার প্রসারণে উৎসর্গিকৃত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষা এই সব পত্রিকার পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে আমাদের সমাজের মন সু-সংস্কৃত হইবে, এবং নানা দেশের নানা অভিজ্ঞতার কথা পাঠ করিয়া, নানা দেশ পরিদর্শন করিয়া আমাদের দেশের সুধীবৃন্দ নিশ্চয়ই আমাদের সমাজকে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। স্বদেশী আন্দোলনকে আমাদের নেতৃবৃন্দ কি ভাবিতেন তার নিদর্শন আছে উপাধ্যায়ের একটা লেখার মধ্যে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"শুভক্ষণে ভগবানের সিংহাসন টলিয়াছে, জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য রাজাধিরাজের অমোঘ আহ্বান আমাদের হৃদয়ে পঁহুছিয়াছে, তাই আমাদের মৃতপ্রায় নিদ্রিত জীবনে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে,—স্বয়ং জগদম্বা অপার স্নেহভরে শিয়রে বসিয়া মৃতসঞ্জীবন-মধুর করস্পর্শে ধীরে ধীরে জড়তা বিতাড়িত করিতেছেন। জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এই প্রথম স্পন্দন।

এ আহ্বান পার্থিব রাজার আদেশপত্র নহে যে; সহি মোহর দেখিয়া চিনিলাম, আর ভাষা পড়িয়াই কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইলাম। এ অধ্যাত্মরাজের পরোয়ানা—প্রত্যাদেশ। ইহাকে আধ্যাত্মিক ভাষায়, আধ্যাত্মিক পবিত্রতার সহিত আধ্যাত্মিক সাধনের প্রণালীতে বুঝিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষার নাম শুনিয়া অবধি প্রাণে এক অভিনব পুলকমিশ্রিত আবেগের সঞ্চার হইয়াছে। কোন গ্রন্থে এ শিক্ষার তত্ত্ব জানিতে পারি, কোন্ মহাত্মা সিদ্ধপুরুষের নিকট এ-শিক্ষার দীক্ষালাভ করি, এই বলিয়া নিয়ত প্রাণের মধ্যে একটা কণ্ডুয়া, একটা অনিবার্য্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি।

প্রথমেই গ্রন্থের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কেমন একটা কদভ্যাস, কেমন একটা পরনির্ভরশীলতার রোগ আমাদের জন্মিয়া গিয়াছে যে, প্রাণের মধ্যে কোন প্রশ্নের আবির্ভাব হইলে তাহার প্রথম আঘাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহার তাড়না হইতে বাঁচিবার ঔষধ নিজের আত্মার নিকট না চাহিয়া, নিজের হৃদয়োদ্যানে অন্বেষণ না করিয়া, কোন গ্রন্থকার এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহাই জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। এ স্থলেও প্রথমেই পুঁথি-পাঁজি দেখিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি আসিয়া দেখা দিল, তাই নিরর্থক বই ঘাঁটার দায় হইতে বাঁচিয়া গেলাম এবং মনে মনে আওড়াইলাম :

"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

কাহার গ্রন্থ দেখিব—কোথায় এ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিব? অবশ্য ইংরাজের পুস্তকালয়ে ইংরাজের গ্রন্থ। কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, আমাদের সে কথা বলিয়া দিবার গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু কেমন করিয়া নাচিতে হয়, কেমন করিয়া দাবা খেলিতে হয়, কেমন করিয়া 'বড়শি' দিয়া মাছ মারিতে হয়, ইংরাজ তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হয় নাই।..."

শেষোক্ত কথার মধ্যে যে আশঙ্কার ইঙ্গিত আছে, পরানুকরণের মোহে পড়িয়া বিপথগামী হইবার ইঙ্গিত আছে, তাহা একেবারে অমূলক নয়। আজ আমেরিকার শিক্ষাবিদগণ, সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের বিজ্ঞান-সেবিগণ আমাদের নূতন শিক্ষা দিবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে নিমন্ত্রিত হইতেছেন। এবং তাঁরা তাঁদের সংস্কারানুযায়ী আমাদের নানা উপদেশ দিতেছেন। এর ভালো মন্দ দুই-ই আছে। আমাদের সজাগ মন নিয়া তাহা বিচার করিলে ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রচার ধর্মী যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি আমরা; প্রচারের জাক-জমকে আমরা বিভ্রান্ত হইতে পারি। সেই বিষয়ে সাবধানী হইতে হইবে। এই পুরাতন সাবধান বাণী উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

★

দীপান্বিতা

সমীর ঘোষ

ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা পথ।
সে পথ উত্তীর্ণ হোয়ে যাই।
অন্ধকারে যা ছিল গোপন
আলোকে তা হয় বিমোচন,
আমি যেন দু' হাতে আমার
কার মধু স্পর্শ ফিরে পাই।
চেয়ে দেখি সম্মুখে আমার
রৌদ্রের মুকুট পরা জাগে রূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার।
জাগে রূপ তুষার বন্যায়
গৌরীশৃঙ্গ ধবলের চূড়ায় চূড়ায়—
তারপর বরফ মরুর
বুকে বাজে ছন্দের নূপুর
লীলাময়ী হয় নির্ঝরিণী,
মন-সমতটে মোর জাগে তার কলকল ধ্বনি:
নতুন ফসলে যেন যাবে ভরে এ রিক্ত প্রান্তর
সেই গান শোনায় নির্ঝর।

অন্ধকার ছিল বন্ধু মোর,
ও দিয়েছে মোরে গাঢ় ঘুম;
ও দিয়েছে মায়ের মতোন
দুঃখের দাহন মুছে স্নেহসিক্ত চুম।

আজ সেই অন্ধকারও নাই
—আমি কি মায়েরে মোর আবার হারাই!
থমকি দাঁড়ায়ে কই সময় চিন্তার
আসে ঢেউ আলোক-বন্যার।
সে আলোকে আমি জ্যোতির্ম্ময়,
চিত্ত হোতে চলে গেছে ভয়,
ছায়ার মায়া কি অবসান?
সে কি নয় এ প্রাণের গান।

পার হই, পথ পার হই—
কার মধু স্পর্শ মোর এ হৃদয়ে বই।
কাহার চোখের জলে ভিজে দুটি হাতের আঙুল,
ছায়ার মায়ায় হরে নিলো কার এলোকালো চুল,
কটাক্ষে এ বক্ষে দিলো রামধনুরেখা—
বসন্তবাতাসে যেন দেবদারু বনে পত্র লেখা
কে দিলো রক্তিম ওষ্ঠাধরে
জীবনের নব রূপান্তরে।
কে গো তুমি জীবনদয়িতা,
ছায়ায় এ ঢাকা পথ অকস্মাৎ করো দীপান্বিতা!

অয়েল

আপটন সিনক্লেয়ার ★ অনুবাদ : যতীশ বেদজ্ঞ

(৪)

এবার সময় ঘনিয়ে এলো বান্নীর স্কুলে ফিরে যাবার ; কিন্তু তার আগে ওকে একবার যেতে হবে ওর মায়ের সাথে দেখা করতে। ছ' মাসে অন্তত একবার গিয়ে ওকে সপ্তাহ খানেকের মত থেকে আসতে হয় ওর মায়ের কাছে।

খবরের কাগজের নোটিসটা বান্নীর নজর এড়ায় নি ; মিসেস এ্যণ্ড্রু ওয়েদারস্পুন ল্যাজ নাকি ত্যাগ করে যাওয়ার অভিযোগে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনছেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। বান্নী যেতে তাকেও তিনি খুলে বললেন সব কথা। বিয়ের ছু' বছর যেতে না যেতেই তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী নাকি তাকে ছেড়ে চলে গেছে ত্যাগ করে, কোথায় যে সে এখন আছে তাও তিনি জানেন না। নিঃসঙ্গ দুঃখময় জীবনের কথা বলতে বলতে তাঁর ছু' চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা ; সবাই চেষ্টা করে মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে আর সেটা যে কি কষ্টকর অবস্থা কি করেই বা বান্নী তা বুঝবে। শুনতে শুনতে বান্নীরও জল এসে গেল চোখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল—ওর "ছোট্ট মা-মনি" যেন একটা কিছু বলতে চাইছেন আভাষে ইঙ্গিতে। বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি পেয়ে গেলে তাঁর তো তখন আবার দরকার হবে নতুন একটা নাম নেবার। আর তাঁর নাকি ইচ্ছে করছে ড্যাডের নামটাই আবার ফিরে পেতে। বান্নী ঠিক বুঝতে পারল না এর মানে নামের সাথে ড্যাডকেও আবার ফিরে পাওয়া কিনা। তিনি জানতে চাইলেন ড্যাড এখন কেমন আছে, একা একা থাকতে তার কষ্ট হয় কিনা, আর সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তার মেয়ে বন্ধুদের কথা। বান্নী কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখাল না সে সব কথায়, ও চায় না ওর বাবার সাথে মেয়েদের সম্পর্ক নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে আসে, আর তা ছাড়া ও নিজেও জানে না সত্যি ড্যাড কোন সম্পর্ক রাখে কিনা অন্য কোন মেয়ের সাথে। ও বললো "মা-মনি", যেন এ নিয়ে বরঞ্চ ড্যাডের কাছেই চিঠি লেখেন, কারণ ড্যাড নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না বান্নীর এ সব নিয়ে আলোচনা করা। শুনে ওর "মা-মনির" সুন্দর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো আরও ছু' চার ফোঁটা চোখের জল ; কি আর করা যাবে, সবই তাঁর বরাত। সবাই চায় তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে, এমন কি তাঁর নিজের মেয়ে বার্টিও জানিয়ে দিয়েছে সে নাকি এবার আর এসে থাকতে পারবে না তাঁর কাছে। বান্নী সাধ্যমত চেষ্টা করলো তাঁকে সান্ত্বনা দিতে ; সত্যি বার্টিটা যেন কেমন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, আজকাল সে শুধু তার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ; আর কি সে এখন আগের মত আছে; এখন সে দিব্যি ফুটফুটে তরুণী, আর উড়ে বেড়াচ্ছেও খুব উঁচুতে উঁচুতে। কেতাদুরস্ত বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে দেখাশোনা করে তার তো এখন আর সময়ই হয়ে ওঠে না বাড়ীর কারো খোঁজ খবর নেবার।

বার্টি কিন্তু কিছুদিন আগেই এ নিয়ে কথা বলেছে তার ভাইয়ের সাথে ; ওর নাকি এখন বয়স হয়েছে ওদের মায়ের সম্বন্ধে সব কিছু জেনে রাখবার। নিজে অবশ্য সে অনেক দিন আগেই সব শুনেছে তার এম্মাখুড়ীর কাছ থেকে, তাই এখন সে বান্নীকেও জানিয়ে দিল সে সব কথা। শুধু মা-মণির নয় ওর বাবার সম্বন্ধেও এতদিনকার অনেক রহস্যই এবার পরিষ্কার হয়ে গেল বান্নীর কাছে।

ড্যাড বিয়ে করেছিল চল্লিশ পেরিয়ে, আর তখন সে ছিল রাস্তার মোড়ের সামান্য একটা দোকানের মালিক; বিয়ে করেছিল সে তার গ্রামেরই একটী নাম করা সুন্দরী মেয়েকে আর ড্যাডকে বিয়ে করতে পেরে মেয়েটীও তখন নিজেকে মনে করেছিল ভাগ্যবতী। কিন্তু কিছুদিন যেতেই সে আর খুসী থাকতে পারলো না গ্রাম্য জীবনে। প্রথমে সে চেষ্টা করলো ড্যাডকেও ছুটিয়ে নিয়ে চলতে তার সাথে, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাকে ছেড়েই সে পালিয়ে গেল এঞ্জেলসিটির একজন অবস্থাপন্ন দালালের সাথে। বিয়ে করলেও শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু আর তাকে ভাল লাগলো না লোকটার, তাই একদিন কোন কিছু না বলে সেও চলে গেল তাকে ত্যাগ করে।

মায়ের কথায় এতদিন যা হয়নি এবার কিন্তু তাই সম্ভব হলো মা চলে যাওয়ায়। ড্যাড এবার সত্যি সুরু করলো ছুটে চলতে। এতদিনে সে বুঝতে পারলো সবাই ছুটছে একটা বস্তুর পিছনে, সে বস্তুটা হচ্ছে টাকা; আর ঐ বস্তুটা যথেষ্ট পারিমানে না থাকাই হচ্ছে তার স্ত্রীর তাকে ছেড়ে যাবার প্রধান কারণ। ভাল কথা, সেও একবার দেখে নিচ্ছে সকলকে। সেদিন থেকে খুব কম কথাই বলতে শোনা গেছে ড্যাডকে, মুখ বুঁজে সে শুধু চলেছে কাজ করে। গ্রামের কয়েকজন পরিচিত লোক একটা তেলের কুঁয়ো বসাবার পরিকল্পনা করতে সেও যোগ দিল তাদের সাথে আর সৌভাগ্যক্রমে তাদের সে প্রচেষ্টাও হলো সফল। তারপর দেখতে দেখতে নিজের পথ করে নিয়ে ড্যাড এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাম্নী লক্ষ্য করে দেখলো ওর বাবাকে। হ্যাঁ, এবার যেন সব কিছুই যাচ্ছে মিলে; ও এখন বুঝতে পারছে তার ঐ কঠোর একাগ্রতা, সদা সতর্ক দৃষ্টি আর নির্ম্মম বেগে ছুটে চলার অর্থ। এমনি করেই ড্যাড এখন শাস্তি দিতে চাইছে মিসেস এ্যাণ্ড ওয়েদারস্পুন ল্যাজকে; সে তাকে দেখিয়ে দিতে চায় সেও কিছু কম নয় কোন সহুরে দালালের চেয়ে।

মেয়েদের সম্বন্ধে ড্যাডের বদ্ধমূল অবিশ্বাস, তারা সবাই ফিরছে শুধু টাকা আদায়ের ফিকিরে—তার এই ধারণা—এ সব কিছুরই অর্থ এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে বাম্নীর কাছে। ড্যাডের সমস্ত চিন্তাই এখন শুধু বাম্নীকে কেন্দ্র করে; যেমন করেই হোক সে চায় ওকে জীবনে সুখী দেখে যেতে। দোষগুলো বর্জ্জন করে ও যেন পারে শুধু তার গুণগুলো গ্রহণ করতে, আর জীবনে কোন দিনই যেন ওকে অসুবিধা ভোগ করতে না হয় সেই পরমার্থ বস্তুটীর যার অভাবে তার নিজের জীবনটা হয়ে গেল ব্যর্থ। ভাবতে ভাবতে বাম্নীর সমস্ত মনটা ভরে ওঠে ড্যাডের প্রতি মমতায়। দু'হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে, মেলাই নাকি পরিশ্রম হচ্ছে তার, তাড়াতাড়ি করে একবার বড় হয়ে নিতে পারলে ও নাকি কখ্খনই আর তাকে দেবে না এত পরিশ্রম করতে।

মায়ের দেনা শোধ আর ভাতা বাড়িয়ে দেবার আবেদনটা বাম্নী খুব সন্তর্পণেই জানালো ড্যাডকে আর সেই প্রসঙ্গে ড্যাডের মনোভাবটাও জেনে নিল বিষয়টা সম্বন্ধে।

ড্যাড বললো, কোন লাভই হবে না তাঁকে আর টাকা দিয়ে। সে হচ্ছে এমন প্রকৃতির মেয়ে যারা কোন দিনই চলতে শেখে নি নির্দ্দিষ্ট আয়ের পরে নির্ভর করে। যে অবস্থাতেই থাক না কেন দেনা সে করবেই করবে, কারণ তার স্বভাবের মধ্যেই রয়ে গেছে অপরিসীম অতৃপ্তি। টাকা বাঁচানো কিম্বা শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ড্যাড কিছু এসব বলছে না; কিন্তু প্রথম বিয়ের সময় সে যে ভাবে চলতো সেরকম ভাবে চলবার মত যথেষ্ট টাকাই তো তাকে দেওয়া হচ্ছে—তারই কি উচিৎ নয় সেরকম ভাবে চলা? তারপর, ড্যাডের পরবর্ত্তী জীবনের উন্নতির সাথে তা'র তো কোন সম্পর্কই নেই—কাজেই সেদিক দিয়েও তো আর কোন দাবী থাকতে পারে না। বাম্নীকে ধরলে টাকা পাওয়া যাবে বুঝতে পারলে ওর জীবনও সে করে তুলবে দুর্ব্বিসহ, কাজেই ও বিষয়ে ড্যাডের ইচ্ছে খুব কঠোর হয়েই চলা। ব্যাপারটা অবশ্য সত্যিই দুঃখজনক, কিন্তু বাম্নীরও এখন বোঝা দরকার যেসব মেয়েরা টাকা আদায়ের ফিকিরে ঘোরে তারা সে জন্য বিয়ে করতেও পারে।

মুখে কিছু না বললেও বাম্নীর মনে হলো মনুষ্যজাতির অর্দ্ধেক অংশ সম্বন্ধে ড্যাডের ধারণাটা যেন একটু বেশী রকমেরই নিরাশাবাদী। বাম্নী জানে অনেক মেয়ে আছে

যারা কিনা মোটেই ওরকম নয়, এই যেমন রোজি টেণ্টর। সে তো ওকে এই এক বছর ধরে ভালবেসে আসছে, এর মধ্যে সে তো ওকে এক পয়সাও খরচ করতে দেয় নি তার নিজের জন্য। রোজি বলে তার নিজের যখন কোন টাকাই নেই খরচ করবার মত তখন ওকেই বা কেন দেবে তার জন্য খরচ করতে। সে শুধু ওর সাথে গাড়ী চড়েই খুসী, ব্যস। সত্যি, কত ভাল আর ভদ্র মেয়ে রোজি। তবু কিন্তু সুখ নেই বাম্বীর মনে; কোথায় যে কি একটা পরিবর্ত্তন এসেছে ওদের ভালবাসায়। নিজের কাছে লুকোবার চেষ্টা করলেও কিছুদিন ধরে কেমন যেন একঘেয়ে বলে মনে হচ্ছে ওদের সম্পর্কটাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ছবির ছাপগুলো দেখতে দেখতে নীচের লেখা না দেখেও ওরা এখন বলে দিতে পারে কোনটা কিসের ছবি। আগের মত আজও রোজির কাছে সব কিছুই রয়ে গেছে, "বাঃ! চমৎকার!" কিন্তু বাম্বীর মন ছুটে চলেছে নতুন কিছুর দিকে; ও এখন শুনতে চায় নতুন কোন কথা।

আর যত নিষ্ঠুর বলেই মনে হোক না কেন, তা না চেয়েও যে ওর উপায় নেই—সে যে মানুষের সেই চিরন্তন চাওয়া। আজকাল বেড়াবার সময় প্রায়ই রোজি থাকে না ওর সাথে, দুএকবার অন্য মেয়ের সাথেও ওকে দেখা গিয়েছে নাচের আসরে; ছোট্ট রোজি কিন্তু এখনও রয়ে গেছে ঠিক আগের মতই ভদ্র শান্ত, একবারও সে জানায় নি কোন অভিযোগ, একবারও ফেলে নি এক ফোঁটা চোখের জল—অন্তত ওর সামনে তো নয়ই। বেচারা, সত্যি, তার কথা মনে করে বাম্বীর মন ভরে ওঠে করুণায়। কিন্তু অন্যান্য পুরুষের মত ওদের পুরণো প্রেমের এই বেদনাহীন নির্ব্বাক পরিসমাপ্তিতে বুঝিবা ও স্বস্তিই অনুভব করে মনে মনে। নিজের অজান্তেই বুঝিবা ও উন্মুখ হয়ে ওঠে অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়বার অপেক্ষায়!

★

একটি গীতি কবিতা

রণজিৎ কুমার সেন

আছে রে আশা তোর
  ফুরায়ে যায় নি তো,
শেষের গানখানি
  বাঁশরী গায়নি তো!
হৃদয়ে আজো প্রীতি
জাগেরে নব নিতি,
স্বপনে আজো তব
  আলেয়া ধায় নি তো!

আলোর পাখী তোরে
  ফাগুনে ডেকে যায়;
বনের ফুল-কলি
  ঝরিয়া পড়ে গায়।
এখনো তোরে ঘিরে
চাঁদিমা আসে ফিরে,
সুখের রাত্তি-তব
  বেদনা পায় নি তো॥

"মহর্ষির সম্বন্ধে গল্প"

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

["সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত"]

পূর্ব্বোক্ত শিরনামার ভাষণ ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী) তারিখের "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের তিরোভাবের (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী) পরে মাঘোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা "সঞ্জীবনী" পত্রিকার দুইটি সংখ্যায় (২০শে এবং ২৭শে মাঘ) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উদ্ধৃতিতে কেবল শেষোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ভাষণই প্রদত্ত হইয়াছে। বক্তৃতার ভাষায় যে চলতি ও সাধু ভাষার মিশ্রণ রহিয়াছে, তাহার জন্ম ভাষণ-দাতা দায়ী বলিয়া মনে হয় না,— অনুলিখনের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ওইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ১৩১২ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের সময় হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা, ধর্ম্মোপদেশ এবং বক্তৃতা বহুবার শুনিবার সৌভাগ্য আমাদেরও হইয়াছিল। তিনি যাহা বলিতেন চলতি ভাষায়ই বলিতেন।

শাস্ত্রী মহাশয় খ্যাতনামা ব্যক্তি হইলেও তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক। কলিকাতা হইতে প্রায় বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে চাঙড়িপোতা গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী মাতুলালয়ে শিবনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত বংশ বলিয়া সমাজে সম্মানিত। তাঁহার পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য পরোপকারী ও তেজস্বী বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। পরে স্বগ্রাম মজিলপুরে সরকারী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। শিবনাথের মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্নও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (শিবনাথের মাতুল) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলার সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়াছেন।

শিবনাথ ছিলেন মেধাবী ছাত্র। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন; সংস্কৃত কলেজ হইতে বি, এ, এবং এম, এ, পাশ করেন। সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়া "শাস্ত্রী" উপাধি পাইলেন। বিদ্যার্থি-জীবনেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয়। উত্তর কালে শিবনাথ বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তৎকালে বাল্য-বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকায় তাঁহাকে বাল্যকালেই বিবাহ করিতে হয়। তাঁহার শ্বশুরকুলের সহিত কোপন-স্বভাব পিতার মনোমালিন্য ঘটায় তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

ছাত্র-জীবনে ব্রাহ্ম সজ্জনগণের সংসর্গে আসিয়া শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রহ্ম সমাজে যোগ দিয়া উপবীত ফেলিয়া দিলে পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন দিবসে যে একুশ জন উচ্চ শিক্ষিত যুবক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তন্মধ্যে শিবনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ অল্পকাল মধ্যেই আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের (যাহা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া অভিহিত) ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের প্রিয়পাত্র হইলেন। উত্তর কালে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেই শিবনাথ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার জীবনে

এরূপ সুযোগ ঘটিয়াছিল যে উচ্চ রাজকার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনায় এবং স্বদেশ ও সমাজের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া তিনি সাংসারিক জীবনের সুখসম্পদ লাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিবনাথ শিক্ষাদানের কার্য্যে ব্রতী হন। আদর্শ শিক্ষাব্রতী বলিয়া তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। যাহা তিনি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তজ্জন্য পূজনীয় ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে। 'কুচবিহার-বিবাহ' উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার যে সকল ভক্ত ও অনুগামীর মতবিরোধ হয়, শিবনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ইহা হইতেই সৃষ্টি হইল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। সেই প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও গঠনে শিবনাথ, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্রাহ্ম যুবকগণ ছিলেন অগ্রণী। জাতি গঠনের কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবদান উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন একাধারে ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজসেবক, গঠন-কর্ম্মী, সাহিত্যিক এবং সংবাদপত্রসেবী। সুবক্তা বলিয়াও তাঁহার সুখ্যাতি কম ছিল না। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল উচ্চাঙ্গের। সেই প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে কাব্য, উপন্যাস, জীবন-চরিত, ইতিহাস ও নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া। শাস্ত্রী মহাশয় 'সোমপ্রকাশ', 'সমালোচক', 'সমদর্শী', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'সখা', 'মুকুল' ইত্যাদি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদনাও দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। অনগ্রসর স্বদেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার প্রচেষ্টায় তাঁহার দান কম নহে। এই বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর সহিত একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ জন-প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'সিটি স্কুল' ও 'সিটি কলেজ' স্থাপনে ও গঠনে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্‌টেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে এই ধর্ম্মপ্রাণ, স্বদেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল, লোকহিতৈষী ও সমাজ-সেবক মনীষীর দেহাবসান হয়।

—সঙ্কলয়িতা।

"সত্যনিষ্ঠা"

"মহর্ষির জীবনে আর একটা ভাব এই দেখেছি যে ধর্ম্মের বড় বড় কথায় বড় মূল্য দিতেন না। মহর্ষির ভাব এই ছিল যে, যে দু'টো কথা বুঝেছি, তা' প্রাণ দিয়ে ধরতে হবে; ধর্ম্ম শুধু কথা বা পাণ্ডিত্যের জিনিষ নয়—ধর্ম্ম সাধনের জিনিষ।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মুখে যখন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই শ্লোকের অর্থ বুঝিলেন, যখন এই শ্লোকে তিনি নিজের মর্ম্মের ভিতরে সায় পাইলেন, মহর্ষি তখন সমগ্র প্রাণ দিয়া উহাকে ধরিলেন। ঐ যে শুনিলেন, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"—উহা তিনি জীবনে আর ভুলেন নাই। উহার যে তিনটি ভাব তাহা মহর্ষি চিরদিন ধারণ করিয়া জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" কি না,—ঈশ্বরের দ্বারা সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর। মহর্ষি আজীবন সেই পরমাত্মাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া জীবনধারণ করেছেন।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগী হ'য়ে, আর সকল বিষয় তৃষ্ণাদি ত্যাগ ক'রে, কেবল তাঁকেই ভোগ কর। মহর্ষির মত বিষয়ী কে? আর মহর্ষির মত বিষয়ের মধ্যে এমন অনাসক্তই বা কে? উপনিষৎ বলেছেন—ত্যাগী হও; মহর্ষি ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বস্ব গেল, মহর্ষি অকাতরে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। মহর্ষি বলিতেছেন—"আমি যা চাই, তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে গেল।" "আমি বলি যে, 'হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।'—তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ করিলেন

এবং সব কাড়িয়া লইলেন।" "যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল।"

যদিও বিষয় ফিরে এল, কিরূপে অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করতে হয়, মহর্ষি তা' দেখালেন।

আর ঐ যে 'মা গৃধ কস্য সিদ্ধনং'—কার ঠাকুর কোম্পানীর বিপুল দেনা শোধ করিয়া ট্রাষ্ট সম্পত্তি পর্য্যন্ত মহাজনদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহর্ষি ঐ বাক্য জীবনে সফল করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্বেষহীনতা

মহর্ষির গুণের কথা বলতে গিয়ে একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেছেন যে, আমাদের উপর, ব্রাহ্ম সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপর তাঁর বিদ্বেষভাব ছিল না। কলুটোলার বাড়ীতে প্রথম যেবার ব্রহ্মোৎসব হয়, মহর্ষিকে ডাকা গেল, মহর্ষি তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত।

আর একবার কেশব বাবুর সমাজে গিয়া বল্লেন—"তোমার ঐ খৃষ্ট বিভীষিকাটা কেন করেছ?" ভারতবর্ষীয় মন্দিরে গীর্জ্জার মত গড়ন দেখে এই কথা বলেছিলেন। আমরা কেশব বাবুর অধীনতায় তখন এই কথা নিয়ে খুব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। মহর্ষি হেসে বল্লেন—"আরে আর একবার ত যাব।"

একবার সিন্দুরেপটির বাড়ীতে এসে মহর্ষি উপাসনা কল্লেন। উপাসনার পর যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন মহর্ষিকে বল্লেন,—কেশব বাবু এখানে আছেন। "কে! কেশব! তুমি এখানে! আমার কাছে বস নাই কেন? তুমি কাছে বসলে আমার যে আরও খুলত।"

কেশব বাবুর মৃত্যু-শয্যায় গিয়ে মহর্ষি যে কিরূপ করিয়াছিলেন, তা' যাঁরা সে দৃশ্য দেখেছেন তাঁরাই জানেন। আত্ম-জীবনীতে মহর্ষি চল্লিশ বছরের পরের কথা আর লেখেন নাই। ইহার পরে মহর্ষি অনেক কাজ করেছেন, শান্তিনিকেতন স্থাপন, চীন দেশে গমন ইত্যাদি—কিন্তু আত্ম-জীবনীতে সে সব ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—"ঐ পর্য্যন্তই আমার কাজ।" ইহার ভিতরে আর একটা ভাব ছিল—আর লিখলেই ত ওদের কথার একটা জবাব দিতে হবে।

একবার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও আমি শান্তিনিকেতনে গেছি। মহর্ষিকে পূর্ব্বে কোন খবর দিই নাই। মতলবটা এই, তাঁকে হঠাৎ গিয়ে আশ্চর্য্যান্বিত করব। মহর্ষি খেতে যাচ্ছেন, ১২টার সময় আমাদের দেখেই একেবারে গলা জড়িয়ে ধরলেন। একজনের ভাত ত তিনজনে খাওয়া গেল। খাওয়ার পর দেখি, টেবিলের উপর ভূতত্ত্বের একখানা বই রহিয়াছে। তখন সেই বইয়ের খুব প্রশংসা বেরিয়েছে। মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেম—আপনি এই বই পড়ছেন? "হ্যাঁ—ভূতত্ত্ব বিদ্যা আমার খুব ভাল লাগে।" আনন্দ মোহন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি এই বই পড়ছেন?"—"কেন, আনন্দ মোহন, ওটা কি অপাঠ্য? আরে, যত বোঝা নিয়ে যাওয়া যায়, তাই ভাল। যাবার সময় হচ্ছে কিনা।"

ঐ বই তখনও এদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই। শুধু ঐ বইয়ের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহাই তখন এদেশে পৌঁছিয়াছিল। পরে জানা গেল—মহর্ষি ঐ বই বিলাত হইতে আনাইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে মহর্ষির মত পাঠানুরাগী লোক খুব কমই দেখিয়াছি। শান্তিনিকেতনে দেখেছি, স্পেন্সার, ক্যাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকদের গ্রন্থে মহর্ষি নোট করিয়া রাখিয়াছেন।

দার্জ্জিলিঙে একবার মহর্ষির সঙ্গে দেখা ক'রলেম। মহর্ষি বল্লেন—"দেখ, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে টেনিসনের একটা কবিতা বেরিয়েছে; পড়েছ?" আমি বল্লেম—না, পড়ি নাই।

"না, ঐটে প'ড়ো।"

তন্ময়তা

আর একবার আনন্দমোহন বাবু ও আমি মহর্ষির কাছে রয়েছি। পূর্ণিমার রাত। চারিদিক জ্যোছনায় ভেসে উঠেছে। মহর্ষি আমাদিগকে নীচের ঘরে শয়নের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আমরা শুয়ে আছি, খানিকক্ষণ পরে দেখি, উপরে খস্ খস্ ক'রে কি শব্দ হচ্ছে।

ভাবলেম, এটা কি, ও কিসের শব্দ হচ্ছে!—মহর্ষি আমাদিগকে শুইয়ে দিয়ে জ্যোছ্নায় পায়চারি কচ্ছেন! অনেক রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আনন্দমোহন বাবুকে তুলিয়া লইয়া বাগানের দিকে গেলাম। যাইয়া দেখি, মহর্ষি এত রাত্রিতেও বাগানে বেড়াচ্ছেন। মহর্ষি ঐ এক ভাবে নিমগ্ন হয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছেন!

কেশব বাবুর কাছে গল্প শুনেছি, মহর্ষি পদ্মাতে বোটে বেড়াচ্ছেন, বাইরে পদ্মার যে শোভা তাই দেখে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে রয়েছেন, একজন চাকর মাথার উপর ছাতি ধ'রে রয়েছে। কোথা দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে, মহর্ষির কিছুই জ্ঞান নাই। এক এক করে চাকর বদ্‌লোচ্ছে, একজন ক্লান্ত হচ্ছে, আর একজন আস্‌ছে। ৪টার সময় মহর্ষি চোখ খুললেন। চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে গেছে!

সঙ্গে যাঁরা থেকেছেন, তাঁরা দেখেছেন, ধর্ম্ম চিন্তায় নিমগ্ন হলে মহর্ষির আর সময়জ্ঞান থাকতো না।

একবার কোন্নগরে রবিবার রাত্রিতে উপাসনা হবে। ওঁর বোট ছাড়ল শনিবার সকালে। দু'চার ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছা যায়, মহর্ষি অত আগেই বোট ছাড়লেন।

রাজনারায়ণ বাবু ও দ্বিজেন্দ্র বাবু সঙ্গে ছিলেন। কোন্নগর সমাজের উপাসনার পর মহর্ষি বোটে গেলেন। রাজনারায়ণ বাবু আমার কাছে এসে শুয়ে পড়লেন। আমি বল্লেম, "শু'লেন যে?" "না, মহর্ষি ডাকলে বলবেন আমি শুয়েছি—আমি যাব না!" এদিকে মহর্ষি ত কিছুক্ষণ পর রাজনারায়ণ বাবুকে ডেকেছেন। আমি কি করি!—বল্লেম—"না, উনি যাবেন না।" পরদিন রাজনারায়ণ বাবু আমাকে বলেন যে, মহর্ষি কথা কইতে কইতে কখন যে চোখ বুজবেন, তার ত ঠিক নাই। একবার বুজলে কতক্ষণে যে খুলবেন তারও ঠিক নাই। মহর্ষির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমনি কয়েদীর অবস্থাতে পড়তে হয়!

মহর্ষি যখন কথা কইতে কইতে চোখ বুজলেন, তখন বুঝ্‌তে হবে যে আমরা আর কথা কইবো না। দেখেছি মহর্ষির বাড়ীর ছেলে মেয়ে সকলেরই এই শিক্ষা হয়েছিল।

পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠা

মহর্ষির যেমন পারিবারিক শৃঙ্খলা, শাসন ও নিয়মানুগত্য দেখেছি, এমন অল্প লোকেরই দেখা যায়।

মহর্ষি বিশৃঙ্খলা আদপেই সইতে পার্ত্তেন না। একবার মাঘোৎসবে দেখেছি, মহর্ষি কোথায় কি হবে, সব বলে দিচ্ছেন—"রবি ঐ সিঁড়ির নিকট দাঁড়াবেন; অমুক মেয়েদের হাতে (আহারান্তে মুখ ধুইবার) জল ঢেলে দিবেন" —ইত্যাদি। হয়ে গেলে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর নিতেন, ঠিক তেমনি হয়েছে কিনা।

আমাদের এই আনন্দবাজারে একবার বড় গোলমাল হয়েছিল, সকালের ভাত বিকালে খেতে দিয়েছে। মহর্ষির কাণে এই কথা গিয়েছে। শুনে বিরক্ত হয়েছেন। আমাকে ডেকে বল্লেন—"বলি, যদি একটা খাবার যোগাড় করেছ, তা এমন কর কেন? তোমাদের ওটা ত ব্রহ্মোৎসব নয়, ও ব্রহ্মগোল!"

একবার আনন্দমোহন বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে মহর্ষি খবর নিয়েছিলেন, আমাদের এই আনন্দ বাজারে কি কি তরকারী হয়েছিল। আমাদের এখানে যা কিছু হতো মহর্ষি তার খবর নিতে ছাড়তেন না।

যেই ঘড়িতে টং টং ১২টা বেজেছে, মহর্ষি তখনি খেতে বসেছেন। সময় নড়চড় করা, কাজের বিশৃঙ্খলা, মহর্ষি এ সকল বর্দ্দাস্ত কর্ত্তে পার্ত্তেন না। মহর্ষির শাসন এমনি ছিল, বৃদ্ধ বা শিশু কাহারও সে শাসন লঙ্ঘন করার সাধ্যি ছিল না।

একদিন মহর্ষির কাছে বসে আছি, বাড়ীর সব ছেলে মেয়ে, ছোট ছোট পৌত্র দৌহিত্র একে একে সকলে এসে উপস্থিত হ'ল। নিয়ম ছিল এই—বাড়ীর মেয়েরা একদিন শিশুগুলিকে সাজাইয়া মহর্ষির আশীর্ব্বাদ লাভের জন্যে পাঠাইয়া দিতেন। সেদিন ছেলেরা এসে দেখে, মহর্ষি ধ্যানস্থ হ'য়ে আছেন। মহর্ষিকে ধ্যানস্থ দেখে, আড়াই বছর তিন বছরের ছেলেরা পর্য্যন্ত এমন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, দেখে মনে হয় যেন তারা কাওয়াৎ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে একজন বল্লেন, ওরা নিশ্বাস ফেলছে কি না? মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গের পর শিশুরা একে একে মহর্ষিকে প্রণাম কর্ত্তে লাগিল। একজনের মাথায় হাত দিয়ে

বল্লেন—তুমি গাও ত "অন্তরতর অন্তরতম," সে গাইতে লাগিল "অন্তরতর অন্তরতম";—মহর্ষিও তাল দিতে দিতে তার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগিলেন "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে।" অপর একজনকে বলিলেন—তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" উচ্চারণ করতে পার ? সে বল্লে—হাঁ পারি। "আচ্ছা কর ত।" সে বলে গেল,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

একদিন আমরা মহর্ষিকে দেখতে গেছি। মহর্ষির কাছে বাড়ীর দুই কি আড়াই বছরের একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেচারী আর স্থির থাকতে পারছে না। খপ করে কি একটা জিনিষ সে ধরেছে। মহর্ষি আস্তে আস্তে তার হাত থেকে জিনিষটি নিয়ে তাকে এ ধার থেকে ওধারে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আবার সে নড়ে উঠেছে, অমনি মহর্ষি তাকে আবার ওধার থেকে এধারে নিয়ে এলেন। বেচারী আবার নড়েছে। আবার এধার থেকে ওধারে। শেষে আর নড়ে না—এইবার স্থির হয়ে গেছে। এমনি করে মহর্ষি বালকদিগকে নিয়মাভ্যাস করাইতেন। নিয়ম ছিল, পুত্রেরা পিতার সম্মুখে বিনা হুকুমে কথা কহিবেন না। এমন হয়েছে দ্বিজেন বাবু বসেই আছেন, কথা কইতে পারছেন না। মহর্ষি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্বিজেন তুমি কি বল ?" তখন সে দ্বিজেন বাবু কথা কহিলেন।

শিক্ষাদান তৎপরতা ও গুণগ্রাহিতা

মহর্ষি একবার দার্জ্জিলিঙে ছিলেন। আমি গিয়ে দেখা করিলাম। তিনি আমার হাতে একখানা "ভারতী" দিলেন। আমি পাতা উল্টাচ্ছি; বললেম—এটা বোধ হয় স্বর্ণকুমারীর, এইটে বোধ হয় রবি বাবুর। "কি করে জানলে ?"—জিজ্ঞাসা করলেন। দেখি "ভারতী"র কোন প্রবন্ধের পার্শ্বে মহর্ষি লিখে রেখেছেন, "স্বর্ণ তোমার হাতে পুষ্পবৃষ্টি হোক্।" "ভারতী"র স্থানে স্থানে মহর্ষি এইরূপ সব নোট করেছেন। একখানে লিখেছেন—"বালকের ন্যায় বুক্তি।" মহর্ষি পুত্রকন্যাদির সাহিত্য চর্চ্চার প্রতি কিরূপ নজর রাখতেন, তা' এতেই বোঝা যায়।

কোন পুত্রবধূর চিত্রবিদ্যায় শক্তি আছে বলিয়া মহর্ষি টের পাইলেন। অমনি পুত্রকে ডেকে এনে বললেন—"দেখ, আমি তোমার বৃত্তি বাড়িয়ে দিচ্ছি; তুমি একজন চিত্রকর নিযুক্ত ক'রে বউকে ভাল করে শিক্ষা দাও।"

একবার মহর্ষির কাছে একটা কবিতা লিখে নিয়ে গেছি। কবিতাটা পড়ে মহর্ষি দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এমন কথা যে বলে আমি ত তার গোলাম।"

রবিবাবুর পুত্র রথীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করা হল। মহর্ষি শুধু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াই স্থির থাকতে পারছেন না। একবার এক্জামিন করে দেখা চাই। হঠাৎ একদিন হুকুম হল রথীকে আন।

সে বেচারী ত জড়সড় হয়ে এক্জামিন দিবার জন্য উপস্থিত হলো। তার প্রতি আদেশ হলো, তাকে বেদের মত সুর করে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পড়তে হবে। সে চেঁচিয়ে পড়ছে—মহর্ষি ত কাণে শুনতে পান না। আমাকে বললেন, "তুমি শুন ঠিক উচ্চারণ হচ্ছে কি না।" আমি বললেম—হাঁ ঠিক হয়েছে। শুনে খুসী হলেন, অমনি বোধ হয় পণ্ডিতের কিছু পুরস্কারেরও আদেশ হলো।

আমাদের "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" কাগজখানা নিয়ম মত পড়তেন, আর যে যে যায়গা ভাল লাগত কেটে রাখতেন। আবার আমাদিগকে সেইগুলি পড়ে শুনাতেন।

মহর্ষি যে পুত্রকন্যাদির শিক্ষাদানে কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তিনি কিরূপ গুণগ্রাহী ও গুণের উৎসাহদাতা ছিলেন, এই সব ঘটনাতে তা' বেশ বুঝা যায়।

দানশীলতা ও কোমলতা

মহর্ষির দানশীলতার কথা অনেকে জানেন, অনেকে জানেন না। মহর্ষি দান করিতেন, কিন্তু একটু বুঝে সুজে। মনের ভিতর হইতে যে কার্য্যে সায় পেতেন না, সে কার্য্যে মহর্ষি দান করিতে পারিতেন না। তাঁর কাছে অনেকবার চাহিয়াও পাই নাই, আবার অনেকবার চাই নাই, আসিবার কালে মহর্ষি বলেছেন, "বসো, কিছু টাকা নিয়ে যাও।"

মহর্ষি নিজ হাতে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। যাকে ভাল বাসতেন, নিজ হাতে ভাল ক'রে না খাইয়ে তৃপ্ত হতেন না।

একবার মহর্ষির ওখানে আমাদের খাওয়ার হুকুম হোল। দেখি মহর্ষি নিজহাতে পাঁউরুটি ও নেবু দিয়ে যত্ন ক'রে কি একটা জিনিষ তৈয়ারী করিতেছেন। আমরা ভাবলেম, ওটা বুঝি উনি খাবেন। পরে দেখি, ঐ পদার্থটি কয়েকখানা ডিশে সাজালেন, সাজিয়ে নিজ হাতে আমাদের খেতে দিলেন—"দেখ তো কেমন হয়েছে?" পরে শুনলেম ঐটে মহর্ষির প্রিয় খাদ্য।

আর একবার গেছি। হাফেজ নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। হাফেজ আরম্ভ হলে মহর্ষির আর অন্য জ্ঞান থাকতো না। হাফেজ শেষ করে মহর্ষি আমাদের খেতে নিয়ে গেলেন। হাতে করে আমাদের এক একটা জিনিষ দিচ্ছেন, আর আমরা খাচ্ছি। খাওয়াটা ভাল মত হলে পর বল্লেম—আর পারবো না। "পারবে না! সেটি হবে না।—তোমরা হ'চ্ছো স্ত্রী স্বাধীনতার দল—এইগুলি মেয়েদের তৈরী—লেডিদের অসম্মান করা হবে না—ওগুলি খেতে হবে।"

আমরা এই মন্দির নির্ম্মাণের টাকার জন্য মহর্ষির কাছে দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছি। খাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেম—"আমাদের দরখাস্তটার কি হ'ল?" "নথিভুক্ত হয়ে আছে।" এদিকে দ্বিজেন বাবুকে পাঠিয়েছেন, খবর নিতে—কে কে ট্রাষ্টি নিযুক্ত হ'ল। দ্বিজেন বাবু গিয়ে খবর দিলে পর ১০০০৲ হাজার টাকার এক চেক্ দিয়ে বল্লেন—This is my unconditional gift." আমি বল্লেম—"এ যে বড় মুস্কিল হ'ল।" "কি হ'ল?" "আমি ত আর বস্‌তে পারছি না।"—মন চাচ্ছে তখনই দৌড়ে দলে গিয়ে খবর দি। মহর্ষি বুঝিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"তবে ছোট।"

একদিন মহর্ষির সঙ্গে কথা হচ্ছিল—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান উর্দ্দুতে অনুবাদ কল্লে ভাল হয়। অমনি বল্লেন, "ব'স, ৫০০৲ টাকা নিয়ে যাও।"

আর একদিন বাঁকিপুর সাধনাশ্রমের কথা বলছি। যখন উঠে আসবো, মহর্ষি বল্লেন, "ব'স, এর জন্য কিছু টাকা নিয়ে যাও।"

মহর্ষির এইরূপ দানের কথা অনেকেই জানেন না। মহর্ষির দানের ভিতরকার কথা ছিল এই যে, আগে মনের ভিতর সায় লইতেন,-তাঁর দান ত মানুষ-দেখান ছিল না—ভিতর হইতে যখন হুকুম আসিত, মহর্ষি অকাতরে দান করিতেন।

সমগ্র ব্রহ্মসমাজের ইতিহাস যদি অবিকল লেখা যায়, তবে দেখা যায় যে, মহর্ষি এই ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য কত লাখ টাকা দান করে গেছেন। কিন্তু তাঁর সে সকল দানের কথা কয় জনেই বা জানে?

এমন মানুষ আমাদের মধ্য হইতে চ'লে গেছেন। এমন মানুষের অনুকরণ করাও কঠিন। তাঁর জীবনে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখেছি, ঈশ্বর করুন, তা যেন আমাদের কাছে বৃথা হইয়া না যায়। তাঁর এই জীবন যেন আমাদের কাছে ব্যর্থ না হয়। তিনি যে আত্মার ব্যাকুলতা, প্রাণের দীনতা ও বিশ্বাসের গাঢ়তা দেখাইয়া গিয়াছেন—ঈশ্বর করুন আমরা যেন আমাদের মধ্যে তাহা ধারণ করিতে পারি। তিনি যে ধর্ম্মকে অনাসক্ত ভাবে ধ'রবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্ব্বোপরি তিনি যে পরমাত্মাকে চিন্ময়রূপে ধরিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন—ঈশ্বর করুন আমরা যেন সেই ভাব ধারণ ক'রে তাঁহার এই পবিত্র, এই মহোচ্চ জীবনের দৃষ্টান্তে উপকৃত হইতে পারি।"

মুনাফা

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার

ছুটতে ছুটতেই ঘড়িটা দেখে নিল সুকুমার। গাড়ী এসে পড়েছে। ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আজ অফিস পৌঁছতে নির্ঘাৎ দেরী হবে। প্রথম গাড়ীটা ধরবে বলে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল। স্নান না করে, আলু-সিদ্ধ আর ভাত নাকে-মুখে গুঁজে। খানিকটা পথ আসতেই হাতিবাগানে কেনা কাঁচা-চামড়ার কাবলী করলো বিশ্বাসঘাতকতা। গেল ছিঁড়ে। অতখানি পথ উজিয়ে এসে চটি পরে আবার ফিরতে হলো সুকুমারকে।

গাড়ীটা থামতে যা দেরী। একসেকেণ্ড বুড়ি-ছোঁওয়ার মত দমদম্ ষ্টেশন ছুঁয়ে আবার দৌড় দেবে।

সামনেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। সুকুমার এগিয়ে গেল। একটা বারো-তেরো.বছরের মেয়ে দোর আগ্‌লে দাঁড়িয়ে। থম্‌থমে মুখখানা। মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখছে মাঝে মাঝে। লক্ষ্যই করেনি মেয়েটি যে সুকুমার ভেতরে ঢোকবার জন্য হাতলে ঠেলা দিয়েছে।

—আঃ, সরে দাঁড়া না।

সুকুমারের কথার ঝাঁকানিতে চমক ভাঙলো মেয়েটির। সরে দাঁড়ালো।

কু-উ-উ। ঝকৃঝকৃ···ধকৃধকৃ···ছেড়ে দিল গাড়ী।

নস্যির ডিবে বার করতে করতে সুকুমার মেয়েটিকে বললো: ওরকম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছিস কেন রে?

ওপাশের বেঞ্চ থেকে একজন বাবু অযাচিত উত্তর দিলেন: আর বলেন কেন মশাই! চাল—চাল—চুরি করে চাল নিয়ে যাচ্ছে ডানকুনি থেকে। ব্ল্যাকে ঝাড়বে কোলকাতায়।···দেখি মশাই এক টিপ···'র' নস্যি নাকি?

মেয়েটি আমতা আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করলো। প্রতিবাদ নিশ্চয় নয়; প্রতিবাদের জোর নেই তার কেন না চাল সে সত্যি নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো মেয়েটির মুখে যে কথা ফুটে উঠেছে সেটা হলো এই—ওগো বাবু! একটু আস্তে বলো কথাগুলো। পুলিশে শুনতে পেলে আমায় এখুনি চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে।

এক টিপ বলতে এক খামচা নস্যি তুলে নিয়ে ওপাশের বাবুটি নাসারন্ধ্রে দিলেন। তারপর হাঁচি-হাঁচি ভাব নিয়ে জল-টলটল চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন:

—কিরে, কতো লাভ হবে?

—আজ্ঞে না বাবু, আজ আর তেমন হবে না। টিকিট-বাবুই আট আনা নিয়েছে।

—কতো চাল আছে সঙ্গে?

—মাত্র পনরো সের বাবু!

সুকুমার আর একবার ঘড়ি দেখলো। দমদম্ থেকে শিয়ালদা লাগবে তেরো মিনিট। মানে, দশটা বাজতে দুই। বাসে বা ট্রামে উঠতে দশটা পাঁচ। পৌঁছতে পৌঁছতে—নাঃ, আজ সিওর লেট··

ধকৃধক্ ধকৃধকৃ... কু-উ-উ। আরও জোরে যাচ্ছে গাড়ী।

মেয়েটা এইবার বেঞ্চির নীচ থেকে টেনে বার করলো একটা ছোট বস্তা। উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো, বস্তার বাঁধন ঠিক আছে কি না।

সুকুমার একটা সাময়িক পত্রিকা বার করলো পকেট থেকে। এইবার পড়বে।

—তোর নাম কি রে?

—অন্নপূর্ণা। বস্তার গিঁট শক্ত করতে করতেই জবাব দিল মেয়েটি।

—পুলিশ ধরলে কি করবি? এসব করিস কেন?

কোন উত্তর দিল না মেয়েটি। বড় ব্যস্ত। কিংবা জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না। ট্রেনের চাকায় আর লাইনে কিন্তু এতক্ষণ যে ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ শব্দ হচ্ছিল সেখানে যেন অন্নপূর্ণার কণ্ঠের পাল্টা প্রশ্ন ধ্বনিত হলো—

কেন করি? কেন করি? কেন করি? ⋯ অর্থাৎ কেন এমন করি তোমরা কি করে বুঝবে বাবু?

অন্নপূর্ণা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একবার এ-দরজায় যাচ্ছে, আর একবার ও-দরজায়। উঁকি মেরে মেরে কি যেন দেখছে।

ও-পাশের বাবুটি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন :

পুলিশের ভয়?—হুঃ, ওদের মামা-মাসীরা মশাই পেটের চারপাশে এমন ভাবে চাল বেঁধে নিয়ে যাবে যে আপনি ভাবতেই পারবেন না। অবাক হয়ে যাবেন। ঐ যে বস্তা দেখছেন, পনরো সের চাল আছে বলছে। তার মানে, পাঁচ পনোরোং পঁচাত্তর আনা, চার টাকা এগারো আনা।⋯অর্থাৎ দিয়ে-থুয়ে অন্ততঃ তিনটাকা বারো আনা লাভ মারবে⋯।

উল্টোডিঙি আসছে। অন্নপূর্ণার কান নেই ও-বাবুর কথায়। থাকলে হয়তো জবাব দিতো—বলতো : পেটের চারপাশে চাল বেঁধে নিয়ে যাই মশাই, কিন্তু তবু সে-চাল পেটের ভেতর যেতে পায় না, আমাদের দুবেলা অন্ন জোটেনা।

⋯অন্নপূর্ণা হঠাৎ দরজাটা হাট করে খুলে দিল, তারপর চালের বস্তা টেনে নিয়ে গেল দোরগোড়ায়।

—আরে ও কি করছিস্? ও কি করছিস? প্রশ্ন করলো সুকুমার।

'—এইখানে লাইন-ধারে আমার দিদিমা দাঁড়িয়ে আছে বাবু। বস্তাটা ফেলে দোবো।' বলতে বলতে বস্তাটা এক হ্যাঁচকা টানে দরজার একেবারে ধারে নিয়ে ফেললো অন্নপূর্ণা।

ধক্ধক্ ধক্ধক্⋯কু-উ-উ—এসে পরেছে সেই চিহ্নিত স্থান। ঐ যে দিদিমা দাঁড়িয়ে। আর একবার দেখে নিল অন্নপূর্ণা। তারপর⋯হু-হু করে গাড়ীটা সেই চিহ্নিতস্থানে পৌছবামাত্র অন্নপূর্ণা চিৎকার করে উঠলো :

দি—দি—মা। কিন্তু বস্তাটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে গিয়ে কেমন যেন বেসামাল হয়ে গেল অন্নপূর্ণা। বস্তার সঙ্গে সঙ্গে সেও অটাপটি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল বাইরে। অন্নপূর্ণার সেই সাঙ্কেতিক 'দিদিমা' ডাক বেগবতী ট্রেণের বিপরীতমুখী দুরন্ত হাওয়ায় কেমন যেন এক বিকট আর্ত্তনাদের মতো শোনালো।

আঁতকে উঠলো সুকুমার। লাফিয়ে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠলো—মেয়েটা যে পড়ে গেল মশাই। চেন টানবার জন্য ছুটে গেল সুকুমার। হাঁ-হাঁ-হাঁ করে বাধা দিয়ে উঠলেন ও-পাশের সেই বাবু।

—করছেন কি মশাই?

—মেয়েটা যে পড়ে গেল।

—ওকি মরবে মনে করছেন? দূর মশাই, কঠিন জান্ ওদের। আপনি চেন টানবেন, ফলে পুলিশ আর গার্ড টানাটানি করবে আমাদের নিয়ে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ট্রেন ডিটেন হবে। মাঝখান থেকে অফিস লেট⋯

সুকুমার হতভম্ব হয়ে বসে পড়লো বেঞ্চে।

ট্রেন জানেনা, অন্নপূর্ণা পড়ে গেছে। হুহু করে তেমনি নির্ব্বিকার গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন।

চালের বস্তা ধরলাম ভেবে অপেক্ষমানা দিদিমা-বুড়ি হয়তো এখন অন্নপূর্ণার লাসটা জাপটে ধরেছে। ভাবছে—বাঃ রে মুনাফা!

পূর্ব্বপাকিস্তান বাঙলা সাহিত্য সম্মেলন

প্রফুল্ল রায়

উত্তরের তুষার-কবরী হিমালয়, দক্ষিণের শুভ্রচন্দন বঙ্গোপসাগর, পূবের পান্নার দীপ্তির মত সবুজ আসাম আর পশ্চিমে বিহারের প্রাণহীন ঊষরমৃত্তিকার পাঁজর ছিন্ন করিয়া উঁকি-দেওয়া জনার আর ভুট্টার ইতস্ততঃ আত্মপ্রকাশ —এই সীমানাচিহ্নের পরিবেষ্টনে ভূগোলের মানচিত্রে যে দেশটি একটি নগণ্য বিন্দুর মত স্থান পাইয়াছে, উনিশ শ' সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগষ্ট পর্যন্ত তাহার নাম ছিল বাঙলা দেশ, কিন্তু ঠিক তাহার পরের দিন হইতেই ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে একটি অদৃশ্য রাজনীতির খরখঙ্গে তাহা দ্বিখণ্ডিত হইল। তাহার পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমাংশ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাঙলা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দুইটি দেশ দুইটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের চিহ্ন বহন করিলেও কৃষ্টিগত প্রাণসত্তার দিক হইতে এই দুইটি দেশ মিশিয়া একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য বাঙালী জীবনের স্নেহময়ী ধাত্রী; আবহমান কাল হইতে তাহার অমৃতময় স্তন্যরসে বাঙালীকে সঞ্জীবিত করিয়া চলিয়াছে। দুইটি দেশের আশা এক, নিরাশা এক, বেদনা হাহাকার, গ্লানি-মৃত্যুর, ক্রন্দন-প্রেরণার হৃৎস্পন্দন এক। ভাষা এক, সাহিত্য এক, শিল্প এক, সংস্কৃতি এক।

দ্বিধাছিন্ন বাঙলার পরিচয় পাকিস্তান ও ভারত হইলেও সকল সমস্যার মতই দুইটি দেশেরই বাঙলা ভাষা রাষ্ট্রগত নিপীড়নে পতনক্লিষ্ট। আর সেই পতনের অন্ধ যবনিকা অপসারিত করিয়া দুইটি দেশেই বাঙলা ভাষার জ্যোতির্ময় আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতিটি বাঙালীর প্রতিটি রক্তকোষ স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পূর্ব-বাঙলা ভাষা-আন্দোলন সেই গণদেবতারই ভৈরব জাগরণের সংবাদ আনিয়াছিল এবং সম্প্রতি লীগের স্বৈরাচারী প্রভুত্ব সেই ভাষারই ক্রোধদীপ্ত বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলাও তাহার ভাষার জন্য আত্মিক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা সহরের কার্জন হলে বাঙলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের তরফ হইতে পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যসাধকদের প্রতি উদার আমন্ত্রণ জানানো হয়। পশ্চিম বাঙলা হইতে শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে পাঁচ সহস্র সাহিত্যানুরাগী নরনারীর সমাবেশে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন, এতকাল অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের বাণী-সাধকেরা প্রচলিত বাঙলা ভাষাকে 'গঙ্গা তীরের ভাষা' বলিয়া আরবী হরফের মাধ্যমে তাহা প্রচার করার আবেদন লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আরবীর প্রতি মোহ একটি ভঙ্গুর কাচের বাসনের মত ভাঙিয়া টুকরো টুকরো হইয়া গিয়াছে। বাঙলা ভাষা বাঙলার রসপ্রাণ মানুষ-মাত্রেরই একমাত্র উচ্চারণ-মন্ত্র। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন, ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়, গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাঙলাকে সংস্কৃত-পন্থী করিতে চাহিয়াছে অপরদিকে আর একটি দল তাহাকে আরবীপৃষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু দুইটি প্রচেষ্টাই সমান অপরাধের। একদল খাঁটি বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চাহিতেছে, আর একদল আরবীর ছুরিকাদ্বারা তাহাকে জবাই করিতে চাহিতেছে। বাঙলা অক্ষরের মধ্যে বাঙলা ভাষাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। অস্বাভাবিক জোর দিয়া তিনি বলেনঃ বাঙলাভাষাকে পিষ্ট করিয়া পূর্ববাঙলায় উর্দুকে যদি কেহ রাষ্ট্রভাষা করিতে চায়, সে পাকিস্তানের দুশমন। আশাবাদী মত প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, Basic English-এর মত এক সোজা বাঙলার বিষয় বিবেচনা করা আমাদের কর্তব্য।

পূর্ববাঙলার জনসংখ্যা গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বেশী। স্বর্ণসম্ভবা বাঙলাকে কেবল জনে নয়, ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশের সমকক্ষ হইতে হইবে। কেবল কাব্য-উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাঙলাকে সীমাচিহ্নিত করিয়া রাখিলে চলিবে না, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, পদার্থ-তত্ত্ব জীবতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিভাগে উহাকে প্রতি-

ষ্ঠিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে 'পুরোপুরি' বাঙলা ভাষায় ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম দিনের বৈকালিক অধিবেশনে কথা-সাহিত্য-শাখায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল ফজল এবং কাব্য-সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন কবি আব্দুল কাদির। কথা-সাহিত্য বিভাগে উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন শওকৎ ওসমান ও নাটক সম্বন্ধে মুনীর চৌধুরী। কবি জসিমুদ্দিন 'কবির কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় আজিজুল হকের নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ছিল গণসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও ছায়া-নাটিকা।

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে আমন্ত্রিত অতিথি ও প্রতিনিধিদের নাম ও সংখ্যা এইরূপঃ উর্দু কবি ও সাহিত্যিকঃ জগন্নাথ আজাদ, ওয়াসিক জৌনপুরী, পারভেজ শাহীদি, রইম আমরোহী, চট্টগ্রামঃ সাওকৎ ওসমান, আবুল ফজল, রমেশ শীল সম্প্রদায় (মোট ১৬০ জন)। বগুড়াঃ ২০ জন, নোয়াখালিঃ ২৫ জন, দিনাজপুরঃ ২০ জন, রংপুরঃ ২৩ জন, শ্রীহট্টঃ ৩০ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়াঃ ১ জন, মাণিকগঞ্জঃ ৩ জন, বরিশালঃ ১০ জন, কুমিল্লাঃ ১২ জন, নওগাঁঃ ১১ জন, পাবনাঃ ৬ জন, কিশোরগঞ্জ ঃ ২ জন এবং রাজসাহীঃ ৭ জন।

দ্বিতীয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ কার্যক্রম ছিল মৌলানা ভাসানী ও ডাঃ সিদ্দিকীর অভিভাষণ।

উদ্বোধনী ভাষণে মৌলানা ভাসানী বাঙালী সাহিত্যিকদের নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন, জাতীয় জীবনে সাহিত্যের মাধ্যমে নূতন ভাবচেতনার প্লাবন আনিতে হইবে। আনন্দই জাতির প্রাণবিন্দু, বাঙালী আনন্দপ্রিয় জাতি। তাহার জীবনে রসের সঞ্জীবনীধারা প্রবাহিত করিবার জন্য সাহিত্যকর্মীদের দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে। বাঙলার পল্লীগীতির দান সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ পল্লীগাথার প্রাণসঞ্চারী সুরই কৃষক জীবনের পথের পাথেয়। তিনি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মূল সভাপতি অশীতিপর বৃদ্ধ ডক্টর সিদ্দিকী বলেন, আজ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানের আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের অতীতের কুৎসিত সম্পর্কও অপগত। জীবনকে বাদ দিয়া সাহিত্য নহে, আজ দেশে জীবনের যে তেজোস্পর্শ স্ফুরিত হইয়াছে, সেই অগ্নিশুদ্ধ জীবনকে সাহিত্যে পরিপ্লাবিত করিয়া দিতে হইবে। তিনি বলেন, মাতৃভাষার উপর যে আক্রমণ আসিয়াছে তাহা জীবনের বিনিময়ে রোধ করা হইয়াছে, সেই সংগ্রামী চেতনাবোধের আন্দোলনকে কালজয়ী করিয়া রাখিতে হইবে। সাহিত্যিকদের প্রতি নির্দেশ করিয়া তিনি বলেন, দেশের লোককে যদি ভালবাসিয়া থাকেন তবে তাহাদের জীবন-প্রকাশের গুরুতম দায়িত্ব তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নে বাঙলা ভাষা আন্দোলনের শহীদবেদীতে মাল্যদান প্রসঙ্গে মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দান করেন রাধারাণী দেবী ও উর্দু কবি পারভেজ শাহিদী; শাহিদী বলেনঃ উর্দুভাষী হিসাবে আমি উর্দুকে যেভাবে ভালবাসি, তাহা হইতেই জানি বাঙলাভাষী তাহার মাতৃভাষাকে কিরূপ ভালবাসে; বাঙলাভাষাকে ভালবাসিয়া যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের সেলাম।

সম্মেলনের যুক্ত সম্পাদকদ্বয় লিখিত ভাষণে বলেন, 'আজ যে যাত্রা আমরা শুরু করেছি কল্যাণময় এক ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে, একসঙ্গেই আমরা সংগ্রাম করবো তার দিকে এগিয়ে চলতে। আর যেন কোন অশুভ হস্ত আমাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে না পারে।'

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডক্টর কুদরত-এ খুদা অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বাঙলার মধ্যে ফলবতী করিতে হইবে। প্রাতঃকালীন সমাবেশে ভাষা ও সাহিত্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক আবদুল হাই তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন আবু জাফর শামসুদ্দিন, অধ্যাপক হানিফ, অধ্যাপক কাজী দীন মহাম্মদ, ডক্টর রথীন্দ্রমোহন মিত্র, আবখল্লাহ আলমুতি এবং মিসেস কবি।

অপরাহ্নে চারুশিল্প বিভাগের সভানায়ক জয়নুল আবেদিনের মনোজ্ঞ ভাষণের পর প্রবন্ধ পাঠ করেন শিল্পী কামরুল হাসান, জনাব গাজির আহমেদ ও কাজী আবুল কাসেম।

সমসাময়িক (১৯৪৭-১৯৫৩) শিল্প ও সাহিত্য শাখায় ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেনের ভাষণ সমাপ্ত হইবার পর জনাব শামসুর রহমান, জনাব আতোয়ার রহমান, জনাব কলিম শরাফী ও জনাব ফয়েজ আমেদ যথাক্রমে কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, সংগীত ও শিশুসাহিত্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য বিভাগে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে রমেশ শীল ও বন্দে আলী মিঞা।

লোকসাহিত্যের প্রায় বিলুপ্তির আশঙ্কা নির্ণয় করিয়া রমেশ শীল বলেনঃ বৈদেশিক পরাধীনতাই একমাত্র প্রধান

কারণ। চাষাভূষা মানুষগুলিই লোকসাহিত্যের নায়ক, এবং তাহার জীবনের সমৃদ্ধিই লোকসাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে।

শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক গঠনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার আবেদন জানাইয়া সভাপতি বন্দেআলী মিঞা বলেন ঃ শিশু সাহিত্যিকদিগকে অতিসতর্ক ভাবে, বন্ধুজনোচিত দরদের সহিত সাহিত্য-রচনা করিতে হইবে।

প্রাতঃকালীন অধিবেশনের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল উর্দু মোশায়েরা, পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত-নামা উর্দু কবি পারভেজ শাহিদী, রেজা পারভিজ, নজরুছ শফি, আসগর আলি এবং আহছান্ আহমেদ্ আল্‌ফ যোগদান করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সভাপতিত্বে প্রান্তিক নবনাট্য-সংঘের একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হইয়া সমবেত দর্শকদের চিত্ত জয় করে। চট্টগ্রামের শিল্পী সংঘের সদস্যবৃন্দ তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' অভিনয় করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখেন।

বাঙলা সাহিত্যের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখিয়া আমরা—সকল বাঙলা ভাষাভাষী প্রতিজ্ঞা করিতে পারি ঃ আর ভয় নাই—আমরা সাতকোটি সমর্পিত-প্রাণ মানুষ আসিয়াছি, নূতন কালের ইতিহাসের অগ্রগামী কীর্তিপুরুষ, আমরা আসিয়াছি নিশ্চিত পদসঞ্চারে, আমরা আসিয়াছি বীর্যবান প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত হইয়া, আমরা আসিয়াছি অতীতের মারী-মৃত্যুর, শ্মশান-কবরের, গ্লানিবেদনার উপর দিয়া, প্রাণ-গঙ্গার সাতকোটী ভগীরথ আমরা, হাতে আমাদের পাঞ্চজন্য, আমরা আসিয়াছি অন্ধ তমসা অতিক্রম করিয়া আমাদের ভাষার দাবীর ক্রান্তিসূর্যকে মধ্যাহ্নদীপ্ত করিয়া তুলিতে। আমরা সাতকোটি প্রতিজ্ঞা-গ্রথিত মানুষ আসিয়াছি।

★

ভারতেতিহাসের সুপ্রাচীন পর্বে যে শুধু মানব-ইতিহাসের গভীর সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে তা' নয়; পরবর্তী কালে যখনই মানুষের জীবনাচরণের পথ নানা বিধিবিধানে, ধরা-বাঁধা গণ্ডির সীমানায় বাঁধা পড়ে গেছে, চিরাচরিত সংস্কারের বেড়াজালে ঢাকা পড়ে গেছে, তখনই একদল লোক সেই সব বিধি-বিধান, গণ্ডি সীমানা ও সংস্কারজালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে নোতুন পথের নির্দেশদান করেছেন, জীবনের নোতুন অর্থসন্ধান করেছেন—নানা নিন্দা, গঞ্জনা ও অত্যাচার বহন করা সত্ত্বেও। মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রধর্ম্ম, আউল বাউলের ধর্ম, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম, মধ্যযুগীয় নানা ধর্ম মত ও পথ প্রভৃতির উদ্ভবের ইতিহাসেও এই একই মানবসত্য ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অগ্রগতি সম্ভব হতো না যদি এই সত্যটি ব্যক্ত হবার আকুলতা ও ব্যস্ততা না থাক্‌তো মানুষের মধ্যেই। মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, মানুষের ধর্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝেছেন, তার ভেতর এই সত্যটি নিহিত। এই মানুষই বার বার নানা অবস্থার মধ্যে, নিজেরই সৃষ্ট বিধিবিধান ও সংস্কারের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে আসে, তখন সে আবার নিজেই সমস্ত জাল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করে নোতুন খাত কেটে জীবনপ্রবাহকে মুক্ত করে দেয়। এই দেওয়ার মধ্যে দিয়েই মানবমহিমার অন্যতম মহৎ পরিচয়, মানবাত্মার জয়-ঘোষণা, মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনার প্রকাশ।

—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

আমরা কি তবে করবো

সন্তোষকুমার অধিকারী

শান্তির পাখী পাখা মেলে ওড়ে
চোখে রাখে আশ্বাস,
বজ্রদাহনে ভাঙে পাখা তার
মুছে যায় প্রতিভাস।
দূরদিগন্তে বাজ ঘোরে ফেরে
শিকারীদৃষ্টি চোখে,
ভাগাড়ের পারে একশ শকুনি
কাঁদে পৃথিবীর শোকে।

আমরা নাহয় রুখবো ঝড়ের
বিজয় মাতনটাকে,
আমরা নাহোক জ্বালবো আকাশ-
-প্রদীপে গগনটাকে;
দিকে দিকে যদি রাত্রি ঘনায়
আমরা জানাবো দিন,
আসবেই; ধরা তিমির পঙ্কে
রইবেনা বিলীন।

তবু যদি ওরা ঝড়ের কেতনে
রাত্রিকে নেড়ে বলে,
আমরা এ'সব সূর্য্যের আলো
মেঘে ঢেকে দিতে পারি,
আকাশদীপকে ভেঙে দিয়ে যাই
জোরে আর কৌশলে,
যদি বলে, মোরা শান্তির নয়,
মৃত্যুর হবো বারী!

তোমার হস্ত কমলবনের
মলয়গন্ধ মাখা,
তোমার নয়নে দূরদিগন্ত
গোধূলিস্বপ্নে আঁকা,
তোমার কণ্ঠে শঙ্খ, ওদের
বজ্রনিনাদ শোননি?
বারুদের ঘর বানাবেই ওরা
আগুনের ক্ষোভ ঢাকা!

তুমিত' বলছো শান্তির মানে
অস্ত্র বিসর্জন;
ওরা ঘটাবেই অস্ত্রশক্তির
চরম বিবর্ত্তণ;
যুদ্ধকে তুমি রুখবে কি দিয়ে
ওরা চায় হোক যুদ্ধ,
ওরা কেউ নয় গান্ধী কিম্বা
কনফুসিয়াস বুদ্ধ।

হাইড্রোজেনের শক্তিকে আজ
ধ্বংসে পরখ করবে,
ওরা বলে, ভীড় বড় পৃথিবীতে
দু'দশ কোটিত মরবে।
শক্তি যাদের পাশব, তাদের
কঠিন নির্ম্মমতা,
মানুষমারার অস্ত্রে যে তাই
মুছে যায় মানবতা।

আমরা কি তবে করবো?

আমরা প্রাণের দীপশিখায়
মুক্তির গাবো জয়,
আমরা জেনেছি শান্তির মানে
হিংসার চির লয়;
বিদ্বেষ আর অহংকারের
শক্তির চেয়ে বড়
এক দধিচীর অস্থিশয্যা;
ত্যাগেরে পূর্ণ করো।
মৃত্যুর চেয়ে জীবনের গতি
নির্ভুল অভ্রান্ত,
আমরা চলার মন্ত্রে অভীক
অমৃতপথ পান্থ॥

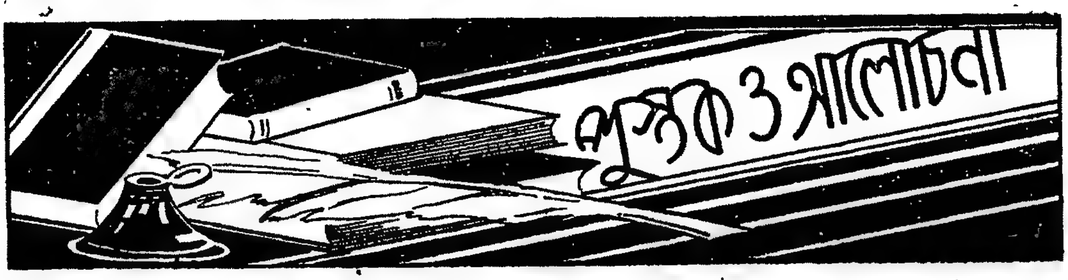

গ্রীষ্মশেষের খরদীপ্ত মাস জ্যৈষ্ঠ—অগ্নিনেত্র কাপালিকের মত বীরাচারী; বিশুষ্ক মাঠপ্রান্তরের করোটিকঙ্কালে রৌদ্রের আসব লইয়া তাহার তন্ত্রতপস্যা। এই মাসের একটি সবিশেষ তাৎপর্য আছে। গ্রীষ্ম-বর্ষার সীমান্তবিন্দুতে দাঁড়াইয়া আগামী আষাঢ়ে মেঘকজ্জলিত বর্ষার জন্ম তাহার সেই ভয়াল শবসাধনার মধ্যেও প্রাণিত বন্দনা।

এই রোষরুদ্র জ্যৈষ্ঠে একটি সূর্যকেন্দ্রিত অগ্নিকমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। তাঁহার 'অগ্নিবীণা'র তারে তারে এই মাসের খরতেজেরই প্রার্থনা। তাঁহার জন্মজয়ন্তীতে আরোগ্যের কল্যাণ-কামনা করিতেছি।

সম্প্রতি পূর্ব্ববাঙলায় সর্ব্ববঙ্গ বাঙলা সাহিত্যের সম্মেলন সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙলা ভাষা প্রতিটি বাঙালীর প্রতিটি কণ্ঠের, প্রতিটি উচ্চারণের বেদধ্বনি, প্রতিটি মুহূর্ত্তের মন্ত্রোচ্চার। সেই শুভঙ্করা বাঙলা ভাষার প্রতি অন্তরের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পারস্পরিক যোগ-বন্ধনকে দৃঢ় করিবার উজ্জ্বল ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল বাঙালী বাণীসাধক।

* * *

সাহিত্যে আমরা দুই শ্রেণীর শিল্পীর সাক্ষাৎ পাই। একশ্রেণীর শিল্পী অতীতের ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বা সমসাময়িক কালের সামাজিক সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করিয়া নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার চিত্র অঙ্কিত করেন; উদ্দেশ্য—জনসাধারণ যাহাতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উহার সমস্যাবলীর সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সমস্যার ইঙ্গিত করিয়াই শিল্পী মুক্ত, তাঁহার সমাধানের দায়িত্ব সমাজ-সংস্কারকের বা জন-সাধারণের। কিন্তু যে সাহিত্যে সমাধানেরও ইঙ্গিত আছে, সে-সাহিত্য একদিকে শিল্পকর্ম, অন্যদিকে সমাজ-কল্যাণকর ব্রত—উভয়দিকেরই সার্থক ক্রিয়াশীল সাহিত্য। সাহিত্যে এজাতীয় শিল্পীও একেবারে বিরল ন'ন। আর একশ্রেণীর শিল্পী আছেন—যাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যই হইল—নিত্যদিনের দুঃখ-কষ্ট-হাহাকারের দাবদাহ হইতে মানুষকে ভুলাইয়া কিছুক্ষণের জন্যও অন্ততঃ তাহার জীবনে কিছু হাসি ও আনন্দের সঞ্চার করা। বাউলের জীবনকে যেমন এ সংসারের পাপ-প্রপঞ্চময়তা কখনও স্পর্শ করে না, সে যেমন আপন-ঔদাস্যে অহরহ তাহার 'মনের মানুষের' উদ্দেশে গান গাহিয়া চলে, তেমনই সাহিত্যের এই শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পীরাও তাঁহাদের প্রধান উদ্দিষ্ট মানুষদের জন্য আনন্দকর কাহিনী রচনা করিয়া চলেন। এই শ্রেণীর অন্যতম শক্তিমান শিল্পী পরিমল গোস্বামী। অথচ এই শ্রেণীর হইয়াও তিনি আত্মবৈশিষ্ট্যে অন্যাপেক্ষা স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করে। ইংরেজিতে যেমন Wit and Humour, বাংলায় তেমনি কৌতুক ও ব্যঙ্গ; এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে রাজশেখর বসু, পরিমল গোস্বামী ও প্র, না, বি অন্যতম। কিন্তু অন্যতমদের একজন হইয়াও যেখানে পরিমল বাবু তাঁহার প্রতিভার ক্ষেত্রে একান্তই একক, তাহা হইতেছে তাঁহার ব্যঙ্গ বা কৌতুকাবহ কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবতার সংস্পর্শ। তিনি ব্যঙ্গ করিতে যাইয়া নিতান্তই কৌতুক করেন নাই, বা কৌতুক করিতে যাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বাঙালী সমাজের প্রতি অহেতুক শ্লেষ বর্ষণ করেন নাই। যাহা প্রচলিত, যাহা স্থিরসিদ্ধান্ত, যাহা অনাচারের আবরণে নিয়মে অবরুদ্ধ, তাহাকেই তিনি আরবি-শব্দ-পাঠের-মতো উল্টাইয়া অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম ভাবে বাংলায় প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহাকে অনেক সময় স্বপ্নমধুর কাহিনীরও অবতারণা করিতে হইয়াছে; কিন্তু কোনোটিরই উদ্দেশ্য লেখকের মূল-

সম্পাদকীয়

বঙ্গশ্রীর একবিংশতিতম বর্ষ পূর্তির নিবেদন

বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর একবিংশতিতম বর্ষ পূর্ণ হইল। গত সুদীর্ঘকাল যাঁহারা আমাদিগকে নানাভাবের সাহচর্য দান করিয়া বঙ্গশ্রীর উন্নতিবিধানকল্পে সহায়তা করিয়াছেন, এই অবকাশে তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বাংলাদেশের অধিকাংশ সাময়িকপত্রই গত কিছুকালের মধ্যে তাঁহাদের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সাড়া দিতে পারি নাই। বাঙালী আজ তাহার জীবন-সংগ্রামে নানাভাবে পর্যুদস্ত। অর্থনৈতিক অধোগতির ফলে বহুক্ষেত্রেই আজ জাতীয় সংস্কৃতি ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। ইহা আমরা প্রতিদিনই লক্ষ্য করিতেছি। এই অবস্থায় পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সহৃদয় পাঠক সাধারণকে আমরা বিপর্যস্ত করিতে চাহি নাই। আজ সর্বক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই; ছাপাখানা, কাগজ, কালি প্রভৃতিরও অসম্ভব মূল্য বাড়িয়াছে। তৎসত্ত্বেও নানা ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমরা বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসারের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। আমাদের সহৃদয় লেখক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা ভবিষ্যতে আমাদের আরব্ধ কার্যে আরও বেশী কৃতকার্য হইতে পারিব বলিয়াই ভরসা রাখি।

সাহিত্যের নামে একশ্রেণীর পূতিগন্ধময় আবর্জনায় আজ বাজার ভরিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গশ্রী চিরকাল সেই আবর্জনা বন্ধ করিতে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। একটা জাতির সুষ্ঠু জীবনবোধ যে অনেকাংশেই তাহার সৎসাহিত্যের উপর নির্ভরশীল, একথা বার বার আমরা দেশের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছি; আমাদের রুচিবান লেখক ও পাঠকবৃন্দের সহযোগিতা একাজে আমাদিগকে আরও অধিকতর উৎসাহিত করিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

আজ যাহারা তরুণ, কাল তাহারা দেশ ও জাতির কর্ণধার। আজিকার অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যিকের অসামান্য শক্তির পরিচয় গত এক বৎসরের বঙ্গশ্রীর পাতায় পাতায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। বঙ্গশ্রী চিরকালই তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছে। বঙ্গশ্রীর এমন বহু একদা-তরুণ লেখক আজ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের গৌরবে বঙ্গশ্রী গৌরবান্বিত। আমরা বিশ্বাস করি, নব নব চিন্তাধারা ও প্রকাশ ব্যঞ্জনার সুললিত মাধুর্যে তাঁহারা বাংলার মানসক্ষেত্রে শ্রী ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

গ্রাহকবৃন্দের কাছে নিবেদন: যাঁহাদের চাঁদা এই মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাঁহাদের আগামী বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া আমাদের কাজের সহায়তা করেন। বঙ্গশ্রীর মূল্য পূর্ব বৎসরের ন্যায়ই বার্ষিক ৮৷৹ টাকা এবং প্রতিকপি ৷৹ আনা রহিল।

জেনেভা ও কলম্বো সম্মেলন

একই সময়ে জেনেভা ও কলম্বোতে আধুনিক সমরভীত মহাপৃথিবীর দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। দুইটি সম্মেলনেরই বিষয়বস্তু কমবেশী প্রায় এক; কিন্তু পরিবেশ এবং মানসিক সুস্থতার পটভূমির দিক হইতে দুইটি সম্মেলনের প্রকৃতিতে মূলগত প্রভেদ উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরুর পার্থক্য সূচিত করে। জেনেভার মহাসম্মেলনে কোরিয়া ও ইন্দোচীন; বিশেষ করিয়া এশিয়া-সংক্রান্ত নানা সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছেন এশিয়ার বাহিরের বিভিন্ন দেশনায়কেরা। তাঁহাদের মধ্যে একটি সদাসন্ত্রস্ত পারস্পরিক ভীতি ও সন্দেহের কলুষিত আবহাওয়া বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই তাঁহাদের স্ব স্ব সমরসম্ভারের শক্তির উপর আলোচনার গুরুত্ব অর্পণ করিতেছেন। জেনেভাতেই সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই বহির্বিশ্বে পদবিক্ষেপ করিলেন। সোবিয়েত রাশিয়া হইতে আসিয়াছেন ম' মলোটভ, ফরাসীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন বিদো, গ্রেট-

ব্রিটেনের এণ্টনি ইডেন, অস্ট্রেলিয়ার কেসী, মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের ডালেস প্রমুখ রাজনীতি-ধুরন্ধরেরাও উপস্থিত রহিয়াছেন। এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ঘটনা, এশিয়ার কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিই উপস্থিত নাই। মোট উনিশটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবেরা এই সম্মেলনে যোগ দেন।

অপরদিকে কলম্বোতে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্যর জন কোটেলওয়ালার আমন্ত্রণে এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীরা সমবেত হইয়াছেন; ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহরু, পাকিস্থানের মহম্মদ আলী, ব্রহ্মের উ-নু, ইন্দোনেশিয়ার ডাঃ আলী শাস্ত্রোমিদ্যো এবং উদ্যোক্তা সিংহল-প্রধান স্বয়ং কোটেলওয়ালা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে এশিয়াসংক্রান্ত সকল সমস্যার সুস্থ নিরসনই এই সম্মেলনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

জেনেভায় অকমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট এই গভীর-সঞ্চারী ও নীতিগত বিরোধ কোন সময়ের জন্যই অপসারিত হইয়া বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে নাই কিন্তু এই জেনেভাতেই ইন্দোচীনের আগামী ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইতেছে—ইহাই পরম কৌতুকপ্রদ ও করুণ পরিহাসের বিষয়।

জেনেভা-অধিবেশনের প্রথম দিনেই ভারতের অনুপস্থিতিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই অভিভাষণ দান করেন। মলোটভ ভারতীয় শান্তি-নীতিকে সন্তোষজনক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

কোরিয়া ও ইন্দোচীন, এই দুইটি দেশ লইয়া জেনেভায় আলোচনা স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে ইন্দোচীনে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে বিদো অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং জেনেভায় ইন্দোচীনই আলোচনার প্রথম বিষয়বস্তু।

অপর দিকে কলোম্বোতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁহার বলদৃপ্ত ভাষণে ইন্দোচীন সমস্যাকেই বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তম সমস্যা হিসাবে উপস্থিত করেন এবং যুদ্ধবিরতি আসন্ন হইলে সকল সঙ্কটও দূরীভূত হইবে, তাহার সুস্পষ্ট দিক্‌নির্দেশ করেন। ইন্দোচীনের যুদ্ধব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ-নু বলেন, "আমরা কোন সময়েই যুদ্ধ চাই না।"

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধানমন্ত্রীগণ ইন্দোচীনে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়, এই ব্যাপারে ঐক্যমত হইয়াছেন। তাঁহাদের তিন দফা প্রস্তাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইতেছে—

(১) একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশন সৃষ্টি,

(২) যতশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধবিরতি এবং

(৩) অতিশীঘ্র ইন্দোচীনের স্বাধিকার দান ঘোষণা।

অপর দিকে চৌ-এন-লাই জেনেভায় প্রস্তাব করিয়াছেন— এশিয়ার নিরাপত্তা চুক্তি করিতে হইবে। মলোটভ তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

জেনেভা বৈঠকের প্রাক্কালে দিল্লীতে লোকসভায় শ্রীনেহেরুকে ছয়দফা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। জেনেভা বৈঠকের পক্ষে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নেহেরুর ছয়দফা প্রস্তাব—

(১) শান্তি ও আলোচনার উপযুক্ত আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং বর্তমানে যে সন্দেহ ও হুমকীর আবহাওয়া বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা অপসারিত করিতে হইবে। (২) যুদ্ধবিরতি—উহা কার্যকরী করার জন্য (ক) ইন্দোচীন সংক্রান্ত আলোচনাকে সর্বপ্রথম গুরুত্বদান (খ) প্রকৃত যুদ্ধমান রাষ্ট্রগুলি যথা ফ্রান্স ও তাহার সহযোগী রাষ্ট্রত্রয় ও ভিয়েৎনামকে লইয়া যুদ্ধবিরতি দল গঠন করিতে হইবে। (৩)স্বাধীনতা—ফরাসী সরকার কতৃক ইন্দোচীনকে সন্দেহাতীতভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। এবং কোন ফরাসী কর্তৃত্ব সেখানে থাকিবে না। (৪) সম্মেলনকে এই যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশিল্ষ্ট পথগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজেরা মীমাংসা না করিয়া এই যুদ্ধের সহিত সংশিল্ষ্ট প্রধান পক্ষগুলিকে নিজেদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাইবেন এবং এতদুদ্দেশে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবেন। যুদ্ধবিরতি দল যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারাই ইন্দোচীনে নিবদ্ধ ইন্দোচীন-প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিবেন।

(৫) হস্তক্ষেপ হইতে বিরতি—সম্মেলনকে এইরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করাইতে হইবে যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধমগ্ন পক্ষগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৈন্য বা সমরোপকরণ দ্বারা সাহায্য করিতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন ও চীনই এই চুক্তির প্রধান পক্ষ হইবে। এই চুক্তি পালনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

(৬) সম্মেলনে আলোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের নিকট বিবরণ পেশ করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রসংঘ সনদের অনুচ্ছেদে আপোষ-মীমাংসার যে সকল সর্তাদি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। শান্তিমূলক ব্যবস্থার উপর জোর দিলেই চলিবে না।

জেনেভা বৈঠকে কোরিয়া সমস্যা, আণবিক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে মলোটভ-বিদো, মলোটভ-ডালেস, ডালেস-ইডেন প্রভৃতির মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা চলিয়াছে।

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধানমন্ত্রীগণের পক্ষ হইতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীগুলির নিকট তাহাদের হস্তক্ষেপের ব্যাপার সহ্য করা হইবে না বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে।

আমরা সাধারণ শান্তিকামী মানুষ, বিগত মহাযুদ্ধে যাহারা বার বার বিপর্যস্ত হইয়াছি, অনাহারে মারী-মৃত্যুতে যাহারা বিধ্বস্ত হইয়াছি, আবার যুদ্ধে দেশকে ভয়ানক বধ্যভূমিতে পরিণত হইতে দেখিতে চাই না। জেনেভায়-কলোম্বোতে, বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি নামিয়া আসুক—তাহাই একমাত্র ও বহু প্রত্যাশিত অন্তর্লোকের কামনা।

কলিকাতায় পূর্বপাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক্

পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মৌলবী এ. কে. ফজলুল হকের সাম্প্রতিক কলিকাতায় আগমন নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ক্রমেই যে সন্দেহ ও সংশয় খাড়া হইয়া উঠিতেছে এবং ভিসা ও পাস-পোর্ট প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে উভয় বঙ্গের যাত্রীদের পক্ষে যে নিদারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া যাহাতে শীঘ্রই কিছুএকটা সুবিধাজনক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়, মিঃ হকের কলিকাতা আগমনের ইহা একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং তৎসম্পর্কে তিনি প্রাথমিক আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মিঃ হকের ৪৫ মিনিট আলোচনাকালে উভয় বঙ্গের মধ্যে ভিসা প্রথা বিলোপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। দুইটি রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা যাহাতে আরও সহজ হয়, তজ্জন্য ভিসা বিলোপের যৌক্তিকতা সম্পর্কে উভয় মুখ্যমন্ত্রীই একমত হন। স্থির হয় যে, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্ব স্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। তৎপর উভয় কেন্দ্রীয় সরকার ভিসা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।—পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় বঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নূতন করিয়া আলোচনার জন্য অতি সত্বর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারীর মধ্যে কলিকাতায় এক বৈঠক হইবে বলিয়া স্থির হয়। উভয় বঙ্গের মধ্যে গমনাগমনের সুবিধা এবং যাত্রীদের কষ্ট লাঘবের নিমিত্ত থ্রু টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রস্তাবও উভয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে আলোচিত হয়। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে আস্থার মনোভাব সঞ্চারিত হইতে পারে, তজ্জন্য ঐ রাজ্যে যে সকল পাঠ্যপুস্তকে উক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মনোভাব, আঘাতমূলক গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে, আলোচনাকালে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে তৎপ্রতি মিঃ হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঐগুলি প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ আজিজুল হক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পর ইতিমধ্যেই এ ধরণের পুস্তক প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, ঢাকার বর্ধমান হাউসে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি একাডেমি গঠন করা হইয়াছে। তাঁহারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য উভয় বঙ্গের মধ্যে বাঙালী পণ্ডিতদের বিনিময় করিতে প্রস্তুত আছেন। মিঃ হক বলেন যে, জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া তাঁহার আর কোনো আশা নাই, —উভয়বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যা প্রাচীর রচিত হইয়াছে, তাহা দূর করার কাজ যদি আরম্ভ করিয়া যাইতে পারেন তবে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।

পূর্ব পাকিস্থানের মর্মের বাণীই মিঃ হকের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে। লীগ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আজ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলাই পূর্বপাকিস্থান সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য হইয়াছে। এতকাল একটা মিথ্যা মরীচিকার দুর্ভেদ্য কুটিল জাল রচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্থানের লীগ গভর্নমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে যত বিষোদ্গার তুলিয়াছে, সে বিষোদ্গার যে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের নিজেদের অদৃষ্টে গিয়াই লাগিল, তাহার প্রধান উদাহরণ হইতেছে লীগ গভর্নমেণ্টের অবসান। তাহারা যে পাপ করিয়া গিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে আজ অগ্রসর হইয়াছেন অশীতিপর বৃদ্ধ মৌলবী এ কে. ফজলুল হক। তিনি শুধু আজ পূর্ব পাকিস্থানেরই অবিসংবাদি নেতা নন, একদা অবিভক্ত বাংলারও তিনি ক্ষমতাশালী নেতৃত্ব পদে আসীন ছিলেন। তাঁহার কাছে বাংলার মর্মের দিকটি ঢাকা থাকিবার কথা নয়। তিনি আজ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশবিভাগ একটা প্রহসন মাত্র, দুই বাংলার নাড়ী একই ভাবে গঠিত, দুই বাংলার ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত। বাহির হইতে কিছু-একটা বেড়া দিয়া তাহাকে ঢাকিতে চেষ্টা করিলেই সে ঢাকা পড়ে না। এই সত্য আজ আবার নতুন করিয়া

প্রমাণিত হইয়া গেল পূর্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনে। নেতাজী ভবনে শরৎচন্দ্র বসু একাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত এক সম্বর্ধনায় মিঃ হক বলেন ঃ 'ভারতীয় হিসাবে, আমরা দল এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ঊর্ধ্বে। দেশের উন্নতিবিধানের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কতখানি, তৎসম্পর্কে সচেতন হইলে আমার মনে হয়, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নাই যাহা আমাদের ভাগ করিতে পারে। একই উদ্দেশ্য সাধনের পথে আমরা সহকর্মী। লক্ষ্য এক হইলে আমি বাঙালী, অমুক বিহারী, অমুক পাকিস্থানী ইত্যাদি বলার কোনো অর্থ হয় না। যাহারা ভারত বিভাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি ভারতের শত্রু বলিয়া মনে করি। পাকিস্থান বলিতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝায় না। উহা বিভ্রান্তির সূচনা করিবার একটি পন্থা। ইহা কেবল উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। এই উপমহাদেশের মুসলমানদের এইরূপ চিন্তা করিতে বাধ্য করা হইয়াছে যে, তাহারা আকাশ হইতে কিছু পাইয়া গিয়াছে, অতএব নিকট প্রতিবেশীদের ব্যাপারে তাহাদের কিছুই করিবার নাই। আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করি না। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি এই সকল ভাবধারার ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিব। আমি আশা করি যে, জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর আমি ইহা দেখাইতে পারিব যে, আন্তরিকতার সহিত দেশের সেবায় ব্রতী হইলে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হইতে পারে।...আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশগ্রহণ করিতে হইতেছে। আশা করি 'ভারত' কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমি উহার দ্বারা পাকিস্থান ও ভারত উভয়কেই বুঝাইয়াছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলিয়াই আমি মনে করিতে চেষ্টা করিব। আমি ভারতের সেবা করিব। আমি ইহাও দেখাইতে চাই যে, সেবা করিবার সত্যিকারের ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না।'

ভারতকে তাহার অক্ষতদেহে সেবা করিবার প্রবৃত্তি যখন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংঘাতে অন্তর্হিত হইল, তখনই প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের জন্ম। তারপর দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সাত বৎসরের ইতিহাস মর্মান্তিক ইতিহাস। ভারতকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে জিগিরের ধ্বনিতে গত সাত বৎসরের পাকিস্থান-রাষ্ট্রের ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দিন বদলায়, ইতিহাসেরও পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনেরই স্বাক্ষর আজ খুঁজিয়া পাইতেছি মিঃ হকের উক্তিতে। অবিভক্ত বঙ্গে তিনিই প্রথম লীগ মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখনও আম[illegible] মিঃ হকের তেজস্বিতা লক্ষ্য করিয়াছি, আবার পূর্বপাকি[illegible] স্থানে লীগ মন্ত্রীত্বকে পর্য্যুদস্ত করিয়া যুক্তফ্রন্টের গভন[illegible] মেণ্ট গঠনের মধ্য দিয়াও আজ মিঃ হককে দেখিতেছি। আ[illegible] তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়কপদেই প্রতিষ্ঠিত নন, মানবতার বিপু[illegible] গৌরব-শিখরেও অধিষ্ঠিত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন [illegible] তাঁহার শেষ জীবন বাংলা, বাঙালী ও বাংলা ভাষার উন্নতি[illegible] কল্পে কাজ করিয়া যাইবেন। ইহা যদি নিতান্ত রাজনৈতি[illegible] উক্তি না হইয়া আন্তরিক উক্তি হয়, এবং প্রতিদিনের কর্মে[illegible] মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারে[illegible] তবে শুধু পূর্ববঙ্গই নয়, সমগ্র বাংলা ও বাঙালী চিরকা[illegible] তাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিগত ১৬-১৭ই এপ্রিল তারিখে মালদহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগা[illegible] সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অধিবে[illegible] শনে সভাপতিত্ব করেন অনাথনাথ বসু ও উদ্বোধন করে[illegible] জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বি, এস, কেশবন। শিক্ষ[illegible] সক্রিয় বাহন হিসাবে গ্রন্থাগারের দান অপরিসীম কি[illegible] বাঙলাদেশের গ্রন্থাগারগুলি এইদিক হইতে শোচনীয় দু[illegible] বস্থার কবলে মৃতপ্রায়। উপরন্তু ১৯৫১ সালের আদ[illegible] সুমারীতে ৫২ লক্ষ বাঙালী শিক্ষিতের সংখ্যা ধার্য ক[illegible] হইয়াছে আর সেই অনুপাতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা হইতে[illegible] মাত্র একুশ শো।

জনশিক্ষার প্রসার, গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধতম পরিকল্প[illegible] ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া এবারকার অধিবেশনটি বিশেষ তা[illegible] পর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নানা বিষয়ে আলোক পা[illegible] করিয়া বক্তৃতা দেন বি, এস, কেশবন, প্রভাতকুমার মুখে[illegible] পাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ। এই অধি[illegible] বেশনে সম্পূর্ণ একটি নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজন বিশে[illegible] উল্লেখযোগ্য; বিষয়টি শিশুগ্রন্থাগার স্থাপন ও তাহার সু[illegible] পরিচালনার উপর আলোচনা।

মোট কথা, আমরা আশা করি গ্রন্থাগার আন্দোলনে ব্যাপারে গ্রন্থাগারের কর্ণধারগণ ও সরকার যৌথভা[illegible] পারস্পরিক সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন এবং সুপরি[illegible] কল্পিত ও সমৃদ্ধতর গ্রন্থাগারের মাধ্যমে উপযুক্ত জনশিক্ষ[illegible] প্রচারিত করিবেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সক্রিয় অগ্র[illegible] যাত্রা মঙ্গলময় জয়যাত্রায় পরিণত হউক—ইহাই আন্তরি[illegible] কামনা।

মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ বাতিল

। বৎসর পূর্বে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে মধ্য-র্ষদ গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার র হইতে বিশেষ অর্ডিন্যান্স বলে পর্ষদকে বাতিল দিয়াছেন। সরকার হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ন্দ্রনাথ দাসকে পর্ষদের এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

ছুদিন হইতেই জনসাধারণ পর্ষদের বিভিন্ন তা লক্ষ্য করিয়া বিরক্তি অনুভব করিতেছিলেন। পরীক্ষার পূর্বেই ফাঁস প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম-চ ও অব্যবস্থামূলক কার্যের জন্য পর্ষদের এই নির্মম। বিশেষ করিয়া প্রশ্নপত্রে নানাপ্রকার গোলযোগ ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তারা যে চমৎকার তা দেখাইয়াছেন, পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থার ইতি-হা অভূতপূর্ব। এ বৎসর ইংরাজী পরীক্ষার পূর্বেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা কিছুকালের জন্য স্থগিত এবং সহস্র সহস্র পরীক্ষার্থী যে অসুবিধায় কবলিত স্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা পর্ষদের সরকার কর্তৃক ক্‌ বড়কর্তাদের কাণে বিশেষ আবেদন যে তুলিতে াই তাহারই মর্মান্তিক প্রমাণ পুনরায় অনুষ্ঠিত র সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আবার প্রশ্নপত্র আবার অব্যবস্থা।

কার যথাসময়ে এবং অতি তৎপরতার সহিত বাতিল করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া-এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকর্তাদের জনসমক্ষে চ শাস্তি বিধান করিয়া শিক্ষাকে সমস্ত ত্রুটি ও গলদ মুক্ত করিবার জন্য সরকারের এই সুদৃঢ় পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

গত ৯ই মে রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্তাহারে বলা হইয়াছে—

গত কিছুকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মধ্যশিক্ষা-র ক্রিয়াকলাপ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য চছিলেন। পর্ষদ বার বার অযোগ্যতা ও ত্রুটিবিচ্যু-পরিচয় প্রদান করে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পরিণতির মধ্যে সরকার মনে করেন পর্ষদ তাহার সংক্রান্ত গুরুভারের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও তাহা ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যতদিন ইহা পুন-না হয় ততদিন ইহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

সব নিয়মবিচ্যুত ব্যাপার ও অবস্থার জন্য সরকার পর্ষদকে বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা নিম্ন-রূপ—

(ক) পরিদর্শনকারী কর্মচারীদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া অথবা কোনরূপ পরিদর্শন না করিয়াই কয়েকটি বিদ্যালয়ের অনুমোদন দান, (খ) সাহায্যদান সম্পর্কিত আইনকানুন না মানিয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য দান, (গ) যথা-সময়ে বহুসংখ্যক বিদ্যালয়কে একত্রে সাহায্য না দেওয়ায় তাহাদের দুর্ভোগ, (ঘ) অনুমোদনের যোগ্যতা বিচার না করিয়া পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, (ঙ) স্কুল ফাইন্যাল পরী-ক্ষার জন্য যে সব প্রশ্নপত্র করা হয় সেগুলির যথোপযুক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখার অসামর্থ্য, ইহার ফলে গুরুতর ভুল-ত্রুটি ঘটে এবং পাঠ্যসূচী বহির্ভূত প্রশ্নপত্র রচনা হয় ও কয়েকবার পরীক্ষা বন্ধ থাকে, (চ) প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থতা, ইহার ফলে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যায়।

গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, ছাত্র ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের স্বার্থরক্ষার খাতিরেই এজাতীয় অবস্থা আর চলিতে দেওয়া অনুচিত। এই হেতু সরকার কলিকাতা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাসকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্যপরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ পুনর্গঠনে ইচ্ছাপ্রয়াসী। ঐ সব সুপারিশ কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর অনুমোদন ও ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা সম্পূর্ণ ত্রুটিবিমুক্ত আগামী দিনের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠিত রূপকে স্বাগত জানাইতেছি।

কাশ্মীর-সমস্যা

কাশ্মীরে গণভোটের মহড়া ও কাশ্মীরের উপর সর্বাত্মক দাবী লইয়া পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট যে এখনও দুশ্চিন্তা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাকিস্থান-পার্লামেণ্টের ১৯শে এপ্রিলের অধিবেশন। পাক-প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী ঘোষণা করেন যে, মার্কিন-সাহায্যের ফলে পাকিস্থান শক্তিশালী হইলে এশিয়ার নিরা-পত্তার পক্ষে আশঙ্কার কারণ ঘটিবে না। কাশ্মীর লইয়া ভারতের সহিত যদি পাকিস্থানের বিরোধ চলিতে থাকে, তাহাই হইবে আশঙ্কার কারণ, এশিয়ার স্থায়িত্বের জন্য পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় থাকা

প্রয়োজন। কিন্তু জনগণের ইচ্ছানুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কাশ্মীর ও জম্মু সংক্রান্ত বিরোধ সন্তোষজনকভাবে মিটাইবার ব্যবস্থা না হইলে তাহা সম্ভব নয়।

মিটাইবার সহজতম পন্থা হইতেছে গণভোট—যাহা পূর্ব হইতেই প্রস্তাবিত হইয়া আছে। কিন্তু কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সি গোলাম মহম্মদ তাঁহার আত্ম-নীতিতে আগাগোড়া অটল। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের কোনই আশা নাই; কাশ্মীর গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় এবং পাকিস্থান, ভারত বা অন্য কাহারও পক্ষেই সে সিদ্ধান্ত রদ করা সম্ভব নয়। রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত গণপরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর গণভোটের প্রশ্নই ওঠে না। —অতঃপর তিনি দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করেন যে, কাশ্মীর কোন অবস্থাতেই পাকিস্থানের সহিত যুক্ত হইতে পারে না এবং এই বিষয়ে মিঃ মহম্মদ আলীর যদি কোনো ভুল ধারণা থাকে, অবিলম্বে সেটা ছাড়িয়া দিলেই তিনি ভাল করিবেন। অতঃপর পাকিস্থান-গভর্নমেণ্ট কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া কাজ হাঁসিলের প্রয়াস পাইবেন—তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন পর্ব সম্প্রতি সমাপ্ত হইল। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের পদে যথাক্রমে নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি এবং শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু। এইবার লইয়া শ্রীমুখার্জি ও শ্রীবসু তৃতীয়বার উক্ত সম্মানিত পদ দুইটিতে নির্বাচিত হইলেন। ইহা তাঁহাদের উভয়েরই দক্ষতার পরিচায়ক।

পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেই দায়িত্ব সর্বত্র সর্বৈব পালিত হয় নাই। ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালনার ভার কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আসিতে বাধ্য হয়। এখনও বহু প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্মক অব্যবস্থা। যাঁহারা পরিচালক, তাঁহাদের অযোগ্যতাই ইহার জন্য একমাত্র দায়ী। অথচ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে পৌর প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অত্যধিক। সেই মর্যাদা যাহাতে কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়, পরিচালকমণ্ডলীকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলা কর্তব্য। কিন্তু সরকারী রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়—বহুতর প্রতিষ্ঠানই এ পর্যন্ত সেইভাবে চলিতে পারেন নাই। ফলে তাহাদের অক্ষমতা ও ন' সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের জীবনে অনুরূপ ইতিহা ভবিষ্যতে আর কখনও ঘটিবে না বলিয়াই আমরা মনে করি শ্রীযুক্ত মুখার্জি ও শ্রীযুক্ত বসুর এই তৃতীয় বারের নির্বাচ তাঁহাদের কর্মদক্ষতার পরিচয়ই বিশেষভাবে স্পষ্ট হই উঠিয়াছে। আশা করিব, তাঁহাদের সুযোগ্য পরিচালনায় কলিকাতা কর্পোরেশন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ করিবে [illegible] সঙ্গে কলিকাতা সহরেরও অধিকতর উন্নতি ঘটিবে। [illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসুকে তাঁহা [illegible] নতুন পদলাভে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীত-একাডেমি ও [illegible] রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় [illegible] কাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের [illegible] 'একাডেমি' গঠনের খসড়া পরিকল্পনা করিয়া পশ্চি [illegible] কলারসিকদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করিয়া [illegible] ছিলেন, সম্প্রতি তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ জানা [illegible] এই খসড়া পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল, বাংলার ঐতিহ [illegible] নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতশিক্ষা দিবার জন্য একটি অ [illegible] শিক্ষালয় এই একাডেমির অঙ্গীভূত থাকিবে এবং বর্তমানে এই বিষয়সমূহের যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, একাডেমি সেইগুলিকে অনুমোদন দিবেন, একাডেমির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণা ও পুস্তকাদি প্রকাশ করা হইবে। আরও প্রকাশ যে, প্রস্তাবিত একাডেমির আরও একটি কাজ হইবে নৃত্য নাটক ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে [illegible] সংগঠন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়া একাডেমি বাং [illegible] কলারীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কতটুকু অগ্রণী হইতে [illegible] মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়েও আলোচনা করিতেছেন। একা [illegible] সঙ্গে সঙ্গে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে [illegible] চনা করা হইতেছে। একাডেমি ও জাতীয় রঙ্গমঞ্চে [illegible] আপাতত স্থান নির্ধারিত হইয়াছে যথাক্রমে 'রবীন্দ্র-ভ [illegible] ভবন এবং সেণ্ট্ পল্স্ ক্যাথিড্রালের নিকটবর্তী রাজ্য-সরকার-অধিকৃত জমির একাংশ, অপরাংশ 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প চলিয়াছে। প্রস্তাবিত এই একাডেমিকে সম্ভবতঃ একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হইবে। ইহার ব্যয়নির্বাহের জন্য অংশতঃ

হ:-কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রারম্ভিক এককালীন ব্যয়ের জন্য বেসরকারী দানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই।

একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার সেই পরিকল্পিত কাজ বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। এবারে প্রস্তাবিত একাডেমির মাধ্যমে রাজ্যসরকার যদি সেই কাজটি সাধন করিতে পারেন, তবে দেশবন্ধুর শাশ্বত আত্মার আশীর্বাদ তাঁহারা লাভ করিবেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এই অভিনব উদ্যম প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

রবিবাসরের রজত জয়ন্তী বর্ষ

সাহিত্য সেবকগণের বিশিষ্ট মিলন সভা 'রবিবাসর' এই বার বৈশাখ মাসে পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। রবিবাসরে'র একটি গৌরবময় অতীত রহিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অধিনায়করূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাহিত্যরথী জলধর সেন ছিলেন প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট বাণীসাধকগণ একান্ত অনুরাগী সদস্য হিসাবে ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু যথাক্রমে রবিবাসরে'র সর্বাধ্যক্ষ ও সম্পাদক; প্রখ্যাত কবি-কথাশিল্পী-সাংবাদিকগণ ইহার সদস্য।

সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যিক মিলনের মত আদর্শবাদী কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনা করিবার পর এই বৎসর 'রবিবাসর' রজতজয়ন্তীর বিরল গৌরবের তোরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। আমরা ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যপদে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদের জন্য আরও দুইটি নাম তালিকাভুক্ত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, অপরজন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। কিন্তু উপাচার্যপদে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চীর যোগ্যতা অধিকতর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় পরিদর্শক ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকেই উক্তপদে নিয়োগ করিয়াছেন। ডক্টর বাগ্‌চী একদিকে যেমন খ্যাতিমান গবেষক ও ঐতিহাসিক, তেমনি অপরিসীম উদ্যমশীল ব্যক্তি। তাঁহার এই বহুতর গুণের অধিকারেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার যোগ্য আসন রচনা করিয়া লইতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই নূতন উপাচার্য পদলাভ সেই যোগ্যতারই পরিচায়ক। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, সুতরাং তাহার উপাচার্যের দায়িত্বও সমধিক। সেই দায়িত্ব পালনের দক্ষতা ডক্টর বাগ্‌চীর আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি এবং তাঁহার এই নতুন পদলাভে তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ফরাসী-ভারতের কমিউনগুলির ভারত-ভুক্তি-সম্পর্কে ভারত সরকারের নোট

ফরাসী-ভারতের কমিউনগুলির ভারতভুক্তি আন্দোলন লইয়া সম্প্রতি যে তিক্ত ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, গত সংখ্যায় আমরা তাহার কিছু আভাষ দিয়াছি। বিভিন্ন কমিউনগুলির পক্ষ হইতে ভারত সরকারকে এই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে আবেদন করা হয়, ভারত সরকার তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ফ্রান্সের নিকট একটি নোট প্রেরণ করিয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলিতেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা অনিবার্য এবং সেইভাবেই ফরাসী শাসনের অবসান ঘটিবে। ভারত সরকার এই নোটে ভারতের হস্তে অবিলম্বে ফরাসী উপনিবেশগুলির শাসন পরিচালনা কার্যত হস্তান্তর এবং যে পর্যন্ত না নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়, সে পর্যন্ত ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা উভয় গভর্ণমেণ্টেরই কাম্য এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব বলিয়া তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা। ফরাসী উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের উপর অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট এই নোটে বলিয়াছেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট চোরাচালান এবং অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন—এই ব্যবস্থাগুলিও সম্পূর্ণ নয়। নিজেদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইয়াছে। ভারত হইতে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রেরণ করা হইতেছে। অবশ্য ভারত গভর্ণমেণ্ট

জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ যদি রাজনৈতিক কারণে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় বা সরবরাহে ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নীতি সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে।

ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরে ফরাসী-ভারতীয় পুলিশদের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই নোটে বলিয়াছেন যে, ফরাসী-ভারতীয় পুলিশ ভারতীয় এলাকা লঙ্ঘন করায় এবং বেআইনীভাবে কতকগুলি লোককে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে। কেবল মাত্র ভারতীয় নাগরিকদের নয়, ফরাসী-ভারতীয় পুলিশদের স্বার্থের দিক হইতেও এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ এবং গণআন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিদেশী বাহিনীকে ভারতীয় এলাকা ব্যবহার করিতে দিতে পারেন না। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট সেই চুক্তির দ্বারা আর আবদ্ধ নহেন বলিয়া কেন বিবেচনা করেন, এই নোটে তাহার কারণগুলির পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলিতে বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে উক্ত চুক্তির মূল নীতি আর কার্যকরী নয়। এই প্রশ্নের যাহাতে সন্তোষজনক মীমাংসা হয়, তাহার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন এবং সেইজন্য তাঁহারা নূতন ভিত্তিতে আলোচনার জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়মতান্ত্রিক অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি স্মরণ রাখিয়াই ভারত গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে শাসন-পরিচালনা সরাসরি হস্তান্তরের এবং যে পর্যন্ত না আইনগত ও নিয়মতান্ত্রিক বাধাগুলি অপসারিত হয়, সে পর্যন্ত ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, উপনিবেশগুলির বিপুল সংখ্যক অধিবাসীই ভারত গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব সমর্থন করে। ফরাসী উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের অধিকাংশ লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতের সহিত অন্তর্ভুক্তির দাবী করিয়াছেন। ভারতের সহিত অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে জনগণের ইচ্ছা সুবিদিত হওয়ায় তাঁহারা গণভোট ছাড়াই অন্তর্ভুক্তির দাবী করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত যাঁহারা ফরাসী শাসন-পরিষদের দায়িত্বশীল সদস্য ছিলেন, সেই ফরাসী কাউন্সিলারগণ এবং প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতিও এই দাবী সমর্থন করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট আশা করেন, জনগণের এই দাবী ফরাসী সরকার সহানুভূতির সহিত বিচার করিবেন। সেই জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট যেভাবে, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণের ইহাই উপযুক্ত সময় বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। ইহাও দুঃখের বিষয় যে, সহানুভূতির সহিত বিবেচনা না করিয়া স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। ভারতেও এই সম্পর্কে অধিকতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে।

ফরাসী-ভারতের অধিবাসীদের অধিকাংশ লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঘোষণায় ফরাসী-ভারতের অধিবাসীদের ইচ্ছা সুস্পষ্ট হওয়ায় গণভোট গ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট এই নোটে বলিয়াছেন যে, নীতির দিক হইতে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে অবাধ গণভোট গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া বিশিষ্ট রাজনীতিক দলগুলি গণভোটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। পরিশেষে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই নোটে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারই ভিত্তিতে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিতে ভারত গভর্ণমেণ্ট আনন্দিত হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড,
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।